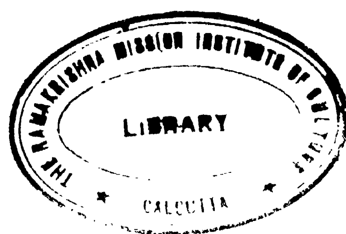



LIBRARY

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

মাঘ, ১৩৭৫



৭১তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা ৩

উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৭১তম বর্ষ

(১৩৭৫-মাঘ হইতে ১৩৭৬-পৌষ)



'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'

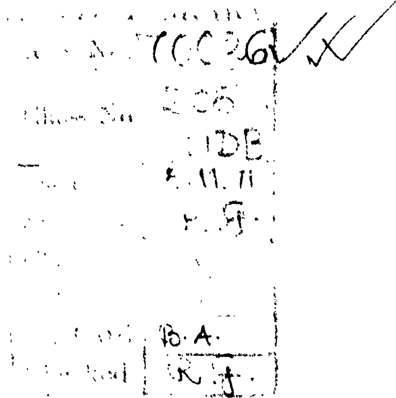
সম্পাদক

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

বার্ষিক মুল্য ৭৲ প্রতি সংখ্যা ৭০ প.



৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ,
বেলুড়ের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী বীতশোকানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত
এবং ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

(মাঘ—১৩৭৫ হইতে পৌষ—১৩৭৬)

লেখক-লেখিকাগণ ও তাঁহাদের রচনা



দিব্য বাণী

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
সংপশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং যাতি নান্যেন হেতুনা ॥ ১০
ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ময়ি সর্বং লয়ং যাতি তদ্‌ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্ ॥ ১৯
অণোরণীয়ানহমেব তদ্বন্মহানহং বিশ্বমহং বিচিত্রম্।
পুরাতনোঽহং পুরুষোঽহমীশো হিরণ্ময়োঽহং শিবরূপমস্মি ॥ ২০

—কৈবল্যোপনিষদ্

নিজেরে যে দেখে সর্বভূতেই, সবারে নিজের মাঝে,
নিঃসংশয় এ-বোধ যাহার চেতনায় সদা রাজে
পরমব্রহ্ম-গত সেই হয়; এই একত্ব বোধ
লাভ করা ছাড়া ব্রহ্মলাভের নাহিক অন্য পথ ॥

আমা হতে সবই লভেছে জনম, আমারেই ধরি আছে,
বিনাশের কালে সকলই আবার মিলায় আমারই মাঝে;
আমিই সবের সৃষ্টি-স্থিতি- ও বিনাশ-কারণ, তাই
চরমসত্য ব্রহ্ম সে আমি, নিত্য ও অদ্বয়।
মহান হতেও মহীয়ান আমি, অণু হতে অণুতর,
আমিই নিত্য, আমিই হয়েছি এ নিখিল চরাচর।
আমিই পূর্ণ, আমি ঈশ্বর—আমিই জগৎ-স্বামী,
শিব-রূপ আমি, প্রকাশধর্মী শুদ্ধ চেতনা আমি।
(এরূপে নিজেরে অভেদ যে জানে পরমাত্মার সনে
সেই-ই লভে জ্ঞান, মেশে অদ্বয় ব্রহ্মে, নিরঞ্জনে) ॥

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের নববর্ষ

শ্রীভগবানের কৃপায় 'উদ্বোধন' ৭১তম বর্ষে পদার্পণ করিল।

পত্রিকাটি ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ (১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুআরি) প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমে এটি পাক্ষিক পত্রিকা ছিল, পরে দশম বর্ষ হইতে মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।

৭০ বৎসরের এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ভারতের ইতিহাসে, জনগণের চিন্তাধারার কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আনন্দের কথা, এই সব পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিবার সময় উদ্বোধন প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত সর্বাবস্থায় তাহার 'ব্যক্তিত্ব'কে বজায় রাখিয়াই জনপ্রিয় থাকিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। ইহার কারণ, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে প রবর্তন যেখানে অবশ্যম্ভাবী এবং বাঞ্ছনীয়ও, আমাদের জাতীয় জীবনের সেই বাহ্য বিকাশকে সর্বদা স্পর্শ করিয়া থাকিলেও উদ্বোধনের ব্যক্তিত্ব দাঁড়াইয়া আছে জাতির প্রাণস্বরূপ কতকগুলি মৌলিক সত্যের ভিত্তির উপর, যে সত্য চিরদিনই এক।

স্বামী বিবেকানন্দ উদ্বোধনের ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় প্রস্তাবনা লিখিয়া দিয়াছিলেন। উহাতে 'উদ্বোধনের জীবনোদ্দেশ্য' কি, তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মানবসভ্যতায় দুটি প্রাচীন জাতির, গ্রীক ও ভারতীয় জাতির অবদান প্রধান। প্রথমটি মানুষকে জাগতিক উন্নতির শিখরে উঠিতে শিখাইয়াছে, দ্বিতীয়টি শিখাইয়াছে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরমে উঠিতে। এ-দুটির কোনটিকে বাদ দিয়া মানবসভ্যতা উন্নত হইতে, এমনকি বাঁচিতেও পারে না। যুগে যুগে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে এই দুই সভ্যতার মিলন মানব-সভ্যতাকে অগ্রগতির পথে অধিকতর অগ্রসর করাইয়াছে। আধুনিক যুগে আবার উহাদের মিলনের সময় উপস্থিত এবং তাহা ঘটিবে ভারতবর্ষেই—"এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ"।

এই মিলন ঘটাইবার কাজটি জটিল; একাজে আমাদের গভীরভাবে বহু বিষয় চিন্তা করিতে হইবে, নিজস্ব অবলম্বনভূমিকে সর্বাগ্রে আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে, নতুবা পাশ্চাত্য ভাবতরঙ্গে ভাসিয়া নিজস্বতা হইতে দূরে চলিয়া যাইবার ভয় সমূহ। এই মিলনের কাজে সহায়তা করাই "উদ্বোধনের জীবনোদ্দেশ্য"।

কিভাবে এই মিলন ঘটাইতে হইবে, তাহারও ইঙ্গিত স্বামীজী দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আধুনিক "ইউরোপ-আমেরিকা যবনদিগের (গ্রীকগণের) মুখোজ্জলকারী সন্তান", কিন্তু "আধুনিক ভারতবাসী আর্যকুলের গৌরব নহেন।" আমাদের কাজ তাই দুইটি—তামসিকতা হইতে টানিয়া তুলিয়া জাতিকে পাশ্চাত্যের রজোগুণে, কর্মোদ্যমে ভরাইয়া তোলা, জাগতিক উন্নতি করা, এবং সেই সঙ্গে আমাদের নিজস্ব সম্পদ ধর্মজীবনের যথার্থ বিকাশ-সাধন করিয়া জাতিকে দেবভাবে প্রতিষ্ঠিত করা এরূপ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মিলন ঘটাইতে যাইয়া ভুলক্রমে সর্ববিষয়ে কেবল পাশ্চাত্যকে অনুকরণের স্পৃহা আমাদের জাগিতে পারে (বর্তমানে যাহা হইতেছে), আমরা ধর্মজীবনের বিকাশের চেষ্টা না করিয়া পাশ্চাত্যের আপাতমধুর ইহকাল-সর্বস্বতার দিকে ছুটিতে পারি—এ আশঙ্কা স্বামীজীর মনে জাগিয়াছিল। তাই তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে আমাদের "পৈতৃক সম্পদ"কে—ভারতের

সনাতন আদর্শকে সর্বদা দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া রাখিতে হইবে।

উদ্বোধন সুদীর্ঘ সত্তর বৎসর ধরিয়া সাধ্যমত এই কাজ করিয়া আসিতেছে। নানাভাবে যাঁহারা এই কাজে আমাদের সহায়তা করিয়া আসিতেছেন, নববর্ষের যাত্রারম্ভে তাঁহাদের সকলকেই—লেখক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, পাঠক প্রভৃতি সকলকেই আমরা ধন্যবাদ জানাইতেছি, সহায়তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য "সহৃদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে সাদর আহ্বান জানাইতেছি।"

বর্তমান সমস্যা

বর্তমানে আমাদের জাতি বহু সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। ইহার কারণ, স্বাধীনতালাভের পর আমরা স্বামীজীকে, ভারতের সনাতন আদর্শকে আবার ভুলিতে বসিয়াছি। স্বামীজীর আদর্শকে গ্রহণ করা ছাড়া, জাতিকে তাহার শক্তির মূল উৎস ধর্মের ভিত্তিতে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া এ সমস্যা-সমাধানের অন্য কোন পথ আছে বলিয়া মনে হয় না।

স্বামীজীই ভারতীয় জাতিকে জাগাইয়াছেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। স্বামীজীর ঈপ্সিত পথ ধরিয়া, ভারতের সনাতন আদর্শ আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া এবং পাশ্চাত্যের "আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ" লইয়া ভারতের যে বীর সন্তানগণ দেশসেবায় নামিয়াছিলেন, আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভে তাঁহাদেরই অবদান সর্বাধিক, ইহাও ঐতিহাসিক সত্য।

স্বামীজীর বাণী এবং গীতাই ছিল অগ্নিযুগের পূজারীদের প্রেরণার উৎস। দেশাত্মবোধের অগ্নিকে তাঁহারাই উদ্দীপিত করিয়াছিলেন বিপুল শিখায়, যাহার দীপ্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল সমগ্র দেশে। এই দেশাত্মবোধকে যিনি জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন, সেই মহাত্মাজীর জীবনেও প্রাচ্যের ধর্মভাবের সহিত পাশ্চাত্যের কর্মোদ্যমের সমন্বয় হইয়াছিল। বলা যায়, "তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই"—স্বামীজীর এই বাণীরই মূর্ত প্রকাশ যেন তাঁহার জীবন। আমাদের জড়তা ও দ্বিধা চূর্ণ করিয়া যিনি দেশবাসীর অন্তরকে তেজোদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন সেই নেতাজীর জীবনও ছিল স্বামীজীর ঈপ্সিত ধর্মভিত্তিক ক্ষাত্রবীর্যের প্রতীক। আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভে সমধিক সহায়ক এই জীবনগুলি সবই ছিল সংযম, ত্যাগ ও ঈশ্বরবিশ্বাসের সহিত বীর্যবত্তা, নির্ভীকতা ও স্বদেশপ্রেমের মিলনভূমি, ধর্মই যার মূল উৎস। ধর্ম যে মানুষকে ঝিমাইয়া দেয়, ধর্ম যে মানুষকে জনগণের দুঃখমোচনে উদাসীন করিয়া বাস্তব হইতে কল্পনার রাজ্যে টানিয়া লইয়া যায়,—একথা যে কত অন্তঃসারশূন্য, তাহা আর সবকিছু ছাড়িয়া দিলেও আমাদের যুগের স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁহার আদর্শানুগামী এই কয়টি জীবনই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আজ স্বাধীনতালাভের এতদিন পরও আমরা জাতীয় আদর্শই নিশ্চিতভাবে ধরিতে এবং তাহার বাস্তব রূপায়ণের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে পারিলাম না। একদিকে তামসিকতায় এখনো আমরা আচ্ছন্ন, অপর দিকে পাশ্চাত্যের ভাবগ্রহণের দোহাই দিয়া পাশ্চাত্যের দৃষ্টি লইয়াই আমাদের সত্ত্বগুণ-ভিত্তিক জাতীয় আদর্শগুলির মূল্যায়ন করিয়া চলিয়াছি, জাতীয় জীবনে সেগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রয়াসী হওয়া তো দূরের কথা। আত্মবিশ্বাসহীন এই প্রয়াস যে কী পরিমাণ

লজ্জাকর, জাতি-গঠনে কী পরিমাণ বিপজ্জনক তাহা ভাবিয়াও দেখিতেছি না।

স্বামী বিবেকানন্দ বার বার আমাদের সজাগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, ভারতের জাতীয় জীবন ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, ধর্মই তাহার জীবনী-শক্তি, তাহার ধমনীতে প্রবাহিত রক্তস্বরূপ। ইহা দূষিত হইয়াছে, ইহার ধারা ক্ষীণ হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি জাতিকে বাঁচাইতে চাই, ইহাকে সংশোধিত করিয়া, ইহার ধারাকে বাড়াইয়া জাতির ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত করিতে হইবে; তাহা হইলেই বাকী আর সব কিছু ঠিক হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা না করিয়া, দূষিত হইয়াছে বলিয়া রক্তপ্রবাহ বন্ধ করিয়া অন্য যে-কোন প্রয়াসে যদি জাতিকে বাঁচাইতে যাই—ধর্মকে বাদ দিয়া যদি যে-কোন প্রকারের রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি প্রভৃতি গ্রহণ করি—তাহা হইলে জাতি হিসাবে ভারতের মৃত্যু অবধারিত।

আমরা এখন ঠিক এই বিপরীত কাজটিই করিতেছি। শিক্ষা হইতে ধর্ম নির্বাসিত; শুধু নির্বাসিত বলিলে ভুল হয়, ধর্ম-বিরোধী যে-সব ভাবধারা যথেচ্ছভাবে তাহাতে প্রবেশ করিতেছে, সেগুলিকে বাধা দেওয়ারও কোন প্রয়াস আমাদের নেই। এই অবস্থার ভিতর আমরা শিক্ষা-সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিতেছি, ছাত্রগণকে আদর্শ 'ভারতীয় নাগরিকে' পরিণত করিতে চাহিতেছি।

এতদিন স্বাধীনভাবে এ ধারায় কাজ করিবার পর লাভ কি হইয়াছে? রাজনীতিক্ষেত্রে অহিংসা প্রভৃতি বড় বড় কথা এখনো আমরা পটভূমিতে রাখিয়াছি, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কোন ছোট আদর্শকেও কার্যকরী করিবার শক্তি আমাদের নাই! এমনকি, জাতীয় আদর্শের ভাবগুলিকে যাহারা আঘাতের পর আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করিতেছে, তাহাদের রোধ করিবার শক্তিও নাই। অহিংসা প্রভৃতি যে খুব বড় কথা, সত্ত্বগুণোদ্ভূত, সে সম্বন্ধে আমরা কেন সকল চিন্তাশীল মানুষই একমত। কিন্তু বক্তব্য হইল, উহার যোগ্যতা অর্জন করিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি কি না, মহাত্মাজী প্রভৃতির মতো জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করিতেছি কিনা। দুর্বলের মুখে, অযোগ্যের মুখে বড় বড় কথা অপরের হাস্যোদ্রেকই করে, মানুষকে উন্নত না করিয়া তাহাকে অবনতই করে—উহা 'জন্মালস্যের উপর বৈরাগ্যের আবরণ' টানারই তুল্য। সামাজিক বিষয়ে আমরা নিয়মকানুন করিতেছি উদার দৃষ্টিভঙ্গী দেখাইয়া, সে দৃষ্টি কিন্তু সবসময় জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের উপর সমভাবে পড়িতেছে না; ভারতীয়তার গভীরে ডুবিয়া ত্যাগপূত দৃষ্টিতে ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে চিন্তা করা তো পরের কথা। ইহা সর্বনাশা পথ, মৃত্যুর পথ।

স্বাধীনতালাভের পূর্বে স্বামীজীর ভাব আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহার শুভ ফলও পাইয়াছি। জাতিগঠনের সময় তাঁহার ভাবগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আরো অধিক—'মানুষে'র প্রয়োজন স্বাধীনতা-অর্জনেই শেষ হয় না, খাঁটি মানুষের প্রয়োজন সবসময়েই। স্বামীজী সর্বাধিক জোর দিয়াছেন 'মানুষ' গড়ার কাজে; স্বামীজীর কথা, 'মানুষ'ই হইল দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। 'মানুষে'র প্রয়োজন সর্বকালে, সর্বদেশে। তাছাড়া ভারতের উন্নতির জন্য সর্ববিধ ক্ষেত্রেই স্বামীজী আলোকসম্পাত করিয়া গিয়াছেন; এখন সেদিকে আমাদের ফিরিয়া তাকানো প্রয়োজন। সর্বপ্রথম প্রয়োজন, জাতির মধ্যে যথার্থ ধর্মজীবনের বিকাশের প্রচেষ্টা। আমরা যেন না ভুলি, স্বামীজীর এ ধর্ম হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান কোন বিশেষ

ধর্ম নহে, আবার কোনটিকে বাদ দিয়াও নহে। স্বামীজীর মতে—যাহা মানুষের মধ্যে শ্রদ্ধা বা আত্মবিশ্বাস উদ্বুদ্ধ করে, তাহাই ধর্ম; যাহা মানুষকে অপরের জন্য আত্ম-বিসর্জন করিতে শেখায়, তাহাই ধর্ম; যাহা সকল মানুষকে এক বলিয়া ভাবিতে শেখায়, মানুষকে যথার্থ সাম্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, যাহা মানুষকে সর্বোচ্চ সম্মান দিতে পারে তাহাই ধর্ম। স্বামীজী যে ধর্মের কথা বলিয়াছেন, তাহা মানুষকে, সমাজকে, দেশকে, সমগ্র জগতের মানুষকেই 'পূজা' করিতে শেখায়, তাহার কল্যাণসাধনে ব্রতী করে। হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম, খৃষ্টধর্ম প্রভৃতি পথগুলি এই ধর্মলাভের উপায় মাত্র। আমরা যেন না ভাবি, যে-কোন পথেই হউক, ধর্মাচরণ বাদ দিয়া দেশে ব্যাপকভাবে মানুষকে মনুষ্যত্বসম্পন্ন করিতে বা দেবতার মতো করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিব। যে যাহার রুচিমত যে-কোন ধর্মপথ গ্রহণ করিয়া 'মানুষ' হইতে পারে, কিন্তু জীবনে ধর্মাচরণ চাই-ই। ধর্মের পোশাকমাত্র গায়ে জড়াইয়া বা ধর্মকে বাদ দিয়া বা ধর্মসম্বন্ধে উদারতার অছিলায় উদাসীন থাকিয়া এরূপ মানুষ—যাহা আমরা বিদ্যালয়ে, সমাজে, রাষ্ট্রে চাহিতেছি—তৈয়ারী করা সম্ভব নহে।

আর সেই সঙ্গে স্বামীজীর আরো একটি আদর্শকে অবিলম্বে কার্যকরী করার প্রয়াস প্রয়োজন: যাহাদের দুঃখে তিনি দিনের পর দিন কাঁদিয়াছেন, সেই দুর্গতদের উন্নতির জন্য এমন কিছু করা, যাহাতে তাহারা বুঝিতে পারে ভারতীয় আদর্শকে অবলম্বন করিয়াও তাহাদের দুঃখের অবসান হইতে পারে, তাহার জন্য মানবজাতির এই শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ত্যাগ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। আজ পর্যন্ত এবিষয়ে আমরা উদাসীন, যাহার বিষময় ফলে জড়বাদী আদর্শকেই উন্নতির একমাত্র সহায়ক ভাবিয়া তাহারা উহা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইতেছে; হয়ত একদিন আমাদের যা কিছু মহনীয়, যা কিছু বরণীয়, তাহা সবই ভাঙিয়া ফেলিয়া ভারতকে দেহসর্বস্ব পাশ্চাত্য জাতিগুলিরই অন্যতম করিতে চাহিবে।

শুধু ভারতে নয়, জগতের সর্বত্রই আজ মানুষ নিজেকে মানুষ বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে, মানুষের জয়গান আজ সর্বত্র। মানুষের মতো বাঁচিবার দাবীতে, মানুষের স্বাধীনতার দাবীতে, সাম্যের জয়গানে আজ জগতের আকাশ-বাতাস পূর্ণ। মানুষ যে আজ আত্মবিশ্বাস লইয়া জাগিতেছে, ছাত্র-আন্দোলন, শ্রমিক-আন্দোলন, বিভিন্ন নিপীড়িত জাতির নিপীড়নের কবল হইতে মুক্ত হইবার আন্দোলন এই জাগরণেরই সাক্ষ্য বহন করে। স্বামীজী এই আত্মবিশ্বাস চাহিয়াছিলেন নিঃসন্দেহ, কিন্তু এই সব জাগরণ দেহসীমিত মানুষকে লইয়া; মাত্র ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তিনি চাহিয়াছিলেন আসল মানুষের, মানুষের দেহাতীত সত্তারও জাগরণ, যাহার জন্য সর্বাগ্রে দেশকে উপনিষদের ভাবে ভাসাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন। একমাত্র এই জাগরণই মানুষকে যথার্থ সাম্য, যথার্থ স্বাধীনতা দিতে পারে, মানুষকে সারাজীবন ধরিয়া থাকিবার মতো একটা অবলম্বন দিতে পারে, মানুষের অন্তরের ক্ষুধা মিটাইতে পারে। ইহার অভাব বলিয়াই আজ মানুষের কল্যাণের নাম লইয়া অকল্যাণই আসিতেছে, জাগরণ উন্নতির পথকে প্রশস্ততর না করিয়া বিভ্রান্তি ও সমস্যারই সৃষ্টি করিতেছে।

ধর্মকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া অগ্রসর না হইলে মানুষ তাহার আসল স্বরূপ, আসল

উন্নতিকে কোনদিনই চিনিতে পারিবে না, তাহার ব্যক্তিগত বা জাতিগত স্বার্থপরতা কোনদিনই কমিবে না, এবং এই স্বার্থপরতাই আত্মঘাতী সংঘর্ষের জন্ম দিবে; যেমন আজ বহির্বিশ্বে নানাস্থানে ঘটিতেছে।

স্বামীজী তাই সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্যই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের, আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতির, ব্রহ্মতেজ ও ক্ষাত্রবীর্যের সমন্বয় চাহিয়াছিলেন; বিশেষ করিয়া ভারতের জন্য, কারণ ভারত ছাড়া এ সমন্বয়ের আদর্শ অপর কোন জাতিই দেখাইতে পারিবে না। স্বামীজীর কথামত অবিলম্বে জাতীয় জীবনে ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য এবং মানুষকে তাহার আসল স্বরূপে দেখিয়া সেরূপে তাহাকে সেবা করিবার, বিশেষ করিয়া তাঁহার "পাপী নারায়ণকে, তাপী নারায়ণকে, সর্বজাতির সর্বজীবের দরিদ্রনারায়ণকে" "সর্বাধিক উপাস্য দেবতা" করিবার জন্য অবিলম্বে আমাদের সর্বাধিক শক্তি নিয়োগ করা প্রয়োজন।

আমাদের বর্তমান সমস্যাগুলির মূলে যাহা রহিয়াছে, এ-পথেই তাহার অপসারণ সম্ভব।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র*

মঠ
পোঃ বরাহনগর, কলিকাতা
১৭. ৯. ৯৭

কুমারী মার্গারেট ই. নোব্‌ল সমীপেষু,
রাস্কিন স্কুল, ব্রান্টউড্‌ উর্পল
উইম্বলডন, লণ্ডন, দক্ষিণ-পশ্চিম

প্রিয় মহাশয়া,

আমার পূর্ব পত্রের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জুলাই, ১৮৯৭-এ আমাদের ভারতবর্ষের কার্যবিবরণী প্রেরণ করিতেছি।

প্রথম পত্রে 'মঠ' নামে অভিহিত কেন্দ্রীয় শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানের সংক্ষেপিত বর্ণনা দিয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম। এই চিঠিতে মনে হয়, মঠের গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন; পূর্ব পত্রে এ বিষয়ে কোন আলোচনাই করা হয় নাই। আমাদের পরমপ্রিয় গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহাবসানের স্বল্পকাল পরে, যে-কয়টি তরুণ যুবক তাঁহার পবিত্র সত্তার প্রতি গভীর ভালোবাসায় তাঁহার চারিপাশে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা আচার্যদেবের আদেশ ও উপদেশাবলী জীবনে রূপায়িত করিবার জন্য এক সন্ন্যাসিসঙ্ঘে পরিণত হন। মানবকে অধ্যাত্মজগতে পৌছিতে হইলে ত্যাগের মধ্য দিয়া যাইতেই হইবে। আচার্যদেবের পদাঙ্ক-অনুসরণের জন্য ইঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। প্রথমে ইঁহাদের সংখ্যা ছিল এগারো। বর্তমানে এই সংখ্যা তেইশে উঠিয়াছে। এ ছাড়া আরো ছয়জন যুবক রহিয়াছেন, যাঁহারা আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ না করিলেও কায়িক, মানসিক, নৈতিক ও অধ্যাত্ম অনুশাসন অবলম্বনে জীবনযাপন করিতেছেন। ধ্যান, ভজন, মননচর্চা, নৈতিক

* মূল ইংরেজী হইতে অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ কর্তৃক অনূদিত।

জীবনযাপন এবং সর্ববিষয়ে কঠোর সংযম—এইভাবে মঠের জীবনধারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। মঠের সভ্যগণের ব্যক্তিগত স্বাধ্যায়চর্চা বিশেষভাবে হইতেছে; বেদান্ত ও অপরাপর দর্শনের শাখাসমূহ, সেইসঙ্গে গীতা, ভাগবত—যাহাতে ভক্তিযোগ বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত—এই ধরনের গ্রন্থই বেশীর ভাগ সময়ে পঠিত হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সভ্যগণ সকলে আমাদেরই মধ্যে কোনো সন্ন্যাসীমহারাজের ভাষণ শুনিতে সমবেত হন (আমার পূর্ব পত্রে এই সভা শিক্ষণশ্রেণীরূপে অভিহিত)। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ বা কর্ম বিষয়ে শাস্ত্রীয় সূত্রসকল ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। সাপ্তাহিক বক্তৃতার ক্লাশগুলি বিশেষ উপভোগ্য হয়। জুলাই মাসে আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল—(ক) সন্ন্যাসীদের মঠ—স্বামী ত্রিগুণাতীত, (খ) বৈরাগ্য—স্বামী বিমলানন্দ, (গ) যথার্থ ধর্ম—স্বামী সুবোধানন্দ, (ঘ) ব্রহ্মচর্য—স্বামী প্রকাশানন্দ।

(২) আপনাকে লেখা আমার পূর্ব পত্রে স্বামী বিবেকানন্দের ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরে সঙ্ঘের মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। বর্তমান পত্রে সঙ্ঘের কার্যক্ষেত্রের পরিধি, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

আমাদের বিশ্বাস, জগতের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্বস্থাপনই আমাদের পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। এই পরম আদর্শের রূপদানই আমাদের সঙ্ঘের প্রধান লক্ষ্য। বিশেষ কোনো মতবাদ লইয়া সংগ্রাম করিতে, অগণিত ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে আর একটি সম্প্রদায় বৃদ্ধি করিতে, হিন্দুধর্ম অথবা অন্য কোনো ধর্মের স্বীকৃতির জন্য প্রচেষ্টা করিতে আমরা বিশ্বরঙ্গভূমিতে প্রবেশ করি নাই, কারণ আমাদের দৃষ্টিতে "জগতের সব ধর্মই এক অনন্ত সর্বজনীন ধর্মের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। এই বিভিন্ন ধর্মমতগুলির মধ্যে শান্তিস্থাপনই আমাদের মূলমন্ত্র।" রামকৃষ্ণ মিশনের বিশ্বাস, এই মহতী বাণী ঘোষণাই তাহার বিশেষ অধিকার। কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। অবশ্য আমরা যে-সত্যের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ, সেই সত্য আমরা সর্বদাই অবলম্বন করিয়া থাকিব। আজ আমাদের প্রতি লোকে অবিচার করিয়া আমাদের উদ্দেশ্যের ভুল ব্যাখ্যা করে, সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে, কিছু লোক নিন্দা করে, আর বেশীর ভাগ লোকই সহানুভূতিহীন। আমাদের কর্মপ্রচেষ্টায় সাড়া অতি সামান্যই মেলে, যদি অবশ্য সেই প্রচেষ্টা অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচিত না হয়। কিন্তু এ সকলের জন্য আমাদের কোনো অভিযোগ নাই। আমরা যে-কোনো বর্ণ বা সম্প্রদায়েরই হই না কেন, দৈহিক বা মানসিক, জাতিগত বা ধর্মগত যে-কোনো পার্থক্যই আমাদের মধ্যে থাকুক না কেন, সেই এক ব্রহ্মই সকলের অন্তরে প্রকাশিত; কাজেই ধর্ম লইয়া বিবাদ এখন বন্ধ হওয়া প্রয়োজন, সামাজিক ও ধর্মীয় পার্থক্য সত্ত্বেও সকলের অন্তর্নিহিত ঐক্যেরই প্রাধান্য লাভ করা উচিত—এই আদর্শপ্রচারের উপযুক্ত মুহূর্ত বর্তমানকালের মতো আর কখনো আসে নাই।

রামকৃষ্ণ মিশনের কলিকাতা কেন্দ্রের সাপ্তাহিক সভাগুলি আমাদের প্রিয়তম প্রভু কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও স্বীয় জীবনে আচরিত আদর্শগুলিরই অনুধ্যান ও জীবনরূপায়ণের বিশেষ উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। এইজন্য সেইসব সভায়, যাঁহারা ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ছিলেন এবং বস্তুতঃ যাঁহাদের জীবনে তাঁহার উপদেশাবলী রূপায়িত হইয়াছে, তাঁহারাই ঠাকুর সম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যক্তিগত

স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার কথা বলিয়া থাকেন। এইসব সভার সভ্যবৃন্দ যাহাতে ধর্মের মূল আদর্শগুলির সহিত পরিচিত হইতে পারেন, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া মাঝে মাঝে বক্তৃতার বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়। বিশ্বাস, ভক্তি ও উপাসনার উদাহরণরূপে হিন্দুধর্মের সাধু-সন্ত, আচার্য ও অবতারগণের জীবনী বিশেষভাবে আলোচ্য বিষয়রূপে গৃহীত হয়। জুলাই মাসে বাবু জি. সি. ঘোষ এবং বাবু এম্. এন্. গুপ্ত মহোদয়দের শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতিপ্রসঙ্গ যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল এবং হিন্দুধর্মগ্রহণকারী মুসলমান মহাপুরুষ হরিদাসের সম্বন্ধে বাবু এস্. এন্. বোসের লেখাটি অতি মূল্যবান ও চমৎকার হইয়াছিল।

(৩) স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য শ্রী জে. জে. গুড্উইন মাদ্রাজ কেন্দ্রের পক্ষে মূল্যবান সম্পদরূপে বিবেচিত হইয়াছেন এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর পক্ষে বিশেষ সহায়করূপে পরিগণিত হইয়াছেন। মঠের সাধারণ কাজকর্ম ছাড়া মাদ্রাজের ইয়ং মেন্স্ হিন্দু এসোসিয়েশনে নিম্নলিখিত বক্তৃতাসমূহ প্রদত্ত হইয়াছে—(ক) ভক্তিযোগ—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, (খ) শ্রীচৈতন্যের জীবন ও উপদেশাবলী—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, (গ) কর্ম—জে. জে. গুড্উইন।

(৪) স্বামী শিবানন্দের নিকট হইতে আমরা পত্র পাইয়াছি। কলম্বোয় তিনি ভালভাবে কাজের সূচনা করিয়াছেন। কয়েকজন য়ুরোপীয় মহিলা ও ভদ্রমহোদয়কে লইয়া তিনি বক্তৃতার ক্লাশ খুলিয়াছেন এবং রাজযোগ লইয়া আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। সপ্তাহে তিন দিন করিয়া তিনি ক্লাশ করিতেছেন। একটি গীতা ক্লাশও খোলা হইয়াছে। কলম্বোর শিক্ষিত স্বদেশবাসীদের প্রায় বারো জন এই ক্লাশে যোগদান করেন। আশা করি, খুব শীঘ্রই আমরা কাজের বিস্তৃত বিবরণ পাইব।

(৫) মুর্শিদাবাদ জেলায় দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণের মধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দজীর সময়োচিত সেবাকার্য সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছে এবং সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ লেভিঞ্জ, যিনি জনসাধারণের মধ্যে বস্ত্রবিতরণের সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন, তিনি উক্ত স্বামীজীর সেবাকার্য সম্বন্ধে প্রশংসা করিয়াছেন। ঐ একই জেলার কান্দি মহকুমায়, যেখানে ত্রাণকার্যের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, স্বামী অখণ্ডানন্দ আরও একটি সেবাকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু দিনাজপুর জেলার মতো বাংলার আর অন্য কোনো স্থানে এত চরম ও ব্যাপক দুঃখদুর্দশা দেখা দেয় নাই। সরকারী ও বেসরকারী সব সমাচারেই দেশের এই অঞ্চলটিতে আশু সেবাকেন্দ্র-স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখিত। তাই স্বামী অখণ্ডানন্দের সহায়ক স্বামী ত্রিগুণাতীত দিনাজপুরে রওনা হইয়া যান এবং স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীবোনহেম কার্টারের সঙ্গে পরামর্শক্রমে বিরাল স্টেশনে সেবাকার্যের সূচনা করিয়াছেন। আমাদের আবেদনে বহু সহৃদয় ব্যক্তি সাড়া দিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকটই আমরা কৃতজ্ঞ, বিশেষভাবে মাদ্রাজের সেই ভদ্রলোকটির নিকট, যিনি সাধারণ আয়ের মানুষ হইলেও এই সেবামূলক কার্যের জন্য ১৫০০৲ দান করার মতো মহৎ হৃদয়ের অধিকারী।

জুলাই মাসের এই বিবরণী প্রেরণে বিলম্বের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

আপনার অতি বিশ্বস্ত

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

ভারতের নবজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দ*

অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার

...আজ এখানে যে বিষয়টি আমাকে আলোচনা করতে বলা হয়েছে সেটি সম্বন্ধে প্রথমেই একটি কথা পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো। আমরা প্রায়ই 'ইণ্ডিয়ান রেনেসাঁ' কথাটা ব্যবহার করি, কিন্তু ইউরোপের ইতিহাস যখন আলোচনা করি, তখন দেখতে পাই, সেখানে রেনেসাঁ কথাটি যে-অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, তার যে ঐতিহাসিক তাৎপর্য, সেটি ভারতবর্ষের পটভূমিকায় অনুপস্থিত। সেজন্য আমার অনেক সময় মনে হয়েছে যে রেনেসাঁ কথা থেকে ঐ 'রে' (Re) কথাটাকে বাদ দিলে বোধ হয় ভালো হয়—যদি শুধু 'নেসাঁ' কথাটা থাকে—জাগরণ কথাটা থাকে, তাহলে হয়ত ইতিহাসের প্রতি মর্যাদা রক্ষা করা হয়।

এই যে জাগরণ, স্বামীজী যা এনেছিলেন, তা হঠাৎ হয়নি। স্বামীজী বলেছিলেন, "কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হইতেছে।"—সত্যি কথা। কিন্তু কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ একদিনে হয়নি—তার পেছনে সুগভীর প্রস্তুতি ছিল। যেমন কবি বলেছেন,—'রাত্রির তপস্যা, সে কি আনিবে না দিন?' রাত্রির সুগভীর তপস্যা ছিল। সেইজন্য আমরা প্রভাতসূর্যকে আহ্বান করতে পেরেছিলাম। এই যে জাগরণ তার মূল লক্ষণগুলি বিচার করলে দেখা যাবে যে, তার ভেতরে মোটামুটিভাবে তিনটি লক্ষণ রয়েছে। এই জাগরণে এক হিসেবে মানুষের জয়গান গাওয়া হয়েছে, মানুষকে সবচাইতে বড় আসন দেওয়া হয়েছে, মানুষের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য যত রকম কষ্ট স্বীকার করা প্রয়োজন তাই করা হয়েছে। মানুষ বলছে বারবার এসে—আমি এসেছি, আমি জেগেছি, আমাকে দেখ। অয়মহং ভোঃ—এই যে আমি এসেছি। আমার চাইতে বড় কেউ নেই—এই কথাটি মানুষ বারবার বলতে চেয়েছে। স্বামীজী মানুষের জয়গান যে কত বড় করে গেয়েছেন তা তাঁর অনেক উক্তির ভেতরে একটি উক্তির মধ্যে স্পষ্ট হবে, যেখানে বলছেন—"Christs and Buddhas are but waves on the ocean which I am"—আমি একটি বিরাট সমুদ্র, একজন যীশুখ্রীষ্ট বা একজন বুদ্ধ সেই বিরাট সমুদ্রের একটি ঢেউমাত্র। এই যে 'আমি'র জয়গান গাইলেন স্বামী বিবেকানন্দ, সেই 'আমি' কোন্ 'আমি'?—ঠাকুর যাকে বলতেন 'পাকা আমি'—এ 'আমি'র সঙ্গে ব্রহ্মের, সচ্চিদানন্দের কোন ভেদ নেই—সেই 'আমি'। একদিকে 'আমি'র জয়গান গাওয়া হয়েছে আর একদিকে বলা হয়েছে যে, আমি সত্যকে তখনই স্বীকার করব যখন আমার যুক্তির কষ্টিপাথরে ঘষে দেখব তার মধ্যে কিছু খাদ

* বেলঘরিয়ায় রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমে প্রদত্ত (২৩.৪.৬৮) 'স্বামী নির্বেদানন্দ স্মৃতি বক্তৃতা'র অনুলিখন। বক্তৃতার প্রারম্ভে স্বামী নির্বেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বক্তা বলেন, "আমার মনে পড়ছে, প্রায় বারো বৎসর আগে প্রেসিডেন্সী কলেজের শতাব্দী জয়ন্তী উৎসব যখন পালন করা হয় তখন আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছিলেন, 'আমি বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঘুরেছি, কিন্তু আমার অনেক সময় মনে হয়েছে, এই বেলঘরিয়াতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের যে বিদ্যার্থী আশ্রম, এটি একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।' আচার্য যদুনাথ সেদিন বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষে এরকম আদর্শ প্রতিষ্ঠান যত বেশী প্রতিষ্ঠিত হবে ততই আমাদের শিক্ষা কল্যাণপ্রদ হবে।'"

নেই, তার মধ্যে কিছু মালিন্য নেই। যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হব, দেখতে পাব যে, সত্য আমার বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে– যখন জানতে পারব যে, সত্যকে আমি শুধু জানছি না, আমি প্রকৃতপক্ষে সত্য হচ্ছি— ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি—তখনই আমি সত্যের মহিমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হব। রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে, আমি সত্যকে জানছি না, সত্য হচ্ছি। গান্ধীজী তাঁর আত্মজীবনীতে বলছেন—"Denial of God we have seen, but denial of Truth we have never known." সেই সত্যকে যুক্তির কষ্টিপাথরে ঘষে দেখা হচ্ছে। অর্থাৎ ঐতিহ্যকে মানা হচ্ছে না—অন্ধ ইতিহাসকে অনুসরণ করে মতুয়ার (dogmatic) বুদ্ধি দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে সত্যের পরিবর্তে অন্ধকারের কাছে আমরা কখনও আত্মসমর্পণ করছি না। এই হল আমাদের রেনেসাঁ বা জাগরণের দ্বিতীয় লক্ষণ। এখানে বুদ্ধির দীপ্তি বা বুদ্ধির পরাকাষ্ঠার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সত্যকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তৃতীয় লক্ষণ যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হল—আমাদের জীবনের মধ্যে যে নানা খণ্ডখণ্ড প্রকোষ্ঠ রয়েছে তারই মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করা। জ্ঞান এবং কর্মের সঙ্গে হোক, মুক্তি এবং বন্ধনের সঙ্গে হোক, কাল এবং কালাতীতের সঙ্গে হোক—Time & Eternity—এই সমন্বয়ের সূত্র আমরা দেখতে পাই নবজাগরণের মধ্যে। আমরা জগৎ থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি না—আবার এই দৃশ্যমান জগৎই একমাত্র সত্য, এছাড়া কিছু নেই —এমন অসত্য কথাও বলছি না—আমরা দুয়ের ভেতরে সমন্বয় সাধন করছি—এইটি হল জাগরণের তৃতীয় লক্ষণ।

ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে এই জাগরণের প্রথম পুরোহিত ছিলেন রামমোহন। তিনি সর্বপ্রথম আমাদের অন্ধকুসংস্কারকে দূর করার জন্যে, মানুষকে তার আত্মমর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আহ্বান জানালেন। তিনিই সর্বপ্রথম বললেন—আমি বেদান্তকে যুক্তির পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিচার করে দেখব। তিনি মানুষের স্বাধীনতার জয়গান গাইলেন—মানুষের মর্যাদার কথা নতুন করে বললেন। সে ইতিহাসের বিস্তারিত আলোচনা করব না। আপনারা জানেন যে, সে সময়ে ভারতবর্ষে নানারকমে ভারতবাসীদের নির্যাতিত করা হোত। উনিশ শতকের প্রথম পাদের কথা বলছি। আদালতে যদি কোন ইংরেজ অপরাধী আসামী হিসাবে অভিযুক্ত হোত, তবে তার বিচারের জন্য ভারতীয় জুরি নিযুক্ত করা হোত না। রামমোহন বহু তথ্যের সাহায্যে দেখালেন যে, East India Companyকে নানাভাবে সুযোগ-সুবিধা এবং একচেটিয়া ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়াতে ভারতবাসী নানাপ্রকারে বঞ্চিত হয়েছে। ইংরেজী শিক্ষার প্রতি রামমোহনের অত্যন্ত আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীর আকৃতি যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে অবহিত হলেন। রামমোহন প্রথম বললেন যে, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে স্বাধীন জনমত প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা কোন বাধা, কোন নিষেধ মানবো না। এজন্য তিনি প্রাণপণ সংগ্রাম করলেন। বোধ হয় একথা বললে অত্যুক্তি হবেনা যে, রামমোহনই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে, বিধিবদ্ধভাবে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার আন্দোলনে নেমেছিলেন। তাঁর আগে বোধ হয় কেউ নামেননি।

সেই রামমোহন চিন্তার স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা এবং যুক্তির পরাকাষ্ঠা

দেখিয়ে মানুষের গলায় জয়মাল্য দিলেন। কিন্তু রামমোহনের প্রচেষ্টা সার্থক হল না কেন? —এই প্রশ্ন যদি করেন তাহলে দেখা যাবে তাঁর ভেতর অনেক জিনিস ছিল, অনেক সম্ভাবনা ছিল যা একটি পরিপূর্ণ পুষ্পস্তবকে পরিণত হ'তে পারত—কিন্তু হল না দুটো কারণে। একদিকে তিনি সুদূর-প্রসারী দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন না যে, ভারতবাসীর পক্ষে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা যতক্ষণ লাভ না হচ্ছে ততক্ষণ তার চিন্তার স্বাধীনতা আসছে না। বস্তুতঃ রামমোহন ইংরেজ শাসন থেকে ভারতকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করতে তখনও চাননি। ঐতিহাসিক কারণ তার অবশ্যই ছিল। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, এটা বিধাতার আশীর্বাদ যে, ইংরেজ আমাদের দেশ এখন শাসন করছে। ইংরেজী শিক্ষার যে প্রবর্তন করা হয়েছে তাতে আমাদের জাতীয় সংহতি বাড়বে, আমরা পরস্পরকে চিনতে এবং বুঝতে পারব—একথা সত্য, কিন্তু আর একটা দিক তিনি দেখলেন না যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সঙ্গে সঙ্গে না পেলেও তার প্রতি যে ভারতবাসীর একটা স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা বা আকূতি ছিল সেটি সমগ্র মানুষের চিত্তের মধ্যে উদ্বুদ্ধ করে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। যে-কথা স্বামীজী বলেছিলেন, গোলামের ইহলোকেও নরক, পরলোকেও নরক, যে-কথা নিবেদিতা বলেছিলেন স্বামীজী সম্বন্ধে যে, the queen of his adoration was his motherland.

এ জাতীয় পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় মুক্তির স্বপ্ন রামমোহন দেখেননি।

দ্বিতীয়তঃ রামমোহন যুক্তির বিচারে এত নৈপুণ্য ও বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন যে, তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী শুধু উপরতলার যে শিক্ষিত মানুষ—অভিজাত সম্প্রদায়ের যে মানুষ—তাঁদের কাছেই আদরণীয় হয়েছিল। যে মানুষ সর্বহারা এবং নিঃস্ব, যে মানুষ পদদলিত এবং উৎপীড়িত, যে মানুষ বঞ্চিত, সে মানুষের—নিরক্ষর জনসাধারণের কাছে রামমোহনের বাণী পৌঁছায়নি। যে কথা পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "আমাদের প্রথম কাজ হবে to raise the masses"—একথা রামমোহনের চিন্তাধারার মধ্যে আসন পায়নি।

ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হল ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। স্বামীজীর তিরোধান ঘটেছে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে। এর মধ্যে জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলী যদি পড়ে দেখেন, দেখবেন কখনও একথা বলা হয়নি (স্বামীজীর আগে, বোধ হয় ১৯২১-এর আগে কেউ বলেননি) যে, ভারতের উজ্জীবন নির্ভর করছে সাধারণ মানুষের উন্নতির উপর। "To raise the masses, restore their lost individuality without destroying their religion."—স্বামী বিবেকানন্দের কথা। যে মানুষ পদদলিত বঞ্চিত, যে মানুষ রিক্ত সর্বহারা, যে মানুষকে শোষণ করে আজকে আমাদের বিরাট অট্টালিকা তৈরী হয়েছে—যাদের সেবার ফলে আমরা বড় বড় আসনে বসেছি—সেই মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি আমরা—তাকে আগে তুলতে হবে—একথা স্বামীজী প্রথম বললেন, "To raise the masses, restore their lost individuality without destroying their religion"—তাদের ধর্মে আঘাত করো না, কিন্তু যে ব্যক্তিত্বকে সে হারিয়েছে, সে ব্যক্তিত্বকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কর। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, রামমোহন স্বাধীনতার নবজাগরণে মানুষের জয়গানের প্রথম পুরোহিত, প্রথম হোতা।

তাঁর জীবনীকার এক জায়গায় বলেছেন, রামমোহন এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পরে যে স্মৃতিফলক তৈরী হবে তাতে একটি কথা যেন লেখা থাকে যেটি একটি ফার্সী কবির উক্তি, যেটাকে বাংলা করলে দাঁড়াবে 'ঈশ্বরকে ভালবাসা মানেই মানুষের কল্যাণ করা'। স্বামীজী পরবর্তী কালে কম্বুকণ্ঠে যা ঘোষণা করেছিলেন, 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' রামমোহন যে জাগরণের সূচনা করলেন, মানুষের জয়গান গাইলেন, সেটার পেছনে যুক্তির মধ্য দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা ছিল। তিনি এক সমন্বয় সাধন করলেন জ্ঞানের এবং কর্মের, ঐহিক এবং পারত্রিক জীবনের। এই ধারা হঠাৎ বিলুপ্ত হয়ে গেল, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যখন আমরা হেনরী ডিরোজিওকে দেখলাম। হিন্দু কলেজের শিক্ষক হেনরী ডিরোজিও। তিনি Young Bengal সৃষ্টি করলেন; যুবসম্প্রদায়ের মনের মধ্যে এমন একটি আকাঙ্ক্ষা, আকৃতি জাগিয়ে তুললেন, যার ফলে সেকালের যুবসম্প্রদায় ভারতের আধ্যাত্মিক সত্য বিস্মৃত হতে লাগল। ইতিহাসের পাতা খুললে দেখি যে, এই যুব-সম্পদায় মা কালীকে সম্বোধন করেছেন 'Good morning, Madam' বলে। কথা আছে, তাঁরা ব্রাহ্মণদের আঘাত দেওয়ার জন্য ইচ্ছা করে গোমাংস তাঁদের ঘরে নিক্ষেপ করতেন। এই ডিরোজিও স্বাধীন চিন্তার পথ প্রশস্ত করলেন সত্যি কথা, যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে একটি স্বাধীন স্পৃহা জাগালেন, সবই সত্যি কথা; কিন্তু হল কি? সেই সময়ের যুব-সম্প্রদায়, যাঁদের মধ্যে খুব নাম করা সব লোক ছিলেন, দক্ষিণারঞ্জন ছিলেন, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার ছিলেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন, রামগোপাল ঘোষ ছিলেন, সেকালের উনিশ শতকের একেবারে চাঁদের হাটে যাঁরা বসেছিলেন, সেই বিদ্বন্মণ্ডলী, পণ্ডিতের সমাজ, তাঁরা কি করলেন? তাঁরা ডিরোজিওর শিক্ষার গুণে আকৃষ্ট হলেন। সত্যি কথা, কিন্তু ডিরোজিও সেই নব্য বঙ্গকে, নবীন যুব-সম্প্রদায়কে এমন কিছু দিতে পারলেন না যেখানে তাঁরা নোঙর ফেলতে পারেন—এমন কিছু দিতে পারলেন না যা তাঁদের জীবনে প্রশান্তি আনতে পারে, এমন কিছু দিতে পারলেন না যা সমস্ত জীবনকে পরিব্যাপ্ত করে একটি শান্ত সমাহিত জীবনের মধ্যে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ফলে এই হল, Young Bengal (নব্য বাংলা) ডিরোজিওর কাছে ভাসা-ভাসা কথা শুনে অত্যন্ত বিচলিত হলেন, অত্যন্ত বিমুগ্ধ হলেন, অথচ বিপথে চলে গেলেন। যখন হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ বিচারকের আসনে বসলেন ডিরোজিওর বিচার করতে, তখন নিজেকে সমর্থন করতে গিয়ে, আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে ডিরোজিও বারবার বলেছিলেন, "এই যুবসম্প্রদায়ের কাছে আমি কখনো বলিনি যে আমি নাস্তিক, আমি কখনো বলিনি ঈশ্বর নেই। আমি শুধু হিন্দুধর্মকে যুক্তির আসনে, যুক্তিবিচারের আসনে দাঁড় করিয়ে দেখাতে চেয়েছি যুক্তির বিচারে হিন্দুধর্ম টেঁকে কিনা। এর বেশী কিছু বলিনি। আমি যদি David Hume, John Stuart Mill, Herbert Spencer, August Comte প্রভৃতি দার্শনিকদের মত প্রচার করে থাকি, আমি সঙ্গে সঙ্গে Bishop Barkeley-এর কথা বলেছি, আমি Hegel-এর কথা বলেছি, আমি আস্তিক্যবাদের কথাও বলেছি, আমি পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ সমানভাবে তাদের কাছে

পরিবেশন করেছি এবং বলেছি তোমাদের যুক্তিবিচারে যা গ্রহণীয় তাই গ্রহণ কর।" কিন্তু ফল হল কি? নেতিবাচক যদি কোন প্রচেষ্টা হয় তবে মানুষ তাতে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। আপনি বাড়ী ভেঙ্গে ফেলতে পারেন, কিন্তু যদি সেই ভিত্তির উপর নতুন বাড়ী তোলেন; তবেই মানুষ একটি আবাসস্থান পাবে। কিন্তু বাড়ী ভাঙ্গবার জন্য ভাঙ্গা—মানুষ কখনো এ চায় না। গড়বার জন্য ভাঙ্গা সে বুঝতে পারে, ভাঙ্গার জন্য ভাঙ্গা সে বোঝে না। ডিরোজিও মানুষের বিশ্বাস ভেঙ্গে দিলেন শুধু, গড়লেন না কিছু। সেইজন্য পরবর্তী কালে এলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা হল। তিনি নতুন করে আস্তিক্যবুদ্ধিকে ফিরিয়ে আনলেন। মানুষের মধ্যে ভাবগত সত্তাকে বিচ্ছুরিত করে দিলেন। তার মহিমা যে সত্যকারের ঈশ্বর-মহিমা, নতুন করে তাই শেখালেন। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে যুক্তির উপর নির্ভর করে-ছিলেন তার প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করা। প্রতিপক্ষ ছিলেন Dr. Alexander Duff, তাঁর কার্যকলাপে খৃষ্টান মিশনারীরা উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। যখন ডিরোজিওর কাছে দলে দলে যুবকরা আসতে লাগলেন, তাঁরা নাস্তিক হয়ে পড়লেন, Alexander Duff এবং অন্যান্য মিশনারীরা উল্লসিত হয়েছিলেন এই কথা ভেবে যে, এইবার ভারতবর্ষে আমরা এমন একটা ভিত্তি পেয়েছি, এমন একটা মাটি পেয়েছি যেটা খৃষ্টধর্মের প্রচারের পক্ষে সুবিধাজনক হবে; কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতায় পাতায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিজে তাঁর সঙ্গীদের মারফত নতুন করে আবার ভারতীয় ঐতিহ্য, সাধনা ও সংহতিকে সমর্থন করে প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। Alexander Duff হিন্দুধর্মের প্রতি কটূক্তি করতে লাগলেন। হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে প্রত্যুত্তর দিলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। এই মসীযুদ্ধ অনেকদিন চলতে লাগল। Alexander Duff ও তাঁর সঙ্গীরা বললেন খৃষ্টধর্মই একমাত্র ধর্ম, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বললেন—না, হিন্দুধর্ম খৃষ্ট-ধর্মের চাইতে অনেক বড়, অনেক উদার, অনেক ব্যাপক। এই সংঘাত চলতে লাগল। এই সংগ্রাম চলতে চলতে একদিন তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার খ্যাতি ও প্রয়োজন ধীরে ধীরে তিরোহিত হল। তারপর এলেন দক্ষিণেশ্বরের সেই পূজারী ব্রাহ্মণ, যাঁর হাতে সংগ্রামের হাতিয়ার ছিল না, যাঁর হাতে debating society ছিল না, যাঁর হাতে প্রেস ছিল না খবরের কাগজে ছাপাবার, যিনি যুক্তিতর্ক বুঝতেন না, যাঁর হাতে পত্রিকা ছিল না—কিছুই ছিল না; একটি মাত্র হাতিয়ার নিয়ে সেই পূজারী ব্রাহ্মণ এলেন—সেই হাতিহার বা অস্ত্রের নাম হল ভালবাসা বা প্রেম। তিনি প্রেমের বন্ধনে সকলকে বাঁধলেন। বললেন না যে খৃষ্টধর্ম হিন্দুধর্মের চাইতে ছোট, বললেন না যে হিন্দুধর্ম খৃষ্টধর্মের চাইতে বড়—বললেন সকল ধর্মই সমান। শুধু সমান নয়, সকল পথ দিয়ে একই লক্ষ্যে, একই সত্যে পৌছানো যেতে পারে। এত বড় আবিষ্কার মুগ্ধবিস্ময়ে উনিশ শতকের মানুষ শুনলো। শুনলো এমন একজন লোকের কাছ থেকে যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাননি, যিনি গবেষণা করেননি, যাঁর হাতে কোন হাতিয়ার ছিল না, যাঁর হাতে পত্রিকা ছিল না, দল ছিল না, কিছুই ছিল না। বলেছিলেন একবার পরিহাস করে, "দলটল,

ও-সব কেশব বোঝে, আমার দলটল নেই।" বলেছিলেন একজন ভক্তকে, "যদি অনেক কথায় জানতে চাও ঈশ্বর কি, তাহলে কেশবের কাছে যাও, আর যদি এককথায় বুঝতে চাও ঈশ্বর কি, তা হলে আমার কাছে এস।" সেই এককথাটি কি? একটি একাক্ষর মন্ত্র দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণদেব। সেই মন্ত্রটি আর কিছুই নয়—'মা'। এই একাক্ষর 'মা'-মন্ত্রের মধ্য দিয়ে সকল সত্য উদ্ঘাটিত হল। সেখান থেকে প্রেরণা পেলেন বিবেকানন্দ। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা আবার লক্ষ্য করুন। বঙ্কিমচন্দ্রকে বাদ দিলে চলবে না। জনজাগরণের এত বড় একজন পুরোহিত, ধর্ম সম্বন্ধে বারবার বললেন, ধর্ম ডগমা (dogma) নয়, ধর্ম মানুষের বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য সাধন করে। মানুষের জয়গান বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে গাইলেন তা অনুধাবনযোগ্য। পুরাণকে তিনি অস্বীকার করলেন, বললেন—শ্রীকৃষ্ণ একজন আদর্শ মানুষ, তিনি পৌরাণিক দেবতা নন। বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—ধর্ম অনুশীলনের জিনিস—ধর্ম হল যা তোমাকে ধারণ করে রেখেছে; এ তোমার শীল বা conduct-এর জিনিস। মহাভারত যেমন বারবার বলেছেন শিক্ষিত মানুষ আমরা তাকেই বলি যিনি "অভিন্নশ্রুতচরিত্রম্", যাঁর মধ্যে অধীত বিদ্যা এবং আচরণের সামঞ্জস্য রয়েছে, উভয়ের মধ্যে অভিন্নতা এসেছে। সেজন্য আমরা বাংলায় কুল এবং শীল কথাটা—এক সঙ্গে ব্যবহার করি। এই শীলের উপরে জোর দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ধর্ম আচরণের জিনিস, ডগমা নয়, ritual নয়, অনুষ্ঠান নয়, আচার নয়। এলেন মাইকেল মধুসূদন। রাবণকে তিনি তাঁর আদর্শ করলেন। সবই সত্য কথা। তারপর আমরা আরও অনেক দেখেছি, গিরিশচন্দ্রকে দেখেছি, প্রতাপ মজুমদারকে দেখেছি, অনেক লোকের কথা, —নাম বলতে অনেক সময় যাবে। আমি এখন চলে আসছি রবীন্দ্রনাথের কথায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই ধারাকে অনুসরণ করলেন। করে কি করলেন? তিনি আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বললেন—আমি ভালবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি নরদেবতার বেদীমূলে প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করেছি। আমি প্রণাম করেছি সেই মানুষকে, যে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'; তাকে ইংরেজীতে বলে The Eternal man। সেই পরম পুরুষকে কবি দেখছেন। শেষের দিকে কবিতায় এক জায়গায় কবি বলেছেন, "দেখি তাঁরে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক"—তোমার এবং আমার মাঝে যে পুরুষ রয়েছেন তাঁকে দেখতে চাইলেন। কবি কিন্তু বারবার বলছেন—আমি তত্ত্বদর্শী নই, আমি গুরু নই, নেতা নই। আমি শুধু কবি, বাঁশি বাজিয়েছি, গান গেয়েছি, কবিতা লিখেছি। তিনি কিরকম ভাবে বাঁশি বাজিয়েছিলেন? বাঁশের বাঁশি যখন বাজে, বাঁশের মধ্যে যখন ছিদ্র তৈরি করা হয়—বাঁশের ব্যথা লাগে, সে কষ্ট পায়। কিন্তু বাঁশ জানে না যে, কষ্ট দেওয়া হচ্ছে তাকে এইজন্য যে, ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়ে সাতটি সুর বেরুবে—যে সুর মানুষকে মুগ্ধ করবে—যে-সুরের মূর্ছনায় আমরা অরূপের লোকে চলে যাবো—আনন্দের জগতে বিচরণ করবো! তেমনি জীবনদেবতা বা অন্তর্যামী আমার সমস্ত সত্তার মধ্য দিয়ে অসংখ্য ছিদ্র তৈরি করেছেন, আমাকে দুঃখের মধ্য দিয়ে, আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষ করে তুলেছেন, যাতে আমার মধ্য দিয়ে তিনি বাঁশি বাজাতে পারেন। কবি এই দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন, বললেন যে আমি

কখনো তত্ত্ব বুঝতে আসিনি। আমাকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অথবা অদ্বৈতবাদের কথা কিছু বলো না, আমি মুক্তিপ্রয়াসী নই; কি বললেন?

'বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে,
পরশ যারে যায় না করা,
সকল দেহে দিলেন ধরা,
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ করে দিন তাই,
যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।'

তাই কবি বললেন, বারবার আকাঙ্ক্ষা করলেন কি?

"...আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে।
দুঃখ সুখের ঢেউ খেলানো এই সাগরের তীরে॥
আবার জলে ভাসাই ভেলা,
মাটির 'পরে করি খেলা
হাসির মায়ামৃগীর পিছে ভাসি নয়ননীরে।
আবার যদি ইচ্ছা কর আবার
আসি ফিরে॥..."

এই জগতে বারবার ফিরে আসতে চেয়েছেন। কেন? "লভিয়াছি মানবজীবন এই মোর শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ।" একথা বারবার কবি বলেছেন। পরিশেষ কাব্যের মধ্যে তিনিও ভূমাকে চেয়েছেন। কিন্তু বলেছেন "মাটির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি, ধ্যানচোখে আলোকের অতীত আলোকে।" গিরিগুহায় যেতে চাননি, গায়ে ছাই মাখতে চাননি, জীবনকে জগৎকে ত্যাগ করে চলে যেতে চাননি। "বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো, তোমার সাথে সেইখানে যোগ আমারও নয়কো বনে, নয় বিজনে"...ইত্যাদি। এমনিভাবে কবি জাগরণের একটা দিক দেখালেন, সমন্বয়ের সূত্র দেখালেন। ঈশোপনিষদের শ্লোক বারবার ব্যাখ্যা করে বললেন যে, আমরা একককে বাদ দিয়ে বহুর উপাসনা করতে পারি, বহুকে বাদ দিয়ে একের উপাসনা করতে পারি; এর ফলে অন্ধকারে আমরা প্রবেশ করবো। কিন্তু গভীরতর অন্ধকারে কে যাবে? যে বহুকে বাদ দিয়ে একের উপাসনা করবে সে। একককে বাদ দিয়ে যে বহুর উপাসনা করবে, সে তো অন্ধকারে যাবেই, কিন্তু "বহুকে" বাদ দিয়ে যদি "একে" যাও, তুমি গভীরতর অন্ধকারে যাবে। ততো ভূয় এব তমঃ প্রবিশন্তি ইত্যাদি, অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি সে কথা বলছেন। এই যে অবিদ্যা এবং বিদ্যা, বহু এবং এক—এই মিলনের কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার বললেন—"মাটির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে আলোকের অতীত আলোকে।" কিন্তু জাগরণের যে দ্বিতীয় সূত্রটি আমি বলেছিলাম, বুদ্ধির বিচারের কথা, সেটা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা ততটা পাচ্ছি না, বরং আমরা হৃদয়ের কথা পাচ্ছি বেশী করে। বারবার বলছেন, তত্ত্বজ্ঞানী তুমি বুঝবে না; "আমার চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনী উঠল রাঙা হয়ে"; তুমি বলবে—এ তত্ত্বকথা, আমি বলব—এ সত্য, তাই এ সুন্দর। এই তত্ত্বকথাটাকে তিনি অনুভবের মধ্য দিয়ে নিলেন "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা।" সমস্ত অনুভূতির মধ্য দিয়ে যে একটির অনুভূতিকে, সুন্দরকে পেতে চেয়েছেন, সেই সুন্দরের আবির্ভাবের কথা কবি বলেছেন। এর প্রতিষ্ঠা যুক্তিবিচারের দ্বারা হচ্ছে না, শুধু অনুভূতির দ্বারা হচ্ছে না। কবি মানুষের জয়গান বারবার গাইছেন একেবারে প্রথম থেকে: 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'—এই যে শুরু করলেন, শেষে গিয়ে 'পৃথিবী' কবিতার মধ্যে—

বলছেন, শেষদিকের কবিতার মধ্যে বলছেন, "তবে দিও তোমার মাটির তিলক আমার কপালে।" বলছেন, "আমি তারপরে সেই অসীমের মধ্যে মিশে যাব।" বলছেন, "আমি মানবজীবন লভিয়াছি এ মোর পরম আশীর্বাদ।" "সূর্য যখন উড়ালো কেতন অন্ধকারের প্রান্তে। তুমি আমি তার রথের চাকার ধ্বনি পেয়েছিনু জানতে। সঙ্গীতে ভরি এ প্রাণের তরী অসীমে ভাসিছে রঙ্গে। চিনি নাহি চিনি চিরসঙ্গিনী চলিলে আমার সঙ্গে।" সেই চিরসঙ্গিনী সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন, কিন্তু কোথায় যাচ্ছেন? সেই মানুষের মধ্যে তাকে নিয়ে যাচ্ছেন, কখনো মানুষকে বাদ দিয়ে যাচ্ছেন না। সেইজন্য কবি মহামানবের স্বপ্ন দেখেছেন। 'ঐ মহামানব আসে' বারবার বলছেন, শেষের দিকে "সভ্যতার সঙ্কটে"র মধ্যে ঐ একই কথা বলছেন, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাসহারানো মহাপাপ।' সে বিশ্বাস তিনি হারাননি। কিন্তু কবি কখনো জীবনদেবতা বলতে ঈশ্বর বুঝছেন না। Theism-এ আমরা বলি God, Personal God, সে কথা তিনি বার বার বলছেন না। "Eternal man" কথাটা বলেছেন, কিন্তু কখনও ব্রহ্মকথাটাকে তিনি দার্শনিক অর্থে ব্যবহার করছেন না। উপনিষদে অবগাহন করেছেন সত্যি কথা, উপনিষদ থেকে সমস্ত রসদ নিয়েছেন সত্যি-কথা, কিন্তু কবি দার্শনিক বিচার করেননি। লক্ষ্য করবেন, ১৮৯৩ সালে Parliament of Religions-এ স্বামীজী ভাষণ দিলেন—সেখানে ধর্মের যে নতুন লক্ষণ দেখালেন তার ৭ বৎসর পরে ১৯০০ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রবন্ধ লেখেন 'ধর্মের সবল আদর্শ', সেখানে সূত্রাকারে কবি তাই-ই বলেছিলেন—মানুষের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ধর্ম। সেই কথাটি পরবর্তী কালে Hibbert Lecture-এ Religion of Man এবং Kamala lecture-এ 'মানুষের ধর্ম' প্রসঙ্গে পরিস্ফুট করে তিনি বলেছেন। বলেছেন, একটি মানুষের ভেতর দুটি সত্তা আছে। উপনিষদের কথা, 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া'। একটি গাছে দুটি পাখী আছে। একটি পাখী—সে কেবল খাচ্ছে, আর একজন—কেবল দেখছে; প্রত্যেক মানুষের ভেতরে দুটি পাখী রয়েছে, একটি কেবল স্বাদু ফল খাচ্ছে আর একজন খাচ্ছে না—সে সাক্ষী হয়ে কেবল দেখছে। কবি এক জায়গায় বলেছেন, "আমার চোখের সামনে একটি পর্দা সরে গেল। সেদিন অন্তরাত্মাকে দেখলুম। মনে হলো আজ ভূমিষ্ঠ হয়ে কাউকে প্রণাম করি। দুচোখ বেয়ে আমার জল পড়ছে। মনে হচ্ছে জীবনে এত আনন্দের তরঙ্গায়িত সঙ্গীত আর কখনো শুনিনি।" সেই সঙ্গীতের মূর্ছনায় কবি অনুভব করলেন– জগতের সর্বত্র একটি অখণ্ড চৈতন্য পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। তবু তিনি জাগরণের স্বপ্ন দেখলেন, মানুষের জয়গান গাইলেন। মানুষকে বাদ দিয়ে সভ্যতা হচ্ছে না, কাব্য হচ্ছে না, সৌন্দর্যানুভূতি হচ্ছে না—কিছুই হচ্ছে না। কবি তাই মানুষকে কেন্দ্রে স্থাপন করলেন, বললেন আমি যখন এ জন্মের অধিদেবতাকে প্রণাম করে যাব তখন বলে যাব আমি আনন্দিত। কেন? আমি মানুষের মধ্যে জন্মেছি, মানুষকে ভালবেসেছি। এই ধারা যদি আর একটু অনুসরণ করে আসি তাহলে স্বামী বিবেকানন্দ কিভাবে মানুষের মহিমা কীর্তন করেছেন তা বোঝা যাবে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন আলোচনা করলে দেখা যাবে যে তিনি প্রথমে যুক্তির পথে এগিয়েছিলেন। উইলিয়াম হেস্টি General Assembly's Institution-এর অধ্যাপক। তিনি Wordsworth-এর কবিতা পড়াচ্ছেন

যেখানে mysticism-এর কথা রয়েছে। নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করছেন mysticism ব্যাপারটা কি। যে নরেন্দ্রনাথ Herbert Spencer আত্মসাৎ করেছেন, August Comte পড়ছেন, John Stuart Mill-এর দর্শনে পাঠ গ্রহণ করেছেন, তিনি বলছেন mysticism কি। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি কি সত্যিই হতে পারে ?

অধ্যাপক Hastie বললেন, 'তোমাদের চোখের সামনে একজন লোক রয়েছেন, যাঁর এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি হয়েছে, যিনি সাধন-মার্গের সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছেন, যিনি এই সাধনার মধ্যে সিদ্ধ হয়েছেন, তাঁর নাম পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ।' বিদেশী অধ্যাপক হেষ্টির কাছে এই সংবাদটি নরেন্দ্রনাথ পেলেন। এখানে পূর্ব এবং পশ্চিমের মিলন ঘটল। যে কথা স্বামীজী বার বার বলেছেন—পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের কথা। Hastie-র কাছে, একজন পাশ্চাত্য বিদেশী শিক্ষকের কাছে নরেন্দ্রনাথ প্রথম শুনলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবসমাধি হয়েছে, তাঁর নির্বিকল্প অনুভূতি হয়েছে, তিনি ভগবানকে দেখেছেন। একথা যখন নরেন্দ্রনাথ জানলেন, তখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল। জিজ্ঞাসা করলেন বহু লোককে, "আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন ?" স্পষ্ট জবাব কেউ দিলেন না—এমনকি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও না। শুধু জবাব দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব—দেখেছি বই-কি ; তোমাকে যেমন স্পষ্টভাবে দেখছি, তার চাইতেও স্পষ্ট দেখেছি! এটুকু বলে তিনি থামলেন না, বললেন—তোমাকেও দেখাতে পারি। ঈশ্বরানুভূতির demonstration যে দেওয়া যায় এটা নরেন্দ্রনাথ জানতেন না। এই প্রথম শুনলেন, বিমুগ্ধ হলেন, অবাক হলেন। এ কি কথা! শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুধু ঈশ্বরকে দেখেছেন তাই নয়, তিনি দেখাতেও পারেন! নরেন্দ্রনাথ সে কথা বিশ্বাস করলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালভাবে যাচাই করতে ছাড়লেন না। সেই পূজারী ব্রাহ্মণকে, প্রায়-নিরক্ষর ব্রাহ্মণকে নরেন্দ্রনাথ পরীক্ষা করে চললেন বারবার, তাঁকে বাজিয়ে দেখলেন, বুদ্ধির কষ্টিপাথরে ঘষে দেখলেন সোনা খাঁটি কিনা ; সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে লাগল। পরিশেষে এমন একটি সময় এল—সে-ইতিহাস আপনারা জানেন—যখন নরেন্দ্রনাথ আত্মসমর্পণ করলেন। যদি বলেন যে, নরেন্দ্রনাথ সমস্ত বুদ্ধিকে বিসর্জন দিলেন, যদি বলেন যে, এখানে যুক্তি পরাজয় স্বীকার করল, হার মানল, আমি বলব তা নয়। এ যদি বিসর্জন হয় তবে এ নদীর আত্মবিসর্জন সমুদ্রের কাছে, বীজের আত্মসমর্পণ গাছের কাছে। বীজ থেকে যখন গাছ হয় সে-গাছকে উপড়ে ফেলুন, বীজকে বীজ-অবস্থায় আর পাবেন না। বীজের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু সে মহান্ মৃত্যু ; বীজ নিজের জীবন দিয়ে নবজীবন লাভ করেছে। নবজীবনের মধ্যে সে অখণ্ড জীবনের স্বাদ পেয়েছে ; কিন্তু নিজের যে ক্ষুদ্র আমি, বীজের যে সত্তা সেটার মৃত্যু হয়েছে। নদী যখন সাগরে মিশেছে, সে আত্মসমর্পণ করেছে ঠিকই, কিন্তু সে নবজীবন লাভ করেছে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। নরেন্দ্রনাথের জীবনেও তাই ঘটল। সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত বিচার, সমস্ত তর্ক বিশ্বাসের কাছে, উপলব্ধির কাছে, অনুভূতির কাছে আত্মসমর্পণ করল বৃহত্তর মহত্তর সুন্দরতর গভীরতর জীবন লাভ করার জন্য। সেই নবজীবন লাভ করে নরেন্দ্রনাথ ধন্য হলেন। তাঁর আচার্যদেবের কাছে নরেন্দ্রনাথ দুটি সত্য জেনেছিলেন। একটি সত্য হল এই—জীবে দয়া নয়, জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা

করতে হবে। দ্বিতীয় সত্য হল—সকল ধর্মই সত্য, সব নিজস্বতা নিয়েই সত্য; কোন ধর্মই ছোট বা কোন ধর্মই বড় নয়। এবং এর থেকে তৃতীয় সত্যটি আসছে যে ধর্মই হল মানবজীবনের প্রাণবিন্দু, কেন্দ্রবিন্দু। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে এই সত্যটিই আভাসে-ইঙ্গিতে বলেছিলেন। রামমোহন কেবল পরোক্ষে বলবার চেষ্টা করেছিলেন, "আমার মৃত্যুর পরে যেন আমার স্মৃতিফলকে লেখা থাকে—ঈশ্বরকে আরাধনা করা মানে মানুষের কল্যাণ করা।" স্বামীজী করেছিলেন এই সত্যটিকে জনজাগরণের এবং পুনরুজ্জীবনের মূলমন্ত্র। তিনি বললেন যে, ধর্মই হচ্ছে মানুষের জীবনের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু, কেন্দ্রশক্তি। তিনি এই সত্যটি পরিবেশন করলেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে। যেমন বেদান্তশিক্ষার ব্যাপারে অরুন্ধতী-ন্যায়ের কথা আছে। বলা আছে যে, প্রথমেই আমরা অখণ্ড অদ্বয় ব্রহ্মের কথা বলি না। 'জগৎ ব্রহ্মেতে আছে'—এই কথা প্রথমে বলি। একে বলে অধ্যারোপ। তারপর বলা হল যে, জগৎ ব্রহ্মেতে নেই—এর নাম অপবাদ। এ কথা শুনলে মনে হবে আপাতবিরোধী কথা। কিন্তু এ আপাতবিরোধী কথা নয়। যদি প্রথম থেকে বলা হতো "শোন হে বাপু, জগৎ ব্রহ্মেতে নেই; ব্রহ্ম নির্গুণ সচ্চিদানন্দ", তাহলে লোকের মনে সংশয় হত, জগৎ তো ব্রহ্মে নেই, তাহলে নিশ্চয়ই অন্য কোথাও আছে। যেমন, বাবু অফিসে নেই তাহলে বাড়ীতে আছেন। এই জাতীয় সংশয় যাতে না আসে সেইজন্য প্রথম বলা হল—জগৎ যদি কোথাও থেকে থাকে তাহলে ব্রহ্মেতে আছে। তার একমাত্র অধিষ্ঠান-সত্তা ব্রহ্ম। ব্রহ্মই সর্বব্যাপী, তাঁকে আশ্রয় করেই জগৎ থাকবে; নতুবা থাকবে কোথায় জগৎ? পরক্ষণে দেখা গেল ব্রহ্ম হচ্ছেন স্বগত-ভেদরহিত, বিজাতীয়-ভেদরহিত, সজাতীয়-ভেদরহিত; কাজেই ভেদপূর্ণ জগৎ ব্রহ্মে থাকতে পারে না, অতএব জগৎ ব্রহ্মেতে নেই। যেমন দড়িতে আমরা সাপ দেখে অন্ধকারে ভুল করি। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, 'সাপ দেখলি কোথা?' আমরা আঙুল দিয়ে দড়িটাকে দেখাই; দড়ি যদি না থাকত, তাহলে তো সাপ দেখতাম না। কাজেই সাপটা দড়িতেই আছে। কিন্তু ভুল যখন ভেঙে গেল, আলো আনলাম, হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলাম, ভাল করে স্পর্শ করলাম, তখন বললাম যে, যে-সাপটাকে দেখেছিলাম সে ভুল; ও নেই, ছিলও না। প্রথমে বললাম, সাপ যদি কোথাও থেকে থাকে তবে সে দড়িতে আছে। ভুল যখন ভাঙল তখন বললাম: সাপ দড়িতেও নেই, কদাচ ছিল না। এই প্রথমটা হল অধ্যারোপ, দ্বিতীয়টা হল অপবাদ। বলা আছে অরুন্ধতী-ন্যায়ের কথা। সেকালে নববধূ যখন শ্বশুরবাড়ীতে আসতেন, লজ্জাশীলা বধূ বড় ঘোমটা দিয়েছেন, কথা বলছেন না, শাশুড়ী-ননদদের সামনে কেবল মাথা নেড়ে হুঁ-হাঁ করছেন; তাঁকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখাতে হবে। খই যেমন মাঙ্গলিক, দই যেমন মাঙ্গলিক, শাঁখ বাজানো যেমন একটা মাঙ্গলিক, তেমনি অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখতে পাওয়া নববধূর কাছে একটি মঙ্গলকাজ। কিন্তু নববধূ লজ্জাশীলা, শাশুড়ী বলছেন, অরুন্ধতী দেখেছ, বৌমা? মাথা তুলে বৌমা বলছেন, 'হ্যাঁ'। লজ্জায় স্পষ্ট করে কথা বলছেন না। শাশুড়ী যা বলছেন তাই শুনে বৌমা মাথা নাড়ছেন। কিন্তু এমনি করে শাশুড়ী তাঁকে বড় একটা নক্ষত্র দেখাচ্ছেন। চোখ যখন সেখানে স্থির হয়েছে,

তখন আর একটা ছোট নক্ষত্রে যাচ্ছেন—আর একটা ছোট, এমনি করতে করতে অরুন্ধতীতে নিয়ে যাচ্ছেন। একে বলে অরুন্ধতী-ন্যায়। ঠিক সেই রকম প্রথমে বলা হল জগৎ ব্রহ্মেতে আছে, তারপর বলা হল জগৎ ব্রহ্মেতে নেই। স্বামীজীও ঠিক তাই করলেন। তিনি প্রথম বললেন মানুষকে—ঈশ্বরে বিশ্বাস করছো না, দরকার নেই, করো না। ঈশ্বর আছেন কিনা কে জানে? দরকার নেই ভেবে। কিন্তু নিজেকে বিশ্বাস করো তো? তুমি তো আছ? হ্যাঁ, আমি তো আছি। এই হলেই হল, ওতেই বিশ্বাস করো। ফরাসী দার্শনিক একজন বলেছিলেন: আমি সবকিছু সন্দেহ করে শুরু করবো, কিছুই মানবো না—দুয়ে দুয়ে চার না পাঁচ, আমার সন্দেহ হচ্ছে; ঈশ্বর আছেন কি না, সন্দেহ হচ্ছে; পাখাগুলো ঘুরছে কি না, সন্দেহ হচ্ছে। এটা বেলঘরিয়াতে আছি না পাটনায় আছি, সন্দেহ হচ্ছে; আপনারা বেঁচে আছেন না মৃত, সন্দেহ হচ্ছে; এটা আমার দেহ না অন্য লোকের দেহ, সন্দেহ হচ্ছে; এই করতে করতে সেই দার্শনিক বললেন—কিন্তু একটা জিনিস সন্দেহ করতে পারছি না; আমি যে সন্দেহ করছি, এটাতে তো সন্দেহ করা যাচ্ছে না। তখন বললেন: দেখো, সন্দেহ করার কর্তাকে খুঁজে বার করো—কে সন্দেহ করছে? বললেন, খাওয়া দাওয়া হচ্ছে, খাদক নেই—এ তো হয় না; একটু আগে গান শুনলেন, গান হচ্ছে, গায়ক নেই—এতো হয় না। বাজনা শুনলেন, বাদক নেই—এ কি কথা? তাহলে সন্দেহক্রিয়া যখন হয়েছে, কর্তা আছে। এই যে করছে সন্দেহ, সেটা কর্তা। তিনি বললেন—এটাকেও সন্দেহ করছি। এটাকেও যে সন্দেহ করছি, এই দেহটাকে, কাজেই দেহটা কর্তা নয়। এ একটা গাছের ডাল, এটাকে আমি কাটবো, দু টুকরো করবো—একটা দা দিয়ে কাটবো তো! এই গাছের ডালটা এই গাছের ডাল দিয়ে কাটবো কি করে? কাটা যায় না। কাজেই দা দিয়ে কাটতে হবে। তাই আমার দেহকে যখন সন্দেহ করছি—কাজেই দেহাতিরিক্ত অন্য কিছু দিয়ে সন্দেহ করেছি—সেই অন্য কিছুর নাম আত্মা বা চৈতন্য। সেই আত্মাই সন্দেহ করছে। শঙ্করাচার্য তাঁর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের মধ্যে এক জায়গায় বলেছেন, যে-লোক নিজের অস্তিত্বকে, নিজের আত্মাকে অস্বীকার করে, সে কিরকম লোক জান? সে নেমন্তন্ন বাড়ীতে ভূরিভোজন করে এসেছে, ঢেঁকুর তুলছে, অথচ বলছে—ওঁরা বড় খারাপ লোক, কিছু খাওয়ায়নি। সেইরকম নিজের অস্তিত্বটাকে অস্বীকার করা যায় না। স্বামীজী এইভাবে শুরু করলেন। মানুষকে মর্যাদা দিলেন; তাঁর আচার্যদেবের কাছ থেকে একটা সূত্র পেয়েছিলেন। তিনি যখন বলেছিলেন, মানুষ মানে মান-হুঁশ। যে নিজের মানমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন সেই তো মানুষ। কিন্তু আমার মান বা মর্যাদাটা কি? সেটা হল, আমার ভেতরে অনন্ত শক্তি আছে। আমাকে বাইরে থেকে যতটা ছোট মনে করছ আমি ততটা ছোট নই। আমি অনন্ত শক্তির ধারক এবং বাহক। এইটি আমার মর্যাদা, এইটি আমার status, এইটি আমার dignity—এইটাকে রক্ষা করতে হবে।

স্বামীজী প্রথম বললেন, ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করতে পার, করার দরকার নেই বাপু। নিজেকে বিশ্বাস করো। এই নিজেকে বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে মানুষের জাগরণ শুরু হল—পুনরুজ্জীবন—রেনেসাঁ। এতকাল মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা হারিয়ে গিয়েছিল। সেই

ভিয়োজিওর প্রভাব চলছিল। মানুষ নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের মোহে মূঢ় হয়ে পড়েছিল। নিজের মধ্যে যে শক্তি আছে তার সম্বন্ধে সে সচেতন ছিল না।

আপনারা সেই সিংহশাবক এবং মেষশিশুর গল্প জানেন; আমি সেই গল্প বলে সময় নষ্ট করবো না। স্বামীজী সেই কথাটি আবার বললেন: তুমি সিংহশিশু, তুমি মেষশাবক নও; একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখো। এই প্রথম জাগরণের সূত্র দিলেন স্বামীজী; কিন্তু সেই আত্ম-অবলোকন বা আত্মানুসন্ধানের ফলে কি দেখা গেল? দেখা গেল যে আমিই আসলে ব্রহ্ম, স্বরূপতঃ আমি ও ঈশ্বর এক—"অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"। এ কিন্তু পুঁথির কথা মাত্র নয়, এ উপলব্ধ সত্য।

[ক্রমশঃ]

পথটি বলে দাও

(গান)

শ্রীসুধাংশুকুমার দাস

যে গান আমার গাইতে হবে
হয়নি সে গান সাধা,
কোন্ তরীতে উঠতে হবে—
কোন্ ঘাটে সে বাঁধা?

খেলার মাঝে ডুবে আছি,
রঙের বনে মৌমাছি,
এবার যে মোর সময় হ'ল
বোঁচ্‌কা-বিড়ে বাঁধা।

কোথায় গিয়ে খুঁজবো তাঁরে
কোন্ ঘাটে সে নাও,
প্রভু, তুমি দয়াল স্বামী,
পথটি বলে দাও।

এত দিনের কান্নাহাসা,
নিজের বলে ভালবাসা,
সব কিছু যে রইল পড়ে—
কোথায় তরী বাঁধা?

স্বাধ্যায়

স্বামী ধ্যানানন্দ

'স্বাধ্যায়' শব্দটির মুখ্য অর্থ হচ্ছে বেদাধ্যয়ন। 'অধি', 'আ' ও 'সু'— এই তিনটি উপসর্গপূর্বক ই-ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করে স্বাধ্যায় শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। ই-ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করলে হয়—'আয়'। অধি + আয় = অধ্যায়। অধ্যায় ও অধ্যয়ন একার্থক। 'সু'-এর অর্থ সুন্দররূপে, অর্থাৎ উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত— এই ত্রিবিধ স্বর-সাহায্যে ; 'আ'-এর অর্থ সম্যক্‌রূপে অর্থাৎ নিয়মপূর্বক। একই স্বরে দীর্ঘকাল যা কিছু পাঠ করা যায়, তা শুধু যে শ্রুতিমধুর হয় না, তাই নয়—বাগিন্দ্রিয়েরও ক্লেশকর হয়ে থাকে। আর প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে নির্দিষ্ট, পবিত্র স্থানে শুচিসংযত হয়ে অর্থে মনোনিবেশ করে পাঠ না করলে তাকে সম্যক্‌রূপে পাঠ বলা যায় না।

স্বাধ্যায়ের অন্য অর্থও আছে, তা এখানে আলোচ্য নয়।

শব্দটি অতি প্রাচীন। বৈদিক যুগ থেকে আজ অবধি মোটামুটি একই অর্থে চলে আসছে। সমগ্র ঋগ্বেদসংহিতায় অবশ্য এই শব্দটি পাওয়া যায় না। শুক্ল-যজুর্বেদের শতপথ-ব্রাহ্মণের একটি অধ্যায়ের নাম 'স্বাধ্যায়-প্রশংসা'। তাতে বেদপাঠের প্রয়োজনীয়তা ও মহিমার কথা বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। বলা হয়েছে - 'যে হ বৈ কে চ শ্রমাঃ ইমে দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেণ, স্বাধ্যায়ো হৈব তেষাং পরমতা কাষ্ঠা', অর্থাৎ স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে শ্রমসাধ্য যত তপস্যা আছে, বেদাধ্যয়ন তার পরাকাষ্ঠা। কৃষ্ণ-যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় উপনিষদের শীক্ষাবল্লীর নবম অনুবাকে প্রায় প্রতি পঙ্‌ক্তিতে 'স্বাধ্যায়-প্রবচনে' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সংসারের সমস্ত কর্মের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায় ও প্রবচন— বেদের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনাও করতে হবে। এ দুটিকে বাদ দিলে চলবে না। ঐ বল্লীরই একাদশ অনুবাকে আছে—'স্বাধ্যায়ান্‌ মা প্রমদঃ', 'স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্‌'। স্বাধ্যায়ে অনবহিত হবে না; স্বাধ্যায় ও প্রবচনে অনবহিত হবে না।

সমস্ত ধর্মসূত্রগ্রন্থের মধ্যে প্রাচীনতম গৌতমধর্মসূত্রে আমরা 'নিত্যস্বাধ্যায়ঃ' এই সূত্রটি পাই। 'নিত্যস্বাধ্যায়ঃ' শব্দটি একটি বিশেষণ পদ। বিশেষ্যপদ 'গৃহস্থঃ' এবং ক্রিয়াপদ 'ভবেৎ' উহ্য আছে। অর্থাৎ গৃহী ব্যক্তি নিত্য বেদাভ্যাসী হবেন। স্বাধ্যায় গৃহস্থের নিত্যকর্ম— পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্তর্গত। একেই ঋষিযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞ বলে। সমগ্র ধর্মশাস্ত্রে অর্থাৎ ধর্মসূত্র-গ্রন্থে ও মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির শ্লোকবদ্ধ সংহিতায় এই স্বাধ্যায়ের উপদেশ রয়েছে। ইতিহাস পুরাণ ও মহানির্বাণাদি তন্ত্রেও এই স্বাধ্যায়ের কথা বলা হয়েছে।

'স্বাধ্যায়' শব্দটি পাতঞ্জলদর্শনে মোট তিনবার পাওয়া যায়। সূত্র তিনটি এই :— ১) তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ (২.১); (২) শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ২.৩২); (৩) স্বাধ্যায়াদ্‌ ইষ্টদেবতা-সম্প্রয়োগঃ (২.৪৪)। ১ম ও ২য় সূত্র সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব। তবে উভয়েরই ভাষ্যে উল্লিখিত প্রণবজপকেও যে স্বাধ্যায় বলে সেই কথাটি আগেই নিচ্ছি, কারণ তা না হলে এই ৩য় সূত্রটিতে স্বাধ্যায়ের অর্থ পরিষ্কার

হবে না। ৩য় সূত্রের ব্যাসভাষ্যে রয়েছে—দেবা ঋষয়ঃ সিদ্ধাশ্চ স্বাধ্যায়শীলস্য দর্শনং গচ্ছন্তি, কার্যে চ অস্য বর্তন্তে ইতি। 'ভাস্বতী' টীকায় ভাষ্যোক্ত 'স্বাধ্যায়শীলস্য' কথাটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে—নিরন্তরং ......
'কার্যে' কথাটির ব্যাখ্যায় 'পাতঞ্জলরহস্য' টীকায় আছে—অনুগ্রহাদৌ। সাধক যদি কোনও দেবতা, ঋষি বা সিদ্ধের দর্শন চান তা হলে তাঁকে ওঙ্কার বা ওঙ্কারযুক্ত মন্ত্রের জপ ও সঙ্গে সঙ্গে উপাস্যের নিরন্তর ধ্যান করতে হবে। তা হলেই ইষ্ট দর্শন দেবেন এবং অন্যভাবেও সাধককে অনুগ্রহ করবেন। এই হল ভাষ্যটীকা অনুযায়ী সূত্রটির ব্যাখ্যা। প্রণবকে টেনে আনতে হয়েছে 'স্বাধ্যায়' শব্দটির জন্য। বেদের সার প্রণবকে আমরা বেদ থেকেই পাই সুতরাং প্রণবজপ যে স্বাধ্যায় তাতে সন্দেহ নেই।

১ম ও ২য় সূত্রের ব্যাসভাষ্যে বলা হয়েছে—স্বাধ্যায়ো মোক্ষশাস্ত্রাণাম্ অধ্যয়নং প্রণবজপো বা। প্রণবজপ অর্থাৎ ওঙ্কারের আবৃত্তি যে স্বাধ্যায় তা আমরা উল্লেখ করেছি। কিন্তু মোক্ষশাস্ত্র কি? বেদের কর্মকাণ্ডকে বাদ দিয়ে শুধু যদি বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদ্‌গুলির অধ্যয়ন এবং বেদেতর অন্যান্য মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়নই ব্যাসভাষ্যে উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে স্বাধ্যায়ের মৌলিক অর্থকে একদিকে যেমন সঙ্কীর্ণ করা হয়, অন্যদিকে তেমনি ব্যাপকও করা হয়। কিন্তু আমাদের গত্যন্তর নেই। ব্যাসের এই অর্থই প্রচলিত হয়ে গেছে। সুতরাং আমরা উপনিষদের সঙ্গে সঙ্গে গীতা ভাগবত কথামৃত আদি যাবতীয় ধর্মগ্রন্থের নিয়মপূর্বক অধ্যয়নকেই স্বাধ্যায়ের অন্তর্গত মনে করি। জেন্দাবেস্তা, ধম্মপদ, বাইবেল, গ্রন্থসাহেব প্রভৃতিকেও বাদ দিই না

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও 'স্বাধ্যায়' শব্দটি মোট তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে 'স্বাধ্যায়'কে জ্ঞানযজ্ঞ, এবং দ্রব্যময় যজ্ঞ থেকে জ্ঞানযজ্ঞ যে শ্রেষ্ঠ তা বলা হয়েছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ অধ্যায়ে স্বাধ্যায়কে যথাক্রমে দৈবী সম্পদ ও বাঙ্‌ময় তপস্যা বলা হয়েছে। গীতাপাঠ এমনকি অর্থ না বুঝেও জপরূপে শুধু আবৃত্তি, তাও যে স্বাধ্যায়রূপী জ্ঞানযজ্ঞ এবং ভগবানের প্রীতিকর, 'অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ। জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥' গীতার শেষ অধ্যায়ের এই শ্লোকটির ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী, মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি টীকাকাররা এই সিদ্ধান্তই করছেন। এমনকি গীতার অশুদ্ধ পাঠ করেও শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যেতে পারে, যদি তেমন ভক্তি থাকে। এ বিষয়ে একটি সুন্দর ঘটনা রয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেব যখন দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করছিলেন, তখন এই ঘটনাটি দেখেছিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলায় আছে—

"সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে বসি করে গীতা আবর্তন॥
অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ-আবেশে।
অশুদ্ধ পড়েন, লোকে করে উপহাসে॥
কেহো হাসে কেহো নিন্দে, তাহা নাহি মানে।
আবিষ্ট হইয়া পড়ে আনন্দিত মনে॥
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ যাবৎ পঠন।
দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন॥
মহাপ্রভু পুছিলা তাঁরে শুন মহাশয়!
কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়॥
বিপ্র কহে--মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি॥
অর্জুনের রথে কৃষ্ণ হঞা রজ্জুধর।

বসিয়াছে হাতে তোত্র শ্যামল সুন্দর ॥
অর্জুনেরে কহিতেছেন হিত-উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ-আবেশ ॥
যাবৎ পঢ়োঁ তাবৎ পাঙ্‌ তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতাপাঠ না ছাড়ে মোর মন ॥
প্রভু কহে—গীতাপাঠে তোমারি অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার ॥"

স্বাধ্যায়ের ও সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেব সনাতন গোস্বামীকে বলেছিলেন—

"সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥"

সাধুর কৃপায় ও শাস্ত্রের কৃপায় জীব যদি ভগবন্মুখী হয়, তবেই ভগবানের দুরত্যয়া মায়া তাকে ত্যাগ করে। স্বাধ্যায়ের দ্বারাই শাস্ত্রের কৃপা হতে পারে। প্রত্যেক সাধকেরই নিত্য স্বাধ্যায়ী হওয়া উচিত।

তবে স্বাধ্যায় করতে হবে বলে যে বহু শাস্ত্র পড়তেই হবে এমন কোনও কথা নেই। তাতে বরং ক্ষতিই হয়। যাঁরা আচার্য হবেন, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁদের বহু শাস্ত্র পড়ার দরকার হতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—নিজেকে মারতে একটা নরুনই যথেষ্ট, অপরকে মারতেই ঢাল-তলোয়ার দরকার। যাঁরা মুখ্যতঃ অধ্যাপনা, বক্তৃতা, সাহিত্য-সাধনা ইত্যাদি নিয়ে আছেন তাঁদের কথা বলা হচ্ছে না। এগুলি যাঁদের দৈনন্দিন জীবনের মুখ্য কাজ নয়, সেই সব সাধকেরই কথা বলা হচ্ছে। তাঁদের বেশী পড়ার সময়ও নেই, প্রয়োজনও নেই।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—'নানুধ্যায়াদ্ বহূন্ শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ'। অর্থাৎ বহু শব্দের অনুধ্যান করবে না, কারণ তা বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানিকর। এর 'মিতাক্ষরা' টীকায় বলা হয়েছে যে, এখানে বহু শাস্ত্রের অধ্যয়নে দোষ দেখানো হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—'গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্ বহূন্।' বহু গ্রন্থের অভ্যাস করবে না।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রয়েছে—

"বহু শাস্ত্রে বহু বাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়।
সাধ্য-সাধন শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয় ॥"

তপন মিশ্র নামে পূর্ববঙ্গের একজন ব্রাহ্মণের বহুশাস্ত্রপাঠে ও বহুবাক্যশ্রবণে সন্দেহ আরও বেড়ে গিয়েছিল। তিনি সাধ্য ও সাধন নির্ণয় করতে পারছিলেন না। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তিনি মহাপ্রভুর শরণ নেন। মহাপ্রভু তাঁকে নামসংকীর্তন করতে উপদেশ দেন। নামসংকীর্তনও স্বাধ্যায়।

নেপালরাজের উকীল বিশ্বনাথ উপাধ্যায়কে শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'কাপ্তেন' বলে ডাকতেন; বলতেন—'কাপ্তেনের বেদ, বেদান্ত, শ্রীমদ্-ভাগবত, গীতা, অধ্যাত্ম (রামায়ণ)—এ সব কণ্ঠস্থ।' তাঁকেই একদিন তিনি বকেছিলেন বেশী পড়ার জন্য। বলেছিলেন—'তুমি পড়েই সব খারাপ করেছ। আর পোড়ো না।'

ভক্তবর বলরাম বসুর পিতৃদেবকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন—'বই আর পোড়ো না, তবে ভক্তিশাস্ত্র পোড়ো, যেমন চৈতন্য-চরিতামৃত।'

সন্ন্যাসী কবি বিবেকানন্দ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম প্রিয় বীর সন্ন্যাসী সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ একাধারে বহু অসাধারণ গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি শুধু সুবক্তাই ছিলেন না, সুলেখকও ছিলেন—এ তাঁর দেশবাসীরা এবং দূর বিদেশীরা সকলেই স্বীকার করেন। তবে তিনি যে একজন শক্তিশালী 'কবি' এবং অসামান্য 'সঙ্গীত-শিল্পী'ও ছিলেন, এ হয়তো অনেকেই না জানতে পারেন। অবশ্য, স্বামীজীর 'বীরবাণী' গ্রন্থের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় ঘটেছে তাঁদের কাছে এ সংবাদ নূতন নয়। তাঁদের সঙ্গে এই বীর সন্ন্যাসী কবির অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটেছে।

কবি বিবেকানন্দ স্বামী ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দী এই চারটি বিভিন্ন ভাষাতেই কবিতা, গান ও স্তবগাথা রচনা করেছিলেন। স্বামীজীর প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলির মতো কবিতাও অধিকাংশ ইংরেজীতে রচিত। তবে কিছু কিছু তিনি মাতৃভাষাতেও লিখে গেছেন। তাঁর অনুরক্ত ভক্ত ও সন্ন্যাসী ভায়েরা তাঁর বহু ইংরেজী রচনার সুচারু বাংলা অনুবাদ করে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা- ও ধন্যবাদ-ভাজন হয়েছেন।

ভারতের সিদ্ধ-সাধকগণের মধ্যে অনেকেই যে বিশিষ্ট কবি ছিলেন এ পরিচয় তাঁরা রেখে গেছেন তাঁদের বিবিধ রচনার মধ্যে। বেদের সূক্ত ও উপনিষদের বাণী থেকে শুরু করে একেবারে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত দেখা যায় দর্শন, ইতিহাস, গণিত, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান ও বিধিবিধান সব কিছুই সচ্ছন্দ সংস্কৃত ভাষায় সুললিত কবিতায় বিধৃত।

প্রাচীনোত্তর যুগেও দেখা যায় বহু সিদ্ধ-সাধকের উচ্চ চিন্তাধারা এবং ভক্তিমূলক ভাব-বৈচিত্র্য ছন্দোবদ্ধ কবিতার ভাষায় শ্লোকের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য, নানক, কবীর, দাদু, তুকারাম, তুলসীদাস প্রভৃতি। অর্বাচীন কালেরও বহু সাধক, যেমন চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, নীলকণ্ঠ, কমলাকান্ত প্রভৃতি এই ধারাই অনুসরণ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবও আমরা একাধিক বৈষ্ণব সাধকের গীতকাব্য-রসাস্বাদনে তৃপ্ত হয়েছি। বাংলার বাউল সাধকসম্প্রদায়ের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব থেকে দেহতত্ত্ব পর্যন্ত সর্বপ্রকার কঠিন বিষয়ই সুন্দর সহজবোধ্য কবিতায় সিদ্ধ-সাধকদের দ্বারা রচিত হয়েছিল। দেবদেবীগণের স্তোত্র, বন্দনা, ধ্যান ও প্রণাম সবই প্রায় সুললিত সংস্কৃত কবিতায় রচিত হয়েছিল দেখা যায়।

সাম্প্রতিক কালে এই উনবিংশ ও বিংশ-শতাব্দীতেও আমরা পেয়েছি রামমোহন, কেশবচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, দরবেশ, কাঙাল হরিনাথ, সাধু তারাচরণ প্রভৃতি একাধিক ভক্তগণের রচিত কত অধ্যাত্মতত্ত্ব-সম্বলিত গান ও কবিতা, স্তোত্র ও গাথা। বর্তমানেও একাধিক জীবিত সাধক বহু রচনাই ছন্দোবন্ধে আমাদের উপহার দিয়ে চলেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ তরুণ বয়স থেকেই শুধু সঙ্গীতপ্রিয়ই ছিলেন না, তাঁর মতো একজন সুধাকণ্ঠ সুগায়ক সেকালের ছাত্রদের মধ্যে খুব কমই ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্বয়ং

সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। তিনি নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে ভক্তিমূলক মাতৃনাম-গান শুনতে শুনতে অনেক সময় ভাবসমাধিতে নিমগ্ন হয়ে পড়তেন। স্বামীজী কেবল মাত্র একজন মধুকণ্ঠ সুগায়কই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী সঙ্গীত-সুরকার ও গীত-রচয়িতা। তিনি কত গান লিখতেন, সুর দিতেন। আবার পছন্দ না হলে নূতন করেও লিখতেন।

যেমন ধরুন, স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের একটি 'ভজন' রচনা করেছিলেন, প্রথমটা এই ভাবে :

"খণ্ডন-ভব-বন্ধন, বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ গুণময় ॥
নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত
মনোবচনৈকাধার,
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর
তুমি তমভঞ্জনহার।
ধে-ধে-ধে, লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ,
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ, আরতি তোমার ॥"

কিন্তু পরে এ ভজনটি ঠিক তাঁর মনের মতো হয়েছে বলে মনে হয়নি। 'শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক ভজন' আরও উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত মনে করে স্বামীজী গানটিতে আরও কিছু সংযোজন করলেন সংস্কৃত চম্পকাবলী ছন্দে :

"খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ, গুণময় ॥
মোচন-অঘদূষণ জগভূষণ, চিদ্‌ঘনকায়।
জ্ঞানাঞ্জন-বিমল-নয়ন বীক্ষণে মোহ যায় ॥
ভাস্বর ভাব-সাগর চির-উন্মদ প্রেম-পাথার।
ভক্তার্জন-যুগলচরণ, তারণ-ভব-পার ॥" ইত্যাদি।

'ভজনখানি' বেশ সুদীর্ঘ, তাই সবটুকু উদ্ধৃত করলাম না। এই অংশটুকু থেকেই বোঝা যাবে তাঁর বাংলা রচনার মধ্যেও সংস্কৃতের উপমা ও অনুপ্রাস প্রচুর। এবং শব্দের ধ্বনি-মাধুর্যের প্রতি এই সন্ন্যাসী কবির কত প্রবল আকর্ষণ ছিল! মঠের সন্ন্যাসীরা আজও মন্দিরে সন্ধ্যারতির সময় এই আরাত্রিক-ভজন নিত্য সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তি করেন। দূর থেকে শুনলে মনে হয় ঠিক যেন সংস্কৃত শ্লোক পাঠ হচ্ছে! স্বামীজী বীর সাধক হলে কি হবে, প্রাণ যে তাঁর কবির প্রাণ! কাজেই, ভগবৎ-পূজারী এই সন্ন্যাসী একজন বিশ্বমানব-পূজারী সাধকও ছিলেন। এঁর মধ্যে আমরা একাধারে পাই ভগবদ্‌ভক্ত, গুরুভক্ত, দেশভক্ত ও বাণীর ভক্ত এক বীর্যবান সাধক কবিকে, যাঁর কণ্ঠে বিরাজিত বাণী বিদ্যাদায়িনী বাগীশ্বরী স্বয়ং।

এই সন্ন্যাসী কবির স্বজাতিপ্রীতি ও স্বদেশ-বাৎসল্যের যেমন তুলনা মেলে না, তেমনি বন্ধু-প্রীতি ও ভক্তবৎসলতাও ছিল অতুলনীয়। সাধকগোষ্ঠীর প্রতি এঁর আকর্ষণ দেখা যায় অত্যন্ত আন্তরিক। কবিমাত্রেরই প্রকৃতি একটু কুসুমাদপি কোমল বলেই লোকের ধারণা, কিন্তু সেই কুসুমাদপি কোমলপ্রাণ কবির মধ্যেও যে বজ্রাদপি কঠোরপ্রাণ পুরুষ-সিংহও থাকতে পারে, তার প্রমাণ পাই আমরা এই বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের চরিত্রের মধ্যে।

কবি বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের কিশোর ছাত্র নরেন্দ্রনাথরূপেই সঙ্গীতচর্চা ও কাব্য-চর্চা শুরু করেছিলেন। তাঁর প্রথম দিকের বেশী কবিতাই ইংরেজীতে রচিত। ইংরেজী কাব্য ও সাহিত্যের তিনি সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ভগবান পরমহংসদেবের কৃপালাভের পরও স্বামীজী যখন ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ ও পৃথিবীর নানা স্থান পরিভ্রমণ করছিলেন, সেই সময় তাঁর সমস্ত ভাষণই তাঁকে ইংরেজী ভাষাতেই দিতে হয়েছিল। তাই স্বামীজীর বিপুল মূল্যবান রচনাসম্ভারও আমরা ইংরেজী ভাষাতেই পেয়েছি। সে তুলনায় তাঁর নিজের

বাংলা ভাষায় লেখার সংখ্যা অল্প। সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষাতে তাঁর রচনা খুবই কম।*

মাতৃভাষায় স্বামীজী যতই অল্প লিখে থাকুন না কেন, তারই মধ্যে কিন্তু এই দিব্য সাধকের কবি-প্রতিভা আশ্চর্য ঐশ্বর্য নিয়ে স্ফুরিত হয়ে উঠেছিল। এই সন্ন্যাসী কবি সাধারণতঃ তাঁর বক্তব্য চলতি ভাষায় রচনা করতেন। তখন 'সবুজ পত্রে'র অংকুরোদ্গমও হয়নি এবং প্রমথ চৌধুরী বা বীরবলের সাহিত্য-জীবনও একটা বিশিষ্ট রূপ পায়নি। স্বামীজীর চলতি ভাষার মধ্যে তাঁর নিজের আন্তরিকতার এমন একটা সবল প্রকাশ দেখা যায় যা তাঁর বীর সন্ন্যাসী আখ্যালাভের সার্থকতা ঘোষণা করে।

আজও বিশ্বের নানা প্রদেশে স্বামীজীর এমন বহু ভক্ত রয়েছেন, যাঁরা তাঁর নাম শোনবামাত্র ললাটে যুক্তকর তুলে সশ্রদ্ধ নমস্কার না জানিয়ে পারেন না। এই দিব্যপ্রাণ মহান কবির সকল প্রকার রচনার বিশদ পরিচয় দেওয়া ক্ষুদ্র এক প্রবন্ধের মধ্যে সম্ভব নয়। সুতরাং এই সন্ন্যাসী কবির ইংরেজী ও সংস্কৃত কবিতাগুলির আলোচনা না করে কেবলমাত্র তাঁর বাংলা কবিতা ও গান এবং হিন্দী পদাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এই সন্ন্যাসী কবির মহতী কাব্য-প্রতিভার সামান্য নিদর্শন উপস্থিত করবো।

সন্ন্যাসী কবি স্বামী বিবেকানন্দের রচনার মধ্যে বাংলায় একটি 'শিবসঙ্গীত' আছে। রচনাভঙ্গী সংস্কৃতঘেঁষা হ'লেও, ছন্দ তার বাংলা পয়ারের পর্যায়ে পড়ে। কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করছি। পড়লেই বুঝতে পারবেন।

* ইংরেজীতেও লিখেছেন তিনি কম; তাঁর বক্তৃতার শ্রুতি-লিখনই (সাংকেতিক-লিপিকার গুডউইন কর্তৃক গৃহীত) অধিক।—সঃ

"হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি।
যোগেশ্বর মহাদেব শিব পিনাকপাণি॥
ঊর্ধ্ব জলত জটাজাল, নাচত ব্যোমকেশ ভাল।
সপ্ত ভুবন ধরত তাল, টলমল অবনী॥"

এই শিবতুল্য শিবভক্ত কবির আরও একটি বাংলা শিব-সঙ্গীত শুনুন:

'তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা,
বম্ বব বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, দুলিছে
কপাল মাল।
গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উগরে অনল
ত্রিশূল রাজে,
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ জ্বলে শশাঙ্ক-ভাল।"

ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য যেমন বহু দেবদেবীর স্তবগান সহজ সরল সংস্কৃত ভাষায় সর্বজনবোধ্য করে রচনা করে গিয়েছেন, সন্ন্যাসী কবি স্বামী বিবেকানন্দও তেমনি একাধিক স্তব স্তুতি ও সঙ্গীত রচনা করে গিয়েছেন। আমরা অনেকেই হয়ত সে খবর রাখিনি।

দার্শনিকতত্ত্ব-সম্বলিত সঙ্গীত এই সন্ন্যাসী কবি একাধিক রচনা করে গিয়েছেন। কয়েক ছত্র এখানে তুলে দিচ্ছি:

"একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামি-
কাল-হীন,
দেশহীন, সর্বহীন, 'নেতি নেতি' বিরাম
যথায়॥
সেথা হ'তে বহে কারণ-ধারা,
ধরিয়ে বাসনা বেশ উজালা,
গরজি গরজি উঠে তার বারি—'অহমহমিতি'
সর্বক্ষণ॥"

'প্রলয়' বা 'গভীর সমাধি' সম্বন্ধেও স্বামীজী একটি অপূর্ব সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। সাধন-

সাম্রাজ্যের সুর-মণ্ডলে এ গানখানি অনুপম হয়ে থাকবে।

"নহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর॥
অস্ফুট মন-আকাশে, জগতসংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল ;
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি'—এই ধারা অনুক্ষণ॥
সে ধারাও বন্ধ হ'ল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌', বোঝে—প্রাণ
বোঝে যার॥"

এই সঙ্গীতগুলির অধিকাংশই প্রায় ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীত, যথাযোগ্য সুরসহ তানমানলয়ে গীত হয়। স্বামীজীর সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিতা 'সখার প্রতি' অনেকেরই প্রায় কণ্ঠস্থ হয়ে আছে। সুদীর্ঘ কবিতা। পাঠকদের স্মরণার্থ শেষ চার ছত্র এখানে উদ্ধৃত করছি :—

"ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা
খুঁজিছ ঈশ্বর ;
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন
সেবিছে ঈশ্বর।"

এমন সহজ সরল সত্য মৈত্রী ও করুণার মূর্ত অবতার বুদ্ধদেবের পর আর কোনও মহাপুরুষ বলতে পেরেছেন কিনা আমার জানা নেই। এটি যেন ঈশ্বরসন্ধানী মানুষের দিগ্‌দর্শন! ভগবদারাধনার বীজমন্ত্র! স্বামীজীর কঠোর সাধনলব্ধ জ্ঞান যেন কবিতার ছত্রে ছত্রে ব্যক্ত হয়েছে।

এই বীর সন্ন্যাসী কবির আর একটি প্রখ্যাত দার্শনিক কবিতার সঙ্গে আশা করি অনেকেরই পরিচয় আছে। সেটি হল শ্যামা-মার সংহার-মূর্তিতে নৃত্যলীলাবিষয়ক। অদ্ভুত রচনা। কবিতাটি সুদীর্ঘ। তবু, কিছু কিছু অংশ তুলে দেবার লোভ অজেয়।

"ভাঙ্গ বীণা—প্রেমসুধাপান,
মহা আকর্ষণ—দূর কর নারীমায়া।
আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান,
অশ্রুজলপান, প্রাণপণ, যাক্‌ কায়া॥
জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন,
শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে ?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর,
মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার,
সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান,
হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥"

সাধক কবি শুধু শ্যামাসঙ্গীতেই তৃপ্ত হননি। বৃন্দাবন-মনোহারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও কবির আকর্ষণ বড় কম ছিল না। মুরলীধারীর উদ্দেশেও একটি সুন্দর সঙ্গীত তিনি রচনা করেছিলেন দেখি অতি সরল সুমধুর হিন্দী ভাষায়। কয়েক ছত্রমাত্র তুলে দিচ্ছি এখানে :

"মুঝে বারি বনোয়ারী
সৈঁইয়া, যানেকো দে—
যানেকো দে রে সৈঁইয়া,
যানেকো দে (আজু ভালা)॥
মেরে বনোয়ারী,
বাঁদি তুহারি, ছোড়ে চতুরাই
সৈঁইয়া, যানেকো দে (আজু ভালা)
মেরে সৈঁইয়া!"

সন্ন্যাসী কবি যে সঙ্গীত রচনা করে গান করেন সে কার জন্য? কাকে শোনাতে? কবি নিজেই বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারিত একটি কবিতায় এর উত্তর দিয়েছেন, "গাই গীত শুনাতে তোমায়।" এটিও সুদীর্ঘ সুন্দর কবিতা, কয়েক

ছত্রমাত্র তুলে দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করবো—কিন্তু তার আগে কবির 'সাগর-বক্ষে' কবিতাটির কিছু পরিচয় না দিলে এই সাধক কবির প্রতি অবিচার করা হবে। 'সাগর-বক্ষে' কবি দেখেছেন—

"শ্বেত কৃষ্ণ বিবিধ বরণ—
তাহে তারতম্য তারল্যের
পীত ভানু মাঙ্গিছে বিদায়,
রাগচ্ছটা জলদ দেখায়।
বহে বায়ু আপনার মনে,

সমুদ্রবক্ষে যেতে যেতেও এই দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী কবি তাঁর জননী জন্মভূমিকে ভুলতে পারেননি। তাই দেখতে পাই 'সাগর-বক্ষে' কবিতার সমাপ্তি ঘটছে—

"নীচে সিন্ধু গায় নানা তান ;
মহীয়ান সে নহে, ভারত !
অম্বুরাশি বিখ্যাত তোমার ;
রূপরাগ হ'য়ে জলময়
গায় হেথা, না করে গর্জন ॥"

এইবার এই বীর সন্ন্যাসী কবির কাহিনী শেষ করছি। কিন্তু এ যেন সমুদ্রে পাদ্য-অর্ঘ্য দেওয়া হল। বিশদভাবে আলোচনা করবার অবকাশ নেই এ সময় আমার হাতে ; তাই তিলকাঞ্চনে শ্রদ্ধা নিবেদন করেই ক্ষান্ত হচ্ছি।

কবির এই "গাই গীত শুনাতে তোমায়"—বোধ করি সবাই আমার সঙ্গে স্বীকার করবেন যে বীর সন্ন্যাসী কবির সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা এটি। কয়েক ছত্রমাত্র তুলে দিয়ে উপসংহার টানাছ—কী গভীর সুদৃঢ় আত্ম-প্রত্যয় !

"আমি আদি কবি,
মম শক্তি বিকাশ-রচনা
জড় জীব আদি যত
আমি করি খেলা শক্তিরূপা মম মায়া সনে
একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ !

* * *

আমি আদি কবি,

* * *

মম আজ্ঞাবলে
বহে ঝঞ্ঝা পৃথিবী উপর,
গর্জে মেঘ, অশনি-নিনাদ,
মৃদুমন্দ মলয়-পবন
আসে যায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসরূপে
ঢালে শশী হিম করধারা,
তরুলতা করে আচ্ছাদন ধরাবপু
তোলে মুখ শিশিরমার্জিত
ফুল্ল ফুল রবি-পানে।"

ওঁ তৎ সৎ

ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ

প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পুণ্যভূমি ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। যুগে যুগে ভগবান মানবদেহ ধারণ করে যুগধর্ম-সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন ভারত-ভূমিতে। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের গূঢ় রহস্য নিহিত রয়েছে তাঁর তিনটি যুগধর্ম-স্থাপনে। প্রথমতঃ সকল ধর্মমতের সাধন করে শ্রীরামকৃষ্ণ সনাতন ভারতের অনন্ত সত্য প্রচার করলেন—মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সর্বপ্রকার অজ্ঞান থেকে মুক্তি,—এই মুক্তিপথের সন্ধান দিয়েছে ভারত ও ভারতেতর ধর্মমতসমূহ। অতএব 'যত মত তত পথ'—এই সত্যপ্রতিষ্ঠা শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসংস্থাপনের প্রথম পর্ব। দ্বিতীয়তঃ সকল জীবই ব্রহ্মের প্রকাশ। মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশই মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা—অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার করলেন—'এক বই দুই নাই। সচ্চিদানন্দই নানারূপ ধরে রয়েছেন। তিনিই জীবজগৎ সমস্ত হয়েছেন।' সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনায় সত্যের নবরূপায়ণ সম্ভব হলো - জীবসেবার মাধ্যমেই শিবলাভ। তৃতীয় যুগধর্ম প্রচারিত হলো সহধর্মিণীতে জগজ্জননীরূপে আরাধনায়। পুরাণের অমোঘ বাণী শ্রীরামকৃষ্ণ রূপায়িত করলেন স্বীয় সাধনায়—'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।' 'মাতৃজাতি' যে শক্তি-রূপিণী—সেই শক্তিকেই জগতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। সেই মহিমময় সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তরসাধক যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—'তাই এ অবতারে স্ত্রীগুরুগ্রহণ, নারীভাবসাধন, মাতৃভাবপ্রচার।' সর্বত্যাগী সাধক স্বীয় জীবনের প্রত্যক্ষ সাধনার ভেতর দিয়ে নরনারীর সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত করলেন অনন্তমাধুরী ও অবিনাশী পবিত্রতায়, ভোগৈক-লক্ষ্য জড়সভ্যতার কাছে রেখে গেলেন এক অপূর্ব জীবনাদর্শ।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভ করলেন, তিনিও শ্রীগুরুর ঐশী প্রেরণায় অনুভব করলেন—সমগ্র জীবজগৎ সেই অখণ্ড ব্রহ্মসত্তারই পূর্ণবিকাশ। অতএব জীবসেবার মধ্যেই মানুষের শিবত্ব বা দেবত্ব-লাভের উপায় নিহিত। এই সত্য বিবেকানন্দ-চেতনায় নবীনালোক সঞ্চার করলো। মানবের দেবশক্তির উদ্বোধনই হলো স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগের মূলরহস্য। যে মহাকালীকে, যুগের মহাশক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় সাধনবলে জাগ্রত করলেন সেই মহাশক্তির উদ্বোধক হবেন স্বামী বিবেকানন্দ যিনি ভাবী কালের কাছে আধ্যাত্মিক বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারিত করবার উপযুক্ত আধার।

শ্রীগুরুর মহাপ্রয়াণের পর ভারতের প্রাণপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ সারা ভারত পরিক্রমা করে অনুভব করলেন—ভারতের মানুষের মধ্যে প্রয়োজন শক্তিজাগরণ। নির্বীর্য, আত্মবিস্মৃত জাতির উদ্দেশ্যে ধ্বনিত হলো তাঁর উদাত্ত স্বর—"তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এই সব নারীমূর্তির অবমাননা করা।" যুগাচার্যের বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল—"আমার জীবনব্রত দু'টি—স্ত্রীজাতির ও ভারতের নিম্ন সম্প্রদায়ের যথার্থ উন্নতিসাধন।" উন্নয়নের অর্থই হলো আত্ম-

শক্তিতে বিশ্বাস-অর্জন। স্ত্রীশক্তির পুনরভ্যুত্থানের জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে এনেছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে প্রাচ্যভাবে তাঁকে দীক্ষিত করেছিলেন স্বামীজী। গুরুর শিক্ষাপ্রণালী শিষ্যার চরিত্রে অপূর্বভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। স্বামীজীর অনুভূতি—জগতে মহিমময় দেশ ভারতবর্ষ,—তার অত্যুজ্জ্বল গৌরবময় ধর্ম আর শিবময় জনগণ নিবেদিতার অন্তরে করলো গভীর রেখাপাত। স্বামীজী বুঝেছিলেন যে, নিবেদিতা প্রচণ্ড কর্মশক্তির অধিকারিণী, কিন্তু সে শক্তির রূপ শান্ত নয়। কুশলী গুরু ধীরে ধীরে নিবেদিতাকে শিক্ষিত করে তুললেন ভারতীয় ভাবাদর্শে। ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণপূর্বক নিবেদিতা স্বীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিতা হলেন। তাঁর জীবন-সুষমা প্রকাশ পেল ত্যাগ, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা ও অপরিসীম ভালবাসায়। প্রাচ্যের ভাবক্রোড়ে নিবেদিতার মানসসত্তা রূপান্তরিত হলো। মানসিক সকল সংগ্রামের ঊর্ধ্বে নৈর্ব্যক্তিক সাধনলব্ধ আনন্দলোকে যখন নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিতা তখন ভারতের ধূলিকণার প্রতি পর্যন্ত নিবেদিতার সপ্রেম দৃষ্টি। এই কালের মনোভাব প্রকাশ করে নিবেদিতা লিখছেন—"স্বামীজীর সান্নিধ্যে মানুষ তাহার জীবনের অনভিব্যক্ত মহৎ উদ্দেশ্য যেন স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইত এবং দেখিয়া উহাকে ভালবাসিতে শিখিত। আর দোষত্রুটিগুলির কালিমা অনেকটা মুছিয়া যাইত—মনে হইত জীবনের সম্যক্ বিকাশের জন্য ইহাদের সংঘটন যেন ঠিকই হইয়াছে। স্বামীজীর শিষ্যারূপে আমি যে জগতের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, তাহার সম্বন্ধে ক্রমলব্ধ অভিজ্ঞতা কতকটা পূর্বোক্ত ধরনের। এইরূপে প্রতিপদেই তাহারই ভাবরাজি দ্বারা পরিবৃত ও তাঁহারই প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আমি যেন দেবলোকের স্নিগ্ধ জ্যোতির মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলাম, যেখানে প্রত্যেক নরনারী তাহাদের স্বভাবের অপেক্ষা বড় হইয়া দেখা দিত।"

নিবেদিতার দৃষ্টিতে ভারতের শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্যই হলো আধ্যাত্মিক জাগরণ—এই জাগরণের অন্য নাম জাতীয়তা। ভারতে জাতীয়তার উদ্বোধনই ছিল নিবেদিতার জীবনব্রত। নিবেদিতার মতে—"জাতীয়তার (nationality) উপাদান হোল পৌরজীবন এবং ঐ জীবনের উপাদান হিসাবে ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ ও স্থায়িভাবে তার (পৌরজীবনের) সঙ্গে যুক্ত। যে ব্যক্তি গৃহপালিত পশুর গোচারণভূমি দখল করবার জন্য একটি অঙ্গুলি তুলেও গ্রামকে সাহায্য করে না, সে কখনও দেশের জন্য রক্তপাত ও মৃত্যুবরণ করবার মানুষ নয়। যে ব্যক্তি জাতির কল্যাণের জন্য সামান্য বিপদের ঝুঁকি বা অসুবিধা স্বীকার করতে অনিচ্ছুক, তার হাতে বিশ্বাস করে সৈনিকদলের পতাকা অর্পণ করা চলে না।"

ভারতের ইতিহাসপ্রসঙ্গে নিবেদিতা বলেছিলেন—"যে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে সে ভারতকে নবীন বলিয়া মনে করে—যৌবনসম্পন্না ভারতবর্ষ তার হৃদয়ে পাঁচহাজার বছরের স্মৃতি বহন করিয়া চলিয়াছে। সমগ্র জাতির মধ্যে বস্তুতঃ ভারতবর্ষ ব্রহ্মচারিণী—নবযৌবনা, বীর্যশালিনী—সংগ্রামের জন্য সদা প্রস্তুত। ভারত এশিয়ার হৃদয়স্বরূপ"।

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে নিবেদিতার উক্তি উল্লেখযোগ্য—"জগতের মধ্যে হিন্দুধর্মেরই সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সঙ্গতিপূর্ণ বিবৃদ্ধি ঘটেছে। * * *

হিন্দুধর্ম কেবলমাত্র হিন্দু আচারব্যবহারের রক্ষক নয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্ম হিন্দুচরিত্রের স্রষ্টা। হিন্দুধর্মের মতো আর কোন ধর্ম বৈপ্লবিক পরিবর্তন করতে পারে না।"

ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে নিবেদিতা আনতে চেয়েছিলেন এক বৈপ্লবিক চেতনা। তাঁর মতে অনুভূতির জাগরণই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। ভারতের অন্তর্নিহিত মর্মবাণী ও জাতীয় আদর্শ ত্যাগ ও সেবা—এই ভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়াই শিক্ষার প্রকৃত পরিণাম।

নিবেদিতা শিল্পী মনের দ্বারা অনুভব করেছিলেন যে, ভারতের শিল্পকলা অধ্যাত্ম-ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত। প্রখ্যাত শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুকে নিবেদিতাই ভারতীয় শিল্পসাধনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। নিবেদিতার অভিমত—"ভারত যে শিল্পের ব্যাপারে কেবল পুরাতন রীতিই অনুসরণ করবে এবং নতুনকে বুঝতে ও গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে তা হয় না। তথাপি ভারতীয় শিল্পরীতিতে ভারতীয় অনুষঙ্গের (association) মাধ্যমে ভারতবাসী উৎকর্ষ-লাভ করতে শিখেছে, সেখানে ইতালীয় অথবা গ্রীসদেশীয় রীতি বা অনুষঙ্গের মাধ্যমে কিছু উপস্থাপিত করার প্রয়াস একান্তই নিষ্ফল। যদি কোন ভারতীয় চিত্রকে প্রকৃত ভারতীয় এবং মহৎ সৃষ্টি হতে হয় তাহলে তাকে ভারতীয় রীতিতে ভারতবাসীর হৃদয়ে আবেদন করতে হবে, তাকে এমন ভাব বা ধারণার ব্যঞ্জনা দিতে হবে যা এদেশীয় সকলের পরিচিত কিংবা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধির যোগ্য। সত্যকারের অতি উচ্চ স্তরের সৃষ্টি হতে গেলে তাকে দর্শকমনে এমন দিব্যানুভূতি বহন করতে হবে যার ফলে সে নিজেকে উন্নততর বলে মনে করবে। কিন্তু একথা স্পষ্ট যে, এই উদ্দেশ্যে শিল্পটিকে এমন সব উপাদান দিয়ে রচনা করা প্রয়োজন যা হবে জাতীয়রুচিসম্মত। * * * চিত্রের উপাদান ভাষারই মতো; যেমন কোন সত্য কবি তাঁর সকল কবিতা বিদেশী ভাষার মাধ্যমে রচনার কথা ভাবেন না, তেমনি কোন শিল্পীও তাঁর কালজয়ী সৃষ্টিকে এমন রীতিতে অঙ্কিত করেন না, যা জনসাধারণের বোধগম্য নয়। যে কোন মহৎ অভিব্যক্তি—রচনা, অঙ্কন বা ভাস্কর্য বা ঐ জাতীয় যা কিছু মানুষের হৃদয়ের নিকট সহানুভূতি লাভের জন্য আবেদনস্বরূপ, মানুষ তা কখনও অজানা ভাষায় আবেদন করেন না।"

সমগ্র ভারতের অখণ্ড সত্তার গভীরে নিবেদিতা দেখেছিলেন এক মহাশক্তির জাগরণ। এই শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার সাধনায় তিনি সর্বস্ব সমর্পণ করেছিলেন। অতএব ভারতবর্ষ ও জগন্মাতা নিবেদিতার ধ্যাননেত্রে অধিকার করেছিল এক অভিন্ন স্থান। দেশমাতৃকা ও জগজ্জননীর অদ্বয়রূপের কল্পনা নিবেদিতার নিকট এইরূপ ছিল—" 'মা' এই মহান শব্দের দ্বারা ভারতবর্ষে কোন্ চিন্তাটির এত উচ্চভাবের অভিব্যক্তি হয়? এ কি সেই ভালবাসারই কল্পনা নয়—যা কোনদিনও অধিকারের দাবী রাখে না, যে কেবল ভালবেসেই তৃপ্ত, যে ভালবাসা প্রতিদানের অপেক্ষা না করে কেবল দিয়ে যায়, যার জ্যোতি আমরা স্বপ্নেও চিন্তা করতে অক্ষম—কিন্তু যার আলোকে আমরা অভিসিঞ্চিত হই এবং যা চিরদিনের সূর্যালোকের মতো আমাদের চারিদিকে পরিব্যাপ্ত করে রাখে। তথাপি মাতৃত্বের ন্যায় এমন বলিষ্ঠ আর কোন আদর্শ আছে কি যা কোন প্রকার আত্ম-সংযমের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়নি?

সন্তানের নিকট প্রাপ্ত এই দুর্লভ পূজার জন্য কোন্ মূল্য হিন্দু রমণীকে দিতে হয়? * * * প্রকৃতপক্ষে মাতৃপূজার অর্থ পবিত্রতা ও নিষ্ঠার পূজা।"

নিবেদিতার মুখে উচ্চারিত হয়েছিল—"আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড, অবিভাজ্য। এক আবাস, এক স্বার্থ ও এক সম্প্রীতির উপরেই জাতীয় ঐক্য গঠিত। আমি বিশ্বাস করি বেদ ও উপনিষদের বাণীতে ধর্ম ও সাম্রাজ্যসমূহের সংগঠনে, মনীষিবৃন্দের বিদ্যাচর্চায় ও মহাপুরুষের ধ্যানে যে শক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই আর একবার আমাদের মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছে এবং আজিকার দিনে উহারই নাম জাতীয়তা।"

ভারতমাতার বেদীমূলে যিনি নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করে 'নিবেদিতা' নাম সার্থক করেছিলেন তাঁকে আমরা জানাই আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাবিনম্র অজস্র ভক্তিপ্রণতি এবং প্রার্থনা করি তাঁরই পাদপীঠতলে বসে যেন আমরা দেশমাতৃকাকে ভালবাসার অক্ষয় মন্ত্র লাভ করি।

স্বামীজী

শ্রীশান্তশীল দাশ

বেদান্তের পূর্ণমূর্তি ; ভাস্বর জীবন :
সংসারবিরাগী নহ ; 'জীবে'র মাঝারে
দেখেছ তোমার 'শিবে', যে-দৃষ্টি দিলেন
তোমায় শ্রীরামকৃষ্ণ, সেই দৃষ্টি নিয়ে
নর-নারায়ণে তুমি করে গেলে সেবা,
আর সেই সেবামন্ত্র দিলে জনে জনে ;
জানালে, দেবতা নেই দূরে বহু দূরে,
লোকালয় হতে দূর নভোচারী হয়ে।
যেখানে মানুষ কাঁদে নানা দুঃখ সয়ে
সেইখানে ব্যথাহত মানুষের মাঝে
রয়েছেন সে-দেবতা, মানবমন্দিরে
অধিষ্ঠান যাঁর নিত্য, সেই মানুষেরে
সেবা কর ; সে-সেবায় তুষ্ট ভগবান :
অভিনব পূজারীতি শিখালে হে যোগী।

মধু বাতা ঋতায়তে

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

ঋগ্বেদের ঋষি 'মধু বাতা ঋতায়তে' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রে শান্ত হৃদয়ে বিশ্বপ্রকৃতির সর্ব স্তরে নিবিড় একটি মাধুর্য উপলব্ধি করিতেছেন, চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সকল কেন্দ্র হইতে সামঞ্জস্য ও শান্তির আবাহন করিতেছেন। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৯০ সূক্তের ৬, ৭, ৮ সংখ্যক মন্ত্র—বড় কবিত্বময় ভাষা, একটি গভীর উদার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি মন্ত্রগুলিতে অভিব্যঞ্জিত।

মধু বাতা ঋতায়তে। যজ্ঞের সুফল ঘোষণা করিবার জন্য যেন আজ সমীরণ মৃদুমন্দ বহিয়া দিকে দিকে আনন্দ বিকীর্ণ করিতেছে। বাতাসের স্পর্শে আজ এক নূতন মাধুরী অনুভূত হইতেছে। স্বচ্ছ মনে আজ বায়ুর অন্তর্গূঢ় আধ্যাত্মিক সত্য প্রতিবিম্বিত। তাই বায়ু আজ শুধু ভৌতিক বায়ু নয়, উহা প্রাণস্পন্দনের প্রতীক, চৈতন্য-সত্তার নির্দেশক।

মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। নদীর প্রবাহে, সিন্ধুর ঊর্মিভঙ্গে মধু ঝরিয়া পড়িতেছে। প্রকৃতির প্রত্যেকটি ঘটনার দুটি দিক আছে। একটি বাহিরের, অপরটি ভিতরের। ইন্দ্রিয় এবং মন দিয়া আমরা বাহিরের অভিব্যক্তিটি অনুভব করি। ভিতরের সত্যটি অনুভব করিতে গেলে আর একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টি অনুশীলন করিতে হয়। আমাদের দৃষ্টি যখন বিক্ষিপ্ত, মন যখন চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে তখন আমরা সব কিছুকে খণ্ড খণ্ড ভাবে উপলব্ধি করি, বিশ্বসংসারের সকল অভিব্যক্তি যে নিবিড় সাম্যে অধিশ্রিত সে সাম্য তখন আমাদের বোধকে এড়াইয়া যায়। কিন্তু যদি কখনও সৌভাগ্যক্রমে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি কথঞ্চিৎ শান্ত থাকে, মনের চঞ্চলতা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা হইলে আমাদের চোখ জগতের বস্তু ও ঘটনানিচয়কে ভিন্ন ভাবে দেখিতে পায়। দেখিতে পায় যে সংসারের অজস্র ভিন্নতার মধ্যেও একটি নিগূঢ় ঐক্য সর্বক্ষণেই বিরাজ করিতেছে, অসংখ্য দুঃখ ও তিক্ততা সত্ত্বেও ভগবান এখানে আনন্দ ও মাধুর্য প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত রাখিয়াছেন। মানুষ ইচ্ছা করিলে সে আনন্দ লুটিয়া লইতে পারে, হৃদয় মধু দিয়া যত খুশি ভরিয়া লইতে পারে। তটিনীর কুলকুল স্রোতে, সাগরের বুকে তরঙ্গের নৃত্যে ঋষি এই আনন্দের ঘোষণা দেখিতে পাইয়াছেন।

মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন, তৃণলতা শস্যাদি আমাদের নিকট মধুময় হউক, অর্থাৎ আমাদের পুষ্টি ও আনন্দবর্ধন করুক। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ আছে। সচরাচর আমরা উহা ধরিতে পারি না। আমরা মনে করি উদ্ভিদজগৎ মানুষের ভোগের জন্যই সৃষ্ট; মানুষ ভোক্তা, উদ্ভিদ ভোগ্য; মানুষ খাদক, উদ্ভিদ খাদ্য। এই দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা উদ্ভিদ হইতে আমরা স্থূল ভোগ আহরণ করিতে পারি কিন্তু যথার্থ পুষ্টি, বীর্য ও মেধা আমাদের দেহমনে সঞ্চিত হয় না উহার জন্য দরকার তৃণলতাশস্যাদির সহিত একটি প্রীতি- ও মৈত্রী-অভ্যাস। বস্তুতঃ উদ্ভিদ ও মানুষ একই সত্যে দাঁড়াইয়া আছে। সেই সত্যকে স্মরণ রাখিয়া উদ্ভিদের সহিত লেনদেন করিতে পারিলে উদ্ভিদ আমাদের নিকট মধুর ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে। সবুজ শস্যক্ষেত্রের দিকে তাকাইয়া ফলভারাবনত গাছ-

গুলির তলে দাঁড়াইয়া উহাদের প্রাণবিলাস অনুভব কর। যে প্রাণশক্তি উহাদের লতায় পাতায় ফুলে ফলে অভিব্যক্ত হইতেছে, সেই প্রাণশক্তিকে হৃদয়ের ভালবাসা দিয়া নিজের দেহমনে আবাহন কর। যদি এইরূপ করিতে পার তাহা হইলে লতার প্রাণ-ভঙ্গিমা, পত্রের সবুজ শোভা, পুষ্পের সৌরভ ও বর্ণসুষমা এবং ফলের স্বাদুতা তোমাতে সংক্রমিত হইবে। এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি হইতেই ঋষি বলিতেছেন, মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।

মধু নক্তমুতোষসঃ। রাত্রি মধু হউক, প্রাতঃকাল মধু হউক। বেদের ঋষি অনুভব করিয়াছিলেন কালের নৃত্যভঙ্গ একটি কালাতীত মহিমার পটভূমিকায় পরিনিষ্পন্ন হইতেছে। এ কথা সত্য যে, ক্ষণ, নিমিষ, মুহূর্ত, দিবা, পক্ষ, মাস, সংবৎসর প্রভৃতি কালখণ্ডগুলি অপ্রতিহত বেগে ছুটিয়া চলিতেছে। উহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাল দিয়া চলিয়াছে মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, জয়-পরাজয়। এই কাল ও ঘটনাবলীর দ্রুত সংক্রমণের নামই সংসার। যে মুহূর্তে আমরা জন্মাই তখন হইতেই আমরা সংসারে বাঁধা পড়ি। অন্তিম নিঃশ্বাস-ত্যাগ পর্যন্ত আমাদিগকে কাল ও ঘটনার সহিত সংযুক্ত থাকিতে হয়। পুনর্জন্মে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয় যে, এই সংযোগ পূর্ব পূর্ব জন্মেও আমাদের ঘটিয়াছে এবং মৃত্যুর পরেও বার বার ঘটিবে। আমাদের কালবদ্ধতার আদি নাই, অন্তও বোধকরি আপাতদৃষ্টিতে নাই। তথাপি আমাদের জীবনে কালবশ্যতা মানুষের সমগ্র সত্যকে প্রকাশ করে না। তত্ত্বজ্ঞ ঋষি দেখিয়াছেন যে, মানুষ কালচক্রে ঘুরিলেও তাহার জীবনের একটি বৃহৎ ভাগ কালের ঊর্ধ্বে দাঁড়াইয়া আছে। উহাই মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তা। ঐ সত্তার প্রত্যক্ষ পরিচয় যখন মানুষ পায় তখন সে কালজয়ী হয়। মৃত্যু আর তখন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। নিত্য পরিবর্তনশীলের মধ্যে চির অপরিবর্তনীয়কে দেখিয়া সে আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া যায়। প্রত্যেকটি দিন তখন হয় সার্থকতায় পূর্ণ, প্রত্যেকটি রাত্রি তখন ভরিয়া যায় মধুঝরা সঙ্গীতে। কালপ্রবাহের পারে যে কালাতীত আনন্দ-উৎসব রহিয়াছে উহাকে স্মরণ করিয়াই ঋষি বলিতেছেন, মধু নক্তমুতোষসঃ। মধু—অর্থাৎ অপার্থিব শান্তিস্পর্শ দিয়া দিনের আরম্ভ হউক, মধু দিয়া দিনের শেষ হউক, আবার রাত্রিতেও যেন মধুস্পন্দনের বিরতি না ঘটে।

মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥

মাতা পৃথিবীর ধূলি মধুময় হউক; পিতৃতুল্য স্বর্গলোক হইতে মধু বর্ষিত হউক। পৃথিবীর ধূলি যদি মধুময় হয় তাহা হইলে পৃথিবীপৃষ্ঠের কোন কিছু কি তিক্ত থাকিতে পারে? ভূলোক-দ্যুলোক ব্যাপিয়া আনন্দের পরিবিস্তার। কালো আর কিছু নাই, সকলই আলো। কুৎসিত আর কিছু নাই, সকলই সুন্দর। ঘৃণা লজ্জায় মুখ লুকাইয়াছে। হীন স্বার্থ দূরে পলায়ন করিয়াছে। সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা চিরতরে নির্বাসিত। ধরণী হইতে উঠিয়া জ্যোতির্বর্ত্ম ঊর্ধ্বগগনে গিয়া ঠেকিয়াছে। সেই রাস্তা ধরিয়া পৃথিবীতে স্বর্গ নামিয়া আসিয়াছে। বৈদিক ঋষির অনুভবকে অনুসরণ করিয়া সুফী মরমিয়া জাফর গাহিয়াছেন—

অর্শসে লেকর ফর্শ জমীন তক্,
ঔর জমীন সে অর্শ বরী তক্।
জহাঁ মৈঁনে দেখা তুঁহী নজর আয়া,
জো কুছ হায় সো তুঁহী হায়॥

বাঙলার বাউলও ধুয়া ধরিয়াছেন—

প্রেমিকের চালটা বেয়াড়া,
কিছু বেদবিধি ছাড়া
আঁধার কোলে চাঁদ গেলেও
তার মুখে নাই সাড়া,
(আবার) চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হলেও
আসমানেতে বানায় ঘর।
প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর ॥

মধুমান্নো বনস্পতিঃ মধুমাং অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥

বনস্পতি আমাদের নিকট মধুমান্ হউক। সূর্যের কিরণ আমাদের দেহমনঃপ্রাণে মধু সঞ্চার করুক। দিঙ্‌মণ্ডল অথবা ধেনুসমূহ আমাদের দিক অভয় ও পুষ্টি।

ঋষি শান্তি, সামঞ্জস্য, শক্তি ও আনন্দের উৎসে পৌছিয়াছেন বলিয়া তাঁহার দৃষ্টি বদলাইয়া গিয়াছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ তাঁহার নিকট কোনও মোহ, আসক্তি, ভয় এবং বন্ধন আনিতেছে না। উহারা তাঁহার চিত্তে শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ চিরমুক্ত চৈতন্যসত্তার স্পর্শ দিয়া যাইতেছে। মধু বাতা ঋতায়তে প্রভৃতি মন্ত্রত্রয়ে ঋষির স্বাত্মানুভূতির সামান্য কিছু পরিচয় আমরা পাই। সম্পূর্ণ পরিচয় তো পাওয়া সম্ভবপর নয়। সম্পূর্ণ পরিচয় কি বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা চলে? যেখানে সম্পূর্ণ পরিচয় সেখানে বাক্য থামিয়া যায়, মনও সেখানে নিশ্চল।

'মধু বাতা ঋতায়তে' মন্ত্রত্রয়ে ঋষি মানুষকে ডাকিয়া বলিতে চাহিতেছেন, বিশ্বপ্রকৃতির গভীরে একটি অব্যাহত শান্তি, শক্তি ও সমতা রহিয়াছে। চন্দ্র সূর্য তারকা আকাশ বাতাস তটিনী সাগর প্রান্তর পর্বত পশু পক্ষী—সব কিছু একটি অসীম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, জ্ঞানঘন, আনন্দঘন সত্যের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। মানুষও দাঁড়াইয়া আছে ঐ জন্মহীন ক্ষয়হীন অনন্ত সত্যে। মানুষ যদি যথার্থ শক্তি, অভয়, শান্তি ও আনন্দ চায় তাহা হইলে তাহাকে বাহির ধরিয়া ভিতরে যাইতে হইবে। ঐ সত্যকে আবিষ্কার না করিলে মানুষের দুঃখের অবসান নাই। ঐ সত্যকে জানিতে পারিলে জগৎ-সংসার মধুময় হইয়া যায়, সকল বন্ধন, সকল অন্ধকার কাটিয়া যায়। তখন সর্ব বস্তু হইতে, সকল দিক হইতে মধুর স্রোত প্রবাহিত হয়।

মধু বাতা ঋতায়তে। বায়ুর প্রবাহ মধুর। কিন্তু বায়ু শুধু বাহিরের বায়ু নয়। স্পন্দনশীল সূক্ষ্মতর নানা বস্তুকেও আমাদের শাস্ত্রে বায়ু বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আমাদের মনকে আমরা দ্রুতগতি অসংখ্য চিন্তা, সঙ্কল্প, ইচ্ছা ও আবেগরাশির নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ বলিয়া দেখিতে পাই। অতএব মনকে বায়ুর সহিত তুলনা করা সমীচীনই। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে মনঃসংযমের প্রসঙ্গে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্। বায়ুকে আয়ত্ত করা যেমন কঠিন, সদা-চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা সেইরূপই দুষ্কর। সত্য কথা, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ঋষি অনুভব করিয়াছেন-মধু বাতা ঋতায়তে। বহু দুঃখ, বহু ভয়-মোহ-শোক আনিয়া যে মন-বায়ু আমাদিগকে সাধারণতঃ বিপর্যস্ত করে উহা একদিন শান্ত হইতে পারে। উহার প্রবাহে ব্যথা-বিক্ষোভের পরিবর্তে একদিন মধু ঝরিতে পারে। সেই শুভদিন যখন আসে তখন আমাদের মন দেখিয়া আমরা নিজেরাই মুগ্ধ হই। কী পবিত্রতা, কী উদারতা, কী সন্তোষ অভয় ও অনাসক্তি, কী জ্ঞান ও প্রেম, কী সমদৃষ্টি, কী প্রশান্তি! পুরাতন মানুষটি যেন একেবারেই মরিয়া গিয়াছে, মানুষের দেহে জ্যোতির্ময় সর্বশুক্র এক দেবতা বাস করিতেছেন।

ভগবান শঙ্করাচার্য তাঁহার 'ধন্যাষ্টকে' বলিতেছেন,—সর্বাবস্থিতিরস্য বস্তুবিষয়া। সে মন যে ভাবেই অবস্থান করুক উহা ব্রহ্মকেই অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়। কেনোপনিষদের ঋষি শুনাইয়া রাখিয়াছেন—প্রতিবোধবিদিতম্—মনের প্রত্যেকটি বৃত্তিতে সত্যের জ্ঞান প্রতিভাত হয়।

মধু বাতা ঋতায়তে। বাতা—বাহিরের বায়ু, প্রাণবায়ু মন-বায়ু, আবার অখিল ঘটনাস্রোত—সারা বিশ্বপ্রপঞ্চ। বিশ্বসংসারকে ঈশোপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—যাহা কিছু অনবরত ছুটিতেছে, বদলাইতেছে, তিরোহিত হইতেছে। বাহিরের বায়ুতে যে বৈশিষ্ট্য দেখিয়াছি, প্রাণবায়ুতে এবং মন-বায়ুতে যাহা লক্ষ্য করিয়াছি, বিশ্বজগতেও উহা দেখিতে পাইতেছি—স্পন্দন, প্রবাহ। অতএব সংসারকেও বায়ু বলা বলে। যতদিন আমাদের তত্ত্বদৃষ্টি আসে নাই ততদিন সংসার শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় সং—সার, সং-এর ব্যাপার মাত্র। কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে আমাদের তৃতীয় নয়ন যখন খুলিয়া যায় তখন বৈদিক ঋষির ন্যায় আমরাও উপলব্ধি করি—মধু বাতা ঋতায়তে। বাতা—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল ঘটনাবলী মধু বিকীর্ণ করিতেছে। কোথাও কিছু অসামঞ্জস্য নাই, ত্রুটি নাই, হানি নাই। জন্মের হাত ধরিয়া মৃত্যু কী সুন্দর তালে তালে নাচিতেছে, আলোকের সহিত আঁধার মিশিয়া কী অপরূপ বিশ্বপট সৃষ্ট হইয়াছে, কান্নাও হাসিতে মিলিয়া কী অনবদ্য সঙ্গীত বাজিয়া উঠিতেছে!

বেদবাণী আশা ও আনন্দের বাণী। মানুষ অমৃতের সন্তান। জগৎ ব্রহ্মময়। পরিবর্তন অপরিবর্তনীয়ে আশ্রিত। বন্ধন মুক্তিরই নির্দেশক। মানুষ জীবন ও জগতের পরম সত্যকে চিনিয়া, ভালবাসিয়া, ধরিয়া মধুর আস্বাদ করুক, বিশোক বিমোহ বিমৃত্যু হউক—ইহাই বেদের ঋষির একতান প্রার্থনা।

'অ্যাপোলো-৮' মহাকাশযানে চন্দ্রপ্রদক্ষিণ

বিজ্ঞানভিক্ষু

পথের বাধা

আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তা দিনে একবার করে নিজের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। বছরে একবার করে সে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।

পৃথিবী তার সূর্যপ্রদক্ষিণের পথে আমাদের চাঁদকেও সঙ্গে নিয়ে চলে। পৃথিবী যেমন সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, চাঁদ তেমনি ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে। পৃথিবী গ্রহ, চাঁদ উপগ্রহ। চাঁদ আবার নিজের চারদিকেও ঘোরে। কিন্তু এতে তার সময় লাগে ২৯½ দিন। পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতেও তার ২৯½ দিনই লাগে; তাই চাঁদের একটা দিকই আমরা দেখতে পাই, অপর দিকটি কোন দিনই নজরে পড়ে না।

পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ২,৩৩,৮১৪ মাইল। চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী সবই গোলাকার। পৃথিবীর ব্যাস ৮,০০০ মাইল, চাঁদের ব্যাস ২,১৬৩ মাইল।

পৃথিবীর চারদিকে (ভূপৃষ্ঠ থেকে দেড়শো মাইল পর্যন্ত) বায়ুমণ্ডল ঘিরে আছে; তার

ভেতর পৃথিবীপৃষ্ঠসংলগ্ন ৫০ মাইল ঘন স্তর, বাকীটা খুবই হাল্কা। তারপর আরো চারশো মাইল অতি হালকা গ্যাস থাকলেও কার্যতঃ তা শূন্যেরই মত। তারপর মহাশূন্য। চাঁদের চারদিকে পৃথিবীর মত বায়ুমণ্ডল বা অন্য কোন বাষ্পীয় মণ্ডল নেই।

পৃথিবী থেকে চাঁদের কাছে পৌঁছুতে চাইলে তাই ২,৩৩,৮১৪ মাইল রাস্তার মাত্র ১৫০ মাইল বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে তারপর মহাশূন্যপথেই যেতে হবে। অর্থাৎ পথে যে-কদিন থাকা হবে, সে-কদিনের জল, খাবার এসব তো চাই-ই, সেইসঙ্গে শ্বাসগ্রহণের জন্য যথেষ্ট অক্সিজেনও সঙ্গে নিতে হবে। তাছাড়া যাবার পথে মানুষের দেহের ওপর চাপও যাতে পৃথিবীতে থাকার সময়কার মতই থাকে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। পৃথিবীতে থাকার সময় সমগ্র বায়ুমণ্ডলের চাপ আমাদের দেহের ওপর পড়ে; এই চাপের ভেতর সর্বক্ষণ বাস করার উপযোগী করেই আমাদের দেহযন্ত্র নির্মিত। বায়ুমণ্ডলের মধ্যেও যত ওপরে ওঠা যাবে, এই চাপ তত কমে আসবে। মহাশূন্যে একেবারেই থাকবে না। কৃত্রিম চাপের ব্যবস্থা না থাকলে দেহযন্ত্র বিকল হয়ে যাবে।

মহাশূন্যে সূর্যের তাপও পৃথিবীপৃষ্ঠের চেয়ে অনেক বেশী লাগে। সূর্যকিরণ যেদিকে পড়ে না, সেদিকে ঠাণ্ডাও লাগে অনেক বেশী। আরো অনেক বাধা পথে, মহাশূন্যে কত রকমের রশ্মি বিকীর্ণ হচ্ছে; সেগুলির হাত থেকে বাঁচার ব্যবস্থাও থাকা চাই।

আর, সবচেয়ে বড় কথা, পৃথিবীর টান বা অভিকর্ষ ছাড়িয়ে চলে যাবার মত শক্তিমান যান তৈরী করতে হবে। মহাকাশপথে যানটি চলার সময় তার গতিনিয়ন্ত্রণ নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করতে হবে, যানটিকে আবার ফিরিয়েও আনতে হবে পৃথিবীতে।

চাঁদে মানুষ যাবার পথে এত বাধা, কিন্তু মানুষ সে-সব বাধা জয় করে সম্প্রতি চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে ফিরে এসেছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির এবং মানুষের সাহসের এ এক যুগান্তকারী বিজয়ের ইতিহাস। চাঁদ ও পৃথিবী কোনটিই স্থির নয়। দুরকমের গতি আছে প্রত্যেকেরই। কাজেই পৃথিবীর ওপর দূর থেকে কোন লক্ষ্য বেধ করার নিপুণতা, আর পৃথিবী থেকে চাঁদে তা করার নিপুণতায় পার্থক্য প্রচুর। পৃথিবী থেকে উৎক্ষিপ্ত রকেট যেদিন চাঁদের বুকে প্রথম আছড়ে পড়েছিল এবং পূর্ব-নির্ধারিত স্থানের কাছাকাছিই, সেদিন তাই একজন মন্তব্য করেছিলেন: '৬ মাইল দূরে একটি মাছি বসে আছে; এত দূর থেকে একটি খুব সরু সূচ ছুঁড়ে তার চোখ বিদ্ধ করতে হলে যে নিপুণতার প্রয়োজন, এ নিপুণতা তার চেয়েও বেশী।'

প্রস্তুতি

মানুষের মহাকাশ-অভিযানের স্বপ্নকে বাস্তব করে তোলার সূচনা হল ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর; এইদিন রাশিয়া মহাকাশে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপ করে। এটি ৯০ মিনিটে একবার করে পৃথিবীকে পরিক্রমা করতে থাকে। পরিক্রমা-পথে পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব ছিল সর্বনিম্ন ১৪০ মাইল, এবং সর্বোচ্চ ৫৬০ মাইল।

কৃত্রিম উপগ্রহটিকে এত উঁচুতে তোলা এবং পৃথিবীর কক্ষপথে তার গতিপথ ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল রকেটের সাহায্যে। রকেট হল, আমরা আকাশে যে হাউই ছুঁড়ি,

তারই অতি-উন্নত সংস্করণ। এই রকেটের সাহায্যে সাফল্যের সহিত প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ-উৎক্ষেপ ও তার নিয়ন্ত্রণ মহাকাশ-অভিযানের বিপুল সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিল। আকাশে যে পাখী উড়ে বেড়ায়, প্রপেলার-চালিত এরোপ্লেন চলে, তা পৃথিবীর ওপর বায়ুমণ্ডল আছে বলেই সম্ভব হয়; যেমন জলে আমরা হাত দিয়ে জল টেনে সাঁতার কাটি, দাঁড় বা প্রপেলার দিয়ে জল টেনে নৌকা বা জাহাজ চালাই, অনেকটা সেই ধরনের। কিন্তু যেখানে বাতাস নেই, সেখানে প্রপেলার ঘোরালেও এরোপ্লেন চলবে না। কিন্তু রকেট বা রকেট চালিত যান চলবে; রকেট চালু হওয়া মাত্র তার ভিতরে গ্যাস সৃষ্ট হয়ে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করে, এবং তার পিছনদিক থেকে প্রচণ্ড বেগে সে গ্যাস বেরিয়ে আসে; এরই প্রতিক্রিয়া রকেটটিকে সামনের দিকে ঠেলে দেয়; বায়ুমণ্ডল থাকা-না থাকার সঙ্গে এই গতিসৃষ্টির কোন সম্পর্ক নেই। তাই মহাশূন্যেও রকেট ছুটতে পারে। এই প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ-উৎক্ষেপের পর আরো বহু উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হয়েছে; আমেরিকাও এই অভিযানে যোগদান করে। আমেরিকা থেকে প্রথম উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের জানুআরি মাসে।

এভাবে উৎক্ষেপণের শক্তি ও দক্ষতা ক্রমে বাড়তেই থাকে। মহাকাশ সম্বন্ধে মানুষের বহু অজানা বিষয়ের জ্ঞানও আহরিত হতে থাকে এই সব উপগ্রহের সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত যন্ত্রপাতি থেকে প্রেরিত সংবাদের মাধ্যমে। পৃথিবীর অভিকর্ষের বাইরে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া থেকে 'লুনিক-১' যন্ত্রপাতিসহ প্রথম উৎক্ষিপ্ত হয়; ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার 'লুনিক-৩' চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে কাছ থেকে চাঁদের (চাঁদের যে দিকটি আমরা দেখতে পাই না তারও) ফটো তুলে পাঠায়। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের জানুআরিতে রাশিয়ার 'লুনা-৯' এবং ঐ বৎসরেরই জুন মাসে আমেরিকার 'সার্ভেয়ার-১' চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে।

এভাবে মহাকাশ এবং চাঁদের অনেক অজানা তথ্য সংগৃহীত হয়। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উৎক্ষিপ্ত যন্ত্রগুলিকে বেতারতরঙ্গের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার এবং সেগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার দক্ষতাও বিপুলভাবে উন্নত হতে থাকে। এই দক্ষতা এখন এত উন্নত হয়েছে যে, পৃথিবী থেকে যন্ত্রপাতি সহ মঙ্গল ও শুক্রগ্রহের খুব কাছে কৃত্রিম গ্রহ পাঠিয়ে, পৃথিবী থেকে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে নিকট থেকে গ্রহ দুটির ফটো তুলে আনা হয়েছে।

মানুষকে চাঁদের কাছে পাঠাতে হলে আরো যেসব প্রস্তুতি এবং মহাকাশযান ও তার নিয়ন্ত্রণের উন্নতির প্রয়োজন, তাও ইতোমধ্যে হয়ে গেছে; মানুষ মহাকাশযানে চড়ে মহাকাশে ওঠেছেও বহু বার।

মানুষের মহাকাশ অভিযান

মানুষ মহাকাশযানে প্রথম আকাশে ওঠে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল; রাশিয়ার 'ভস্টক-১' মহাকাশযানে গাগারিন ওপরে উঠে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে ১ঘণ্টা ৪৮ মিনিট পরে নেমে আসেন। তারপর ১৭ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন রাশিয়ার টিটভ, 'ভস্টক-২' যানে; এই বৎসরই ৬ই আগস্ট তিনি ওঠেন এবং ২৫ ঘণ্টা ১৮ মিনিট পরে ৭ই আগস্ট পৃথিবীতে নেমে আসেন। আমেরিকা থেকে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের

৫ই মে শেপার্ড এবং ২১শে জুলাই গ্রিসম মহাকাশে উঠলেও পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারেননি, যথাক্রমে ১৫ মিনিট ও ১৬ মিনিট আকাশে থেকে অবতরণ করেছিলেন। আমেরিকা থেকে প্রথমে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন গ্লেন, ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুআরি। তিনি ৪ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট মহাকাশে থেকে তিনবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিলেন। এভাবে 'অ্যাপোলো-৮'-এ চড়ে চন্দ্রপ্রদক্ষিণ করতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ৩৩ জন মহাকাশচারী (আঃ ২১, রাঃ ১২ জন) মহাকাশে ওঠেছেন ২৭টি অভিযানে (আমেরিকা ১৭, রাশিয়া ১০)। এঁদের মধ্যে আমেরিকার ৬ জন মহাকাশচারী দুবার এবং ১ জন তিনবার উঠেছিলেন। রাশিয়ার একজন মহাকাশচারী ২ বার উঠেছিলেন। ২৭টি অভিযানের মধ্যে (রাশিয়া ও আমেরিকা মিলে) মহাকাশযানে একজন করে মহাকাশচারী উঠেছিলেন ১৪টিতে, দুজন করে ১১টিতে এবং তিনজন করে ২টিতে।* এই অভিযানগুলির মধ্যে মানুষ মহাকাশে একটানা সবচেয়ে বেশী সময় থেকেছে ৩৩০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট (এই সময় পৃথিবীকে একটানা পরিক্রমা করেছে ২০৬ বার), আর সবচেয়ে উঁচুতে উঠেছে ৮৫৩ মাইল।

* অ্যাপোলো-এর অভিযান নিয়ে পৃথিবীর মহাকাশচারীর সংখ্যা হল ৩৪ জন (২২ জন আমেরিকার, ১২ জন রাশিয়ার)। এদের ভেতর ৭ জন দুবার করে মহাকাশে ওঠলেন, তিনবার করে ওঠলেন ২ জন; একবার করে ওঠেছেন বাকী ২৫ জন। মোট অভিযানের সংখ্যা হল ২৮—একজনকে নিয়ে ১৪টি, ২ জনকে নিয়ে ১১টি এবং তিনজনকে নিয়ে ৩টি)।

অ্যাপালো-৮ মহাকাশযান

অ্যাপোলো-৮ নামক মূল মহাকাশযানটির (১নং চিত্র—খ) উচ্চতা ১১' ফিট, ব্যাস ১৩' ফিট; গম্বুজাকার এই যানটির ভেতরে জায়গা ২১৮ ঘনফুট। এরই ভেতর বসে তিনজন মহাকাশচারী চন্দ্র প্রদক্ষিণ করে এলেন। যানটি এমন ধাতুতে তৈরী, যা ৬,০০০° ফাঃ উত্তাপ থেকেও মহাকাশচারীদের বাঁচাতে পারে, বাইরে ৬,০০০° ফাঃ উত্তাপ হলেও ভেতরের উত্তাপ ৭২° ফাঃ-এর বেশী না হয়। যানটির বহির্ভাগ অ্যালুমিনিয়াম ও প্লাষ্টিক-মিশ্রিত একটি মৌচাকের নকসায় গড়া আবরণে ঢাকা। মহাকাশাযানের এই অংশটুকুই মাত্র মহাকাশচারীদের নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। যাত্রাকালে রকেট প্রভৃতি সহ মহাকাশযানটি ৩৬৪' ফিট দীর্ঘ ছিল (১নং চিত্র); ৩৬ তলা বাড়ীর সমান উঁচু।

এই মূল যানের মাথায় ছিল 'লাঞ্চ এসকেপ মডিউল (১নং চিত্র— ক)—এটির কাজ হল, ওঠার সময় মাঝপথে হঠাৎ যদি রকেটে কোন বিপজ্জনক গোলমাল ঘটে, তাহলে এটি মূল যানটিকে নীচের অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে, যাতে মহাকাশ-যাত্রীরা নিরাপদ হতে পারেন। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওপরে ওঠার পরই এটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, কারণ তখন এর আর কোন কাজ ছিল না।

মূল যানটির ঠিক নীচেই ছিল ২৩' ফিট লম্বা 'সার্ভিস মডিউল' বা অ্যাপোলো-৮ মূলযানের নিজস্ব ইঞ্জিন (১নং চিত্র—গ) এবং অন্যান্য বহু যন্ত্রপাতি। মহাশূন্যে ছুটতে শুরু করার পর থেকে এইটিই হবে মূলযানের একমাত্র সঙ্গী ও সহায়ক। মাঝপথে গতিপথ পাল্টাবার সময়, চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশের জন্য যানের

গতিবেগ কমানো ও তার মুখ ঘুরিয়ে দেবার সময়, চাঁদকে প্রদক্ষিণ করার পর ফিরে আসার জন্য যানের গতিবেগ বাড়ানোর এবং ফেরার পথে কোথাও প্রয়োজন হলে যানের মুখ একটু ঘুরিয়ে তার গতিপথ ঠিক করে নেওয়ার সময় এই অংশে স্থাপিত ইঞ্জিনটিই তা করবে। এটি ঠিক থাকার ওপরই নির্ভর করছে চন্দ্র-প্রদক্ষিণ অভিযানের সাফল্য এবং মহাকাশচারীদের মরণ-বাঁচন। ফিরে এসে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের ঠিক আগে এটিকে মূল যান থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে।

এর ঠিক নীচে ছিল 'লুনার মডিউল' বা চাঁদে নামার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র (১নং চিত্র-ঘ); এ অভিযানে চাঁদে নামা হবে না, তাই যন্ত্রগুলি ভেতরে নেওয়া হয় নাই, কেবল তার বাইরের খোলটিই রাখা হয়েছিল।

এর নীচে ছিল বিপুলশক্তিশালী ২৮২' ফিট দীর্ঘ 'সাটার্ণ-৫' রকেট। রকেটটির তিনটি অংশ, পরপর জোড়া; রকেটের একেবারে মাথায় মাত্র ৩ ফিট উঁচু একটি অংশে রকেটের 'মস্তিষ্ক' (১নং চিত্র ঙ) বা যন্ত্র-গৃহ, যেখানে রকেটের এই তিনটি অংশকে নীচের দিক থেকে একটির পর একটি চালু করার ও কাজশেষে খুলে দেওয়ার উপযোগী স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ছিল।

রকেটের প্রথম অংশটি, একেবারে নীচের অংশটি (১নং চিত্র জ) ১৩৮' ফিট উঁচু, ব্যাস ৩৩' ফিট জ্বালানি সহ এটির ওজন ২,৪০০ টন; জ্বালানির ওজনই বেশী—১,৬০০ টন তরল অক্সিজেন এবং ৬৫০ টন কেরোসিন। এটিতে ৫টি শক্তিশালী 'এফ-১' ইঞ্জিন সংযুক্ত

রকেটের দ্বিতীয় অংশটি (১নং চিত্র—ছ) ৮২' ফিট লম্বা, ব্যাস ৩৩' ফিট। ৪৭০ টন জ্বালানি সহ (তরল অক্সিজেন ও তরল হাইড্রোজেন) এটির ওজন ৫০০ টনের কিছু বেশী। এটিতে ৫টি 'জে-২' এঞ্জিন।

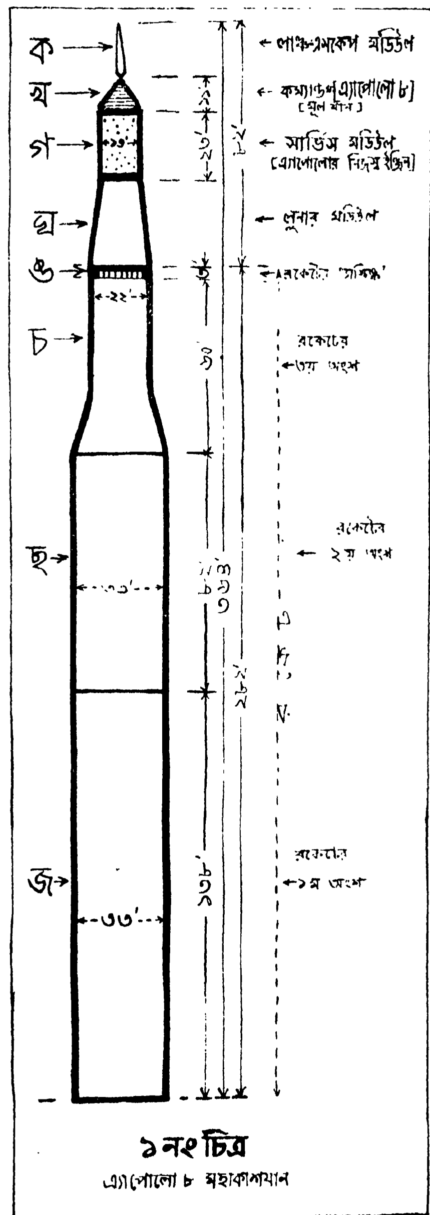
রকেটের তৃতীয় অংশটি ৫৯' ফিট উঁচু, ব্যাস ২২' ফিট। ওজন ১১৫ টন জ্বালানি সহ (তরল অক্সিজেন ও তরল হাইড্রোজেন) ১৩০ টন। এটিতে একটি 'জে-২' ইঞ্জিন।

অভিযান

চন্দ্রপ্রদক্ষিণের জন্য অ্যাপোলো-৮-এর ঐতিহাসিক অভিযান শুরু হয় গত ২১ শে ডিসেম্বর। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেপ-কেনেডি শহরের উৎক্ষেপণ-কেন্দ্রে পূর্বোক্ত ৩৬৪' ফিট দীর্ঘ মহাকাশযানটি খাড়া করে দাঁড় করানো ছিল; মাথার ওপর মূল যানটির (খ) মধ্যে মহাশূন্যে দেহের আভ্যন্তর চাপ, উত্তাপ প্রভৃতি রক্ষার উপযোগী পোশাক পরে বসে ছিলেন তিনজন মহাকাশচারী—ফ্রাঙ্ক বোরম্যান, জেমস্ এ. লোভেল ও উইলিয়াম এ. এ্যানডারস; তাঁদের সঙ্গে ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার, মহাশূন্য হতে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগরক্ষার উপযোগী যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ছিল। অভিযানের নেতা ছিলেন বোরম্যান, চালক ছিলেন লোভেল। ফটো তোলার দায়িত্ব ছিল এ্যানডার্স-এর ওপর। লোভেল এর আগে আরো দুবার মহাকাশে উঠেছিলেন; প্রথমবার 'জেমিনি-৭' মহাকাশযানে ১৯৬৫-র ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে ১৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৩০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট মহাকাশে ছিলেন, ২০৬ বার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন। এই যাত্রায় বোরম্যানও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ১৯৬৬-র ১১ই নভেম্বর লোভেল দ্বিতীয় বার 'জেমিনি-১২' যানে মহাকাশে উঠেছিলেন, ৯৪ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটে ৫৯ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে নেমে এসেছিলেন

১৯৬৮-র ২১শে ডিসেম্বর পূর্বনির্ধারিত সময়ে * সন্ধ্যা ৬-১৫ মিনিটে অ্যাপোলো-৮ মহাকাশযানটির সহিত সংযুক্ত সাটার্ন-৫ রকেটের ৩য় অংশের ৫টি ইঞ্জিনই একসঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠল; সে বিপুল শক্তি (৩৩,৭৫,০০০ কিলোগ্রাম চাপের) বিপুলকায় মহাকাশযানটিকে ওপরের দিকে তুলে নিয়ে ঘণ্টায় ৬,০০০ হাজার মাইল বেগ দিল—ঐতিহাসিক চন্দ্রাভিযান শুরু হল। আড়াই মিনিটের মধ্যে যানটিকে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ৩৮ মাইল ওপরে তুলে দিয়ে রকেটের এই প্রথম অংশটি (জ) খসে গেল; এই আড়াই মিনিটেই তার ৫টি ইঞ্জিন ২,২৫০ টন জ্বালানি পুড়িয়ে ফেলেছে। রকেটের প্রথম অংশটি খসে যাবার পরেই দ্বিতীয় অংশটি (ছ) সক্রিয় হয়; ৫টি 'জে-২' ইঞ্জিন মিলিতভাবে ৫,১০,০০০ কেজি চাপের শক্তি উৎপাদন করে ৬½ মিনিট সক্রিয় থেকে মহাকাশযানটিকে পৃথিবী থেকে ১১৮ মাইল ওপরে তুলে দিল। তারপর প্রথম অংশটির মতই জ্বালানি-হীন অবস্থায় মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মহাকাশযানটির গতিবেগ তখন বেড়ে গিয়ে ঘণ্টায় ১৪,০০০ মাইল হয়েছে।

দ্বিতীয় অংশটি বিচ্ছিন্ন হবার পর রকেটের তৃতীয় অংশটি (চ) চালু হয়। এ অংশে মাত্র ১টি 'জে ২' ইঞ্জিন ছিল। এটি মহাকাশযানের গতিবেগ আরও বাড়িয়ে ঘণ্টায় ১৭,৪০০ মাইল করে দিল এবং এটির মুখ ঘুরিয়ে দিল; যার ফলে এতক্ষণ যেমন মহাকাশযানটি পৃথিবী থেকে দূরে চলে যাচ্ছিল, তা না করে পৃথিবীর চার-দিকে ঘুরতে থাকল। পৃথিবীর কক্ষপথে মহাকাশযানটিকে স্থাপন করেই এই তৃতীয়



১ নং চিত্র
এ্যাপোলো ৮ মহাকাশযান

অংশের ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া হয়; মহাকাশযানটি তখন ইঞ্জিনের শক্তি ছাড়াই

* ভারতীয় সময়; প্রবন্ধের সর্বত্রই ভারতীয় সময় দেওয়া হয়েছে।

নিজের গতিবেগ ও পৃথিবীর অভিকর্ষের মিলিত ফলে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকে। তৃতীয় অংশটি কিন্তু তখনো মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নাই, তার জ্বালানিও ফুরিয়ে যায় নাই; তার আরো কাজ ছিল। মহাকাশযানটি রকেটের এই তৃতীয় অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়েই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে থাকে।

এই পৃথিবী-প্রদক্ষিণকালে মহাকাশযাত্রীরা খুব ভালভাবে দেখে নিলেন মহাকাশযানের যন্ত্রপাতিগুলি ঠিকমত কাজ করছে কিনা। পৃথিবীর পরিচালন-কেন্দ্রের সহিত বেতারে যোগাযোগের যন্ত্রগুলি ঠিক আছে কি না, তাঁদের মহাশূন্যে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যানের ভেতরকার তাপ, চাপ ইত্যাদি ঠিক রাখার যন্ত্রগুলি, শ্বাসগ্রহণের জন্য অক্সিজেন-সরবরাহের যন্ত্র, বিদ্যুৎ-উৎপাদন-যন্ত্র প্রভৃতি ঠিক কাজ করছে কিনা—ভালভাবে সব পরীক্ষা করে নিলেন। কথা ছিল, কোথাও কোন গোলমাল দেখলে এখান থেকেই তাঁরা পৃথিবীতে ফিরে আসবেন বা অন্য কাজ করবেন, পৃথিবীর অভিকর্ষ ছাড়িয়ে চাঁদের দিকে যাবার জন্য মহাশূন্যের পথে পা বাড়াবেন না; কিন্তু তার প্রয়োজন হল না, মহাকাশযাত্রীরা দেখালেন সব যন্ত্রপাতিই ঠিক মত কাজ করছে।

তখন আসল চন্দ্রাভিযান শুরু হল। পৃথিবী ছেড়ে যাবার প্রায় তিন ঘণ্টা পরে, রাত্রি ৯-১১ মিঃ সময়ে রকেটের তৃতীয় অংশের ইঞ্জিনটিকে দ্বিতীয়বার চালু করা হল; ফলে মহাকাশযানের গতি বেড়ে ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইলে উঠল। এই গতিবেগ পেয়ে মহাকাশযানটি পৃথিবীর কক্ষপথ ছেড়ে, তার অভিকর্ষশক্তিকে উপেক্ষা করে সোজা চাঁদের দিকে ছুটতে লাগল। চাঁদ এই সময় যেখানে ছিল, সেদিকে নয়, কারণ চাঁদের কাছে পৌঁছুতে যানটির যে সময় লাগবে, ততক্ষণে চাঁদ অনেকখানি সরে যাবে। হিসেব করে মহাকাশযানটির মুখ মহাকাশের এমন একটি স্থানের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হল, যেখানে যানটি যখন চাঁদের ঠিক পাশে গিয়ে পৌঁছুবে, চাঁদ ততক্ষণে এগিয়ে এসে সেখান থেকে মাইল ৭০ দূরে থাকবে। সহজেই বোঝা যায় এই হিসেব করে যাত্রা করাটা কত সূক্ষ্ম ও বিপজ্জনক ব্যাপার—একটু এদিক ওদিক হলেই হয় যানটি চাঁদের খুব কাছে গিয়ে তার টানে তার বুকে আছড়ে পড়বে, আর না হয় চাঁদ থেকে যানটি অনেক বেশী দূর দিয়ে চলে যাবে, যার ফলে চাঁদের অভিকর্ষ তাকে টেনে নিজের চারদিকে ঘোরাতে পারবে না, মহাশূন্যে আরও এগিয়ে গিয়ে যানটি পৃথিবী ও চাঁদ দুয়েরই অভিকর্ষের বাইরে গিয়ে সূর্যের টানে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে থাকবে। উভয়ক্ষেত্রেই মহাকাশচারীদের মৃত্যু নিশ্চিত।

মহাকাশযাত্রীরা পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের সহযোগিতায় যাত্রাপথ ঠিকমতই বেছে নিয়েছিলেন, হিসেবে ভুল হয়নি। কথা ছিল সামান্য ভুল হলে মাঝপথে তা সংশোধন করা হবে, তার ব্যবস্থাও ছিল, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন হয়নি; পৃথিবী থেকে ৬২,৫০০ মাইল দূরে আসার পর একবার মাত্র তা করতে হয়েছিল।

চাঁদের দিকে মহাকাশযানটিকে ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মাইল বেগে চন্দ্রাভিমুখী করার পরই মহাকাশযানের সঙ্গে সংযুক্ত 'স্যাটার্ন-৫' রকেটের তৃতীয় অংশটি মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বিচ্ছিন্ন হবার পরও, ইঞ্জিন চালু না থাকা সত্ত্বেও নিজের গতিবেগেই

রকেটের ৩য় অংশ (চ) এই পথ ধ'রে সূর্যের কক্ষাভিমুখে চলে যায়

এই দুই ডিম্বাকার পথে এ্যাপোলো৮ একবার ক'রে প্রদক্ষিণ করে

এই বৃত্তাকার পথে এ্যাপোলো আবার ঘোরে

চাঁদ

এখানে এ্যাপোলো৮-এর নিজস্ব ইঞ্জিন (গ) বিচ্ছিন্ন হয় [এবং তার মুখ উল্টে যায়]

এখানে রকেটের ২য় অংশ (ছ) বিচ্ছিন্ন হয়

প্রত্যাবর্তন পথ

২,৩৪,০০০ মাইল

এখানে রকেটের ১ম অংশ (জ) বিচ্ছিন্ন হয়

যাত্রাস্থল কেপ-কেনেডি

অবতরণ স্থান

হাওয়াই দ্বীপ

পৃথিবী

যাবার পথ

এখানে রকেটের ৩য় অংশ (চ) বিচ্ছিন্ন হয়ে এ্যাপোলোর পিছনে পিছনে ছুটতে থাকে

চাঁদ

এ্যাপোলো৮-এর যাত্রাকালে চাঁদ এখানে ছিল

২নং চিত্র

এ্যাপোলো৮-এর চাঁদে যাবার ও ফিরে আসার পথ

এটি মহাকাশযানের পিছন পিছন চাঁদের দিকেই ছুটতে লাগল, প্রায় একই পথ ধরে। মহাকাশযানের আয়তন তখন খুব ছোট হয়ে এসেছে, মহাকাশযাত্রিবাহী 'অ্যাপোলো-৮' এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত তার নিজস্ব ইঞ্জিনটি মাত্র ছিল; সব নিয়ে ৩৪' লম্বা।

'অ্যাপোলো-৮' তার সঙ্গে সংযুক্ত নিজস্ব ইঞ্জিন সহ তখন প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে চাঁদের দিকে। তার নিজস্ব ইঞ্জিনও তখন চালু নয়, নিজের গতিবেগেই ছুটেছে। এই গতিবেগ পৃথিবীর অভিকর্ষে (পৃথিবীর টানে) ক্রমশঃ কমতে থাকে। ২২শে ডিসেম্বর বিকাল ৫-৩০ মিঃ সময়, ভূপৃষ্ঠ ছাড়ার প্রায় ২৪ ঘণ্টা পরে, 'অ্যাপোলো-৮' পৃথিবী থেকে ১,০০,০০০ মাইল দূরে চলে যায়; চাঁদ তখনো ১,৩৩,৮১৪ মাইল দূরে।

'অ্যাপোলো-৮'-এর পিছনে তা থেকে বিচ্ছিন্ন স্যাটার্ন-৫ রকেটের তৃতীয় অংশটিও ছুটে আসছিল; এখন সেটি 'অ্যাপোলো-৮'-এর ১,২০০ মাইল পিছনে ছিল, তার গতিবেগ ছিল এ-সময় ঘণ্টায় ৪০০ মাইল মাত্র। হিসেব করে দেখা গেল, 'অ্যাপোলো-৮' চাঁদে পৌছে যখন চন্দ্রপরিক্রমা করবে, তখন এটি সেখান থেকে ১,৮০০ মাইল পিছিয়ে থাকবে; কাজেই চন্দ্রপরিক্রমা-কালে এর সঙ্গে 'অ্যাপোলো-৮'-এর ঠোকাঠুকি লাগার কোন আশঙ্কাই নেই; এটি যতক্ষণে চাঁদের কাছে পৌছুবে, 'অ্যাপোলো-৮' ততক্ষণে চন্দ্রপরিক্রমা শেষ করে পৃথিবীর দিকে রওনা হয়ে যাবে। রকেটের এই তৃতীয় অংশটি চাঁদকেও ছাড়িয়ে চলে যাবে, সূর্যের কক্ষপথে প্রবেশ করে তার চারদিকে ঘুরতে থাকবে একটি অতি ক্ষুদ্র গ্রহরূপে।

মহাশূন্যের গভীর প্রদেশ দিয়ে যখন 'অ্যাপোলো-৮' ছুটছিল, তখন যান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেটি নিজের চারদিকেও ঘণ্টায় একবার পাক খাচ্ছিল। এর কারণ, সেখানে সূর্যের তাপ খুবই প্রখর—রাত-ও নাই, বায়ুমণ্ডলও নাই; পৃথিবীর চারদিক ঘিরে বায়ুমণ্ডল থাকার ফলে তার ভেতর দিয়ে সূর্যের তাপের সবটা আমাদের কাছে পৌছোয় না; তাছাড়া পৃথিবী নিজের চারদিকে ঘুরে এই তাপ চারদিকে সমানভাবে চারিয়ে নেয়, ক্রমান্বয়ে দিনে তাপ গ্রহণ ও রাত্রে তা বিকিরণের সুযোগ নেয়। মহাকাশযানটি চলার সময় নিজের চারদিকে ঘুরে ঠিক এই কাজটিই করছিল, যাতে যানটির সবদিকই মোটামুটি সমানভাবে উত্তপ্ত থাকে। এরূপ না করলে একটা দিক সব সময় প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে থাকতো, অন্য দিক থাকতো খুব ঠাণ্ডা হয়ে।

মহাকাশচারীরা মহাশূন্যে অভিযানের সময় সময়মত খেয়ে ও ঘুমিয়ে নিয়েছিলেন। অবশ্য এমনভাবে তাঁরা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন যাতে সব সময় অন্ততঃ একজন জেগে থাকেন। মহাশূন্য থেকে তাঁরা সব সময়ই পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন; তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন, প্রয়োজনীয় সংবাদ নিচ্ছিলেন। কয়েকবার সেখান থেকে সোজাসুজি টেলিভিশনে চাঁদের দৃশ্য এবং দূর থেকে পৃথিবীর দৃশ্যও দেখিয়েছিলেন, 'অ্যাপোলো-৮'-এর ভেতরকার দৃশ্যও টেলিভিশনে পাঠিয়েছিলেন।

২৪শে ডিসেম্বর রাত্রি ১-৫৯ মিঃ সময়ে 'অ্যাপোলো-৮' পৃথিবী থেকে ২,০৩,৬২৫ মাইল দূরে চলে যায়, চাঁদ সেখান থেকে মাত্র ৩০,০০০ মাইল দূরে। এখানে সে পৃথিবীর অভিকর্ষ ছাড়িয়ে চাঁদের অভিকর্ষ-ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। অর্থাৎ তখন যে তাকে পৃথিবী নিজের দিকে টানছিল না তা নয়, তবে মহাকাশযানটি তখন পৃথিবীর চেয়ে চাঁদের খুব বেশী নিকটে বলে

তার ওপর চাঁদের টানই পৃথিবীর টানের চেয়ে বেশী কাজ করছিল। তার ফলে যতই মহাকাশযানটি চাঁদের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল, ততই তার গতিবেগ বাড়তে লাগল। পৃথিবীর কক্ষপথ ছেড়ে আসার সময় তার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল। তারপর ইঞ্জিন ছাড়াই সে নিজের গতিবেগেই ছুটে আসছে, কিন্তু পৃথিবীর টান এই গতিবেগকে কমিয়ে আনছিল। পৃথিবী থেকে সে যখন ১,২০,০০০ মাইল দূরে এসেছিল, তখন তার গতিবেগ ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল থেকে ঘণ্টায় মাত্র ২,৮০০ মাইলে নেমে আসে।

পৃথিবী থেকে ২,০৩,০০০ মাইল এসে চাঁদের অভিকর্ষক্ষেত্রে প্রবেশের সময় তা আরো কমে গিয়ে হয়েছিল ঘণ্টায় ১,২২৩ মাইল। এর পরই আবার চাঁদের টানে তার গতিবেগ বাড়তে থাকে এবং সর্বোচ্চ বর্ধিত বেগে, ঘণ্টায় ৫,৭০০ মাইল বেগে মহাকাশযানটি চাঁদকে ছাড়িয়ে তার অপর পাশে চলে যায়। চাঁদের ও-পিঠে যখন চলে যায় তখন তার গতিপথ সোজা না থেকে চাঁদের টানে একটু বক্রাকার হল। কিন্তু এ-গতিবেগ না কমালে সে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করতে পারবে না, চাঁদ থেকে বহুদূর এগিয়ে গিয়ে আবার চাঁদের টানে তার দিকে ফিরে আসবে ও প্রচণ্ড গতিতে চাঁদের টান কাটিয়ে আবার পৃথিবীর অভিকর্ষ-ক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। তাই চাঁদের ও-পিঠে যাবার কিছুক্ষণ পরেই 'অ্যাপোলো-৮'-এর নিজস্ব ইঞ্জিনটি চালু করে এই গতিবেগ কমিয়ে করা হল ঘণ্টায় ৩,৭০০ মাইল। মহাকাশযানটি তখন চাঁদের টানে তার কক্ষপথে ঘোরার পথ ধরতে পারল।

যথাসময়ে ইঞ্জিন চালু করার এই মুহূর্তটি ছিল খুবই বিপজ্জনক। দিক- বা স্থান-নির্ণয়ে একটু এদিক-ওদিক হলে যানটি চাঁদের ওপর আছড়ে পড়ত বা অন্য পথ ধরে কোথায় হারিয়ে যেত। ইঞ্জিনটি একেবারে যদি না চলতো, তা-হলে যানটি চাঁদের চারদিকে ঘুরতেই থাকতো। সবচেয়ে মুশকিলের কথা, যখন এটি করা হল, 'অ্যাপোলো-৮' তখন চাঁদের অপরদিকে— পৃথিবী থেকে বেতারে যোগাযোগস্থাপনের পথ রোধ করে মহাকাশযান ও পৃথিবীর মাঝখানে চাঁদ দাঁড়িয়ে আছে। মহাকাশ-যাত্রীরা পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র থেকে কোন নির্দেশই তখন পাচ্ছেন না, মহাকাশযানটির অবস্থিতি সম্বন্ধে বা ইঞ্জিনটি ঠিকমত চালু হল কি হল না সে সম্বন্ধে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রও কিছু জানতে পারছে না।

মহাকাশযান ২৪শে ডিসেম্বরের বিকাল ৩-১৮ মিনিট সময়ে চাঁদের অপর দিকে প্রবেশ করে, ৩-৫৫ মিঃ সময়ে বেরিয়ে আসে; তখন আবার পৃথিবী সঙ্গে যোগা-যোগ স্থাপিত হয় এবং মহাকাশযাত্রীরা খবর পাঠান যে ৩·২৮ মিনিটের সময় তাঁরা ইঞ্জিন ঠিকমত চালু করে মহাকাশযানের গতিবেগ কমিয়ে তাকে চাঁদের কক্ষপথে স্থাপন করেছেন। ইঞ্জিনটি যখন চালু করা হয়, তখন মহাকাশযান এবং চাঁদ ও পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু প্রায় এক লাইনে ছিল। ইঞ্জিনটিকে এসময় মাত্র চার মিনিট চালু রাখতে হয়েছিল।

এর পর মহাকাশযানটি ২০ ঘণ্টায় ১০ বার চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে। এই প্রদক্ষিণ-কালে মহাকাশচারীরা চাঁদের ছবি তুললেন, টেলিভিশনে তার কিছু পৃথিবীতেও পাঠালেন, ভবিষ্যতে চাঁদে নামার উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করলেন, ইত্যাদি। মাত্র ৬৯ মাইল দূরে থেকে তাঁরা বৃত্তাকারে চাঁদের চারদিকে

ঘুরেছেন। প্রথম দুটি আবর্তন অবশ্য বৃত্তাকার হয়নি, হবার কথাও ছিল না। ইঞ্জিনটি আবার চালু করে পথটি বৃত্তাকার করে নেওয়া হয়।

চাঁদকে দশবার প্রদক্ষিণ করার পর ২৫শে ডিসেম্বর দুপুর ১১-৪০ মিনিট সময়ে মহাকাশচারীরা আর একবার মহাকাশযানের নিজস্ব ইঞ্জিনটি চালু করে তার গতিবেগ ঘণ্টায় ৩,৭০০ থেকে ঘণ্টায় ৬,০০০ মাইলে বাড়িয়ে দেন, যার ফলে মহাকাশযানটি চাঁদের ওপাশ থেকে এই বেগ নিয়ে বেরিয়ে এসে চাঁদের চারদিকে ঘোরার পথে আর না গিয়ে চাঁদের অভিকর্ষ কাটিয়ে পৃথিবীর দিকে ছুটতে থাকে। এও একটি বিপজ্জনক মুহূর্ত ছিল; ইঞ্জিনটি চালু না হলে মহাকাশযানটি মহাকাশচারীদের নিয়ে চাঁদের চারদিকে ঘুরতেই থাকতো, যার ফলে অক্সিজেন ফুরিয়ে যাবার পর মৃত্যু ছিল অবধারিত।

পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসার সময় চাঁদের টানে যানটির গতিবেগ আবার কমতে থাকে; এই দিন সন্ধ্যা ৭টার সময় চাঁদ থেকে ২০ হাজার মাইল আসার পর (পৃথিবী তখন ২,১৩,৫২৬ মাইল দূরে) তার গতিবেগ হয় ঘণ্টায় ২,৭৬৩ মাইল।

এইদিন (২৫শে ডিসেম্বর) রাত্রি ১১-৪৪ মিনিটের সময় মহাকাশযান চাঁদের অভিকর্ষক্ষেত্র ছাড়িয়ে আসে। তারপর থেকে পৃথিবীর টানে তার গতি আবার বাড়তে থাকে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের প্রাক্কালে এর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৫,০০০ হাজার মাইল।

২৭শে ডিসেম্বর রাত্রি ৯টার পর অ্যাপোলো-৮ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কাছাকাছি আসে। বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের আগেই মূল-যানটির সঙ্গে প্রথম থেকে সংযুক্ত, সুদীর্ঘ ৪,৮০,০০০ হাজার মাইল পথের সঙ্গী ও সহায়ক নিজস্ব ইঞ্জিন-সংযুক্ত অংশটিকেও ('সার্ভিস মডিউল' 'গ' অংশটিকে অ্যাপোলো-৮ থেকে) বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল। পৃথিবী থেকে যে ৩৬৪' উঁচু যানটি যাত্রা করেছিল, তার ১১ ফুট উঁচু অংশটি মাত্র ('কম্যাণ্ড মডিউল' 'খ') তখন অবশিষ্ট। মূল যানের মধ্যেকার ইঞ্জিন ('রিঅ্যাকসেন কণ্ট্রোল') চালিয়ে তখন মূল যানটিকে উল্টেও দেওয়া হল। যানটির নীচের দিক সমতল, ওপরের দিক সূচল; এতক্ষণ পর্যন্ত যানটি সূঁচল দিকটি সামনে রেখে পৃথিবীর দিকে এগুচ্ছিল, এখন সমতল দিকটি সামনে (পৃথিবীর দিকে) রেখে ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল বেগে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করল। উল্কাপিণ্ড যেমন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রচণ্ডবেগে ঢুকেই বায়ুর ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে, যানটিও প্রায় সেভাবে জ্বলে উঠল, জ্বলন্ত উল্কার মত পৃথিবীর দিকে নেমে আসতে লাগল। তার বাইরের তাপমাত্রা তখন ৬,০০০° ফা:, কিন্তু ভিতরের তাপ মানুষের পক্ষে সহনীয়ই ছিল।

যানটির গতিবেগ কমাবার জন্য যান্ত্রিক সাহায্য ছাড়াও প্যারাসুটের সাহায্য নেওয়া হল। পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রায় ৫ মাইল কাছে এসে একটি প্যারাসুট ('ড্রোগ প্যারাসুট') খুলে দেওয়ায় যানের গতি খুব মন্দীভূত হয়ে এল, ঘণ্টায় ১৭৫ মাইলের মত হল। পৃথিবী থেকে প্রায় দু মাইলের ভেতর আসার পর এ প্যারাসুটটি খুলে দিয়ে তিনটি 'পাইলট প্যারাসুট' খোলা হল; এই প্যারাসুট তিনটি আরো তিনটি (অবতরণ-প্যারাসুট) প্যারাসুট খুলে নিল। এর ফলে যানটির গতিবেগ ঘণ্টায় ২২ মাইলে নেমে এল। এই গতিতে রাত্রি ৯-১৫ মিনিটের সময় অ্যাপোলো-৮ তিনজন বিজয়ী মহাকাশ-

যাত্রীকে নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কিছু দূরে 'ইয়র্কটাউন' নামক যুদ্ধ-জাহাজ মহাকাশচারীদের সাগরের বুক থেকে তোলার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিল। তখনই জাহাজখানি এগিয়ে গিয়ে তীব্র আলো ফেলে অ্যাপোলো-৮কে আলোকিত করল, কয়েকটি হ্যালিকপ্টার উড়ে গিয়ে ঘুরতে লাগল তার ওপর।

তখনো রাত্রির অন্ধকার কাটে নাই। তাই অবতরণের ৮০ মিনিট পরে মহাকাশ যাত্রীদের হ্যালিকপ্টারএ তুলে জাহাজে নিয়ে আসা হল।

নির্বিঘ্নে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করে মহাকাশচারী তিনজন পৃথিবীতে ফিরে এলেন। প্রায় ৫ লক্ষ মাইলের এই বিপদসঙ্কুল, দুঃসাহসিক মহাশূন্য-অভিযানে সব কিছুই পূর্বনির্ধারিত সময়মত ঘটেছিল, প্রত্যাশিত সূক্ষ্মতা নিয়ে সব যন্ত্রগুলি কাজ করেছিল। এমনকি ছয়দিন মহাশূন্যে ঘুরে আসার পর অ্যাপোলো-৮ কখন কোথায় অবতরণ করবে বলে পূর্বে যা নির্ধারণ করা হয়েছিল, যানটি নেমেছেও ঠিক সেই সময়ে, সেইখানেই।

বিদ্যার বন্দনা

শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

বিদ্যার মুরতি তুমি, দেবি সরস্বতি!
শুভ্র তব পদযুগে করি মোরা নতি।
তোমার প্রসাদে মাগো, কত গবেষণা,
কত আবিষ্কার হল, কত না সাধনা!

তবু কোথা শুভ জ্ঞান? শুভ্রতা কোথায়?
বিদ্যার শকতি কেন পালিছে হিংসায়?
করুণার মাতৃভূমি, বিদ্যার ভাণ্ডার,
নিঃস্বকে বাঁচাতে কেন নহে সমুদার?
অশুচি হ'ল কি মাগো, মোদের পূজায়
যত উপচার, অর্ঘ্য দম্ভের ছোঁয়ায়?

সমালোচনা

Man in Search of Immortality—স্বামী নিখিলানন্দ। প্রকাশক: George Allen and Unwin Ltd., Ruskin House, Museum Street, London. মূল্য ২৫ শিলিং; পৃষ্ঠা ১০৬।

স্বামী নিখিলানন্দ প্রায় ৪০ বৎসর আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারে ব্রতী আছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও উপনিষদ্‌গ্রন্থাবলী, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদে, শ্রীসারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী এবং হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকখানি মৌলিক গ্রন্থরচনায় তিনি বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত।

বর্তমান পুস্তকে ৫টি অধ্যায়ে (১) অমৃতত্ব, (২) মৃত্যুই কি শেষ? (৩) অবস্থাত্রয়, (৪) তত্ত্বমসি, (৫) মানুষের কি স্বরূপ—উপনিষদ্‌-প্রোক্ত অমৃতের অভিযানে মানুষের প্রচেষ্টার একটি সার্থক বর্ণনা আধুনিক যুগের চিন্তাধারার প্রবিপ্রেক্ষিতে দার্শনিক জটিলতা বর্জন করে গ্রন্থকার প্রাঞ্জল ভাষায় দিয়েছেন। মূলতঃ পাশ্চাত্য পাঠককে লক্ষ্য করে লেখা হলেও এই গ্রন্থপাঠে সকল শ্রেণীর পাঠকরা—বিশেষতঃ উপনিষদের চিন্তাধারার সহিত যাঁরা পরিচিত নন তাঁরা—নিঃসন্দেহে লাভবান হবেন। গ্রন্থকারের আকর্ষণীয় কৃতিত্ব এই যে, প্রতিটি নিবন্ধে ধর্মালোচনার চরম পরিণতি যে স্বানুভব—এই তত্ত্বটি তিনি দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করেছেন। —**স্বামী বীতশোকানন্দ**

পত্রাবলী, ১ম খণ্ড: মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ। প্রকাশক—শ্রীজগদীশ্বর পাল: পঞ্চবটী প্রকাশনী, ১০ গ্যালিফ স্ট্রীট (সুইট ১৩, ব্লক ১), কলিকাতা-৩। প্রাপ্তিস্থান: দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ৫৪।৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।

এই ২৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তকখানি সর্বপ্রকারেই উপাদেয়, মন্তব্য। ইহার কাগজ, ছাপা, প্রচ্ছদপট সুন্দর এবং প্রচ্ছদপটে অঙ্কিত প্রতীকটি পরম ধ্যেয়, সৃষ্টিরহস্যের উদ্‌ঘাটক। ইহার ভাষা স্বচ্ছ, সাবলীল; ভাব গম্ভীর, প্রশস্ত।

ভারত ও ভারত-বহির্ভূত দেশের যাবতীয় ধর্মমত ও সাধনের অপূর্ব সমন্বয়-চেষ্টা ইহার বৈশিষ্ট্য। মতগুলির উপস্থাপন ও সমালোচন-শৈলী উদার ও বাস্তবনিষ্ঠ; বহু দর্শন ও সাধনের প্রকৃত মর্ম স্বল্প শব্দে উদ্‌ঘাটন করিবার অপূর্ব পাণ্ডিত্য প্রায় প্রত্যেক পত্রেই প্রকাশিত।

তথাপি, সর্বত্র না হউক, কোন কোন ক্ষেত্রে, একটি বিশেষ দর্শনের অনুকূলে অন্যান্যগুলিকে দেখা ও আলোচনা করা হইয়াছে—ইহা হওয়া স্বাভাবিক। কারণ পুস্তকখানি শুধু তো পাণ্ডিত্যের নিদর্শন নয়, ইহাতে 'দরদ' যথেষ্ট রহিয়াছে—চিঠিগুলি গ্রন্থকারের প্রাণের জিনিস।

একটিমাত্র দৃষ্টান্ত ৭১ নং (১৮৫—৮৮ পৃ.) পত্র হইতে দিলেই আমাদের বক্তব্য বুঝা যাইবে। জন্মান্তর সম্বন্ধে গ্রন্থকার তাঁহার সমাধান বর্ণন করিতেছেন। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বলিতে যাইয়া তিনি শেষে "সাংখ্যের পর বেদান্ত-ভূমিতে স্থূল ও সূক্ষ্ম ব্যতীত কারণ-শরীর অঙ্গীকৃত হয়। ইহার পর **আর কাহারও গতি নাই**। বস্তুতঃ, কারণ-শরীরের পর"… "মহাকারণ-শরীর, কৈবল্যশরীর এবং হংসশরীর"ও আছে। কিছু পরে বলিতেছেন, "মায়া ভেদ

করিয়া যদি মহামায়াতে স্থিতি হয় তাহা হইলে বিদেহকৈবল্যের অবস্থাপ্রাপ্তি ঘটে" (১৮৭ পৃঃ)। কবিরাজ মহাশয় নিশ্চয় জানেন যে, বৈদান্তিক যাহাকে "মায়া" বলেন তাহা অপরের 'মহামায়া'কেও অন্তরস্থ করিয়া আছে, এবং তাঁহাদের কারণ-শরীরের বাহিরে এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ছাড়া কোন ভেদই নাই, তাহা যতই সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মাতীত হউক না কেন। অতএব উহার পরে "আর কাহারও গতি নাই" নহে, গতি থাকিতে পারে না। ১৮৮ পৃষ্ঠায় কর্ম-জনিত ভোগের বিচার করিবার সময় এবং ১৮৯ পৃষ্ঠায় সিদ্ধগণের জীবন্মুক্তি ও বেদান্তের জীবন্মুক্তি তুলনায়ও এই প্রকার পক্ষপ্রেম আসিয়া গিয়াছে। সকল বিচারই যোগীর দৃষ্টিতে বা আরও সূক্ষ্মভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় গ্রন্থকারের "জ্ঞানগঞ্জ" প্রণালীতেই (১৭৮ পৃঃ) করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা গ্রন্থের দূষণ নহে, ভূষণই।

বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম-পথিকৃৎ বলিয়াছেন, পাণ্ডিত্য যদি বিবেক-বৈরাগ্য-মণ্ডিত হয় তবে তাহার মূল্য "হাতীর দাঁত সোনা দিয়ে মোড়ার" ন্যায় বর্ধিত হয়। এ ক্ষেত্রে ইহার উপর আবার ঐকান্তিক সাধন অলঙ্কৃত হইয়া গ্রন্থের উপাদেয়ত্ব সমধিক বৃদ্ধি করিয়াছে।

বিদগ্ধসমাজ ও সাধকবৃন্দ দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশন-মুখাপেক্ষী হইয়া রহিল।

—স্বামী সৎস্বরূপানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত নতুন পুস্তক

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। প্রকাশক স্বামী বীতশোকানন্দ; ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩; পৃঃ ২৫৬+১৪; মূল্য—৩৲ টাকা।

স্বামী ঈশানানন্দ দীর্ঘ এগার বৎসরকাল শ্রীশ্রীমায়ের পূত সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে কলিকাতার বাগবাজারস্থ তাঁহার নিজস্ব ভবনে, 'শ্রীশ্রীমায়ের বাটী'তে (উদ্বোধন কার্যালয় বা উদ্বোধন বলিয়াও এটি পরিচিত) প্রথম পদার্পণ করেন; সেই সময় জয়রামবাটী হইতে আসিবার পথে কোয়ালপাড়ায় তাঁহার বিশ্রাম লওয়ার বর্ণনা হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুলাই উদ্বোধনে তাঁহার লীলা-সংবরণ পর্যন্ত লেখকের মাতৃ-সান্নিধ্যের স্মৃতিগুলি গ্রন্থটিতে বিধৃত। এই স্মৃতিকথার অনেকাংশ পূর্বেই 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় স্থান পাইলেও বর্তমান গ্রন্থে সেগুলি লেখকের অপ্রকাশিত স্মৃতিগুলির সহিত সুসম্বদ্ধ ও ধারাবাহিকরূপে উপস্থাপিত হওয়ায় গ্রন্থটি বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে। "শ্রদ্ধাশীল ভক্ত নরনারী ইহা পাঠ করিয়া স্নিগ্ধ মাতৃসান্নিধ্যলাভে দিব্য আনন্দ ও শান্তি লাভ করুন"—মাতৃচরণে লেখকের এই প্রার্থনা যে পূর্ণ হইবে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ২৭শে পৌষ (১১.১.৬৯) শনিবার কৃষ্ণা-সপ্তমীতে যুগাচার্য পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের শুভ ১০৭তম জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এইদিন প্রত্যূষে স্বামীজীর মন্দিরে মঙ্গলারতি, বেদ-আবৃত্তি, কঠোপনিষৎ-পাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও কালীকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামীজীর ঘরে ভজন হইয়াছিল।

কয়েক সহস্র নরনারী এইদিন স্বামীজীর চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে বেলুড় মঠে সমাগত হন এবং সারাদিন নানা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ভক্তবৃন্দকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল।

বিকাল সাড়ে-তিনটায় স্বামী গম্ভীরানন্দজীর সভাপতিত্বে মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটি জনসভা হইয়াছিল। সভায় সভাপতি মহারাজ ও অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় এবং স্বামী বুধানন্দ ইংরেজীতে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী অবলম্বনে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। স্বামী বুধানন্দ তাঁহার ভাষণে বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ গঠনের দিশারী। তাঁর কথামত বিজ্ঞান ও জাগতিক উন্নতির সঙ্গে, সমাজনীতি প্রভৃতির সঙ্গে আজ ধর্মের মিলন ঘটাইতে হইবে। বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি উভয়কে জয় করিয়া অগ্রসর হওয়ার পথেই আমাদের কাম্য এক পৃথিবী গড়িয়া উঠিবে। ডক্টর আসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে মহনীয় করেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েও মানুষের দুঃখে তিনি কেঁদেছেন, মানুষেরই জয় গেয়েছেন, তার সেবায় জীবন দিয়েছেন; তবে যে মানুষের জয়গান গেয়ে ইউরোপে রেঁনেসাঁ এসেছিল, যে মানুষের কথা আজ আমরা শুনছি, এ মানুষ সে 'বাইওলজিক্যাল ম্যান' নয়, দেহসীমিত মানুষ নয়, এ মানুষ দেবস্বরূপ মানুষ, স্বয়ং ভগবানই তার স্বরূপ। নিজের এই দেবস্বরূপে আমাদের প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।" স্বামী গম্ভীরানন্দজী বলেন, "স্বামীজীর বাণী কেবল ভারতের প্রাচীন মর্মবাণীর পুনরুক্তিই নয়, নবজীবনের ইঙ্গিতও রয়েছে তার মধ্যে। ভগবানকে তিনি মন্দির শাস্ত্র প্রভৃতি থেকে জীবনের সাবলীল গতির সর্বত্র টেনে এনেছেন—সকল মানুষ সর্বাবস্থায় সর্বকর্মের মাধ্যমেই যাতে ভগবানের আরাধনা করতে পারে। কর্তা কর্ম ভগবান সবই এক—এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শিবজ্ঞানে জীবসেবা করতে বলেছেন তিনি। এই-ই নবযুগের বাণী।"

কল্পতরু-উৎসব

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে গত ১লা জানুআরি (১৯৬৮) 'কল্পতরু-দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। ৪ঠা এবং ৫ই জানুআরিও উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রথম দিন ১লা জানুআরি বুধবার বিশেষ পূজাদি, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি, কালীকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে স্বামী ভূতেশানন্দ কর্তৃক ভাগবত-ব্যাখ্যার পর স্বামী চিদাত্মানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী উমানন্দ, মুখ্যানন্দ, লোকেশ্বরানন্দ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জীবন ও বাণী অবলম্বনে সময়োপযোগী ভাষণ দেন। স্বামী

মুখ্যানন্দ হিন্দীতে এবং সভাপতি মহারাজ ও অপর দুই বক্তা বাংলায় বক্তৃতা করেন। রাত্রে শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক রামায়ণ গান হয়।

উৎসবের দ্বিতীয় দিন ৪ঠা জানুআরি শনিবার অপরাহ্ণে সঙ্গীতানুষ্ঠানের পর স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ গীতা ব্যাখ্যা করেন। ধর্মসভায় স্বামী পরশিবানন্দ সভাপতিত্ব করেন। স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ, নিরাময়ানন্দ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন বক্তৃতা দেন। সকলের বক্তৃতাই সময়োপযোগী। রাত্রে পদাবলী-কীর্তন উপভোগ্য হইয়াছিল।

উৎসবের শেষ দিন ৫ই জানুআরি রবিবার অপরাহ্ণে বাউল-সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। কঠোপনিষদ্ ব্যাখ্যা করেন স্বামী নিত্যানন্দ। সন্ধ্যায় সঙ্গীতানুষ্ঠানের পর রাত্রে রহড়া বালকাশ্রমের ছাত্রগণ কর্তৃক 'মুক্তিযজ্ঞ' যাত্রাভিনয় শ্রোতৃবৃন্দকে প্রভূত আনন্দ দিয়াছিল।

উৎসবের তিন দিনই কাশীপুর উদ্যানবাটীতে সহস্র সহস্র ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। প্রথম দিন প্রায় ১৩।১৪ হাজার নরনারীকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্রীপূর্ণদাস বাউল প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ সঙ্গীতাদিতে অংশ গ্রহণ করেন।

কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও গত ১লা জানুআরি বুধবার 'কল্পতরু-দিবস' উপলক্ষে যথারীতি আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিশেষ পূজা, পাঠ, হোম ও ভজনাদি উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। উৎসবের প্রতিটি অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। প্রসাদ হাতে হাতে দেওয়া হইয়াছিল। ভক্তসমাগমে ও ভজন-কীর্তনে যোগোদ্যান সারাদিন আনন্দমুখর থাকে।

স্বামী সারদানন্দের জন্মোৎসব

উদ্বোধনে, শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে গত ১০ই পৌষ (২৫. ১২. ৬৮ বুধবার শুভ শুক্লা ষষ্ঠীতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলা-পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের পুণ্য জন্মতিথি-উৎসব বিশেষ আনন্দ সহকারে উদ্‌যাপিত হয়।

পূজ্যপাদ মহারাজের ঘরে ও পার্শ্ববর্তী কক্ষে তাঁহার প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভজন, জীবনী-আলোচনা প্রভৃতি উৎসবের প্রতিটি অঙ্গ সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১০টা হইতে ১১টা স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ ও আলোচনা করেন। সন্ধ্যারতির পর স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজীর পুণ্য জীবনী আলোচনা করেন। পূর্বাহ্ণে ভজন, বাঁশিতে যন্ত্রসঙ্গীত এবং রাত্রে শ্রীশ্যামাদাস চক্রবর্তীর সেতার-বাদন শ্রোতৃবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দিয়াছিল। বহু সাধু ও ভক্তের সমাগমে উদ্বোধন-ভবন আনন্দমুখর হইয়াছিল। রাত্রেও বহু ভক্তের সমাগম হয়। সমাগত ভক্তগণকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

মেদিনীপুরে বন্যার্তসেবা: গত ডিসেম্বর, ১৯৬৮, মেদিনীপুর জেলার সবং, নন্দীগ্রাম, ভগবানপুর ও ময়না থানার ১২টি অঞ্চলে বন্যাপীড়িত জনগণের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ১৭,৯৮২ কেজি চাল এবং ২,৩৮,৪৯৩ কেজি গম বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৪৪,৬০৬।

উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবা: গত ডিসেম্বর মাসে জলপাইগুড়ি শহরের ১৯নং ওয়ার্ডে,

মণ্ডলঘাটের ৯নং অঞ্চলে এবং কাঠামবাড়ী অঞ্চলে বন্যাবিধ্বস্ত জনগণের মধ্যে মিশন কর্তৃক ৬,৮৯০ কেজি চাল, ৬০০ কেজি আটা, ৪,৩০০ কেজি ডাল, ১৭৫ কেজি বিস্কুট এবং ৩,৩১২ কেজি গুঁড়া দুধ বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত বন্যার্তদের সংখ্যা—৯,৫৫৯।

এতদ্ব্যতীত ২,৪২৮ খানি ধুতি ও শাড়ী, ১,২১২ খানি তুলার কম্বল, শিশুদের পোশাক ৩৭০টি এবং ৯,২২০ খানি পুরাতন বস্ত্রাদি বিতরিত হইয়াছে।

জলপাইগুড়িতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে দুঃস্থ জনগণের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক কুটীর নির্মাণ করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

গুজরাটে বন্যার্তসেবা: সুরাট জেলায় বন্যাপীড়িতদের পুনর্বাসনের জন্য মিশন কর্তৃক কুটীরনির্মাণকার্য সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হইতেছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের নূতন কেন্দ্র

আসামে গৌহাটীতে 'রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম' নামে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি নূতন কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। কেন্দ্রটির ঠিকানা: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, ছত্রীবাড়ী, গৌহাটি-৮, আসাম।

মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ডিস্পেন্সারীর সম্প্রসারণ

গত ২৪শে নভেম্বর ১৯৬৮ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ মাদ্রাজ মায়লাপুরস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ডিস্পেন্সারীর নূতন সম্প্রসারিত অংশের উদ্বোধন করিয়াছেন। এই সম্প্রসারণকার্যে ৫০,০০০ টাকারও অধিক খরচ হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার

(শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয়): ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩:

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার স্থাপিত হয় ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে। ইহার প্রধান কার্য দুইটি - শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের সেবা এবং প্রকাশন।

শ্রীশ্রীমা এখানে প্রথম পদার্পণ করেন ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে। উদ্বোধন কার্যালয় উঠিয়া আসে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে।

উদ্বোধন কার্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ১৪ নং রামচন্দ্র মৈত্র লেন-এ গিরীন্দ্রলাল বসাকের বাড়ীতে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বোসপাড়া লেন-এ উহা স্থানান্তরিত হয়, পরে এখানে নিজস্ব ভবনে উঠিয়া আসে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রচারকল্পে এখানে ক্লাস এবং আলোচনাদিও নিয়মিতভাবে হইয়া থাকে। বিশেষ দিনে উৎসবাদিও করা হয়। সাধারণের জন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য, শাস্ত্রগ্রন্থ প্রভৃতি সংবলিত একটি ছোট পুস্তকাগারও আছে।

পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বাংলাদেশে একমাত্র প্রকাশনকেন্দ্র ছিল উদ্বোধন কার্যালয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মুখপত্র 'উদ্বোধন' পত্রিকা এবং স্বামীজীর বাংলা ও ইংরেজী পুস্তকাবলী প্রভৃতি সবই তখন এখান হইতেই প্রকাশিত হইত। পরে অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ইংরেজী পুস্তকাবলীর অধিকাংশ সেখান হইতেই প্রকাশিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের কর্মধারা নিম্নরূপ:

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের নিত্য সেবা-পূজাদি যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর এবং পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি-উৎসব সুষ্ঠুভাবে যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উভয় দিনে প্রায় পাঁচ হাজার ভক্তসমাগম হইয়াছিল। ফলহারিণী কালিকাপূজার রাত্রে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, কালীপূজার রাত্রে প্রতিমায়

শ্রীশ্রীকালীপূজা এবং শিবরাত্রিতে সারারাত্রি শিবপূজা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত খৃষ্টমাস ইভ, শঙ্করপঞ্চমী, বুদ্ধপূর্ণিমা ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পুণ্য দিনে সন্ধ্যারাত্রিকের পর অবতারগণের জীবন ও বাণী পঠিত ও আলোচিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী সন্তানগণের জন্মতিথিগুলিও অনুরূপভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসর যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন' (মাসিক) পত্রিকার ৭০তম বর্ষ। পত্রিকা যথারীতি প্রকাশিত হইয়াছে, এবং উহার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে মাসে প্রায় ৫,০০০ করিয়া ছাপা হয়।

এখানকার গ্রন্থাগারটি—প্রতি রবিবার অপরাহ্নে খোলা হয়। গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ২,৩৭৬। আলোচ্য বর্ষে ১,৫৯৫ খানি পুস্তক পড়িবার জন্য দেওয়া হইয়াছে।

এখান হইতে আলোচ্য বর্ষে দুইখানি নূতন পুস্তক, 'শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয়' এবং 'মাতৃসান্নিধ্যে' প্রকাশিত হইয়াছে. এই দুইখানি লইয়া ১৯৬৮ খৃঃ পর্যন্ত উদ্বোধন কার্যালয় হইতে ১৬৭ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইল।

আলোচ্য বর্ষে মঠের সাধু-কর্মিগণ এখানে এবং বাহিরে বিভিন্ন স্থানে যথাক্রমে ৮৬টি ও ১৯৩টি ক্লাস ও বক্তৃতা করিয়াছেন।

ভিত্তিস্থাপন

গত ২৫শে নভেম্বর শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজের বটানি ব্লকের (Botany Block) ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন।

বিজ্ঞানভবনের উদ্বোধন

গত ২৬শে নভেম্বর শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মাদ্রাজে ত্যাগরায়নগর নর্থ ব্রাঞ্চ উচ্চবিদ্যালয়ের নবনির্মিত সায়েন্স ব্লকের উদ্বোধন করিয়াছেন। প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই বিজ্ঞানভবনটি নির্মিত হইয়াছে।

অন্ধ ছাত্রের কৃতিত্ব

পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ছাত্রাবাসের জনৈক অন্ধ ছাত্র এই বৎসর মগধ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করিয়াছে।

সেণ্ট লুইস বেদান্ত সমিতিতে নূতন মন্দিরের উদ্বোধন

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি রাজ্যে অবস্থিত সেণ্ট লুইস বেদান্ত সমিতির মন্দির ও বক্তৃতা-গৃহটি নূতন পরিকল্পনানুসারে পরিবর্ধিত ও পুনর্নির্মিত হইয়াছে। এই নূতন মন্দিরের শুভ উদ্বোধন হয় গত ৪ঠা ও ৬ই অক্টোবর। প্রথম দিন সকালে ৭০ জন ভক্তের উপস্থিতিতে পূজাদি উদ্‌যাপিত হয়। মন্দিরের বেদীর উপরিভাগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি বড় চিত্র, নীচে পৃথক পৃথক সিংহাসনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের ফটো শোভা পাইতেছিল। হাওয়াই দ্বীপ হইতে প্রেরিত অর্কিডের মালা প্রতি পটবিগ্রহকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। চিকাগো বেদান্ত সমিতির স্বামী ভাষ্যানন্দ উপনিষদ এবং অন্যান্য স্তোত্রাদি পাঠ করেন। পূজা করেন স্যানফ্রান্সিসকো বেদান্ত সমিতির স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। চণ্ডীপাঠ করেন সম্প্রতি আমেরিকায় বক্তৃতাসফরে আগত স্বামী রঙ্গনাথানন্দ। আরাত্রিক-স্তোত্রও গীত হয়। উপস্থিত ভক্তগণের পুষ্পাঞ্জলি দিবার ব্যবস্থা ছিল। হোমের পর উপস্থিত ভক্তগণকে ভূরিভোজন দ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছিল।

ঐ দিন সন্ধ্যায় সমিতির সভ্য ও ভক্তগণের তরফ হইতে স্বামী রঙ্গনাথানন্দকে

অভ্যর্থনা করা হয়। স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ সংক্ষিপ্ত ভাষণ দ্বারা সকলের নিকট স্বামী রঙ্গনাথানন্দকে উপস্থাপিত করেন। তৎপরে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ মানবজীবনের উদ্দেশ্য যে ঈশ্বরদর্শন—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐ বাণী অবলম্বনে একটি হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা দেন। তৎপরে মিসেস এ. ভি. রঙ্গরাজন কর্ণাটী ধারায় একটি সংস্কৃত গান গাহিলে স্বামী ভাষ্যানন্দ স্বামী রঙ্গনাথানন্দের আমেরিকায় বক্তৃতা-সফরের একটি বিবরণ প্রদান করেন। অতঃপর মিসেস রিচার্ড বার্গম্যান একটি ভক্তিমূলক গান গাহিবার পর 'ধ্যান করবি মনে বনে কোণে'—শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তি অবলম্বনে একটি ভাষণ দেন। ইহার পর ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কয়েকটি গান করেন। পরে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ সমবেত সকলকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করেন।

৬ই অক্টোবর রবিবার বেলা সাড়ে-দশটায় নূতন মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে প্রায় দুই-শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ একটি বৈদিক প্রার্থনা দ্বারা সভার উদ্বোধন করেন। তৎপরে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ও স্বামী ভাষ্যানন্দ কর্তৃক একত্র মহানারায়ণ উপনিষৎ হইতে আবৃত্তি করা হইলে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ সমাগত সকলকে অভিনন্দিত করিয়া সেন্টলুইস-এর নূতন মন্দিরটি জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল অধ্যাত্মপিপাসু নরনারীর জন্য উন্মুক্ত থাকিবে, ইহা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন: 'যে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেখান হইতেই তাহাকে আগাইয়া দাও'—স্বামী বিবেকানন্দের এই জ্ঞানগর্ভ উক্তিটিই হইল এই সমিতির পথনির্দেশিকা। অতঃপর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দের শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করেন। আমেরিকার অন্যান্য বেদান্তকেন্দ্রের পরিচালক সন্ন্যাসীদের এবং দুইজন স্থানীয় ধর্মযাজকের শুভেচ্ছাবাণীও পড়া হয়। ইহার পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ একটি গান গাহিয়া শুনান। অতঃপর অধ্যাপক হিউস্টন স্মিথ স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া স্থানীয় জনৈক চিত্রশিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত আটটি ধর্মের প্রতীকের একটি সুবৃহৎ চিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন এবং সর্বধর্মসমন্বয় সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেন। পরে স্বামী ভাষ্যানন্দ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও স্বামী রঙ্গনাথানন্দ বক্তৃতা করেন। মিসেস রিচার্ড বার্গম্যান এবং মিসেস এ. ভি. রঙ্গরাজন বক্তৃতাত্রয়ের অন্তরালে ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করিয়াছিলেন। ভাষণগুলির পর অধ্যাপক হিউস্টন স্মিথ কর্তৃক সঙ্কলিত 'তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম' সম্বন্ধে একটি রঙীন চলচ্চিত্র দেখানো হয়। ডক্টর রবীন্দ্র ভট্টাচার্য মীরাবাঈ-এর একটি ভজন সমাপ্তি-সঙ্গীতরূপে গান করেন। স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ সংক্ষিপ্ত ভাষণে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভাভঙ্গ হয়। বক্তৃতাগৃহের প্রবেশদ্বারের পাশে পৃথিবীর আটটি প্রধান ধর্মের মূল শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত সমিতির নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অরিগন রাজ্যের প্রধান শহর পোর্টল্যাণ্ডে বেদান্ত সমিতি স্থাপিত হয় ১৯২৫ সালে। স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী প্রভবানন্দ, স্বামী বিবিদিষানন্দ এবং স্বামী দেবাত্মানন্দ পর পর এখানে কাজ করিয়া গিয়াছেন। স্বামী দেবাত্মানন্দের চেষ্টায় ১৯৩৪

সালে শহরে সমিতির স্থায়ী বাড়ী ক্রয় করা হয় এবং কয়েক বৎসর পরে শহর হইতে ২২ মাইল দূরে পাহাড়ে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে একটি আশ্রমও স্থাপিত হয়। বর্তমান পরিচালক স্বামী অশেষানন্দ ১৯৫৫ সাল হইতে পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত সমিতির ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৬৫ সালের পোর্টল্যাণ্ড স্টেট কলেজের সম্প্রসারণ-পরিকল্পনায় বেদান্ত সমিতির জমির প্রয়োজন হওয়ায় বাড়ীসহ জমি তাঁহারা উপযুক্ত মূল্যে সমিতির নিকট হইতে কিনিয়া লন।

সমিতি শহরের আর একটি অপেক্ষাকৃত নিভৃত অঞ্চলে এক একর জমি সংগ্রহ করিয়া সম্প্রতি একটি মনোরম দ্বিতল গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন। একতলায় ঠাকুরঘর, লাইব্রেরী, অফিস, বক্তৃতা-হল, রান্নাঘর প্রভৃতি এবং দোতলায় সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও অতিথিদের থাকিবার ঘর। বেদান্ত সমিতির এই নূতন বাড়ীর প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী অতি সুন্দর। সমিতির জমিতে অনেকগুলি ফলের ও অন্যান্য গাছ আছে। একটি চমৎকার পুষ্পোদ্যানও আশ্রমের সৌষ্ঠব বর্ধন করিয়াছে।

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর, শনিবার মহাসপ্তমীর দিন পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত সমিতির এই নূতন মন্দিরের শুভ উদ্বোধন বিশেষ পূজার্চনাদির দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে সিয়্যাটল বেদান্ত কেন্দ্র হইতে স্বামী বিবিদিষানন্দ এবং স্যানফ্রান্সিস্‌কো বেদান্ত সমিতির স্বামী শ্রদ্ধানন্দ পোর্টল্যাণ্ডে আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এবং রাজা মহারাজের বিশেষ পূজা স্বামী অশেষানন্দ সম্পন্ন করেন। পৃথক বেদীতে শ্রীশ্রী৺দুর্গামাতার অর্চনা নির্বাহ করেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। স্বামী বিবিদিষানন্দ স্তবস্তোত্রাদি পাঠ করেন। বক্তৃতা-গৃহের বেদীতে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বড় চিত্রের আবরণ-উন্মোচন এবং প্রাণ-প্রতিষ্ঠাও অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূজান্তে ভোগ, আরতি ও হোম হয়। উপস্থিত ষাটজন ভক্ত পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। পরে সকলকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়।

পরের দিন ২৯শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, বেলা ১১টায় মন্দির-প্রতিষ্ঠার সাধারণ উৎসব হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, কর্মসচিব স্বামী গম্ভীরানন্দজী এবং আমেরিকার বিভিন্ন কেন্দ্রের পরিচালক সন্ন্যাসী মহারাজদের শুভেচ্ছা-বাণী স্বামী অশেষানন্দ পড়িয়া শুনান। তৎপরে সমিতির প্রেসিডেণ্ট মিঃ স্টুয়ার্ট বুশ একটি প্রারম্ভিক ভাষণে সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া সমিতির একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন। অতঃপর স্বামী বিবিদিষানন্দ 'যোগের অনুশীলন' এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 'আত্মবিদ্যা' সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। সর্বশেষে স্বামী অশেষানন্দ 'অতীন্দ্রিয় জ্ঞান' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সকলের আনন্দ বর্ধন করেন। সমিতির গায়ক- ও গায়িকামণ্ডলীর ভক্তিমূলক সঙ্গীত খুবই প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। প্রায় দুইশতাধিক ব্যক্তি এই সাধারণ উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর : গত ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১২ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর জন্মতিথি উপলক্ষে এখানে বিশেষ পূজানুষ্ঠান ও চণ্ডীপাঠের আয়োজন হইয়াছিল। ভোরে মঙ্গলারতির পরে দেবীসূক্ত পাঠ করা হয়। রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন আশ্রম ও বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের ছাত্রীগণ কর্তৃক গীত ভজন একটি বিশেষ ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করে। বেলা দশটায় প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন। অপরাহ্ণে দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার সহকারিণীগণ ভজন-কীর্তন পরিবেশন করেন। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত প্রায় দুই হাজারের বেশী ভক্ত-মহিলার সমাগম হয়। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর মঠবাসিনীগণ কর্তৃক রাত্রি ৯টা পর্যন্ত মাতৃসঙ্গীত গীত হইয়াছিল। বর্তমান পরিস্থিতির জন্য বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

বারাসত : স্বামী শিবানন্দ মহারাজের ১১৩তম জন্মোৎসব বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে গত ১৬ই ডিসেম্বর হইতে ২২শে ডিসেম্বর সাতদিন ধর্মসভা, ভজন-কীর্তন, গীতি-আলেখ্য, ছায়াচিত্র প্রভৃতির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এবং স্বামী শিবানন্দের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী ভূতেশানন্দ, স্বামী বীতশোকানন্দ, শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, অধ্যাপক পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ অমিয় মজুমদার ও অধ্যাপক অমূল্য গুপ্ত। আশ্রম-সম্পাদক শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য আশ্রমের কার্যবিবরণী বিবৃত করেন। শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করেন স্বামী চিদাত্মানন্দ, স্বামী দেবানন্দ, স্বামী চিৎপ্রকাশানন্দ ও শ্রীকিরণ ঘোষাল। রহড়া বালকাশ্রমের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক 'মুক্তিযজ্ঞ' নাটক কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হয়। কয়েক সহস্র নরনারীর এক শোভাযাত্রা শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা, বিবেকানন্দ ও শিবানন্দের প্রতিকৃতি সহ ভজন গাহিতে গাহিতে শহর পরিক্রমা করেন। এই কয়দিনে পনর হাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ৬ই ফাল্গুন, ১৩৭৫ (১৮. ২. ৬৯), মঙ্গলবার, শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় বেলুড় মঠে ও অন্যত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৪তম পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা, পাঠ ও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে এবং পরবর্তী রবিবার, ১১ই ফাল্গুন (২৩.২.৬৯) বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব-মহোৎসব উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী আনন্দানুষ্ঠান হইবে।



দিব্য বাণী

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ৮

বেদাহমেতমজরং পুরাণং
সর্বাত্মানং সর্বগতং বিভুত্বাৎ।
জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য
ব্রহ্মবাদিনো হি প্রবদন্তি নিত্যম্ ॥ ২১

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ৩য় অধ্যায়

অজ্ঞান-তমসা-পারে সর্বব্যাপী যে পুরুষ—যে পূর্ণস্বরূপ
সূর্যসম প্রভাময়—স্বপ্রকাশ হয়ে বিদ্যমান
তাঁরে আমি জানি—আমি করিয়াছি প্রত্যক্ষ তাঁহারে,
তাঁহারেই জানি' শুধু পারে লোকে জিনিতে মরণ;
অমৃতত্ব লাভে আর নাই কোন দ্বিতীয় অয়ন।

(আপন প্রত্যক্ষ হতে সত্যদ্রষ্টা পুরুষেরা), ব্রহ্মবাদিগণ
জন্মহীন, জরাহীন, অবিনাশী বলেন যাঁহারে,
সকলেরই আত্মা যিনি—সবার স্বরূপ, বিভু তাই
সর্বগত ওতপ্রোত সর্বভূতে এ বিশ্বসংসারে—
তাঁরে আমি জানি—আমি করিয়াছি প্রত্যক্ষ তাঁহারে।

কথাপ্রসঙ্গে

বাস্তবতা ও শ্রীরামকৃষ্ণ

বাস্তবতা ও যুক্তি

'বাস্তব' কথাটি আজকাল বহুল প্রচলিত। সাহিত্যে, দর্শনে, রাজনীতিতে- সর্বক্ষেত্রেই এই শব্দটির প্রয়োগ আমাদের মনে একটি প্রভাব বিস্তার করে। যাহাকিছুকে বাস্তবধর্মী বলিয়া শুনি, মন তাহাই মানিয়া লইতে চায়।

বাস্তব কথাটির বহুবিধ সংজ্ঞা বহুজন দিয়াছেন, বিশেষ করিয়া দার্শনিকগণ। সাধারণভাবে বলা ,চলে, যাহা সত্য তাহাই বাস্তব, ইহার বিপরীত কল্পনা

কিন্তু বাস্তব বলিতে সত্যকে সব সময় বুঝি না আমরা, যদিও মনে করি তাহাই বুঝিতেছি। আমাদের দেখার ও বোঝার শক্তির সীমার ভিতর যাহা ধরা পড়ে, তাহাকেই বাস্তব বলি; সে-সীমার বাহিরে সত্য কিছু থাকিলেও, তাহা অপরের প্রত্যক্ষ করা হইলেও, সাধারণতঃ তাহাকে কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিই।
তাহাও আবার সর্বক্ষেত্রে সমভাবে করি না

এই দৃষ্টিভঙ্গী, যাহা লইয়া আমরা বস্তুকে যাচাই করি, তাহা কিন্তু বাস্তবধর্মী নহে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা পক্ষপাতদুষ্টও। ফলে আধুনিক যুগে বাস্তবতার দোহাই দিয়া আমরা আপেক্ষিক সত্যগুলির নিম্নতর স্তরের দিকেই নামিয়া চলিয়াছি, কতকগুলি কুসংস্কারকে ত্যাগ করিতে যাইয়া কতকগুলি সত্যকেও কুসংস্কার বলিয়া ভাবিতেছি এবং নূতন কতকগুলি কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া পড়িতেছি।

বাস্তবতা-নির্ণয়ে আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যগুলির প্রভাব অপরিসীম। 'বিজ্ঞানসম্মত' কথাটি আমাদের মনে গভীর বিশ্বাস সৃষ্টি করে। কিন্তু বিজ্ঞান বাস্তবতা সম্বন্ধে যে কথা বলে, যেসব সত্য সে আবিষ্কার করিয়াছে সেগুলির মধ্যে কয়টিকেই বা আমরা জানি? কিন্তু যেহেতু বিজ্ঞানীরা নিজে পরীক্ষা না করিয়া, সম্পূর্ণ নিঃসংশয় না হইয়া কোন সত্যকে স্বীকার করিয়া লন না, এবং যেহেতু যোগ্যতা অর্জন করিয়া সকলের জন্যই সে সত্যকে নিজে যাচাই করিয়া লইবার দ্বার উন্মুক্ত এবং ফলিত-বিজ্ঞান জড়প্রকৃতির বহু সত্যকে আমাদের প্রয়োজনসিদ্ধিতে লাগাইতেছে দেখিতেছি, সেজন্য তাহাদের সব কথাকেই আমরা বাস্তব বলিয়া মানিয়া লই, কল্পনা ভাবি না; এমন কি বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া কেহ কোন যুক্তিবিরোধী বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিলেও তাহা বিচার না করিয়াই চোখ বুজিয়া মানিয়া লই। একটা উদাহরণ দিতেছি, যাহা আজকাল বহুভাবে শোনা যায়, 'ঈশ্বর নাই।' কারণ?—বিজ্ঞান এখনো তাহার পরীক্ষাগারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পান নাই; আমরা সকলেই যেমন ইট পাথর প্রভৃতি দেখিতেছি, ঈশ্বরকে সেভাবে দেখিতে পাই না। কাজেই ঈশ্বর অবাস্তব; কাজেকাজেই, শাস্ত্রের কথা, আচার্যাদির কথাও সব অবাস্তব, কল্পনা মাত্র।

এ দুটি যুক্তিই অবশ্য অত্যন্ত হালকা।

বস্তু—বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে

বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে এখনো ঈশ্বরের অস্তিত্ব ধরা পরে নাই বলিয়া ঈশ্বর অবাস্তব, আজ আর ইহাকে যুক্তি বলা চলে না। সত্যান্বেষণের পথে বিজ্ঞানীরা অতীব সজাগ থাকিয়া চলেন, খুব ভালভাবে না যাচাইয়া-বাজাইয়া কোন কিছুকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন না, ইহা নিশ্চিত; কিন্তু তাঁহারা কখনো

একথাও বলেন না যে, আমরা এ পর্যন্ত যাহা জানিয়াছি তাহার পরে আর কোন সত্য নাই। বরং ঠিক ইহার বিপরীত কথাই তাঁহারা বলেন, সত্যান্বেষণের প্রচেষ্টায় যতটুকু তাঁহারা জানিয়াছেন তাহারও পরে কি আছে তাহা জানিবার জন্যই পৃথিবী জুড়িয়া বিজ্ঞানীরা গবেষণায় রত। বিশ্বের রহস্যোদ্ঘাটনে চরম সীমায় আমরা পৌঁছিয়াছি, একথা কোন বিজ্ঞানীই বলেন না, বলিতে পারেন না। আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য অতি স্থূল জাগতিক বস্তুগুলির মূলে আজ তাঁহারা বাহ্যেন্দ্রিয়ের অগোচর অতি সূক্ষ্ম শক্তিকেই 'বস্তু' হিসাবে পাইয়াছেন। এখানে বস্তু বলিতে বুঝায় যাহা দুই বা ততোধিক পদার্থের মিশ্রণ নহে, যাহা ঘটনার সমাবেশ নহে, যাহাকে দুই বা ততোধিক পদার্থে ভাঙ্গা যায় না। যেমন একদা 'এলিমেণ্টের' ক্ষুদ্রতম অংশ বা পরমাণুকে এই-জাতীয় 'বস্তু' বলিয়া বিজ্ঞানীরা মনে করিতেন, এখন আর তাহা করেন না, তেমনি শক্তিকে এখনো পর্যন্ত 'বস্তু' বলিয়া ভাবিলেও আসল বস্তু যে আরো সূক্ষ্ম প্রদেশে থাকিতে পারে না, একথা কেহই বলেন না।

বস্তু—সত্যদ্রষ্টাদের দৃষ্টিতে

ইহারও বহু পরের সত্যের কথা, চরম সত্যের কথাই হাজার হাজার বছর ধরিয়া অগণিত সত্যদ্রষ্টা নিজেরা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়া আসিতেছেন। সেই সত্যকেই ঈশ্বর বলা হয়; সেই সত্যই জগতের সব কিছুর মূলে একমাত্র 'বস্তু'। সেই 'বস্তু' অদ্বয়, অবিনাশী, চেতন সত্তা। বিজ্ঞানীরা তাঁহাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে যাচাই করিয়া ইহাতে বিশ্বাসী না হওয়া পর্যন্ত ইহাকে সত্য বলিয়া ঘোষণা না করিতে পারেন, তাঁহাদের পদ্ধতি ছাড়া অন্য পথ ধরিয়া চরম সত্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব ইহা স্বীকার না-ও করিতে পারেন, কিন্তু সত্যান্বেষণের মাঝপথে দাঁড়াইয়া 'ইহা সত্য নহে' একথা বলিবেন কিরূপে? 'আমরা জানি না', ইহাই হইল বিশুদ্ধযুক্তিসম্মত কথা। আমরা যাহা জানিতে পারি নাই, অপর কেহ তাহা জানিতে পারেন না, ইহাও যুক্তি নয়। ডাল্টন যাহা জানিতেন না, আইনষ্টাইন তাহা জানিতে পারেন না, ইহা যেমন কোন কথাই নয়, তেমনি এখনো বিজ্ঞানীরা যেহেতু জানেন না, উপনিষদের ঋষিরা, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, শঙ্কর, শ্রীরামকৃষ্ণ কেহই তাহা জানিতে পারেন না—বিজ্ঞান ঈশ্বরের কথা জানে না, কাজেই শাস্ত্র ও আচার্যাদির কথা সব অসত্য—ইহাও তেমনি কোন কথাই নয়।

বস্তু ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান

আমরা দ্বিতীয় যে যুক্তিটি ঈশ্বরের অবাস্তবতা সম্বন্ধে দিই, তাহা আরও হাস্যকর। আমরা সবাই ইঁট দেখিতেছি, গাছ দেখিতেছি, মানুষ দেখিতেছি, এগুলি বাস্তব; ঈশ্বরকে সবাই সেভাবে দেখিতে পাই না, কাজেই তিনি অবাস্তব। ইহা যুক্তি নয়, যুক্ত্যাভাস। একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। একটি স্কুলে ইনস্পেকটর আসিয়াছেন। কোন ক্লাসে ঢুকিয়া ছেলেদের প্রশ্ন করিলেন, "উচ্চশিক্ষালাভের জন্য বিলাতে আসিয়া ছয় বৎসর ছিলাম। সেখান হইতে কৃতবিদ্য হইয়া দেশে ফিরিয়া ছয় বৎসর চাকরী করিতেছি। আমার বয়স কত বল দেখি?" ছেলেরা কেন, শিক্ষকগণও প্রশ্ন শুনিয়া হতবাক। শেষে একটি ছেলে, যে আগে কিছুই শোনে নাই, শেষের বেঞ্চে বসিয়া লুকাইয়া একখানি গল্পের বই পড়িতেছিল, জিজ্ঞাসিত হইয়া মুখ তুলিয়া প্রশ্নটি আর একবার শুনিয়া বলিল,

"চল্লিশ বছর।" ইনস্পেকটর খুশী হইয়া চলিয়া গেলেন। পরে কিভাবে সে হিসাব করিল, শিক্ষকগণের এই প্রশ্নে ছেলেটি বলিল, "আমার ছোড়দা আধ-পাগলা; তার বয়স কুড়ি বছর। এঁর প্রশ্ন শুনে মনে হল, ইনি বদ্ধ পাগল, পুরো পাগল। তাই হিসেব করে দ্বিগুণ করলাম, চল্লিশ বছর বললাম।" এখানেও সে যুক্তি একটা দেখাইল, কিন্তু আমাদের কাছে তা হাস্যকরই। ঈশ্বরকে সকলে দেখিতে পাই না বলিয়া তিনি অবাস্তব, একথা বলাও ঠিক সেই ধরনেরই যুক্তি।

আমাদের সত্যকে দেখিবার শক্তি কতটুকু? সেই অতি সীমিত দৃষ্টিশক্তির সীমার মধ্যে পড়ে না বলিয়া অপরের পরীক্ষিত কোন বাস্তবতাকে অবাস্তব বলা শুধু অযৌক্তিক নয়, হাস্যকর। আমরা কয়টা সত্যকে, বাস্তবতার কতটুকু অংশকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি? আমাদের সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান এক জিনিস, সে-সত্যকে প্রত্যক্ষ করা আলাদা জিনিস। কোন বৈদ্যুতিক পাখা যখন চলে না, দেখি উহার তিন বা চারটি ব্লেড আছে। এটা প্রত্যক্ষ করি। যখন খুব জোরে পাখাটি চলে, উহার ব্লেডগুলি ঘোরে; আমরা জানি ইহা সত্য, উহার ফল দেখিয়া ইহা অনুমান করি, কিন্তু ব্লেডগুলির ঘোরাটা তখন দেখিতে পাই না, ব্লেডগুলিকেও না; দেখি, প্রত্যক্ষ করি একটি অর্ধস্বচ্ছ গোলাকার বস্তু রহিয়াছে, যে বস্তুটিই অবাস্তব। রামধনু প্রত্যক্ষ করি, সমুদ্রের জল নীল প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু জানি এ সবই অবাস্তব। অথচ আমাদের দেহমন যেভাবে বিন্যস্ত তাহাতে শক্তির খেলায় ইহা দেখিতেই হয়। পরমাণুকেই আজ পর্যন্ত কেহ, কোন বৈজ্ঞানিকও দেখেন নাই; কিন্তু উহার বাস্তবতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয়। শক্তির বিভিন্ন ক্রিয়াই আমাদের মনে বিভিন্ন রূপ-রসাদি প্রত্যক্ষের অনুভূতির সৃষ্টি করে। ইহার ফলে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে বাধ্য হই—সত্যকে নয়, বিভিন্ন অবস্থায় শক্তির ক্রিয়া-জনিত যে ছাপ মনে পড়ে, তাহাকেই।

এই হইল আমাদের বস্তু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। উহার রূপ রস প্রভৃতি গুণের বৈচিত্র্য বস্তুতে নিহিত নয়, মনে। জগতের পিছনে 'বস্তু' কি আছে বিজ্ঞানীরা এখনো সঠিকভাবে তাহা জানেন না। বাহিরে বস্তু যাহাই থাকুক, আমাদের মনের অনুভূতিই আমাদের প্রত্যক্ষ জগৎ। অবশ্য সত্য সম্বন্ধে আমরা আমাদের সীমিত প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র ছাড়াইয়াও জ্ঞান লাভ করিতে পারি প্রত্যক্ষকে ভিত্তি করিয়া এবং তদ্‌ভিত্তিক যুক্তি-অনুমানাদি সহায়ে।

বাস্তব বলিতে আমরা যাহা সাধারণতঃ বুঝি, তাহা 'বস্তু'কে আপেক্ষিক অবস্থায় যে ভাবে প্রত্যক্ষ করি, তাহাই। সত্যের বিচার তাহা দিয়া করা যায় না, এবং আমি এখন যাহা দেখিতেছি, তাহা ছাড়া আর সব অবাস্তব, ইহাও বলা চলে না। বলা চলে তখন, যখন মূল বস্তুকে প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন অন্যান্য বহু সত্যদ্রষ্টার সঙ্গে একবাক্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সহজ ভাষায় বলিয়াছেন, "ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাস্তবতা

বাস্তবকে যাচাই করিতে হইলে তাই মনের প্রত্যক্ষ করিবার শক্তিকে না বাড়াইলে চলে না। ঈশ্বরদর্শনের জন্য যত ধর্মপথে যত অনুষ্ঠান, যত সাধনা রহিয়াছে তাহার সব-কিছুরই উদ্দেশ্য এইটিই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই ধর্মাচরণেরই উপর জোর দিয়াছেন সর্বাধিক; সর্বাধিক জোর দিয়াছেন মনের এই প্রত্যক্ষ করার শক্তিকে বাড়াইয়া জগতের উচ্চতর

বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করার উপর, শাস্ত্রপাঠাদির উপর নহে, বৌদ্ধিক ধারণার উপর নহে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, একভাবে নয় বহুভাবে; ঔপনিষদিক যুগ হইতে আজ পর্যন্ত যতভাবে মানুষ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তিনি সে সব ভাবেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সেই চরম সত্যকে বা ঈশ্বরকে কেবল চরম অবস্থাতেই প্রত্যক্ষ করেন নাই, সর্ববিধ আপেক্ষিক অবস্থাতেও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। চরম অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে সেই সত্যের সঙ্গে তিনি এক, তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। আবার যে-অবস্থায় নিজের পৃথক অস্তিত্ব অনুভূত হয়, সেই অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই সব কিছু হইয়া রহিয়াছেন। জগৎকে একটি ভাবসমুদ্র-রূপে দেখিয়াছেন, আবার যে অবস্থায় জগৎকে স্থূলরূপে আমরা সকলেই দেখি, সে অবস্থায়ও দেখিয়াছেন। কিন্তু সর্বাবস্থাতে তাঁহাকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি ছাড়া আর অন্য-কিছুকে নহে—'মা দেখিয়ে দিলেন কোশাকুশি, মন্দিরের মেজে, মার্বেল, চৌকাঠ সব চৈতন্যে জ'রে রয়েছে।' এ অবস্থার কোশাকুশি, মার্বেল, চৌকাঠ দেখিতেছেন, কিন্তু উহার বাহিরের রূপটিকে শুধু নয়, একই সঙ্গে তাহার মূলে 'বস্তু'কেও—চৈতন্যকেও দেখিতেছেন। আমাদের সীমিত দৃষ্টি বস্তুর বেশী ভিতরে যাইতে পারে না—তাহার জড়রূপে প্রতিভাত অবস্থারও সূক্ষ্মতম জড়কণাগুলিকেই প্রত্যক্ষ করিতে পারে না—সেই দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষলব্ধজ্ঞানমাত্র লইয়া জগতের সর্বযুগের সর্বদেশের সত্যদ্রষ্টাদের প্রত্যক্ষের মিলনভূমি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষকে কল্পনা বলিবার অধিকার আমাদের কী আছে? আমাদেরই অযৌক্তিক সন্দেহের মূর্তি ধরিয়া নরেন্দ্রনাথও একদিন বহু কথা বলিয়াছিলেন; সোজাসুজিই শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের দোহাই দিয়াই বলিয়াছিলেন যে তিনি যাহা প্রত্যক্ষ করেন তাহা অবাস্তব, তাহা কল্পনা মাত্র, তাঁহার 'মাথার খেয়াল'—কোন কিছু সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিতে করিতে মানুষ এরকম হ্যালুসি-নেশন দেখে।

কিন্তু সেই নরেন্দ্রনাথই মা-কালীকে প্রত্যক্ষ করার পর বুঝিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর-বিষয়ক প্রত্যক্ষগুলি বাস্তব না কল্পনা তাহা নির্ণয় করিতে হইলে আগে মনকে উহা প্রত্যক্ষ করার উপযোগী করিতে হইবে; সেই-মনের প্রত্যক্ষই এবিষয়ে বাস্তবতা-অবাস্তবতা নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি—কেবল যুক্তি নয়। মনের এই প্রস্তুতির নামই ধর্মাচরণ বা সাধনা। ঈশ্বর বাস্তব কি অবাস্তব তাহা এই সূক্ষ্মদর্শী মনের প্রত্যক্ষের উপরই নির্ভরশীল, সাধারণ মনের প্রত্যক্ষের উপর নহে। যাঁহারা মনকে ইহার উপযোগী করিয়া গড়েন না, তাঁহাদের বুদ্ধি যতই উন্নত হউক, মনের স্থূল-সীমিত প্রত্যক্ষের সীমায় তাঁহাদের অনুসন্ধান যতই সুদূরপ্রসারী হউক, জগতের চরম সত্যের, ঈশ্বরের বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁহাদের কথা কখনই প্রামাণ্য হইতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই এই মনকে বস্তুর সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম অবস্থাগুলিকে প্রত্যক্ষ করার উপযোগী করিয়া গড়িবার দিকেই জোর দিতেন সর্বাধিক। মনকে এভাবে গড়িবার একমাত্র পথ মনকে একাগ্র করার ও পবিত্র করার প্রচেষ্টা—যাহার যেভাবে তাহা করিতে পছন্দ হয় এবং যাহার শক্তিতে যেভাবে ইহা করা সহজসাধ্য। জপ ধ্যান ভজন পূজা প্রার্থনা অনুষ্ঠান—এসবই মনকে একাগ্র ও পবিত্র করার সহায়ক। আর, তিনিই সব হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার

ইচ্ছাতেই সব হইতেছে—তাঁহার ইচ্ছাই প্রকৃতির নিয়ম—এই সত্যকে যথাসাধ্য সর্বক্ষণ স্মরণে রাখিতে বলিতেন। তিনিই যে সব হইয়া রহিয়াছেন, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে তাহা প্রত্যক্ষ করাইয়া, এবং ঈশ্বরেচ্ছাই যে প্রাকৃতিক নিয়ম, মথুরবাবুকে তাহার প্রমাণ দিয়া তাঁহাদের মনের সংশয় অপনীত করিয়াছিলেন। তাই নিয়মিতভাবে অন্ততঃ সকালসন্ধ্যায় জপ-ধ্যান-ভজনাদির মাধ্যমে মনকে সত্যাভিমুখী করার কথা বারেবারে তিনি বলিয়াছেন, আর বলিয়াছেন, আত্মীয়স্বজনকে, সকলকেই ঈশ্বর-বোধে সেবা করিতে।

ঈশ্বর বাস্তব কি অবাস্তব তাহা সত্যই যদি নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে অপ্রত্যক্ষ-দর্শীদের যুক্তিবিচারের অরণ্য হইতে বাহির হইয়া মনকে উহার প্রত্যক্ষের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলার এই পথে চলার মতো 'রিয়ালিষ্টিক অ্যাপ্রোচ', বাস্তবানুগ উপায় আর কিছু আছে কিনা জানি না।

চলার পথে একটু অগ্রসর হইয়া পথের দু-একটি নিদর্শন দেখিলেই মনে সত্য সম্বন্ধে বিশ্বাস সহজেই আসে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা অবলম্বনে বলা যায়: কোন অজ্ঞাত শহরের বর্ণনা শুনিলাম। সেখানে যাইবার পথের নির্দেশ পাইলাম। শহরের বর্ণনা শুনিয়া উহাতে আমার বিশ্বাস না আসিতে পারে, গল্প বলিয়া মনে হইতে পারে। উহার সত্যাসত্য নির্ণয়ে পথে না নামিলে এ বিষয়ে কোন মীমাংসাই কোন দিন আমার হইবে না। কিন্তু পথে নামিলেই তো আর সঙ্গে সঙ্গে শহরে পৌছানো যাইবে না; কিন্তু পথের বর্ণনা যাহা শুনিয়াছি সামান্য কিছুদূর চলিবার পরও তাহার মিল দেখিতে পাইলেই বাকী সবগুলির উপরই আমার বিশ্বাস দৃঢ় হইবে, আমাকে আরো অগ্রসর হইবার প্রেরণা জোগাইবে। (এ কথাটি রাজযোগের আলোচনাকালে স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন।)

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, এপথে যত অগ্রসর হওয়া যাইবে ততই মন অধিকতর প্রশান্তি ও আনন্দে ভরিয়া উঠিবে, ততই মানুষের স্বার্থপরতা কমিবে, ততই সে সকলকে সমান বলিয়া অধিকতরভাবে অনুভব করিবে। শান্তি, অবিচ্ছেদ আনন্দ, বিশ্বপ্রেম, সাম্য প্রভৃতি যাহা আমরা সবাই চাই, অথচ যাহা এখনো আমাদের নিকট যুক্তি ও কথাতেই আবদ্ধ, যাহার বাস্তবতা নাই, শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশিত পথই কেবল ঈশ্বরের বাস্তবতায় নয়, ইহারও বাস্তবতায় আমাদের পৌছাইয়া দিবে বিজ্ঞানের সত্য যাচাই করার মতই সকলে ইহার সত্যাসত্য নিজে পরীক্ষাও করিয়া লইতে পারেন। এ পথ সকলেরই জন্য উন্মুক্ত এবং ইহা মনকে উন্নত করার পথ বলিয়া বিশ্বসমস্যাগুলির সমাধানে স্বার্থহীন, মানব-প্রেমিক, সাহসী ও শক্তিমান মানুষ গঠনের প্রয়োজনও সিদ্ধ হয় ইহাতে।

স্বামী প্রেমানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

[স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে লিখিত]

১

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীচরণ ভরসা

মৈমনসিং

সোমবার, ২৪।১।১৬

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু—

মহারাজ, আজ এখানে আপনার পত্র পাইলাম। মহারাজ দয়া করে কামাখ্যাদেবী দর্শন করাইয়া ৪।৫ দিন এখানে আনিয়াছেন। ঠাকুরের খেলা দেখে অবাক্ হয়েছি। দু'বৎসর আগে এখানে এসেছিলাম। কিন্তু এবার তার ১০।১৫ গুণ ভক্ত বেড়ে গেছে। ছেলে মেয়ে যুবক ভক্তের ছড়াছড়ি। মহারাজকে পেয়ে আনন্দে বিভোর। দেশ মেতে গেছে। দেখছি সেই ডুবু-ডুবুর ভাব, আর বোধ হয় ঢাকা ভেসে যাবে। কি সুন্দর ভাব! আপনি দেখলে খুব আনন্দ পেতেন, কেবল মাধুর্যময়। ছেলেরা এখানে নিজেরা খেটে এক লম্বা ঘর তুলেছে, তাইতে গতকল্য ঠাকুর বসিলেন। মহারাজ কল্লেন পূজা, আরতি, আর ভোগও দিলেন। গান ও স্তোত্রপাঠ হল, আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। ছেলেরা মনে মনে বলেছিল যে, যদি মহারাজ আসেন তবেই জানিব ঠাকুর আছেন, নতুবা সব মিথ্যা। কল্পতরু প্রভু আমার তাই কামাখ্যা-দেবী দর্শন উপলক্ষে মহারাজকে এখানে আনিলেন। ভক্ত যে চুম্বক, তাই ঠিক দেখলুম। কি কাণ্ড যে ঠাকুর কচ্ছেন তা লিখে জানাবার নয়! যারা দেখছে, কিছু কিছু বুঝছে। ২।৪ দিন পরে ঢাকায় যেতে হবে, সেখান হতে বোধ হয় বরিশাল। মহারাজও খুব আনন্দে আছেন। বলুন—আরও বেড়ে যাক্ সহস্রগুণ, লক্ষগুণ ভক্তি বিশ্বাস। কৃপা করুন আরও ভক্তি বিশ্বাস যাতে হয়। সকলকে ভালবাসা জানাইবেন, আর আপনি আমাদের অসংখ্য অসংখ্য প্রণাম ও হৃদয়ের ভালবাসা জানিবেন। ইতি

দাস

বাবুরাম

২

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

Ramkrishna Mission
Belur P.O. Howrah Dt.
সোমবার, ১৫।৩।১৬

পরম পূজ্যপাদেষু

গতকল্য, অপর অপর বৎসর যেমন হয় এ বৎসর তাহা অপেক্ষা যেন আরও উৎসাহে উৎসব হইয়া গেল। যেমন যেমন হয়, তাছাড়া কিরণবাবু পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, স্মৃতিকণ্ঠ বাচস্পতি আর অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী গণকে আনাইয়া বক্তৃতা করাইয়াছিলেন। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা হইল। স্থান হয়েছিল গিরিশবাবু ও কালীবাবুর স্মৃতিমন্দিরের উত্তরে, সময় ৩টা হইতে ছয়টা। লোকে এই মহামেলার মধ্যেও আনন্দে স্থির হইয়া শুনিয়াছিল, এক-দিকে কালীকীর্তন, মধ্যে তরজা, অন্যদিকে বক্তৃতা। সকল শ্রেণীর লোকই আনন্দ পাইয়াছিল। গোয়ালের পশ্চিমের জমিখণ্ড জমা করে লওয়াতে এইস্থানে নারায়ণগণের বেশ সুবিধায় সেবা হইয়াছিল। কিছু কম ৫০ মণ চাল ডাল ছিল। পরিবেশন করেছিল কলেজের ছেলেরা, কি অদ্ভুত উৎসাহ তাদের মধ্যে, মহাশয়! কিছুমাত্র ক্লান্তি কি অবসাদ নাই, এই আশ্চর্য!

নিত্যই ভক্তপরিবার বাড়িতেছে। মঙ্গলবার শিলং হইতে প্রসন্নবাবু আসিয়া অনুরোধ কচ্চেন তথায় যাইবার জন্য। এ দিকে রাঁচীতে কাহাকে যাইতেই হইবে। এইরূপ আরও কত নিমন্ত্রণ রয়েছে। আবার আপনার চরণদর্শনেও আমার ইচ্ছা; যেদিকে প্রভু নিয়ে যান, তাঁর ইচ্ছা।

উৎসবদিন আশ্চর্য দেখিলাম—সমস্ত দিন মেঘলা, চন্দ্রাতপের কাজ করিল, কিন্তু কাল ও আজ ভীষণ রৌদ্র। প্রভুর অদ্ভুত লীলা। কত দেশের কত লোকই এসেছিল, ভাষা বোঝে না, কিন্তু যা দেখে তাই যেন আনন্দে পূর্ণ। আপনি আমাদের অসংখ্য অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিবেন। সকল ভক্তদের ভালবাসা কহিবেন। আপনার শরীর ভাল থাকুক—ইহা ঠাকুরের কাছে সর্বদা প্রার্থনা। অতুল কেমন আছে? সাজিদের খবর কি? তাহাদিগকে আমার স্নেহ-সম্ভাষণাদি জানাইবেন। গঙ্গাধর ভায়া উৎসবের পূর্ব হতেই মঠে আছে। সে বলছে, হরিভায়াকে লিখে দাও, "মঠে আমার আশ্রমের সব ভার দিয়েছি, আর হয়ত আপনার কাছেও যেতে পারি। কিন্তু মহাশয়, সব তার মুখে; সে তার আশ্রম কিছুতেই ছাড়িতে পারিবে না বোধ হয়...। যে-ছেলেমানুষ, সেই ভাবটাই আছে। আমরা তাকে নিয়ে খুব রগড় করি।

...ভায়া আমার পত্রের উত্তর দিলে না, তবু সে ঠাকুরের। প্রভু তাকে ভাল রাখুন!

ইতি

আপনার কৃপাপ্রার্থী

ভৃত্য বাবুরাম

শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম*

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্মযোগ-প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "এ যোগ পুরাকাল থেকে চলে আসছে। আমিই প্রথমে বিবস্বান্‌কে এ যোগের উপদেশ দিয়েছিলাম; বিবস্বান্ মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। এভাবে এ যোগ পরম্পরাগত হয়ে আসছিল। কালক্রমে তা লুপ্ত হয়েছে। সেই কর্মযোগই আজ তোমাকে উপদেশ করছি; তুমি আমার সখা ও প্রিয় বন্ধু বলে এর গুপ্তরহস্য তোমাকে বলছি।"

একথা শুনে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি যে বললে তুমি বিবস্বান্‌কে বলেছিলে, তা হয় কি করে? বিবস্বান্ কত আগে জন্মেছিলেন, আর তোমার জন্ম তো ইদানীং।" শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুনের মনে দুটি সংশয় জেগেছিল। প্রথম, তুমি যদি আমার মতো জীব হও, তাহলে পূর্বজন্মের স্মৃতি তোমার থাকতে পারে না। দ্বিতীয়, তুমি যে পূর্বজন্মের কথা বিস্মৃত হওনি, এতে বোঝা যাচ্ছে তুমি সর্বজ্ঞ ঈশ্বর; কিন্তু তাহলে তো তোমার জন্ম বা মৃত্যু কোনটাই হতে পারে না; কারণ যে অদৃষ্টের জন্য সাধারণ মানুষকে জন্মগ্রহণ করতে হয়, ঈশ্বরের তা কিছুই নাই —তাঁর কোন কর্তব্য নাই, ধর্ম-অধর্মাদি কিছুই নাই, তিনি সমস্ত কর্মের অতীত। এই দুটি সংশয়ের জন্যই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে এভাবে প্রশ্ন করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, "আগে আমার অনেক জন্ম হয়ে গেছে, তোমারও হয়েছে। আমি ঈশ্বর বলে সে-সব জন্মের কথা আমার মনে আছে; তুমি সাধারণ জীব বলে তোমার কোন কথাই মনে নেই।" জন্মমৃত্যুহীন ঈশ্বরের আবার জন্ম হয় কি করে?— অর্জুনের এই সংশয় দূর করার জন্য তিনি বললেন, "আমার জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই, ঠিকই; তবু আমি আমার প্রকৃতিকে অধিষ্ঠান করে নিজ মায়া দ্বারা মানুষের রূপ ধারণ করি—এদিক থেকে আমি ঠিক সাধারণ মানুষ নই। এটি আমার মায়িক রূপ।" শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে স্তব করতে গিয়ে তুলসীদাস যেমন বলেছেন, 'মায়ামনুষ্যং হরিম্' শ্রীকৃষ্ণ সেই কথাই বললেন; তিনি যে ঠিক আমাদের মতো মানুষ নন, এই কথাই অর্জুনকে বললেন। এই 'মায়া-মনুষ্য' হয়ে পূর্বে বহুবার তিনি এসেছেন, এভাবেই এসে পূর্বে বিবস্বান্‌কে উপদেশ দিয়েছেন।

তারপর কি জন্য তিনি এভাবে আসেন তাই বলছেন—"আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। যখন অধর্ম খুব বেড়ে যায়, ধর্মের গ্লানি হয়, তখন আমি সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্টলোকদের শাসন করবার জন্য অবতীর্ণ হই।" অর্থাৎ ধর্মপ্রতিষ্ঠার জন্য—ধর্মসংস্থাপনার্থায় চ—আমি আসি। কিন্তু এজন্য তাঁকে আসতে হবে কেন? ঈশ্বর তো সর্বশক্তিমান—মনুষ্যরূপ না ধারণ করেও তো তিনি দুষ্টলোককে বিনাশ ও ভাল লোককে সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু ধর্মস্থাপন সেভাবে হতে পারে না; ধর্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে মানুষরূপে আসতে হয়; আমাদের ধর্মপথে নিয়ে যাবার জন্য, পথ দেখিয়ে দেবার জন্য আমাদের চোখের সামনে

* গত ২৪. ৮. ৬৮ তারিখে পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন।

তিনি লীলা করে যান। তাঁর জীবন দিয়ে আদর্শ দেখান আর উপদেশ দেন, যাতে আমরা সহজে সব বুঝতে পারি। ভগবান করুণাময়, আমাদের পরম হিতৈষী। মানুষ যাতে ঠিক পথে গিয়ে তাঁর দর্শনলাভ করতে পারে, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, সেইজন্যই তিনি অবতাররূপে, মনুষ্যরূপে এসে লীলা করে আদর্শ জীবনটা দেখিয়ে যান—আমাদের কাছে আদর্শকে সহজবোধ্য করার জন্য ডিমনস্ট্রেশন দিয়ে যান; আজকালকার অডিও-ভিসুঅ্যাল (সবাকচিত্রযোগে) শিক্ষার মতোই আমাদের চোখের সামনে লীলা করে যান।

তারপর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "আমার এরূপ দিব্য জন্ম-কর্ম যারা ঠিক ঠিক বুঝতে পারে, তাদের আর পুনর্জন্ম হয় না। মৃত্যুর পর তারা আমাকে প্রাপ্ত হয়।"

এখন, আমরা সাধারণতঃ বলি, শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার ছিলেন। তাহলে নিশ্চয়ই তিনি ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য এসেছিলেন।

একটু বিচার করে দেখা যাক, কিভাবে তিনি ধর্মস্থাপন করলেন। বিচার করে আমরা যদি তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, তাহলে ভগবানের বাক্যানুসারে আমাদের মুক্তির পথ পরিষ্কার হতে পারে। স্থূলদৃষ্টিতে দেখে আমরা হয়ত বলতে পারি, ধর্মসংস্থাপন কোথায়? আমরা তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না; কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের সময় যেটুকু ধর্ম ছিল, এখন তো তাও নেই—এখন চারদিকে অধর্মেরই তাণ্ডব-নৃত্য চলছে। ধর্মস্থাপনের জন্য তিনি কোথায় কি করে গেলেন

বিষয়টি বোঝার জন্য আমরা একটু ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে বিচার করে দেখি।

রোম-সভ্যতা এক সময় খুব বড় সভ্যতা ছিল। কিন্তু যখন তার ভেতরের শক্তি ক্ষয় হয়ে গেল, তখন সে সভ্যতা বিনষ্ট হল। তার সেই চিতাভস্মের ওপর যে নতুন সভ্যতা গড়ে উঠল, সে হচ্ছে এই আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা, যাকে ইউরোপীয়ান সভ্যতা বলে। এ সভ্যতার পেছনে কী শক্তি ছিল? —যীশুখ্রীষ্ট; যীশুখ্রীষ্ট যে জীবন দেখিয়েছিলেন এবং যা উপদেশ করেছিলেন, তারই ওপর ভিত্তি করে ইউরোপে এই নতুন সভ্যতা গড়ে ওঠে

এর পর প্রায় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত সমস্ত ইউরোপে একটা শান্তি ছিল, ভগবানে ভক্তি-বিশ্বাস ছিল, লোকে আনন্দে ছিল। ঠিক এই সময়ে বিজ্ঞানের আবিষ্কার শুরু হল। বিজ্ঞানের জন্ম হল, আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বিচারের দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগল। মানুষ দেখল, ভগবানকে আমরা দেখতে পাই না, আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের গোচর তিনি নন। এরকম ভগবানের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? এভাবে তারা খ্রীষ্টের জীবন ও বাণী থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে গেল। আপনারা জানেন, এই করতে করতে আমরা কোথায় এসে পৌছেছি! মানবসভ্যতার গতি যে অধোমুখী হয়েছে, এখন অনেক মনীষী সেটা বুঝতে পারছেন। বুঝতে পেরে, কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে এটাকে একেবারে তলিয়ে যাবার হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। আর তারই ফলে সোশ্যালিজম, কম্যুনিজম প্রভৃতির উদ্ভব। বিচার করলে দেখা যায়, এগুলির ভেতর কিছু সত্য, কিছু ভাল জিনিস আছে; কিন্তু শুধু এই জিনিস মানুষকে পুরোপুরিভাবে তৃপ্ত করতে পারে না। তাই আমাদের যা সব সমস্যা, তার পুরো সমাধান এগুলি করতে পারছে না। কোনরূপ রাজনীতি বা অর্থনীতির দ্বারা এ সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ মূলে একটা মস্ত ভুল করা হচ্ছে—

মানুষকে জড়মাত্র বলে, দেহমাত্র বলে ভাবা হচ্ছে; তার যে আত্মা আছে, এ সত্যটি অবহেলিত হচ্ছে। আধুনিক সমস্যাগুলির সমাধান করতে গেলে মানুষের এই আত্মায়, তার অন্তরে রেভোল্যুশন, আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। অন্তরের এই পরিবর্তনই সব সমস্যার সমাধান করতে পারে, কেবল বাইরের পরিবেশে পরিবর্তন ঘটালে হবে না। আর অন্তরে সে পরিবর্তন আনতে গেলে ধর্ম ছাড়া অন্য কোন উপায়ে তা আনা যাবে না। সেজন্য আবার ধর্মের একটা অভ্যুত্থান প্রয়োজন।

কিভাবে এই অভ্যুত্থান সম্ভব হতে পারে? আমরা দেখি যুগে যুগে মহাপুরুষগণ জন্মেছেন, আর তাঁদের বাণী শুনে বড় বড় সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছে। এমন কি আজও এই সব মহাপুরুষদের জীবন ও বাণী অনেকের হৃদয়ে শান্তি ঢেলে দিচ্ছে। এরূপ কোন মহাপুরুষের জীবন ও বাণী অবলম্বন করেই এই অভ্যুত্থান ঘটে।

এখন কথা হচ্ছে, আমাদের বিজ্ঞানের মহাবীরেরা বলবেন, তোমরা যে ধর্ম ধর্ম করছ, তার মূলে যে ভগবান, সেই ভগবান আছেন কি না তারই তো ঠিক নেই। তাছাড়া, মানুষের দুঃখকষ্টের সঙ্গে তোমাদের ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই দেখছি। তোমরা সংসার সম্বন্ধে উদাসীন। এ ধর্মে আমাদের দরকার কি? মানুষ না খেতে পেয়ে, নানা রোগে, মহামারীতে মরছে। এসব বিষয়ে উদাসীন থেকে তোমরা ধর্ম ধর্ম করছ। এ ধর্ম দিয়ে হবে কি? আর একটি কথা—ধর্মমত সম্বন্ধে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মিল নেই, তোমরা পরস্পর ঝগড়া করে মর; অর্থের জন্য, জমি-জায়গার জন্য লড়াই করে পৃথিবীতে যত লোক না মরেছে, তার চেয়ে অনেক বেশী লোক মরেছে তোমাদের ধর্মের জন্য পরস্পর ঝগড়া করে—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান পরস্পর ঝগড়া করে। আমরা এর ভেতর কোন্ ধর্মটা নেব? আর নিয়ে করবই বা কি? অতএব তোমাদের ঘর তোমরা সামলাও, আমাদের উপদেশ দিতে এসো না।

এই হচ্ছে তাঁদের যুক্তি, আধুনিক যুগের মনোভাব। এই মনোভাব সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ আজ বৈজ্ঞানিক ধারায় বিচার করতে শিখেছে, সে বিচার অনুযায়ী ভগবানে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়েছে। ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের যে সব পুরনো বুলি আছে, সেগুলি এ বিচারের সামনে দাঁড়াতে পারছে না। সেজন্য ভগবান আছেন কি না, মানুষ তা ঠিক বুঝতে পারছে না, ভগবানে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। কিন্তু এ বিশ্বাস হারানোতে ফল কি হচ্ছে?—মানুষ মনে কষ্ট পাচ্ছে, তাদের মন হাহাকারে ভরে যাচ্ছে; মনে করছে, অনেক কিছু হারিয়েছি। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি, আদর্শ কি, তার কোন হদিসই সে পাচ্ছে না।

এ সব সমস্যার সমাধান কে করবে? ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করে লোকের মনে ভগবানের ওপর বিশ্বাস আবার কে এনে দেবে? এই ছিল আধুনিক যুগের একটা বিশেষ সমস্যা।

আধুনিক কালের আর একটা ব্যাপার হল, চারদিকে আমরা দাবীর কথা শুনছি, কর্তব্যের কথা কোথাও শোনা যাচ্ছে না। আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধানের ভেতরও মানবীয় অধিকার, আমাদের মৌলিক অধিকার ইত্যাদি পাশ্চাত্য জগতের অনেক অধিকারের কথা এসেছে। আমাদের দাবী কি কি, সে বিষয়ে আমরা খুবই সজাগ, কিন্তু আমাদের কর্তব্য কি তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছি না, সেদিকে কারো দৃষ্টি

নেই। গোটা জগতেরই দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেছে। আমাদের ভারতবর্ষের যে আদর্শ ছিল, তাতে দাবীর কথা কিছুই ছিল না, সব সময় কর্তব্যের কথাই ছিল। রাজার কি কর্তব্য, প্রজার কি কর্তব্য, রাজকর্মচারীদের কি কর্তব্য, আমাদের শাস্ত্রে তা বলা আছে। আবার ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের কি কর্তব্য, গৃহীর, সন্ন্যাসীর কি কর্তব্য, ছাত্রের কি কর্তব্য ইত্যাদি সবই বলা আছে। সকলেরই কর্তব্য কি, তারই ওপর নজর ছিল। কোন দাবী কিন্তু ছিল না। ফলে সকলেই ছিল সেবাপরায়ণ; ভাব হল—আমার নিজের যে ধর্ম, নিজের যে জীবন, তা আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়—পরহিতায়, অপরের সেবার জন্য। সমাজে থাকতে গেলে সমাজের কিছু সেবা আমাকে করতে হবে—এই দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে আমাদের সমাজ গড়ে উঠেছে। কিন্তু এখন সে দৃষ্টিভঙ্গী উল্টে গেছে, সেবার পরিবর্তে তার স্থান নিয়েছে দাবী।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনই বা কি ভাবে হতে পারে ?

এসব সমস্যা শুধু ভারতবর্ষেরই নয়, সমস্ত জগতের। বর্তমান সভ্যতা এসব সমস্যার সমাধান করতে পারছে না, যার ফলে সভ্যতা পতনোন্মুখ হয়েছে। বাস্তবিক, বেশী দিন এভাবে চলতে পারে না; নতুন করে সভ্যতাকে গড়তেই হবে। নতুন সভ্যতা গড়ার জন্য আমাদের কি শক্তি, কি আদর্শ আছে, সেটাও দেখে নেওয়া যাক। আমরা এখন একটা সন্ধিক্ষণে আছি—একটা যুগের শেষে, আর একটা যুগের প্রারম্ভে; এর ফলে আমরা দু-দিকেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু স্থূল দৃষ্টিতে নতুন যুগের ধ্বংসের দিকটাই আমাদের নজরে বেশী পড়ে, অন্যদিকে পুনর্গঠনের যে সব শক্তি ধীরে ধীরে কাজ করে চলেছে, তা দেখতে পাই না। এগুলি খুব ভালভাবে দেখে বিচার করলে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো।

এখন দেখা যাক, এই যুগপরিবর্তনের সময় নতুন যুগ প্রবর্তনে শ্রীরামকৃষ্ণের কি দান। ঠাকুর কি দিয়ে গেছেন আমাদের? প্রথমেই আমাদের যা চাই, ভগবানে বিশ্বাস, যা না থাকায় আমাদের মনে শান্তি আসছে না, অথচ যে বিশ্বাস আনতেও পারছি না, ঠাকুর সেই ভগবদ্-বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছেন। সাধন-ভজন করে তিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেছেন, আত্মসাক্ষাৎকার করেছেন। স্বামীজী যখন প্রথম পাশ্চাত্যশিক্ষা গ্রহণ করেন সব শিখে তাঁর মনেও ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এমনি সন্দেহ জেগেছিল। অর্জুন যেমন সমস্ত জগতের হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিলেন, স্বামীজীও ঠিক সেই রকম আধুনিক যুগের পৃথিবীর সব মানুষের হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে এই প্রশ্নটি করেছিলেন, "আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন ?" উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন "হ্যাঁ, ভগবানকে আমি দেখেছি। তোমার সঙ্গে যেমন কথা বলি, ভগবানের সঙ্গেও ঠিক সেই ভাবেই কথা বলি; আর শুধু তাই নয়, তোমাকেও আমি দেখিয়ে দিতে পারি।" ফলে স্বামীজীর মন থেকে ভগবানের অস্তিত্বে সন্দেহ চিরতরে চলে যায়। এতে যে শুধু স্বামীজীরই সন্দেহ চলে গেল তা নয়, সমস্ত জগতের মানুষের সন্দেহের নিরসন করা হল—ঠাকুর নিজে ভগবানকে প্রত্যক্ষ ক'রে, তাঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে বিজ্ঞানসম্মত ভাবেই অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণিত করলেন—ভগবান আছেন, তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়। এর চেয়ে, আর বড় প্রমাণ কি হতে পারে ? কাজেই ভগবদ্-

বিশ্বাস সম্বন্ধে মানুষকে তিনি আবার খুব আশ্বাস দিয়ে গেছেন।

সমগ্র জগতে আজ যে মারামারি-কাটাকাটি চলছে, তা প্রতিরোধের জন্য অনেক মনীষী চেষ্টা করছেন। বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপনের জন্য, এক-পৃথিবী গড়ার জন্য অনেক চেষ্টা করছেন তাঁরা, যাতে সবাই পরস্পরের প্রতি প্রীতি-ভালবাসা নিয়ে জগতে বাস করতে পারে। কিন্তু এরূপ করতে হলে যে ভিত্তির প্রয়োজন, যার ওপর তা গড়ে উঠবে, সে ভিত্তি কোথায়? কিসের ওপর বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হবে? আমরা দেখছি, জগতে নানা জাতি ও নানারকমের লোক রয়েছে; তাদের সবাইকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধতে গেলে, সকলকে এক-পরিবারের ভেতর আনতে গেলে একটা সাধারণ সূত্রের প্রয়োজন। সে সূত্রটি যে কি, তা কেউ ধরতে পারছেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের এই সূত্রটি দিয়ে গেছেন—প্রত্যেক ব্যক্তির ভেতরেই ভগবান রয়েছেন, বাইরের চেহারা যার যেমনই হোক না কেন, সকলেরই অন্তরে একই ভগবানের প্রকাশ। এখানেই সব মানুষের একত্ব নিহিত। মানুষের এই ঈশ্বরস্বরূপতা-রূপ একত্বকে ভিত্তি করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হতে পারে, এক-পৃথিবী গড়ে উঠতে পারে। আমাদের এই সমস্যাটার সমাধান তিনি করে গেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁকে গ্রহণ করলে বিশ্বভ্রাতৃত্বস্থাপন সম্ভব হতে পারে।

তারপর, ধর্মে-ধর্মে যে বিরোধ, যার জন্যে কত সংঘর্ষ, তারও তিনি মীমাংসা করে দিয়ে গেছেন। তিনি প্রত্যেকটি ধর্মপথ ধরে সাধনা করেছিলেন এবং প্রত্যেক সাধনার, প্রত্যেক পথের শেষে ভগবদ্দর্শন করেছিলেন; আর প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, একই ভগবানকে বিভিন্ন ধর্মপথে বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন রূপে ডাকা হয়। এভাবে অনুষ্ঠান করে তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেলেন যে, সব ধর্মই ভগবদ্দর্শনের অনুকূল, যে কোন ধর্মপথ ধরে এগিয়ে যাওয়া যাক না কেন, পথের শেষে ভগবানলাভ হবেই। এজন্য ধর্মমত নিয়ে—পথ নিয়ে—ঝগড়া করবার দরকার নেই। যার যে রকম মনোভাব, যার যে রকম প্রবৃত্তি, সে সে-ভাবেই ধর্মের অনুষ্ঠান করুক; শেষে সকলে একই ভগবানের কাছে গিয়ে পৌছুবে। এ ভাবে ধর্মে-ধর্মে মত নিয়ে যে বিরোধ, তারও একটা মীমাংসা তিনি করে দিয়ে গেলেন।

তারপর, আমরা একটু আগে যা বলেছি, সর্বত্র মানুষের দৃষ্টি এখন 'দাবী'র দিকে, 'কর্তব্যে'র দিকে নয়. ধর্মের নামে অভিযোগ—মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতি ধর্মের কোন সহানুভূতি নেই; যাঁরা ধার্মিক তাঁরা মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতি উদাসীন; এরকম ধর্মে কি প্রয়োজন?

ঠাকুর-স্বামীজীর জীবনে এ অভিযোগের সদুত্তর পাওয়া যায়। স্বামীজী বলতেন, "যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, স্বর্গে অনন্ত সুখ দেবেন—সে ভগবানে আমি বিশ্বাস করি না।" স্বামীজী এটা খুব জোর দিয়েই বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি থেকে নেমে এসে একদিন বলেছেন, "জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।" শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করতে হবে। এ ভাবটি আজ সারা জগতেরই পক্ষে প্রয়োজন। ঠাকুরের এই ছোট্ট কথাটিকে স্বামীজী খুব ব্যাপকভাবে প্রচার করে গেছেন। স্বামীজী যখন পাশ্চাত্য দেশ থেকে ঘুরে এলেন, ওদেশের বিপুল ঐশ্বর্য এবং ভারতের অন্নাভাব দেখে স্থির করলেন, ভারতের মানুষকে যদি পেটভরে খেতে না দিই, তাদের জাগতিক সম্পদ যদি একটু না

থাকে, তাহলে ধর্মপ্রচার করে কোন লাভ হবে না। আবার এরকম জাগতিক উন্নতি করতে গিয়ে সেদিকে বেশী দৃষ্টি গেলে আমরা যদি আমাদের আদর্শ—ধর্মের আদর্শ—পাশ্চাত্য জগতের মতোই ভুলে যাই, তাহলে আমাদের অবস্থাও তাদেরই মতো হয়ে যাবে। সেজন্য তিনি একটা বিশেষ আদর্শ আমাদের সামনে রেখে গেলেন—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ", একই সঙ্গে নিজের মোক্ষলাভ এবং জগতের হিতসাধনে লেগে পড়

আমাদের দেশে প্রত্যেক অবতারপুরুষ, আচার্য মহাপুরুষ জন্মাবার পর একটা করে মঠ স্থাপিত হয়। সেখানে তাঁদের শিষ্যেরা থাকেন এবং তাঁদের আদেশ-উপদেশ প্রচার করেন। এবার ঠাকুর-স্বামীজী যে মঠ স্থাপন করলেন-শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন—এটা কি ঠিক সেই-রকম, না আগের মঠগুলি থেকে এর কিছু পার্থক্য আছে? আগে যে সব মঠ হয়েছে, সেগুলির উদ্দেশ্য ভগবানলাভ; স্বামীজী যে মঠ করে গেছেন তারও মুখ্য উদ্দেশ্য ভগবান-লাভ। এ দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই; আমাদের সনাতন যে আদর্শ তা ঠিকই আছে। কিন্তু সাধারণ মঠ থেকে স্বামীজীর মঠের একটু পার্থক্যও আছে। আগের সব মঠে মঠবাসীরা শুধু জপধ্যান করতেন, পূজা শাস্ত্রপাঠ শাস্ত্রা-লোচনা করতেন; ভক্তদের শাস্ত্রোপদেশ দিতেন—বাইরের লোকের সঙ্গে সম্পর্ক ঐটুকু মাত্র, সমাজের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক ছিল না। স্বামীজী এর একটু পরিবর্তন করেছেন —দেশ ও সমাজের উন্নতির জন্য মঠবাসীদের সবরকম কাজ করতে হবে, রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতে হবে, যারা অশিক্ষিত তাদের শিক্ষাদান করতে হবে—এই রকম নানাবিধ কাজ করে সমাজকে আবার ভাল করে গড়তে হবে। আর এই কাজ বেশ ব্যাপকভাবেই করতে হবে। সমাজ চিরদিন সাধুদের সেবা করে এসেছে, তাদের সাধন-ভজন করার সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছে। আজ সে সমাজ গ্লানি-যুক্ত; অতএব সাধুদের কর্তব্য হচ্ছে কার্যক্ষেত্রে এসে সমাজকে আবার গ্লানিমুক্ত করে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া। কার্যক্ষেত্রে নামলে আবার আদর্শ ভুল হবার ভয় আছে; তা যাতে না হয়, সে-দিকেও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সেজন্য স্বামীজী একটা নতুন সাধন-পথ তৈরি করে গেলেন। সাধুরা আগের মতোই জপ ধ্যান পূজা পাঠ করবে, ভগবানের যে নামরূপাতীত সত্তা, তার ধ্যান করবে। কিন্তু ভগবান যে জগৎরূপেও প্রকাশিত! প্রত্যেক লোকের মধ্যেও যে তিনিই রয়েছেন! এই দৃষ্টি নিয়ে মানুষের সেবা করলে—মানুষের সেবায় ভগবানেরই সেবা হচ্ছে, এই ভাব নিয়ে সেবা করলে—সেটা উপাসনাই হয়ে যায়। জপধ্যানের সময় আমরা যে-ভগবানের চিন্তা করি, তিনিই মানুষ হয়ে রয়েছেন—এ বুদ্ধি নিয়ে সেবা করলে সে-সেবায় ভগবানের ধ্যানও হয়ে যায়। তাহলেই ভগবানের পূজায়, তাঁর ধ্যানে এবং ভগবদ্‌বুদ্ধিতে মানুষের সেবায় কোন প্রভেদ আর থাকে না, সব সময়েই আমরা ভগবানের চিন্তাতেই লিপ্ত থাকতে পারি। এতে আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই।

সেজন্য স্বামীজী কর্তৃক প্রবর্তিত এই কাজকর্মের সঙ্গে ধ্যান-ধারণার কোন তফাত নেই—"work is worship," কর্মই পূজা। স্বামীজী বলেছেন, ভগবানের পূজা জ্ঞানে কাজ সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করবে। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—এর ভেতরকার মূল ভাবটি যেন আমরা বিচার করে দেখি। এর অর্থ কাজকে শুধু জগতের

উপকার করা হিসাবে, মানুষের উপকার করা হিসাবে, শুধু 'স্যোস্যাল ওয়ার্ক' হিসাবে নেওয়া নয়ঃ এর অর্থ—ভগবানলাভের জন্যই কাজকে সাধনারূপে নেওয়া, জগতের, সমাজের মানুষের সেবার মাধ্যমে ভগবানেরই সেবা করা। কাজ উদ্দেশ্য নয়, শুধু মানুষের সেবা, 'সোস্যাল ওয়ার্ক' উদ্দেশ্য নয়; উদ্দেশ্য ভগবানলাভ। কাজ তার উপায় মাত্র। যেমন কোন কারখানার মূল উদ্দেশ্য ষ্টীল তৈরি করা; তা করতে গিয়ে তার 'বাই-প্রোডাক্ট' হিসাবে আরো পাঁচটা জিনিস উৎপন্ন হচ্ছে; বাজারে সেগুলির দামও আছে; কিন্তু সেই 'বাই-প্রোডাক্ট'গুলির উৎপাদনকে তো আর কারখানাটির আসল উদ্দেশ্য বলা চলে না। ঠিক সেই রকম আমাদেরও এই কাজকর্ম, লোকসেবা, সমাজ-সেবা—এগুলি উদ্দেশ্য নয়; উদ্দেশ্য ভগবান-লাভ। এই ভগবানলাভের জন্য এমন একটি সাধনা স্বামীজী দিয়ে গেছেন যে, সে-সাধনা দ্বারা ভগবানলাভ করতে গেলেই তার 'বাই-প্রোডাক্ট' হিসাবে সমাজের সেবা, সমাজের উন্নতি সাধিত হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই সাধনা দ্বারা একদিকে ভগবান-লাভের সুবিধা হচ্ছে আর অন্যদিকে জগতের কল্যাণও হয়ে যাচ্ছে। তাই স্বামীজী বলেছেন, "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।"

শুধু আমাদের নয়, সারা জগতেই এর প্রয়োজন রয়েছে। কেন না, এর দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে—সেবাই পরম ধর্ম।

বর্তমান জগতে আমাদের যা যা সমস্যা, শ্রীরামকৃষ্ণ তার সব গুলিরই সমাধানের উপায় দিয়ে গেছেন। কি কি দিয়ে গেছেন তিনি? তিনি ভগবানের ওপর বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছেন, সর্বজীবে ঈশ্বরদর্শন দ্বারা জগতে বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপনের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিরোধ দূর করেছেন, জগতের লোকের দুঃখকষ্টে উদাসীন না থেকে শিবজ্ঞানে জীবসেবা করতে শিখিয়েছেন, ধর্মের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে এনেছেন —ভগবানলাভই যে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, তা শিখিয়ে গেছেন। এ সব আদর্শ তিনি স্থাপন করেছেন। এই আদর্শগুলির ভেতর এত শক্তি নিহিত আছে যে, তা দিয়ে একটা নতুন যুগের প্রবর্তন, একটা নতুন সভ্যতার সৃষ্টি হবে। এ ব্যাপারটা স্থূলদৃষ্টিতে আমাদের নজরে পড়ছে না; কিন্তু দেখা যায়, বড় বড় মনীষীরা ঠাকুর-স্বামীজীর বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন যে, এই আদর্শই বর্তমান জগতের সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবে।

ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব, ব্যাপকভাবে না হলেও, সারা জগতে যে ছড়াচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। কোথা দিয়ে কি হচ্ছে! ঠাকুর-স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হচ্ছে কত দেশে কত জন!

এই আদর্শের জন্য সব জায়গাতেই একটা আকর্ষণ হচ্ছে; এই আদর্শের দ্বারাই আমাদের সব সমস্যার সমাধান হবে, জগতে আবার শান্তি ফিরে আসবে।

ধর্মের ওপর এখন যে উদাসীন ভাব দেখা যায়, তার কারণ যথার্থ ধর্ম আমাদের নজরে পড়ছে না; লোহায় মরচে ধরার মতো ধর্মের ওপর যেন একটা আবরণ পড়ে গেছে। এই আবরণটাই—মরচেটাই—আমাদের নজরে পড়ছে। আসল ধর্ম হল শাস্ত্রোক্ত সত্যগুলির উপলব্ধি; স্বামীজী বলেছেন, "Religion is realisation"—'উপলব্ধিই ধর্ম', আর যা কিছু সবই গৌণ, উপলব্ধির

সহায়ক মাত্র।

ধর্মের ওপর ময়চে পড়েছে ঠিক কথা; কিন্তু তাই বলে সবসুদ্ধ ধর্মকেই ত্যাগ করতে হবে কেন? এ যেন মাথা ধরেছে বলে মাথা কেটে ফেলার মতো। ধর্ম থেকে তার ওপর জমা এই ময়চেটাকে—কুসংস্কারগুলোকে—বাদ দিয়ে ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করে তার যথাযথ রূপ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরবার জন্যই ঠাকুর-স্বামীজী এসেছিলেন। স্বামীজী সারা জগতের কাছে সেটা পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন এবং বলে গেছেন যে, যথার্থ ধর্মকেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে, ময়চে ধরা—গ্লানিযুক্ত—ধর্মকে নয়।

এইটি জীবনে দেখিয়ে আমাদের বোঝাবার জন্যই ঠাকুর-স্বামীজীর আবির্ভাব। শ্রীশ্রীমাও এইজন্যই এসেছিলেন ঠাকুরের সঙ্গে।

শ্রীশ্রীমা আমাদের কি দিয়ে গেলেন, তা একটু দেখা যাক। এমনিতে তাঁর জীবনের ভেতর কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না; তিনি সাধারণ মানুষের মতোই জীবনযাপন করে গেছেন। অবশ্য তার ভেতর একটা মাধুর্য ছিল। আমরা প্রথমে তা ধরতে পারি নাই। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' ১ম ও ২য় ভাগ যখন বেরুল, দুটো ভাগই পড়ে ফেললাম। একজন ভক্ত-মহিলা প্রতিদিন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে এসে সারাদিনের ঘটনাগুলি লিখে রেখেছিলেন; ১ম ভাগে সেই কথাই, মায়ের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটিই বেশী। ২য় ভাগে মায়ের উপদেশই বেশী আছে। দুখানি বই পড়ে আমি ২য় ভাগটিকেই বেশী পছন্দ করেছিলাম। ১ম ভাগে সবই ভাল, কিন্তু ওর ভেতর কি বিশেষত্ব আছে, তা তখন বুঝিনি। কিন্তু বইগুলি যখন ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে আমেরিকায় গেল, সেখানকার মেয়েরা সবাই প্রথম ভাগটিকেই পছন্দ করলেন বেশী। তাঁরা, নিজেদের যে জীবনাদর্শ, তাতে শান্তি পাচ্ছিলেন না; ভারতবর্ষের মেয়েরা আগে কিভাবে জীবনযাপন করতেন, সেইটে তাঁরা খুঁজছিলেন। মায়ের জীবনে সেটা পেয়ে গেলেন, শান্তিলাভের পথ খুঁজে পেলেন। সেজন্যই ১ম ভাগটি তাঁদের এত ভাল লাগে।

আমাদের দেশের মেয়েরাও ভারতের প্রাচীন আদর্শ ভুলে যাচ্ছেন, আমাদের দেশেও এ আদর্শের প্রয়োজন রয়েছে এখন। আমাদের দেশের মেয়েরা ভারতের নিজস্ব আদর্শ যে ভুলে যাচ্ছেন, পাশ্চাত্যের মেয়েদের জীবনাদর্শ গ্রহণ করতে চাইছেন, তা মেয়েদের কনফারেন্স-এ যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয় তা দেখলেই বোঝা যায়; তাঁদের চিন্তাধারা কি রকম তা বোঝা যায়। অথচ যেটা তাঁরা অনুকরণ করতে যাচ্ছেন, সেই পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের মেয়েরাই এখন বিরক্ত হয়ে গেছেন। আদর্শ জীবন, শান্তিলাভের যে জীবন, সে জীবন দেখিয়ে গেছেন শ্রীশ্রীমা। ভারতের মেয়েদের সেই জীবনাদর্শই গ্রহণ করতে হবে।

মায়ের বিশেষত্ব ছিল তাঁর মাতৃভাব। তাঁর কাছে যাঁরাই গেছেন তাঁরাই তাঁর ভালবাসায় মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর কাছে যাঁরা ধর্মলাভের জন্য, তাঁর উপদেশ লাভের জন্য থাকতেন শুধু তাঁরাই নন, যারা তাঁর দেশের বাড়ীতে মজুরের কাজ করত, বাড়ীর কাজ-কর্ম করত, ক্ষেতের কাজ করত, তারাও মায়ের এই ভালবাসায় মুগ্ধ হয়েছিল। মায়ের শরীর যাবার বহু বছর পরও তারা মায়ের বাড়ীতে মাঝে মাঝে যাওয়া-আসা করত। তাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হত, 'তোমরা এখনো এরকম আস কেন?' তাহলে

বলত, 'মায়ের ভালবাসা ভুলতে পারছি না।' এখনো মায়ের কথা উঠলেই তাদের চোখে জল আসে। এতেই বোঝা যাচ্ছে মায়ের প্রতি তাদের এখনো কী টান! মায়ের যে ভালবাসা, তাঁর যে মাতৃভাব তা তারা ভুলতে পারছে না। ভগবানের প্রতি জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক, একবার যদি কারো ভালবাসার টান আসে তাহলে সে মুক্ত হয়ে যাবে। মায়ের প্রতি ভালবাসার জন্য এই সব মেয়েরাও যে মুক্ত হয়ে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমাদের এই সঙ্ঘে মায়ের দান অপরিসীম। মা না থাকলে ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একত্র থাকতেন কি না সন্দেহ। হয়ত তাঁরা বাইরে গিয়ে তপস্যায় সারাজীবন কাটাতেন। মায়ের ভালবাসা তাঁদের সঙ্ঘবদ্ধ করে রেখেছিল। তাছাড়া মা যখন গয়া গিয়েছিলেন, বোধগয়ায় মঠ দেখে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, যেন তাঁর ছেলেদেরও এরকম একটা মঠ হয়, যেখানে তারা একসঙ্গে থাকতে পারে। আজ এই যে মঠ মিশন দেখছেন, এ সবই মায়ের সেই প্রার্থনার ফল। আর, মা যেভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরকে, স্বামীজীকে বুঝেছিলেন, বাস্তবিকই অন্য আর কারো পক্ষে সেভাবে বোঝা সম্ভব নয়। তাঁকে দেখে সাধারণ গ্রাম্য মহিলা বলে মনে হলেও সবকিছু বোঝার ক্ষমতা ছিল তাঁর অপূর্ব। স্বামীজী যখন পাশ্চাত্য থেকে ফিরে এসে সাধুদের দ্বারা সেবাকার্যের প্রবর্তন করলেন, তখন অনেকেরই, তাঁর গুরুভাইদের ভেতরও অনেকেরই মনে হয়েছিল, এটা পাশ্চাত্যের ভাব, ঠাকুরের ভাব নয়। অবশ্য তাঁর গুরুভাইরা স্বামীজীর ভাবই গ্রহণ করলেন। কিন্তু কথাটা রয়ে গেল। মাস্টার মশায়ও এই ভাব পোষণ করতেন। মাস্টার মশায়ের কথা শুনে এই নিয়ে উদ্বোধনের কোন কোন সাধুব্রহ্মচারীর ভেতরও সন্দেহ এল। তখন তাঁরা মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। মা বললেন, "মাস্টার যা বলে বলুক, নরেন যা করেছে সেইটাই ঠাকুরের ভাব।" তখন তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, "এই যে উদ্বোধন পত্রিকা প্রকাশ করা হচ্ছে, বই ছাপা হচ্ছে—এসবও কি ঠাকুরের কাজ?" মা উত্তর দিলেন, "হাঁ, সবই ঠাকুরের কাজ।" —এই বলে তিনি এক কথায় স্বামীজীর "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" মূলমন্ত্রটির সমর্থন করলেন। মা যখন কাশী যান, সেবাশ্রমের নিকটেই একটি বাড়ীতে থাকতেন। একদিন সেবাশ্রম দেখতে যান; ফিরে এসে বলেছিলেন, "হাসপাতাল দেখে এলাম। দেখলাম ঠাকুর ওখানে বিরাজমান, সর্বত্রই ঠাকুর!" সেবাশ্রম দেখে ফিরে এসে মা সেবাশ্রমের জন্য দশটাকার একখানি নোট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে নোটখানি আজও রক্ষিত আছে। এভাবে সঙ্ঘের বহু প্রশ্নের মীমাংসা মা করে দিয়েছেন।

এই জগতের জন্য মা কি দিয়ে গেলেন?—তিনি মাতৃভাব দিয়ে গেছেন। তাঁর জীবন দেখে যাতে আমাদের মেয়েরা আদর্শ জীবন যাপন করতে শেখে, সেজন্য মা ভারতের প্রাচীন আদর্শকে নিজ জীবনে মূর্ত করে গেছেন, নিজে সে জীবন যাপন করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। আজকাল আমাদের দেশের মেয়েরা আগেকার মতো কেবল রান্নাঘরে আবদ্ধ না থেকে বাইরের কাজকর্মে নানাদিকে এগিয়ে আসছেন। কেউ রাজনীতিক্ষেত্রে, কেউ ডাক্তারীতে, কেউ নার্সিং-এ—এমনি সর্বত্র তাঁদের কর্মক্ষেত্র ছড়িয়ে পড়ছে। এর প্রয়োজন আছে ঠিক-ই, কিন্তু এই সব করতে গিয়ে তাঁদের নিজস্ব আদর্শ ভুলে

যাবার ভয়ও আছে। সেইজন্যই মা আদর্শ জীবন দেখিয়ে গেলেন—যেন আদর্শের একটি ছাঁচ তৈরি করে রেখে গেলেন। আমাদের দেশের মেয়েদের আদর্শ হল মাতৃত্ব, পবিত্রতা। আমাদের মেয়েদের আজ মায়ের জীবনের ছাঁচে জীবন ঢেলে নিতে হবে; ভারতের নিজস্ব আদর্শকে জীবনে আঁকড়ে ধরতে হবে, আবার সেই সঙ্গে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়েও চলতে হবে। মা যে আদর্শ দেখিয়ে গেছেন, তা শুধু ভারতের জন্য নয়, সারা জগতের জন্যই প্রয়োজন। তাই মায়ের আদর্শকে আঁকড়ে জীবনপথে চললে তাতে নিজেরও কল্যাণ হবে, সারা জগতেরও কল্যাণ হবে।

এভাবে ঠাকুর, মা ও স্বামীজী—এই তিনজন এসে লীলা করে আধুনিক জগতে যা যা প্রয়োজন, তা সবই দিয়ে গেলেন, আধুনিক কালের আদর্শগুলিকে নিজ নিজ জীবনে দেখিয়ে গেলেন। সেটা যেন আমাদের চোখের সামনে ভাসছে। তাঁদের ভাব, তাঁদের আদর্শ অবলম্বন করে একটা নতুন যুগ প্রবর্তিত হবে, নতুন একটা সভ্যতা গড়ে উঠবে। কাজ শুরু হয়েছে, ধীরে ধীরে সব হবে। স্বামীজী বলেছেন, "ঠাকুরের এই আদর্শ সারা জগৎকে নিতেই হবে।"

এখন আমি আলোচনা শেষ করার আগে মায়েদের কাছে একটা আবেদন জানাব। কোন ছেলে সন্ন্যাস গ্রহণ করলে শ্রীশ্রীমা খুব খুশী হতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশনের যে-সব কাজ আমরা করি, আপনারা এ কাজের প্রশংসা করেন, আমাদের কাজে অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও করেন। কিন্তু এ কাজ করছে কারা? সাধু-ব্রহ্মচারীরাই করছে। সাধু-ব্রহ্মচারী ছাড়া এ কাজ চলতে পারে না। আমাদের কাছে আপনারা বলেন, এখানে মঠ করুন, ওখানে স্কুল করুন ইত্যাদি। কিন্তু এসব করার জন্য অত লোক কোথায়, অত সাধু-ব্রহ্মচারী কোথায়? সেজন্য আপনাদের কাছে আবেদন, আপনাদের ছেলে-মেয়েরা যদি সাধু হতে চায়, বাধা দেবেন না। বরং তাদের ইচ্ছা দেখলে উৎসাহই দেবেন। শ্রীশ্রীমা যেভাবে ছেলেদের উৎসাহ দিতেন, ঠিক সেইভাবে দেবেন। ছেলেবেলায় তাদের যদি এ আদর্শ সম্বন্ধে বুঝিয়ে দেন, এ আদর্শ তাদের মনে থাকবে। মদালসা যেমন তাঁর ছেলেদের ঘুম পাড়াবার সময় ব্রহ্মবিদ্যার সার কথাগুলি তাদের শোনাতেন—গান গেয়ে শোনাতেন, "ত্বমসি নিরঞ্জনঃ"। এর ফলে তাঁর ছেলেরা এমন ভাবে তৈরী হয়েছিল যে, একটু বড় হতে না হতে তারা সন্ন্যাস নিয়ে চলে যেতো; প্রায় ৫।৬টি ছেলে এভাবে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। আপনারা আপনাদের ছেলেদের ছেলেবেলা থেকে যেমন শিক্ষা দেবেন, তাদের ভবিষ্যৎ সেভাবেই গড়ে উঠবে। রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ যদি আপনারা পছন্দ করেন এবং এ কাজের দ্বারা ভারতের কল্যাণ হবে বলে মনে করেন, তাহলে আপনাদের ছেলেদেরও একাজে সহায়তা করার মতো করে শিক্ষা দিতে হবে, যে-সব ছেলেমেয়েরা সাধু হতে চায়, তাদের উৎসাহ দিতে হবে।

আর একটা কথা ভেবে দেখুন। আমাদের সঙ্ঘের কাজের জন্য না হলেও ভারতবর্ষের অন্য কাজের দিক থেকেও এই ত্যাগের প্রয়োজন আছে। দেশের অনেক ছেলে আজকাল মিলিটারীতে যোগ দেয়; তাদের অনেকের মা তা পছন্দ করেন না। আমার মনে হয়, এভাব স্বার্থপ্রসূত। সে-সব মা ভাবেন, নিজের ছেলে-মেয়েরা কাছে থাকবে, চাকরি করবে, ডাক্তারি প্রোফেসারি প্রভৃতি করবে; লড়াই করতে যাবার, তোপের মুখে যাবার দরকার নেই।

এ ভাব হলে ভারতের স্বাধীনতা থাকবে কি করে? ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করা তো দরকার, আর আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরাই তো তা করবে। দেশের স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করার ভাব, ক্ষত্রিয়ের ভাব, অখণ্ড দেশাত্মবোধ—এ সব যদি আমাদের না থাকে, তাহলে চলবে কি করে? পাশ্চাত্য দেশে গত যুদ্ধের সময় এক বীরহৃদয়া মা কি করেছিলেন, শুনুন। তাঁর একটি মাত্র ছেলে। ছেলেটিকে যুদ্ধে যেতে হল। তাঁর মা তখন খুব খুশী হয়ে বললেন, "যাও, দেশের জন্য যুদ্ধ কর।" ছেলে বলল, "হ্যাঁ মা, যাব; তবে প্রতি সপ্তাহে আমাকে একখানা করে চিঠি দিও।" মা তাতে রাজী হলেন। ছেলে যুদ্ধে গেল, মা-ও নিয়মিতভাবে বহুদিন পর্যন্ত তাকে চিঠি পাঠাতে লাগলেন। তারপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং বুঝলেন যে এ অসুখ সারবে না, তিনি আর বাঁচবেন না। ভাবলেন, তিনি মারা গেলে ছেলে আর চিঠি না পেয়ে লড়াই ছেড়ে ফিরে আসতে পারে; এটা তিনি মোটেই চান না। তাই করলেন কি, মৃত্যু হবার আগেই ভবিষ্যতের জন্য অনেকগুলো চিঠি লিখে রাখলেন—তখন থেকে এক সপ্তাহ পর পর তারিখ দিয়ে; আর, একজন প্রতিবেশিনীকে বললেন, "দেখ, এই চিঠিগুলি আমি তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি। আমি মরে যাবার পর প্রতি সপ্তাহে একখানি করে চিঠি তুমি ডাকে দেবে।" চিঠিগুলির ভেতর লেখা ছিল, 'আমি ভাল আছি। আমার জন্য তুমি কিছু ভেবো না। তুমি দেশের জন্য লড়াই করছ, নিশ্চিন্ত হয়ে লড়াই কর', ইত্যাদি। মা তো এভাবে চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা করে মারা গেলেন। ছেলের কাছে চিঠিও ঠিকমত যেতে লাগল, সে ভাবল মা ভালই আছেন। পরে যখন বাড়ী ফিরে এল তখন সব কথাই শুনল।

এরকম মা না হলে এরকম ক্ষত্রিয়, বীর্যবান ছেলেমেয়ে হবে কি করে?

আমাদের দেশে আগে এরকম সব বীর-রমণী ছিলেন। পুরাণে আপনারা তাঁদের কথা পড়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই একবার এক রাজার বিরোধ হল, লড়াই করতে হবে। সেই রাজা শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অন্যান্য বহু রাজার কাছে সাহায্য চাইতে গেলেন, কিন্তু কেউ তাঁর হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লড়তে রাজী হলেন না; তাঁরা বললেন, "তুমি কি পাগল? শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে কি আমাদের সর্বনাশ করবে?" তিনি তখন দেবতাদের সাহায্য চাইলেন, অনেক দেবতার কাছে গেলেন। কিন্তু দেবতারাও একই ভাবে অসম্মতি জানালেন—ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র প্রভৃতিও বললেন, "বাবা, তুমি যাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইছ, তাঁর সঙ্গে তো আমরা যুদ্ধ করতে পারব না! এভাবে স্বর্গ-মর্ত্য ঘুরে কোথাও তিনি আশ্রয় পেলেন না। শেষে একদিন তিনি দ্রৌপদীর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন; দ্রৌপদী তখন নদীতে স্নান করে ফিরছিলেন। সেই রাজা দ্রৌপদীর কাছে সব কথা বললেন, শরণাগত হয়ে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইলেন। বীরহৃদয়া ক্ষত্রিয়রমণী দ্রৌপদী তৎক্ষণাৎ তাঁকে আশ্রয় দিলেন। গৃহে ফিরে পাণ্ডবদের কাছে বললেন, "ইনি শরণাগত হয়েছিলেন, এঁকে আশ্রয় দিয়েছি।" পাণ্ডবরা জিজ্ঞেস করলেন, "কার সঙ্গে এঁর বিরোধ?" দ্রৌপদী বললেন, "শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে।" শুনে পাণ্ডবরা বললেন, "এ কি বলছ তুমি! শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সুহৃদ। তিনি স্বয়ং ভগবান। তাঁর সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করব কি! আর যুদ্ধ করলেও কি জিতব?

তাছাড়া এ লোকটির জন্যে আমরা এসব করতে যাবই বা কেন?" শুনে দ্রৌপদী বললেন, "তোমাদের ক্ষত্রিয়ত্বে ধিক্! এই কি তোমাদের ক্ষাত্রবীর্য? যে শরণাগত তাকে আশ্রয় দেওয়াই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। আশ্রিতকে রক্ষা করার জন্যে দরকার হলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই বা যুদ্ধ করবে না কেন—হলেনই বা তিনি সুহৃদ? আর হেরে যাওয়ার ভয়ে যুদ্ধ করতে চাইছ না? ভয়ে আশ্রয় দিতে চাচ্ছ না? তাহলে তোমরা কিসের ক্ষত্রিয়? তোমাদের ধিক্!" দ্রৌপদীর এ কথা শুনে পাণ্ডবগণ রাজাকে আশ্রয় দিলেন।

মেয়েদের ভেতর এ রকম ক্ষত্রিয়ের ভাব যদি না জাগে, তাহলে ভারতের উন্নতি হবে কি করে? ভারত তাহলে রক্ষা পাবে কি করে? স্বামীজী বলেছেন, আবার ক্ষাত্রবীর্য না জাগলে দেশের কোন উন্নতি হবে না। মিলিটারীতে যোগ দেওয়াই হোক বা সাধু হওয়াই হোক, দুয়ের পিছনে রয়েছে ত্যাগ। স্বার্থত্যাগ করে দেশের উন্নতির জন্যই হোক বা দেশরক্ষার জন্যই হোক—ছেলেবেলা থেকে ছেলেমেয়েদের যদি সে রকম ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে ঠিক হবে। এ শিক্ষা মায়েরাই দিতে পারবেন। সেজন্যই আপনাদের কাছে বিশেষ করে বলছি, ছেলেমেয়েদের ত্যাগের পথে যেতে বাধা দেবেন না, বরং ত্যাগের আদর্শে উৎসাহিতই করবেন।

রোমান ক্যাথলিক সমাজে প্রতি পরিবারে অন্ততঃ একজন করে সাধু হয়ে যান, ছেলেই হোক বা মেয়েই হোক। তাঁরা এটি চান। কোন পরিবার থেকে কেউ সাধু না হলে সে পরিবারের সকলে নিজেদের শাপগ্রস্ত বলে মনে করেন; কেননা যীশুখৃষ্ট তাঁদের পরিবার থেকে নিজের কাজের জন্য কাউকে উপযুক্ত মনে করলেন না। ঠাকুরের কাজের জন্য আপনারা কি সেরকম ভাবেন? তাই আশা করি, আপনাদের ছেলে বা মেয়ে কেউ যদি ঠাকুরের ত্যাগের আদর্শে জীবন গঠন করতে চায়, আদর্শ জীবন যাপন করতে চায়, আপনারা তাকে বাধা দেবেন না। বরং ছেলেবেলা থেকে তাদের এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করবেন, সেভাবে শিক্ষা দেবেন। আপনাদের কাছে এই আরজি আমার। ত্যাগের মতো পরম কল্যাণ আর কিসে হতে পারে? দেশের যুবশক্তিকে লক্ষ্য করে স্বামীজী বলেছেন, "তোমাদের কল্যাণের জন্য, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগই শ্রেষ্ঠ কর্ম।"

দেশসেবা, সমাজসেবা, সমগ্র মানবজাতির সেবায় ত্যাগই মূলমন্ত্র। ত্যাগই যুগধর্ম। ঠাকুর মা ও স্বামীজীকে সঙ্গে এনে জীবনে তাই-ই দেখিয়ে গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনেঃ ধর্মদাস লাহা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পূর্বকথা

'নাম ধর্মদাস লাহা বড় কারবারি।
বহু ধনেশ্বর তেঁহ বহু টাকাকড়ি॥

...

অগণ্য গো-ধনেশ্বর গোকুল মাঝারে।
এবে ধর্মদাস লাহা কামারপুকুরে॥

...

কি বড় করিব বন্দি যুগলচরণ।
যাঁর ঘরে খেলে পূর্ণ ব্রহ্মসনাতন॥'—পুঁথি

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে ধর্মদাস লাহা একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। অবতারবরিষ্ঠের আদ্য-লীলা-কাণ্ডে এই পুণ্যকীর্তি পুরুষের ভূমিকা সবিশেষ স্মরণযোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী-সাহিত্যে ইনি সংক্ষেপে 'লাহাবাবু' নামেও প্রসিদ্ধ।

শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহা ছিলেন মহাত্মা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের নিকটতম প্রতিবেশী ও একান্ত অন্তরঙ্গ সুহৃদ। এই সূত্রে চাটুয্যে-পরিবারের সঙ্গে লাহা-পরিবারের প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা ও নিবিড় হৃদ্যতা দেখা যায়। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের আদ্যলীলা-রঙ্গে কেবল ধর্মদাস লাহাই নন, তাঁর পত্নী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতিও বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বিজড়িত।

জীবনবৃত্তান্ত

ধর্মদাস লাহা ছিলেন কামারপুকুরের অধিবাসী এবং তথাকার স্বনামধন্য জমিদার। বিবিধ বাণিজ্য-ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত বিত্ত ও ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। ধনাঢ্য ও মহানুভব ব্যক্তিরূপে কামারপুকুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। শ্রীযুক্ত সুখলাল গোস্বামীর পরলোকগমনের পর তাঁর পুত্র শ্রীকৃষ্ণলাল গোস্বামীর নিকট হতে তাঁর জমিদারি ও তথাকার যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি তিনি ক্রয় ক'রে নেন। তিনি অগণিত গো-ধনেরও অধিকারী ছিলেন; প্রত্যহ প্রচুর দুগ্ধ পাওয়া যেত। ঘরে তাই ঘৃত ক্ষীর, সর-ননী প্রভৃতির অভাব ছিল না।

লাহাবাবু বিবিধসদ্‌গুণসম্পন্ন অতি মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর প্রকৃতি ছিল ধীর-স্থির ও নম্র-মধুর। তিনি ছিলেন উদার-সরল ও দয়ার্দ্র-কোমল। তাঁর মধ্যে ধন-ঐশ্বর্যের দম্ভ-মোহ আদৌ ছিল না। তিনি ছিলেন অতিশয় সজ্জন, ধর্মপ্রাণ ও পরহিতব্রতী। দেব-দ্বিজ ও সাধু-বৈষ্ণবগণের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা। তিনি স্বধর্মনিষ্ঠ ও সৎকর্মপরায়ণ ছিলেন। বিবিধ ধর্মকর্মাদির অনুষ্ঠানে তিনি সর্বদাই পরম উৎসাহী ছিলেন। তাঁর ভবনে বারমাসে তেরপার্বণের বিপুল সমারোহ লেগে থাকত, বিশেষতঃ দোল-দুর্গোৎসব, জন্মাষ্টমী-রাসযাত্রা, গাজন-রথ, নবান্ন-পুণ্যাহ প্রভৃতি উপলক্ষ্যে প্রচুর ধুমধাম ও আনন্দোৎসব হত। ঐ সকল পাল-পার্বণে তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে অজস্র অর্থব্যয় করতেন। দীন-দুঃখী ও আর্ত-পীড়িতদের সেবায় এবং ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ও অতিথি-অভ্যাগতগণের সমাদর-সৎকারে তিনি সর্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। এ-ছাড়া পারিবারিক ও সামাজিক বিবিধ ক্রিয়া-কর্মাদি উপলক্ষ্যে দান-ধ্যানাদি-বিষয়েও তাঁর প্রচুর উৎসাহ দেখা যেত।

'গ্রামেতে বর্দ্ধিষ্ঠ গোষ্ঠী লাহা নামে খ্যাত।
নানা কাজে অর্থব্যয় প্রচুর করিত ॥'—পুঁথি

শিক্ষাবিস্তার-বিষয়েও লাহাবাবুর অনুরাগ ও সক্রিয় প্রচেষ্টা দেখা যায়। পল্লীর বালকদের শিক্ষাদানের জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে স্বীয় ঠাকুরবাটীর প্রশস্ত নাটামণ্ডপে অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন করেছিলেন। কামারপুকুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এই পাঠশালাটি 'লাহাবাবুর পাঠশালা' নামে বিখ্যাত হয়েছিল। যাহোক, উক্ত পাঠশালায় নিযুক্ত শিক্ষক মহাশয়ের বৃত্তি এবং তার পরিচালনের অন্যান্য ব্যয়ভার তিনিই বহন করিতেন।

অতিথিসৎকার-বিষয়েও লাহাবাবু বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কামারপুকুর পল্লীর দক্ষিণ-পূর্ব-প্রান্তে শ্রীক্ষেত্র পুরীধাম গমনাগমনের পথের পার্শ্বে তীর্থযাত্রী ও পর্যটকগণের জন্য তিনি নিজব্যয়ে এক বৃহৎ অতিথিশালা নির্মাণ করেছিলেন। প্রত্যহ এই অতিথিশালায় দেশ-দেশান্তরের বহু সাধু-বৈষ্ণব ও অতিথি-অভ্যাগতের সমাগম হত। আগন্তুকগণের জন্য তিনি তথায় বিশ্রাম ও আহারাদির অতি উত্তম বন্দোবস্ত করেছিলেন। তথায় আতিথ্য গ্রহণ ক'রে সমাগত সকলেই পরম আহ্লাদিত ও পরিতৃপ্ত হতেন। লাহাবাবুর অতিথিশালার সুবন্দোবস্তের খ্যাতি চারদিকে সুপ্রচারিত হয়েছিল।

ধর্মদাস লাহা স্বীয় প্রকৃতিগত মহৎ গুণাবলী ও বিবিধ সৎকর্মের জন্য পল্লীবাসিগণের পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন। মহাত্মা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় তাঁকে অগাধ প্রীতির চক্ষে দেখতেন। তিনি লাহাবাবু এবং তাঁর পরিবারবর্গের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। লাহাবাবুও মহাত্মা ক্ষুদিরামকে সর্বদাই অশেষ ভক্তি-মান্য করতেন। তাঁদের উভয়ের মধ্যে নিবিড় অন্তরঙ্গতা ও মধুর সম্প্রীতি দেখা যায়। লাহাবাবু ক্ষুদিরাম চাটুয্যে অপেক্ষা সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন।

কামারপুকুরের এই ধর্মপ্রাণ লাহা-পরিবার অত্যন্ত বর্দ্ধিষ্ণু ছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-বৃত্তান্তে এই পরিবারের মাত্র সামান্য কয়েক-জনের উল্লেখ দেখা যায়। লাহাবাবু এবং তাঁর ভক্তিমতী পত্নীর প্রসঙ্গ ক্বচিৎ উল্লেখিত রয়েছে। আর তাঁদের পুত্র-কন্যাগণের মধ্যে কেবল প্রসন্নময়ী ও গয়াবিষ্ণুর খণ্ড খণ্ড বৃত্তান্ত ইতস্ততঃ লিপিবদ্ধ দেখা যায়। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার সহিত একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এই বিখ্যাত পরিবারের উল্লেখিত মাত্র এই কজন ছাড়া আর অপর কারও বিবরণী উদ্ধার করা সম্ভবপর নয়।

লীলাবার্তা

[গদাধরের অন্নপ্রাশনে ধর্মদাস]

শ্রীমান গদাধর ক্রমশঃ ষষ্ঠমাসে পদার্পণ ক'রলে মহাত্মা ক্ষুদিরাম নিজ সঙ্গতি অনুসারে তার অন্নপ্রাশনের বন্দোবস্ত করেন। তিনি মনস্থ করেন, শুভদিনে ঐ উপলক্ষ্যে শাস্ত্রবিহিত আবশ্যিক কৃত্যগুলি যথানিয়মে সম্পাদন ক'রে ৺রঘুবীরের প্রসাদী অন্ন পুত্রের মুখে প্রদান করবেন এবং সেই অনুষ্ঠানে মাত্র দু'চারজন নিকট আত্মীয়কেই নিমন্ত্রণ ক'রে ভোজন করাবেন।

কিন্তু ধর্মদাস লাহার উৎসাহে ও প্রেরণায় ঐ অনুষ্ঠান কার্যকালে মহাসমারোহপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর গোপন পরামর্শে কামারপুকুর পল্লীর প্রবীণ ব্রাহ্মণ-সজ্জনগণ ক্ষুদিরামকে ধরে বসেন, ঐ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তাঁদেরও ভোজন করাতে হবে। তখন ক্ষুদিরাম হাসিমুখে 'রঘুবীরের ইচ্ছা', বলে তাঁদের সাদর

আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু পরক্ষণে তিনি ভাবেন, গ্রামবাসী কেবল কয়েকজন ব্রাহ্মণকেই ভোজন করিয়ে এই অনুষ্ঠান সম্পাদন করা তাঁর পক্ষে আদৌ সমীচীন হবে না, কারণ গ্রামস্থ সকলকেই তিনি সমান প্রীতির চক্ষে দেখেন এবং সকলেরই সঙ্গে সমান ব্যবহার করেন। অতএব তিনি কাদের বাদ দিবেন এবং কাদের নিমন্ত্রণ করবেন, ভেবে স্থির করতে পারলেন না। তাছাড়া, আশানুরূপ ব্যবস্থা এবং সমারোহ করার মতো তাঁর সামর্থ্যই বা কোথায়? যা হোক, এ-জন্য তিনি স্বভাবতই কিছুটা চিন্তিত হলেন। এ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভিপ্রায়ে যুক্তি-পরামর্শ করার জন্য অবশেষে তিনি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার নিকট গমন করেন। অতঃপর তাঁর সঙ্গে ঐ বিষয়ে আলোচনাদি ক'রে তিনি সহজেই বুঝতে পারেন যে, ঐ বন্ধুবরেরই গুপ্ত প্রেরণায় ও উৎসাহে উক্ত ব্রাহ্মণগণ তাঁর নিকট ঐরূপ মধুর আবদার করেছেন।

পরিশেষে ক্ষুদিরাম ৺রঘুবীরের উপর সমুদয় ভার অর্পণ ক'রে ঐ অনুষ্ঠানে ভোজন করার জন্য নিজের সকল আত্মীয়বর্গ, গ্রামস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বর্ণের সকল প্রতিবেশীকে সাদর নিমন্ত্রণ জানান। ফলে নির্ধারিত দিনে গদাধরের শুভ অন্নপ্রাশন-অনুষ্ঠানে অভাবনীয় সমারোহ হয়।

'গরীব ব্রাহ্মণবাড়ী কিন্তু আজি দিনে।
চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় পায় চারিবর্ণে॥
গ্রামের ব্রাহ্মণ আর যতেক সজ্জাতি।
বৈষ্ণব ভিখারী প্রতিবাসী জোলা তাঁতি॥
সমভাবে সকলে উদর পূরি খায়।
কুলের ঠাকুর রঘুবীরের কৃপায়॥'—পুঁথি

বস্তুতঃ লাহাবাবুরই আন্তরিক অভিপ্রায়ে ও উৎসাহে এই অনুষ্ঠান এরূপ বিরাট আকার ধারণ করে এবং বিশেষ আড়ম্বরপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তোলার জন্য তিনি অন্তরালে থেকে নানাভাবে সাহায্যও করেন।

[লাহাভবনে গদাধর]

'এইরূপে দুই তিন বর্ষ গেলে পরে।
সমান বয়স শিশু সঙ্গে খেলা করে॥
লাহা নামে ধনাঢ্যবংশীয় সেই গ্রামে।
যাওয়া আসা হয় তার তাঁহার ভবনে॥'
—পুঁথি

শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার ভবন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদ্যলীলা-বিলাসের একটি বিশিষ্টতম ক্ষেত্র। শৈশব ও বাল্যে তিনি তাঁর অঙ্গনে যে কত শতবার পদার্পণ করেছেন, এবং কত লীলা-খেলা করেছেন, তার ইয়ত্তা করা অসম্ভব।

গদাধরের বয়স ক্রমশঃ দু'তিন বছর হলে, সে তার সমবয়সী শিশুদের সঙ্গে মধুর খেলা-ধুলা আরম্ভ করে। ধর্মদাস লাহার পুত্র গয়াবিষ্ণু ছিল তার সমবয়সী এবং একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। গয়াবিষ্ণুর টানে এবং লাহাগিন্নী ও প্রসন্নময়ী প্রমুখ স্নেহশীলা রমণীগণের প্রীতি-আকর্ষণে, এখন হতে লাহাভবনে তার ঘন ঘন যাতায়াত শুরু হয়।

বালক গদাধরের প্রতি ধর্মদাস লাহার অগাধ অপত্যস্নেহ, বাৎসল্য-প্রেম দেখা যায়। তিনি তাকে নিজ পুত্রাধিক স্নেহ-আদর করতেন। তাকে দেখে তিনি স্বভাবতই পরম আহ্লাদিত হতেন এবং তার প্রতি এক অনির্বচনীয় প্রেমাকর্ষণ অনুভব করতেন। স্বীয় বিবিধ কারবারের জটিল হিসাব-নিকাশে এবং খাতা খতিয়ান প্রভৃতি বিশেষ জরুরী কার্যে তিনি নিবিষ্ট থাকলেও গদাধরকে দেখা মাত্রই যেন কিরূপ ভাব-বিহ্বল হয়ে পড়তেন।

তখন তাঁর ঐ সমস্ত কাজ-কর্ম একেবারে স্তব্ধ হয়ে যেত।

'আর না হইত তাঁর হিসাবেতে মন।
কি জানি কি করিতেন তাহে দরশন॥
বলিতেন ধর্মদাস শিশু গদাধরে।
যাও বাপ খাও গিয়া কি রেখেছে ঘরে॥'

—পুঁথি

তিনি পরম স্নেহভরে তাকে নিজ সকাশে আহ্বান করতেন এবং নির্নিমেষ নয়নে তার দিকে চেয়ে থাকতেন। তাকে দেখে এবং তার আধ আধ মধুর কথাবার্তা শুনে তিনি বিমোহিত হয়ে পড়তেন। তাকে অজস্র স্নেহ-আদর ক'রেও তাঁর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ চরিতার্থ হত না। অবশেষে তিনি তাকে মিষ্টান্নাদি উপহার গ্রহণের জন্য অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিতেন।

অন্তঃপুরবাসিনীরাও তার আগমন-প্রতীক্ষায় বিশেষ ব্যাকুল থাকতেন। তাকে পেয়ে তাঁরাও পরম উল্লসিতা হয়ে উঠতেন। তাকে কোলে-পিঠে নিয়ে তাঁরা কত আদর-স্নেহ করতেন। তার মধুর খেলাধুলা দেখে এবং আধ আধ কথা-বার্তা শুনে তাঁরা আত্মহারা হয়ে পড়তেন। তাঁরা প্রত্যহ তাকে গৃহজাত ক্ষীর-সর, নাড়ু-ননী প্রভৃতি উপহার দিতেন। ঐ সকল উপাদেয় মিষ্টান্ন পেয়ে গদাধর মহা আনন্দিত চিত্তে ঐগুলি ভোজন করত। দেখে তাঁদেরও আনন্দের অবধি থাকত না।

[গদাধরের সঙ্গে গয়াবিষ্ণুর মিত্রতা]

'আপন নন্দন গয়াবিষ্ণু নাম খ্যাতি।
সমবয়ঃ গদায়ের সঙ্গে বড় প্রীতি॥

সঙ্গে নানারূপ খেলা বালকের সনে
সসঙ্গী কানাই যেন নন্দের অঙ্গনে॥'

—পুঁথি

ধর্মদাস লাহার পুত্র গয়াবিষ্ণু গদাধরের সমবয়সী ছিল। শৈশবাবধিই এই বালকদ্বয়ের মধ্যে প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতা ও নিবিড় ঘনিষ্ঠতা দেখা যায়।

বালকদ্বয়ের অদ্ভুত সৌহার্দ্য লক্ষ্য ক'রে ধর্মদাস তাদের উভয়ের মধ্যে ধর্মসম্পর্ক স্থাপনের জন্য ক্রমশঃ আগ্রহান্বিত হন অবশেষে তিনি ঐ বিষয়ে সুহৃদবর ক্ষুদিরামের সহিত পরামর্শ করেন। ক্ষুদিরাম হৃষ্টচিত্তে তাকে সম্মতি দেন। অতঃপর লাহাবাবু শুভদিনে এক আড়ম্বরপূর্ণ ধর্মানুষ্ঠান ক'রে গদাধরের সঙ্গে গয়াবিষ্ণুর 'স্যাঙাৎ' বা মিত্রতা পাতিয়ে দেন। ঐ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তিনি বিশেষ আনন্দোৎসবও করেন। বস্তুতঃ এই ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা তিনি গদাধরকে একান্ত নিকটতম আত্ম-সম্পর্কে লাভ ক'রে চির চরিতার্থ হন। মনে হয় এই জন্যই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'কার লাহাবাবুকে কৃষ্ণলীলায় বিজড়িত মহারাজ নন্দের সহিত তুলনা করেছেন।

[লাহাবাবুর পাঠশালায় গদাধর]

শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলার আর একটি বিশেষ চিহ্নিত ক্ষেত্র। পাঁচ বছর বয়সে পিতার নিকট হাতে খড়ি হওয়ার পর গদাধর শ্লেট-পাততাড়ি নিয়ে এই পাঠশালেই প্রবেশ করে। তার বিদ্যালয়ের পাঠ এইখানেই আরম্ভ এবং এইখানেই সমাপ্ত হয়। পাঁচ বছর বয়স হতে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত এই পাঠশালার সঙ্গে তার সম্পর্ক দেখা যায়।

এই পাঠশালে তার প্রবেশকালে শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার নামে একজন শিক্ষক তথায় শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন। যদুনাথের নিকট তার বিদ্যারম্ভ হয়। বছর কয়েক পরে তিনি অবসর গ্রহণ করলে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সরকার

তথায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এই পাঠশালে গদাধর উল্লিখিত উভয় শিক্ষকেরই নিকট হতে পুত্রাধিক স্নেহ-আদর লাভ করে। তথায় তার সহপাঠিগণের মধ্যে মাত্র তিন জনের নাম প্রামাণিক গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ দেখা যায়। তাদের মধ্যে একজন শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার পুত্র গয়াবিষ্ণু, আর দুইজন কামারপুকুরের গঙ্গাবিষ্ণু লাহা ও শ্রীরাম মল্লিক। এদের সঙ্গে বাল্যকালে তার প্রগাঢ় সম্প্রীতি এবং নিবিড় অন্তরঙ্গতা লক্ষিত হয়। সাধকোত্তর জীবনেও শ্রীরাম-কৃষ্ণের মানসপটে এদের স্মৃতি সমুজ্জ্বল দেখা যায়।

এই পাঠশালে প্রবেশের স্বল্পকাল মধ্যেই গদাধর নিজ সরল-মধুর প্রকৃতির গুণে শিক্ষক ও ছাত্রগণের সকলেরই অশেষ প্রীতিভাজন হয়ে ওঠে। বাল্যাবধি তার মধ্যে বিচিত্র প্রতিভার বিকাশ দেখা যায়। শৈশব কাল হ'তেই সে ছিল অত্যাশ্চর্য শ্রুতিধর ও মেধাবী। তার স্মৃতিশক্তিও ছিল অদ্ভুত প্রখর। তাছাড়া, তার কণ্ঠস্বর ছিল সুললিত এবং বাচনভঙ্গিমাও ছিল অতি সরস ও মনোমুগ্ধকর। সঙ্গীতে এবং অভিনয়েও তার বিশেষ নৈপুণ্য দেখা যায়। সে স্বল্পকালের মধ্যেই মধুর সঙ্গীতে এবং সরস হাস্য-কৌতুক ও অভিনয়ে পাঠশালা মাতিয়ে তোলে।

'আপনি করেন গান মুখে বাদ্য বাজে।
দুই হাতে দেন তাল পদদ্বয় নাচে॥
গীত-বাদ্য-নৃত্য তার অতি পরিপাটি।
মাঝে মাঝে সং দেওয়া কিছু নাহি ত্রুটি॥
হেসে হেসে মরে গুরুসহ ছাত্রগণ।
কতই আনন্দ তাঁর নাহি নিরূপণ॥
শুনি হাসি-রোল যারা থাকিত নিকটে।
তেয়াগিয়া কার্য-কর্ম পাঠশালে জুটে॥'—পুঁথি

৪

[লাহাবাবুর অতিথিশালায় গদাধর]

লাহাবাবুর অতিথিশালা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্য-কৈশোর-লীলা-রঙ্গের আর একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র। গদাধর বাল্যাবধি কখন একাকী, কখন বা গয়াবিষ্ণু, শ্রীরাম মল্লিক প্রমুখ বন্ধুগণ-সহ এই অতিথিশালায় উপস্থিত হত। এখানে সাধুদের ধুনির নিকট বসে সে একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে তাঁদের ধ্যান-ধারণা ও পূজার্চনাদি দর্শন করত এবং তাঁদের ভজন-কীর্তন শাস্ত্রপাঠ ও উপদেশাদি শ্রবণ করত। তাঁরা ধুনির আগুনে কিভাবে ভোজ্যাদি প্রস্তুত ক'রে ঐগুলি ইষ্ট-দেবতাকে নিবেদনপূর্বক ভোজন করতেন—এ-সকল অনুষ্ঠানও সে অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করত। সাধু-সন্ন্যাসিগণের অনাড়ম্বর বেশ-ভূষা এবং ত্যাগ-বৈরাগ্যময় পবিত্র জীবন-ধারা দেখে সে পরম আকৃষ্ট হত।

গদাধরের নয়নাভিরাম মূর্তি এবং বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রকৃতি দেখে তাঁরাও তার প্রতি আকৃষ্ট হতেন। তাঁরা তাকে অশেষ আশীর্বাদ ও স্নেহ-আদর করতেন। ভোজনের পূর্বে তাঁরা পরমপ্রীতি-ভরে তাকে প্রসাদ দিতেন। সে ঐ প্রসাদের কিছু অংশ মহানন্দে উপস্থিত বন্ধুদের বিতরণ ক'রে অবশিষ্ট নিজে গ্রহণ করত।

এইভাবে ক্রমশঃ যতই দিন যেতে থাকে, গদাধরের অন্তরে সাধুসঙ্গলাভের অনুরাগ ততই প্রবল হতে থাকে। অতঃপর সে এই অতিথি-শালায় প্রতিদিন ঘন ঘন গতায়াত শুরু করে এবং সাধু-বৈষ্ণবগণের পূত সন্নিধানে বহুক্ষণ অতিবাহিত করতে থাকে। কখন কখন সে কাষ্ঠ-পানীয়, ফল-মূল, পুষ্প-বিল্বপত্র প্রভৃতি আহরণ ক'রে এনে তাঁদের উপহার দিত। আবার কখন কখন সে নিজ জননীর নিকট হতে চাল-ডাল, আটা-আলু প্রভৃতি ভোজ্য সংগ্রহ ক'রে এনে তাঁদের ভিক্ষা দান করত তাঁর

এরূপ আন্তরিক ভক্তিপূর্ণ সেবায় তাঁরা অত্যন্ত প্রীত হ'তেন এবং তার মঙ্গল কামনা ক'রে তাকে অজস্র আশীর্বাদ করতেন।

গদাধর তাঁদের বেশ-ভূষায় আকৃষ্ট হয়ে কোন কোন দিন তাঁদের নিকট বসে তিলক-চন্দনাদিতে নিজ দেহ চর্চিত করত, কোন কোন দিন সর্বাঙ্গে ধুনির ভস্ম মেখে পরম আহ্লাদিত হ'ত। ঐরূপ বেশ-ভূষা ধারণ ক'রে মহানন্দে নৃত্য করতে করতে সে কখন কখন নিজ জননীর নিকটও আগমন করত। তার ঐরূপ মতি-গতি ও ভাব-প্রকৃতি দেখে চন্দ্রাদেবীর হৃদয় সময় সময় বিষম আশঙ্কায় ভরে উঠত।

গদাধরের বয়স তখন প্রায় আট বছর। একদিন চন্দ্রাদেবী তাকে একখানি নতুন বস্ত্র পরিয়ে এবং তার মনোহর কেশদাম সুন্দরভাবে পরিপাটি ক'রে তাকে বেশ মনোমত ক'রে সাজিয়ে দেন। তারপর সে বন্ধুদের সঙ্গে খেলা-ধূলা করতে করতে ক্রমশঃ অতিথিশালায় উপস্থিত হয়। তথায় সেদিন একদল নাগা সন্ন্যাসীর আগমন ঘটে। সন্ন্যাসিগণের জটাজুট-ডোর-কৌপীন-পরিহিত বিভূতিভূষিত সৌম্য মূর্তি দেখে তার অন্তরে ঐরূপ বেশ-বাস ধারণের বাসনা জন্মায়। সে তখন তার ঐ নতুন বস্ত্রখানি খণ্ড খণ্ড ক'রে ডোর-কৌপীন ও ভিক্ষার ঝুলি ক'রে এবং সর্বাঙ্গে ভস্ম মেখে—সন্ন্যাসীর বেশে মহানন্দে জননীর নিকট উপস্থিত হয়।

'কহেন মায়ের আগে নাচিয়া নাচিয়া।
অতিথি হয়েছি মাগো দেখ না চাহিয়া॥

সন্ন্যাসীর বেশ অঙ্গে দেখিয়া নয়নে।
শেলের সমান লাগে জননীর প্রাণে॥'—পুঁথি

শ্রীরামকৃষ্ণ-মহাজীবন গভীরে পর্যালোচনা করলে মনে হয়, তাঁর অভিনব জীবন-দর্শনে লাহাবাবুর এই অতিথিশালার প্রভাবের একটা বিশেষ অংশ ছিল। তিনি বাল্যকালে এখানে বিভিন্নপন্থী বহু সাধু-সন্ন্যাসী এবং ভক্ত ও সাধক-গণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন, বহু জনকে বহু বিভিন্ন পথ অবলম্বনে ভগবানকে আরাধনা করতে দেখেছিলেন। (ক্রমশঃ)

'তুমি বিগ্রহ আর আমি তব পায়ে ফুল'

শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

তুমি বিগ্রহ আর
আমি তব পায়ে ফুল,
জীবনসায়রে ভাসিতে ভাসিতে
এইখানে পাই কূল।
জনমে জনমে তোমার দেউলে
কতরূপে গেনু পূজাবেদীমূলে
আবার সেথায় লভিয়াছি ঠাঁই—
একি মিছে, একি ভুল?
তুমি বিগ্রহ আর
আমি তব পায়ে ফুল।

আমার মনের যত নিবেদন
বাঁধা হয়ে এক সুরে
কবিতা হইয়া ফুটিয়া উঠে যে
সকল জীবন জুড়ে।
চিরজনমের ভাব-পারাবার তুমি,
সকল মনের ভাবের ধারার নিত্য মিলন-ভূমি।
যুগে যুগে তাই যত গান গায়
মরমিয়া বুলবুল
মূল কথা তার: তুমি বিগ্রহ আর
আমি তব পায়ে ফুল।

উপনিষদের কথা

ডক্টর অণিমা সেনগুপ্তা

সাধারণতঃ উপনিষদ্ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা, এই গ্রন্থগুলি কেবল জীব, জগৎ, ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতির আধ্যাত্মিক বিচার দ্বারাই পরিপূর্ণ। আমরা মনে করি কেবল মোক্ষশাস্ত্র-সংগঠনেই উপনিষদ্ সহায়ক; মানুষের ব্যবহারিক জীবনে উপনিষদের বাণী কোন কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই একমাত্র সদ্বস্তু, এবং বিশ্বের সকল বস্তু তাঁরই অভিব্যক্তি—এ তো হ'ল সাংসারিক-জীবনবিমুখ নিছক ধর্মকথা! এই বাণীর ব্যবহারিক সার্থকতা কতটুকু! এরূপ দৃষ্টি নিয়ে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও উপনিষদের অধ্যয়ন অধ্যাপনা হ'য়ে থাকে। এ অধ্যয়ন অসম্পূর্ণ। সেজন্য, উপনিষদের গভীর ভাবধারায় অবগাহন ক'রে এবং উপনিষদের প্রকৃত ভাবামৃত মন্থন ক'রে জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টি সাধনের ব্রত আজও আমাদের দেশে অসমাপ্ত রয়েছে। সাধারণ শিক্ষিতের দৃষ্টিতে উপনিষদের সম্পর্ক কেবল সন্ন্যাস-জীবনের সঙ্গে, ত্যাগীর জীবনের সঙ্গে। মানবকে তার গার্হস্থ্য জীবনে বা ব্যবহারিক জীবনে যোগক্ষেমলাভে উপনিষদ্ কোনরূপ সহায়তা করতে পারে না বলেই সাধারণের বিশ্বাস। উপনিষদের গভীরতায় যে অল্পসংখ্যক ঋষিতুল্য মনীষী ডুব দিতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁদের দৃষ্টির রূপায়ণ হয়েছে কিন্তু একেবারে ভিন্নভাবে। তাঁদের দৃষ্টিতে উপনিষদে নিহিত আছে সত্যকার জীবন-সমস্যার বাণী এবং তার সুন্দর সমাধান। মানবকে মনুষ্যত্বলাভের পথে পরিচালিত করতে এবং জগতের আনন্দ ও শান্তি বিশুদ্ধভাবে ভোগ ক'রে, তা থেকে একটা দিব্য তেজ সঞ্চয় করতে, বর্তমান জগতে একমাত্র উপনিষদই সহায়ক হ'তে পারে।

আত্মকেন্দ্রিকতার প্রবৃত্তি সহজাত বলেই মানবের আত্মপ্রসারের পথে তা প্রবল ও প্রধান অন্তরায়। সেজন্য, আত্মকেন্দ্রিকতায় যে সুখ নাই, সুখ আছে আত্মত্যাগে—উপনিষদের এই গভীর তথ্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে মানুষের ব্যবহারিক জীবনই সর্বাপেক্ষা লাভবান হবে। আত্মকেন্দ্রিক প্রবৃত্তি কেবল নিজের দেহ-মনকে আশ্রয় ক'রে জেগে ওঠে এবং তাতেই সীমিত হয়ে যায়। ফলে, মানুষ হয় স্বার্থপর এবং স্ব-ভোগলালসায় উন্মত্ত। এই উন্মত্ততা যেমন পারিবারিক জীবনে ধ্বংসের বীজ বপন করে, তেমনি জাতীয় জীবনকেও সর্বনাশা পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। যোগক্ষেম এক নিমিষে তলিয়ে যায় কোন্ অন্ধকার অতল গভীরতায়!

কিন্তু একটা মহৎ আবেগে যদি আমাদের আত্মকেন্দ্রিক জীবনটা গোড়াসুদ্ধ নড়ে উঠতে পারে,—যদি আমরা এই জীবনটাকে পরাভূত করতে পারি,—তাহ'লেই দেখতে পাই আমি আমার ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ থেকে অনেক বড়, এদের তুচ্ছ বন্ধন থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত, আমার আনন্দ সবার আনন্দে মিশে আছে, আমার আত্মবিসর্জনই আমার আত্মপ্রাপ্তি।

এই মহৎ আবেগটি প্রতি মানবের অন্তরে সঞ্চারিত ক'রে দেবার জন্যই উপনিষদে বলা হয়েছে:

"ঈশা বাস্যম্ ইদং সর্বং যৎকিঞ্চ
জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ
কস্যস্বিদ্ ধনম্।"

অর্থাৎ, হে মানব, পরম চৈতন্যের দ্বারা এই চলমান জগতের সমস্ত সম্পদ উদ্ভাসিত হয়েছে বলে অনুভব করতে চেষ্টা করো। তাহ'লেই তোমার ভোগ হবে ত্যাগবিদ্ধ। যে ধন অন্যের, তার প্রতি লোলুপ হ'য়ো না। গৃধ্নুতা সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ কর।

এক নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, আত্মা সকলের মধ্যে বিরাজিত। সকলেই ঈশ। সকলেই এক এবং অভিন্ন। সুতরাং আমি কেবল আমার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখে গণ্ডীবদ্ধ ক্ষুদ্র মানবমাত্র নই। আমি সকল জগতের। সকলের সুখভোগ আমারই পরম ভোগ, আমারই পরম আনন্দ।

বাস্তবিকপক্ষে জগতে শান্তি ও সুখ রক্ষা ক'রে কর্ম করতে হ'লে পরকল্যাণের মধ্যেই স্ব-কল্যাণের অনুসন্ধান করতে হবে। তাহ'লেই হিংসা, লোলুপতা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা প্রভৃতি নিম্নগামী প্রবৃত্তির প্রভাব হ'তে ব্যবহারিক জীবনটাকেও মুক্ত রাখা সম্ভব হবে। জীবনের সর্বস্তরে আসক্তি ও লোলুপতা বর্জনের জন্য উপনিষদের ঋষি বার বার মানবকে আহ্বান করেছেন। এই আহ্বান শাশ্বত জীবনের আহ্বান; সর্বকালে সর্বদেশে মানবকে সুস্থ, সবল ও মহান্ হবার সাধনায় দীক্ষিত করার আহ্বান। এই আহ্বান বিমৃত্যু ও বিশুদ্ধ।

সমস্ত জগৎ ও জীবন আবিষ্ট ক'রে আছে অন্তর্যামী পরম চৈতন্য, যাঁর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়েছে জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু।

"একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ।"
"কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ।"

এই বিরাট বিস্ফারিত চৈতন্য একদিকে বিশ্বাতীত, অন্যদিকে বিশ্বানুগ। একদিকে তিনি "নেতি", অন্যদিকে তিনি "ইতি"। তিনি অরূপ হ'য়েও "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।" বস্তু-বিশ্ব তাঁরই প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত। উপনিষদের ঋষিকণ্ঠে ত্যাগের বাণী সর্বাধিক ধ্বনিত হলেও সর্বসাধারণের জন্য জগৎ-প্রত্যাখ্যানের বাণী ধ্বনিত হয় নাই, বরং জগৎভোগকে সুন্দর, সুমঙ্গল ও শুদ্ধ করে তুলে অমৃতলাভের লক্ষ্যে এগিয়ে চলার মহৎ ব্রতে উপনিষদ্ আমাদের দীক্ষিত করে। অখণ্ড চৈতন্যে পৌঁছাতে হ'লে যেমন জাগতিক পদার্থকে 'নেতি, নেতি' ক'রে অগ্রসর হ'তে হয়, তেমনি উপলব্ধির পরম মুহূর্তে আবার জগতের সকল পদার্থ তাঁরই অভিব্যক্তিরূপে প্রকাশমান হয়। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"—তিনিই যে বিশ্ব হ'য়ে রয়েছেন। বিশ্বকে তবে প্রত্যাখ্যান করা যায় কেমন করে? পরম চৈতন্য আত্মস্বরূপ, আবার বিশ্বরূপও তিনি বিশ্বের অন্তরে আবার বিশ্বের বাইরেও। সুতরাং বিশ্বকে তুচ্ছ করলে, তাঁকেই তুচ্ছ করা হবে। উপনিষদের ঋষি জগৎকে ত্যাগ করতে বলেন নাই, বলেছেন জগতের প্রতি যে আসক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে সংসারী মানুষ দুঃখগ্রস্ত হচ্ছে, সেই অজ্ঞানলব্ধ অশুদ্ধ দৃষ্টিটিকে ত্যাগ করতে। আসক্তির আবরণ মানবকে ক্ষুদ্র করেছে, সংসারকে কণ্টকাকীর্ণ করেছে, জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দকে সীমিত করেছে, পীড়িত করেছে, ক্লেদাক্ত করেছে।

আসক্তির প্রভাবে প্রত্যেকে মনে করে জগৎ কেবল তারই ভোগের জন্য সৃষ্ট হয়েছে এবং মনুষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য জগৎকে চূড়ান্তভাবে ভোগ করা, জীবনধারণ কেবল ভোগের জন্য এবং জ্ঞানের, কর্মের সার্থকতাও

কেবল ভোগের সহায়করূপে। মানুষ যখন স্ব-ভোগ-কামনা ভিন্ন জগৎ সম্বন্ধে আর কোন চিন্তাই করতে পারে না, তখনই তাকে জগতে দুঃখভোগ করতে হয়।

ভোগে আসক্তি বা স্বার্থপরতাই দুঃখের কারণ, জগৎ দুঃখের কারণ নয়। আসক্তি-জনিত দৃষ্টি এবং আসক্তিজনিত প্রেমই জাগতিক জীবনে দুঃখ বহন ক'রে আনে। জগৎ দুঃখরূপ নয়; দুঃখের বীজ রয়েছে আমাদের আসক্তিপূর্ণ অবিশুদ্ধ চিত্তে। চিত্তনদী "বহতি পাপায়, বহতি কল্যাণায় চ।" কল্যাণের পথে, মহৎ আবেগের পথে যদি মনকে পরিচালনা করা যায়, তবে চারদিক মধুময় হ'য়ে ওঠে। 'মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।' তাই উপনিষদের বাণী :

লোলুপতা ত্যাগ কর, শুদ্ধ চিত্ত নিয়ে যথার্থ আনন্দ উপভোগ কর। চির জ্যোতির্ময়ের জ্যোতিতে অন্তর পূর্ণ কর; সকল কালো নিঃশেষে মুছে ফেলে আলো হ'য়ে আপনাকে প্রকাশ কর।

"আত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতি; কতম আত্মেতি;
যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ
পুরুষঃ।"

জ্যোতিতে অবগাহন করছে সমস্ত বিশ্ব-সংসার। এখানে অভাবজনিত বেদনা বা বিক্ষোভের স্থান কোথায়?

"তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।"

দৃষ্টি, কর্ম ও ভোগকে জ্যোতিসিক্ত ক'রে শুদ্ধ করতে হবে। আত্মকেন্দ্রিকতা বা স্বার্থ-পরতার স্থূল আবরণটি ধ্বংস ক'রে ফেলতে হবে। যখনই মনুষ্য স্বার্থের দাস হ'য়ে সংসারে কর্ম করে, তখনই তাকে প্রতি পদক্ষেপে কেবল দুঃখ ও দুর্দশা ভোগ করতে হয়। স্বার্থপর মনুষ্য কেবল নিজের জীবনেই দুঃখ ভোগ করে না, অন্যের জীবনেও দুঃখের দাবদাহ জ্বালিয়ে দেয়। এরূপ মনুষ্যের হৃদয়ে কেবল স্বার্থহানির ভয়ই জেগে থাকে না, সেই সঙ্গে অন্যকে বঞ্চিত করার দুর্বুদ্ধি, অন্যের প্রতি ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও কলহভাবনার দ্বারাও তার চিত্ত সর্বদাই পীড়িত হ'তে থাকে।

আত্মকেন্দ্রিক প্রেমও মনুষ্যজীবনে কেবল দুঃখের শিখাই জ্বালিয়ে রাখে। যে ভালবাসা কেবল স্বার্থপর সম্ভোগে সীমাবদ্ধ থাকে, সেই কামনা-জর্জরিত ভালবাসার পরিণতি হয় ঘৃণা, ঈর্ষা ও হতাশায়। কিন্তু ভালবাসা যেখানে অনাসক্ত, সেখানে কেবল অনাবিল আনন্দই উৎসারিত হয়।

জগতের সর্বপ্রকার ভোগে ও কর্মে উদার অনাসক্ত দৃষ্টির সার্থকতাই ঘোষিত হয়েছে উপনিষদের মন্ত্রে। সুপ্ত মনুষ্যত্ব জাগ্রত ক'রে আপনাকে দেবত্বে উন্নীত করার সাধনা এবং শুদ্ধ দৃষ্টির প্রসন্নতা দ্বারা আপন কর্ম ও ভোগকে অনাসক্তিতে রূপান্তরিত করার সাধনাই হ'ল উপনিষদ্‌ বর্ণিত পুরুষার্থ। শুদ্ধ দৃষ্টি, শুদ্ধ কর্ম, শুদ্ধ প্রেম যেমন অধ্যাত্মিক জীবনে মুক্তির সাধন, তেমনি ব্যবহারিক জীবনেও সমৃদ্ধি-প্রাপ্তির সহায়ক। মানব যখন লোভ ও স্বার্থপরতাকে সংযম দ্বারা অতিক্রম করে, তখনই ন্যায়নিষ্ঠা, উদারতা, প্রেম ও মৈত্রী তার জীবনে মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের গৌরব বহন ক'রে আনে। বর্তমান জগতের ভোগলোলুপতা এবং তার অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল দেখে এ কথাই বার বার মনে হচ্ছে যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে আজ তৃষ্ণাতর্পণের নীতির আমূল পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে। উপনিষদ্‌-বর্ণিত তৃষ্ণাক্ষয়ের সাধনা যদি আজ আমাদের ব্যবহারিক জীবনেরও সাধনা হ'য়ে না ওঠে, তবে প্রলয়ঙ্কর সর্বনাশকে রোধ করা আর কোন প্রকারেই সম্ভবপর হবে না। আমরা যেন পরমচৈতন্যের অমৃতজ্যোতির ভাবনা দ্বারা তৃষ্ণা- ও আত্মকেন্দ্রিকতা-নাশের তপস্যায় সর্বান্তঃকরণে নিযুক্ত হ'তে পারি—বর্তমান যুগে উপনিষদের এই হ'ল প্রকৃত অনুশাসন।

ভারতের নব জাগরণে স্বামী বিবেকানন্দের দান

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার

নিবেদিতা তাঁর সুন্দর বই 'The Web of Indian Life'-এর মধ্যে বলেছেন যে, fundamental rights নিয়ে মানুষ ঝগড়া করে, franchise-এর কথা মানুষ বলে; কিন্তু একমাত্র ভারতবর্ষ বলছে যে, মানুষের fundamental right—মৌলিক অধিকার হলো ত্যাগ করতে পারা—to renounce the world—জগৎকে ত্যাগ করতে পারা। মানুষের কল্যাণের জন্য—বহুজনহিতায়—বহুজনসুখায়—নিজের সুখ-সুবিধা ত্যাগ করতে পারা যায়, একথা ভারতবর্ষ প্রথম বলেছে। একথা বুদ্ধ বলেছেন, বিবেকানন্দ বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন। সেজন্য নিবেদিতা বলেছেন, এই যে আমাদের fundamental right বা মৌলিক অধিকার সেটা ভোগের নয়—ভোট দেওয়ার কথা নয়— ত্যাগ করতে পারা। আমি যদি ত্যাগ করতে চাই তুমি আমাকে বাধা দেওয়ার কেউ নও। কিন্তু সে ত্যাগ কর'ছি কেন? আমি আমার ক্ষুদ্র 'আমি'কে ত্যাগ করছি—যাতে করে পাকা আমি, বৃহৎ আমি সমস্ত পৃথিবীর সকল আমির মধ্যে ছড়িয়ে যেতে পারে.

স্বামীজী এই প্রথম সূত্র দিলেন যে, তুমি নিজেকে বিশ্বাস করো, নিজের হারানো বিশ্বাস ফিরিয়ে আনো। একবার একজন রুগ্ন, ভগ্নস্বাস্থ্য যুবক স্বামীজীর কাছে গিয়ে বললেন, 'আমার ইচ্ছে করে আমি ব্রহ্মচর্য নিই, সন্ন্যাস নিই, আমার জগৎ আর ভাল লাগছে না, আমি সাধন-ভজনের পথে এগুতে চাই।' স্বামীজী তার কাঁধ দুটি ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'মিছে কথা বলতে পারবি?' সে তো অবাক! এ কি কথা! স্বামীজী বললেন, 'হ্যাঁ, মিছে কথা বলার জন্য যে শক্তি দরকার তোর তো তাও নেই। তুই যা, ব্রহ্মচারী হওয়া চলবে না।' একথার তাৎপর্য কি? কেন স্বামীজী বলেছিলেন ফুটবল খেলার কথা!— "You will understand the Gita, the Upanishads better through your biceps." 'গীতা পড়ার চেয়ে ফুটবল খেল' —এর মানে এই নয় যে, দোকানে, বাজারে, লাইব্রেরীতে, পুরোহিতদের কাছে গীতা দেখলেই সরিয়ে নিয়ে এসে সেখানে একটি করে ফুটবল রেখে দাও। এর মানে "অধিকতর সবল হলে গীতা আরো ভাল বুঝবে।" স্বামীজী যে মানুষের স্বপ্ন দেখেছিলেন সে অখণ্ড মানুষ, তার দেহ, তার মন, তার বুদ্ধি, তার আত্মা, তার চৈতন্য, তার আনন্দ—এ সমস্ত একেবারে একটা সত্যের মধ্যেই বিধৃত হয়ে আছে। এগুলি আলাদা নয়।

সেজন্য দেহকে বাদ দিয়ে মন নয়, মনকে বাদ দিয়ে প্রাণ নয়, প্রাণকে বাদ দিয়ে চৈতন্য নয়, চৈতন্যকে বাদ দিয়ে আনন্দ নয়। সেইজন্য ফুটবল খেলা মানে হোল দেহকে পুষ্ট করতে হবে, স্নায়ুকে সবল করতে হবে, তবেই মন একাগ্র হবে। মন একাগ্র হলে গীতার আদর্শ ভাল করে বোঝা যাবে। মানুষের এই যে একটা পরিপূর্ণ অখণ্ড রূপ স্বামীজী দেখলেন তা জগৎকে ত্যাগ করার মধ্যে নয়। মায়াবাদ মানে জগৎ মরীচিকা মিথ্যা মতিভ্রম নয়। মায়াকে স্বামীজী বললেন, 'a statement of

facts'—যা ঘটছে, তারই বিবৃতি। মানুষ অহর্নিশ মরছে, তবু সে নিজেকে অমর ভেবে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে, প্ল্যান করে; স্বামীজী বললেন, এইটি মায়া। একই জিনিস ভাল এবং মন্দ দু'রকম ফল সৃষ্টি করতে পারে—এই মায়া। যে আলোতে মুদীর দোকানে মুদী বসে বসে তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ছে, সেই আলো দেখে দেখে ডাকাত পাশের বাড়ীতে ডাকাতি করছে—একই আলো। এই ব্যাপারটির নাম হল মায়া।

স্বামীজী মানুষের যে জয়গান গাইলেন, সে মানুষ স্বয়ম্প্রকাশ ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন। "Christs and Buddhas are but waves of the ocean which I am." 'অয়ং অহং ভোঃ'—এই জয়গান গাইলেন স্বামীজী। সেখানে বললেন, আমিই সব চাইতে বড়, আমার চাইতে বড় কেউ নেই। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই আমিকে বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে আমিই হলাম আসলে ব্রহ্ম—আমি সচ্চিদানন্দ—নতুবা এত বড় শক্তি আমি পেলাম কোথা থেকে? নতুবা এত বড় ঐশ্বর্য আমাকে দিল কে? নতুবা অঘটন-ঘটন করতে আমি পারলাম কি করে? যদি আমি খর্ব, ক্ষিন্ন, ক্ষুদ্র হতাম তাহলে পারতাম না। তাই তিনি বিদেশে গিয়ে বললেন, It is a sin to call man a sinner. বেদান্ত কখনও পাপের কথা বলেনি, কখনও বলেনি মানুষ পাপী। বেদান্ত বলছে মানুষ অমৃতের সন্তান। এত বড় আশ্বাসের কথা, এত বড় বিশ্বাসের কথা, এত বড় সমৃদ্ধির কথা মানুষ আর কোথাও শোনেনি। বিবেকানন্দের কণ্ঠে প্রথম শুনল; তাঁর কাছে জনজাগরণের প্রথম সূত্রটি পেলাম—মানুষই ব্রহ্ম—অহং ব্রহ্মাস্মি।

কিন্তু স্বামীজী একথা বললেন না যে, এই কথা কেবল বেদান্ত বলেছে—তিনি debating club খুললেন না। ঠাকুরের আদর্শ অনুসরণ করে তিনি বললেন যে, সকল ধর্মই সমান। যেমন জৈনদর্শনে আমরা অনেকান্তবাদের কথা পেয়েছি—স্যাদ্বাদের কথা পেয়েছি—ঠিক সেই সত্যটি একটি অপূর্ব উদাহরণের দ্বারা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বোঝাচ্ছেন। একটি গাছের উপরে একটি বহুরূপী থাকত, সে কখনো নীল, কখনো লাল, কখনো কালো, কখনো বেগুনী। যারা সেই বহুরূপীকে দেখেছে—তাদের মধ্যে ঝগড়া হলো। একজন বলল, বহুরূপীর রঙ লাল, একজন বলল হলদে, আর একজন বলল নীল। কিন্তু সেই ঝগড়ার মীমাংসা করতে হবে। মীমাংসা করবার জন্য তারা দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের কাছে গেল না, টোলের পণ্ডিতের কাছে গেল না, তারা বৈদান্তিকের কাছে গেল না, তারা debating club খুললো না, তারা parliament-এ গেল না, তারা গেল সেই লোকটির কাছে, যে লোকটি চিরকাল ঐ গাছের নীচে বাস করছে, যে লোকটি বহুরূপীটিকে সর্বাবস্থায় দেখেছে। অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণের—প্রত্যক্ষদর্শীর কথার—সাহায্য তারা নিল। তারা গিয়ে বললো, "মশাই, আপনি তো বরাবর এখানে বাস করেন, এ বহুরূপীর রঙটা কি বলুন তো? আমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে। আমি বলছি হলদে, ঐ লোকটা বলছে লাল, আমার বন্ধু বলছে নীল।" সেই লোকটি, যিনি বরাবর গাছের নীচে থাকেন, যাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়েছে, তিনি বললেন যে তোমরা সকলেই ঠিক বলেছ; বহুরূপীটি কখনো নীল, কখনো লাল, কখনো হলদে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলছেন, কখনো আবার তার কোন রঙই থাকে না। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামীজীকে "যে রাম, যে কৃষ্ণ,

সেই-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ”—একথা বলার পরই বলেছেন, “তবে তোর বেদান্তের দিক থেকে নয়।” যেমন বলা হয়েছিল যে, আমরা যেদিক দিয়ে যাই না কেন—একই সত্যে পৌছুবো সে কথার তাৎপর্য এখানে দেখতে পাবেন। যেমন ঠাকুর বলছেন যে ঈশ্বর বেদবিধির পারে; নিজের অনুভূতি সম্বন্ধেও বলেছেন যে, তা বেদ-বেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে। শাস্ত্রের মধ্যে তাঁকে পাওয়া যাবে না; অনুভূতি চাই। আমরা উপনিষদে বারবার পড়েছি পরাবিদ্যা, আর অপরাবিদ্যার কথা। সেখানে অপরাবিদ্যার মধ্যে কিন্তু বেদান্তও রয়েছে—বেদান্ত পরাবিদ্যা নয়। পরাবিদ্যা হল প্রত্যক্ষ অনুভূতি—আত্মজ্ঞান, আত্মোপলব্ধি। সেই জ্ঞান বা উপলব্ধির জন্য পুঁথির দরকার করে না। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে জীবনই ছিল একমাত্র পুঁথি। সেই পুঁথি চিরকাল খোলা ছিল; তার অক্ষর কালিতে ছাপা নয়, হৃদয়ের রক্ত দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে লেখা ছিল। সেই পুঁথি খোলা পুঁথি বলেই আজও সেই পুঁথি পড়ে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ প্রেরণা পাচ্ছে, আনন্দ পাচ্ছে, শান্তি পাচ্ছে। এইখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন—শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেননি যে, সকল ধর্মের synthesis করতে হবে। আমরা প্রায়ই বলি সর্বধর্মসমন্বয়। শ্রীরামকৃষ্ণ synthesis-এর কথা বলেননি। কেননা লক্ষ্য করুন তিনি বলেননি যে, বহুরূপীর সব রঙগুলো মিশিয়ে নতুন রঙ হলো। তিনি বলছেন, বহুরূপীর প্রত্যেকটা রঙই সত্যি। কখনও বা তার কোনও রঙই নেই, এও সত্যি। অর্থাৎ তিনি সগুণও, নির্গুণও এবং সগুণ-নির্গুণের পারেও। আসল কথা হচ্ছে প্রত্যক্ষ জ্ঞান; যে কথা উপনিষদ্ আমাদের বলছেন, ‘বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।’ খবরের কাগজে পড়েছি বলছেন না, ইতিহাসে দেখেছি তাও বলছেন না, ‘বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্’—সেই মহান্ পুরুষকে আমি দেখেছি, আমি জেনেছি। আমি পরের মুখে শুনেছি?—না, খবরের কাগজে পড়েছি?—না; thesis-এ পেয়েছি?—না, তাও নয়—আমি তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছি—যিনি অন্ধকারের পরপারে আছেন। আদিত্যবর্ণ কেন? সূর্য যেমন স্বয়ম্প্রকাশ—তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেন, অপর সকলকেও প্রকাশিত করেন। সূর্যকে দেখাবার জন্য আমরা প্রদীপ জ্বালি না, টর্চলাইট ধরি না, নিজের আলোকে সূর্য প্রকাশিত। ভগবানও ঠিক সেই রকম। এই কথাই স্বামীজী বলতে চাইলেন। তিনি কোন্ ধর্ম বড়, কোন্ ধর্ম ছোট, এই বিতর্কে গেলেন না; বললেন, সকল ধর্ম সমান, শুধু তাই নয়, বললেন, “I would rather welcome as many religions as there are human beings.”—যত মানুষ আছে, তত রকমের ধর্ম হোক, আমি বরং তাই-ই চাই। কেন? কারণ প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্যই হল—unity in diversity. আমি ‘বহুর’ মধ্যে যখন ‘একের’ সন্ধান পেয়েছি তখন আমি কিছুতে বিচলিত হব না। ‘এক’কে ধরেছি আমি। বহু বিচিত্র রূপে যদি বিচ্ছুরিত হয় সেই এক, বহুভাবে প্রকাশিত হয়, কোন আপত্তি নেই। এক যদি তার মূলে থাকে, তবেই বহু একের মধ্যে বিধৃত। সেই একক আমি বুদ্ধির দ্বারা পাবো না। অনুভূতির দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, সেবার দ্বারা পাবো। ‘তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।’ সেবা হলো সবচেয়ে বড় কথা। প্রণিপাতের দ্বারা, প্ররিপ্রশ্নের দ্বারা, জিজ্ঞাসার দ্বারা, সেবা দ্বারা তাঁকে জানো।

দ্বিতীয় স্তরে আসা যাক। যে মানুষের জয়গানের কথা রামমোহন বললেন, যে মানুষের কথা আমরা কংগ্রেসের মধ্যে শুনলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে শুনলাম, তারই কথা কিভাবে বলছেন স্বামী বিবেকানন্দ! যে বছর তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন, ১৮৯৭ সাল, ঠিক সেই বছর রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের যে constitution, সংবিধান, রচিত হল, তার মধ্যে বলছেন যে, আমাদের ব্যবহারিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির লক্ষ্য নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন দাঁড়িয়ে আছে।

উপনিষদে বারবার বলা হয়েছে, ব্যবহারিক উৎকর্ষ এবং আ্যাধ্যাত্মিক উজ্জীবন দুইয়ের মধ্যে যতক্ষণ সমন্বয় না হচ্ছে ততক্ষণ আমার জীবন কিছুতেই সমৃদ্ধ হচ্ছে না। নিঃশ্রেয়স এবং অভ্যুদয় উভয়েরই প্রয়োজন। আমাকে যদি ত্যাগ করতে হয় তবে ভোগের মধ্য দিয়ে ত্যাগ, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'নদীতে জল আছে, কিন্তু সেই বহনের দুঃখের দ্বারা তাহাকে আপনার করিতে হইবে।' বলছেন, 'ক্ষেতে শস্য উৎপন্ন করা যায়, ক্ষেত তো উর্বর, কিন্তু কর্ষণের দুঃখের দ্বারা তাহাকে আপনার করিতে হইবে।' রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ দিচ্ছেন যে, অসীম অনন্ত জল চলে যাচ্ছে, কিন্তু তোমার কাছে যখন তৃষ্ণার্ত লোক জল চায়, তুমি বল না যে, 'যান না মশাই নদীতে গিয়ে জল খেয়ে আসুন।' তুমি একটি পাত্র করে তাকে জল দাও। অর্থাৎ অনন্ত যে নদী চলে যাচ্ছে, অসীম যে নদী তাকে সীমিত করে একটি ঘটিতে বা একটি বাটিতে করে তাকে জল দাও। সেইজন্য অসীম আমাদের কাছে সীমিত হবেই। যতক্ষণ আমরা সীমার মধ্যে রয়েছি, ততক্ষণ তিনি সীমার মধ্যে প্রকাশিত না হলে তাঁকে আমরা বুঝতে পারছি না। কিন্তু সীমাকে অতিক্রম করে যখন তাঁকে দেখব তখন আনন্দের আর পরিসীমা থাকবে না। সেই জীবনকে যখন পেতে হবে তখন এই ব্যবহারিক জীবনের মধ্য দিয়ে পেতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ একথা তো বলেছিলেন। কিন্তু সেখানে একটি বড় কথা তিনি বলেছেন, যা আজকে আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না। তিনি বলেছেন, "আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য দেশমাতৃকাই তোমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা হউন। এই কয় বৎসর অন্যান্য দেবতাদের ভুলিয়া থাকিলেও ক্ষতি নাই।"

"তোমার সামনে একমাত্র দেবতা তোমার স্বজাতি। সর্বত্র তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার পদযুগল প্রসারিত। তিনি সবকিছু ব্যাপিয়া আছেন"—এ অপরূপ উক্তি! যে বছর রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, সে বছর তিনি কেন বললেন. আগামী পঞ্চাশবর্ষ ধরিয়া তোমার একমাত্র আরাধ্য-দেবতা জননী জন্মভূমি। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী একথা বলেছেন; তার সঙ্গে ৫০ বৎসর যোগ করুন—১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে, ঠিক ৫০ বৎসর পরে ভারত স্বাধীন হল। স্বামীজী ধ্যানদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন যে, এই ৫০ বৎসর ধরে আমাদের সাধনা করতে হবে, সংগ্রাম করতে হবে, যাতে রাষ্ট্রীয় মুক্তি আসে। কেন তিনি বলেছিলেন, "গোলামের ইহলোকেও নরক, পরলোকেও নরক?" কেন তিনি বলেছিলেন, "Freedom is the condition of growth?" কেন তিনি বলেছিলেন, "Freedom is the song of the soul?" এর বেশী কিছু বলেননি। যা বলেছেন তাতেই স্পষ্ট যে,

বাইরের বন্ধন থেকে মুক্ত না হতে পারলে জাতির চিন্তার মুক্তি, আধ্যাত্মিক মুক্তি, সর্বাঙ্গীণ মুক্তি হয় না। এই জাগরণের দ্বিতীয় সূত্র।

মানুষের মর্যাদা দিতে পারা যায় তখনই যখন সেই মানুষ স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে। একথা রামমোহন পূর্বে ইঙ্গিতে বলেছিলেন ; রবীন্দ্রনাথ পরে গান গেয়ে স্বদেশীযুগে বলেছিলেন, তাঁর স্যার উপাধি পরিত্যাগ-প্রসঙ্গে বলেছিলেন, হিজলী ডিটেনসন্ ক্যাম্প-এর অত্যাচারের প্রতিবাদে বলেছিলেন ; কিন্তু একথা স্বামী বিবেকানন্দ যেভাবে বলে গেছেন, সেভাবে আর কেউ বলেননি। সে সূত্র অনুসরণ করেছিলেন নিবেদিতা। সেজন্য তিনি স্বামীজী সম্বন্ধে বলতে পেরেছিলেন যে, the queen of his adoration was his motherland. স্বামীজীর আরাধনার সম্রাজ্ঞী ছিলেন এই ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ ছাড়া আর কিছু নয়। আপনারা জানেন, পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্করের কথা। সেই মারাঠী ব্রাহ্মণ 'দেশের কথা' নামক একটি বই লিখেছিলেন, যে-বই ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত ক'রে দেন পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর একদিন স্বামী বিবেকানন্দের কাছে গিয়ে বললেন, "আপনার কাছে বেদান্তের শিক্ষা গ্রহণ করতে এসেছি।" প্রায় দেড়ঘণ্টাব্যাপী নানারকম কথাবার্তা হল। সখারাম গণেশ দেউস্কর ফিরে গেলেন। যাবার সময় আক্ষেপ ক'রে বললেন, "স্বামীজী, আপনার কাছে আমি বেদান্ত শিখতে এসে-ছিলাম। কিন্তু সারাক্ষণ আপনি কী বললেন? আপনি ভারতবর্ষের দুর্গতির কথা বললেন, ভারতবাসী কী ক'রে উজ্জীবন লাভ করতে পারে তাই বললেন, তার আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় অবনতির কথা বললেন, তার অজ্ঞান, অশিক্ষা, কুসংস্কারের কথা বললেন। কিন্তু একবারও তো বেদান্তের কথা বললেন না, ধর্মের কথা বললেন না!" স্বামীজীর চোখ দিয়ে আগুন বেরুতে লাগল, দৃপ্তকণ্ঠে স্বামীজী বললেন, "একটি কুকুর যতক্ষণ আমার দেশে অভুক্ত থাকবে, ততক্ষণ সে কুকুরকে আহার্য প্রদান করা আমার একমাত্র ধর্ম—আর সব অধর্ম।"

আবার স্বামীজী ধর্মের এক অপূর্ব ব্যাখ্যা দিলেন। বললেন: ধর্ম বলতে আমি fearlessness বুঝি। আমি পুঁথি বুঝি না, কোন অনুষ্ঠান বুঝি না; আমি বুঝি—মানুষের ভেতরে যে অখণ্ড সত্তা আছে, যে মহিমা লুকিয়ে আছে, তাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ করতে হবে। যখন মানুষ বুঝতে পারবে তার ভেতরে অনন্ত শক্তি আছে, তখনই তার ধর্ম আছে। ধর্মকে তাই স্বামীজী নিঃশাসবায়ুর সঙ্গে তুলনা করলেন। বললেন: 'মানুষ যেমন একমুহূর্তকাল নিঃশাস-প্রশ্বাস না নিয়ে থাকতে পারে না, তেমনি ধর্মকে বাদ দিয়ে সে একমুহূর্ত থাকতে পারে না—ধর্ম রবিবারের গীর্জায় যাওয়া নয়, মসজিদে বিশেষ দিনে যাওয়া নয়, মন্দিরে বিশেষ তিথিতে প্রার্থনা করা নয়—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ধর্ম আমাকে পরিব্যাপ্ত ক'রে রেখেছে নিঃশাস-প্রশ্বাসের মতো। মানুষের ধর্ম বলতে আমি বুঝছি মানুষের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা। সেই স্বাভাবিক অবস্থা থেকে আমাদের বিচ্যুতি ঘটেছে—কেন ঘটেছে তা আমরা জানি না, তাতে আবার ফিরে যাওয়ার নাম ধর্ম

বলেছেন: তোমরা কখনও ভেবেছ যে, হিমালয় থেকে গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছেন, তার সে স্রোতকে, গঙ্গার গতিকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে অর্থাৎ হিমালয় থেকে প্রবাহিত যে গঙ্গা তাকে

উল্টো ক'রে দেওয়া যাবে? সেই গঙ্গাকে আসমুদ্র প্রবাহিত ক'রে হিমালয়ে আবার ফিরিয়ে নেওয়া যায়? অসম্ভব। ঠিক তেমনি ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে ধর্ম, ধর্মের ধারায় সবকিছু প্রবাহিত হচ্ছে—তার রাজনীতি বলুন, শিক্ষানীতি বলুন, সমাজনীতি বলুন সব ধর্মকে কেন্দ্র করে। সেইজন্য তাকে অন্যপথে ফেরানো যাবে না। তাই স্বামীজীর বিখ্যাত উক্তি: Deluge the country with spiritual ideals before all else—সবকিছু করবার আগে দেশে আধ্যাত্মিক ভাবের একটা প্লাবন বইয়ে দাও। প্লাবন কথা ব্যবহার করলেন কেন? প্লাবন যখন আসে তখন যা কিছু মালিন্যময়, যা কুৎসিত, যা ভঙ্গুর, যা ক্ষয়িষ্ণু তাকে সে ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং সেই জিনিসকে সে রেখে যায় যা দৃঢ়, যা শাশ্বত, সনাতন, স্থায়ী। প্লাবন তাকে নষ্ট করতে পারে না। বিরাট বটবৃক্ষকে সে রাখে—বিরাট একটি বাড়ীকে সে নষ্ট করতে পারে না, কিন্তু কুটীরকে সে ফেলে দেয়—সেইজন্য স্বামীজী প্লাবনের কথা বললেন। জীবনে যা ভঙ্গুর, যা ক্ষয়িষ্ণু, তাই আধ্যাত্মিক প্লাবনে শেষ ক'রে দিক। কিন্তু জীবনে যা শাশ্বত, সুন্দর, সনাতন তাকে ভালো ক'রে দিক, তাকে রাখুক। এখানে আমাদের সংশয় জাগতে পারে—স্বামীজী কোন্ জিনিসটা আগে চেয়েছিলেন? আগে ধর্ম, না আগে ব্যবহারিক অভ্যুদয়? এই জাগরণের মধ্যে কেন, আমেরিকায় যখন গিয়েছেন, বিদেশে যখন গিয়েছেন, বারবার বলেছেন ভারতবর্ষের এখন প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে অভ্যুদয়—সমৃদ্ধি। তাকে শিল্পে, শিক্ষায়, বাণিজ্যে উন্নত হতে হবে। জামশেদজী টাটাকে স্বামীজী অনুপ্রাণিত করেছিলেন যে, এমন একটি শিল্পের ব্যবস্থা করা যায় না যে আমাদের বেকার পুরুষেরা কিছু শিখতে পারে—জাপান থেকে কিছু শিখিয়ে আনা যেতে পারে? স্বামীজী শিল্পোন্নয়নের কথা বলেছিলেন। তিনি প্রথম বলেছিলেন, আমি বেদান্তের সহিত বিজ্ঞানের মিলন চাই—উভয়কে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করতে চাই। একথা বলেছিলেন যে, আমি ইসলামের দেহ (সংহতি) এবং বেদান্তের মস্তিষ্ক চাই, বুদ্ধের হৃদয় ও সংঘশক্তি চাই—মানুষকে তিনি অখণ্ডরূপে দেখেছিলেন। মানুষের জয়গান গাইতে গিয়ে কোন কিছুকে তিনি বর্জন করেননি। তাই বলেছিলেন: 'Not rejection but assimilation, এইটি হচ্ছে আমার মন্ত্র। Not toleration but acceptance is my creed. এতকাল আমরা বলেছি 'পরমত-সহিষ্ণুতা'। স্বামীজী বলেছেন: Tolerance অত্যন্ত ছেঁদো কথা, বাজে কথা। Toleration মানে হচ্ছে যেন অনুকম্পা করা আর কি! কিন্তু না, not toleration but acceptance is my creed. আমার যে জগৎ, আমার যে world view, আমার যে বিরাট পটভূমিকা তাতে আমি সকলকে আহ্বান করছি, নাস্তিককেও আহ্বান করছি। নাস্তিক কেন? কারণ, যে যথার্থ নাস্তিক তার তো আত্মবিশ্বাস আছে। সে জোর গলায় বলতে পারছে যে, ঈশ্বরকে দেখিনি, তাই মানি না। আমিও তো একসময় বলেছিলাম—I would rather welcome an atheist than a religious man, who believes in thousand and one deities without understanding what religion means. এই স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আজকে যে প্রশ্নটা জেগেছে সেটি বলেই আমার কথা আমি শেষ করব। অনেকের মনে এই প্রশ্ন জেগেছে, এমনকি বহু গ্রন্থও

এই বিষয়ে লেখা হয়েছে যে, স্বামীজীর অধ্যাত্ম-বাদ একটা প্রক্ষিপ্ত ঘটনা—আসলে তিনি একজন সমাজতন্ত্রবাদী। তিনি বলেছেন: I am a socialist, not because socialism is a perfect system, but half a loaf is better than nothing. কিন্তু একথা ভুললে চলবেনা যে, স্বামীজীর socialism মার্কসীয় socialism নয়—উপরতলার মানুষকে—ঘৃণা সেখানে প্রধান কথা নয়, সেখানে আসল কথা প্রেমের কথা। সেখানে সংঘাত এবং সংঘর্ষ প্রাণবিন্দু নয়, সেখানে co-operation, সমন্বয়ের কথা—যে সমন্বয়ের স্বপ্ন রামমোহন দেখেছিলেন, স্বামীজী ঠিক সেই কথা বলেছিলেন—give and take। একটা জাতি একটা জাতির সঙ্গে লেন-দেন করবে, বিনিময় করবে, তবে তো বড় হবে। সংঘাত নয়, সংঘর্ষ নয়, have and have-nots-এর মধ্যে সংঘাত নয়, ধর্মঘট নয়, রক্তাক্ত বিপ্লব নয়, প্রেমের মধ্য দিয়ে, ভালবাসার মধ্য দিয়ে, বৈদান্তিক ঐক্যের মধ্য দিয়ে—যে বৈদান্তিক ঐক্য বলছে মানুষ, পশুপক্ষী এবং কীটপতঙ্গের মধ্যে একই ব্রহ্ম, একই সচ্চিদানন্দ, একই চৈতন্য প্রবাহিত—সেদিক থেকে বলেছেন—not because soclialism is a perfect system but half a loaf is better than nothing. কিন্তু স্বামীজীর যে socia-lism বা সমাজতন্ত্রবাদ সেটা বৈদান্তিক ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একথা ভুললে চলবে না—কেননা যেখানেই বলেছেন I am a socialist, পরের বাক্যেই বলেছেন—every man is potentially divine, man is potentially divine এই কথাটি গানের ধুয়ার মতো বারবার ফিরে ফিরে আসছে। কখনও এই গানের ধুয়া স্বামীজী ত্যাগ করেননি। যখন সেখানে বলেছেন তখনই গানের ধুয়ার মতো বার বার ফিরে এসেছে, man is poten-tially divine. সেই ভেতরকার যে মানুষ 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' তাকে জানবার কথা স্বামীজী বারবার বলেছেন। America-য় গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, তোমরা আমাদের দেশে মিশনারী পাঠিয়ো না—it is a mockery to teach a starving nation religion and ethics. বলেছিলেন ঠিকই। কিন্তু আবার দেশে ফিরে বলেছেন: Deluge the country with spiritual ideals before all else. এর মানে কি? কোন্‌টা আগে হবে? আগে দেশকে সমৃদ্ধিশালী করব, তারপর ধর্ম—না আগে ধর্ম অনুসরণ করব, তারপর দেশকে সমৃদ্ধিশালী করব? একটি ছোট উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে—পাহাড়ের উপর থেকে জলপ্রপাত পড়ছে—জল পড়ছে—ঝর্ণার জল—আপনি সমতল ভূমিতে হাঁটছেন—আপনি জলকে প্রথম দেখবেন সমতল ভূমিতে, আস্তে পাহাড় বেয়ে বেয়ে উপরে চলে যান, তারপর দেখবেন পাহাড়ের চূড়ায়। আপনার দেখার যে ক্রম বা order of knowledge-এ জলকে প্রথমে দেখবেন সমতলে, তারপর পাহাড়ের চূড়ায়। কিন্তু সত্যি কি? সত্যি হ'ল জল আগে পাহাড়ের চূড়ায়, তারপর এসে সমতলে নামছে। ঠিক সেইরকম ধর্ম তো কোন

নয়, আচার নয়, ধর্ম মোক্ষ ব্রহ্ম

চৈতন্য সব এক কথা—অভিন্ন,

কাজেই ধর্ম আগে, পাহাড়ের চূড়ায়—সেখান থেকেই তো সমৃদ্ধি আসবে, তাকে কেন্দ্র না করলে সমৃদ্ধি চিরস্থায়ী হ'তে পারে না, কিন্তু জানবার বেলায় সমৃদ্ধির ভেতর দিয়ে—অভ্যুদয়ের ভেতর দিয়ে নিঃশ্রেয়সে যেতে হচ্ছে, তাই স্বামীজী ধর্ম এবং সমৃদ্ধিকে পাশাপাশি রেখেছেন। কেন? না, ধর্ম শক্তি দেবে

আমাকে। আমি যদি ধর্মের বর্ম বুকে না রাখলাম, তাহলে দেশের উন্নতি করব কি করে? পিছিয়ে পড়বো তো? আঘাত সংঘাত আসবে, বারবার হেরে যাব, পিছিয়ে পড়ব, ভয়ে পিছিয়ে যাব—অত্যাচার হবে, অবিচার হবে, দুর্জন লোক আমার অপমান করবে, যশ অপহরণ করবে—আমি পিছিয়ে যাব, কিন্তু যদি ধর্মের বর্মকে বুকে বাঁধি তাহলে দেশসেবার কাজে জীবনকে আমি বিসর্জন দিতে পারব—পিছিয়ে যাব না, সেজন্য স্বামীজীর যে world view, তাঁর যে জীবন-তত্ত্ব তার মধ্যে দেশসেবা ও ধর্ম, অদ্বৈতবাদ ও দেশপ্রেম অভিন্নতা লাভ করেছে। এটি না বুঝলে স্বামীজীকে একেবারেই বোঝা হবে না। তিনি বলেছেন: আমার নতুন ভারত বেরুক ঐ ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, মুদীর দোকানের ভেতর থেকে—পাহাড়, পর্বত, ঝোপ, জঙ্গল ভেদ করে—ঠিকই বলেছেন একথা। তোমরা উচ্চবর্ণের পুরুষেরা শূন্যে বিলীন হয়ে যাও। তোমাদের যে সামনে দেখছি মনে হচ্ছে যেন অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন দেখছি—মনে হচ্ছে যেন ঠাকুরমার মুখের রূপকথা শুনছি—তোমরা শূন্যে বিলীন হয়ে যাও—আমার নতুন ভারত বেরুক ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, মুদীর দোকানের ভেতর থেকে, চাষীর লাঙ্গলের বুক ভেদ করে, পাহাড় পর্বত নদী জঙ্গলের ভেতর থেকে। সত্যি কথা, বলেছেন শূদ্ররাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে—nobody can resist it. কেউ রুখতে পারবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন—সেই শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত ক'রে নিতে হবে। তাকে ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী করতে হবে। সেই একটি নতুন ভারতের যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, যে ভারতবর্ষ কলুষতামুক্ত—স্বাধীন ভারতবর্ষ সমৃদ্ধিতে পূর্ণ, যে ভারতবর্ষের মধ্যে আনন্দ, সত্য এবং ন্যায়ের সামঞ্জস্য ঘটেছে, যে ভারতবর্ষ ব্রহ্মকে, চৈতন্যকে, পরম-পুরুষকে বাদ দিয়ে নয়, তাঁকে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করে। তারই যে রশ্মি চারদিকে বিকীর্ণ তাতে সেই ভারতবর্ষ প্রোজ্জ্বল এবং ভাস্বর হয়ে উঠবে। সেই ভারতবর্ষেরই স্বপ্ন দেখেছেন স্বামীজী। তাকে সার্থক করতে হ'লে আজকে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হবে স্বামীজী যে পতাকা আমাদের দিয়েছেন সেই পতাকা বহন করা; সেই পতাকায় তিনি বলেছেন not dissension, but harmony, not hatred but love, ক্রোধকে অক্রোধের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, জয় করতে হবে—ঘৃণাকে প্রেমের দ্বারা জয় করতে হ'বে—সেই প্রেম এবং ভালবাসার যে পতাকা তিনি দিয়েছিলেন সেই পতাকা আমাদের হাতে তুলে নিতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন হ'লে জীবন-পণ করতে হবে।

বিবেকানন্দের রাষ্ট্রিক চেতনা

ডক্টর যামিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

জড়বাদ যখন জীবনের সর্বস্ব—অতিলৌকিক বিশ্বাস যখন প্রতীচ্যের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জর্জরিত, যন্ত্র যখন জীবনের মানদণ্ড—তখন উদাত্ত কণ্ঠে উৎসারিত সঞ্জীবনী সুধার প্রয়োজন হয়েছিল—যে কণ্ঠ বার বার বিঘোষিত করেছিল সেই সনাতন তত্ত্ব—"ঈশ্বর সত্য", "অলৌকিক বা অতিলৌকিক সত্যই সে সত্য ও অনুভূতি-সাপেক্ষ।" উনবিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে প্রয়োজন হয়েছিল ভারতাত্মার এই বাণীকে সঞ্জীবিত করার। এই উদ্দেশ্য নিয়েই দেশের নেতারা সেদিন সূচনা করেছিলেন একটা ধর্মসংস্কার-আন্দোলন, যার ফলে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে 'ব্রাহ্মসমাজ', পাঞ্জাবে দয়ানন্দ সরস্বতীর নেতৃত্বে 'আর্য-সমাজ', বম্বের প্রার্থনা-সমাজ ও দক্ষিণের 'Theosophical Society' হ'ল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই আন্দোলনটির শ্রেষ্ঠ অবদান হ'ল ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধের বিকাশ ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে আস্থা-স্থাপনা। এই পরিবেশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ রাষ্ট্রীয়তার একটা নতুন সিদ্ধান্ত নিয়ে, যা সমগ্র দেশে সৃষ্টি করলো একটা নব জাগরণ। স্বামীজীর ভাবধারা সেদিন জাতীয় জীবনে যুগিয়েছিল গভীর প্রেরণা। Roman Rolland (রমাঁ্যা রলাঁ্যা) বলেছেন, "The Indian Nationalist Movement smouldered for a long time until Vivekananda's breath blew the ashes into flame and erupted violently three years after his death in 1905."[১] স্বামীজীর জীবনী-লেখক ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, "All the militant nationalist movements culminating in Gandhiji's movement for independence of India, were launched after Swamiji's thundering roar, 'Arise Awake.'"[২] এই সব উক্তির তাৎপর্য-নির্ণয়ে স্বামীজীর রাষ্ট্রনীতি বা রাষ্ট্রচেতনার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

স্বামীজীর রাষ্ট্রনীতি বা রাষ্ট্র-চেতনার আলোচনাকালে আমরা লক্ষ্য করি যে, রাজনীতির লোক বলতে যা বোঝায় তা তিনি কোনও দিনই ছিলেন না। তথাকথিত রাজনীতিতে তিনি ছিলেন না আস্থাশীল। প্রমাণস্বরূপ আমরা দেখতে পাই তাঁর পত্রাবলীতে লেখা কয়েকটি চিঠি। আলাসিঙ্গা পেরুমলকে তিনি একবার লিখেছিলেন, "আমি কোন প্রকার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নহি। ঈশ্বর ও সত্যই জগতে একমাত্র রাজনীতি, আর সব বাজে।"[৩] স্বামীজী নিজে কখনও রাজনৈতিক নেতার আখ্যায় বিভূষিত হ'তে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন সমাজকে জাগাতে, মানুষকে বেদের মহামন্ত্র 'অভীঃ' শোনাতে। দৃষ্টির বৈচিত্র্য ছিল

১ Roman Rolland—Prophets of New India, P. 497.

২ Dutta, B. N.—Vivekananda—Patriot Prophet, pp 212-13.

৩ পত্রাবলী—১ম ভাগ, পৃঃ ৪৭০

স্বামীজীর। আত্মদৃষ্টি ও ভাবীকালের সব সমস্যার সমাধান ছিল তাঁর অবগতিতে। জনজাগরণের প্রচেষ্টা ও জনমানসে প্রেরণা যোগানোর দক্ষতা সমসাময়িক কালের মানুষকে করেছিল চেতনান্বিত। তাই তৎ-কালীন কোনও মুদ্রিত পুস্তকে স্বামীজী রাজনীতিক আখ্যায় ভূষিত হয়েছেন জেনে বড়ই মর্মব্যাথা পেয়েছিলেন। সেই আহত চিত্তে দৃঢ় মতবাদ তিনি আলাসিঙ্গাকে একটি চিঠিতে এইভাবে লিখে জানান, "আমি একজন রাজনীতিজ্ঞ নই অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনকারীও নই। আমার লক্ষ্য কেবল ভেতরের আত্মতত্ত্বের দিকে। সেইটে যদি ঠিক হ'য়ে যায়—আর সব ঠিক হয়ে যাবে। এই আমার মত। অতএব তুমি কলকাতার লোকেদের অবশ্য সাবধান করে দেবে যেন আমার কোন লেখা বা কথার ভেতর রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্য মিথ্যা করে আরোপিত না হয়।"[৪] স্বামীজী তথাকথিত রাজনীতির উর্ধ্বে ছিলেন, এই সব পত্রাবলীর মধ্য দিয়ে তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ স্বামীজী ছিলেন প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী। তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতীয় জাতিকে উন্নতির সর্বোচ্চ সোপানে নিয়ে যাওয়া। এর জন্য তিনি একটি নতুন সিদ্ধান্ত প্রচার করেছিলেন, যাকে রাষ্ট্রীয়তার আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত বলা যেতে পারে। এই সিদ্ধান্তের মূল কথা হ'ল—"ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয় জীবনের সংগঠন।" স্বামীজীর বাণী ছিল, "ভারতে ধর্ম জাতীয় হৃদয়ের মর্মস্থল। এই ভিত্তির উপর জাতীয় প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত।...রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় কখনও ভারতীয় জীবনে অত্যাবশ্যক বলিয়া পরিগণিত হয় নাই; কেবল ধর্ম ও আধ্যাত্মিক-তার বলে ভারত চিরকাল বাঁচিয়া আছে ও উন্নতি করিয়াছে, এবং উহারই সাহায্যে ভবিষ্যতে বাঁচিয়া থাকিবে।"[৫] আর একস্থানে স্বামীজী বলেছেন, "ভারতকে সামাজিক বা রাজনীতিক ভাবে প্লাবিত করার আগে আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত কর।"[৬] স্বামীজীর মতে ধর্ম হ'ল এমন একটা সঞ্জীবনী শক্তি, যা ভারতীয় জাতিকে কর্মজীবনে পরিচালিত করতে পারে। তিনি বলতেন, "প্রত্যেক জাতিরই উদ্দেশ্য-সাধনের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম-প্রণালী আছে। কেহ রাজনীতি, কেহ সমাজসংস্কার, কেহ বা অপর কিছুকে প্রধান উদ্দেশ্য রূপে অবলম্বন করিয় কাজ করিতেছে। আমাদিগের পক্ষে ধর্মের মধ্য দিয়া ছাড়া কাজ করিবার অন্য উপায় নাই।"[৭] এইখানেই স্বামীজীর মতে ভারতবাসীর সহিত অন্য জাতির রয়েছে পার্থক্য। তার কারণ অন্য জাতিরা প্রথমে রাজনীতি বোঝে, তারপর ধর্ম, কিন্তু ভারতবাসীরা প্রথমে ধর্ম বোঝে, তারপর রাজনীতি। এই রাজনীতিও ভারতবাসী বুঝতে পারে কেবলমাত্র ধর্মের মাধ্যমে। স্বামীজী বলেছেন যে, বিস্তৃতিই হ'ল জীবনের লক্ষণ, তাই বিভিন্ন জাতি একটা বৈদেশিক নীতি অবলম্বন ক'রে নিজেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করে। এই নীতির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশের সহিত বিবাদসূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে তারা সাম্রাজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে। ভারতকে কিন্তু এই নীতি অবলম্বন করলে চলবে না। ভারতের লক্ষ্য হবে আধ্যাত্মিক বিজয়। সাম্রাজ্য-বিস্তারের পরিবর্তে ভারতকে করতে হবে আধ্যাত্মিক

৪ পত্রাবলী—১ম ভাগ

৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—৫ম খণ্ড পৃঃ ৯১
৬ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—৫ম খণ্ড, পৃঃ ১১১
৭ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা - ৫ম খণ্ড

জ্ঞানবিস্তার। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উৎস হ'ল ভারতের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলি; বেদান্ত বা উপনিষদ হ'ল এদের মধ্যে প্রধান। এই সব ধর্মগ্রন্থের প্রতি স্বামীজীর ছিল প্রগাঢ় ভক্তি। তিনি বলতেন যে, এদের মধ্যে রয়েছে অমূল্য সম্পদ। সুতরাং এই সব গ্রন্থের মূল তত্ত্বগুলিকে আমাদের প্রচার করতে হবে দেশ-বিদেশে এবং এই প্রচারকার্যটি হবে ভারতের চিরন্তন বৈদেশিক নীতি। তাঁর পাশ্চাত্যে গমনও ভারতের এই চিরন্তন সর্বজনীন বাণী প্রচারের জন্যই। তিনি নিজেই একস্থানে বলেছেন, "গৌতম বুদ্ধ যেমন প্রাচ্যের জন্য একটা বার্তা এনেছিলেন, আমিও পাশ্চাত্য দেশের জন্য একটা বার্তা এনেছি।" স্বামীজী এর নাম দিয়েছিলেন 'আধ্যাত্মিক বিজয়-অভিযান'। এই সিদ্ধান্তকে বাস্তবের রূপ দিতে হ'লে ভারতকে কিছু দিতে ও নিতে হবে। অর্থাৎ ভারতীয় ধর্ম অন্য জাতির মধ্যে প্রচার করতে হ'লে তাদের মধ্যে যা ভাল তা ভারতকে গ্রহণ করতে হবে। এখানে নিজেকে একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমায়িত করা চলবে না। এখানে একটা উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অন্য দেশের ভাবধারাকে গ্রহণ করা প্রয়োজন। তা নইলে ভারতের উন্নতির পথ কখনও উন্মোচিত হবে না। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন, "ভারতের পতন ও দুঃখ-দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, ভারত নিজ কার্যক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিয়াছিল, শামুকের মতো দরজায় খিল দিয়া বসিয়াছিল, আর্যেতর অন্যান্য সত্যপিপাসু জাতির নিকট নিজ রত্নভাণ্ডার, জীবনপ্রদ সত্যরত্নের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে নাই।"[৮] সুতরাং স্বামীজীর মতে ভারতকে অন্যান্য জাতির সহিত নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ করতে হবে। এখানে থাকবে না শুধু গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ। এখানে হতে হবে সমভাবাপন্ন। এরই দ্বারা বিদেশের সহিত সখ্য স্থাপিত হবার একমাত্র উপায়। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের এই সৃজনী প্রতিভাকে লক্ষ্য করে তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীতে প্রকাশ করেছেন, "বিবেকানন্দ ভারতের ও পশ্চিমের সাধনাকে দক্ষিণে ও বামদিকে রাখিয়া তাহার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া তাহাকে চিরকাল সঙ্কীর্ণতার মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া রাখা তাঁহার জীবনের উপদেশ নয়। তিনি ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যের মিলনের সেতু-রচনার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার ও সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল"[৯] আমেরিকায় অবস্থানকালীন স্বামীজী এই সত্যটি খুব গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সেখানকার কয়েকটি প্রথা স্বামীজীকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু তাই বলে স্বামীজী তাঁর দেশবাসীকে কখনও পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধানুকরণ করার বা স্বদেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হবার উপদেশ দেননি। কোনও একসময় জনৈক ইংরেজ বন্ধু স্বামীজীকে একবার প্রশ্ন করেছিলেন যে, চার বৎসর পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণান্তে স্বদেশকে তাঁহার কেমন লাগিবে। স্বামীজী আত্মপ্রত্যয়ের সহিত বলেছিলেন, "আমি পাশ্চাত্য দেশে আসার আগে ভারতকে ভালবাসতাম। এখন ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র, ভারতের বায়ু আমার কাছে পবিত্র; ভারত আমার কাছে একটা মহাতীর্থ"।[১০] ভগিনী

৮ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২১৩

৯ স্বামীজী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

১০ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

নিবেদিতা লিখেছেন, "পাশ্চাত্য দেশে তাঁহাকে আমরা হিন্দুধর্মের প্রচারকরূপেই দেখিয়াছিলাম এবং তাহাতে নিখিল মানবের মধ্যে সেই একই আত্মার মহিমা-ঘোষণাই ছিল তাঁহার উপদেশের সারমর্ম, তাঁহার সেই কর্মের অন্তরালে ভারতবর্ষের জন্য কোন ভাবনা বা তাহার হিতসাধনের জন্য কোন অভিপ্রায় প্রকাশ পাইত না। কিন্তু যে মুহূর্তে আমি তাঁহার সহিত ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলাম, সেই মুহূর্ত হইতে তাঁহার মৃত্যুদিন পর্যন্ত আমি আমার গুরুদেবের মধ্যে আর এক অগ্নির নিরন্তর দহনজ্বালা লক্ষ্য করিয়াছি, সে কোন তত্ত্ব, কোন আধ্যাত্মিক সত্যের উপাসনা বা উন্মাদনা নয়—দেশ ও জাতির দুর্দশা-নিবারণের প্রাণান্ত প্রয়াস ও তাহার নিষ্ফলতার জন্য মর্মান্তিক যাতনাভোগ।"[১১] স্বদেশকে স্বামীজী কল্পনা করেছেন দেবীরূপে এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত দেশবাসীকে বলেছিলেন তার পূজা করতে। এ শুধু তাঁর উপদেশ ছিল না—এ ছিল তাঁর মর্মানুভূতি। এই প্রসঙ্গে তিনি একস্থানে বলেছেন, "আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই।··· অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন; তোমার স্বজাতি—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত···। যখন তুমি এই দেবতার উপাসনায় সমর্থ হইবে, তখনই অন্যান্য দেবতার পূজা করিবার ক্ষমতা তোমার হইবে।"[১২] এই সব মন্তব্যে স্বামীজীর জাতীয়তাবোধের আদর্শগুলি খুব সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে।

স্বামীজী জানতেন, সমাজের উন্নতি না হ'লে জাতির উন্নতি সম্ভবপর নয়। কিন্তু এজন্য তিনি সমাজের বহির্দেশের সংস্কারের জন্য ব্যস্ত হননি, তার "মূলদেশে" অগ্নিসংযোগ করতে চেয়েছিলেন—মানুষের অন্তরকে উন্নত করতে বলেছিলেন। একাজ তিনি করতে চেয়েছেন একেবারে নিম্নস্তর থেকে যেখানে অধিকাংশ নরনারী দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে কাল-যাপন করতো। তাদের এ শোচনীয় অবস্থা জাতীয় উন্নতির পথে সৃষ্টি করেছিল প্রধান বাধা। এ ছাড়া জাতিভেদ-প্রথাটিও সমাজের মধ্যে গভীর অসমতা সৃষ্টি ক'রে নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের অবস্থা আরও শোচনীয় করে দিয়েছিল। এই কারণে স্বামীজী এই সব প্রথাগুলির বিরুদ্ধে জানান তীব্র প্রতিবাদ। কিন্তু জাতি-বিভাগকে স্বামীজী একেবারে পরিত্যাগ করতে বলেননি। জাতি-বিভাগের প্রসঙ্গে তিনি একস্থানে বলেছেন, জাতি শব্দের অর্থ হ'ল শ্রেণীবিশেষ। এখন সৃষ্টির মূলে ইহা বিদ্যমান। বিচিত্রতা সৃষ্টির মূলেই রয়েছে।

স্বামীজী জাতি-বিভাগ বলতে বুঝতেন শ্রমবিভাগ, অর্থশাস্ত্রে আমরা যাকে বলি 'division of labour' অর্থাৎ যেমন ঋগ্-বৈদিক যুগে ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে ভারত এই ভাবটি পরিত্যাগ করে; সমাজসংগঠনে পেশাগত সিদ্ধান্তের পরিবর্তে বংশানুগত সিদ্ধান্তটি স্থান পায়। এর ফলে সমাজে চারটি বর্ণের সৃষ্টি হয়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। কালক্রমে ব্রাহ্মণসম্প্রদায় হ'লেন সমাজপতি, তাঁদের অধিকার বৃদ্ধি পেতে লাগলো আর শূদ্রের অবস্থা হ'ল অত্যন্ত শোচনীয়। এই শূদ্র-সম্প্রদায় সমাজে নিকৃষ্ট- ও ঘৃণিত-রূপে পরিগণিত হ'ল। ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদের ওপর

১১ মোহিতলাল মজুমদার—বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, পৃঃ ৯০

১২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৯

হ'তে লাগলো বহু নির্যাতন। সে ধর্মও ছিল ছুতমার্গপ্রধান। তাই স্বামীজী বলেছেন, "এখানকার ধর্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই। ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। এখানকার ধর্ম 'বিচার'-মার্গেও নয়, 'জ্ঞান'-মার্গেও নয়, ছুতমার্গে—আমায় ছুঁয়ো না। এই ছুতমার্গে পড়ে প্রাণ খুইও না...এটা হ'ল একটা মানসিক ব্যাধি।"[১৩] বস্তুতঃ স্বামীজী অধিকার ও ভোগ-বৈষম্যকে ধ্বংস করে (জাতিপ্রথাকে নয়) সমাজে আনতে চেয়েছিলেন সমতা। তাঁর মতে সমাজের এক প্রান্তে বসে আছে ব্রাহ্মণ আর এক প্রান্তে চণ্ডাল। সমতা সৃষ্টি করতে হলে, এই চণ্ডালকে ব্রাহ্মণের স্তরে উন্নীত করতে হবে। তাই নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করার প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন, "চণ্ডালের বিদ্যাশিক্ষার যত আবশ্যক, ব্রাহ্মণের তত নয়। যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষক আবশ্যক, চণ্ডালের ছেলের দশজনের আবশ্যক। কারণ যাহাকে প্রকৃতি স্বাভাবিক প্রখর করে নাই, তাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে। তেলা মাথায় তেল দেওয়া পাগলের কর্ম।"[১৪]

স্বামীজীর চিন্তাধারার মধ্যে সাম্যবাদের সিদ্ধান্ত যেন স্বতঃস্ফূর্ত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি আছে, বলেছিলেন দরিদ্রের মধ্য দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান। একেই বলি বাণী। এই বাণী স্বার্থবোধের বাহিরে মানুষের আত্মবোধকে অসীম মুক্তির পথ দেখালো। এ তো কোন বিশেষ আচারের উপদেশ নয়, ব্যবহারিক সংকীর্ণ অনুশাসন নয়। ছুতমার্গের বিরুদ্ধতা এর মধ্যে আপনিই এসে পড়েছে। তার দ্বারা রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ হ'তে পারে ব'লে নয়—তার দ্বারা মানুষের অপমান দূর হবে বলে, সেই অপমান আমাদের প্রত্যেকের আত্মাবমাননা।"[১৫] স্বামীজীর এই ভাবধারা পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীকে যুগিয়েছিল গভীর প্রেরণা। বেলুড় মঠে একটি বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, স্বামীজীর সিদ্ধান্তগুলি তাঁর মনে আরও গভীরভাবে দেশপ্রেম জাগায়।

সমাজের অধিকাংশ লোকের জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য স্বামীজী চেয়েছিলেন নিরক্ষরতা দূর করে তাদের মধ্যে একটা চেতনার সৃষ্টি করতে। এই চেতনা সৃষ্টি করার জন্য তিনি উপনিষদের বাণীগুলি তাদের মধ্যে প্রচার করতে চেয়েছিলেন ব্যাপকভাবে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিক চিন্তা জাতিকে নতুন করে জাগিয়ে তুলবে। শুধু তাই নয়, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য স্বামীজী একটা নতুন শিক্ষা-পরিকল্পনাও দিয়েছিলেন। এখানে তিনি গ্রামে কেবল কয়েকটি অবৈতনিক শিক্ষায়তনের ব্যবস্থা করতে বলেননি। তার কারণ তিনি বলতেন, গ্রামের নিরক্ষর লোকেদের এই সব বিদ্যালয়ে পড়তে আসা কঠিন, সময় পাবে না। তাদের শিক্ষা দিতে হলে তাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে শিখিয়ে আসতে হবে। এ বিষয়ে দেশের শিক্ষিত যুবকবৃন্দেরই অগ্রণী হওয়া প্রয়োজন। একটি চিঠিতে স্বামীজী বলেছেন, "দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার নিকট পৌঁছিতে না পারে, তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙ্গলের কাছে, মানুষের কারখানায় এবং অন্য অবস্থানে পৌঁছুতে হবে।"[১৬] নিরক্ষরতা ছাড়া জাতীয়

১৩ পত্রাবলী, ১ম ভাগ—পৃঃ ৭৩-৭৪;

১৪ পত্রাবলী, ১ম ভাগ—পৃঃ ৩০২

১৫ স্বামীজী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

১৬ পত্রাবলী—১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৬-৬৭

জীবনের উন্নতির আরও একটি প্রধান অন্তরায় হ'ল দেশের অধিকাংশ লোকের দারিদ্র্য। স্বামীজী বলতেন যে, দেশের কোটি কোটি লোক যুগ যুগ ধ'রে অনাহারে মরছে এবং আমাদের কর্তব্য হ'ল সর্বাগ্রে তাদের এই দুঃখ দূর করা। তাঁর মতে স্বদেশহিতৈষী হবার প্রথম সোপান হ'ল জনগণের এই দুঃখ আন্তরিকভাবে অনুভব করা, তাদের সঙ্গে নিজেকে এক ভাবা। এই একাত্মতাবোধ-সঞ্জাত আকুল বেদনায়, অসীম ভালবাসায় তিনি বলেছেন, "হে আমার স্বদেশবাসিগণ, হে আমার বন্ধুগণ, হে আমার সন্তানগণ, এই জাতীয় অর্ণবপোত লক্ষ লক্ষ মানবাত্মাকে জীবন-নদীতে পারাপার করিতেছে।...যদি এই জাতীয় অর্ণবপোতে—আমাদের এই সমাজে—ছিদ্র হইয়া থাকে তথাপি আমরা তো এই সমাজেরই সন্তান। আমাদিগকেই এই ছিদ্র বন্ধ করিতে হইবে। আনন্দের সহিত আমাদের হৃদয়ের শোণিত দিয়াও বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, যদি আমরা বন্ধ করিতে না পারি তবে মরিতে হইবে।"[১৭] স্বামীজী প্রত্যক্ষ করেছেন, ভগবানই মানুষ হয়ে রয়েছেন; তাই দেশের দরিদ্র জনগণকে তিনি 'দরিদ্রনারায়ণ' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি নারায়ণের পূজা জ্ঞানে একান্ত ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত দেশবাসীর সেবা করতে বলেছেন আমাদের। তাঁর বাণী ছিল, "দেশের অজ্ঞ, দরিদ্র, পদদলিতই হোক্ তোমার ঈশ্বর।... দিবারাত্র তাঁরই পূজা কর।"[১৮] এই কাজটি আমাদের সকলকেই, বিশেষ করে দেশের যারা ভবিষ্যৎ সেই যুবক-বৃন্দকে করতে হবে এবং তার জন্য তাদের 'ত্যাগ ও সেবার' ধর্মে দীক্ষিত হতে হবে। স্বামীজী বলেছেন, এই "ত্যাগ ও সেবাই আমাদের জাতীয় আদর্শ," ইহাই জাতীয় জাগরণের মূলসূত্র। আশার কথা, তাঁর এই বাণীকে কার্যে রূপ দেবার পরিকল্পনা স্বামীজী নিজেই করে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে। কিন্তু স্বার্থত্যাগকে ভিত্তি করে নারায়ণজ্ঞানে দেশ-বাসীকে সেবা করার ভাব কেবল সেখানেই সীমিত রাখলে চলবে না, চাই আরও জাতীয় সংগঠন, আরও আত্মত্যাগ বা আত্মবলি। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এই জাতীয় আদর্শের বিস্তার প্রয়োজন। ভারতের ভাগ্যবিধাতার আশীর্বাদে আমাদের "নিজের কল্যাণের জন্য দেশের কল্যাণের জন্য, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য" আমাদের অন্তরে জ্বলে উঠুক এই আত্মত্যাগের প্রেরণা, ধ্বনিত হোক সর্বত্র, বিশ্বের সর্বস্তরে চকিত হোক, অনুপ্রাণিত হোক, "Arise! awake! and stop not till the goal is reached." 'ওঠো, জাগো, লক্ষ্যলাভের আগে কোথাও থেমো না; এগিয়ে চলো।'

১৭ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—৫ম খণ্ড, পৃঃ ১১৮

১৮ পত্রাবলী—১ম ভাগ, পৃঃ ৩৭৩

অমরণ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

যাকে ডাকল তোমার চিরচরণ তার কোথা নাথ, ভয় ?
তোমার রাঙা পায়ে চায় যে শরণ অপারশান্তিময় ?
পরি আশার বাঁধন কতই সাধে !
সুখের খাঁচায় প্রাণ যে কাঁদে !
কামনার গোলাপ ফুটিয়ে গাই রঙিনের জয় :
হায়, দমকা হাওয়ায় হয় পলকে ফুলের বাগান লয়।

তবু নয় যে জীবন মায়া কালো
জানি তোমায় বাসলে ভালো,
ঝরাও তোমার সেই কৃপা যে নয়কে করে হয়
নিঠুর মরণ-আড়াল ঘুচিয়ে যে দেয় প্রেমের পরিচয়।

কে ঐ উদাস সুরে সাগর পানে
সব নদীকেই এমন টানে ?
গায় সে : "কৃপার ডাকেই প্রতি ঢেউ নদী তোর বয়
আমার সিন্ধুকোলে ঝাঁপিয়ে হবে আনন্দতন্ময়।"

মর্মবাণী

শ্রীশিবশম্ভু সরকার

বিন্দুরে যদি সিন্ধুর পটে
রাখো সযতনে ধ'রে—
বিন্দুর বুকে সিন্ধুর দোলা
আবেশেতে যাবে ভ'রে।

সীমাতেই যার অসীম জগৎ
তারই পথ হয় সত্যের পথ
শতদল হোয়ে অমিয় সেথায়
জেগে উঠে থরে থরে—
চলা-বলা ভাসে ছন্দের মত
কথনেতে কুহু ঝরে!

নিজ হাতে জ্বালা আপন জীবন
যে ক'য়েছে, তুই নে রে ভুবন
মুক্তি তাহার বলেনি কখন,
ভাঙো স্বপ্নের পাঁতি—
দ্বারে দ্বারে সে যে করেছে অটন
আলোর নেশায় মাতি!

সে যে পঙ্কের স্রোতে পেয়েছে গাঙ্গ্য বাণী
ভাঙা 'নাও' তার ছুটেছে সাগর ছানি'
বন্ধন শেষে হোয়েছে অবন্ধন—
মরণ জিনিয়া অদম্য হাসে
হেসেছে যে সে-জীবন!

আবেদন

কাশীপুর উদ্যানবাটী

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে আটমাস ধরিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার ভক্তদের মধ্যে ইতঃপূর্বে আরব্ধ শিক্ষা-দীক্ষাদি কার্যের পরিসমাপ্তির জন্য নিরন্তর নিযুক্ত ছিলেন। এই স্থানেই প্রতিদিন বৈকালে নরেন্দ্রনাথকে নিজ গৃহে আহ্বান করিয়া দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহাকে আধ্যাত্মিকতা, ভাবী সঙ্ঘগঠন ও পরিচালনা সম্বন্ধে উপদেশ ও নির্দেশ দিতেন। এইখানেই তাঁহার দেব-মানবত্বের পূর্ণ প্রকাশ এবং এইখানেই তাঁহার কল্পতরুলীলা। এই উদ্যানবাটীতেই শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের সাধনালব্ধ অধ্যাত্ম সম্পদ ও শক্তি স্বামীজীর মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। এই স্থানেই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার চিহ্নিত সন্তানগণকে গেরুয়া বসন ও রুদ্রাক্ষমালা প্রদান করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের সূত্রপাত করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ ইচ্ছা ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের বহুস্মৃতিবিজড়িত এই স্থানটি লইয়া মঠের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৯৭-র ১৩ই জুলাই-এর পত্রে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তিনি একথা জানান; ঐ পত্রে লিখিয়াছিলেন, "ও-বাগানের সহিত আমাদের সমস্ত association (স্মৃতি জড়িত)। বাস্তবিক ওটাই আমাদের প্রথম মঠ। ওটা তো নিতেই হবে ···।" স্বামীজীর সেই ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ কর্তৃপক্ষ এই উদ্যানবাটীটি ক্রয় করিয়া ১৯৪৬ সালে এখানে একটি মঠকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থানকালে সমগ্র উদ্যানবাটী যেমনটি ছিল—বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট, বাগান, পুকুর প্রাচীর প্রভৃতি পুনর্নির্মাণপূর্বক ঠিক সেই ভাবে উপযুক্ত স্মৃতিভবনরূপে সুরক্ষিত করা। আনন্দের সহিত জানাইতেছি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যে গৃহে বাস এবং মহাসমাধিলাভ করিয়াছিলেন, উহা জনৈক ভক্তের সাহায্যে কয়েক বৎসর পূর্বে পুনর্নির্মিত হইয়াছে।

এখন সাধুদের বাসস্থান এবং সমগ্র পরিকল্পনাটির বাকী অংশগুলির রূপায়ণের জন্য আনুমানিক পাঁচলক্ষ (৫,০০০০০) টাকার প্রয়োজন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি-পূত এই বাগানটির সংরক্ষণার্থে সমগ্র ভারতের সর্বসাধারণের নিকট মুক্তহস্তে অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন জানাইতেছি। দান যত সামান্যই হউক উহা ধন্যবাদের সহিত সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। আমাদের অনুমোদিত প্রতিনিধি মারফত অথবা নিম্নলিখিত ঠিকানায় ডাকযোগে সাহায্য পাঠাইতে হইবে। চেক পাঠাইলে "Ramakrishna Math, Cossipore" এই নামে লিখিবেন।

স্বামী সাধনানন্দ
অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
৯০, কাশীপুর রোড, কলিকাতা ২

১০ই ফেব্রুআরি,
১৯৬৯

সমালোচনা

সূফী-গাথা : শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রমন্দির (পোঃ বারাসত)। প্রকাশক : ভারত-প্রকাশ-ভবন, ২৪বি বুধু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা-৯। পৃষ্ঠা-৩৩৬ (১০৮+১৪০+৮৮), মূল্য—২৲ টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দ ইসলামধর্মের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : "ইসলামধর্ম তদন্তর্গত সকল ব্যক্তিকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকে। এইখানেই মুসলমানধর্মের বিশেষত্ব।...মুসলমান-ধর্ম জগতে যে বার্তা প্রচার করিতে আসিয়াছে তাহা সকল মুসলমানধর্মীদের মধ্যে কার্যে পরিণত এই ভ্রাতৃভাব; ইহাই মুসলমানধর্মের অত্যাবশ্যক সারাংশ..."

সূফী-সাধক মহর্ষি জালালুদ্দিন রুমি সাধারণ মুসলমানকে এই প্রেমের ধর্মে উদ্বুদ্ধ করিয়া বলিয়াছিলেন :

আজল বা আন নূর্শূদ কিবলাহ একরম।
কিবলাহ্ বে আন নূরশূদ কুফর এসনম॥

ভগবৎপ্রেমে রঞ্জিত হইলে গোবৎসেরও পূজা করা চলে। আর ভগবৎপ্রেমের অভাবে নমাজের বেদীও অপবিত্র হইয়া যায়।

আর বলিয়াছেন :

ইন সিফাল্ ও ইন পলিতা দিগর অস্ত্।
লেক নূর অশ নিস্ত্ দিগর জান সব অস্ত্॥

এই সলিতাটি পৃথক বটে, দীপশিখাটি নয়—সকল প্রদীপের শিখাই অভিন্ন। প্রত্যেক পয়গম্বর সিদ্ধযোগীর পথ ভিন্ন, তাঁহারা সকলেই খোদার নিকট পৌছান, তাঁহারা সকলেই এক।

এই সূফী সম্প্রদায়েরই অন্যতম সাধক গোবিন্দ রায়ের নিকট হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ঐ সময়ে আল্লামন্ত্র জপ করিতাম, ত্রিসন্ধ্যা নমাজ পড়িতাম।" সর্বমতের সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'সর্ব ধর্ম সত্য, যত মত তত পথ।'

আলোচ্য গ্রন্থটিতে আমরা এই সূফী সম্প্রদায় ও তাহাদের মতবাদের বিশদ বিবরণ পাই। সূফী-সাধকগণের প্রতি মর্মবাণীতে সর্বজনীন ভাবের অনুরণন রহিয়াছে। কোরান-বিরুদ্ধ ভাব প্রচার করিতেছেন বলিয়া প্রথম দিকে সূফী-প্রধানগণকে বহু অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। পরে তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন, যতদিন না তাঁহারা প্রমাণ করিতে পারিবেন যে, সূফীতত্ত্ব কোরানের অনুমোদিত ততদিন এই ধর্ম পালন বা প্রচার তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। ইমান গজ্জলি এবং জালালুদ্দিন রুমির চেষ্টায় তা ফলবতী হইল। কোরানের বাণী উদ্ধৃত করিয়া, ইহার নিগূঢ়ার্থ প্রকাশ করিয়া তাঁহারা দেখাইলেন যে, সূফীধর্ম কেবল কোরানের অভিপ্রেত নহে, উহাই কোরানের সত্য। গজ্জলি সূফীবাদ প্রতিষ্ঠা করিলেন সুতীক্ষ্ণ দার্শনিক যুক্তিজাল দ্বারা, আর তাহাতে কাব্যরসের মূর্ছনা দিলেন জালাল।

সূফীরাজ জালালেই সূফী-সাধনার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে। তাঁর প্রণীত মসনবীই সূফীদের গুরুগ্রন্থ। মুসলমানের কোরান, খৃষ্টানের বাইবেল, পারসিকের জেন্দ আবেস্তার মতো মসনবীই সূফীদের প্রধান শাস্ত্র। সূফী-ধর্মকে প্রথম বাস্তব রূপ দেন আবুলখৈর (৯৪৭-১০৪৯)। পারসী ভাষায় রচিত তাঁহার কারিকা-গুলিই মসনবীর আকরগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। মসনবী রচিত হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে।

গ্রন্থকার বলিয়াছেন : সুফীধর্ম এক বিশ্বজনীন ধর্ম। জমদগ্নি জরথুশত্র-প্রবর্তিত সু-প্রাচীন পারসিক ধর্মের প্রভাব ইহাতে যথেষ্ট, ভারতীয় দর্শনের প্রতিধ্বনি প্রতিপদেই শোনা যায়। কারণ বৈদিক ধর্মের দুটি ধারা—একটি ইরানীয়, আর একটি ভারতীয়। ইরানীয় ধারা অথর্ব তথা ভার্গব বেদকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। নিরাকার উপাসনার পুরোহিত শুক্রাচার্য বা ভৃগুই সেই বেদের ধারক ও বাহক। ভার্গব বেদের প্রচলিত নাম ছিল ছান্দ উপস্থা—পারসিক ভাষায় জেন্দ আবেস্তা—বা বৈদিক উপাসনার মন্ত্র। ছান্দ উপস্থা চারিটি সংহিতায় বিভক্ত—যস্ন, যস্ত, বিশ্বরতু ও বিদৈবধাত। যস্ন সংহিতাই ইহাদের মূখ্য গ্রন্থ ইহাতে ৭২টি সুক্ত আছে। তন্মধ্যে ১৭টি মহারতু জরথুশত্রের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বলিয়া কথিত—এই বাণীর নাম গাথা।

লেখকের মতে এই গাথাই সুফীসাধনার মূল উৎস। যস্ন সংহিতার গৌণ অঙ্গ বাদ দিয়া উহার যাহা রাগাত্মিকা ভক্তি তাহাকে অবলম্বন করিয়াই মহর্ষি জালাল তাঁহার মহাগ্রন্থ মসনবী রচনা করিয়াছেন। যস্ন সংহিতার সারসত্য সর্বভূতে সমদর্শন (অষা), ব্রহ্মবাদ (হু), রাগাত্মিকা ভক্তি (চিস্তি), প্রেম (ইশ্ক), কর্মফল, জন্মান্তর এবং আত্মার অবিনশ্বরত্ব সুফী-ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এক কথায় বলিতে গেলে ইহা মাধুর্যরসের সাধনা। "খেত্বর দাত" বা স্বাত্মার্পণ, প্রেমের আবেগে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন-সাধনই যস্ন সংহিতার ও মসনবীর মূলকথা।

জান এ মন কোড় অস্ত্ বা আতশ্ খোশ অস্ত্।
কোড় বা ইন্ বস্ কি খানা এ আতশ্ অস্ত্॥

আমার মনটা একটা চুলা—আগুনেই আমার আহ্লাদ। সে যে আগুনের আধার তাতে চুলারই গৌরব। অর্থাৎ ভগবৎপ্রেমের আগুন যদি হৃদয়ে জ্বলে তাহাতেই মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা। পার্শীরা এই প্রেমাগ্নিরই উপাসক। তাদেরই অনুবর্তী সুফীরাও ভগবানকে প্রিয় বা প্রিয়ারূপে ভাবনা করিয়া উপাসনা করিয়াছেন।

ব্রহ্ম জীব- ও জগৎ-রূপে পরিণত, জীব ব্রহ্মেরই অংশ, হঠাৎ সৃষ্ট বাহির হইতে উদ্ভূত কোন পদার্থ নয়। তাই অংশের সঙ্গে অংশীর মিলনে কোন বাধা নাই। সুফীগণ এই পরিণামবাদই গ্রহণ করিয়াছেন। সুফীধর্মের আর একটি প্রধান কথা আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন।

যস্ন সংহিতার দুটি পর্যায়—একটির নাম চিস্তি, ইহাতে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, আত্মা, রাগাত্মিকা ভক্তি প্রভৃতি তথ্যের সমাবেশ। অপরটির নাম দীন—ইহাতে আছে একেশ্বরবাদ, নিরাকার উপাসনা ও জাতিভেদরাহিত্য। সুফী পন্থায়ও এই দুটি বিভাগ। হাপেজ বলিয়াছেন :

মুরীদ এ পীর এ ময়ান অম
সে মন মা রনজ্ অয় শেখ

হে শেখ, আমি মখগুরুর (জরথুশত্রের) শিষ্য বলিয়া আমার উপর রুষ্ট হইও না। আর জালাল বলিয়াছেন, খোদাকে আমি যদি কান্তাভাবে ব্যাখ্যা করি তোমরা আমার অপরাধ মার্জনা করিও। এ সাধনা প্রেমের সাধনা। মসনবীর পাতায় পাতায় রহিয়াছে খোদার সহিত মিলনের আকুল আগ্রহ, মিলনের প্রস্তুতি ও বেদনা।

গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে এই প্রেমের ধর্ম সুফীধর্মের বিকাশ ও ইতিহাস মুখবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং সুফী সম্প্রদায়ের গুরুগ্রন্থ মসনবীর শ্লোকগুলির সটীক অনুবাদ সহ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গলাভাষাভাষীর পক্ষে সেই মানসলোকে প্রবেশের পথ রচনা করিয়া দিয়াছেন। বঙ্গ সরস্বতীর মণিহারে তিনি

আর একটি অমূল্য মণি সংযোজন করিয়াছেন। ভারতেও সুফীধর্মের দ্বারা বহু ধর্ম অনুপ্রাণিত হয়েছে। খাজা মইনুদ্দিন চিস্তিই ভারতে সুফীধর্মের প্রধান ধারক ও বাহক। ১১৯২ খ্রীঃ তিনি সাহবুদ্দিন ঘোরীর সঙ্গে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। মহাত্মা কবীরও এই সুফীধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে আমরা রামভক্ত বলিয়াই জানি—কবীর সম্পর্কেও গ্রন্থকার নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়াছেন। সামর্থ্য-বিচারে পুস্তকটির অতি অল্প মূল্যই ধার্য হইয়াছে। এইরূপ একখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশের জন্য গ্রন্থকারকে পুনরায় ধন্যবাদ জানাই। —**দেবব্রত রায়চৌধুরী**

ভজন-সঙ্গীত (প্রথম ভাগ)—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। প্রকাশক: স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ, অধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির, পোঃ জয়রামবাটী, বাঁকুড়া। প্রাপ্তিস্থান: রামকৃষ্ণ মিশন সারদা-পীঠ সেলস্ রুম (বেলুড় মঠ) এবং প্রকাশকের ঠিকানা। পৃষ্ঠা ২৮+৮; মূল্য আড়াই টাকা।

স্বামী চণ্ডিকানন্দ সঙ্গীতরচনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁহার গানগুলি ভাষা ও ছন্দের সম্মিলনে মাধুর্য-মণ্ডিত; সুর-লয়-তানে গীত হইলে ভক্তি-ভাবের উদ্রেক করে।

আলোচ্য গ্রন্থে স্বরলিপি-সহ ১৭টি গান স্থান পাইয়াছে। পুস্তকের অধিকাংশ সঙ্গীতই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী সম্বন্ধে এবং কয়েকটি স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ অবলম্বনে রচিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ষোড়শী-পূজার ভাব অবলম্বনে অঙ্কিত একখানি ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত চিত্র গ্রন্থটিতে সংযুক্ত। লখনৌ ন্যাশন্যাল একাডেমি অব হিন্দুস্থানী মিউজিক-এর অধ্যক্ষ ৺নারায়ণ রতনজন্‌কার-লিখিত ভূমিকাটি গ্রন্থখানিকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়াছে। সঙ্গীতজ্ঞ ভক্তগণের নিকট 'ভজন-সঙ্গীত' পুস্তিকাটির যথাযথ সমাদর হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

মহাভারত কাহিনী—স্বামী অমলানন্দ। প্রকাশক, স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ, সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেণ্টস হোম, বেলঘরিয়া, কলিকাতা ৫৬। পৃঃ ১৫৬; মূল্য ২৲ টাকা; বোর্ড বাঁধাই—২·৫০ টাকা।

জাতির সর্বোচ্চ চিন্তাগুলিকে সর্বসাধারণের দ্বারে দ্বারে যুগ যুগ ধরিয়া পরিবেশনের কাজে প্রধান মাধ্যমগুলির মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের স্থান সর্বোচ্চে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, আমাদের জাতিগঠনের জন্য একটি বিশেষ কাজ হইল রামায়ণ-মহাভারতাদি বালক-বালিকাদের উপযোগী করিয়া লিখিয়া তাহাদের কাছে পৌছাইয়া দেওয়া, যাহাতে প্রথম হইতেই তাহারা ভারতীয় চিন্তার সহিত পরিচিত হইতে পারে।

স্বামী অমলানন্দ-লিখিত মহাভারত কাহিনী দেখিয়া তাই আমরা খুব তৃপ্তি পাইলাম। অতি সহজ ভাষায় পুস্তকটি রচিত। ব্যাসদেব-রচিত মহাভারতকে অনুসরণ করিয়া এবং উহার পর্বানুসারে ভাগ করিয়া পুস্তকটি লিখিত। বলা বাহুল্য এত ক্ষুদ্র আয়তনে মহাভারতের সব আখ্যানগুলি কেবল স্পর্শ করাও অসম্ভব; লেখক মূল কাহিনীকে সাবলীল-ভাবে অগ্রসর করাইবার সময় নিপুণতার সহিত কয়েকটি সংশ্লিষ্ট শিক্ষামূলক আখ্যানকেও এই সচিত্র পুস্তকটিতে স্থান দিতে পারিয়াছেন।

পুস্তকটি বালক-বালিকাদের উপযোগী তো বটেই, খুব সংক্ষেপে যাঁহারা মহাভারতের আখ্যায়িকার সারাংশ জানিতে চান, তাঁহারাও পুস্তকটিকে সহায়করূপে পাইবেন। বালক-বালিকাদের মধ্যে পুস্তকটির বহুল প্রচলন একান্ত কাম্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

মেদিনীপুরে বন্যার্তসেবা: গত ডিসেম্বরের শেষভাগে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক মেদিনীপুর জেলার সবং, নন্দীগ্রাম, ভগবানপুর ও ময়না থানার ১২টি অঞ্চলে বন্যার্ত জনগণের মধ্যে ২৩,৫৪৫ কেজি চাল, ৬৮,১৪৮ কেজি গম এবং ৬,০০০ খানি ধুতি ও শাড়ী বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—৩৪,৭২২।

উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবা: গত জানুআরি ১৯৬৯ জলপাইগুড়ি শহরের ১৯নং ওয়ার্ডে, মণ্ডলঘাটের ৯নং অঞ্চলে এবং কাঠামবাড়ী অঞ্চলে বন্যাবিধ্বস্ত জনগণের মধ্যে মিশন কর্তৃক ৭,১৮৩ কেজি গুঁড়া দুধ, ৬০২ কেজি স্যুপ-মিক্সচার ১,৭২৪ খানি ধুতি ও শাড়ী, ১,৩৩৩ খানি কম্বল, ১০১টি বেনিয়্যান, ৬,৯৫৭টি পুরাতন পোশাক, ৮,২৭১টি বাসনপত্র, ৮৫টি কৃষিকার্যের সরঞ্জাম (farm implements), ৬টি লণ্ঠন এবং ১,৪৭০ খানি পাঠ্য-পুস্তক বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—১২,৩৬৯। ৬১১ জনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

জলপাইগুড়িতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে দুঃস্থ জনগণের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক কুটীর-নির্মাণকার্য এবং স্কুল-কলেজসমূহে শিক্ষা-সরঞ্জাম (educational appliances) দেওয়ার কাজ গ্রহণ করা হইয়াছে।

গুজরাটে বন্যার্তসেবা: গুজরাটে বন্যাপীড়িতদের পুনর্বাসনের জন্য মিশন কর্তৃক কুটীরনির্মাণকার্য সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হইতেছে।

উৎসব ও অন্যান্য সংবাদ

জামসেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির ভগিনী নিবেদিতা উচ্চ-মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণী সভায় স্বামী গম্ভীরানন্দজী ১৯৬৮ ২৫শে নভেম্বর পারিতোষিক বিতরণ এবং ভগিনী নিবেদিতার জীবন ও বাণী অবলম্বনে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন।

মাদ্রাজ: গত ১লা জানুআরি, ১৯৬৯ মাদ্রাজে মায়লাপুরস্থ ছাত্রাবাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডক্টর করণ সিং বিশিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

মাদ্রাজ শহরে অবস্থিত বিবেকানন্দ কলেজে, মায়লাপুর ছাত্রাবাসে, ত্যাগরায়নগর উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে, সারদা বালিকা বিদ্যালয়ে, বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী বালিকা বিদ্যালয়ে এবং দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চিকাগো ধর্মমহাসভার ৭৫তম স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

চণ্ডীগড়: স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ১২ই জানুআরি চণ্ডীগড় আশ্রমে হরিয়ানার রাজ্যপাল শ্রীবি. এন. চক্রবর্তী স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটি বিশেষ বক্তৃতা দেন।

দিল্লী: গত ১২ই জানুআরি দিল্লীর লে. গভর্নর ডক্টর এ. এন. ঝা নিউদিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনে আয়োজিত সাধারণ সভায় স্বামীজী সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন।

ভুবনেশ্বর: গত ১৯শে জানুআরি ভুবনেশ্বর আশ্রমে স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে ডক্টর করণ সিং সাধারণ সভায় পৌরোহিত্য করেন।

দেওঘর: গত ২২শে জানুআরি দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে স্বামী গম্ভীরানন্দজী নবনির্মিত গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করিয়াছেন। সাধু-ভবন এবং ভোজনালয়ের সম্প্রসারিত অংশেরও উদ্বোধন হইয়াছে। স্বামী গম্ভীরানন্দজী বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন ছাত্রদের পুনর্মিলনোৎসবেরও উদ্বোধন করেন। ২২শে, ২৩শে, ২৪শে জানুআরি মিলনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিন সভাপতিত্ব করেন স্বামী গম্ভীরানন্দ, দ্বিতীয় দিন স্বামী বুধানন্দ ও শেষ দিন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ।

আমেরিকা: গত ২০শে জানুআরি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নব-নির্বাচিত প্রেসিডেণ্টের জন্য ওয়াশিংটনে আয়োজিত প্রাথমিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে চিকাগো কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ভাষ্যানন্দ আমন্ত্রিত হইয়া সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

২৫.৭.৬৮ তারিখে চিকাগো আসার পর হইতে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, কানাডা পরিভ্রমণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক সম্মেলনে, বেদান্ত সমিতিতে, চার্চে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা করিতেছেন। ১৯৬৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি প্রায় ১৬০টি বক্তৃতা ও আলোচনা করিয়াছেন।

কার্যবিবরণী

নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের বার্ষিক (১৮.৫.১৯৬৭ হইতে ২২.৫.১৯৬৮ পর্যন্ত) কার্যবিবরণী: কেন্দ্রাধ্যক্ষ—স্বামী নিখিলানন্দ।

আলোচ্য বর্ষে এই কেন্দ্রের নির্ধারিত কর্মধারা যথারীতি অনুসৃত হইয়াছে। ২.৬.৬৭ তারিখে আমেরিকার বস্টন কেন্দ্রের স্বামী সর্বগতানন্দ এই কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং ধর্মসভা পরিচালনা করেন।

কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দজীর শারীরিক অসুস্থতার জন্য কেন্দ্রের কাজকর্ম ১১.৬.৬৭ হইতে কিছুদিন স্থগিত রাখা হয়। হাসপাতালে সুচিকিৎসায় আরোগ্যলাভান্তে ফিরিয়া তিনি ২৪শে এপ্রিল সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) গমন করেন। সেখানে বিবেকানন্দ-কুটির উপাসনা-মন্দিরে সারা গ্রীষ্মকাল যাবৎ প্রায় ২৪ জন বন্ধু ও ছাত্রগণসহ সন্ধ্যায় নিয়মিত ধ্যানধারণা ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

স্বামী নিখিলানন্দ ফিলাডেলফিয়া টেম্পল ইউনিভারসিটিতে হিন্দুধর্মের অধ্যাপক-পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ১৯৬৭ সেপ্টেম্বর হইতে প্রতি সোমবার বেলা ৩টা হইতে ৫-৩০ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকগণের জন্য হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দিতে শুরু করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে স্বামী নিখিলানন্দের সর্বশেষ গ্রন্থ 'অমৃতত্বের সন্ধানে মানুষ' (Man in Search of Immortality) প্রকাশিত হইয়াছে।

গত ২২শে অক্টোবর গ্রেস চার্চের তুলনামূলক ধর্মশিক্ষার্থী একদল ছাত্র নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের উপাসনা-সভায় যোগদান করেন।

গত ৩রা নভেম্বর মহিলা সেন্‌টিনারি কলেজ চ্যাপেলের ডীন ডক্টর এম. অর-এর 'বিশ্বধর্ম' বিষয়ক ক্লাসটি এখানে অনুষ্ঠিত হয়; স্বামী নিখিলানন্দজী 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—দ্বিতীয় অধ্যায় অবলম্বনে ভাষণ দেন।

গত ১৯শে নভেম্বর ভ্যান উইক জুনিয়র হাইস্কুলের শিক্ষক মিঃ গ্রীনবার্গ একদল ছাত্র লইয়া এখানে আসেন।

গত ২৭শে নভেম্বর মাউণ্ট ভারনন-স্থিত চার্চ-অ্যাসোসিয়েশন-এর যাজক মারভিন এ. গার্ডনার ১২ জন উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র লইয়া

'আধ্যাত্মিকতার সাধন ও ঐহিক বাসনা' সম্বন্ধে ভাষণ শুনিতে আসিয়াছিলেন।

গত ১০ই ডিসেম্বর ইউনিটেরিয়ান গ্রুপের কিশোর-বয়স্ক বালকগণের তত্ত্বাবধায়ক কতক-গুলি ছাত্র লইয়া রবিবাসরীয় প্রাতঃকালীন উপাসনা-সভায় যোগ দেন।

গত ১১ই ফেব্রুআরি ওয়াটচুং-এর উইলসন মেমোরিয়্যাল ইউনিয়ন চার্চের রেভারেণ্ড রোল্যাণ্ড এইচ. ওস্ট ৩৫ জন ছাত্রসহ রবিবারের সভায় যোগদান করেন।

গত ১২ই মে এই কেন্দ্রের সভ্যগণ ও বন্ধুবর্গ ভারতে লখনৌ- গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারে ব্রতী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর ওয়েলদী এইচ. ফিশারের মনোজ্ঞ ভাষণ শুনিবার সুযোগ লাভ করেন। তিনি 'পুনরুজ্জীবন: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

স্বামী নিখিলানন্দ তাঁহাকে ঐদিনের বক্তৃতায় প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ ভারতের গ্রামে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য উপহার দেন।

আলোচ্য বর্ষে নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ উপাসনা-মন্দিরে নিম্নলিখিত বিশেষ অনুষ্ঠান-গুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল:

বুদ্ধ-জয়ন্তী. শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষে জগজ্জননীর পূজা, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব, খৃষ্টজন্মদিন, গুডফ্রাইডে, ঈস্টার সারভিস ও বুদ্ধদেবের জন্মতিথি-উৎসব। প্রতিটি অনুষ্ঠান ভজনাদি সহায়ে মনোজ্ঞ হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে রবিবাসরীয় ও অন্যান্য সাপ্তাহিক সভায় মোট শ্রোতৃসংখ্যা—৩,৭৫১। রবিবারের সভায় গড়ে উপস্থিতি—৭১, সাপ্তাহিক সভায় ৩২। নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টারের বর্তমান সভ্য-সংখ্যা—১৩৫।

কানপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের (এপ্রিল, ১৯৬৭—মার্চ, ১৯৬৮) বার্ষিক কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

আশ্রমে নিয়মিত পূজা-উপাসনাদি ছাড়া প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বর্ষে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব, শ্রীশ্রীকালীপূজা এবং মহাপুরুষগণের পুণ্য জন্মতিথিগুলি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে নূতন গ্রন্থাগার ও পাঠাগার ভবনের উদ্বোধন করা হয়। গ্রন্থাগারে ৫ খানি দৈনিক সংবাদপত্র এবং ৪৭ খানি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। গ্রন্থাগারে দৈনিক পাঠক-সংখ্যা ৩৫।

উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬৮০। পরীক্ষার ফল বিশেষ সন্তোষজনক। আলোচ্য বর্ষে ১২ জন ছাত্র জাতীয় বৃত্তি লাভ করিয়াছে। স্কুল লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা ৬,১২২; ৩,৪৭৭ খানি বই ছাত্র ও শিক্ষকগণকে পড়িতে দেওয়া হয়।

দাতব্য চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে ২,৪৬,৭৩১ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে; ২৬৭টি অস্ত্রচিকিৎসা করা হয়; ৩০,২১৬টি ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। ল্যাবরেটরীতে ১৮৮টি নমুনা পরীক্ষিত হয়। এক্স-রে বিভাগে ৯০ জন রোগীকে পরীক্ষা করা হইয়াছিল।

কানপুর কেন্দ্রটি ইহার প্রতিষ্ঠাকাল ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে জনসাধারণের নানাভাবে সেবা করিয়া আসিতেছে।

কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৩—মার্চ ১৯৬৮) আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই আশ্রম কর্তৃক একটি দাতব্য আউটডোর ডিসপেন-সারী, একটি উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, একটি

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার এবং একটি ছাত্রাবাস পরিচালিত হয়।

দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে মোট ২৫,৯৩০ জন রোগী চিকিৎসিত হয়, তন্মধ্যে অ্যালোপ্যাথিক বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১৫,৭৭১ এবং হোমিওপ্যাথিক বিভাগে ১০,১৫৯।

উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছয় শতের অধিক। বিগত ৫ বৎসরে ছাত্রগণ স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষায় প্রতিবৎসরই ভাল ফল দেখাইয়াছে এবং ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে চারজন ছাত্র জাতীয় বৃত্তি পাইয়াছে।

গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ভাষায় ২,১০০ খানি পুস্তক আছে। পাঠাগারে ২টি দৈনিক সংবাদ-পত্র ও ১৭টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার হইতেছে।

ছাত্রাবাসে ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে ২৪ জন ছাত্র ছিল। বিদ্যার্থীদের পড়াশুনা, স্বাস্থ্যচর্চা ও নৈতিক চরিত্রগঠনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় এবং স্বাবলম্বী হইতে শিখানো হয়।

পূর্বপাকিস্তান হইতে আগত রিক্ত জনগণের জন্য বীরেশ্বর পল্লীতে একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারী, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি সমবায়-বিপণি করা হইয়াছে।

আলোচ্য সময়ে আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত এবং অন্যান্য পুণ্যদিনগুলিও যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

প্রতিদিন সন্ধ্যারতির পর নিয়মিতভাবে ধর্মালোচনা হয়।

রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটির ১৯৬৫ এবং ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি।

এই সোসাইটি কর্তৃক একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচালিত হয়। পাঠাগারে বিভিন্ন ভাষায় দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক পত্র-পত্রিকা রাখা হয়।

আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে সোসাইটির ৮৫৬ জন নূতন সদস্য করা হয়। ১২৯টি ধর্মশাস্ত্র এবং মহাপুরুষগণের জীবন অবলম্বনে আলোচনা, ৭৭টি শিক্ষা-সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা, ১১টি সঙ্গীত-অধিবেশন, ৮টি কৃষ্টি- ও শিক্ষামূলক আলোচনা, একটি নাটকাভিনয়, এবং প্রতি একাদশীতে রামনাম সংকীর্তন হইয়াছিল। শহরে ও শহরের বাহিরে অন্যান্য স্থানেও ধর্মবিষয়ে ৪২টি বক্তৃতা ও ১৯৭টি ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়।

বিনা-বেতনে সংস্কৃতভাষা শিক্ষার জন্য সপ্তাহে দুইদিন করিয়া ক্লাস করা হইতেছে।

ব্রহ্মদেশে গভর্ণমেন্ট কর্তৃক সাধুগণের স্থায়িভাবে থাকার অনুমতি প্রদত্ত না হওয়ায় মিশনের স্থানীয় বন্ধুগণ কেন্দ্রটি পরিচালনা করিতেছেন।

সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। ভারতের বাহিরে মিশনের এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ইহা জনসাধারণের সেবা করিয়া আসিতেছে।

এই কেন্দ্রের প্রধান কার্য আধ্যাত্মিক ও সাধারণ শিক্ষা-বিস্তার। প্রতি সপ্তাহে ক্লাস, আলোচনা ও বক্তৃতা এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ধর্মোপদেশ দেওয়া হয়। কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দ আশ্রমের বাহিরে বিভিন্ন স্থানেও ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা দেন। সিঙ্গাপুরে ও মালেশিয়ায় তিনি আলোচ্য বর্ষে ৩২টি ভাষণ প্রদান করেন।

বিদ্যালয়ঃ 'বিবেকানন্দ তামিল বিদ্যালয়' এবং 'সারদাদেবী তামিল বিদ্যালয়'—সুপরিচালিত এই বিদ্যায়তন দুইটিতে আলোচ্য বর্ষে ২২৫ জন ছাত্রছাত্রী (ছাত্রী—১৬৫) অধ্যয়ন করিয়াছে।

কলাইমঙ্গল (Kalaimangal) তামিল স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ৪৯ ও ১০৯।

তামিলভাষা শিক্ষার মাধ্যম হইলেও ছাত্রছাত্রীগণকে জাতীয় ভাষা (মালয়) এবং ইংরেজীও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে উপরি-উক্ত তিনটি বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক প্রবেশিকা-পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক।

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদেগের জন্য নৈশবিদ্যালয়ে তামিল ও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৫৩ জন বয়স্ক ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

ছাত্রাবাসঃ মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত ছাত্রাবাসে আলোচ্য বর্ষে ৫৫টি ছাত্র ছিল। বিদ্যার্থীরা নিয়মিত প্রার্থনা ভজনাদি, খেলাধুলা ও পড়াশুনার মাধ্যমে মানুষ হইয়া উঠিতেছে। ৮ হইতে ১৭ বৎসরের আশ্রম-বালকগণ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। একজন প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং একজন পলিটেকনিক ডিগ্রীকোর্সের ছাত্রও ছাত্রাবাসে থাকে। ছাত্রাবাসে একটি শিশু-গ্রন্থাগার করা হইয়াছে এবং গ্রন্থাগারটির উপযুক্ত সদ্ব্যবহার হইতেছে।

গ্রন্থাগার ও পাঠাগারঃ ইংরেজী, তামিল, মালয়লম, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় ধর্ম দর্শন সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ৫,১১৮ খানি পুস্তক আছে, আলোচ্য বর্ষে ১০ খানি নূতন পুস্তক সংযোজিত হইয়াছে। পাঠাগারে ৬টি দৈনিক ও ৩৪টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব যথারীতি পূজা, পাঠ ও বক্তৃতাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। রামনবমী, কৃষ্ণজয়ন্তী, নবরাত্রি, দুর্গাপূজা, খৃষ্টজন্মদিন এবং অন্যান্য পুণ্যতিথিও সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

স্বামী আত্মারামানন্দের দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ২২.১.৬৯ বেলা ১২টায় বারাণসী সেবাশ্রমে স্বামী আত্মারামানন্দ (ফণী মহারাজ) দেহত্যাগ করিয়াছেন। আন্ত্রিক গোলযোগের জন্য কিছুদিন পূর্বে তাঁহার একটি অস্ত্রোপচার হইয়াছিল। দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি অনিদ্রা প্রভৃতিতে ভুগিতেছিলেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট তাঁহার সন্ন্যাস-দীক্ষা হয়। তিনি কিষেণপুর ও জামতাড়া আশ্রমের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন; প্রথম দিকে বেলুড় মঠে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া প্রধানতঃ গৃহনির্মাণাদি দেখাশুনা করিতেন। তিনি অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগে সঙ্ঘের একজন কর্মঠ সন্ন্যাসীর অভাব ঘটিল।

তাঁহার আত্মা ভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

নববারাকপুর—গত ১৯শে জানুআরি বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জন্মোৎসব পূজাপাঠাদির মাধ্যমে পালন করা হয়। সন্ধ্যায় স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন এবং স্বামী নিত্যানন্দ পরিষদ-কর্তৃক স্থাপিত বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের (শিশু শিক্ষাভবন) উদ্বোধন করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন ডক্টর মহেন্দ্র চন্দ্র মালাকার।

আরামবাগ—স্থানীয় জনগণের সহায়তায় ও স্বামী গদাধরানন্দজীর পৌরোহিত্যে গত ২৯শে জানুআরি কালীপুর অঞ্চলে 'শ্রীরামকৃষ্ণ সমন্বয় আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিন সকালে শোভাযাত্রা ও স্থানীয় আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজাদি সুসম্পন্ন হয়। বিকালে স্বামী অদ্বয়ানন্দজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ, সভাপতি মহারাজ, শ্রীযুগলকিশোর ভাণ্ডারী, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা এবং নবপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

ইম্ফল—শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতিতে গত ১২ই ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উৎসব প্রতিপালিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় শ্রীকালীপদ শর্মা শ্রীশ্রীমায়ের জীবন আলোচনা করেন। পরে রামায়ণ-গান পরিবেশিত হয়।

গত ২৪শে ডিসেম্বর খ্রীষ্টমাস উৎসব উপলক্ষে ভাষণ দেন রেঃ যাথার যোসেফ ও শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সেন।

অখিল-ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের দ্বিতীয় বার্ষিক যুবশিক্ষণশিবির অনুষ্ঠিত হয় গত ৪ঠা হইতে ৮ই জানুআরি পর্যন্ত। বারাকপুরে ৪ঠা জানুআরি শিবিরের উদ্বোধন করেন স্বামী গম্ভীরানন্দজী এবং বিভিন্ন দিনে স্বামীজীর বিভিন্ন ভাবাধারা বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী জ্যোতিরূপানন্দ, স্বামী স্মরণানন্দ, স্বামী নিত্যানন্দ, স্বামী জয়ানন্দ, স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী অমৃতত্বানন্দ, অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী, অধ্যক্ষ অধীর কুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক জীবনবল্লভ চৌধুরী, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, শ্রীনীলমণি দাস ও মহামণ্ডলের সভাপতি অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার। প্রত্যহ বেদপাঠ, একাগ্রতা বিষয়ে আলোচনা ও অভ্যাস, ব্যায়াম, স্বামীজীর বাণী পাঠ ও প্রশ্নোত্তর, খেলাধুলা, সান্ধ্য প্রার্থনা প্রভৃতি এবং স্বামীজীর ভাবধারা লইয়া প্রত্যহ তিনটি করিয়া আলোচনা শিবিরের কার্যসূচী ছিল। ৯টি জেলা হইতে বিদ্যার্থী ও শিক্ষকগণ ইহাতে যোগদান করেন। ২৫০ জন বিদ্যার্থী শিবিরে যোগ দেন; ইহা ছাড়া একদিন প্রায় ৫০০ জন বিদ্যার্থী বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

স্বামীজীর জন্মোৎসবপালন উপলক্ষে গত ১১ই জানুআরি মহামণ্ডলের উদ্যোগে কলিকাতা ও হাওড়ার বিভিন্ন প্রান্ত হইতে বিদ্যার্থীদের পাঁচটি শোভাযাত্রা ময়দানে মনুমেন্টের নীচে আয়োজিত সভায় সমবেত হন। সভাপতি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ রমা চৌধুরী, স্বামী চিদাত্মানন্দ ও অধ্যক্ষ

অমিয়কুমার মজুমদার এই সভায় ভাষণ দেন। তাঁহারা স্বামীজীর আদর্শে যুবজীবন-গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন।

মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য স্বামীজীর আদর্শে যুবসম্প্রদায়ের জীবনগঠন; ৩২টি সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া মহামণ্ডল এই কাজ করিয়া চলিয়াছে। গত বৎসর কলিকাতা, হাওড়া হুগলী, মেদিনীপুর ও জলপাইগুড়ি জেলায় বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে যাইয়া মহামণ্ডলের সভ্যগণ খাদ্য-বস্ত্র-ঔষধাদি-বিতরণ প্রভৃতি সেবাকার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।

নেহেরু পুরস্কার

মার্কিণ নিগ্রো-আন্দোলনের নেতা, শান্তির দূত ডঃ মার্টিন লুথার কিং ১৯৬৬ সালের জন্য মরণোত্তর নেহেরু পুরস্কার পাইয়াছেন। আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে ডঃ কিং-এর অবদানের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। গত ২৪শে জানুআরি সকালে দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে ডঃ কিং-এর পত্নী শ্রীমতী কোরেটা কিং রাষ্ট্রপতির নিকট হইতে স্বামীর হইয়া এই পুরস্কার গ্রহণ করেন।

পরলোকে রজনীকান্ত প্রামাণিক

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ২৪. ১১. ৬৮ তারিখ রাত্রি পৌনে তিনটার সময় শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য রজনীকান্ত প্রামাণিক ৭৪ বৎসর বয়সে তমলুকে দেহত্যাগ করিয়াছেন। দেশসেবক রজনীকান্ত প্রামাণিক চিরকুমার থাকিয়া দেশের জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি মহাত্মাজীর আদর্শানুগ ছিলেন, কেবল রাজনীতিতেই নয়, জীবনেও। অনাড়ম্বরজীবন, আদর্শনিষ্ঠ, সেবাপরায়ণ রজনীকান্ত প্রামাণিক স্বামীজীর ভাবে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তিনি মেদিনীপুর জেলার তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই আশ্রমটির সেবা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার আত্মা শ্রীভগবচ্চরণে শান্তিলাভ করুক, এই প্রার্থনা।

পরলোকে গিরিজা দেবী

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, ঢাকা জেলার আউটসাহীর ভক্ত রাজেন্দ্রভূষণ গুপ্তের পত্নী গিরিজা দেবী ৮৯ বৎসর বয়সে গত ৮ই জানুআরি কলিকাতায় সজ্ঞানে পরলোকগমন করিয়াছেন। গিরিজা দেবী মৃত্যুকালে চার পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন; প্রখ্যাত চিত্রকর ৺মণীন্দ্র গুপ্ত তাঁহার পুত্র ছিলেন।

সন ১৩২৫ সালের ১৩ই শ্রাবণ গিরিজা দেবী শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন।

তাঁহার আত্মা শ্রীভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করুক।

ভ্রম-সংশোধন

উদ্বোধনের গত পৌষ, ১৩৭৫ সংখ্যার ৫৫৯ পৃষ্ঠা, ১ম কলম, ২৮ লাইনে 'প্রভাতকর বাবু' স্থলে 'প্রভাকর বাবু' এবং মাঘ, ১৩৭৫ সংখ্যার ২০ পৃষ্ঠা, ১২ লাইনে 'শ্রীসুধাংশুকুমার দাস' স্থলে 'শ্রীসুধাংশুকুমার দাম' পড়িবেন।



দিব্য বাণী

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ২

কত না তোমার নাম (কতজন ডাকে কত নাম ধ'রে)!
প্রতিটি নামেই তোমার সর্ব শক্তি দিয়েছ ভ'রে
(যে-কোন নামের তরী নিয়ে যায় ভবসিন্ধুর পার)!
সে-নাম কখন করিবে স্মরণ বিধিও নাহিক তার!
এত তব কৃপা! হেন দুর্ভাগা তবু ভগবান আমি
অনুরাগ মোর হল না জীবনে সে-নামে, হৃদয়-স্বামী!

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩
—শিক্ষাষ্টকম্ (শ্রীচৈতন্য)

তৃণের চেয়েও নীচু হয়ে থেকে, সহ্য করিয়া তরুরও চেয়ে,
মানের কাঙাল হইয়া না ঘুরে, অপরেরে মান সদাই দিয়ে
করিতে হয় যে হরিনাম-কীর্তন!
(করে তা যে জন তাহার 'অহং' নিঃশেষে মুছে গিয়ে
অবাধিত করে হৃদি-মন্দিরে শ্রীহরির দর্শন।)

কথাপ্রসঙ্গে

সংস্কার

সংস্কারমুক্ত কথাটি আজকাল মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের জাতির যাহা কিছু প্রাচীন সংস্কার তাহার প্রায় সবকিছুকেই আধুনিকগণ কুসংস্কার আখ্যায় ভূষিত করিতে চাহেন এবং সেগুলির মধ্যে যাহা শুভ তাহা হইতেও মুক্ত হওয়াকেই সভ্যতার, মানবতার উচ্চতর স্তরে আরোহণ বলিয়া মনে করেন। প্রাচীন সংস্কারগুলিকে বর্জন করিবার প্রবণতা প্রায় সব দেশেই জনচিত্তে, বিশেষ করিয়া যুবমনে প্রকট হইতেছে।

কিন্তু সত্যই কি ইহা আমাদিগকে, মানুষকে উন্নততর অবস্থার দিকে অগ্রসর করাইতেছে, না উহা হইতে পিছু হটাইয়া আনিতেছে? উহা কি সত্যই সংস্কারমুক্তি, না শুভ-সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া কেবল অশুভ সংস্কারকে বরণ করিয়া লওয়া? যথার্থ সংস্কারমুক্তি ঘটে মনের অতি উন্নত অবস্থায়, এবং সেরূপ উন্নত মনের অধিকারীর সংখ্যা চিরদিনই বিরল।

সংস্কার কি?

আমাদের প্রত্যেকটি চিন্তা, প্রত্যেকটি অনুভূতি মস্তিষ্কে, এবং মনেও, সূক্ষ্মাকারে একটি করিয়া ছাপ রাখিয়া যায়। সেজন্য কোন চিন্তা বা কাজ, সৎ বা অসৎ যাহাই হউক, পর পর কয়েকবার করিলেই ঐ ছাপগুলি ক্রমে দৃঢ় হইয়া অভ্যাসে পরিণত হয়। অভ্যাস খুব দৃঢ় হইলেই তাহাকে সংস্কার বলে।

অভ্যাসের প্রভাব যে কতখানি, তাহা আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেই দেখিতে পাই। যে-সব খাদ্যে আমরা শৈশব হইতে অভ্যস্ত, পরবর্তী জীবনে সেগুলিকে ভাললাগার ছাপ প্রায় আজীবন স্থায়ী হয়। ছেলেবেলায় অনেক অভ্যাস হয়ত করিয়াছি; পরে অকল্যাণকর জানিয়া সেগুলি ছাড়িবার সময় বুঝা যায় কী গভীরভাবে সেগুলি মনে গাঁথিয়া গিয়াছে। যে-সব চিন্তা আমরা বহুবার করিয়াছি, সে-সব চিন্তা করিতে আমাদের কোনপ্রকার কষ্টবোধ হয় না; কিন্তু যে-চিন্তার সহিত আমাদের পরিচয় নাই বা কম, তাহা শুনিতে বা সেই চিন্তাসমন্বিত বই পড়িতে মস্তিষ্কে চাপ লাগে, মনও উহা সহজে গ্রহণ করিতে চায় না। কিন্তু দিনকতক জোর করিয়া অভ্যাস করিলে উহাকেই আবার মন ও মস্তিষ্ক সহজভাবে গ্রহণ করে। ইহার একমাত্র কারণ, বারবার একইভাবে চিন্তা ও কাজ করার ফলে মস্তিষ্কের ও মনের উপর উহার ছাপ ক্রমে গভীরতর হইতে থাকে; যেন চিন্তাধারার জন্য এক একটি গভীর খাদ কাটিয়া দেয়, যাহার মধ্য দিয়া উহার প্রবাহ সাবলীলা হইতে পারে।

এই অভ্যাসই আরো গভীর হইলে সংস্কারে পরিণত হয়। আমাদের এ-জন্মে অর্জিত অভ্যাসের প্রভাব হইতেই অনুমান করিতে পারি, বহু বহু জন্ম ধরিয়া যেগুলির পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে সে-অভ্যাসগুলির ছাপ কত গভীর হইতে পারে! অবশ্য যদি মন এক জন্মের ছাপগুলি অন্য জন্মে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়, ইহা সত্য হয়।

মন—প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, তাহাই ঘটে। মনের এই ছাপগুলি দেহনাশের সঙ্গে নষ্ট হয় না, কারণ দেহের মৃত্যুর সঙ্গে মনের নাশ হয় না।

মন স্থূলদেহের সঙ্গে জাত এবং দেহের বিনাশের সঙ্গেই বিলুপ্ত দেহের পরমাণুবিন্যাসের ফলে উৎপন্ন মস্তিষ্কের ধর্মমাত্র নহে; মন পৃথক একটি পদার্থ। স্থূলদেহের মতোই জড়-উপাদানে গঠিত হইলেও আমাদের দেহ যে-সব উপাদানে গঠিত, মনের উপাদান তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর। সেজন্য স্থূলদেহ যত সহজে বিনষ্ট হয়, মন তত সহজে বিনষ্ট হয় না। মনের মতো প্রাণ প্রভৃতিও (যে শক্তি শরীর গঠন ও পালনাদি করে) এই-জাতীয় উপাদানে গঠিত বলিয়া সেগুলিও স্থূল দেহের বিনাশে বিনষ্ট হয় না। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল উপাদানে গঠিত দেহকে স্থূলদেহ এবং সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত মন, প্রাণ প্রভৃতির সমষ্টিকে সূক্ষ্মদেহ বলে। একটি স্থূলদেহ নাশের পর এই সূক্ষ্মদেহ থাকিয়া যায় এবং উপযুক্ত পরিবেশে অপর একটি স্থূলদেহ গঠন করিয়া লয়। গীতার ভাষায় দেহী যেন পুরাতনদেহরূপ জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া নবদেহরূপ নূতন বসন পরিধান করেন। অক্ষয়ের দেহত্যাগ দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, "কেমন করে মানুষ মরে, বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। দেখলুম, যেন খাপের ভেতর তলোয়ারখানা ছিল, সেটাকে খাপ থেকে বের করে নিলে; তলোয়ারের কিছুই হল না,—যেমন তেমনি থাকল, খাপটা পড়ে রইল।" দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশের সময় মন পূর্ব পূর্ব জন্মার্জিত সমস্ত অনুভূতির ছাপই সঙ্গে লইয়া আসে; সূক্ষ্মদেহের কাছে মৃত্যু জীবনের শেষ নয়, তাহার সুদীর্ঘ জীবন-পথের মাঝে মাঝে জন্মমৃত্যু পরিবর্তন মাত্র। (অবশ্য পূর্বজন্মের স্মৃতি আমাদের মনের চেতন স্তরে থাকে না, অবচেতনে থাকে। গভীর একাগ্রতার অভ্যাসে এই স্মৃতিকে চেতন স্তরেও আনা সম্ভব)। মনের উপর জন্ম-জন্মান্তরের এই ছাপগুলির সমষ্টিকেই পূর্ব-জন্মার্জিত সংস্কার বা সাধারণভাবে সংস্কার বলা হয়। বর্তমান জন্মে আমরা এই 'সংস্কারের পুঁটলি'তে আবার নতুন কিছু ভরিয়া দিই, পুরাতন সংস্কারগুলিকে অনুকূল অভ্যাসের দ্বারা কখনো দৃঢ়তর এবং প্রতিকূল অভ্যাসের দ্বারা কখনো বা ক্ষীণতর করি। (স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, আমাদের বর্তমান ব্যক্তিত্ব এই সংস্কারগুলির সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নহে এবং যেহেতু আমরাই ইহা গড়িয়াছি, আমরা ইচ্ছা করিলে ইহাকে ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়িতেও পারি।)

মন ও মস্তিষ্ক পৃথক পৃথক পদার্থ

এখানে প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল। মস্তিষ্ক ও মনকে আমরা যেন একই পদার্থ না ভাবি; স্থূলদেহে আবদ্ধ থাকিবার সময় মস্তিষ্কের সাহায্য অবশ্য তাহাকে গ্রহণ করিতেই হয় বিষয় আহরণের সময়। যেমন ছেলেরা ভাবে চোখই দেখে, কিন্তু দেহতত্ত্ব-বিদ্‌গণ জানেন, আসল দেখা মস্তিষ্ক না থাকিলে হয় না, তেমনি দেখা শোনা চিন্তাকরা প্রভৃতির জন্য মস্তিষ্কের প্রয়োজন থাকিলেও আসলে এ-সব মনই করে। চোখ নষ্ট হইয়া গেলে যেমন মস্তিষ্কের দেখার কেন্দ্রটিও নষ্ট হইয়া যায় না, মস্তিষ্কের কোন অংশ নষ্ট হইয়া গেলেও তেমনি মনের কিছু হয় না। একটি ঘরে আবদ্ধ আছি, একটি কাঁচের জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের যেটুকু দেখা যায় সেটুকুই দেখিতে পাইতেছি। কাঁচটি যে রঙের, আমাদের কাছে বাইরের জগৎটিও সেই রঙের বলিয়া মনে হইবে; কাঁচটির গঠন বিকৃত হইলে আমাদের দর্শনকেই বিকৃত বলিয়া মনে হইবে; কাঁচটি ময়লা লাগিয়া অস্পষ্ট হইলে

বাহিরের জিনিস অস্পষ্ট দেখিব, একেবারে কালো হইয়া গেলে বাহিরের আর কিছুই দেখিতে পাইব না। কিন্তু এই-জাতীয় কোন ক্ষেত্রেই আমাদের দেখার শক্তি বিকৃত বা নষ্ট হইয়াছে বলা যায় না; কাঁচটি পাল্টাইয়া দিলে, বা ঘর হইতে বাহিরে আসিলে, বা সে-ঘর ছাড়িয়া ভাল কাঁচের জানালাসংযুক্ত অন্য ঘরে আমাকে ঢুকাইয়া দিলে আমি আবার ভাল-ভাবেই সব দেখিতে পাইব। মন ও মস্তিষ্কের সম্বন্ধও ঠিক এই রকম। মস্তিষ্ক হইতে মনের পৃথক অস্তিত্ব না জানার জন্যই মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া প্রকাশিত চিন্তা প্রভৃতিকেই আমরা মন বলিয়া ধরিয়া লই।

মন যে মস্তিষ্ক হইতে আলাদা, সূক্ষ্মতর পদার্থে গঠিত পৃথক সত্তা, তাহা অনুমান নয়, বহুজনের প্রত্যক্ষ করা সত্য। চেষ্টা করিলে আমরাও স্থূলদেহ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এই মনকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। মনকে এভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া যাঁহারা মনস্তত্ত্ব লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন, মন সম্বন্ধে তাঁহাদের কথাই প্রামাণ্য। যাঁহারা মনকে এভাবে প্রত্যক্ষ না করিয়াই কেবল মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া প্রকাশিত তাহার ক্রিয়াদি পর্যবেক্ষণ করিয়া মন সম্বন্ধে অভিমত দেন, তাহা অনুমান মাত্র, এবং মন সম্বন্ধে তাঁহাদের এ-প্রকার অনুসন্ধানলব্ধ জ্ঞান মস্তিষ্ক ও বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত অবস্থায় এগুলির মাধ্যমে মনের যেটুকু প্রকাশ তাহাতেই সীমাবদ্ধ। মস্তিষ্কের খবর না রাখিয়া কেবল চোখের গঠন ও কার্যাবলীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা মস্তিষ্কের দেখার কেন্দ্র সম্বন্ধে অনুমান করার মূল্য যতখানি, মনসংযুক্ত মস্তিষ্কের ক্রিয়া দেখিয়া মন সম্বন্ধে অনুমান করার মূল্য তাহার অধিক নহে।

তাই কেবল এ-জাতীয় তথ্যের উপর নির্ভর করিলে আমাদের বিভ্রান্ত হইবার সমূহ সম্ভাবনা। যেমন মথুরবাবু একবার শ্রীরামকৃষ্ণের মনের উচ্চাবস্থা না বুঝিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুভূতিজনিত লক্ষণগুলিকে একবার মাথা গরম হওয়ার জন্য বলিয়া এবং আর একবার অখণ্ড ব্রহ্মচর্যপালনের কুফল বলিয়া ভাবিয়া-ছিলেন। যেমন প্রথমদিকে নরেন্দ্রনাথই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিতেন যে, তাঁহার দিব্যদর্শনসমূহ মাথায় খেয়াল ছাড়া আর কিছু নহে। তাঁহাদের এ ভুল অবশ্য পরে ভাঙিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই উচ্চতর সত্যগুলি প্রত্যক্ষ করিবার পরে স্বামী বিবেকানন্দ মনস্তত্ত্বপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন: মন কি, তাহা প্রত্যক্ষ না করিয়াই মন সম্বন্ধে অনুমান করিয়া কেহ মনস্তত্ত্বের বই লিখিলেন, সেই অনুমানের উপর অনুমান করিয়া অপর একজন আর একখানি বই লিখিয়া বাজারে ছাড়িলেন—এভাবে বিভ্রান্ত মানুষের বিভ্রান্তি আরও বাড়াইয়া দিলেন।

মন—জড়বাদিগণের মতে

মস্তিষ্কের মাধ্যমে মনের যেটুকু প্রকাশ তাহার অতিরিক্ত বা তাহা হইতে পৃথক মনের কোন অস্তিত্ব জড়বাদিগণ স্বীকার করেন না। জড়বাদিগণ এবিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়ে আজ যাহা বলিতেছেন, ভারতে একদা চার্বাকপন্থিগণ তাহাই প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন। চার্বাক-মতে মন, চেতনা প্রভৃতির দেহাতিরিক্ত কোন অস্তিত্ব নাই। কাজেই জন্মান্তর নাই। ঈশ্বরও নাই। কারণ এগুলির কোনটিই আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নহে। ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য প্রমাণ তাঁহারা মানিতেন না—"প্রত্যক্ষ-মেবৈকং প্রমাণম্", "মানস্বক্ষজমেবহি।" অনুমান তাঁহাদের মতে প্রমাণই নহে—"অনুমানম-প্রমাণম্"। তাঁহাদের মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ু—এই চারিটি ভূত বা মূল উপাদানেই

(কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থার জড়কণা এবং শক্তি) জগৎ গঠিত, আমাদের দেহাদিও (আকাশ ইন্দ্রিয়গোচর নহে বলিয়া 'আকাশ'কে তাঁহারা গ্রহণ করে নাই)। আমাদের দেহে এই চারিটি মূল উপাদানের বিশেষ বিন্যাসের ফলেই চিন্তা, চৈতন্য প্রভৃতি গুণের উদয় হয়, মন বা আত্মা বলিয়া কোন কিছুর দেহাতিরিক্ত পৃথক সত্তা নাই—"চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্য-মুপজায়তে" "চৈতন্যবিশিষ্টদেহ এব আত্মা, দেহাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ।" দেহের সঙ্গেই চিন্তা ও চৈতন্যের জন্ম, দেহের বিনাশেই এ সবের বিনাশ ঘটে। আর এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ক্ষিতি প্রভৃতির যে গুণ তাহারই ফলে ঘটে—ঈশ্বর বলিয়া কেহ ইহা করেন না। কল্পিত ঈশ্বর, আত্মা, মন প্রভৃতিতে—যাহার অস্তিত্বই নেই তাহাতে—বিশ্বাসী হওয়া মূর্খতা মাত্র। যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহারা দেহসুখ-সম্ভোগকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া জানেন। কাজেই শাস্ত্র, নীতি প্রভৃতিতে বিশ্বাসী না হইয়া (আধুনিক ভাষায় সংস্কারমুক্ত হইয়া) বেপরোয়া ভাবে ভোগ কর। শাস্ত্র প্রভৃতি যাঁহারা লিখিয়াছেন, লোক-ঠকানোই তাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহারা স্বার্থান্বেষী পিশাচতুল্য লোক—"ধূর্ত-ভণ্ড-নিশাচরাঃ"।

চার্বাকপন্থিগণ যাহা বলিয়াছেন, আধুনিক জড়বাদিগণের কাহারো বক্তব্য তাহার অধিক কিছুই নয়। একদা চার্বাকপন্থীরা এই মতই ভারতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু জীবনের উচ্চতর সত্যের অসংখ্য প্রত্যক্ষ-দর্শীর জন্মভূমি এই ভারতে, এই 'মহামানবের সাগরতীরে' তাহা দাঁড়াইতেই পারে নাই।

ভারতের জাতীয় সংস্কার

ভারতীয় সভ্যতা ও সমাজের নিয়ামকগণ নিজেদের প্রত্যক্ষ-করা সত্যের ভিত্তিতেই ভারতের সমাজজীবন পরিচালনা করার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, যাহাতে মানুষ যথার্থ উন্নতির পথে চলিতে পারে, তাহাদের মন ক্রমোন্নত হইতে পারে, উচ্চ উচ্চতর সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া, জীবনের গভীরতর রহস্যগুলি উদ্ঘাটন করিয়া পরম শান্তি, আনন্দ ও অমৃতত্ব লাভের দিকে অগ্রসর হইতে পারে।

সেই ব্যবস্থানুযায়ী ভারতীয় সমাজ হাজার হাজার বছর ধরিয়া নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজ আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক। ফলে, সমগ্র জাতিরই কতকগুলি শুভসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে—যুগ যুগ ধরিয়া শুভ চিন্তা ও সৎকর্ম আচরণের ফলে। বলা বাহুল্য, একটা কয়েক সহস্রবৎসরব্যাপী জীবন্ত সভ্যতার ইতিহাসে বহু স্বার্থান্বেষীরা বিভিন্ন সময়ে উহার সমাজ-ব্যবস্থায় স্বার্থসিদ্ধির জন্য বহু কুসংস্কারও ঢুকাইয়া দিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও আমাদের শুভসংস্কারগুলি আজিও জাগ্রত।

আজ আমরা অনেকেই জড়বাদভিত্তিক চিন্তায় প্রভাবান্বিত হইয়া অল্পকয়েকটি কুসংস্কারের সঙ্গে জাতির অজস্র শুভ সংস্কারকে ভাঙিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছি; ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজকে জড়বাদভিত্তিক করিতে চাহিতেছি। ভাবিতেছি ইহাই বুঝি প্রগতির লক্ষণ। কিন্তু আসলে ইহা পশ্চাদপসরণ ছাড়া আর কিছুই নহে। যুগ-যুগান্তের সদভ্যাসের ফলে জাতির যে শুভসংস্কারগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের, যথার্থ প্রগতির পথনির্দেশক, মানুষের জীবনকে তাহা অতি নিম্নস্তরের সত্যের, প্রাণিজগতের সাধারণ সত্যের স্তর হইতে উচ্চতর সত্যের স্তরে উন্নীত করে। যেমন ভগবদ্‌বিশ্বাস, যেমন পবিত্রতা, যেমন সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ ও সেবা। এ সংস্কারগুলি থাকিলে তাহা মানুষকে ক্রমে

উপরের দিকেই টানিয়া তোলে। মনকে শান্ত করার, একাগ্র করার, বলিষ্ঠ করার একটি উপায় হইল নিয়মিতভাবে উহার জন্য অভ্যাস করা। সকাল-সন্ধ্যায় ভগবচ্চিন্তা ইহার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। একাগ্রতার সাধনা এবং কায়-মনোবাক্যে পবিত্রতা-পালনের চেষ্টায় যে মনের বল, আত্মবিশ্বাস বাড়িয়া যায়, দেহমনে একটা প্রশান্তি আসে, বলিষ্ঠ উন্নততর ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়, তাহা আমরা অল্প কয়েকদিনের প্রচেষ্টায় নিজেরাই প্রত্যক্ষ করিতে পারি। ইহা সত্য কিনা কিছুদিন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লইলেই আমাদের এ বিষয়ে সন্দেহের নিরসন হইবেই। আমাদের জাতির এই-জাতীয় যে-সব সংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা এমনিতে হয় নাই, বহু যুগের সাধনায় তাহা জাতীয় জীবনে স্বাভাবিক হইয়াছে। পরিবেশ অনুকূল হইলে এগুলি ক্রমবর্ধিত হয়; বিপরীত অভ্যাসের ফলে এই স্বাভাবিক শুভ সংস্কারগুলি স্তিমিত হইয়া অশুভ সংস্কার প্রবল হয়। অবশ্য আমরা চেষ্টা করিয়াও ভারতের এই শুভসংস্কারকে বিনষ্ট কখনোই করিতে পারিব না, সাময়িকভাবে উহা স্তিমিত হইবে মাত্র এবং আমাদের প্রচেষ্টার ফল এইটুকু হইবে যে আমাদের আরো কিছুদিন বেশী দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে।

এই সংস্কারের রক্ষণই মানব সভ্যতাকে বাঁচাইতে পারে

আজ শিক্ষা, পরিবেশ প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষের চিন্তাকে জড়বাদের স্তরে নামাইয়া রাখিবার, মানুষের অস্তিত্ব যে দেহসীমিত, দেহাতীত তাহার কোন অস্তিত্ব নাই, ইহা মনে গভীরভাবে আঁকিয়া দিবার স্বেচ্ছাকৃত প্রয়াসও বহু স্থানে হইতেছে। কিন্তু শুভ সংস্কারগুলি গড়িয়া তোলার বা যাহাদের মধ্যে উহা আছে তাহা রক্ষা করিবার প্রয়াস ছাড়া মানবজাতি কিছুতেই যথার্থ উন্নতির লক্ষ্যাভিমুখী হইতেই পারে না। আমরা যেন না ভুলি, আমাদের প্রতিদিনের চিন্তা ও কর্মই অভ্যাসে ও ক্রমে সংস্কারে পরিণত হয়। ছেলেবেলা হইতে পৃথিবীর সর্বত্র যদি সকলকে চিন্তায় ও কর্মে চার্বাকবাদ শেখানো যায় তাহা হইলে উহা ক্রমে মানবজাতির সংস্কারেই পরিণত হইবে, যেটুকু শুভসংস্কার এখনো আছে, তাহাও ক্রমে লোপ পাইবে। তখন মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীতে বুদ্ধির স্তরে বিপুল পার্থক্য থাকিলেও মানসিক স্তরে পার্থক্য বিশেষ কিছুই থাকিবে না—এতকালের পরিশ্রমে মানুষ যতদূর আগাইয়া আসিয়াছে, তাহা সবই নষ্ট হইয়া যাইবে।

অবশ্য তাহা হইবার নহে। সর্বদেশেই কিছু কিছু করিয়া, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে বিপুল-সংখ্যক মানুষের মনে শুভসংস্কার এত বেশী যে উহা মজ্জাগত, উহাকে সাময়িকভাবে কিছু দমিত হয়ত করা সম্ভব, উহার বিলোপসাধন কখনই সম্ভব নহে। আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি বিষয়ে অগণিত সত্যদ্রষ্টার প্রত্যক্ষের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বসাধারণের এই শুভ সংস্কারই ভারতের বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য হারানো মানেই ভারতের মৃত্যু এবং সেই সঙ্গে সমগ্র মানব-জাতিরও; কারণ তাহাকে পথ দেখাইবার আর কেহই থাকিবে না।

বর্তমান জগতের দিকে তাকাইলে দেখা যায়, আজ প্রায় সর্বত্রই জড়বাদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া চলিয়াছে।

ভারতেও আমরা কেহ কেহ ইহার বিস্তারে সহায়তা করিতেছি। মানুষের ভোগ-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার বৌদ্ধিক সমর্থন জড়বাদের মত আর কেহই দেয় না; তাই যুবমনকে ইহা সহজে আকৃষ্ট করে। প্রবৃত্তির তাড়না সমস্ত প্রাণি-

জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। ভালমন্দ-বিচার, বিবেক একমাত্র মানুষেরই সম্পদ। ইহাকে বিদায় দেওয়া অতি সহজ, বিশেষ করিয়া বৌদ্ধিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমর্থন যদি পাওয়া যায়; কিন্তু গড়া কঠিন। কারণ প্রথমটি নামিবার ঢালু পথ, দ্বিতীয়টি ওঠার।

যুগসমস্যার সমাধান ভারতকেই করিতে হইবে

আজ মানুষের কাছে অতি বড় একটি সমস্যা আসিয়াছে। সাম্যবাদ জগতের সর্বত্র আসিবেই, আজ বা দুদিন পরে। ভোগ-সাম্য ও অধিকার-সাম্য আজ বা কাল পৃথিবীর সব মানুষই চাহিবে। যাহারা যুগ যুগ ধরিয়া নিষ্পেষিত হইয়া আসিতেছে, ভোগ ও বহুবিধ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে, তাহারা আজ জাগিয়াছে। এতদিন যে জাগিতে পারে নাই, স্বামীজী বলিয়াছেন, তাহার একমাত্র কারণ তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে নাই। আজ পৃথিবীর সর্বত্রই এই সঙ্ঘবদ্ধতা আসিয়াছে বা আসিতেছে।

সাম্যবাদ সর্বত্র আসিবেই—কিন্তু বর্তমানে তাহা যে আকারে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে সে ইহার উপযোগী অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক সংগঠনের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় ভাবিয়া মানুষের শুভ সংস্কারগুলিকেও চূর্ণ করিয়া চলিতেছে। এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাসের সংশোধন প্রয়োজন; তাহা না হইলে উহা মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের উপযোগী হইবে না। মানুষের ভোগ- ও অধিকার-সাম্যের জন্য অর্থ-নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কাঠামোয় একটি মূর্তি আজ গড়িয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু উহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা এখনো হয় নাই, উহা এখনো যন্ত্রচালিত প্রাণহীন প্রতিমার মতো। উহার সহিত ঈশ্বরবিশ্বাস, পবিত্রতা বা সংযম, মানুষের উচ্চতর অস্তিত্বকে প্রত্যক্ষ করার প্রচেষ্টা প্রভৃতি শুভ সংস্কারগুলির গঠন, রক্ষণ ও বর্ধনের ব্যবস্থা বা যথার্থ ধর্ম সংযুক্ত হইলেই উহা প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে। সাম্যের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করিতেও সহায়ক হইবে এই শুভসংস্কার-। ডেমোক্র্যাসি, সমাজবাদ প্রভৃতির ভিতরকার যথার্থ কল্যাণকর ভাবগুলি লইয়া শুভসংস্কারগুলির বা ধর্মের ভিত্তির উপর একটি প্রাণবন্ত প্রতিমা গড়িয়া তুলিতে পারে একমাত্র ভারতবর্ষ—বহু যুগের বহু রাজনীতির ও বিপরীত আদর্শের ঝঞ্ঝায় যাহার শুভসংস্কার বিলুপ্ত কখনো হয় নাই; এবং তাহাই হইবে নবযুগের আদর্শ মতবাদ।

সংস্কারমুক্ত হইবার নাম করিয়া ভারতীয় জাতির শুভ সংস্কারগুলি হইতেও মুক্ত হইবার সময় একথা যেন ভালভাবে আমরা চিন্তা করিয়া দেখি, কেবল কতকগুলি অগভীর যুক্তির ধোঁয়ায় আচ্ছন্নদৃষ্টি বা আপাতমনোরম কোন প্রলোভনের মোহে গ্রস্ত হইয়া অগ্রসর না হই।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র*

[১]

মঠ,

পোঃ—বেলুড়

জেলা—হাওড়া

৪. ৬. ৯৮

প্রিয় লালজী,

তোমার পোস্টকার্ড যথাসময়ে পাইয়াছি। জানিয়া খুবই সুখী হইলাম যে, তুমি ও তোমার পরিবারস্থ সকলে বেশ ভালই আছ। আশা করি তুমি যে পবিত্র সাধুসঙ্গ লাভ করিয়াছ তাহা বেশ উপভোগ করিতেছ। তুমি স্বামীজীদিগকে তোমার স্বভাবসুলভ শ্রদ্ধার সহিত যেরূপ অক্লান্ত সেবা-যত্ন করিতেছ সে সম্বন্ধে আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে প্রায়ই সংবাদ পাইয়া থাকি।

খুব সম্ভবতঃ মিস নোবল এত দিনে বক্তৃতা দিয়াছেন, শ্রোতারা তাঁহার বক্তৃতা কিরূপ পছন্দ করিল তাহা জানিতে চাই। তোমার নিকট হইতে তাঁহার বক্তৃতা সম্বন্ধে একটা বিবরণ পাইলে খুবই খুশী হইব। গত এক পক্ষের মধ্যেই দুইবার সাইক্লোন (প্রচণ্ড ঝড়) হইয়া গেল, শেষবারের ঝড় অল্প সময় মাত্র স্থায়ী হইলেও উহাতে মঠের অনেক গাছ হাওয়ার বেগে ধরাশায়ী হইয়াছিল। প্রথমবারের ঝড় অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিয়াছিল এবং উহাতে অনেক ক্ষতিও হইয়াছিল ; গঙ্গায় অনেক নৌকাডুবি হওয়ায় বহুলোকের প্রাণহানি হইয়াছিল।

সহরে প্লেগের ভীতি এখনও রহিয়াছে। আমাদের এক ডাক্তার বন্ধু প্লেগহাসপাতালে দেখিতে গিয়াছিলেন কলিকাতার প্লেগ আসল প্লেগ কি না। তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই প্লেগের লক্ষণের সঙ্গে আসল প্লেগের মিল আছে।

ভগবান না করুন, এখন আশঙ্কা হয় এই বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে চারিদিকে উহা ছড়াইয়া পড়িতে পারে।

তোমরা সকলে ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমাদের

ব্রহ্মানন্দ

---

* ইংরেজী হইতে অনূদিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথা*

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ বাংলার নব যুগের ভাববিগ্রহ, ভাগবত-পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিন। এ নাম আজিকার দিনে বহু মানুষের ইষ্টনাম। তাঁরা প্রতিদিন তাঁদের পূজার আসন থেকে এই নাম স্মরণ করে প্রণাম নিবেদন করেন, আজও করেছেন। সেই সমস্ত মানুষের প্রণামের সঙ্গে আমার প্রণাম যুক্ত করি। তিনি আমাদের পথ প্রদর্শন করুন, আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

বিশ্ববিধাতার এই অতি বিশাল, অপরিমেয় সৃষ্টিশালায় আর কোথায় কোথায় প্রাণলীলার আশ্চর্য মহিমা ও বৈচিত্র্য প্রকটিত তা আজিও মানব-জ্ঞানের অজ্ঞাত। কিন্তু আমাদের চোখের সম্মুখেই এই মর্তলোকে প্রাণলীলার আধুনিকতম পর্যায়ে যে নরলীলা প্রকটিত, তার দিকে তাকিয়ে বা তাকে রচনা করে বিশ্ববিধাতা, মনে হয়, এক আশ্চর্য আনন্দ-লীলারস উপভোগ করেন। আর তার সঙ্গে নরদেহধারী আমরাও এই সৃষ্টির সঙ্গে তার স্রষ্টাকে যুক্ত করে যে এক আশ্চর্য আনন্দ-রস উপলব্ধি করি মনুষ্য-উপলব্ধির মধ্যে তা বোধহয় তুলনা-রহিত।

এই মর্তলোকে অচ্ছিন্ন নরলীলার ধারায় পৃথিবীর এক এক প্রান্তে মানব-ইতিহাস যেন এক একটি বিশেষ মূর্তি পরিগ্রহ করবার বাসনায় ব্যাকুল। পাশ্চাত্য দেশে ইউরোপ ও আমেরিকা ভূখণ্ডে মানবশক্তি বস্তুবিজ্ঞানকে আশ্রয় করে নিজেকে একটি বিশেষ স্বরূপে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর ইতিহাস তিন-চার শো বৎসরের অধিক নয়। আবার অন্যদিকে রাশিয়া ও চীনে গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে ইতিহাসের আর এক আশ্চর্য পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। লৌকিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে সকল মনুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার পরীক্ষা। এই পরীক্ষা সার্থক হলে মানব-ইতিহাসে আরও একটি আশ্চর্য সার্থক অধ্যায় সংযোজিত হবে তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু পর্বত-সমুদ্রবেষ্টিত আমাদের জন্মভূমি এই ভারতবর্ষে ইতিহাস-পুরুষের অভিপ্রায়টি যেন ভিন্নরূপ এবং আরও স্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করি। মানব-সভ্যতা তার সার্থক অভিব্যক্তির ব্রাহ্মমুহূর্তে পৃথিবীর যে যে অংশে অভিব্যক্ত হয়েছিল আমাদের মাতৃভূমি তার অন্যতম। অন্য সমস্ত অংশেই সভ্যতার প্রদীপ্ত উদিত সূর্য কবে অস্তমিত হয়ে গিয়েছে। সেই সব ভূখণ্ডে মানুষ যেমন সেদিনও ছিল, আজও তেমনি আছে; কিন্তু তারা সভ্যতার সেই দীপ্তির উত্তরাধিকারী নয়, সে সভ্যতার সঙ্গে তাদের কোন যোগ নেই, তারা মাত্র সেই দেশের অন্যকালের অধিবাসী। তার অতিরিক্ত কিছু নয়। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমি এই ভারতবর্ষে বেশ কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে যে সভ্যতার সূর্যোদয় হয়েছিল আজও তার দিনান্ত হয়নি। সেই সূর্যোদয়ই একটি দিনের যামে যামে অগ্রগতির মত পর্যায়ে পর্যায়ে অবিচ্ছিন্নরূপে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। হয়তো পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে যে সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছিল আমরা তারই উত্তরাধিকারী। ইতিহাসের যে অভিপ্রায়টি বহুদিন পূর্বে আত্মপ্রকাশ করতে

* বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি উৎসব সভায় (১৮।২।৬৯) প্রদত্ত ভাষণ।

চেয়েছিল সেই অভিপ্রায়টি অচ্ছিন্নরূপে আমাদের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের পথ আজও খুঁজে চলেছে। ইতিহাসের পক্ষে একে এক বিস্ময় বলেই মনে করি।

ইতিহাসের সেই অভিপ্রায়টির স্বরূপটি কি? পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে ইতিহাস যে স্বরূপে প্রকাশিত হচ্ছে বা হতে চাচ্ছে তার থেকে সে স্বরূপটি অন্তরে বাহিরে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। ইউরোপ যেখানে বস্তুবিজ্ঞান-চর্চার মাধ্যমে বস্তুকণাকে বিভাজন করে আশ্চর্য এক শক্তিকে আবিষ্কার করে তাকে করায়ত্ত করেছে, ভারতবর্ষে সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে মানব-মন ও চৈতন্যকে নিয়ে, আরম্ভ হয়েছে সেই তার সভ্যতাবিকাশের আদি মুহূর্ত থেকে। এরই প্রমাণ মিলবে আমাদের লৌকিক জীবনের দিকে তাকালে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমরা বিদেশে অভিযান করিনি, বহির্ভারতের কোন দেশ জয় করিনি, কদাচিৎ বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছি, বিদেশে বাণিজ্য করে মণিমাণিক্য বা অর্থসম্পদ নিজের দেশে বহন করে আনবার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠিনি। হিমালয় থেকে কন্যা-কুমারিকা এবং সৌরাষ্ট্র থেকে মণিপুর পর্যন্ত অঞ্চলে আমাদের জীবন কাল থেকে কালান্তরে বড় নিস্তরঙ্গ, বড় মন্থর, বড় ঘটনাহীন। হয়তো এরই মধ্যে কোন রাজা বা ভূস্বামী পার্শ্ববর্তী কোন রাজ্যের রাজা বা ভূস্বামীর সঙ্গে সাময়িকভাবে কিছু কলহ বা কিছু সংগ্রাম বা কিছু রক্তপাত করেছেন এই মাত্র। আমাদের জন-সমাজের বৃহৎ ব্যাপক যে জীবন তা বরাবরই সমান নিরুত্তাপ ও নিস্তরঙ্গ ছিল। তবে আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে বিদেশী অভিযানকারীর অত্যাচার ও অস্ত্রাঘাত সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, যারা একদা বিদেশ থেকে অভিযানকারী হয়ে অস্ত্রহাতে এই ভূমিখণ্ডে এসেছিল, তারাই পরবর্তীকালে এই মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যে অস্ত্র পরিত্যাগ করে প্রতিবেশী হয়ে বসবাস আরম্ভ করেছে। এমনটি একবারই ঘটেনি, বারবারই ঘটেছে। এই রাজবৃত্তের অন্তরালে, আমাদের প্রতিদিনের জীবন থেকে, জীবনের সত্যকে জানবার ও উদ্‌ঘাটনের আকুল তৃষ্ণায় তাপিত হয়ে, নচিকেতার মত, বহু মানুষ লৌকিক সংসারের সুখ ও সঙ্গ পরিত্যাগ করে গৃহস্থ জীবনের সমান্তরালে, লোকচক্ষুর অগোচরে প্রবাহিত সন্ন্যাস-জীবনে গিয়ে প্রবেশ করেছেন। রাজপুত্র গৌতম, মহাবীর এমনি ধারার পুণ্য নাম। সেই চির-প্রবাহিত প্রবাহে আজও ছেদ পড়েনি।

মানুষ থেকে, জনসমাজ থেকে দূরে গিয়ে তাঁরা জীবনের সত্য ও অর্থকে উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন। এই কাজে কেউ স্রষ্টা ঈশ্বরকে তাঁদের ধ্যান-ধারণার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করছেন, কেউ করেননি। এই প্রচেষ্টায় কত পরীক্ষা, কত নিরীক্ষা! কত বিচিত্র পথ, কত বিচিত্র মত! এরই ফলে কেউ নিরীশ্বরবাদী, কেউ ঈশ্বরবাদী; কেউ সাকারবাদী, কেউ নিরাকারবাদী ব্রহ্মবাদী; কেউ বৈষ্ণব, কেউ শাক্ত, কেউ শৈব, কেউ সৌর-উপাসক; কেউ তান্ত্রিক, কেউ বীরাচারী, কেউ বামাচারী। কেউ ঈশ্বরকে ভজনা করেছেন প্রিয়রূপে, কেউ সখারূপে, কেউ পিতারূপে, কেউ প্রভুরূপে, কেউ বা জননীরূপে। এই সাধকরা অনেকেই সত্যসন্ধান করতে গিয়ে সমুদ্রের জলে নুনের পুতুলের মত গলে হারিয়ে গিয়ে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হয়েছেন। কেউ বা সেই আশ্চর্যকে জেনে সেই অমৃতময় আস্বাদকে মরণশীল, পীড়িত মানুষের জন্য মানবসমাজে বহন করে এনেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই চলমান জ্যোতিষ্ক-সমাজের অন্যতম প্রধান উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তবে তাঁর ক্ষেত্রে যেন এই লীলাটি একটু পৃথক ও বিচিত্র ভঙ্গীর। অবশ্য সব মহৎ সাধকের সাধনার ধারাটি সশ্রদ্ধ অনুরাগের সঙ্গে চর্চা করলে তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যকে অনুধাবন করা সম্ভব হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে তার বিশেষত্ব নিবেদন করি। তার পূর্বে একটি সর্বজনবিদিত বিষয় পুনরুক্তি করছি। বঙ্গদেশে ঈশ্বর কালিকা-মূর্তিতে প্রকটিত; সর্ব ভারতীয় ধরনের বিভিন্ন সাধনা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের মত বাংলাদেশে প্রচলিত থাকলেও, বাংলাদেশে ঈশ্বরকে মাতৃমূর্তিতে সাধনাটিই বিশেষ স্ফূর্তি-লাভ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণও ঈশ্বরকে প্রধানত মাতৃভাবেই আরাধনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে মনে হয় ভক্ত যেমন ভগবানের জন্য আকুল হন, ভগবানও ভক্তের সঙ্গলাভের ও সাধনার জন্য তেমনি আকুলভাবে যেন অপেক্ষা করছিলেন। আজ যেখানে দাঁড়িয়ে এই সুমহান সাধক ও ঈশ্বরভক্তকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, সেখান থেকে পুণ্যতোয়া গঙ্গাধারার উজানে, কিছু উত্তরে, গঙ্গার অপরতীরে ঈশ্বররূপিণী জননী শ্রীশ্রীভবতারিণী যেন ভক্ত সন্তানের জন্য খেলার আঙিনা পেতে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন পরম আগ্রহে। সেই আগ্রহ পরিপূরণের জন্যই যেন শ্রীরামকৃষ্ণ একদা গিয়ে দক্ষিণেশ্বরের অঙ্গনে সন্তানের মূর্তিতে আবির্ভূত হন। ভক্ত-ভগবানের আশ্চর্য প্রেমের লীলা আরম্ভ হল।

ঈশ্বর ও ভক্তের ব্যক্তিগত সাধনার কথাটি মাত্র উল্লেখ করেই এখানে বলতে পারি দেশের বৃহত্তর প্রয়োজনে এই আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ, লৌকিক সংজ্ঞায় যাকে পণ্ডিত বলে তা তিনি ছিলেন না, ধনীও ছিলেন না, কিন্তু তাঁকেই সেদিন জাতির প্রয়োজন ছিল। সেই দিক থেকে এ আবির্ভাব ঐতিহাসিক পূর্বেই উল্লেখ করেছি—আমাদের সংস্কৃতি ও সাধনার ইতিহাস শান্ত, উচ্ছ্বাসহীন, এবং অনেক পরিমাণ অন্তঃস্রোতচারী এবং সর্বোপরি তা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে প্রবাহিত। এই অবিচ্ছিন্ন স্রোতধারায় মধ্যে মধ্যে মন্থরতা আসে, কালের করস্পর্শে তার বেগই শুধু মন্দীভূত হয় না, তাতে সহস্র ভয়ার্ত ও ক্ষুদ্রচিত্তের আবিলতা ও আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়। জীবনজলে বিষ-জর্জরতা অনুভব করি। তখনই যেন কোন ঐশ্বরিক প্রসাদে অথবা এই ভূমিখণ্ডে ইতিহাসের বিশিষ্ট প্রয়োজনে এক বা একাধিক পুরুষ আবির্ভূত হয়ে তাঁদের সাধন-মহিমার শক্তিতে সেই পুঞ্জীভূত আবর্জনা ও আবিলতাকে দূর ও পরিষ্কার করে তাকে কালোচিত মূর্তি দান করে যান। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সামান্য কিছুদূর উজানে গেলেই তার বহু উদাহরণ দৃষ্টিতে আসবে। মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বে আর একজন তেজস্বী পুরুষ এই বাংলাদেশেই ভাগীরথীর ধারার আরও খানিকটা উত্তরে নবদ্বীপধামে আবির্ভূত হয়ে হরিচরণস্রুত নামের পুণ্য ধারায় বাঙালীর জীবনের আবর্জনা একবার পরিষ্কার করে দিয়ে হরিনামের পাদপীঠ রচনা করে গিয়েছিলেন। তার সঞ্জীবনীতে বাঙালী জাতি তখনকার মত বেঁচে গিয়েছিল। শুধু বাঁচা নয়—নতুন করে সঞ্জীবিত হয়েছিল। আজও তার রেশ অনুভব করি।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবার একবার এমনি আবির্ভাবের যেন প্রয়োজন ঘটেছিল। তার কিছুকাল পূর্বে দেশের পুরাতন রাজশক্তি বিধ্বস্ত ও ধ্বংস হয়েছে; তার স্থলে আবির্ভূত হয়েছে সমুদ্রপার থেকে

আগত নবীন এক আগন্তুক রাজশক্তি। তার হাতে শুধু কঠিন শাসনদণ্ডই ছিল না, তার সে শাসনযন্ত্র ছিল সুশৃঙ্খল। সেই সঙ্গে সে সমুদ্রপার থেকে নিয়ে এসেছিল পাশ্চাত্য বস্তুতন্ত্রবাদ ও এক অভিনব দর্শন। তার সম্মুখে আমাদের প্রাচীন সংস্কার, ধ্যান-ধারণা, সবই প্রবল আঘাত খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে চলেছে। আমাদের ধ্যান-ধারণা সেদিন এক দিকে সংস্কারের অন্ধকারে আবৃত, সমাজদেহ জীর্ণ। অন্য দিকে নবীন বিদেশী সংস্কৃতির জয়ধ্বজা আমাদেরই এক অংশ সগৌরবে, মূঢ়তার সঙ্গে বহন করে চলেছি। আমাদের অপরাংশ মূক, পঙ্গু; সমস্ত বিশ্বাস সংশয়ে বিমূঢ়। সেই মুহূর্তে ইতিহাসের অমোঘ অভিপ্রায়ে সর্বগ্রন্থি-মোচনকারী, সর্বসংশয়-ছেদনকারী উপলব্ধি নিয়ে আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। একদিকে যেমন রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র এক নবধর্মের প্রবর্তন করলেন, অন্যদিকে আমাদের সনাতন ধ্যান-ধারণা ও উপলব্ধির অঙ্গ থেকে সঞ্চিত মালিন্য ও আবর্জনাকে বিদূরিত করে তাকে কালোচিত নবীন এক অম্লান মূর্তিতে তিনি স্থাপন করলেন। ভারতের সনাতন উপলব্ধি দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-প্রাঙ্গণে জননী শ্রীশ্রীভবতারিণীর শ্রীপদপ্রান্তে পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে বাণীমূর্তি লাভ করল। পরবর্তীকালে এরই কর্মকাণ্ড রচিত হল তাঁর প্রিয়তম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের হাতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে বাণী প্রচার করেছেন তা ভারতের শুধু কেন, তা মনুষ্যসভ্যতার নির্মলতম ও সরলতম বাণী। তাই এক দিকে সে তাঁরই জীবনের বাণী। তিনি নিজে তাঁর কোন বাণী লিপিবদ্ধ করেননি, করার প্রয়োজনও বোধ করেননি। গঙ্গোত্রীর উৎস-মুখ কি গঙ্গাধারার অঞ্জলিকে কমণ্ডলুতে ধারণ করে রাখার প্রয়োজন বোধ করে? তিনিও করেননি। তবে আমাদের মহাসৌভাগ্য, তাঁরই এক ভক্ত আমাদের জন্য তার কিছু কিছু গ্রন্থাকারে গ্রন্থন করে গিয়েছেন। আমি বিশ্বাস করি, শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' কয়েকখণ্ড 'চৈতন্যচরিতামৃতের' মতই আমাদের কাছে মহা শ্লাঘার সামগ্রী এবং আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে মহামূল্য সংযোজন। যাঁরা এই মহাগ্রন্থ পাঠ করেছেন, তাঁরা জানেন—এই গ্রন্থগুলির মধ্যে যে অত্যন্ত কঠিন, জটিল ও গূঢ় উপলব্ধির কথা রয়েছে তা কতখানি শিশুপাঠ্য, কত সরল, কত সহজ ও কত কাব্যময়! পড়ামাত্র অনুভব হয় যে, যিনি এই বাণী উচ্চারণ করে গিয়েছেন তাঁর উপলব্ধি কত ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী, তা কত সরল ও সহজ! এগুলি যিশুর বাণীর সমতুল্য বলে মনে করলে অন্যায় হবে না। এবং আমি বিশ্বাস করি আমাদের হৃদয় শুকিয়ে গেলে এই বাণীর ভৃঙ্গারের কাছে সশ্রদ্ধ অঞ্জলি পাতলে এক মুহূর্তে সকলসংশয়-নিরসনকারী অমৃতধারা পেতে বিলম্ব হবে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ভক্ত গ্রন্থ-কর্তা শ্রীমকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বসংশয়-মোচনকারী, সর্বগ্রন্থি-ছেদনকারী অমৃতবাণী আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনার কল্যাণে সনাতনকে নবীন, নির্মল মূর্তিতে আবিষ্কার করে আমাদের সম্মুখে স্থাপন করে গিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে সমাজদেহের বহু গ্লানি বিদূরিত হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণই আমাদিকে স্বামী বিবেকানন্দকে আশীর্বাদস্বরূপ দান করে গিয়েছেন—এ সবই সত্য, অতি সত্য। তার জন্য তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই। কিন্তু এহ বাহ্য। তিনি আমাদের মনে যে

প্রেমের আসনে আজও অসীন তা কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা থেকে পৃথক।

ব্যক্তিহিসাবে তাঁর মূর্তি কল্পনা করতে গেলেই তাঁকে এক অতি সাধারণ, কিন্তু এক আশ্চর্য মূর্তিতে দেখতে পাই। সেখানে তিনি এবং শ্রীশ্রীভবতারিণী অচ্ছেদ্য এবং অভিন্ন। সে এক আশ্চর্য ভালবাসার লীলা! সেই লীলায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, রাজ-রাজেশ্বর, জননী শ্রীশ্রীভবতারিণীর মূর্তিতে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তাঁর হাতের দেওয়া খাদ্য গ্রহণ করে নিজে তৃপ্ত হয়েছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ-বিগ্রহের আধারে যে সন্তানরূপী শিশু অনন্তকাল মায়ের জন্য ব্যাকুল হস্ত সম্প্রসারিত করেছে তাকে কৃতকৃতার্থ করেছেন। কল্পনা করি—সকল মানবদৃষ্টির অন্তরালে তিনি মাকে অনুরোধ করেছেন—যশোদা নাচাত তোরে বলে নীলমণি, একবার তেমনি করে নাচ দেখি মা! মা সন্তানের সে অনুরোধ শিরোধার্য করে কন্যারূপে নেচেও হয়তো পরম প্রীতিলাভ করেছেন।

বিবেকানন্দ

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

জীবন আসিয়াছিল সীমাবদ্ধ লোকে দিকে দিকে ফেলিয়া চরণ।
ক্লান্তসিংহসম দেহ'পরে পরম সুষুপ্তি দিল টানি আবরণ।
স্থূলদেহ হয়ে গেল অন্তর্হিত! ওকি মৃত্যু? ওকি মৃত্যুময়!
কালের মুহূর্তে ধরা জীবনের পঞ্চপাত্রে অমর বিজয়! আর অগাধ বিস্ময়!

*　　*　　*

কণ্ঠের গভীর ধ্বনি ফিরাইয়া নিল সহসা আকাশে
সে ধ্বনি ভরিয়া রবে পৃথিবীর কানে চিরকাল!
চল্লিশ-অনতিক্রান্ত ক্লান্ত জীবনের পবিত্র নিঃশ্বাস
মিশিয়া বায়ুতে রবে চিরদিন আকাশপাতাল।
যে দীপ জ্বালিয়াছিলে জানি কখনোই তাহা হইবে না ক্ষীণ
জ্বালা রবে লোকে লোকে গ্রহে গ্রহে আকাশে তারার।
পদচিহ্ন'পর তব ফুটিয়া উঠিবে ফুল জানি চিরদিন
বিশ্বভরা দেশে দেশে যাত্রাপথ ভরিয়া তোমার।

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সাময়িক পত্র

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

এক

ব্রহ্মবাদিন ও আলাসিঙ্গা পেরুমল

॥ ১ ॥

স্বামীজীর বহুমুখী চিন্তা ও কর্মের আলোচনা অল্পবিস্তর হলেও একটি বিষয়ে আমরা যতদূর দেখেছি স্বতন্ত্র মূল্য দিয়ে আলোচনা হয়নি, তা হল, সাময়িক পত্রের প্রবর্তক বিবেকানন্দ। অথচ সাময়িক পত্র পরিচালনার ব্যাপারটি স্বামীজীর মনের বেশ কিছু অংশ অধিকার করেছিল,—তাঁর কর্ম-প্রচেষ্টার অন্যতম ক্ষেত্র তাঁর পত্রিকাগুলি।

স্বামীজী, এক কথায় বলতে গেলে, ভারতবর্ষে তিনটি সাময়িক পত্রের প্রবর্তক, এবং তাঁর জীবনকালের মধ্যেই কয়েক বৎসরের পরিধিতে পত্রিকাগুলি বিপুল প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। এ ছাড়া ভারতবর্ষের বাইরেও ক্ষুদ্র প্যামফ্লেট জাতীয় পত্রিকা বার করার চেষ্টা করেন তাঁর ভাবানুরাগীরা; ইংলণ্ড বা আমেরিকায় তা প্রকাশিত হয়ও, যদিও পত্রিকাগুলির আয়ু দীর্ঘ হয়নি। পরে অবশ্য পাশ্চাত্যখণ্ডে বেদান্ত-প্রচারক উৎকৃষ্ট পত্রিকার আবির্ভাব হয়েছে, যার মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত 'Vedanta and the West',—স্বামী প্রভবানন্দের নেতৃত্বে ক্যালিফোর্নিয়ার বেদান্ত আশ্রম থেকে এই দ্বৈমাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়, এবং ক্রিস্টোফার ইশারউড প্রমুখ বিখ্যাত সাহিত্যিকেরা এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। এই সঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে—ঠিক বর্তমান মুহূর্তে রামকৃষ্ণ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত পত্রিকার সংখ্যা অল্প নয়, এবং ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা যথেষ্ট।[১]

পত্রিকা-প্রকাশ সম্বন্ধে স্বামীজীর ইচ্ছার সূত্রপাত ঠিক কোন্ সময়ে, তার যথার্থ ইতিহাস পাওয়া সম্ভব নয়, তবে সহজেই বোঝা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী প্রচারের সঙ্কল্প যখন তিনি গ্রহণ করলেন, তখন থেকেই প্রচার-বাহন পত্রিকার কথা নিশ্চয় তাঁর কল্পনায় উদিত হয়েছিল। ভারতে নবোদ্ভূত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মত-প্রচারে পত্রিকার বড় ভূমিকা তিনি বাল্যকাল থেকেই দেখেছেন; আবার ঐসব পত্রিকার শূন্যগর্ভতার রূপও তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। তিনি দেখেছিলেন, পাশ্চাত্য-

১ কয়েকটি পত্রিকার নাম—

'প্রবুদ্ধ ভারত,' 'উদ্বোধন,' 'বেদান্তকেশরী,' 'প্রবুদ্ধ কেরলম্,' 'জীবনবিকাশ,' 'বিশ্ববাণী,' 'শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়ম্,' 'বেদান্ত মান্থলি বুলেটিন,' 'বেদান্ত দর্পণ', 'বেদান্ত অ্যাণ্ড দি ওয়েস্ট,' 'বেদান্ত ফর দি ইস্ট অ্যাণ্ড দি ওয়েস্ট,' 'দি মেসেজ অব দি ইস্ট', 'বিবেক জ্যোতি' প্রভৃতি।

বন্ধ হয়ে গেছে—'ব্রহ্মবাদিন,' 'দি মর্ণিং স্টার,' 'সমন্বয়,' 'বেদান্ত প্যাসিফিক,' 'ভয়েস অব ফ্রিডম।'

এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়। জাপানী ভাষাতেও পত্রিকা দেখেছি। ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষাসমূহ বাদ দিয়ে অন্য ভাষাতেও ক্ষুদ্র পত্রিকা থাকতে পারে বা ছিল, কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে এমন হতে পারে।

*"ভারতীয় পটভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দ: (১৮৯৩—১৯০২)" নামক গ্রন্থের একটি অধ্যায়।

পন্থায় শিক্ষিত কতকগুলি লোকের সাম্প্রদায়িক বা স্বার্থগত চীৎকার কিভাবে পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে পড়ছে, যার মধ্যে কাজের আহ্বান নেই, আছে শুধু কথার রাশি—জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন সেই পত্রিকাগুলি জনসাধারণের মতপ্রকাশের ভঙ্গি করে যাচ্ছে দিনের পর দিন। রামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দ এই প্রাণ-ও প্রাতভাহীন সংবাদপত্রের কোলাহলকে ঘৃণা করেছিলেন, কিন্তু আবার সেই সঙ্গে তিনি জানতেন, ভারতীয় সভ্যতার বিকৃত অথবা আংশিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে তার প্রাণদ সত্যকে তুলে ধরতে সত্যসন্ধ পত্রিকার দরকার কত-খানি। আমেরিকায় থাকাকালেই ভারতবর্ষের জন্য বেদান্ত আন্দোলনের সমর্থক পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা তাঁর কাছে বড় হয়ে ওঠে। স্বামীজী সংবাদপত্রের সংবর্ধনা যে-পরিমাণে পেয়েছিলেন, সেই পরিমাণেই সংবাদপত্রে তাঁর মত বা চরিত্রকে বিকৃত করার চেষ্টাও দেখে-ছিলেন। ভারতবর্ষের কতকগুলি কাগজ তাঁর মতের যথেষ্ট পাবলিশিটি দিয়েছিল, কিন্তু স্বামীজী জানতেন, সংবাদপত্রের এই সমর্থন ততক্ষণ, যতক্ষণ সংবাদপত্রের মনোমত তিনি, —কিন্তু মতপার্থক্য আসবেই; সে ক্ষেত্রে এই সকল পত্রপত্রিকার সমর্থন পেয়ে যেতে হলে স্বামীজীকে নিজের মতের স্বাধীনতা খর্ব করতে হবে। কোনো বিবেকানন্দের পক্ষে নিশ্চয় তা করা সম্ভব নয়! সুতরাং স্বামীজী স্থির করলেন, বেদান্ত আন্দোলনের মুখপত্র না হলে চলবে না।

পত্রিকা-প্রকাশে স্বামীজীর সক্রিয় ইচ্ছার সূত্রপাত পাশ্চাত্ত্যে হিন্দুধর্মের আচার্যরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করার পর থেকেই। তাঁর কীর্তি-কথা সংবাদপত্র-মারফত ভারতে পৌছে প্রবল আবেগের সৃষ্টি করেছিল, সেই ভাবাবেগকে নিছক বন্দনাগানের মধ্যে নিঃশেষিত হতে দেবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তাকে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করতে চাইলেন। সংঘস্থাপন এবং সংঘের মুখপত্র-প্রতিষ্ঠায় তাই আগ্রহী হলেন। এ-ব্যাপারে তাঁর মনে প্রথমেই সেই মানুষটির মুখ ভেসে উঠল, যিনি তাঁর আমেরিকা-গমনের নিমিত্ত হয়েছিলেন। আলাসিঙ্গা পেরুমল! ধন্য চরিত্র! রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ইতিহাসে অক্ষয় স্থানের অধিকারী এই মানুষটি বিবেকানন্দের বিদেশ-গমনের প্রধান উদ্যোক্তা এবং বিবেকানন্দ-আদিষ্ট প্রধান বেদান্ত-পত্রিকার পরিচালক-সম্পাদক। ভগিনী নিবেদিতা ভিন্ন স্বামীজীর কাজে এত বড় ভূমিকা স্বামীজীর আর কোনো শিষ্যের নেই, এবং সেই জন্যই নিবেদিতার কাছে "No one like him, Dear Alasinga!"[২]

আর একটি ব্যাপারে গোটা ভারতবর্ষের অপরিসীম ঋণ আলাসিঙ্গা পেরুমলের কাছে— তাঁকে সম্বোধন করেই স্বামীজীর অগ্নিময় পত্রের অধিকাংশ লিখিত, ভারতবর্ষ তার আত্মবোধ ও আত্মপ্রসারের মহাবাণী যে-পত্রগুলি থেকে সংগ্রহ করেছিল তার সংগ্রামের কালে।

পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা স্বামীজীর মতই আলাসিঙ্গাও অনুভব করেছিলেন। স্বামীজীর কাছে সম্ভবত তিনিই প্রথম পত্রিকা-প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্বামীজী সে ইচ্ছার যৌক্তিকতা স্বীকার করেও গোড়ায় মানব-সেবামূলক কর্মের অধিক মূল্যের কথা লিখে পাঠান। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মে চিকাগো থেকে আলাসিঙ্গাকে উদ্দীপনাময় এক চিঠিতে ঐ কথা লেখেন:

> "আমার কোন সাহায্যের আবশ্যকতা নাই। তোমরা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া

২ মিস্ ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার ৩১শে আগস্ট, ১৯০৪-এর চিঠি।

একটি ফণ্ড খুলিবার চেষ্টা কর। শহরের সর্বাপেক্ষা দরিদ্রগণের যেখানে বাস, সেখানে একটি মৃত্তিকানির্মিত কুটীর ও হল প্রস্তুত কর। গোটাকতক ম্যাজিক লণ্ঠন, কতকগুলি ম্যাপ, গ্লোব এবং কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি যোগাড় কর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে গরীব অনুন্নত, এমন কি, চণ্ডালগণকে পর্যন্ত জড়ো কর; তাহাদিগকে প্রথমে ধর্ম উপদেশ দাও, তারপর ঐ ম্যাজিক লণ্ঠন ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি চলিত ভাষায় শিক্ষা দাও। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত একদল যুবক গঠন কর। তোমাদের উৎসাহাগ্নি তাহাদের ভিতর জ্বালিয়া দাও। আর ক্রমশঃ এই সংঘ বাড়াইতে থাকো—উহার পরিধি বাড়িতে থাকুক। তোমরা যতটুকু পারো, কর। নদীতে যখন জল থাকিবে না, তখন পার হইব বলিয়া বসিয়া থাকিবে না। **পত্রিকা, সংবাদপত্র প্রভৃতির পরিচালন ভাল সন্দেহ নাই; কিন্তু চিরকাল চীৎকার ও কলমপেশা অপেক্ষা প্রকৃত কার্য—যতই সামান্য হউক, অনেক ভাল।** ভট্টাচার্যের গৃহে একটি সভা আহ্বান কর। কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া পূর্বে আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, সেইগুলি ক্রয় কর। একটি কুটীর ভাড়া লও এবং কাজে লাগিয়া যাও। **পত্রিকাদি গৌণ, ইহাই মুখ্য।** যে কোনরূপেই হউক, সাধারণ দরিদ্র লোকের মধ্যে আমাদের প্রভাব বিস্তার করিতেই হইবে। কার্যের সামান্য আরম্ভ দেখিয়া ভয় পাইও না, কাজ সামান্য হইতেই বড় হইয়া থাকে। সাহস অবলম্বন কর। নেতা হইতে যাইও না, সেবা কর।"

এই পত্রের রচনাভঙ্গি থেকে মনে হয়, আলাসিঙ্গা সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্র সম্বন্ধে কোনো অভিপ্রায় ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছেন। স্বামীজী সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেননি, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে সেবা ও শিক্ষা-বিস্তারের অধিক মূল্যের বিষয়ে অধিক জোর দিয়েছেন। কিন্তু এর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই দেখতে পাব, স্বামীজীই আলাসিঙ্গাকে পত্রিকা-প্রকাশের ব্যাপারে অনুরোধ জানাচ্ছেন, যা ক্রমে তাগিদে পরিণত হবে। স্বামীজীর মনোভাবের এই ঈষৎ দিক-পরিবর্তনের কারণ কি?

যতদূর মনে হয়, স্বামীজী আলাসিঙ্গা ও মাদ্রাজী ভক্তগণের প্রকৃতি ও সামর্থ্যসীমা সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই আর একবার চিন্তা করে নিয়েছিলেন। যে মানবসেবা ও দরিদ্রদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কথা তিনি ভাবছিলেন, সে কার্য সিদ্ধ করার উপযোগী মানুষ সম্ভবতঃ আলাসিঙ্গারা ছিলেন না। আলাসিঙ্গা ধর্ম-প্রচারে উৎসাহী। এ-ব্যাপারে তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করতে পারেন। আলোচনা-চক্র, প্রচার, জনসংযোগ, পত্রিকা ও পুস্তিকা-প্রকাশ—এ সকল তাঁর প্রিয় কার্য। স্বামীজী সে কথা বুঝে আলাসিঙ্গাকে তাঁর স্বধর্মেই শেষ-পর্যন্ত নিয়োগ করলেন। আমরা দেখতে পাব, আলাসিঙ্গা তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই 'স্বধর্মে' নিরত ছিলেন।

এ ছাড়া, শ্রীমতী লুই বার্কের গবেষণা অনুযায়ী বলা যায়,—১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে স্বামীজীর মনে বেদান্তকে বিশ্বধর্ম করে তোলার ইচ্ছা জাগে। মনে হয়, তদনুযায়ী ঐ বেদান্তের ভারতীয় প্রচার-পত্রিকার প্রয়োজন অনুভব করেন ও সে বিষয়ে আলাসিঙ্গাকে উৎসাহ দেন।

এইখানে পত্রিকা-বিষয়ক বর্ণনা কিছু সময়ের জন্য থামিয়ে আমরা আলাসিঙ্গার জীবনতথ্যের মধ্যে অল্পভাবে প্রবেশ করতে চাই। স্বামীজী কেন পত্রিকা-প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেছিলেন, তা এই জীবন-তথ্যের দ্বারা উদ্ঘাটিত হবে।

দুঃখের বিষয়, আলাসিঙ্গার জীবন সম্বন্ধে বেশী উপাদান পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য সংবাদ পাওয়া গেছে—(১) তাঁর দেহত্যাগের পরে 'ব্রহ্মবাদিনে' প্রকাশিত শোক-প্রবন্ধে; (২) 'দিনমণি' পত্রিকা থেকে (১৯৩৮ বার্ষিক সংখ্যা) 'বেদান্ত কেশরী'তে অনূদিত একটি রচনায় (বেদান্ত কেশরী, ডিসেম্বর, ১৯৪১); (৩) 'প্রবুদ্ধ ভারতে' ১৯৪৭, অগস্ট সংখ্যায় আলাসিঙ্গার নাতি এম জি শ্রীনিবাসন-এর প্রবন্ধ থেকে।

আলাসিঙ্গার শিক্ষা ও কর্মজীবন সম্বন্ধে তাঁর নাতি শ্রীনিবাসনের লেখা থেকে তথ্য সংকলন করে দিচ্ছি :

"মহীশূর রাজ্যের চিকমাগালুরে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আলাসিঙ্গার জন্ম। পিতা নরসিমাচার্য ধনী না হলেও সম্ভ্রান্ত। তাঁরা শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। মহীশূরের মাণ্ড্য গ্রামে তাঁদের আদি বাস। স্থানীয় এক মিউনিসি-প্যালিটিতে পিতা কেরাণী ছিলেন। পরে মাদ্রাজে চাকরি নেন। আলাসিঙ্গার শিক্ষা প্রথমে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজে, পরে মাদ্রাজ ক্রিশ্চান কলেজে। শেষোক্ত কলেজে তিনি সুপরিচিত শিক্ষাব্রতী ডাঃ উইলিয়ম মিলারের এক প্রিয় শ্রেষ্ঠ ছাত্র। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানে ডিগ্রি নেবার পরে আলাসিঙ্গা ল' কলেজে সামান্য কিছু সময়ের জন্য পড়েন। অনিবার্য কারণে আইন পড়া ছেড়ে দিয়ে তাঁকে অল্প বয়সেই চাকরির সন্ধান করতে হয়। প্রথমে কুম্ভকোনমের এক স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন; তা ছেড়ে দিয়ে ১৮৮৭ সালে চিদাম্বরমে পচিআপ্পা স্কুলে বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। এমনই যোগ্যতার পরিচয় দেন যে, তিন বছরের মধ্যে মাদ্রাজে পচিআপ্পার হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি তাঁর অল্পায়ু জীবনের প্রায় শেষ পর্যায় পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে গেছেন। মৃত্যুর কিছু আগে পচিআপ্পা কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যার অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। জীবনের শেষ অবধি তিনি 'পচিআপ্পা ট্রাস্ট'-এর সেবা করে গেছেন পরম আনুগত্যের সঙ্গে। ছাত্র ও সহকর্মীদের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা তিনি প্রচুর লাভ করেছেন।"[৩]

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাসন অতঃপর জানিয়েছেন, বিজ্ঞানশিক্ষা দান করাই আলাসিঙ্গার জীবনোদ্দেশ্য ছিল না, কিংবা রাজনৈতিক বীরত্বও তিনি কামনা করেননি, ভারতের জীবনসঙ্গীত যে ধর্মেই ঝঙ্কৃত তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন; ক্রীস্টান মিশনারীরা ভারতীয় ধর্মের যে-সব বিকৃত ব্যাখ্যা বা কুৎসা করত, তা তাঁকে ব্যথিত করেছিল। আলাসিঙ্গা যখন প্রতিকারের উপায়-সন্ধানে ব্যাকুল, তখনি তাঁর সঙ্গে পরিব্রাজক বিবেকানন্দের পরিচয়। স্বামী বিবেকানন্দ (তখন স্বামী সচ্চিদানন্দ) কন্যাকুমারিকায়

৩ আলাসিঙ্গার দেহান্ত হয় ১১মে, ১৯০৯ তারিখে। এই সময়ে তাঁর বয়স ছিল ৪৪ বৎসর। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে নাচের চোয়ালে ক্যানসার হয়। তাতেই তাঁর জীবনাবসান হয়। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছিল এর চার বছর আগে।

দিব্যানুভূতিলাভ ও ভবিষ্যদ্দর্শন করবার পরে তিরুবনান্দপুরমে যান। সেখানে সেকালের বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত অধ্যাপক রায় বাহাদুর এম রঙ্গাচার্যের সঙ্গে পরিচিত হন। ইনি আলাসিঙ্গার ভগিনীপতি। এই সূত্রেই স্বামীজীর সঙ্গে আলাসিঙ্গার—'মহান গুরুর সঙ্গে মহান শিষ্যের পরিচয় ঘটে।'

১৮৯৩ সালের শেষ দিকে চিকাগোয় বিরাট আকারে ধর্মমহাসভা বসছে, আলাসিঙ্গা এই সংবাদে বিশেষ চঞ্চল হন। ডাঃ বারোজ, ডাঃ উইলিয়ম মিলারকে ধর্মমহাসভার বিষয়ে লিখেছিলেন। আলাসিঙ্গার কাকা বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত যোগী পার্থসারথি আয়েঙ্গার আমেরিকার 'হিন্দু লীগের' সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তিনিই আলাসিঙ্গাকে ধর্মমহাসভার সংবাদ দেন। হিন্দুধর্মের উত্থানের ভাবনায় আলাসিঙ্গা পূর্বাবধি ব্যাকুল, আন্তর্জাতিক এমন একটি অধিবেশনের গুরুত্ব তাঁর চোখে স্বভাবতই ধরা পড়ে—হিন্দুধর্মের পক্ষে একজন যোগ্য প্রতিনিধি প্রেরণের ভাবনায় তাই খুবই উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন, অধ্যাপক এম রঙ্গাচার্যকে আমেরিকা যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানান, কিন্তু তিনি রাজী হননি। আলাসিঙ্গা কিছুটা হতাশ হলেও চেষ্টা ছাড়েননি। এই সময়ে একদিন তিনি তাঁর ছোট ভাই এম সি কৃষ্ণমাচারের কাছ থেকে শুনলেন, একজন তরুণ সন্ন্যাসী মাদ্রাজে এসেছেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট আক্যাউনট্যান্ট জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের বাড়িতে আছেন, হিন্দুশাস্ত্র এবং ইংরেজী ভাষায় তাঁর অসাধারণ দখল। কৌতূহলী আলাসিঙ্গা, জি জি নরসিমাচার, আর এ কৃষ্ণমাচার প্রভৃতি কয়েকজনকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। "প্রথম দর্শনেই আলাসিঙ্গা যেন পূর্বসংস্কারে বুঝলেন—এই সেই প্রার্থিত পুরুষ। ⋯ স্বামীজীর চোখে যে আলো জ্বলছিল তা যেন আলাসিঙ্গাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এই অজানা সন্ন্যাসীকে ভালবাসবার, গুরুরূপে বরণ করবার অনিবার্য আবেগে তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন।"

আলাসিঙ্গা স্বামীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'স্বামীজী, চিকাগোয় যাচ্ছেন না কেন?' 'কেন নয়? ঠিক তো!'—স্বামীজী বলেছিলেন। আলাসিঙ্গা ক্রমেই অনুরোধের পরিমাণ বাড়াতে লাগলেন; তিনি অনুভব করেছিলেন, বহির্জগতে সনাতন হিন্দুধর্মের উপস্থিত হবার এই পরম সুযোগ, বোধহয় চরম সুযোগ। স্বামীজীর মনস্থির করতে সময় লেগেছিল। কিন্তু আলাসিঙ্গার নিঃস্বার্থ আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হতে পারে না। "১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শিবরাত্রির দিন; সারাক্ষণ স্বামীজী প্রায় মৌন, গভীর ধ্যানে আচ্ছন্ন; সেই রাত্রেই স্বামীজী স্থির করলেন—তিনি আমেরিকায় যাবেন।"

এর পরে স্বামীজীর যাত্রার জন্য আলাসিঙ্গা কিভাবে অর্থসংগ্রহ করেছেন, কিভাবে তাঁকে বিদায় দিয়েছেন, সেকথা শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাসন বলেছেন তাঁর লেখায়। অন্য রচনায় আমরা বিস্তারিতভাবে তার আলোচনা করেছি, এখানে পুনঃ উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই। আলাসিঙ্গার বিষয়ে উপরে যে-সব তথ্য পেলাম তার সঙ্গে 'দিনমণি' পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত আর একটি সংবাদ যোগ করে দেওয়া উচিত—আলাসিঙ্গা ভারতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা আলাসিঙ্গাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। শ্রীনিবাসনের লেখায় এবং 'দিনমণি' পত্রিকার লেখায় অ্যানী বেশান্তের সঙ্গে আলাসিঙ্গার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা পাওয়া যায়।

॥ ৩ ॥

সর্বশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে আলাসিঙ্গার মিশবার ক্ষমতা, কর্মপটুতা ও নিষ্ঠাশক্তির দ্বারা দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণের সামর্থ্যের কথা স্বামীজীর জানা ছিল। এই ক্ষমতার জন্য আলাসিঙ্গার পক্ষে পত্রিকা চালানোই যে সম্ভবপর শ্রেষ্ঠ কাজ, তা বুঝলেন। তদনুযায়ী তিনি একাজে আলাসিঙ্গাকে উৎসাহিত করে চললেন। কয়েকটি চিঠির অংশ পরপর উদ্ধৃত করা যাক:

> "পত্রিকাখানা বার কর—আমি মাঝে মাঝে প্রবন্ধ পাঠাব।···কাগজ ছাপানো ও অন্যান্য খরচের জন্য মাঝে মাঝে তোমাদের কাছে টাকা পাঠাবার চেষ্টা করব।···মাদ্রাজ থেকে যে কাগজখানা বার হবার কথা হচ্ছিল, তার কি হল?··· কিডিকে দিয়ে লেখাতে থাকো, তাতেই তার মেজাজ ঠিক থাকবে।"
>
> (আলাসিঙ্গাকে। ১১ জুলাই, ১৮৯৪)

> "একটা ছোটখাট সমিতি প্রতিষ্ঠা কর, তার মুখপত্রস্বরূপ একখানা সাময়িক পত্র বার কর—তুমি তার সম্পাদক হও। কাগজটা বার করবার ও কাজটা আরম্ভ করে দেবার জন্য খুব কমপক্ষে কত খরচ পড়ে, হিসেব করে আমাকে জানাবে, আর সমিতিটার নাম ও ঠিকানা জানাবে। আমি তাহলে তার জন্য টাকা পাঠাব, শুধু তাই নয়, আমেরিকায় আরও অনেককে ধরে তাঁরা যাতে বছরে মোটা চাঁদা দেন, তা করব। কলকাতায়ও ঐ রকম করতে বল।···
>
> "আমার হাতে এখন ৯০০৲ টাকা আছে—তার কতকটা ভারতের কাজ আরম্ভ করে দেবার জন্য পাঠাব, আর এখানে অনেককে ধরে তাদের দিয়ে বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক বা মাসিক হিসাবে টাকাকড়ি পাঠাবার বন্দোবস্ত করব। এখন তুমি সমিতিটা খুলে ফেল ও কাগজটা বার করে দাও, এবং আর আর আনুষঙ্গিক যা আবশ্যক, তার তোড়জোড় কর। এ ব্যাপারটা খুব অল্প লোকের মধ্যে গোপন রেখো।···
>
> "এই ভয়ানক টাকাকড়ির হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচব। সুতরাং যত শীঘ্র তোমরা সংঘবদ্ধ হতে পারো, এবং তুমি সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হয়ে আমার বন্ধু ও সহায়কদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পত্রাদি ব্যবহার করতে পারো, ততই তোমাদের ও আমার উভয় পক্ষের মঙ্গল। এইটি শীঘ্র করে ফেলে আমাকে লেখো। সমিতির একটা অসাম্প্রদায়িক নাম দিও—আমার মনে হচ্ছে 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামটা হলে মন্দ হয় না। ঐ নামটা দিলে তাতে হিন্দুদের মনে কোনো আঘাত না দিয়ে বৌদ্ধদেরও আমাদের দিকে আকৃষ্ট করবে। 'প্রবুদ্ধ' শব্দটার ধ্বনিতে ('প্র + বুদ্ধ') বুদ্ধ অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধ আছে—তার সঙ্গে 'ভারত' জুড়লে হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সম্মিলন বোঝাতে পারে।"
>
> (আলাসিঙ্গাকে। ৩১ অগস্ট, ১৮৯৪)

> "···তোমাদের যে খবরের কাগজ বাহির করিবার কথা ছিল ছাড়িও না।···
>
> যদি পারো তবে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র উভয়ই বাহির কর।

আমার যে সকল ভ্রাতা চারিদিকে ঘুরিতেছেন, তাঁহারা গ্রাহক সংগ্রহ করিবেন। আমিও অনেক গ্রাহক জোগাড় করিব এবং মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু টাকা পাঠাইব।"

(আলাসিঙ্গাকে। ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪)

"যদি বৈদান্তিক ভাবধারার একটি পত্রিকা বার করতে পারো, তা আমাদের কাজকে এগিয়ে দেবে। কাজে লেগে পড়। অপরকে সমালোচনা করো না। যদি সত্যকার কিছু বাণী দেবার থাকে দাও, শেখাবার থাকে শেখাও, তার বেশী দরকার নেই।... একটা কিছু করে আমায় দেখাও। একটা মন্দির, একটা ছাপাখানা, একখানা কাগজ, থাকবার জন্য একখানা বাড়ি করে আমায় দেখাও।"

(আলাসিঙ্গাকে। ১৮৯৪)

স্বামীজীর যে-সকল পত্রাংশ উদ্ধৃত করলাম, তার থেকে দেখা যায়, স্বামীজী প্রস্তাবিত কাগজের পূর্ণ কর্তৃত্ব আলাসিঙ্গার উপরে দিয়েছিলেন; এবং কাগজের অর্থের দায়িত্ব তিনি নিজে গ্রহণ করেছিলেন। আরও দেখতে পাওয়া যায়, কাগজের সঙ্গে স্বামীজী একটি সংঘ ও একটি মন্দিরের পরিকল্পনাও করেছেন। সংঘের নামকরণ করেছেন 'প্রবুদ্ধ ভারত'। ঐ নামকরণের কারণও জানিয়েছেন: ঐ নামের মধ্যে ভারতের জাগরণের ঘোষণা থাকবে, এবং 'বুদ্ধ' শব্দ থাকার জন্য ঐ নামের দ্বারা 'হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের সম্মিলন সূচিত' হবে। নামটি স্বামীজীর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। পত্রিকার নাম 'প্রবুদ্ধ ভারত' করতে হবে একথা তিনি স্পষ্টভাবে বলেননি, কিন্তু মনোগত অভিপ্রায় হয়ত তাই ছিল; পরে দেখা যাবে, দ্বিতীয় পত্রিকাটির ক্ষেত্রে এই নামটিই গৃহীত হয়েছিল।[৪]

উদ্ধৃত অংশগুলি থেকে আর একটি জিনিস দেখা যায়, স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল, সাময়িক পত্রিকার মত সংবাদপত্রও প্রকাশিত হোক। তাঁর সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়নি, তখন বা পরে।

স্বামীজীর পরিকল্পনা এখানেই শেষ নয়—ইংরাজির মত দেশীয় ভাষাতেও পত্রিকা চাইলেন। ১৮৯৫, ৩রা জানুয়ারী বিচারপতি সুব্রহ্মণ্য আয়ারকে লিখলেন:

"প্রথমে মাদ্রাজে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে, ক্রমশঃ উহাতে অন্যান্য অবয়ব সংযোজন করিতে হইবে। ... ঐ বিদ্যালয়ের মুখপত্র-স্বরূপ একখানি ইংরাজি ও একখানি দেশীয় ভাষার কাগজ থাকিবে।"

যতদূর পেয়েছি, ১১ জুলাই, ১৮৯৪-এর পত্রে স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে পত্রিকা বার করার চেষ্টা করতে প্রথম বলেন। পত্রিকার অভিপ্রায় যে আলাসিঙ্গার মাথায় তার পূর্ব থেকেই ছিল, তাও দেখেছি। তাহলেও, স্বামীজীর নির্দেশ পাবার পরেও আয়োজন করতে বছরখানেক কেটে গেল। স্বামীজী ১৮৯৫-র ৬ মে আলাসিঙ্গাকে যে চিঠি লেখেন, তাতে মনে হয়, তিনি জেনেছেন যে, আলাসিঙ্গা পত্রিকা-প্রকাশের ব্যাপারে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। স্বামীজী ঐ চিঠিতে প্রস্তাবিত কাগজের উচিত-প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত বিস্তারিত লিখে পাঠালেন—

"এখন কাগজখানা কোনরূপে বার করবার খুব ঝোঁক হয়েছে আমার। এই পত্রিকায় গুরুগম্ভীর বিষয় যেন লঘুভাবে

৪ প্রবুদ্ধ ভারতের সঙ্গে আলাসিঙ্গার যোগের কথা প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার ইতিহাসে আলোচিত হবে।

আলোচিত না হয়, এর সুর ধীর-গম্ভীর উচ্চ গ্রামে বাঁধা চাই। আমি এখানে অনেক গ্রাহক যোগাড় ক'রে দেবো, আমি নিজে ওর জন্য প্রবন্ধ লিখব এবং সময়ে সময়ে আমেরিকান লেখকদের দিয়ে প্রবন্ধ লিখিয়ে পাঠাব। তোমরাও একদল পাকা নিয়মিত লেখক ধর। তোমার ভগিনীপতি তো একজন খুব ভাল লেখক। তারপর আমি তোমাকে জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস ভাই, খেতড়ির রাজা, লিমডির ঠাকুর সাহেব প্রভৃতির নামে পত্র দেবো, তাঁরা কাগজটার গ্রাহক হবেন—তা হলেই ওটা খুব চলে যাবে। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও দৃঢ়চিত্ত হও এবং কাজ ক'রে যাও। আমরা বড় বড় কাজ করব—ভয় পেও না। এই একটি নিয়ম কর যে, কাগজের প্রত্যেক সংখ্যায় পূর্বোক্ত তিনটি ভাষ্যের (দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত) মধ্যে কোন না কোন একটির খানিকটা অনুবাদ থাকবে। আর এক কথা—তুমি সকলের সেবক হও, অপরের উপর এতটুকু প্রভুত্ব করতেও চেষ্টা করো না তাতে ঈর্ষার উদ্রেক হবে ও সব মাটি করে দেবে। কাগজের প্রথম সংখ্যাটার বাইরের চাকচিক্য যেন ভাল হয়। আমি ওর জন্য একটা প্রবন্ধ লিখব। আর ভারতে ভাল ভাল লেখকদের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বেশ ভাল ভাল প্রবন্ধ সংগ্রহ কর। তার মধ্যে একটা যেন দ্বৈত-ভাষ্যের অংশবিশেষের অনুবাদ হয়। পত্রিকার প্রচ্ছদপটে প্রবন্ধ ও লেখকদের নাম থাকবে, আর চারধারে খুব ভাল প্রবন্ধগুলি ও ওদের লেখকদের নাম থাকবে। আগামী মাসের মধ্যেই আমি প্রবন্ধ ও টাকা পাঠাচ্ছি

পত্রিকার আর্থিক দায়িত্ব যে স্বামীজী এই পর্যায়ে নিজে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তা এই পত্রেই রয়েছে—

"এখন কাজে লাগো—কাগজখানার জন্য এখন উঠে পড়ে লাগো। আমি কলকাতায় কিছু টাকা পাঠিয়েছি, মাস-খানেকের ভেতর কাগজটার জন্য তোমাদের কাছেও কিছু টাকা পাঠাতে পারবো। এখন অবশ্য অল্পই পাঠাব, পরে নিয়মিত-রূপে কিছু কিছু পাঠাতে পারবো। এখন কাজে লাগো। হিন্দু ভিখারীদের কাছে আর ভিক্ষা করতে যেও না। আমি নিজের মস্তিষ্ক এবং সবল দক্ষিণ বাহুর সাহায্যে নিজেই সব করব। এখানে বা ভারতে আমি কারও সাহায্য চাই না। আমি কলকাতা ও মান্দ্রাজ দু জায়গায় কাজের জন্য যা টাকার দরকার, তা নিজেই রোজগার করব।"

স্বামীজী অতঃপর প্রথম দফায় টাকা পাঠালেন ১০০ ডলার (২৮ মে, ১৮৯৫ চিঠি), মাসখানেক পরে আরও টাকা পাঠাচ্ছেন লিখলেন (১ জুলাই), সেই সঙ্গে পত্রিকা প্রকাশের জন্য আবার তাগিদ দিলেন, আরও মাসখানেক পরে এক পত্রে পত্রিকার নাম ও মটো অনুমোদন করলেন (৩০ জুলাই), নাম ব্রহ্মবাদিন, মটো "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি", —এবং উৎসাহ দিয়ে লিখলেন—"'সন্ন্যাসীর গীতি' এইটিই তোমাদের কাগজে আমার প্রথম প্রবন্ধ। নিরুৎসাহ হয়ো না—তোমার গুরুতে বিশ্বাস হারিও না—ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিও না। হে বৎস! যতদিন তোমার অন্তরে উৎসাহ এবং গুরু ও ঈশ্বরে বিশ্বাস—এই তিনটি জিনিস থাকবে, ততদিন কিছুতেই তোমায় দমাতে পারবে না। আমি দিন দিন

হৃদয়ে শক্তির বিকাশ অনুভব করছি। হে সাহসী বালকগণ, কাজ করে যাও।"

কিন্তু যখন আরও এক মাসের উপর কেটে গেল, অথচ পত্রিকা বেরুল না, তখন স্বামীজী বিশেষ বিরক্ত হলেন। নিশ্চয় ইতিমধ্যে আরও টাকার প্রয়োজন সম্বন্ধে তাঁকে লেখা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ভারতে মাউকস্ প্রভৃতি মিশনারীদের কুৎসা-প্রচারে আতঙ্ক প্রকাশ করেও আলাসিঙ্গারা চিঠি দিয়েছিলেন এইকালে। স্বামীজী ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে মিথ্যা মিশনারী-নিন্দায় কর্ণপাত করার জন্য তীব্র ধিক্কার দিয়ে আলাসিঙ্গাকে চিঠি লিখলেন, তার শেষাংশে পত্রিকা-ব্যাপারে লিখেছিলেন —"আমি ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয়ত্রই কাগজ বার ক'রব, মনে করছি। সুতরাং কাগজের জন্য যদি তোমরা সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভর কর, তাহলে চলবে না তোমাদের ছাড়াও আমার অনেক জিনিস আছে দেখবার।"

অবশেষে ব্রহ্মবাদিন প্রকাশিত হল, প্রথম সংখ্যা ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫। এটি তখন পাক্ষিক পত্র। ৪ঠা অক্টোবর পর্যন্ত স্বামীজী পত্রিকা বার হওয়ার সংবাদ পাননি। অত্যন্ত হতাশ হয়ে ঐ তারিখে কলকাতায় স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখলেন—

> "মান্দ্রাজীরা দেখছি, কাগজ বার করতে পারলে না। বিষয়বুদ্ধি হিন্দু-জাতির যে একেবারেই নাই! যে সময়ে যে কাজ প্রতিশ্রুত হও ঠিক সেই সময়ে তা করা চাই, নতুবা লোকের বিশ্বাস চলে যায়।"

এই চিঠি লেখার অল্পদিনের মধ্যে, ২৪ অক্টোবরের ভিতরে, স্বামীজী ব্রহ্মবাদিনের দুটি সংখ্যা পেয়ে যান। সংখ্যা দুটির উপর সংক্ষেপে তিনি যে-সকল মন্তব্য করেন, এক কথায় বলা যায় সেইগুলিই ব্রহ্মবাদিন সম্বন্ধে স্বামীজীর স্থায়ী সমালোচনা। ২৪ অক্টোবর তিনি লেখেন—"ব্রহ্মবাদিনের দুটি সংখ্যা পেলাম—বেশ হয়েছে—এইরূপ করে চলো। কাগজের কভারটা একটু ভাল করবার চেষ্টা কর, আর সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য-গুলির ভাষাটা আর একটু হালকা অথচ ভাবগুলি একটু চটকদার করবার চেষ্টা কর। গুরুগম্ভীর ভাষা ও ছাঁদ কেবল প্রধান প্রধান প্রবন্ধগুলির জন্য রেখে দাও।" একই চিঠিতে তিনি কাগজটার দিকে 'পুরোপুরি নজর' দিতে বলেন, এবং জানান, হাতে টাকা না থাকায় তখনি তাঁর পক্ষে আরও টাকা পাঠানো শক্ত।

এর পরে বহু চিঠিতে ব্রহ্মবাদিনের প্রসঙ্গ থাকবে। তার একটা বড় অংশ ব্রহ্মবাদিনের অর্থসংগ্রহ নিয়ে। স্বামীজী তাঁর বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতদের ব্রহ্মবাদিনের জন্য গ্রাহক সংগ্রহ করতে অনুরোধ করবেন, নিজে যথাসম্ভব টাকা পাঠাবেন, এবং 'বিজ্ঞাপনের জোরে পত্রিকা চলে', একথা জানিয়ে আলাসিঙ্গাকে বিজ্ঞাপন-সংগ্রহে মনোযোগ দিতে নির্দেশ দেবেন।

ব্রহ্মবাদিনে কি জাতীয় রচনা প্রকাশিত হওয়া উচিত সে বিষয়ে স্বামীজী ১৮ নভেম্বর, ১৮৯৫ লিখলেন—"ব্রহ্মবাদিনের প্রত্যেক সংখ্যায় ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু লেখা বেরুনো দরকার। দ্বিতীয়তঃ লেখার ধাঁজটা ভারি কটমটে একটু যাতে স্বচ্ছ, সরস ও ওজস্বী হয়, তার চেষ্টা কর। গত সংখ্যায় ক্ষত্রিয়দের খুব বাড়ানো হয়েছে, পরের সংখ্যায় ব্রাহ্মণদের খুব প্রশংসা কর, তার পরের সংখ্যায় বৈশ্যদের। কপট ও কাপুরুষ না হয়ে সকলকে খুশী কর। দৃঢ়তা ও পবিত্রতার সহিত নিজেদের ভাবগুলি আঁকড়ে ধরে থাকো; আর এখন যেরূপ বাধাই

আসুক না কেন, জগৎ অবশেষে তোমাদের কথা শুনবেই শুনবে।" এই পত্রিকার প্রতিটি পৃষ্ঠায় তাঁর কি ধরনের নজর থাকত, তার নমুনা আছে এই একই চিঠির শেষাংশে—"ব্রহ্মবাদিনে বিবিধ সংবাদের একটা স্তম্ভ থাকা উচিত। একটি ভক্ত বৈরাগী shuffled off his mortal coil—এইরূপ ভাষা লিখো না। ভক্ত বৈরাগীর মৃত্যুর সঙ্গে এইরূপ বাক্যযোজনা একটু হাস্যোদ্দীপক।" পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে স্বামীজীর অনেক আশাই গড়ে উঠেছিল, এবং তিনি কতখানি তীব্র প্রীতি ও আগ্রহের সঙ্গে এর অগ্রগতি লক্ষ্য করছিলেন তার নিদর্শন আলাসিঙ্গাকে লিখিত ২০ ডিসেম্বর, ১৮৯৫-র পত্রটি, যার সবটাই ব্রহ্মবাদিনের আলোচনায় পূর্ণ। প্রায় সম্পূর্ণ অংশটিই উদ্ধৃত করছি—

"এই সঙ্গে 'ভক্তিযোগে'র কপি কতকটা পূর্ব থেকেই পাঠাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে কর্ম সম্বন্ধেও একটা বক্তৃতা পাঠালাম। এরা এখন একজন সঙ্কেতলিপিকর নিযুক্ত করেছে এবং আমি ক্লাসে যা কিছু বলি, সে সেগুলি টুকে নেয়। সুতরাং এখন তুমি কাগজের জন্য যথেষ্ট মাল পাবে। এগিয়ে চল। স্টার্ডি পরে আরও লিখবে। ইংলণ্ডে এরা নিজেদের একটা কাগজ বের করবে মনে করছে, 'ব্রহ্মবাদিনে'র জন্য তাই বেশী কিছু করতে পারিনি। কাগজটার বাইরে একটা মানানসই মলাট না দেবার মানেটা কি বলো দেখি? এখন কাগজটার ওপর তোমাদের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ কর; কাগজটা দাঁড়িয়ে যাক—আমি এটা দেখতে দৃঢ়সংকল্প। ধৈর্য ধরে থাকো এবং মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ত হয়ে থাকো। নিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না। টাকা-কড়ির লেন-দেন বিষয়ে সম্পূর্ণ খাঁটি হও। তাড়াহুড়ো করে টাকা রোজগারের চেষ্টা করো না—ও-সব ক্রমে হবে। আমরা এখনও বড় বড় কাজ করবো জেনো। প্রতি সপ্তাহে এখান থেকে কাজের একটা রিপোর্ট পাঠানো হবে। যতদিন তোমাদের বিশ্বাস সাধুতা ও নিষ্ঠা থাকবে, ততদিন সব বিষয়ে উন্নতিই হবে। আগামী ডাকে কাগজটা সম্বন্ধে সব কথা আমায় লিখবে।

"বৈদিক সূক্তগুলির অনুবাদের সময় ভাষ্যকারদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখো; প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌দের কথায় এতটুকু মনোযোগ দিও না। ওরা আমাদের শাস্ত্রগুলি সম্বন্ধে কিছুই বোঝে না, নীরস ভাষা-তত্ত্ববিদেরা ধর্ম বা দর্শন বুঝতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, ঋগ্বেদের 'আনীদবাতং' শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে—'তিনি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস না নিয়ে বাঁচতে লাগলেন।' প্রকৃতপক্ষে এখানে মুখ্যপ্রাণ সম্বন্ধেই বলা হয়েছে এবং 'অবাতং' শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ—অবিচলিতভাবে অর্থাৎ অস্পন্দভাবে। কল্পারম্ভের পূর্বে প্রাণ অর্থাৎ সর্বব্যাপিনী জাগতিক শক্তি যে অবস্থায় থাকে, তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে (ভাষ্যকারগণ দ্রষ্টব্য)। আমাদের ঋষিদের ভাবানুযায়ী ব্যাখ্যা কর, তথাকথিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতানুসারে নয়। তারা কি জানে?

সম্বন্ধে লেখাগুলো অনেকটা প্রণালীবদ্ধ আকারে আছে; কিন্তু ক্লাসে যে-সব বলা হয়েছে, সেগুলি অমনি এলোপাতাড়ি—সুতরাং সেগুলি

একটু দেখে-শুনে ছাপাতে হবে। তবে আমার ভাবগুলির ওপর বেশী কলম চালিও না। সাহসী ও নির্ভীক হও—তা হলেই রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। 'ভক্তিযোগ'টা বহুদিন ধরে তোমাদের কাগজের খোরাক যোগাবে। তারপর ওটা গ্রন্থাকারে ছাপিও। ভারত, আমেরিকা ও ইংলণ্ডে বইটি খুব বিক্রী হবে। মনে রেখো; থিওসফিস্টদের সঙ্গে যেন কোন প্রকার সম্বন্ধ না রাখা হয়। তোমরা যদি সকলে আমাকে ত্যাগ না কর, আমার পশ্চাতে ঠিক খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারো এবং ধৈর্য না হারাও, তবে আমি তোমাদের নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি, আমরা আরও খুব বড় বড় কাজ করতে পারব! হে বৎস, ইংলণ্ডে ধীরে ধীরে খুব বড় কাজ হবে। আমি বুঝতে পারছি, তুমি মাঝে মাঝে নিরুৎসাহ হয়ে পড়; মনে রেখো, ইতিহাসের এই একমাত্র সাক্ষ্য যে, গুরুভক্ত জগৎ জয় করবে। আমি জি. জি.-র চিঠি পেয়ে ভারি খুশী হয়েছি। বিশ্বাসই মানুষকে সিংহতুল্য বীর্যবান্ করে। তুমি সর্বদা মনে রেখো, আমাকে কত কাজ করতে হয়। কখন কখন দিনে দু-তিনটা বক্তৃতা দিতে হয়। এইভাবে সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা কাটিয়ে পথ ক'রে নিচ্ছি—কঠিন কাজ! আমার চেয়ে নরম প্রকৃতির লোক হ'লে এতেই মরে যেত। স্টার্ডির প্রবন্ধটা ছাপিয়েছ কি? মিঃ কৃষ্ণ মেনন আমাকে বরাবর বলে এসেছে—সে লিখবে; কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সে এখনও কিছু লেখেনি। ইংলণ্ডে সে দুরবস্থায় পড়েছে। আমি তাকে ৮ পাউণ্ড দিয়ে সাহায্য করেছি; এর বেশী কিছু করবার ক্ষমতা আমার ছিল না। আমি বুঝতে পারছি না, সে দেশে ফিরছে না কেন। তার কাছ থেকে কিছু আশা করো না। বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সহিত লেগে থাকো। সত্যনিষ্ঠ, সাধু ও পবিত্র হও, আর নিজেদের ভেতর বিবাদ করো না। ঈর্ষাই আমাদের জাতির ধ্বংসের কারণ।"

॥ ৪ ॥

স্বামীজীর এই বিপুল আশা ও আগ্রহ প্রচণ্ডতম ধাক্কা খেল একটি ব্যাপারে—তিনি ব্রহ্মবাদিনে থিয়জফিস্ট অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করলেন। থিয়জফির সম্বন্ধে তাঁর কঠিন মনোভাব অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি। স্বামীজী সম্ভবতঃ অনেকদিন ধরেই এই ভয় করছিলেন। বহু চিঠিতে তিনি আলাসিঙ্গাকে গুরুভক্তিতে দৃঢ় হতে বলেছিলেন, তার একটা কারণ অবশ্যই আলাসিঙ্গার কর্মোদ্দীপনা জাগ্রত করা, কিন্তু অন্য একটা কারণও ছিল বলে অনুমান,—তিনি জানতেন, তাঁর মাদ্রাজী ভক্তেরা বেদান্ত ও থিয়জফির মধ্যবর্তী একটি অংশে রয়েছেন। থিয়জফিকে স্বামীজী যতখানি বেদান্ত-বিরোধী বলে মনে করতেন, এই মাদ্রাজী ভক্তেরা তা করতেন না। স্বামীজীর আশঙ্কার বিশেষ কারণ, মাদ্রাজ থিয়জফিস্টদের কেন্দ্রভূমি, এবং থিয়জফিস্টদের সঙ্গে আলাসিঙ্গাদির ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। এই সময়টি ভারতবর্ষে অ্যানী বেশান্তের বিপুল প্রভাবের কাল। বেশান্তের ব্যক্তিত্বের ও বাগ্মিতার আকর্ষণ দারুণ। স্বামীজীর আ[illegible]হল, আলাসিঙ্গারা বেশান্তের মোহে প[illegible]ন। যখন ব্রহ্মবাদিনে বেশান্তের বক্তৃতার বিবরণ ও বিজ্ঞাপন

বেরুল তখন স্বামীজী দেখলেন তাঁর অনুমান সত্য।[৫]

পূর্বে উদ্ধৃত ২০ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে তিনি থিয়জফিস্টদের সম্বন্ধে আলাসিঙ্গাকে সতর্ক করেছিলেন, এই ঘটনার পরে কঠোরতম তিরস্কার ক'রলেন—তীব্র ভাষা প্রয়োগে অভ্যস্ত বিবেকানন্দের পক্ষেও সে ভাষা তীব্র—

"আমি 'ব্রহ্মবাদিন্' কাগজের ২১শে ডিসেম্বর তারিখের শেষ সংখ্যা পেয়েছি।

"ব্রহ্মবাদিন্-এর গত কয়েক সংখ্যা পড়ে আমার একটু সন্দেহ জাগছিল, তোমরা থিওসফিষ্টদের দলে যোগ দেবে নাকি? এবারে তোমরা ওদের হাতে একেবারে আত্মসমর্পণ করেছ। তোমাদের মন্তব্যের স্তম্ভে থিওসফিষ্টদের বক্তৃতার একটা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলে কেন? থিওসফিষ্টদের সঙ্গে আমার কোনরকম যোগ আছে, সন্দেহ করলে ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয়ত্র আমার কাজের ক্ষতি হবে, আর তা হতেই পারে। সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তিরা সকলেই তাদের ভ্রান্ত মনে করে; আর তারা যে এরূপ মনে করে, তা ঠিকই। তোমরা তা ভালরূপেই জানো। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তোমরা আমার উপর টেক্কা দেবার চেষ্টা ক'রছ। তোমরা মনে ক'রছ থিওসফিষ্টদের নামে বিজ্ঞাপন দিলেই ইংলণ্ডে অনেক গ্রাহক পাবে। তোমরাও যেমন আহাম্মক!

"আমি থিওসফিষ্টদের সঙ্গে বিবাদ করতে চাই না; কিন্তু আমার ভাব হচ্ছে, তাদের একদম আমল না দেওয়া। তারা কি বিজ্ঞাপনের জন্য তোমাদের টাকা দিয়েছিল? তোমরা আগ-বাড়িয়ে বিজ্ঞাপন দিতে গেলে কেন? আমি আবার যখন ইংলণ্ডে যাব, তোমাদের জন্য যথেষ্ট গ্রাহক যোগাড় ক'রব।

"আমি বিশ্বাসঘাতক কাকেও চাই না। আমি তোমাদের স্পষ্ট ব'লে রাখছি, কোন ধূর্তের পাল্লায় আমি পড়ছি না। আমার সঙ্গে কপটতা চলবে না।...আমি তোমাদের খুব স্পষ্ট কথাই বলছি। একজন—মাত্র একজন যদি আমায় অনুসরণ করে, সেও ভাল, কিন্তু সে যেন মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বাসী থাকে। সফলতা বা বিফলতা আমি গ্রাহ্যই করি না। সমগ্র জগতে প্রচারকার্যের বৃথা কাজে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যখন ইংলণ্ডে ছিলাম, তখন কি তাদের কেউ আমাকে সাহায্য করতে এসেছিল? পাগল আর কি! আমি হয় আমার আন্দোলনটিকে সম্পূর্ণ খাঁটি রাখবো, তা না হয় মোটেই আন্দোলন চালাব না।...

"তোমরা কি ঠিক করলে তা পত্রপাঠ আমায় লিখবে। আমার এ বিষয়ে মতামত একচুল নড়বার নয়।...

৫ বিজ্ঞাপনটি এই প্রকার:

Notes

The subjects of Mrs. Besant's four (free) lectures at the Adyar Head-quarters of the Theosophical Society, December 27, 28, 29, and 30, will be as follows;

The future that awaits us

Lecture I—First steps. Karma. Yoga. Purification.

Lecture II—Qualification for discipleship. Control of the mind. Meditation. Building of character.

Lecture III—The life of the disciple. Stages on his path. The awakening of the sacred fire. The Siddhis.

Lecture IV—The future progress of humanity. Methods of future science. Man's increasing powers. His coming development. Beyond.

Each lecture will begin at 8 A.M.

(ব্রহ্মবাদিনের ১৮৯৫, ২১ ডিসেম্বরের সংখ্যা থেকে)

"'ব্রহ্মবাদিন' বেদান্ত প্রচারের জন্য, থিওসফি প্রচারের জন্য নয়। তোমাদের যদি উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল, তবে গোড়া থেকে আমাকে তা বলা উচিত ছিল। স্পষ্টভাবে নিজেদের অভিপ্রায় না জানিয়ে কার্যকালে অন্যরূপ করতে দেখলে আমি প্রায় ধৈর্য হারিয়ে ফেলি।...

"এই হচ্ছে জগৎ! যাদের তুমি সবচেয়ে ভালবাস এবং সবচেয়ে বেশী সাহায্য কর, তারাই তোমায় ঠকাতে চায়। ঘৃণিত সংসার !!!"[৬]

গুরুর রূঢ় তিরস্কারে শিষ্য কতখানি আহত হয়েছিলেন, অনুমান করতে পারি। লজ্জিতও হয়েছিলেন নিশ্চয়। তিনি অবিলম্বে পত্রে উত্তর দিয়েছিলেন। ঐ চিঠিতে নিশ্চয় আলাসিঙ্গা পত্রিকা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। প্রিয় শিষ্যের আহত অভিমানে স্বামীজী ব্যথিত হলেন, তৎক্ষণাৎ নিজের ত্রুটি স্বীকার করে অনুতপ্তভাবে লিখলেন (স্বামীজীর মধ্যে 'রুদ্র' ও 'আশুতোষ' অঙ্গাঙ্গী)—

"এই মাত্র তোমার পত্র পেয়ে এবং তোমরা সকলে সঙ্কল্পে দৃঢ়ব্রত আছ জেনে খুব খুশী হলাম। আমার চিঠিগুলিতে খুব কড়া কথা ব্যবহার করেছি; সেজন্য তুমি কিছু মনে ক'রো না, কারণ তুমি জানই তো মাঝে মাঝে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। কাজটি ভয়ানক কঠিন, আর যতই তা বাড়ছে, ততই কঠিনতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমার দীর্ঘ বিশ্রামের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অথচ এখনই আমার সম্মুখে ইংলণ্ডে বিস্তর কাজ পড়ে আছে। তোমায় অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে জেনে আমি বড়ই দুঃখিত হলাম।

"ধৈর্য ধরে থাকো, বৎস! কাজ এত বাড়বে যে, তুমি ভাবতেও পার না। আমরা আশা করছি এখানে শীঘ্রই বহু সহস্র গ্রাহক সংগ্রহ করতে পারব, আর আমি ইংলণ্ডে গেলে সেখানেও অনেক পাব। স্টার্ডি 'ব্রহ্মবাদিন'-এর জন্য তোড়জোড় করছে। সবই সুন্দর, খুব সুন্দর চলছে। **তুমি পত্রিকাখানিকে একটা কমিটির হাতে দেবার যে সঙ্কল্প করেছ, আমি তা মোটেই অনুমোদন করি না। ও-রকম কিছু করো না। পত্রিকার সমস্ত পরিচালনা নিজ হাতে রাখো এবং তুমিই স্বত্বাধিকারী থাকো।** পরে কি করা যায় দেখা যাবে। তুমি ভয় পেও না। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি—যেমন করেই হোক, আমি ব্যয় নির্বাহ ক'রব। কমিটি করা মানে—নানা রুচির লোক আসবে তাদের বিভিন্ন খেয়াল প্রচার করতে, আর অবশেষে সবটা পণ্ড করবে। **তোমার ভগ্নীপতি পত্রিকাখানি সুন্দরভাবে সম্পাদনা করছেন,** তিনি বিজ্ঞ পণ্ডিত ও অদম্য কর্মী। তাঁকে আমার অশেষ শ্রদ্ধা জানাবে এবং আর সব বন্ধুকেও জানাবে।[৭] সকল কাজেই কৃতার্থ হবার পূর্বে শতশত বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়। যারা লেগে থাকবে, তারা শীঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক আলো দেখতে পাবে।" (১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬)

(ক্রমশঃ)

৬ স্বামীজীর কঠোর তিরস্কার হস্তগত হবার পূর্বেই বোধহয় অধিকন্তু অ্যানী বেশান্তের বক্তৃতায় 'সামারি' প্রকাশের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। ১৮৯৬, ৪ জানুয়ারী কর্মযোগ সম্বন্ধে বেশান্ত-বক্তৃতার অংশ ব্রহ্মবাদিনে প্রকাশিত হয়।

৭ ব্রহ্মবাদিনের সম্পাদক হিসাবে মনে হয় প্রথমাবধি আলাসিঙ্গার নামই দাখিল করা ছিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে লেখা 'বিলাতযাত্রীর পত্রে' স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে ব্রহ্মবাদিনের 'এডিটর' বলেছেন। কিন্তু মনে হয়, প্রথম দিকে মূল সম্পাদনার কাজ এম. রঙ্গাচার্য করতেন। শ্রীনিবাসন লিখেছেন, প্রথম দু'বৎসর রঙ্গাচার্য নিয়মিত লেখা দিয়ে গেছেন। "পরবর্তী দশ বৎসর তাঁর সম্পর্কের ভাই জি জি নরসিমাচার, আর এ কৃষ্ণমাচার এবং আরও কয়েকজন ব্রহ্মবাদিন-পরিচালনায় তাঁকে সাহায্য করেন। পরবর্তী চার বৎসর, ১৯০৯-এ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি পত্রিকাটি এককভাবে পরিচালনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্ররা পাঁচ বছর চালান। তারপরে ১৯১৪ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।"

রূপ-সনাতন

শ্রীগৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত কবিতা প্রায় সকলেরই জানা—'নদীতীরে বৃন্দাবনে, সনাতন একমনে জপিছেন নাম, হেনকালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে করিল প্রণাম।' ব্রাহ্মণ স্পর্শমণির প্রার্থী হয়ে সনাতনের কাছে এসেছিল, সেই স্পর্শমণি হাতে পেয়ে ব্রাহ্মণ ভাবল সনাতন কী এমন রত্নের খোঁজ পেয়েছেন যার জন্য স্পর্শমণির মত মণিকেও গ্রাহ্যের মধ্যে আনছেন না, সেই রত্নের অধিকারী তাকে হ'তে হবে।

সনাতন সম্বন্ধে এই কাহিনী যখন লেখা হয়েছে তখন সনাতন বৈষ্ণবচূড়ামণি সাধক। কি করে তিনি আর তাঁর ভাই রূপ সাধক হলেন, সেই গল্পই এখানে বলা হয়েছে। গৌড়ের সিংহাসনে রাজত্ব করছেন নবাব হুসেন শাহ। মুসলমান নবাব হয়েও হুসেন শাহ ছিলেন সুবিচারপরায়ণ ও ধার্মিক। তাঁর দুজন প্রধান অমাত্য হলেন অমর ও সন্তোষ। এই দুজন হিন্দু কর্মচারীর জন্যই হুসেন শাহের দরবারের এত সুনাম। তাই অমর ও সন্তোষের উপর নবাবের অগাধ বিশ্বাস, আদর করে নবাব তাঁদের নাম দিয়েছেন দবীর খাস ও সাকর মল্লিক। গৌড়ের কাছেই রামকেলি গ্রাম। এই গ্রামে বাস করেন অমর ও সন্তোষ। দুই ভাই পরম বৈষ্ণব, রাজকাজের অবসরে তাঁরা ধর্মচর্চা করেন আর করেন বৈষ্ণবের সেবা। কিন্তু অবসর তাঁদের কোথায়? নবাবের কাছারিতে হাজির থাকতে হয় প্রায় সময়। এজন্য তাঁদের মনঃকষ্টও যথেষ্ট।

এই সময় তাঁরা খবর পেলেন নবদ্বীপে নদীয়া নগরে অবতীর্ণ হয়েছেন স্বয়ং বিষ্ণু। এবার তাঁর নাম শ্রীচৈতন্য। শ্রীচৈতন্য বলে বেড়াচ্ছেন 'চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে। বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎ পথে চলে॥' তাঁর লীলার কথা সবই ভক্তমুখে শুনতে পাচ্ছেন অমর ও সন্তোষ। তাঁদের প্রাণটাও শ্রীচৈতন্যের কাছে যাবার জন্য ব্যাকুল। তাঁদের এজন্মও কি বিফলে যাবে? কিন্তু উপায় নেই, নবাবের বিরাট রাজকাজের মাঝে এতটুকু ছুটি মিলবে না। তাঁরা দুভাই তখন চিঠি লিখে শ্রীচৈতন্যের কাছে তাঁদের প্রাণের আকুতি নিবেদন করলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁদের অভয় দিলেন, বললেন যে-কাজ তারা করছে সেই কাজই করুক, তবে হরিস্মরণ ও বৈষ্ণবসেবা যেন বন্ধ না থাকে। তিনি আরও জানালেন, তিনি তাদের সঙ্গে শীঘ্রই মিলিত হচ্ছেন রামকেলি গ্রামে। অমর আর সন্তোষের আনন্দ আর ধরে না। তাঁরা দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে কাজকর্ম আরম্ভ করলেন আর দিন গুনতে লাগলেন প্রভুর আগমনের। তারপর এল সেই শুভ দিন। প্রভু এলেন রামকেলি গ্রামে, কিন্তু রাতের অন্ধকারে এক তমাল-গাছের তলায় এসে প্রভু বসলেন। মিলিত হলেন অমর ও সন্তোষের সঙ্গে। প্রভু তাঁদের সঙ্গে ধর্মচর্চা করলেন আর অমর ও সন্তোষের নামকরণ করলেন—সেই বিখ্যাত নাম - রূপ ও সনাতন। তাঁদের আহ্বান জানালেন তাঁর কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য। এইরকম কথাবার্তা যখন চলছে তখন তাঁরা সংবাদ পেলেন, স্বয়ং নবাব হুসেন শাহ আসছেন প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে। প্রভু

আর সেখানে দাঁড়ালেন না, রাতারাতি সেখান থেকে চলে গেলেন।

অমর ও সন্তোষ এর পর থেকে প্রভুর দেওয়া নাম রূপ-সনাতন হিসাবেই লোকের কাছে পরিচিত হতে থাকলেন। প্রভুর সঙ্গে দেখা হবার পর তাদের বৈরাগ্য আরও বেড়ে গেল। কথাপ্রসঙ্গে তাঁরা নবাবের কাছে চাকরী ছাড়ার প্রস্তাব করলেন, কিন্তু নবাব সে কথায় কোন গুরুত্ব না দিয়ে শুধু বললেন, 'কাজের মধ্যে ঈশ্বরকে চিন্তা করা যায়।'

তারপরের এক ঘটনা। সকাল থেকেই আকাশে মেঘের ঘনঘটা, অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। রূপ-সনাতন বেরিয়েছেন নবাবের সঙ্গে দেখা করতে। পথের ধারে এক ভিখারীর কুঁড়ে, ভিখারীর স্ত্রী ভিখারীকে বলছে 'ভিক্ষে না করে আনলে আজ দিন চলবে কিসে?' ভিখারী বলছে, 'তুই পাগল হয়েছিস? এই দুর্যোগে মানুষ রাস্তায় বেরুতে পারে?' এমন সময়ে রাস্তায় রূপ-সনাতনের পদধ্বনি পাওয়া গেল। ভিখারীর স্ত্রী বলল, 'রাস্তায় পায়ের শব্দ পাচ্ছি, মনে হয় লোকজন পথে বেরিয়েছে।' ভিখারী বলছে, 'পাগল হয়েছিস? মনে হয় শেয়াল-কুকুর যাচ্ছে।' রূপ-সনাতন তাঁদের কথাবার্তা সবই শুনতে পেলেন; ভাবলেন, আর না, খুব হয়েছে। তাঁরা যবনের অন্নদাস হয়ে শেয়াল-কুকুরেরও অধম হয়েছেন। রূপ সেখান থেকেই ফিরলেন, সনাতনকে দিয়ে নবাবকে বলে পাঠালেন—নবাবের চাকরী তিনি করবেন না।

রূপ তো রেহাই পেলেন। কিন্তু সনাতন? তাঁর উপর রয়েছে নবাবের কোষাগারের ভার, এর দায়িত্ব না বুঝিয়েও তো যাওয়া যায় না। তিনি আবার নবাবের অনুমতি চাইলেন, কিন্তু অনুমতি পাওয়া গেল না। এবার সনাতন নিলেন ছলনার আশ্রয়, নবাবকে জানালেন তিনি অসুস্থ। ইতিমধ্যে সনাতন খবর পেলেন রূপকে প্রভু বৃন্দাবনে পাঠিয়েছেন সেখানকার লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের জন্য আর তিনি অপেক্ষা করে আছেন সনাতনের জন্য। সনাতনের অসুখ শুনে স্বয়ং নবাব এলেন সনাতনকে দেখতে, বুঝলেন রোগ সনাতনের দেহে নয়, মনে। নবাব তখন এক আশ্চর্য কাণ্ড করে বসলেন! সনাতন ইচ্ছা করে রাজকার্যে অবহেলা করছেন—এই অজুহাতে সনাতনকে বন্দী করলেন। কিন্তু সনাতন পেয়েছেন প্রভুর আশ্রয়, তাই তাঁর কাছে সুখ দুঃখ সমান হয়ে গেছে। অমন যে প্রতাপশালী অমাত্য, যার হুকুমে মানুষ মরে বাঁচে, সে আজ অন্ধকার বন্দিনিবাসে বন্দী। একেই বলে ভাগ্য। নবাব দেখলেন বন্দী করেও সনাতনের কোন পরিবর্তন হ'ল না, বরং প্রভুর জন্য ব্যাকুলতা আরও বেড়ে গেছে। সব সময় চোখে ধারা বয় আর হরিনামের আনন্দে সনাতন আত্মহারা। তার ঈশ্বরলাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে কোন লাভ নেই, এই ভেবে নবাব তাকে মুক্তি দিলেন।

সনাতন আর কালবিলম্ব করলেন না। বেরিয়ে পড়লেন প্রভুর উদ্দেশ্যে। কৌপীনমাত্র অবলম্বন, ভিক্ষা করে উদর পূরণ করেন, শয়ন করেন বৃক্ষতলে। লোকে দেখে প্রভুর আশ্চর্য লীলা। গত কাল পর্যন্ত যে আরাম ও বিলাসের চরম অবস্থায় কাল কাটিয়েছে, আজ সে স্বেচ্ছায় পথের ভিখারী। সনাতন এসে লুটিয়ে পড়লেন প্রভুর পদতলে। প্রভু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর তাকেও বৃন্দাবনে রূপের কাছে যেতে বললেন। সেখানে দু'ভাই গোবিন্দজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। বৃন্দাবন আবার তীর্থ হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠল। দু'ভাই তখন বৈষ্ণবধর্মশাস্ত্র-রচনায়

মনোনিবেশ করলেন। এরপর প্রভু চলে গেলেন নীলাচলে। পুরীধামের অপর নাম নীলাচল। তাঁর সঙ্গে গেলেন তাঁর ভক্ত ও পরিকরবৃন্দ। কিন্তু রূপ-সনাতন বৃন্দাবন ছেড়ে কোথাও গেলেন না, কারণ প্রভুর আদেশ—বৃন্দাবনে থেকেই প্রভুর মাহাত্ম্য প্রচার করতে হবে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁরা বৃন্দাবনেই রয়ে গেলেন। আজও বৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ ও তাঁদের সমাধি দেখতে পাওয়া যায়।

'ভকতি প্রণাম লহ গো আমার'

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

প্রভু, নিখিল-বিশ্ব হৃদয় মাঝারে
পুণ্য লগনে এসো গো আজ,
হৃদি শতদল ফুটাও সবার,
হে রামকৃষ্ণ, রাজাধিরাজ !

তোমারি কৃপার নবারুণ-আলো
ঘুচাক ধরার সব দুঃখ-কালো।
তোমারি পুণ্য চরণ-পরশে
হরষে ধরণী নাচুক আজ,
প্রেম-শান্তির কুসুম-খচিত
পরুক বিশ্ব নতুন সাজ !

দক্ষিণেশ্বর থেকে শান্তিনিকেতনে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

[ভগবান যখন অবতীর্ণ হন, তাঁর ভাবরাশিকে কেন্দ্র করে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ঘটে নবজাগরণ। আধুনিক যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের ফলে ভারতের জাতীয় জীবনে এই নবজাগরণ শুরু হয়েছে। উনবিংশ শতকের শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীতে যুগমানসের গ্রহণোপযোগী ও যুগজীবনে প্রয়োগযোগ্য রূপে মূর্ত ভারতের সনাতন সর্বজনীন ভাবধারাকে আধুনিক চিন্তার ক্ষেত্রে সর্বত্র প্রবাহিত করার উপযোগী প্রধান খাতগুলি কেটে সারা জগতে ছড়িয়ে দিয়ে যান। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর (আশ্বিন, ১৩০০ সাল) চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় এই বিশ্বব্যাপী প্রচার শুরু হয়। ইহার পর হইতেই ভারতের রাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতের নিজস্ব ভাব অবলম্বনে বিপুল জাগরণ ঘটতে দেখা যায়। রবীন্দ্রসাহিত্যে এই ভাবরাশি কি রূপ নিয়েছে, প্রবন্ধটিতে তারই কিছুটা আভাস দেবার চেষ্টা করেছেন লেখক।—সঃ]

'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের' কথাগুলি কালজয়ী। ঐ কথাগুলি এসেছে জীবনে যা-কিছু গভীরতম সেখান থেকে। জীবনের গভীরতম সত্যগুলি কত সহজ অথচ কত মৌলিক! যেমন, "সিদ্ধি সিদ্ধি বললে নেশা হয় না, সিদ্ধি গায়ে মাখলেও নেশা হয় না—খেতে হয়। 'দুধে মাখন আছে' শুধু বললে কি হবে? দুধকে দই পেতে মন্থন করো তবে তো হবে। শাস্ত্রের কথা বললে কি হবে? শুনলেই বা কি? ধারণা করা চাই।" সাধনের প্রয়োজন বোঝাতে গিয়ে এই সব উপমা। দিব্য অনুভূতির কথা বোঝানো শক্ত। কেউ যদি বলে, ঘি কিরকম খেতে? তার উত্তর, "কেমন ঘি না যেমন ঘি।" এমনি সব সুন্দর সুন্দর সহজবোধ্য কথায় জীবনের গভীরতম সত্যগুলির প্রকাশ যেখানে, সেখানে কথাগুলি অমৃতের ঝরণা হ'য়ে মানুষের আত্মার পিপাসা মেটানোর শক্তি রাখে। 'কথামৃত' শতবার পড়েও পুরানো হয় না। খ্রীষ্ট বলেছিলেন: My words shall never pass away. কথামৃত সম্পর্কেও সমভাবে একথা প্রযোজ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণে যে সত্যের ধ্বনি, রবীন্দ্রনাথে তারই প্রতিধ্বনি।

রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'তে স্বচ্ছসলিলা অফুরান ঝরণার কলধ্বনি! মানুষের আত্মার গভীরতম আকূতি সুললিত ছন্দে প্রকাশ পেয়েছে গীতাঞ্জলিতে। সেই কবিই কালজয়ী যাঁর সৃষ্টির মহিমা মানুষের প্রাণের গভীরতম দাবী মেটাবার ক্ষমতা রাখে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্য দিয়ে এমন একটি দিব্যভাবের সুরধুনী-ধারা কুলুকুলু ধ্বনিতে প্রবাহিত হ'চ্ছে যার মধ্যে আমাদের আত্মা পরম তৃপ্তি খুঁজে পায়।

"জীবন তো ক্ষণ-ভঙ্গুর। তা তোমার স্বাস্থ্য খুব ভালই হউক, অথবা খুব মন্দই হউক। হিন্দু বলেন, এ জীবন-সমস্যার একমাত্র সমাধান —ঈশ্বরলাভ। ধর্মলাভই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান। যদি ঈশ্বর ও ধর্ম সত্য হয়, তবেই জীবন-রহস্যের ব্যাখ্যা হয়, জীবনভারটা দুর্বহ হয় না, জীবনটা উপভোগ্য হয়। তাহা না হইলে জীবন একটা বৃথা ভারমাত্র।" এই

কথাগুলি স্বামী বিবেকানন্দের; 'মদীয় আচার্যদেব' গ্রন্থে আছে। কী গভীর একটা সার্বভৌম সত্য রয়েছে স্বামীজীর বাণীর মধ্যে!

এই সত্যই ছন্দোবদ্ধ রবীন্দ্র-কাব্যে। জীবন তো মুহূর্তের জন্যই! "কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন-যৌবন-ধন-মান।" পরিবর্তনের খর-স্রোতে নিমেষে নিমেষে সমস্ত কিছুই যেখানে ভেসে ভেসে যাচ্ছে সেখানে চিন্তাশীল মানুষের কাছে জগৎ তো বাজীকরের ভেল্কি ব'লে মনে হবেই। এই ভেল্কি নিয়ে তার আনন্দ করবারই বা কি আছে? আর গর্ব করবারই বা কি আছে?

কী ল'য়ে বা গর্ব করি
ব্যর্থ জীবনে।
ভরা গৃহে শূন্য আমি
তোমা বিহনে। (গীতাঞ্জলি)

জলবুদ্বুদের মধ্যে মানুষের অনন্ত আনন্দ কোথায়? চরম শান্তি কোথায়? নিমেষে নিমেষে সেখানে সবই ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, সেখানে ক্ষণভঙ্গুরের ছায়ায় কালে কালে দেশে দেশে মানুষের আত্মা এমন কিছুকে চেয়েছে যা সমস্ত পরিবর্তনকে অতিক্রম ক'রে আছে, সমস্ত পরিবর্তনের পশ্চাতে এবং অভ্যন্তরেও রয়েছে, যাকে পেলে আমরা আমাদের পরম কল্যাণকে লাভ করি, জীবন-রহস্যের একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাই, যা শূন্য তা অর্থে পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে এবং অস্তিত্বকে একটা দুর্বহ বোঝা ব'লে আর মনে হয় না।

'গীতাঞ্জলি'র গানে গানে এই চিরন্তন অমন-কিছুকে চাওয়ার সুরটী ছন্দোবদ্ধ ভাষায় ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে।

ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়,
তবু, জানো, মন তোমারে চায়!

ধনে জনে তো আত্মার চরম শান্তি নেই। ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ। 'রক্তকরবীর রাজা সোনার তাল জড়ো ক'রে ক'রে পাহাড় বানিয়েছে আর সেই পাহাড়ের চূড়ায় একটা নিদারুণ শূন্যতার মধ্যে দুঃখ ক'রে বলছে: "হায়রে, আর সব বাঁধা পড়ে, শুধু আনন্দ বাঁধা পড়ে না।" অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী রাজা কত রিক্ত, কত তপ্ত, কত ক্লান্ত! রাজা আনন্দকে বাঁধবে কেমন ক'রে? ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি। জীবনে যা ক্ষণ-ভঙ্গুর, যা ফুরিয়ে যায়, যা ভেল্কি, মায়া, বুদ্বুদ, 'শূন্যদিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা', তার মধ্যে মানুষের শাশ্বত সুখ থাকবার তো কথা নয়। ছায়া থেকে ছায়ার পিছু পিছু ছুটে ছুটে শুধু হয়রান হওয়ার দুর্বহ ক্লান্তিকেই রাজা মনের মধ্যে জমিয়ে তুলেছে! রাজার সমস্ত চিত্ত জুড়ে বিত্তের কামনা! ক্ষমতার কামনা! শূন্যের পর শূন্য যুক্ত হ'য়ে শূন্যের সংখ্যাই শুধু বেড়ে চলেছে। সেই শূন্যের প্রাচুর্যের মধ্যে রাজার মর্মের গুহা থেকে বেরিয়ে আসছে হতাশায় ভরা দীর্ঘশ্বাস। শূন্যের আগে এক রাখলে তবেই তো শূন্য দশ হয়ে যায়, হাজার হয়ে যায়, লক্ষ হ'য়ে যায়। রাজার চেতনার ক্ষেত্রে এই পরম একের কোন আসন নেই। নেই সেখানে ঈশ্বরলাভের ব্যকুলতা! নেই সর্বজীবে প্রেম! যা সীমিত, যা অল্প তার মধ্যে অনন্তকে, ধ্রুবকে, নিত্যকে চাওয়াই তো অবিদ্যা এবং এই অবিদ্যাই তো দুঃখের মূলে! অবিদ্যার অন্ধকারে শূন্য রাজা ভরা গৃহে কাঁদছে একটা দুঃসহ ক্লান্তির এবং রিক্ততার মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনের বাতায়নগুলিকে সবদিকেই খোলা রেখেছিলেন। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সকল দিক থেকেই আলো-হাওয়া ঢুকতো সেই বিরাট মনে। পশ্চিমের কত সেরা সেরা কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক,

দার্শনিক, চিন্তাবীর তাঁকে যুগিয়েছে নব নব ভাব-সম্পদ। তাঁদের বীণাধ্বনিতে, কণ্ঠধ্বনিতে রবীন্দ্রসাহিত্য মুখর হ'য়ে আছে। কিন্তু একথা নিশ্চয়ই আমরা বিস্মৃত হবো না যে, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনাবলী উপনিষদের ভাবধারায় অনুস্যূত হ'য়ে আছে। উপনিষদের ঋষিগণ সত্যকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। ভারতবর্ষের তপোবন হ'তে যে-প্রার্থনা ঊর্ধ্বে অবিরত উৎসারিত হয়েছে আত্মার একটি গভীরতম আকুতিকে বহন ক'রে, তা হ'চ্ছে—অসতো মা সদ্‌গময়। কালের দ্বারা, দেশের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন যা তাই তো অসৎ। যা উৎপত্তির পূর্বে ছিল না এবং ধ্বংসের পরে থাকবে না, যা এখানে আছে—সেখানে নেই, যা এই বস্তু এবং ঐ বস্তু নয়, তাই না অসৎ! এর বিপরীত হচ্ছে সত্য অর্থাৎ যা ছিল, আছে এবং থাকবে, যা সর্বব্যাপী এবং যা জীব-জগৎ সমস্ত কিছুই হয়েছে তাকেই শুধু সত্যের সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে। 'গীতাঞ্জলি'তে এই সত্যের জন্য একটা নিবিড় আকুতি ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে:

আর যা-কিছু বাসনাতে
ঘুরে বেড়াই দিনে রাতে
মিথ্যা সে-সব মিথ্যা, ওগো
তোমায় আমি চাই।

দেহসুখ, লোকমান্য, টাকা, পদমর্যাদা, ক্ষমতা—এদের প্রতি গভীর আসক্তিতেই তো টো-টো ক'রে দিবারাত্রি ঘুরছি ছায়া থেকে ছায়ার পিছনে! এদের পিছনে কবি অমন ক'রে ঘুরে বেড়াতে চান না। কারণ এরা মিথ্যা অর্থাৎ অসত্য অর্থাৎ কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, দেশের দ্বারাও। নচিকেতা কঠোপনিষদে যে-কারণে যমের প্রদত্ত রাজমুকুট, ঐশ্বর্য, নারী-মায়া ইত্যাদি পরিত্যাগ করেছেন ঠিক সেই কারণেই অর্থাৎ তাদের অনিত্যত্ব চিন্তা ক'রেই কবিও সমস্ত বাসনা হ'তে মুক্ত হতে চান!

তোমার আগুন উঠুক হে জ্বলে,
কৃপা করিও না দুর্বল ব'লে,
যত তাপ পাই সহিবারে চাই—
পুড়ে হোক ছাই বাসনা।

যে-হেতু ধন-জন-মান মিথ্যা, সুতরাং কবি মিথ্যার মধ্যে মিথ্যা হয়ে থাকতে রাজী নন। তাই বাসনাগুলো যাতে পুড়ে ছাই হ'য়ে যায় সেই জন্য কবি ব্যাকুল হ'য়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন। কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে একটিমাত্র প্রার্থনা: "ওগো, তোমায় আমি চাই।" কেন তোমায় আমি চাই? কারণ যে ধন-মানের বাসনাতে দিনে রাতে এখানে ওখানে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি তাদের মতো তুমি তো মিথ্যা নও, দুদিনে ফুরোবার নও। তুমি যে সত্য! সত্যকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করবার জন্য যুগে যুগে মানুষ যে অভিযানে বাহির হয়েছে, সে তো কলম্বাসের দুঃসাহসিক অভিযান। সেই অভিযানের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি হয় সব-পেয়েছির আনন্দ-লোকে পৌছানোর সফলতায় অথবা কূলহীন সমুদ্রবক্ষের অতলে সলিল-সমাধির ট্র্যাজেডিতে। মাঝামাঝি কোন পথ নেই। শ্যামও রাখবো, কূলও রাখবো, হৃদয়-আসনে ঈশ্বর এবং 'ম্যামন্' দু'য়েরই জায়গা থাকবে—আধ্যাত্মিক জীবনে এই দু'নৌকায় পা দিয়ে চলার চেষ্টা একেবারেই অচল। "তোমরা ঈশ্বর ও ধন-দেবতার সেবা একসঙ্গে করিতে পার না"—বাইবেল। Nature abhors a vacuum but God demands one, for He is a jealous God. প্রকৃতি পছন্দ করে না রিক্ততা; কিন্তু ভগবান দাবী করেন, আমরা নিজেদের একেবারে শূন্য ক'রে ফেলবো। কারণ আমরা শুধু তাঁকেই ভালোবাসবো,

এই তাঁর ইচ্ছা। এই জন্যই কবি প্রার্থনা করেছেন :

অমোঘ যে ডাক সেই ডাক দাও,
আর দেরি কেন মিছে।
যা আছে বাঁধন বক্ষ জড়ায়ে
ছিঁড়ে পড়ে যাক পিছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "সুতোর একটী ফেঁসো যতক্ষণ বেরিয়ে আছে ততক্ষণ সুতো তো ছুঁচের ফুটোর মধ্যে যাবে না।" বাসনার অণুমাত্র হৃদয়ে থাকতে ঈশ্বর অন্তরের মধ্যে ঢুকবেন না। খ্রীষ্টের সেই কথা : Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy strength and all thy mind. ষোলো আনা মন দিয়ে তাঁকে ভালোবাসতে হবে। ষোলো আনার এক কড়া-ক্রান্তিও কম নয়! সুতরাং কামনার যত বন্ধন আছে অক্টোপাসের মতো হৃদয়কে জড়িয়ে, সে সমস্তই 'ছিঁড়ে পড়ে যাক পিছে'। সত্যকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করবার সংকল্প থাকে তো মরিয়া হ'য়ে বেরিয়ে পড়তে হবে ত্যাগের দুর্গম রাস্তায় 'ম্যামনের' সঙ্গে সমস্ত কারবার চুকিয়ে দিয়ে। The spiritual life is a terrific and terrifying adventure. রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের শচীশ যেমন বলেছে : "যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার। আর কিছুতেই আমার দরকার নেই।"

মরে গিয়ে বাঁচবো আমি তবে
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।
সব বাসনা যাবে আমার থেমে
মিলে গিয়ে তোমারই এক প্রেমে,
দুঃখসুখের বিচিত্র জীবনে
তুমি ছাড়া আর কিছু না রবে।

(

জীবনে তুমি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না, সমস্ত মনটা তোমার চিন্তায় কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকবে, অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মতো অনুক্ষণ ঈশ্বর-চিন্তার একটা প্রবাহ বইতে থাকবে অন্তরের মধ্যে—একেই গীতার ভাষায় বলা হয়েছে "মন্মনা ভব"।

কবি তাই, "চাইগো আমি তোমায় চাই,
তোমায় আমি চাই"—

এই কথাটি ব'লেই ক্ষান্ত থাকেননি। শুধু তাঁকে চাই ব'ললেই তো পাওয়া যাবে না। সাধন চাই—স্মৃতি-সাধন। কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে, চোখের জল ফেলতে ফেলতে তাঁর কাছে যেতে হয়। তাই কবির পরের লাইনটিতে আছে :

"এই কথাটী সদাই মনে
বলতে যেন পাই।"

আমি তোমাকে চাই, শুধু তোমাকে চাই, আর কিছু চাইনে—এই কথাটি সর্বদা মনে বলতে পারাটাই তো বৈরাগ্য। আর 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।' বৈরাগ্যের দ্বারাই তো বায়ুর মতো চঞ্চল অবাধ্য মনকে তাঁর চরণপদ্মে নিস্পন্দিত করা সম্ভব। দিনরাত্রি চেতনায় শুধু ঈশ্বর-চাওয়াকে অনির্বাণ রাখা! মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ্ উইলিয়াম জেমস্ বলেছেন, The whole drama is a mental drama. সমস্ত নাট্য-লীলা তো একটা মানসিক ব্যাপার। The whole difficulty is a mental difficulty, the difficulty with an object of our thought. সমস্ত মুস্কিল তো মনের বাধা নিয়ে। আমরা যে-চিন্তাকে চেতনায় অম্লান দীপ্তিতে জ্বালিয়ে রাখতে চাই, বিপরীত চিন্তারাশি এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে মন থেকে সরিয়ে দেয়। আমাদের নৈতিক পদস্খলনের গোড়া একটা শুভ সংকল্পকে মনের মধ্যে ধরে না রাখতে পারার এই অক্ষমতায়।

ঈশ্বর-ভজনের অর্থ অনুক্ষণ ভাবনার দ্বারা তাঁর ভজনা। শুধু 'তোমায় চাই' বললে তো তাঁকে পাবো না। 'মামেবৈষ্যসি', আমাকে তুমি ঠিকই পাবে, to Me thou shalt come. এটা আমার একটা কথার কথা নয়। এ হচ্ছে আমার প্রতিশ্রুতি, this is My pledge and promise to thee. তবে একটা কথা। মন্মনা ভব। তোমার ষোলো আনা মন কিন্তু আমাকে দিতে হবে। তুমি যেমন আমার কাছে আসতে চাও আমিও তো তেমনি তোমার কাছে যেতে চাই। তুমি আমাকে ভালোবাসো, শুধু আমাকেই ভালোবাসো—এ যে আমি কত গভীর ক'রে চাই, তা যদি জানতে!

ঠাকুর বলতেন, "তুমি এক পা এগিয়ে গেলে ভগবান দশ পা আগিয়ে আসেন।"

যাঁর পদ-যুগ ঘিরে কোটী চন্দ্র-ভানুর নূপুর বাজছে, তিনি রাজ-রাজেশ্বর হয়েও শিশুর মতোই নম্র এবং মানুষের ভালোবাসা পেতে কতই না উৎসুক! যারা তাঁর বিদ্রোহী সন্তানদের মধ্যে সব চেয়ে একগুঁয়ে, তাদেরও তিনি জোর ক'রে নিজের দিকে ফেরাতে চান না। শুধু প্রেমের দ্বারাই তিনি তাদের জয় করতে চান। এই ভাবটিকে কত সুন্দর ভাষায় 'গীতাঞ্জলির' একটি গানে কবি প্রকাশ করেছেন:

তাই তো তুমি রাজার রাজা হ'য়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছো কত মনোহরণ বেশে,—
প্রভু, নিত্য আছো জাগি।

তুমি রাজার রাজা হয়েও আমার ভালোবাসার জন্য নিত্য অপেক্ষা ক'রে আছো! বিশ্বেশ্বর হ'য়েও তুমি অবতীর্ণ হ'য়েছো ভিক্ষাপাত্র হাতে ভিখারীর ভূমিকায়। সেই ভূমিকা নিয়ে তুমি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলে তোমার ঐ 'তারায় খচিত' অঙ্গদ-পরা হাত দু'খানি। আমিও তো ভিখারী হ'য়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে করতে চলিছি! ভিখারী হ'য়ে তোমাকে একটী মাত্র শস্যকণা দিলাম। ঘরে ফিরে পাত্র উজাড় করে দেখি, একটি সোনার চাল। হায়রে, সেই রাজভিখারীকে কেন সব দিলাম না? তবে তো সবই সোনা হ'য়ে ফিরে আসতো! এই মধুর ভাবটি কত নব নব ভঙ্গীতেই না রবীন্দ্রনাথের কবিতার পর কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে!

হাঁ, ভগবান ভক্তের ভালোবাসার কাঙাল! তিনি আমাদের দিকে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমরা বড়োজোর তাঁকে আমাদের ভালোবাসার এক আনা দিই। ষোলো আনা কেন দিতে পারিনে—এই নিয়েই তো কবির আক্ষেপ! তাই তো গীতাঞ্জলিতে কবি সমস্ত কামনার বোঝা কূলে ফেলে রেখে তাঁর সঙ্গে একতরীতে ভেসে যেতে চেয়েছেন। সেই তরীতে কোন বোঝা নেই, কেবল তুমি আর আমি!

ডাক রে আবার মাঝিরে ডাক,
বোঝা তোমার যাক ভেসে যাক,
জীবনখানি উজাড় ক'রে
সঁপে দে তাঁর চরণমূলে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।"

তাঁর চরণমূলে জীবন সঁপে দেওয়া, উজাড় ক'রে দেওয়া। I-ness and My-ness বলতে চেতনায় কিছু নেই। আমি ও আমার বোধ লুপ্ত হয়ে গেছে মন থেকে। আমার সমস্ত চেতনায় শুধু তুমি! আমার ভাবনার অণুপরমাণুতে অনুস্যূত হ'য়ে আছে কেবল তোমারই চিন্তা!

তুমি আমার অনুভাবে
কোথাও নাহি বাধা পাবে,
পূর্ণ একা দেবে দেখা,
সরিয়ে দিয়ে মায়াকে—
মনকে, আমার কায়াকে।
(গীতাঞ্জলি)

সত্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধির গিরিচূড়ায় আরোহণের জন্য মানুষের নিঃসঙ্গ আত্মার নিঃশঙ্ক অভিযানের চমকপ্রদ কাহিনী গীতাঞ্জলির গানগুলিকে একটি পরম সুষমায় ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ ক'রে রেখেছে। 'রাজা' নাটকের রাণী সুদর্শনার মতো কবির পথিক-আত্মা একাকী চলেছে চোখের জল ফেলতে ফেলতে, কঠিন পথ ভাঙতে আঁধার ঘরের রাজার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। দিব্য উপলব্ধির শিখরে পৌঁছানোর পথে প্রবলতম শত্রু তো অহঙ্কার। সেই অহঙ্কারের সঙ্গে কবির আত্মা অনবরত লড়াই করতে চলেছে। কবি নিঃসংশয়ে জেনেছেন, সত্যকে সাক্ষাৎ উপলব্ধির পথে যত মুস্কিল ঐ অহংকে নিয়ে। গীতাঞ্জলির প্রথম কবিতা তাই শুরু হয়েছে যাতে অহঙ্কার চলে যায় তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে :

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ-ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে॥

গীতাঞ্জলিকে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর পটভূমির সামনে রাখলে তাই মনে হয়, দক্ষিণেশ্বরে যে সত্যের ধ্বনি, তারই প্রতিধ্বনি গীতাঞ্জলিতে।

গীতাঞ্জলির প্রথম কবিতাতেই কবির আকুতিতে রয়েছে, 'যাচি হে তোমার চরম শান্তি।' মানুষের চরম শান্তি সত্যের মধ্যে সত্য হওয়ায়। যেখানে দুদিনের যা অর্থাৎ যা অসত্য তাকে সত্য মনে ক'রে ধ্রুব মনে ক'রে, শাশ্বত মনে ক'রে ছায়ার মধ্যে, তেজির মধ্যে অনন্ত আনন্দ খুঁজতে যাই আমরা, সেখানে মৃত্যুর জালে আমরা জড়িয়ে যাই। কারণ কামনার আর এক নাম মার। কামনা আমাদের আত্মাকে মারে। আমাদের চেতনায় সর্বক্ষণ রয়েছে অহং। এই আমি নিজ সম্ভোগে ব্যস্ত ; তার সমস্ত স্বপ্নজাল নিজেকে কেন্দ্র ক'রে। আমি আজ এতটা বিত্ত অর্জন করেছি, কাল আরও বিত্তের অধিকারী হবো। আজ এতটা ক্ষমতার অধিকারী হয়েছি, কাল বিপুলতর ক্ষমতাকে হস্তগত করবো। আরও বাড়ী, আরও গাড়ী, আরও যশ, আরও ক্ষমতা, মাথায় আরও মুকুটের উপরে মুকুট। আয়নার ঘরে বাস করছি—যেদিকে তাকাই আমি, আমি, আমি। এই যে আপনাকে ঘিরে ঘিরে অবিরাম কামনার জাল বুনে চলেছি—এ তো মৃত্যুজাল। এই মৃত্যুর মৃত্যু কোথায়? যিনি সত্য, যিনি অনন্ত জীবন, তাঁরই মধ্যে। তাই তো 'গীতাঞ্জলি'তে কবির বীণায় এই প্রার্থনাটি ধ্বনিত হয়েছে :

তোমায় দূরে সরিয়ে মরি
আপন অসত্যে।
কী যে কাণ্ড করি গো সেই
ভূতের রাজত্বে।
আমার আমি ধুয়ে মুছে
তোমার মধ্য যাবে ঘুচে,
সত্য, তোমায় সত্য হব
বাঁচব তবে—
তোমার মধ্যে মরণ আমার
মরবে কবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সত্যনারায়ণের মধ্যে সত্য হবার জন্য পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর তীরে পঞ্চবটীর নির্জনে কত কান্নাই না কাঁদলেন! উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে কেঁদে বলতেন :

মা, মা, তুই কি সত্যিই আছিস, তবে আমাকে কেন অজ্ঞানে ফেলে রেখেছিস? সত্য কি, আমাকে তা জানতে দিচ্ছিস না কেন—আমি তোকে সাক্ষাৎ দেখতে পাচ্ছি না কেন? লোকের কথা, শাস্ত্রের কথা, ষড়্দর্শন—এসব পড়ে-শুনে কি হবে, মা? এ সবই মিছে। সত্য—যথার্থ সত্য আমি সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করতে চাই। সত্য অনুভব করতে, স্পর্শ করতে চাই।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের' আগাগোড়া 'নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু' গম্ভীর নির্ঘোষে ধ্বনিত হচ্ছে। সত্যকে উপলব্ধির রাস্তায় অহংকার প্রবলতম শত্রু। গীতাঞ্জলিতে এই সুরই পাই—অহংকারের বিরুদ্ধে একটা সংগ্রামের সুর। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কতবারই কত উপমা দিয়ে কত বিচিত্র ভঙ্গীতে স্মরণ-মননের কথা বলেছেন! "স্মরণ মনন থাকলেই হোলো।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন প্রিয়নাথ মুখুয্যেকে: এগিয়ে পড়; চন্দন কাঠের পর আরও আছে। প্রিয়নাথের মুখে "আজ্ঞা, পায়ে বন্ধন—এগুতে দেয় না" শুনে ঠাকুর বললেন: পায়ের বন্ধন থাকলে কি হবে?—মন নিয়ে কথা। হাঁ, মন নিয়েই তো কথা। সর্বাবস্থায় সব কাজের মধ্যে মনটা তাঁতে তুলে রাখাটাই হোলো আসল কথা। যত মুস্কিল তো ঐ অবাধ্য মনটাকে নিয়ে! রবীন্দ্রনাথে ঠাকুরেরই প্রতিধ্বনি!

"মুখ ফিরায়ে রবো তোমার পানে
এ ইচ্ছাটি সফল করো প্রাণে।
কেবল থাকা, কেবল চেয়ে থাকা,
কেবল আমার মনটা তুলে রাখা
সকল ব্যথা সকল আকাঙ্ক্ষায়
সকল দিনের কাজেরই মাঝখানে

অথবা,

"একটী নমস্কারে প্রভু একটী নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক তব ভবন-দ্বারে।"

"যদি তোমার দেখা না পাই, প্রভু,
এবার এ জীবনে
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন
সেকথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।"

কবির এই গানের সুরেও শ্রীরামকৃষ্ণের "স্মরণ-মননের"-ই প্রতিধ্বনি!

কিন্তু ভগবানে, কেবলমাত্র ভগবানে আমরা যোলো আনা মন ঢেলে দিয়ে ভালোবাসবো শুধু তাঁকেই, "ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা প্রভু তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে"—এই যদি ভগবান চান এবং আমাদেরও প্রার্থনা এই হয় তবে মানুষের জন্য আমাদের ভালোবাসার অবশিষ্ট রইলো কি? তবে কি আমরা মানুষকে ভালোবাসবো না? Love the Lord thy God with all thy mind, যোলো আনা মন দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসো—এ তো সর্বশাস্ত্রের কথা। Love thy neighbour as thyself—মানুষকে ভালোবাসার এ কথাও তো সর্বশাস্ত্রের কথা। আর ভালোবাসা মানে যাকে ভালোবাসি কর্মে তার সেবা। মিল কোথায় এই আপাতবিরোধী শাস্ত্রবাক্যের মধ্যে? মিল,—ঠাকুরের শিববুদ্ধিতে জীবসেবার মধ্যে। ঠাকুর বলতেন, "মা-ই সব হয়েছেন—দুষ্টলোক পর্যন্ত, ভাগবত পণ্ডিতের ভাই পর্যন্ত।" "রামলালের মাকে বকতে গিয়ে আর পারলাম না। দেখলাম তাঁরই একটি রূপ।" বলতেন, "ছাখো দুষ্ট লোককে পর্যন্ত বাদ দিবার জো নাই। তুলসী শুকনো হোক, ছোট হোক,—ঠাকুরসেবায় লাগবে।" এই কথার

সঙ্গে বিবেকানন্দের কথাগুলি একবার পড়া যাক্: "জীবন্ত ঈশ্বরের সেবা কর। ঈশ্বর তোমার নিকট অন্ধ, খঞ্জ, দরিদ্র, দুর্বল বা পাপীর মূর্তিতে আসেন। তোমার জন্য উপাসনার কি চমৎকার সুযোগ!"

রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'তে সেই কথাই পাই—
"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে সবার নীচে,
সবহারাদের মাঝে।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "কাউকে বাদ দেবার জো নেই।" বিবেকানন্দ বলেছেন, বর্তমান জগতের সমক্ষে ঠাকুরের ঘোষণা এই, "কাহারও উপর দোষারোপ করিও না, কারণ সকল মত—সকল পথই ভালো।" রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই উদার সুরটিও ধ্বনিত হয়েছে, ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য স্বীকৃতি পেয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পাঠক-পাঠিকাদের সম্মুখে রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে এই একটিমাত্র নমুনা রেখে দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করি:

এসো হে আর্য, এসো অনার্য
হিন্দু মুসলমান।
এস এস আজ তুমি ইংরাজ,
এস এস খ্রীষ্টান।
এস ব্রাহ্মণ শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, করো অপনীত
সব অপমান ভার।

মানুষকে যিনি 'নরদেবতা' বলে নমস্কার করেছেন, তাঁর কাছ থেকে সর্বজীবে এই উদার প্রীতি ও শ্রদ্ধাই আমরা আশা করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণে যার ধ্বনি, রবীন্দ্রনাথে সেই সত্যেরই প্রতিধ্বনি।

অমৃতপথযাত্রী

শ্রীশুভেন্দু পালিত

যুগে যুগে, দেশে দেশে আবির্ভাব হ'য়েছে তোমার,
যখনই শোণিতসিক্ত, মসীলিপ্ত হ'য়েছে সংসার,
যতবার হিংসা দ্বেষ দিকে দিকে তুলিয়াছে মাথা—
তুমি আসিয়াছ এই ধরাধামে, ধরার বিধাতা!

বিভীষিকাময় সেই মেঘাবৃত, অন্ধকার রাতে—
একাকী ঘুরেছো তুমি দ্বারে দ্বারে দীপ ল'য়ে হাতে,
মানুষেরে ডাকিয়াছো আপনার কাছে ভালবেসে—
কভু যীশু, কভু বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ বেশে!

তোমার সে-ডাকে, জানি, দেয় নাই সাড়া সব লোকে
তোমাকে দেখেছে কেহ সকৌতুকে সন্দেহের চোখে,
কখনো বা নিজ মুখ মুখোসের অন্তরালে ঢাকি'
তোমার কোমল দেহে ক্ষতচিহ্ন দিয়াছে যে আঁকি!

তুমি করিয়াছ ক্ষমা, ডাকিয়াছ সবারে আদরে
পৃথিবীর পথে পথে বাক্যবাণ ক্রুশ তুচ্ছ করে!
আজিও তোমার যাত্রা চলিতেছে দেখি অবিরাম
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রভু! লহ আজ মোদের প্রণাম।

স্বামীজী-মানসে স্বদেশমন্ত্র

স্বামী জীবানন্দ

যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহতী ভবিষ্যদ্বাণী, তাঁর শিক্ষা দীক্ষা ও উপলব্ধি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে গভীর জ্ঞান, ইতিহাসে বিশেষ অভিজ্ঞতা, সংস্কৃত সাহিত্যে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি, শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের অলোকসামান্য জীবনালোকে নিজের জীবনগঠন, ভারতের সর্বত্র আসমুদ্রহিমাচল পরিভ্রমণ, জনসাধারণের ভাব-অভাব ও রীতিনীতি আলোচনা করবার বিশেষ যোগ্যতা, জগতের ধনী দরিদ্র সর্বশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা প্রভৃতি পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, তাঁর আবির্ভাব ভারত ও সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য।

সকলপ্রকার পার্থিব সুখ অগ্রাহ্য ক'রে তিনি জগতের বিশেষতঃ ভারতের কল্যাণের জন্য প্রাণপাত করতে কুণ্ঠিত হননি। স্বামীজী ছিলেন বিশ্বপ্রেমিক। আন্তর্জাতিকতা এবং বিশ্বপ্রেম বলতে যা বোঝায় স্বামীজীর মধ্যে তা পুরোপুরি বিদ্যমান ছিল। সমগ্র বিশ্বের কল্যাণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাভাব প্রচারের জন্য 'অখণ্ডের ঘর থেকে' যুগসন্ধিক্ষণে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। তাই সব দেশের মানুষই ছিল তাঁর কাছে অত্যন্ত আপনার জন, সকলের মধ্যে তিনি এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করতেন।

স্বামীজী বিশ্বপ্রেমিক হলেও বলেছেন আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্র ভারতের সর্ববিষয়ে উন্নতি হলেই সারা বিশ্বের কল্যাণ হবে; তাই তিনি আমাদের দিয়েছেন 'স্বদেশমন্ত্র'। স্বদেশ বলতে তিনি বুঝেছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষ, সেখানে প্রাদেশিকতার কোন স্থান নেই।

'মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্তিতঃ।' মন্ত্রের অদ্ভুত শক্তি ও অমিত প্রভাব, যা মনন করলে সমস্ত দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত মন্ত্র জপ করলে মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা সাধকের চিত্তপটে উদ্ভাসিত হন। নিরন্তর মন্ত্রজপে মন্ত্রচেতনা লাভ হয়, মন্ত্র জীবন্ত ভাস্বর হয়ে ওঠে। মন্ত্রের যিনি উদ্গাতা, তিনি ঋষি, তিনি সত্যদ্রষ্টা।

স্বদেশমন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা ভারতমাতা। ভারত বললে একটি দেশ—একটি অচেতন পদার্থ-বিশেষের কথাই সাধারণতঃ মনে আসে, যেমন ভূগোলে পড়া হয়ে থাকে। কিন্তু ভারত বলতে বিরাটরূপিণী চিন্ময়ী জননীর শাশ্বত-ঐতিহ্য-সমন্বিত ভাস্বর একটি রূপ উদ্ভাসিত হয়েছিল বিবেকানন্দ-মানসে। ভারতমন্ত্রের ঋষি সত্যদ্রষ্টা যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ও ধ্যাননেত্রে ভারতের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র সমুদ্ভাসিত হয়েছিল। ক্রান্তদর্শী স্বামীজী তাঁর অপূর্ব মনীষা, আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ঐতিহাসিক দৃষ্টি ও দার্শনিক প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন—ভারতের প্রাণ কোথায়, ভারতের মহত্ত্ব কেন, অতীতে ভারতের এত গৌরব কেন হয়েছিল, কেনই বা সেই গৌরব-রবি অস্তমিত হ'ল, বর্তমানে ভারতসন্তানদের কর্তব্য কি, কিভাবে ভারতের লুপ্ত গৌরব ফিরে আসবে এবং ভবিষ্যতের রূপ কি?

এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু 'স্বদেশমন্ত্র'। স্বদেশমন্ত্র আলোচনা করলে আমরা দেখতে

পাব, এর মধ্যে ভারতের সর্ববিধ উন্নতির সন্ধান রয়েছে, ভারতবাসীর চলার পথে অপূর্ব ও অভ্রান্ত পথনির্দেশ আছে। এই মন্ত্রের মননে ধ্যানে ও রূপায়ণে ভারতের লুপ্ত গরিমা ফিরে আসবে তাতে কোন সন্দেহই নেই; শুধু তাই নয়, স্বদেশমন্ত্রের সাধন প্রতিটি ভারতবাসী ঠিকঠিক করলে অতীত ভারতের থেকেও ভবিষ্যৎ ভারতের মহিমা আরও উজ্জ্বল হবে, ভারত নিঃসন্দেহে বিশ্বে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে।

স্বদেশমন্ত্রের দুইটি অংশ। প্রথম অংশে ভারতের দুরবস্থার কারণ, দ্বিতীয় অংশে কি করতে হবে, তাই বিবৃত হয়েছে।

ভারতের অবনতির কারণ ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা পর্যালোচনা ক'রে স্বামীজী হৃদয়ের গভীর বেদনা প্রকাশ করেছেন অনবদ্য ভাষায়। ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দেশপ্রেম, সৃষ্ট হয়েছে অনুপম সাহিত্য।

স্বদেশমন্ত্রের প্রথমেই ভারতবাসীর প্রতি যুগাচার্য স্বামীজীর সাবধান-বাণী :

"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা-সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?"

আমরা বড় হতে চাই, উচ্চাধিকার লাভ করতে চাই; কিন্তু বড় হতে গেলে, উচ্চাধিকার লাভ করতে হ'লে যে ধৈর্য, শক্তি, সাহস, বীর্য, প্রেম, ত্যাগ প্রয়োজন সে-সব আমাদের নেই; সে-সব লাভ করবার প্রচেষ্টাও আমাদের নেই। শুধু চালাকি ও ফাঁকির দ্বারা আমরা সব কিছু করায়ত্ত করতে চাই। কিন্তু স্বামীজী বলেছেন, "চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কার্য সম্পন্ন হয়। 'তদ্বা কুরু পৌরুষম্'।" যুগাচার্যের এই যুগবাণী আমরা স্মরণ করি না, কর্মে তার রূপায়ণ তো দূরের কথা! কারণ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য জলাঞ্জলি দিয়ে অপরের অনুকরণ-স্পৃহা, স্বাবলম্বী না হয়ে অন্যের উপর নির্ভর ক'রে থাকা আমাদের মজ্জায় মজ্জায় ঘুণ ধরিয়ে দিচ্ছে। তার উপর জাতীয় দুর্বলতা ও হিংসা-দ্বেষ! স্বামীজী বলেছেন, "যদি জগতে কিছু পাপ থাকে, তবে দুর্বলতাই সেই পাপ। সর্ব-প্রকার দুর্বলতা ত্যাগ কর—দুর্বলতাই মৃত্যু, দুর্বলতাই পাপ।" 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।'

স্বদেশমন্ত্রে স্বামীজী ভারতবাসীকে আহ্বান ক'রে কি করতে হবে তাই বলেছেন :

"হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী",

স্বামীজী বুঝেছিলেন ভারতের উন্নতির মূলে রয়েছে স্ত্রীজাতির অভ্যুদয়। কিভাবে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন করতে হবে সে-প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি :

"মেয়েদিগকে ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই, শরীর-পালন—এই সকল বিষয়ের স্থূল স্থূল মর্মগুলি আগে শেখাতে হবে।...আদর্শ নারীচরিত্র সব মেয়েদের সামনে ধরে বুঝিয়ে দিতে হবে।...যাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাদের ঘরেই বড়লোক জন্মায়।" 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি-যত্নতঃ।'

স্বামীজী চেয়েছেন ভারতে মেয়েরাও সর্ব-বিষয়ে ছেলেদের মতো যাতে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে তার সুব্যবস্থা। কিন্তু সর্বোপরি জোর দিয়েছেন পাতিব্রত্য ও সতীত্বের উপর।

তাই তিনি বলেছেন—'তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।' এঁরাই সতীত্বের মহিমোজ্জ্বল রূপ। স্বামীজী বলেছেন, "ভারতীয় রমণীগণের সর্বাপেক্ষা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা —পরমবিশুদ্ধস্বভাবা পতিপরায়ণা সীতার ন্যায় হওয়া।" "মহামহিমময়ী সীতা স্বয়ং শুদ্ধ হইতেও শুদ্ধতরা, সহিষ্ণুতার চরম আদর্শ!"

ত্যাগদীপ্ত নিঃস্বার্থ প্রেম অক্ষুণ্ণ রেখে মেয়েদের আধুনিক পাশ্চাত্য কার্যকরী শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। দেখতে হবে পাশ্চাত্য ভোগবিলাস ও আড়ম্বর তাদের যেন আদর্শচ্যুত না করে। স্বামীজীর মতে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি পুরুষ অপেক্ষা নারীর উপরই বেশী নির্ভরশীল। আদর্শ-সংঘাতের যুগে তাই সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর পুণ্যময় চরিত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে।

"ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর;"

ভারতের চিরন্তন আদর্শ ত্যাগ। ত্যাগের দ্বারাই অমরত্ব লাভ হয়। ত্যাগই ভারতের সর্বোচ্চ আদর্শ। সেই ত্যাগের মূর্তি হলেন শঙ্কর। জগতের সমস্ত বিষ গ্রহণ ক'রে তিনি নীলকণ্ঠ! কিন্তু বিতরণ করেন অমৃত! সব অশুভ অকল্যাণ দূর ক'রে দান করেন চরম কল্যাণ। নিজস্ব বলতে তাঁর কিছু নেই, কিন্তু ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও তাঁর কাছে তুচ্ছ। ইন্দ্রত্ব তুচ্ছ হলেও তাঁর এত ক্ষমতা যে ইন্দ্রত্বও তিনি দিতে পারেন। তিনি দেবাদিদেব মহাদেব, স্বয়ম্ভু। সকল দেবতা তাঁর শ্রীচরণে প্রণত।

স্বামীজী বলেছেন: "জগতে সর্বদাই দাতার আসন গ্রহণ কর। সর্বস্ব দিয়ে দাও, আর ফিরে কিছু চেয়ো না; ভালবাসা দাও, সাহায্য দাও, সেবা দাও; একটুকু যা তোমার দেবার আছে দিয়ে দাও, কিন্তু সাবধান, বিনিময়ে কিছু চেয়ো না।"

সর্বত্যাগী শঙ্কর সব দেন, কিন্তু কারও কছে কিছুরই প্রত্যাশী নন, তাই তিনি সকলের উপাস্য;

"ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়-সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে;"

স্বামীজী ভারতবাসীকে সচেতন হতে বলেছেন, তাদের যা কিছু ধনসম্পত্তি, শিক্ষা-দীক্ষা, স্বাস্থ্য বল, সমগ্র জীবনটি সকলের সেবার জন্য, নিজের ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের জন্য নয়। স্বামীজীর বাণী:

"জীবনের অর্থ উন্নতি, উন্নতি অর্থে হৃদয়ের বিস্তার; আর হৃদয়ের বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই জীবন, উহাই একমাত্র গতিনিয়ামক। আর স্বার্থপরতাই মৃত্যু, জীবন থাকিতেও ইহা মৃত্যু; আর দেহাবসানেও এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যুস্বরূপ।"

"ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু, সর্বভূতে
সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে,
এ সবার পায়।"

"ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র।"

আমরা সকলেই বিরাটরূপিণী মহামায়ার সন্তান। তাই চিন্তা ক'রতে হবে, যেদিন জন্ম হয়েছে সেই দিন থেকেই আমরা প্রত্যেকেই মায়ের জন্য উৎসর্গীকৃত। বিরাটরূপিণী জননীর শরীরের এক একটি পরমাণুতুল্য আমরা প্রত্যেকে। বিন্দুতে সিন্ধুর মতো অণুতেও বিরাট মহামায়ার ছায়া! মায়ের পূজায়, মায়ের

সেবায়, সমাজের আপামর সকলের কল্যাণে নিজেকে নিঃশেষে বলি দেওয়াতেই জীবনের সার্থকতা।

স্বামীজী বলেছেন: "সর্বশক্তিমত্তা, সর্বব্যাপিতা ও অনন্ত দয়া সেইজগজ্জননী ভগবতীর গুণ। জগতের যত শক্তি আছে, তিনি তার সমষ্টিস্বরূপিণী।...যদি পরম জ্ঞান ও আনন্দ চাও, তবে সেই জগজ্জননীর উপাসনা কর।"

"ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই!"

যারা সমাজে যুগ যুগ ধ'রে দলিত মথিত উপেক্ষিত, যাদের নীচ জাতি ব'লে ঘৃণা করা হয়, তারাও সমাজের অঙ্গ, তাদের সংখ্যাই বিপুল! তাদের ধমনীতে যে রক্তধারা প্রবাহিত, উচ্চশ্রেণীর মানুষের মধ্যেও সেই একই রক্ত, কোন পার্থক্য নেই। উচ্চশ্রেণী আর নিম্নশ্রেণী, সকলেই সেই জগজ্জননীর সন্তান, অতএব পরস্পরের সম্বন্ধ ভ্রাতৃভাবের। সকলে পরস্পর ভাই—এ সম্বন্ধ ভুললেই বিদ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা ও কলহ জাগে।

শরীরকে তখনই সুস্থ বলা যায়, যখন তার প্রত্যেকটি অঙ্গ নীরোগ থাকে। সমাজ-শরীর সম্বন্ধেও একই কথা। নীচু স্তরের জনসাধারণও সমাজ-শরীরের একটি অঙ্গ। যে-কোন অঙ্গ শক্তিহীন হলে সমস্ত দেহটাই পঙ্গু হয়ে যায়; তেমনি সমাজের নীচুস্তরের মানুষগুলির উন্নতি যদি ব্যাহত হয় তাহলে সমগ্র সমাজটিই পঙ্গুত্ব লাভ করে।

স্বামীজীর যুগোপযোগী নির্দেশ:

"উচ্চতম জাতি হইতে নিম্নতম 'পারিয়া' (চণ্ডাল) পর্যন্ত সকলকেই আদর্শ ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। বেদান্তের এই আদর্শ শুধু যে ভারতেই খাটিবে তাহা নহে, সমগ্র জগৎকে এই আদর্শানুযায়ী গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের ধর্মের ইহাই লক্ষ্য, ইহাই উদ্দেশ্য—ধীরে ধীরে সমগ্র মানবজাতি যাহাতে আদর্শ-ধার্মিক অর্থাৎ ক্ষমা-ধৃতি-শৌচ-শান্তি-উপাসনা- ও ধ্যান-পরায়ণ হয়। এই আদর্শ অবলম্বন করিলেই মানবজাতি ক্রমশঃ ঈশ্বরসাযুজ্য লাভ করিবে।"

"হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।"

তথাকথিত উচ্চ শিক্ষা লাভ ক'রে ভারতের অগণিত জনসাধারণের সঙ্গে স্বজনবোধ হারিয়ে অনেকের মনে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগে এবং নিজেদের ভারতবাসী "ব'লে পরিচয় দিতেও কুণ্ঠা ও লজ্জাবোধ হয়। এই দুর্বলতা কাটিয়ে সর্বদা সর্বাবস্থায় নিজেদের ভারতবাসী ব'লে গৌরববোধ করতে বলেছেন স্বামীজী। তিনি বলেছেন: "যদি উপনিষদে এমন কোন শব্দ থাকে, যাহা বজ্রবেগে অজ্ঞান-রাশির উপর পতিত হইয়া উহাকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে, তবে উহা 'অভীঃ'। যদি জগৎকে কোন ধর্ম শিখাইতে হয় তাহা 'এই অভীঃ', এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ ভয়ই পাপ ও অধঃপতনের নিশ্চিত কারণ।"

"বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই;"

শুধু উচ্চবর্ণের লোকদের নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি ভ্রাতৃভাব জাগরূক হলেই হবে না, নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিদেরও উচ্চশ্রেণীর প্রতি যেন ভ্রাতৃভাব জাগে। অর্থাৎ সকলেই যেন জাতিবর্ণনির্বিশেষে ভাবতে পারে—আমরা একই জগজ্জননীর সন্তান। অবশ্য প্রথমে

উচ্চশ্রেণীর লোকেরা যদি নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি প্রেমের বিস্তার দেখাতে পারেন, তবেই তাদের দিক থেকেও প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা আসবে এবং সকলে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে।

স্বামীজীর অগ্নিময়ী বাণী :

"দেশের ইতর সাধারণ লোককে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির কারণ। যতদিন না ভারতের সর্বসাধারণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, উত্তমরূপে খাইতে পাইতেছে, অভিজাত ব্যক্তিরা যতদিন না তাহাদের উত্তমরূপে যত্ন লইতেছে, ততদিন যতই রাজনীতির আন্দোলন হউক না কেন, কিছুতেই ফল হইবে না। যদি আমরা ভারতের পুনরুদ্ধার করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে তাহাদের জন্য কার্য অবশ্য করিতে হইবে।"

"তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী,"

ভারতের অধিকাংশ লোক দরিদ্র, তাদের পরনের কাপড়ও তেমন জোটে না, তাদের সঙ্গে একাত্মবোধ করতে হলে নিজেদের বসনভূষণের বিলাসিতা বর্জন করতে বলেছেন স্বামীজী। দেবদেবীর উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হতে হবে, ভারতের দেবদেবী একই ঈশ্বরের বিভিন্ন মূর্তি, 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' যে সমাজে জন্ম হয়, সেই সমাজেই শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য অতিবাহিত হয়; সমাজের সঙ্গে জীবনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সমাজ শৈশবকালে নিশ্চিন্ত আশ্রয়, যৌবনে আনন্দনিকেতন নন্দনকানন, বৃদ্ধাবস্থায় তপস্যার ক্ষেত্র। মানবজীবনের কল্যাণ সমাজের কল্যাণেই নিহিত।

"বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ;"

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'· জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গ অপেক্ষাও বড় দেশপ্রেমিক হতে হলে স্বদেশকে ভালবাসতে হয়, নিরন্তর স্বদেশের কল্যাণচিন্তা করতে হয়। প্রকৃত স্বদেশবৎসল মানুষের নিকট দেশের মাটি, প্রতিটি ধূলিকণাও পবিত্র। তিনি নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ভুলে কিসে দেশের মঙ্গল হবে, সেই চিন্তায় সদা নিরত থেকে স্বীয় চিন্তাধারাকে বাস্তব রূপ দিতে সচেষ্ট হন। তাঁর কাছে দেশের কল্যাণেই তাঁর নিজের কল্যাণ। তাই স্বামীজী দেশবাসীকে ভারতের কল্যাণচিন্তায় উদ্বুদ্ধ হতে বলেছেন।

"আর বল দিনরাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'"

প্রার্থনার শক্তি অমোঘ। তাই স্বামীজী প্রার্থনা করতে বলেছেন। বলেছেন—প্রার্থনা কর মনুষ্যত্ব, যা মানবজীবনের সর্ববিধ উন্নতির মূলে। মনুষ্যত্বের বোধ যেন লুপ্ত না হয়, মানুষ যেন পশুর মতো আচরণ না করে। আর দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর করবার জন্য জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করতে হবে। দুর্বলতা কাপুরুষতা থাকলে মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে না, মনুষ্যত্বের বিকাশ না হলে দেবভাব জাগবে না।

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'—'Arise, awake and stop not till the goal is reached'. আকাশে বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত স্বামীজীর সঞ্জীবনী বাণী এখনও

মানবহৃদয়ে স্পন্দন তুলবে, মানুষকে মহৎ কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে—'যতদিন না লক্ষ্যে পৌঁচাচ্ছ থামবার অবসর কোথায়? জাগো, মহাপ্রাণ! জাগো।'

বর্তমানে নানা আদর্শের সংঘাতে ও উচ্ছৃঙ্খলতায় সমগ্র ভারত জর্জরিত। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে গেলে প্রত্যেক ভারতবাসীকে, ভারতের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে দৈনন্দিন কর্মারম্ভের পূর্বে 'স্বদেশমন্ত্র' আবৃত্তি করতে হবে এবং কর্মে তার রূপায়ণের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। যদি আমরা নিজেদের এবং দেশের প্রকৃত কল্যাণ চাই তবে এই-ই একমাত্র এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পথ—'নান্যঃ পন্থাঃ'।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলার কয়েকটি আখ্যায়িকা

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী

"বাল্যলীলা শ্রীপ্রভুর গাইলে শুনিলে।
চির অন্ধজনে মন দিব্য আঁখি মিলে॥

বড়ই সুমিষ্ট কথা অমিয়পূরিত। *
বাল্যলীলা শুনে হয় মূর্খ সুপণ্ডিত॥"

বাংলার পরম রমণীয় প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে অবস্থিত পল্লী শ্রীধাম কামারপুকুর ও তার সন্নিহিত গ্রামগুলি ছিল ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাল্যলীলার পূত ক্ষেত্র। তাঁর মধুর বাল্যলীলার কয়েকটি আখ্যায়িকা এখানে উল্লেখ করা হল।

একদিন মায়ের কাছ থেকে মুড়ি-ভরা টুকি হাতে শিশুদের নিয়ে মাঠপথে গদাই চলেছেন খেলতে। খোলামাঠে আকাশে নবমেঘের দৃশ্য দেখে গদাধরের ভাবের আবেশ হল; তিনি মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বাহ্যজ্ঞান হারালেন, হাতের টুকিসুদ্ধ মুড়ি মাঠে ছড়িয়ে পড়ল। সাথীরা কিছুই বুঝল না, গদাইয়ের একি হল! কিছুক্ষণ বাদে গদাই সংবিৎ ফিরে পেলেন।

গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর ছেলেদের সঙ্গে গদাই সব সময়ে নানারকম খেলতে ভাল বাসতেন, কিন্তু তাঁর খেলা সাধারণ ছেলেদের মত মোটেই ছিল না। রাখালবালকদের সঙ্গে নির্জন প্রান্তরে বৃক্ষতলে কখনও ব্রজখেলা খেলতেন। রাখালবালকেরা কেউ হত সুবল, কেউ শ্রীদাম, আর গদাই হতেন কানাই বা রাধারাণী। একদিন মাথুর পালা তাঁরা করছেন সেই প্রান্তরের তরুতলে। গদাই রাধারাণী হয়ে আকুল চিত্তে 'কোথায় কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' বলে কাঁদছেন, চোখের জলে তাঁর বসন ও মাটি ভিজে গেল, এই অবস্থায় তিনি বাহ্য সংজ্ঞা হারালেন। রাখালবালকেরা ব্যস্ত হয়ে, কেউ রামনাম শুনাতে লাগল, কেউ বা তাঁর মুখে চোখে জল দিতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই তাঁর সংজ্ঞা ফিরে এল না। এমন সময়ে একটি বালক বুদ্ধি করে কৃষ্ণনাম শুনাতে লাগল। তাই শুনে গদাই চোখ মেলে চাইলেন, কিন্তু তখনও তাঁর মুখে কথা নেই, আকুল হয়ে কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় কৃষ্ণ বলে

* 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি' অবলম্বনে

হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন, তাঁর হাত দুটো ভাবের আবেশে কাঁপছে। রাখালবালকেরা কৃষ্ণ-নামের প্রভাব দেখে সমস্বরে কৃষ্ণনাম বলতে বলতে গরু নিয়ে তখন গদাই সহ গৃহে ফিরে এল।

এর আগে একদিন গদাই রাখালবালকদের সঙ্গে গোচারণ ভূমিতে আনন্দে নেচে নেচে মুড়ি খেতে খেতে চলেছেন, এমন সময়ে তাঁর ব্রজভাবের উদয় হল, আর তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। তা দেখে রাখালবালকেরা ভয়ে রামনাম করতে লাগল। সেই নাম শুনে গদাই আবার জ্ঞান ফিরে পেলেন। তখন রাখালবালকেরা ভয় পেয়ে তাঁকে বলল :

"গরু চরাইতে আর আনিব না তোরে।
একাকী থাকিয়ো তুমি আপনার ঘরে ॥"

শিশু গদাই যে শুধু মনুষ্যশিশুদের সঙ্গে খেলতেন তা নয়।

একবার মায়ের সঙ্গে মামাবাড়ী সরাইখাটায় (মায়াপুর) পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন, কখনও বা মায়ের কোলে। পথে এক জায়গায় গাছের তলায় কতকগুলো বানর দেখে, আহ্লাদিত হয়ে শিশু গদাই ছড়ি হাতে বানরদের তাড়া করতে গেলেন ; বানরেরা তখন তাঁকে আক্রমণ না করে শান্তভাবে তাঁর দিকে এগিয়ে এল, গাছের ডাল থেকেও কতকগুলি বানর নেমে এল, তখন শিশু গদাই বানরদের সঙ্গে একত্র নেচে নেচে খেলতে লাগলেন এই দৃশ্য দেখে মায়ের প্রথমে ভয় হলেও পরে বিস্ময়ের সৃষ্টি হল।

গদাই একটু বড় হয়ে সাথীদের নিয়ে যেখানেই ঈশ্বরীয় কথা, যাত্রা, ভাগবতপাঠ, কীর্তনাদি হত সেখানে যেতেন এবং নিবিষ্টমনে সে-সব আদ্যন্ত শুনতেন। তাঁর সঙ্গী বালকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্দার, গদাইয়ের যা ইচ্ছা বা আদেশ হত, তারা তাই আনন্দচিত্তে পালন করত। গদাই যে যাত্রাগান বা পাঠ শুনতেন, তা এত নিবিষ্টমনে শুনতেন যে, একবার শুনেই তা কণ্ঠস্থ করে ফেলতে পারতেন। তাঁর গানের গলাও ছিল খুব মধুর, আর খোল করতাল পর্যন্ত মুখে আশ্চর্য নকল করতে পারতেন। তার পরে একদিন সেই শিশু ভক্তদের নিয়ে গদাই অপূর্ব যাত্রাগান করতেন। সেই যাত্রাগানের সাজপোশাক অতি সাধারণ হত, বাইরের পোশাক অন্তরের পোশাক দিয়ে সজ্জিত হয়ে উঠত, এবং সজ্জাকারও ছিলেন স্বয়ং গদাই। গদাইয়ের সঙ্গে যাত্রাগান করে বালকেরাও মেতে উঠত। পাঠশালায় ভরতি হয়েও গদাই ছুটির পর পাঠশালার ছেলেদের নিয়ে যাত্রাভিনয় করতেন। সেই ছেলেরাও গদাইয়ের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে যাত্রা করতে মেতে গেল। গুরুমশাই গদাইয়ের যাত্রার সুখ্যাতি শুনে পাঠশালার মধ্যেই একদিন গদাইকে যাত্রাভিনয় করে তাঁকে শোনাতে বললেন। তখন গদাই মনের আনন্দে যাত্রাগান শুরু করলেন। সেই সময়ে

"আপনি করেন গান মুখে বাদ্য বাজে।
দুই হাতে দেন তাল পদদ্বয় নাচে ॥
গীত-বাদ্য নৃত্য আদি অতি পরিপাটি।
মাঝে মাঝে সং দেওয়া কিছু নাহি ক্রটি ॥"

এই দেব-প্রতিম শিশু গদাইয়ের যাত্রাভিনয় দেখতে ও তাঁর মুখে অমিয়-মাখা সুরের গভীর ভাবের ঈশ্বরবিষয়ক গান শুনতে গ্রামের বয়স্ক নর-নারীরাও নিজ নিজ কাজ ফেলে পাঠশালায় ছুটে আসতেন। গুরুমশাইও তাঁদের ন্যায় মনপ্রাণ দিয়ে গদাইয়ের এই বিচিত্র অভিনয় দেখে ও শুনে পুলকিত হতেন। কতক্ষণে গদাই পাঠশালায় আসবেন এই কথা ভেবে ছাত্র ও শিক্ষক সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন।

পাঠশালায় গুরুমশাই গদাইকে 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' পুঁথিখানা পড়াতেন। গদাই সেই বই পেয়ে সকালে বিকালে পড়ে বার কয়েক শেষ করে ফেললেন, শীঘ্রই সবটা তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে গেল। তারপর তিনি ঐ পুস্তক থেকে যে পাঠ করতেন তা এতই হৃদয়গ্রাহী হত যে, গ্রামের বয়স্ক নর-নারীগণও সে-পাঠ পরম আগ্রহভরে শুনতেন।

একদিন গদাইয়ের পাঠের সময় এক তাজ্জব দৃশ্য সবাই দেখলেন। মধু তাঁতির ঘরে গদাইয়ের প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ চলছে, তখন নিকটস্থ কোনও আমগাছ থেকে একটি হনুমান নেমে এসে পাঠকের চরণ ছুঁয়ে প্রণতি জানিয়ে পাঠ শুনবার জন্যে নিঃশব্দে সেখানে বসল। যতক্ষণ পাঠ চলল, ততক্ষণ গভীর মনোযোগ দিয়ে হনুমানটি পাঠ শুনল। পাঠ সমাপ্ত করে, পাঠক গদাধর পুঁথিখানা হনুমানের মাথায় ছোঁয়ালেন। তখন হনুমানটি পাঠকের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে আবার সেই আমগাছে উঠে গেল। কে এই হনুমান, কে এই বালক—এই সব চিন্তা করতে করতে বিস্মিত ও পুলকিত গ্রামবাসিগণ স্বগৃহে ফিরলেন

গদাই যখন যে দেবতার মূর্তি দর্শন করেন বা তাঁর কথা শুনেন বা পড়েন তখনই সেই-ভাব তাঁকে অধিকার করে। গৃহে কুল-দেবতা রঘুবীরের পূজার মালা গাঁথতে গাঁথতে ভাবে বিভোর হয়ে তিনি রাম নাম গাইতেন। অতি শৈশবে তাঁর পিতা যখন রঘুবীরের মন্দিরে রঘুবীরের পূজাকালে ধ্যানস্থ হয়েছেন, তখন শিশু গদাই এসে রঘুবীরের কণ্ঠের মালা নিজ কণ্ঠে ধারণ করে, নিজ দেহ চন্দন-চর্চিত করে পিতাকে ডাক দিয়ে বললেন, "দেখ, আমি কিরূপ রঘুবীর হয়েছি!

বড় হয়ে কোনও সময় গদাই রামের গান, কখন শ্যামাবিষয়ক গান তাঁর বীণানিন্দিত কণ্ঠে আপন মনে গেয়ে গ্রামের লোকদের প্রাণ জুড়িয়ে দিতেন। গ্রামের মহিলারা আদর করে এই বাল-গোপালসম গদাইকে নাড়ু প্রভৃতি সুখাদ্য তৈরি করে খাওয়াবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন!

গদাইয়ের অমিয়-মাখা কথাও তাঁর সুমধুর গান শুনতে এবং তাঁকে দেখতে তাঁরা সবাই আকুল হয়ে থাকতেন।

একদিন শিবরাত্রি উপলক্ষে কামারপুকুরবাসী সীতানাথ পাইন মশাইয়ের বাড়ীতে সারারাত শিবের পালা যাত্রাগান হবার আয়োজন হয়েছে; অনেক লোক সমবেত হয়েছেন; গদাইকে আসরে দেখবার জন্য তাঁরা খুব উৎসুক হয়ে বসে আছেন; অনেকক্ষণ পর গদাই শিবের বেশে, ব্যাঘ্র-চর্ম পরে, গায়ে ভস্ম মেখে, ত্রিশূল হাতে যখন আসরে এসে দাঁড়ালেন তখন লোকে গদাই বলে তাঁকে চিনতে পারল না; তিনি তখন গভীর শিবভাবে বিভোর। দেখতে দেখতে মহেশ্বরের মহাভাবের আবেশে তিনি বাহ্যজ্ঞান হারালেন আর তাঁর দুচোখ দিয়ে অশ্রুবন্যা বয়ে যেতে লাগল। এই শিবের ভাব তাঁর অনেকক্ষণ ধরে রইল। উপস্থিত লোকেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন; শুধু বৃদ্ধ শ্রীনিবাস শাঁখারী, যিনি আগেই গদাইয়ের স্বরূপ সঠিক চিনতে পেরেছিলেন, তাড়াতাড়ি বিল্বপত্র এনে, নৈবেদ্য-সংযোগে ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করে দিতেই তিনি চোখ মেললেন; তখন তাঁকে ধরে বাড়ী নিয়ে যাওয়া হল, যাত্রাগান সেদিন আর হল না; শোনা যায় যে ঠাকুরের ঐ মহাভাবের ঘোর তিন দিন পর্যন্ত সেবারে ছিল।

আর একবার গ্রামের কয়েকজন মহিলার সঙ্গে কামারপুকুরের অদূরে আনুড় গ্রামে

বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে গদাই চলেছেন। পথে যেতে যেতেই দেবীর ভাবে বালক গদাধর আবিষ্ট হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। যাঁরা তাঁকে সঙ্গে করে এনেছিলেন, তাঁরা তাঁর ঐ অবস্থা দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন; তখন লাহাদের বাড়ীর একটি মেয়ে গদাইয়ের কানে দেবীর নাম শুনাতেই তাঁর জ্ঞান ফিরে এল।

দেবপূজা বালক গদাধরের অতীব প্রিয় কাজ ছিল বলেই বোধ হয়, তিনি ছেলেবেলা থেকেই অদ্ভুত নিপুণতার সঙ্গে মাটির প্রতিমা গড়তে পারতেন। সেই প্রতিমা এতই সুঠাম ও ভাবব্যঞ্জক হত যে মনে হত দেবতা জাগ্রত হয়েছেন। সেই অপূর্ব মূর্তি গড়ে বালক গদাই সঙ্গীদের সঙ্গে আপন মনে প্রগাঢ় ভক্তির সহিত পূজা করতেন।

গদাই ছবি আঁকাও শিখেছিলেন চমৎকার। তাঁর আঁকা ছবি দেখে চিত্রকরও অবাক হয়ে যেতেন। তাঁর এই অদ্ভুত কুশলতার মূলে ছিল তাঁর অপার ভগবৎপ্রেম, যা ভগবৎ-বিষয়ক সব কাজে এনে দিত তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও যত্ন।

এই ভগবদ্ভক্তির প্রভাবেই শিশু গদাই 'সুবাহুর পালা' নামে একটি যাত্রার পালাও লিখেছিলেন। তাঁর শ্রীহস্তের সুন্দর অক্ষরে লেখা এই পুঁথিখানি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি-কার স্বচক্ষে দেখেছেন বলে পুঁথিতে উল্লেখ করেছেন।

বালক গদাই একবার আর এক আশ্চর্য কাজ করলেন। লাহাদের বাড়ীতে শ্রাদ্ধোপলক্ষে অনেক পণ্ডিতের সমাগম হয়েছে। হঠাৎ তাঁদের মধ্যে শাস্ত্রের কোনও কথা নিয়ে বিষম তর্ক উঠল, দুই দলের তর্কের মধ্যে মীমাংসা আর হয় না; এমন সময় গদাই সেখানে এসে পণ্ডিতদের তর্ক শুনে এক মুহূর্তে তার সুন্দর মীমাংসা করে দিলেন, তা শুনে পণ্ডিতেরা শিশুকে ধন্য ধন্য করে আশীর্বাদ করলেন। শুদ্ধা ভক্তি ও অগাধ ভগবৎ-বিশ্বাস-বলেই তিনি এই অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। এ-হেন বালক গদাই গ্রামের সকল লোকের সঙ্গে অতি প্রিয়জনের মত মিশতেন; তাঁর সুন্দর মূর্তি, মধুর ঈশ্বরীয় কথা, কীর্তন, গান, নাচ ও হাস্য-পরিহাসে সবাই খুব উৎফুল্ল হয়ে থাকতেন; তিনি যেখানে যেতেন সেখানে আনন্দের হাট বসত। অন্তঃপুরের নারীরাও এই বালক গদাধরকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তিনিও এ-বাড়ী ও-বাড়ী দিনের পর দিন কাটিয়ে সবাইকে অপার আনন্দ দিতেন।

বালক গদাই রঙ্গরসেও ছিলেন অদ্বিতীয়। একবার নারীবেশে বালক গদাই অন্তঃপুরে প্রবেশ করে মহিলাদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাক্যালাপ করেছিলেন, তাঁরা পর্যন্ত ধরতে পারেননি। এ ঘটনা ঘটেছিল সীতানাথ পাইনের বাড়ীতে। যখন ঠাকুরের মেজ ভাই তাঁর খোঁজে বেরিয়ে তাঁকে ডাকতে লাগলেন, তখন তিনি দাদার ডাকে সাড়া দেওয়াতে, সবাই জানতে পারলেন যে, ভিন্ন গ্রামের মহিলা-অতিথির বেশে স্বয়ং গদাই এতক্ষণ তাঁদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তখন বাড়ীর কর্তা সহ সকলেরই মধ্যে হাসির রোল পড়ে গেল।

দয়াল ঠাকুর গদাইয়ের নিকট গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অতি প্রিয় ছিলেন। তাঁর পৈতার সময় তিনি ধনীমাতার হাতে ছাড়া আর কারও হাতে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন না, এই হল সপ্তমবর্ষীয় বালক গদাইয়ের জিদ। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী কোন ব্রাহ্মণ-বংশীয়া রমণীর হাত থেকেই ভিক্ষা নেওয়ার নিয়ম; গ্রামের ব্রাহ্মণ রমণীরা গদাইকে ভিক্ষা দিতে সবাই ব্যগ্র হয়েছিলেন

কিন্তু গদাই কারও কথা শুনলেন না। তিনি বললেন যে, ধনী কামারনী ভিক্ষা না দিলে তিনি ভিক্ষাই গ্রহণ করবেন না। এই বলে তিনি ঘরের দরজাতে খিল দিয়ে বসে থাকলেন। সকলের প্রাণাধিক গদাই ঘরে অভুক্ত হয়ে আছেন দেখে গ্রামের কারও সেদিন আহার করতে ইচ্ছে হল না। এমন সময় ঠাকুরের অগ্রজ রামেশ্বর এসে যখন বললেন যে গদাইয়ের ইচ্ছানুযায়ী ধনী কামারনীর ভিক্ষাই সে গ্রহণ করুক, এতে বংশের অসম্মান হবে না, তখন গদাই দরজা খুলে বেরিয়ে এসে ধনী কামারনীর কাছ থেকে ভিক্ষা নিলেন। বালকবেশী জগন্নাথের নিকট সকল মানুষই সমান, সেদিন গদাই তা নীরবে ঘোষণা করলেন।

ঠিক এই ভাবের বশবর্তী হয়ে গদাই তাঁর পরম ভক্ত বৃদ্ধ চিনু শাঁখারীকে ধন্য করেছিলেন। চিনু একদিন গদাইয়ের গলায় মালা পরাবার জন্য পরম ভক্তিভরে মালা গেঁথে, মিষ্টান্নভোগ সহ গদাইয়ের শ্রীচরণে নিবেদন করলেন, তার পর সেই মালা তাঁর গলায় পরিয়ে নিজের হাতে সেই মিষ্টান্ন গদাইকে খাওয়াতে শুরু করলেন; ভাবের আবেগে চোখের জলে দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে এই পরমভক্ত বৃদ্ধ মিষ্টান্নসহ তাঁর হাত আবেশে গদাইয়ের মুখে গালে মাথায় ঠেকাতে লাগলেন। তখন গদাই তাঁর হাত ধরে তাঁর হাতের খাবার তাঁর মুখে দেওয়াতে লাগলেন।

এই বৃদ্ধ চিনু শাঁখারী গদাইকে প্রথম থেকেই চিনেছিলেন, তাই যখন বালকদের নিয়ে যাত্রার দল করে এ-গ্রামে সে-গ্রামে যাত্রা করতে গদাই যেতেন তখন বালকদের মধ্যে মহা উৎসাহে চিনুও যোগ দিতেন। ঠাকুরের পবিত্র সঙ্গ সারাক্ষণ পাবার জন্যই বোধ হয় বৃদ্ধ এরূপ করতেন।

আর একবার খেতির মা নামে এক দরিদ্র তাঁতির ঘরের রমণীর খুব ইচ্ছা হলো নিজে হাতে এই দেব-শিশু গদাইকে খাওয়াবেন; কিন্তু নিম্নজাতীয়া বলে মনের ইচ্ছা মনেই চেপে রাখেন। অন্তর্যামী গদাই তাঁর মনের কথা বুঝতে পেরে একদিন নিজেই খেতির মায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে যেচে তাঁর হাতের খাবার খেয়ে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সব মধুর, পরম মঙ্গলদায়ক কথা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিতে পড়লে পুঁথির পরম ভক্ত রচয়িতার নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হতে থাকে—

"ধরি নর-কলেবর মায়ায় মোহিত।
রামকৃষ্ণ শ্রীপ্রভুর বিচিত্র চরিত॥
শ্রবণ-কীর্তনে নাশে মায়ার বন্ধন।
স্মরণে মননে হয় তাপ বিমোচন॥"

সমালোচনা

Swami Premananda : Teachings and Reminiscences. প্রকাশক : বেদান্ত প্রেস, ১৯৪৬ বেদান্ত প্লেস, হলিউড, ক্যালিফর্নিয়া ৯০০২৪, আমেরিকা। স্বামী প্রভবানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত। পৃষ্ঠা ১৫৭; মূল্যের উল্লেখ নাই।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ত্যাগী সন্তান ও লীলাসহচর স্বামী প্রেমানন্দের বাণীর সংকলন, পাঁচ জন সন্ন্যাসী ও দুই জন গৃহীর স্মৃতিচারণ, তাঁহার গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে যথাক্রমে ২টি, ৮টি ও ১টি এবং জনৈক গৃহী ভক্তকে লিখিত ১টি চিঠি আছে। ভূমিকাতে Olive Johnson স্বামী প্রেমানন্দের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াছেন।

স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহার উদার চরিত্র, দেবদুর্লভ পবিত্রতা, নিঃসীম প্রেম, ঐকান্তিক সেবা, চরম ত্যাগ ও পরম বৈরাগ্যের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে একটি মহাজীবনের মৃত্যুঞ্জয় দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বজনীন ধর্মের সার্থক ও উদ্দীপ্ত অনুরণন আমরা পাই তাঁহার বাণী ও শিক্ষাতে যাহা এই গ্রন্থে সুষ্ঠুরূপে সংকলিত হইয়াছে। আর পাই শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তাঁহার অনন্যা ভক্তি এবং অভেদ দৃষ্টি। স্বকীয়তাবর্জন সাধনে তিনি সফলতার শীর্ষে উঠিয়াছিলেন। তাই আমরা দেখি তাঁহার জীবন ছিল সম্পূর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণময়। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সেবাধর্মের তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ প্রবক্তা। স্মৃতিচারণে স্বামী প্রেমানন্দের প্রেমঘন মূর্তিটি অতি সুস্পষ্টরূপে প্রকট হইয়াছে। গুরুভাইদিগকে লিখিত পত্রগুলি হইতে তাঁহাদের প্রতি তাঁহার অকপট ভালবাসা প্রতি ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটি চিঠিতে (স্বামী অভেদানন্দকে) স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের বিস্তৃত বর্ণনা আছে বলিয়া উহা নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান দলিল। আর শেষ পত্রে পাই শ্রীসারদাদেবীর জীবনের একটি ভাবসমৃদ্ধ প্রোজ্জ্বল মূল্যাঙ্কন।

ইংরেজী-ভাষাভাষী পাঠকপাঠিকাদের নিকট গ্রন্থটি সমাদৃত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

স্বামী বীতশোকানন্দ

নিবেদিতা লোকমাতা (প্রথম খণ্ড) শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৯। পৃঃ ৭৭৬+২৪। মূল্য—৩০্ টাকা।

সম্প্রতি প্রকাশিত অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'নিবেদিতা লোকমাতা' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থ থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, জর্মান-গবেষকসুলভ অতন্দ্র অনুসন্ধিৎসা এবং ভারত-সংস্কৃতিজাত বিশাল মনঃপ্রেরণা বাংলাদেশ থেকে এখনও লুপ্ত হয়ে যায়নি। এই বিশাল মহাগ্রন্থের আত্মপ্রকাশ আধুনিক বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অস্তিত্ব ঘোষণা করল। শঙ্করীপ্রসাদ বসু নিবেদিতার যে ভাবমূর্তি নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করলেন, সেই পরিশ্রম-সাধ্য কর্মের জন্য শুধু ধ্যাননিষ্ঠ সাধনাই নয়, তার জন্য প্রয়োজন ছিল ক্ষত্রোচিত পৌরুষ-বীর্য। এই গ্রন্থরচনায় সেই ব্রাহ্মণ্য-ধ্যানলীনতা এবং

ক্ষত্রিয়ের কর্মৈষণার আশ্চর্য সংশ্লেষণ লক্ষ্য করা যাবে। লোকমাতার মর্ত্য ও দিব্যজীবনের এ-হেন মহাকাব্য রচনা করে লেখক যে-সারস্বত পুণ্য অর্জন করেছেন এবং পাঠককেও তার অংশভাগী করেছেন, তার জন্য ভাবীকালের ইতিহাস-দেবতা তাঁকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবেন।

নিবেদিতার প্রবল প্রচণ্ড মাতৃস্নেহ এবং প্রচণ্ডতর বীরাঙ্গনার মূর্তি বিশ্বের এক বিচিত্র বিস্ময়। দেশকালের সীমা লঙ্ঘন করা প্রবল মনুষ্যত্বের লক্ষণ, এবং বিপরীত বিষয়ের মধ্যে মাতৃস্নেহের অচ্ছেদ্য বন্ধনরজ্জু স্থাপন নারী-চরিত্রের লক্ষণ। নিবেদিতা সেই মনুষ্যত্ব ও নারীত্বের এক অপূর্ব সমন্বয়। তাঁর সেই প্রবল মাতৃধর্ম, যা কোনও দিন জাতি-পংক্তি বিচার করে না, যাতে শুচি-অশুচির ভেদাভেদ নেই, সেই সর্বসহিষ্ণু দেশকালাতীত elemental মাতৃত্ব—তাকে অজস্র চরিতার্থতার মধ্যে সার্থক করে তুলতে সাহায্য করেছিলেন তাঁর অধ্যাত্ম গুরু ও জনক স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ এই আইরিশ কন্যাকে কীভাবে ভারতের লোকমাতায়, সেবিকায় পরিণত করলেন, কীভাবে ভাঙলেন, গড়লেন—তার কথা নিবেদিতা নিজেই বলে গেছেন। শঙ্করীপ্রসাদ দীর্ঘকালের সাধনায় সেই অপূর্ব মাতৃকামূর্তির জীবন্ত চিত্রাঙ্কন করেছেন। ইতিপূর্বেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গবেষণায় স্নাতকত্ব লাভ করেছেন ; নিবেদিতার পুণ্যশ্লোক জীবনকথার প্রথম খণ্ড রচনা করে তিনি এবার হলেন উত্তর-স্নাতক।

'নিবেদিতা লোকমাতা'র প্রথম খণ্ডটিকে লেখক চারটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পর্বে বিভক্ত করেছেন : (১) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা, (২) মৃত্যুরূপা কালী, (৩) পূর্বজীবন, (৪) ভগিনী নিবেদিতা ও ডঃ জগদীশচন্দ্র বসু। শেষোক্ত পর্বে মূলতঃ জগদীশচন্দ্র ও নিবেদিতার বিষয়ে আলোচনা প্রাধান্য পেলেও প্রসঙ্গক্রমে লেখক নিবেদিতার সঙ্গে ওলি বুল, ম্যাকলাউড, অবলা বসু, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও রমেশচন্দ্রের সম্পর্ক বিষয়েও অনেক বিচিত্র রহস্য উদ্ঘাটিত করেছেন। এই অংশে নিবেদিতা ও দীনেশচন্দ্র সেন-সংক্রান্ত আলোচনাও স্থান পেতে পারত। দীনেশচন্দ্রকে ইংরেজীতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায় উৎসাহিত করে, রচনাদি নিত্য সংশোধন করে দিয়ে, আলাপ-আলোচনায় দীনেশচন্দ্রের রসদৃষ্টিকে প্রসারিত করতে সাহায্য করে নিবেদিতা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিরও মহদুপকার করেছেন। শঙ্করীপ্রসাদ প্রকাশিতব্য দ্বিতীয় খণ্ডে এই সম্পর্কে আলোচনা করলে এক নতুন দিকে নিবেদিতার প্রভাব দৃষ্টিগোচর হবে।

এই গ্রন্থের যে-দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তাতে স্বদেশী ও বিপ্লবী আন্দোলন, সাহিত্য-শিল্পকলা, সমাজসেবা ও নারীশিক্ষা, দেবেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ-সরলাদেবী এবং একালের নানা মনীষীর সঙ্গে নিবেদিতার সংযোগ ও সম্পর্ক বিষয়ে লেখক অনেক নতুন ব্যাপার বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে অভিজ্ঞতার আলোকে নিয়ে আসবেন বলেছেন। লুই বার্ক যেমন আমেরিকায় বসে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাত তথ্য উদ্ধার করে বিশ্বসংস্কৃতির এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন, অধ্যাপক শঙ্করী-প্রসাদ বসুও সেইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সংস্কৃতির নতুন দিগন্ত আবিষ্কারে সমস্ত প্রয়াসকে কেন্দ্রীভূত করেছেন। 'নিবেদিতা লোকমাতা' সেই প্রয়াসের প্রথম অর্ঘ্য। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটির জন্য পাঠকচিত্ত কতটা কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

একজন অপরিমিতশক্তি নারীকে (যিনি মূলতঃ কেল্টিক-শোণিতজ) কেন্দ্র করে এই শতকের গোড়ার দিকে বাংলা ও বাংলার বাইরে সমাজ-শিক্ষা-সংস্কৃতি-সেবাধর্মের যে বিচিত্র বিকাশ দেখা গিয়েছিল, এত দিন তার অনেক কথাই মূক হয়েছিল। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শঙ্করী-প্রসাদ সেই মৌনকে মুখর করে তুললেন।

লিজেল রেমঁ-র ফরাসী ভাষায় লেখা নিবেদিতার জীবনীটি শ্রীমতী নারায়ণী দেবী বাংলায় অনুবাদ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন ১৯৫৫ সালে। তার কিছু পরে প্রব্রাজিকা মুক্তি-প্রাণার লেখা নিবেদিতার বাংলা জীবনী এবং প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণার লেখা ভগিনীর ইংরেজী জীবনী প্রকাশিত হলে জনসাধারণ নিবেদিতা-সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তারও অনেক আগে ১৯৪০ সালে গিরিজাশঙ্কর রায়-চৌধুরী 'উদ্বোধনে' যখন শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে ধারা-বাহিক প্রবন্ধ লিখছিলেন, তখন স্বদেশী ও গুপ্ত-আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা পাঠককে চমৎকৃত করেছিল, কেউ কেউ-বা এর তথ্যপ্রামাণিকতা সম্বন্ধে কিছু সংশয়ীও হয়েছিলেন। অতঃপর আসন্ন নিবেদিতা শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে অনুসন্ধিৎসু ও অনুরাগীদের কৌতূহল এই সম্পর্কে নানা তথ্য-সন্ধানে ও উৎস-আবিষ্কারে সজাগ হয়ে উঠল। আমাদের লেখক, যিনি অনেক দিন ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সংক্রান্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিয়ে গবেষণা করছিলেন, তিনি নিবেদিতা-তীর্থপরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে শ্রীমৎ অনির্বাণের কাছ থেকে তিনি নিবেদিতার প্রায় পাঁচশ সংগ্রহ করলেন। তাঁরই আনুকূল্যে শঙ্করীপ্রসাদ লিজেল রেমঁ-র কাছ থেকে আরও কতকগুলি মূল্যবান চিঠি পেলেন। এই দুর্লভ দলিল তাঁকে নিবেদিতার বিষয়ে নতুন পথের সন্ধান দিল। প্রাসঙ্গিক আরও নানা তথ্য ও সূত্র থেকে তিনি প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করলেন এবং নিদারুণ পরিশ্রমকে একাজের বেতনস্বরূপ গ্রহণ করে তিনি এক মহীয়সী নারীর অপাপবিদ্ধ জীবন-কথাকে গ্রন্থাকারে গ্রন্থন করলেন।

'নিবেদিতা লোকমাতা'র প্রথম খণ্ড থেকে দেখা যাচ্ছে, লেখক অজস্র উপাদান ব্যবহার করেছেন, সংবিন্যাস করেছেন, এক তথ্যের সঙ্গে অপর তথ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করেছেন—যা একাধারে বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও ঐতিহ্যের এক অপরূপ বিশ্বকোষে পরিণত হয়েছে। যে গ্রন্থের শুধু চিঠি ও দিনলিপির ফটোস্টাট পৃষ্ঠাসংখ্যাই চল্লিশোর্ধ্ব, যাতে দুষ্প্রাপ্য সাময়িকপত্র ও দুর্লভ গ্রন্থের মূল পৃষ্ঠার ফটোলিপিও প্রচুর, সে গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য ও তথ্যসমৃদ্ধির প্রাচুর্য ব্যাখ্যান করা নিষ্প্রয়োজন। তিনি নিবেদিতার জীবনকথাকে চারিটি পর্বে বিভক্ত করে বহির্জীবন, অর্জিতজীবন, অন্তর্জীবন ও কুলধর্মকে যে-সমস্ত তথ্যস্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার বিপুলতা ও পৃথুল কলেবর যে-কোন 'সহজিয়া' পাঠকের ভীতি-উৎপাদনে সক্ষম। এই বস্তু ও তথ্যপুঞ্জকে মন্থন করে নিবেদিতার চিত্তস্বরূপ আবিষ্কার করা যথার্থই ভৌগোলিক আবিষ্কারের মতোই রোমাঞ্চকর, দেশজয়ের মতো উদ্দীপনাময়, আত্মোপলব্ধির মতো শান্তরসাস্পদ।

এই খণ্ডের শেষ পর্বটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পর্বে লেখক নিবেদিতার সঙ্গে কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তির সম্পর্কের কথা নানা তথ্য থেকে সংগ্রহ করেছেন এবং তার যথাযথ মূল্য বিচার করেছেন। জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক ও সংযোগ সম্পর্কে

অসংখ্য পত্র ও দিনলিপি থেকে তিনি যেভাবে তথ্য সঙ্কলন করেছেন তাতে তাঁকে যে-কোন প্রথম শ্রেণীর আবিষ্কারকের পাশে স্থান দেওয়া যেতে পারে। বড়ই পরিতাপের বিষয় বাংলা-দেশ এখনও সত্যদ্রষ্টা বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের একখানিও নির্ভরযোগ্য জীবনী রচনা করতে পারেনি। অসহ্য মানসিক নির্যাতন শিরোধার্য করে অদ্ভুত বীর্যের সঙ্গে এই ধ্যানমগ্ন বিজ্ঞান-সাধক সংগ্রাম করে গেছেন এবং শত বাধাকে অপসারিত করে বিজ্ঞানলক্ষ্মীর আশীর্বাদী মাল্য শিরে ধারণ করেছেন—তার পিছনে ছিল নিবেদিতার উৎসাহ, উপদেশ, উদ্দীপনা, সহযোগিতা। নিবেদিতা তাঁর সমস্ত স্নেহবাৎসল্য যেন এই বয়োজ্যেষ্ঠ পুত্রকল্প সাধকের ওপর উজাড় করে দিয়েছিলেন। সেই মানসিক সংগ্রামের ইতিহাস আজকালকার ক'জন বৈজ্ঞানিকই-বা জানতে উৎসাহী হন? বসু-বিজ্ঞানমন্দিরের দ্বারপ্রান্তে লগ্ন দীপধারিণী নারী-মূর্তিটিই যে নিবেদিতার প্রতিরূপ, শঙ্করীপ্রসাদ অভ্রান্তভাবে তা প্রমাণিত করেছেন। 'Lady of the Lamp' জগদীশচন্দ্রকে অন্ধকারের মধ্যে জ্বালিয়ে রাখতে নিত্য উৎসাহ দিয়েছেন সেই অকথিত ইতিহাস এতদিন পরে শঙ্করীপ্রসাদের চেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করল। নিবেদিতা-জগদীশচন্দ্র-সংক্রান্ত এই সমস্ত নতুন তথ্য ভারতের বিজ্ঞান-সাধনার ইতিহাসেও নির্ভরযোগ্য দলিল হিসেবে স্থান পাবে। অন্য তিনটি পর্বে লেখক যে সমস্ত তথ্য উদ্ধার করেছেন বিশেষজ্ঞ-মহল তার কিছু কিছু জ্ঞাত আছেন। কিন্তু এই চতুর্থ পর্বটি যেন অন্ধকারের মধ্যে একটি অম্লান দীপশিখা। ইতিপূর্বে এই বিষয়ে আমাদের ধারণা ছিল ভাসা-ভাসা। লেখক এদিক থেকে প্রায় অসাধ্য সাধন করেছেন।

অনেক সময় দেখা যায়, গবেষণাকর্মে তথ্য-ভার পাষাণভার হয়ে সহৃদয় পাঠকের সরস পাঠস্পৃহাকে বিরস করে তোলে। এ ধরনের সাহিত্যকর্মে অনেক মূল্যবান ও জ্ঞাতব্য ব্যাপার থাকে বটে, কিন্তু তা অনেক সময়েই হৃদয়বেদ্য সারস্বত রসবস্তু হয়ে উঠতে পারে না। শঙ্করী-প্রসাদ বসু দুরূহ তত্ত্ব ও লতাজটিল তথ্যের অজস্রতাকে সরস লেখনীর সাহায্যে মানসিক আরামে পরিণত করেছেন। এজন্য শুধু পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছ থেকেই নয়, আমাদের মতো 'দুর্মেধস্' ব্যক্তিদের কাছ থেকেও তিনি অকুণ্ঠ সাধুবাদ লাভ করবেন। এ বিশাল মহাগ্রন্থ বাঙালীর নিত্য-পঠনীয় গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করবে, এ বিশ্বাস আমাদের সুদৃঢ়। এটি সর্ব-ভারতীয় অনুচিন্তনের ক্ষেত্রে ভাষান্তরের মধ্য দিয়ে ব্যাপক প্রচার লাভ করুক, যে-কোন সৎপাঠক এ গ্রন্থ পাঠের পর তাই কামনা করবেন। শ্রীমতী লুই বার্কের 'Swami Vivekananda in America—New Discoveries' যেমন বিবেকানন্দ সম্বন্ধে নতুন চিন্তা ও গবেষণার দ্বার খুলে দিয়েছে, তেমন শঙ্করী-প্রসাদের 'নিবেদিতা লোকমাতা' নিবেদিতাকে কেন্দ্র করে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও নব্য-ভারতীয় সাধনা-সংস্কৃতির নতুন দিগন্ত বিভাসিত করেছে। চিঠিপত্র, ডায়েরি, পুরাতন গ্রন্থ, সাময়িক পত্রের দুর্দর্শন ও কৌতূহলোদ্দীপক অজস্র আলোকচিত্রসহ শোভন-আকারে গ্রন্থটিকে নৈবেদ্যস্বরূপ প্রকাশ করে প্রকাশকও একটি মূল্যবান কর্তব্য সম্পাদন করেছেন, এ জন্য তাঁরাও জাতির ধন্যবাদের পাত্র। শঙ্করীপ্রসাদ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদে অমিত শক্তির অধিকারী হয়ে নিবেদিতা-তীর্থপরিক্রমার দ্বিতীয় খণ্ডটি দ্রুত রচনা করুন, আমরা সমস্ত অন্তর দিয়ে এই কামনা করি।

—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ৬ই ফাল্গুন ১৩৭৫ (১৮. ২. ৬৯), মঙ্গলবার শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৪তম পুণ্য জন্মতিথি উৎসব মহানন্দে ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে মঙ্গলারতি, উপনিষদ্-আবৃত্তি, উষাকীর্তন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা, হোম এবং দশাবতারের পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীকালীকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রায় ৮,০০০ ভক্ত নরনারী বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন।

অপরাহ্নে স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বামী বুধানন্দ ইংরেজীতে এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সভাপতি মহারাজ বাংলায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যজীবন অবলম্বনে সুচিন্তিত ও হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন।

স্বামী গম্ভীরানন্দজী বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুধু পথপ্রদর্শক নহেন, পথিকৃৎ; নবীনকে বরণ করিয়া লইয়া তিনি নবযুগের নবজীবনের পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। ভগবানলাভকে জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া মানবতার ভিতর দিয়া তাঁহার চরণস্পর্শ করিবার কথা তিনি বলিয়া গিয়াছেন। স্বামী বুধানন্দের বক্তৃতার বিষয় ছিল 'যোগসহায় শ্রীরামকৃষ্ণ'। তিনি বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছোট-বড়-পাপী-পুণ্যবান-নির্বিশেষে ভগবানলাভের পথে সকলকেই সহায়তা করিয়া গিয়াছেন; যেখানে যে আটকাইয়া গিয়াছে, সেখানেই তিনি তাহাকে আলো দেখাইয়াছেন, তাহার পথের বাধা অপসারণ করিয়াছেন। (শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত ভাষণটি এই সংখ্যায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।)

সারাদিন সহস্র সহস্র ভক্ত মঠে আগমন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণচরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন।

রাত্রে শ্রীশ্রীদশমহাবিদ্যার পূজা, শ্রীশ্রীকালীমাতার বিশেষ পূজা ও হোম হয়। রাত্রিশেষে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ১০ জনকে সন্ন্যাসব্রতে এবং ১৬ জনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন।

জন্মতিথি উৎসবের পরবর্তী রবিবার ১১ই ফাল্গুন (২৩. ২. ৬৯) বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরের পূর্বদিকে নির্মিত এক মণ্ডপে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি সুবৃহৎ প্রতিকৃতি ও তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সজ্জিত ছিল। প্রায় ২৫,০০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। মাইকযোগে সঙ্গীত, আবৃত্তি, কথকতা, পাঠ ইত্যাদির এবং মঠ ও মন্দির-প্রাঙ্গণে কীর্তনাদির ব্যবস্থা ছিল। সন্ধ্যারতির পর বাজি-পোড়ানো হয়। এই দিন মঠে প্রায় এক লক্ষ ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবা: উদ্বোধনের গত ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত জানুআরি, ১৯৬৯ বন্যার্তসেবাকার্যে বিতরিত দ্রব্যাদির পরিমাণ ছাড়া উক্ত বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদিও বিতরণ করা হইয়াছে:

গুড়া দুধ ১,০৮৫ কেজি, বেবি-ফুড ৬ টিন,

বাসনপত্র ২,১০৯টি, কৃষি-সরঞ্জাম ৪৯৯টি, কম্বল ১০০ খানি, ধুতি ও শাড়ী ১৫ খানি, পুরাতন বস্ত্রাদি ১,২৬৮ খানি। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—১৩,৮৩৭।

মণ্ডলঘাটে পানীয় জলের জন্য ৭টি নলকূপ বসানো হইয়াছে।

জলপাইগুড়ি জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে বিভিন্ন গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কম্যুনিটি হল এবং আরও টিউবওয়েল নির্মাণের কাজ গ্রহণ করা হইয়াছে।

মেদিনীপুরে বন্যার্তসেবা: গত ডিসেম্বর, ১৯৬৮ এবং জানুআরি, ১৯৬৯ রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক মেদিনীপুর জেলায় সবং ও ময়না থানার বন্যার্ত জনগণের মধ্যে ১২,১৩৭ কেজি চাল ও ১১,১১৬ কেজি গম বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—২২,৫৯৩।

গুজরাটে বন্যার্তসেবা: গুজরাটে বন্যার্তগণের পুনর্বাসনের জন্য মিশন কর্তৃক কুটীরনির্মাণকার্য সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হইতেছে।

ছাত্রদের কৃতিত্ব

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের (আবাসিক) ছাত্রগণ অন্যান্য বছরের মতো এবারও ভারত সরকারের মেধাবৃত্তি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গের মোট ২৩টি বৃত্তির মধ্যে এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১১টি বৃত্তি লাভ করিয়াছে।

উৎসব-সংবাদ

ফরিদপুর: রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যনির্বাহক সমিতির উদ্যোগে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ১০৫ তম জন্মতিথি বিগত ১১ই জানুআরি (২৭শে পৌষ) শনিবার যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রত্যুষে আশ্রম-পরিচালিত মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীগণ মোটর-বাসযোগে ভজন গাহিয়া সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। সকালে পূজা, চণ্ডীপাঠাদি অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচশতাধিক নরনারী খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন।

৩১শে জানুআরি বিকালে অনুষ্ঠিত সভায় রায় বাহাদুর বিনোদলাল ভদ্র (সভাপতি), ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী (প্রধান অতিথি), এবং ডাঃ ননীগোপাল সাহা স্বামীজীর জীবনদর্শন আলোচনা করেন। সভায় পাঁচশতাধিক নরনারী উপস্থিত ছিলেন। সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীসুধীররঞ্জন চক্রবর্তী।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৪তম জন্মোৎসব পূজা, পাঠ, ভজন ও সভানুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে নিম্নলিখিত আশ্রমগুলিতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে:

মেদিনীপুর: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ১৮ই ফেব্রুআরি সন্ধ্যায় অধ্যাপক বিনয়কুমার সেনগুপ্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ২২শে শ্রীদুর্গাদাস তরফদার সঙ্গীত-সহযোগে কথকতা করেন, পরে চলচ্চিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন প্রদর্শিত হয়। ২৩শে দুপুরে প্রায় সাড়ে চার হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। এইদিন আয়োজিত সভায় স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ (সভাপতি), স্বামী নিত্যানন্দ ও স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সভান্তে 'প্রবীরার্জুন' অভিনীত হয়।

দেওঘর: রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে ১৮ই ফেব্রুআরি প্রত্যুষে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি লইয়া শহরপরিক্রমা করা হয়। সন্ধ্যায় আয়োজিত সভায় ডাঃ বি. কে. সুর (সভাপতি), স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ ও বিদ্যাপীঠের কয়েকজন ছাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন আলোচনা করেন। ১৯শে

নারায়ণসেবায় প্রায় ১২০০ জন নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

কোয়ালপাড়া: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যোগাশ্রমে ১৮ই হইতে ২১শে ফেব্রুআরি প্রত্যহ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদির ব্যবস্থা ছিল। ১৮ই অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় স্বামী গদাধরানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। ২২শে তারিখ দুপুরে ছয় সহস্রাধিক নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোচনা, শ্রীসুধীর চৌধুরীর রামায়ণগান ও রাত্রে প্রতিমায় শ্রীশ্রীকালীপূজা হয়।

দিল্লী: গত ২৩শে ফেব্রুআরি নিউদিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সাধারণ ধর্মসভায় ভারত রাষ্ট্রের সহ-রাষ্ট্রপতি শ্রীভি. ভি. গিরি সভাপতিত্ব করেন।

স্বামী জ্ঞানস্বরূপানন্দ, স্বামী প্রশান্তানন্দ ও স্বামী অঘোরানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের তিনজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ-সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি:

স্বামী জ্ঞানস্বরূপানন্দ (মণীন্দ্র মহারাজ) গত ২রা ফেব্রুআরি ১৯৬৯ ভোর ৪টা ৪৫ মিনিটের সময় কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠানে ৬৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বহু বৎসর যাবৎ তিনি ডায়েবেটিসে ভুগিতেছিলেন। গত ৩১শে জানুআরি তাঁহার 'কোমা' হওয়ায় তাঁহাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভরতি করা হয়। ক্রমশঃ তাঁহার অবস্থা অবনতির দিকে যাইতে থাকে এবং অবশেষে তিনি চিরশান্তি লাভ করেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন; ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের নিকট তাঁহার সন্ন্যাস-দীক্ষা হয়। বেশ কিছুকাল তিনি পুরী মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন।

স্বামী প্রশান্তানন্দ (ঋষি মহারাজ) গত ৩রা ফেব্রুআরি রাত্রি ৮-১০ মিনিটের সময় মেদিনীপুর জেলার চকজয়কৃষ্ণ নামক স্থানে জনৈক ভক্তগৃহে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পুরাতন আমাশয় রোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার ৭৮ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন।

তিনি মেদিনীপুর জেলার বালিচক নামক স্থানে আশ্রম করিয়াছিলেন এবং সেখানেই থাকিতেন।

স্বামী অঘোরানন্দ (গণেশ মহারাজ) গত ২৩শে ফেব্রুআরি বিকাল ৫টার সময় কলম্বো রত্নম্ প্রাইভেট হাসপাতালে ৭০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার 'ডায়েবেটিক কোমা' হইয়াছিল।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডা-নন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। কলম্বো ব্যতীত তিনি বোম্বাই, বেলুড় মঠ, রাজকোট, পনাম্‌পেট প্রভৃতি আশ্রমে নিযুক্ত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ করিয়াছিলেন।

এই সন্ন্যাসিত্রয়ের আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদ-পদ্মে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

বাবুগঞ্জ, হুগলী : 'বিবেকানন্দ ভারতী'র উদ্যোগে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতার ৭৫তম বর্ষের স্মরণোৎসব ১৯৬৮র ১১ই ও ১৫ই সেপ্টেম্বর, অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৫ই তারিখ সভায় স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ (সভাপতি), শ্রীদিলীপকুমার সিংহ ও শ্রীসোমনাথ চট্টোপাধ্যায় স্বামীজীর বাণী আলোচনা করেন।

শিকড়া-কুলিনগ্রাম : রামকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দ আশ্রমে গত ৫ই মাঘ স্বামী ব্রহ্মানন্দ জন্মোৎসব পূজা, পাঠ, তীর্থপরিক্রমা, ভজন প্রভৃতির মাধ্যমে সুসম্পন্ন হইয়াছে। অপরাহ্নে ধর্মসভায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর জীবনালোচনা করেন। পরে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। রাত্রে শ্রীশ্রীকালীপূজা হইয়াছিল।

খিদিরপুর : 'সুরবিতানে' বিভিন্ন দিনে শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

খেপুত : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে পূজা, পাঠ, প্রসাদবিতরণ, কথকতা, কীর্তন ও ধর্মসভার মাধ্যমে গত ১২. ১২. ৬৮ তারিখে শ্রীশ্রীমায়ের এবং গত ১৮. ২. ৬৯ তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

রসুলপুর (বর্ধমান) : স্বামীজী মিলন পাঠাগারে গত ১১ই জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামীজীর জীবনালোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্তী (সভাপতি), শ্রীতারাপদ মোদক ও শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দেব। একটি প্রদর্শনীও আয়োজিত হইয়াছিল।

বড়-আন্দুলিয়া (নদীয়া) : লোক-শিক্ষা শিবিরে গত ২৬শে ফেব্রুআরি আটদিন-ব্যাপী 'গদাধরের মেলা'র উদ্বোধন দিবসে আয়োজিত সভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ (সভাপতি) ও মৌলভী রেজাউল করিম (প্রধান অতিথি) শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী আলোচনা করেন।

আরারিয়া (পূর্ণিয়া) : শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ২৭শে ফেব্রুআরি হইতে ১লা মার্চ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সভা কীর্তনাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আলোচনা-সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী মিত্রানন্দ।

আশ্রমে একটি ছাত্রাবাস, লাইব্রেরী ও দাতব্যচিকিৎসালয় আছে। দাতব্যচিকিৎসালয় হইতে গত বৎসর ৩৭,৮৭০ জন রোগীকে ঔষধ বিতরণ করা হয়।

দশঘরা : পূর্বপাড়া বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে গত ২রা মার্চ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। স্বামীজীর বাণী ও রচনা হইতে পাঠ ও আবৃত্তি, ভজন, সভা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। স্বামী বীরানন্দ (সভাপতি) ও জনৈক শিক্ষক স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করিয়া যুবকগণকে স্বামীজীর আদর্শে আকৃষ্ট করেন। সভায় চারিশতাধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

চাঁদপুর : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১লা হইতে ৪ঠা জানুআরি পর্যন্ত কল্পতরু-উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রথম তিন দিন যথাক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনালোচনা করেন শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী, ঢাকার স্বামী দয়ানন্দ, শ্রীবিমল বোস ও ব্রহ্মচারী সুকুমার। চতুর্থ দিনে মহোৎসবে প্রায় ৭ হাজার ব্যক্তি প্রসাদ গ্রহণ করেন।

নৌকায় আন্দামান অভিযান

গত ১লা ফেব্রুআরি, ১৯৬৯ খৃঃ জর্জ আলবার্ট ডিউক ও শ্রীপিনাকীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় কলিকাতার 'ম্যান-অব-ওয়ার' জেটি হইতে একখানি দাঁড়টানা নৌকাযোগে আন্দামান যাত্রা করেন। 'কনোজি আংরে' নামক নৌকাটি দৈর্ঘ্যে ২০ ফিট, চওড়ায় ৫ ফিট; কোন ইঞ্জিন বা পাল ছিল না। রাস্তায় প্রয়োজনীয় খাদ্যপানীয়াদি এবং একটি বেতার-প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্র মাত্র সঙ্গে লইয়া দাঁড় টানিয়া সমুদ্রের বুকে প্রায় একহাজার মাইল পাড়ি দিবার জন্য অসীমসাহসী এই যুবকদ্বয় অভিযান শুরু করেন।

গত ৫ই মার্চ বিকাল ৫ টায় তাঁহারা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের উত্তর দিকের প্রথম দ্বীপ ল্যাণ্ড ফল-এ উপনীত হন। সেখান হইতে পোর্ট ব্লেয়ারে পৌছান ৮ই মার্চ। পোর্ট ব্লেয়ার হইতে ডিউক ও পিনাকী বিমানযোগে কলিকাতায় পৌছান ১১ই মার্চ পৌনে একটার সময়।

এই বীর যুবকদ্বয় যাত্রাকালে কলিকাতা, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি স্থানে এবং অভিযানে সাফল্যলাভের পর ল্যাণ্ড ফল হইতে শুরু করিয়া যেখানেই গিয়াছেন সর্বত্র বিপুলভাবে সংবর্ধিত হইয়াছেন। কলিকাতায় পৌছিবার দিন দমদম বিমান বন্দরে তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল।

এই ধরনের অভিযান এশিয়ায় এই প্রথম এবং বিশ্বে দ্বিতীয়। কলিকাতা এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের সভাপতি শ্রীমিহির সেন কর্তৃক এই অভিযানটি পরিকল্পিত ও পরিচালিত হয়।



দিব্য বাণী

কিং জ্যোতিস্তব ভানুমানহনি মে রাত্রৌ প্রদীপাদিকং
স্যাদেবং রবিদীপদর্শনবিধৌ কিং জ্যোতিরাখ্যাহি মে।
চক্ষুস্তস্যনিমীলনাদিসময়ে কিং ধীর্ধিয়ো দর্শনে
কিং তত্রাহমতো ভবান্ পরমকং জ্যোতিস্তদস্মি প্রভো! ॥১

একশ্লোকী—(শঙ্করাচার্য)

'যাহা কিছু দেখিতেছ, কোন্ সে জ্যোতির বলে, কিসের বিভায়
বল দেখি, প্রকাশিত হয়ে থাকে দিনমানে অথবা নিশায়?'
"দিনমানে সূর্য আর নিশাকালে চন্দ্র-দীপ-আদি আলো দিয়া
নিখিলের বস্তুচয়ে উদ্ভাসিত করি দেয় প্রকাশ করিয়া।"
'কোন্ জ্যোতিবলে তুমি দেখ সূর্যে, দেখ দীপাদিরে জ্যোতির্ময়?'
"চক্ষুর জ্যোতিতে দেখি। (দৃষ্টিশক্তি না থাকিলে প্রকাশ না পায়
কোন কিছু কারো কাছে শুধুমাত্র দীপাদির আলোর প্রভায়।)"
'চক্ষু যবে নিমীলিত (স্বপ্ন-চিন্তা-ধ্যানাদিতে) কোন্ জ্যোতিবলে
বিষয় প্রকাশ পায় (সূক্ষ্মাকারে ভেসে ওঠে তব চিত্ততলে)?'
"বুদ্ধি করে প্রকাশিত।" 'বুদ্ধি হয় প্রকাশিত কাহার বিভায়?
(প্রকাশ-শকতি তার সঞ্জীবিত হয় কোন্ জ্যোতির ধারায়?)'
"সে পরম জ্যোতি 'আমি'; আপনিও তাই, প্রভু!" ('আমি'-বোধ রূপ
চৈতন্যজ্যোতিই মাত্র প্রকাশিত করে এই বিশ্ব অপরূপ।
চৈতন্যবিহীন কোন স্থূল সূক্ষ্ম দেহ কিম্বা পদার্থের কাছে
কোন বোধই জাগে নাকো কোনখানে কোন কিছু নেই কিম্বা আছে।
স্বপ্রকাশ এ চৈতন্য; ইহারই জ্যোতিতে ফোটে সর্ব ভাব রূপ;
ইহাই পরম ব্রহ্ম—তুমি আমি সবাকার ইহাই স্বরূপ।)

কথাপ্রসঙ্গে

অধিকারবাদ, অস্পৃশ্যতা ও জাতিবিভাগ

আমাদের ধর্ম বলিতেছে, আমাদের সকলের মধ্যে একই ভগবান রহিয়াছেন। তিনিই আমাদের স্বরূপ। শুধু আমাদের নয়, বিশ্বের সবকিছুরই। এই পরম একত্বই চরম সত্য। এই সত্য উপলব্ধি করানোই আমাদের ধর্মের লক্ষ্য। মানুষে-মানুষে যে ভেদ আমরা দেখি, তাহা আসল মানুষটিকে দেখিতে পাই না বলিয়া; তাহার দেহ-মন-বুদ্ধিকেই আসল মানুষ ভাবিয়া সেগুলির বিভিন্নতাকেই আমরা আসল মানুষটির উপর চাপাই। এ যেন বিবিধ প্রকারের ও বিবিধ বর্ণের পোশাক পরা মানুষকে বিবিধ প্রকারের মানুষ বলিয়া ভাবা—পোশাকের ভেদ মানুষের উপরই চাপানো। আমাদের ধর্মের লক্ষ্য মানুষকে এই ভেদজ্ঞানের ঊর্ধ্বে তুলিয়া একত্ববোধে পৌছাইয়া দেওয়া। আমাদের ধর্মের মূল ভিত্তি বেদান্ত তাই বলিতেছেন, এই একত্বরূপ সত্য সর্বদা স্মরণে রাখিয়া ইহার উপলব্ধির পথে অগ্রসর হইবে—"এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্ম-সংস্থম্‌…ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌, ১।১২)—'ভোক্তা জীব, জীবের উপভোগ্য এই জগতের সব কিছু এবং পরমেশ্বর—সত্যদ্রষ্টাগণকর্তৃক উক্ত এই ত্রিবিধ বস্তুর সবই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে; জানিবে এই ব্রহ্মই তোমার স্বরূপ' (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়, ঈশ্বর শুদ্ধবোধস্বরূপ এবং আমাদের সকলেরই স্বরূপ)। এই একত্ববুদ্ধি লইয়াই অগ্রসর হইবে, কোনওরূপ ভেদবুদ্ধি আনিও না, কারণ ভেদজ্ঞান মৃত্যুর পথ—"নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥" (কঠোপনিষদ্‌ ২।১।১১)—'ব্রহ্মে অণুমাত্রও ভেদ নাই; যে ইহাতে ভেদদর্শন করে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুর পথেই অগ্রসর হয়।'

সব মানুষই যে সমান, ভগবানই বা আমিই যে সকলের মধ্যে রহিয়াছি, বেদান্তোক্ত এই সত্য উপলব্ধির জন্য, এই অভেদজ্ঞানে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য স্মৃতি বা পুরাণ মানুষকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া শ্রেষ্ঠ সম্মান দিতে বলিতেছেন; বলিতেছেন, এরূপ না করিয়া, ভগবানকে 'সর্বভূতস্থঃ' না ভাবিয়া, কেবল প্রতিমায় তিনি রহিয়াছেন জানিয়া সেখানে তাঁহার পূজা করা বৃথা—"যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্‌। হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥" "মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহু মানয়ন্‌। ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥" (শ্রীমদ্ভাগবত, ৩।২৯।২২ ও ৩৪)—'আমি ঈশ্বর, আমি সর্বপ্রাণীর আত্মা হইয়া রহিয়াছি; সেই সর্বপ্রাণীতে আমাকে অবহেলা করিয়া যে কেবল প্রতিমায় আমার পূজা করে, তাহার সে পূজা ভস্মে আহুতি দেওয়ার তুল্য বিফল হয়। ঈশ্বরই সর্বজীবে অন্তরাত্মারূপে প্রবিষ্ট আছেন ইহা জানিয়া সর্বজীবের চরণে সর্বদা মনে মনে প্রণতি জানাইবে, তাহাদিগকে সর্বদা বহু সম্মান প্রদান করিবে' (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়, জীবে শিবজ্ঞান করিবে)।

মহাসাম্যের এই জয়গান আমাদের ধর্ম মানবজাতির ইতিহাসে সর্বপ্রথম গাহিলেও,

মানুষকে এরূপ বিপুল সম্মান দিলেও, অদৃষ্টের কি পরিহাস, স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেই ধর্মের নামেই আমরা মহাভেদবুদ্ধি আনিয়াছি—ধর্মের নামেই একজন অপরজন অপেক্ষা অধিক অধিকার দাবী করিয়াছি, এবং একজন মানুষকে অপরজন হইতে এত অধম বলিয়া ভাবিয়াছি যে তাহার স্পর্শও অধর্ম বলিয়া গণ্য !

স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলিয়াছেন, "আমাদের ধর্মে মহা সাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্যে মহাভেদবুদ্ধি।" তাঁহার ব্যাথাতুর চিত্ত এই ভেদবুদ্ধিকে 'পৈশাচিক' ও 'নারকীয়' আখ্যা দিয়াছে। স্বামীজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়াছেন, ধর্মের সঙ্গে ভেদবুদ্ধিসঞ্জাত বর্তমান জাতিপ্রথা, অধিকারবাদ ও অস্পৃশ্যতাকে আমরা মিশাইয়া ফেলিলেও এগুলির কোনটির সহিতই ধর্মের কোন সংস্রব নাই, স্বার্থসিদ্ধির জন্যই আমরা এগুলি ধর্মের নামে চালাইতেছি, এ সবই স্বার্থান্বেষীদের সমাজ-ব্যবস্থার ফল—"হিন্দুধর্মের ন্যায় আর কোন ধর্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা ঘোষণা করে না, আবার হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিকভাবে গরীব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্মই এরূপ করে না। ভগবান আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে ধর্মের কোন দোষ নাই "হিন্দুধর্মের কোন দোষ নাই, হিন্দুধর্ম তো শিখাইতেছে সকলেই তোমার আত্মারই রূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ এই তত্ত্বকে কার্যপরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব।"

স্বামীজী জাতিকে এই কলঙ্কগুলি হইতে মুক্ত করিবার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন এগুলির জন্য ধর্মকে সুদ্ধ ত্যাগ করিয়া নহে, ধর্মকে এগুলি হইতে পৃথক করিয়া, এগুলিকে পরিহার করিয়া যথার্থ ধর্মের পুনরুজ্জীবনের দ্বারা; এবং জাতিপ্রথার মূল ভিত্তি গুণগত বর্ণবিভাগের মূল উদ্দেশ্য সর্বজনের ঊর্ধ্বায়নের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া।

অধিকারবাদ

লণ্ডনে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় স্বামীজী বলিয়াছেন, "অধিকারবাদের যদি কোন দেশ থাকে, তাহা সেই দেশই, যাহা অদ্বৈত-দর্শনের জন্মভূমি—এই দেশেই অধ্যাত্মনিষ্ঠ ব্যক্তির এবং উচ্চবংশজাত ব্যক্তির বিশেষ অধিকার রহিয়াছে। সেখানে অবশ্য আর্থিক অধিকারবাদ ততটা নাই (আমার মনে হয়, ইহাই উহার ভাল দিক), কিন্তু জন্মগত ও ধর্মগত অধিকার সেখানে সর্বত্র বিদ্যমান।"

এই প্রসঙ্গে বিদ্বানের মূর্খের উপর, ধনীর নির্ধনের উপর, সবলের দুর্বলের উপর সুবিধা-ভোগের দাবীর কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "সর্বশেষ এবং সর্বনিকৃষ্ট অধিকার হইল আধ্যাত্মিক সুবিধার অধিকার। ইহা নিকৃষ্টতম, কারণ ইহা সর্বাধিক পরপীড়ক।" আমাদের ধর্ম বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত; কোন বৈদান্তিকের পক্ষে এরূপ বিশেষ অধিকার দাবী তাঁহার আদর্শের বিপরীত—"মানুষ ভগবান, নারায়ণ—আত্মায় স্ত্রী পুং নপুং ব্রহ্মক্ষত্রাদি ভেদ নাই—ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত নারায়ণ—কীট কম অভিব্যক্ত, ব্রহ্ম অধিক অভিব্যক্ত।" "বৈদান্তিক কাহারো শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোনও-রূপ অধিকার দিতে পারেন না, একেবারেই না। একই শক্তি তো সকলের মধ্যে বর্তমান; কোথাও সেই শক্তির অধিক প্রকাশ, কোথাও বা কিছু অল্প প্রকাশ। এই শক্তি সুষুপ্তাকারে সকলের মধ্যেই রহিয়াছে।

অধিকারের দাবী তবে কোথায় ?" সকলেরই মধ্যে ভগবান রহিয়াছেন; প্রকাশের যে তারতম্য দেখা যায়, তাহার কারণ "সে সম্ভবতঃ প্রকাশের সুযোগ পায় নাই, চতুর্দিকের পরিবেশ হয়ত তাহার প্রকাশের অনুকূল হয় নাই। যখন সে সুযোগ পাইবে তখন তাহা প্রকাশ করিবে। একজন লোক অপর হইতে বড় হইয়া জন্মিয়াছে, বেদান্ত কখনই এই ধারণা পোষণ করেন না।" জন্মগত কোন অধিকারের স্থান বেদান্তের ভাবে নাই।

অস্পৃশ্যতা

অস্পৃশ্যতার সহিত ধর্মের কোন সংস্রব না থাকিলেও, বরং উহা ধর্মবিরোধী হইলেও ধর্মের সহিত ইহাকে আমরা নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ফেলিয়াছি। সেজন্য স্বামীজী রহস্য করিয়া বলিয়াছেন, এখন "হিন্দুর ধর্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই—ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। হিন্দুধর্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়—ছুঁৎমার্গে; আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না, ব্যস!" "তপজপের দ্বারা সিদ্ধান্ত এই যে, আমি পবিত্র, আর সব অপবিত্র! পৈশাচিক ধর্ম, রাক্ষসী ধর্ম, নারকী ধর্ম!"

স্বামীজী ধর্মের নামে এই পৈশাচিক ব্যবহারের আবর্তে নিমজ্জন হইতে সাবধান করিয়া দিতেছেন, "মহা দঁক সামনে—সাবধান! ঐ দঁকে সকলে পড়ে মারা যায়।" "এই ঘোর বামাচার ছুঁৎমার্গে পড়ে প্রাণ খুইও না। 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' কি কেবল পুঁথিতে থাকবে নাকি? যারা এক টুকরো রুটি গরীবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দিবে! যারা অপরের নিশ্বাসে অপবিত্র হয়ে যায়, তারা আবার অপরকে কি পবিত্র করিবে?"

অস্পৃশ্যতা যে ধর্ম নয়, সামাজিক কুসংস্কার মাত্র, কতকগুলি সুবিধাবাদী লোক ইহার স্রষ্টা, স্বামীজী তাহা বহুভাবে বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, "ছুঁৎমার্গ একটি মানসিক ব্যাধি।" ইহা "আমাদের জাতীয় কর্মশক্তিকে সর্বক্ষেত্রে ব্যাহত করিয়াছে।" "আমরাই 'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না' রবে কোটি কোটি হিন্দুকে অধঃপাতিত করিয়া ফেলিয়াছি। আর ইহার ফলে আজ সমগ্র দেশ নীচতা, কাপুরুষতা ও অজ্ঞতার চরম দুর্দশায় নিমজ্জিত।" "এক শ্রেণীর সাধু সন্ন্যাসী আর ব্রাহ্মণবদমাশ দেশটাকে উৎসন্নে দিয়েছে। 'দেহি দেহি' চুরি-বদমাশি—এরা আবার ধর্মের প্রচারক! পয়সা নেবে, সর্বনাশ করবে, আবার বলে 'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না!'—আর কাজ তো ভারি—'আলুতে বেগুনেতে যদি ঠেকাঠেকি হয় তাহলে কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে?' '১৪ বার হাতে মাটি না করিলে ১৪ পুরুষ নরকে যায়, কি ২৪ পুরুষ?"—এই সকল দুরূহ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করছেন আজ দুহাজার বছর ধরে!"

অস্পৃশ্যতা-বোধ হৃদয়ের সঙ্কোচন-সঞ্জাত। স্বামীজী বলিয়াছেন, "সঙ্কোচনমাত্রই মৃত্যু, সম্প্রসারণমাত্রই জীবন।"

কাজেই জাতিকে ইহার হাত হইতে বাঁচাইবার একমাত্র পথ যথার্থ ধর্মের অনুসরণ ও হৃদয়ের প্রসারের দ্বারা—"হিন্দুধর্মের মহান উপদেশগুলি অনুসরণ করিয়া এবং তাহার সহিত হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি-স্বরূপ বৌদ্ধধর্মের অদ্ভুত হৃদয়বত্তা লইয়া"—বৈদান্তিকের মস্তিষ্কের সহিত বুদ্ধের হৃদয়ের সংযোগ ঘটাইয়া।

জাতি

প্রসঙ্গতঃ এখানে জাতিবিভাগের কথা আসিয়া পড়ে। অস্পৃশ্যতাকে যেমন আমরা ধর্মের সঙ্গে জড়াইয়া ফেলিয়াছি, তেমনি ফেলিয়াছি জাতির সঙ্গে। কিন্তু বাস্তবিক জাতি-বিভাগ বা বর্ণবিভাগ অন্য জিনিস। সমাজের বহুবিধ বিভিন্ন কর্ম সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন প্রকার লোক চাই-ই; সব লোক সব কাজ করিতেও পারে না। সেজন্য গুণগতভাবে চারিটি প্রধান বিভাগ করা হইয়াছিল। যাঁহারা শাস্ত্রপাঠ ও পাঠন, এবং অধ্যাত্মজগতের সত্যগুলিকে উপলব্ধি করিবার প্রচেষ্টাতেই জীবনপাত করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ; তাঁহাদেরই একদল স্বার্থসিদ্ধির জন্য অধিকারবাদ ও অস্পৃশ্যতার সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা সত্য, তবু, স্বামীজী বলিয়াছেন, আমরা যেন না ভুলি— একথাও সত্য যে তাঁহারাই যুগ যুগ ধরিয়া ভারতীয় সংস্কৃতিকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহারা যুদ্ধবিগ্রহ দেশশাসনাদি কার্যে রত থাকেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়। যাঁহারা কৃষি-বাণিজ্যাদি করেন, তাঁহারা বৈশ্য। আর যাঁহারা অর্থের বিনিময়ে ইঁহাদের কাজে সহায়তা করেন, ইঁহাদের সেবা করেন, ইঁহাদের নিকট চাকরি করেন, তাঁহারাই শূদ্র। কর্মনির্বাচনে মানুষের বিভিন্ন স্বাভাবিক প্রবণতাই বিভিন্ন জাতিসৃষ্টির মূল। সর্বদেশের সমাজেই এই গুণগত জাতিবিভাগ কোন-না-কোন আকারে ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে— "জাতিবিভাগ থাকিবেই—ইহা স্বাভাবিক নিয়ম

কিন্তু মুশকিল হইল তখন, যখনই একবর্ণের লোক অন্য বর্ণাপেক্ষা অধিকতর অধিকারের দাবী করিলেন। বৈদিক যুগ হইতেই বর্ণবিভাগের আরম্ভ দেখা যায়। কিন্তু অধিকারবাদ বা অস্পৃশ্যতা হইতে তাহা মুক্ত ছিল। ঋগ্বেদে দেখা যায়, একজন ব্রাহ্মণ ঋষি বলিতেছেন, "আমি স্তোত্রকার, আমার পুত্র চিকিৎসক ও কন্যা প্রস্তরের উপর যবভর্জন-কারিণী। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম করিতেছি।" পৌরাণিক যুগে ইহা বংশগত হইলেও গুণানুরূপ কর্মের স্বীকৃতি লোপ পায় নাই—পরশুরাম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়াও ক্ষত্রিয়ের কর্ম করিয়াছেন; বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়বংশে জন্মিয়াও ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হইয়াছেন। মহাভারতে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণের বংশে জন্মাইলেই ব্রাহ্মণ হয় না, যদি তাহার ব্রাহ্মণোচিত গুণ না থাকে। আর শূদ্রের মধ্যেও যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণ দেখা যায় তবে সে ব্রাহ্মণই। বস্তুতঃ, স্বামীজী বলিয়াছেন, বর্ণবিভাগের মূল উদ্দেশ্যই হইল নিম্নতম অধিকারীকে উচ্চতম অধিকারীর গুণভূষিত করিয়া সেই স্তরে তাহাকে উন্নীত করা—শূদ্রকে ব্রাহ্মণ করা। কিন্তু এই অধিকারের পথ পরে রুদ্ধ হয়—বর্ণবিভাগ পূর্ণরূপে জাতিগতই হইয়া পড়ে, গুণের সহিত তাহার আর কোন সংস্পর্শই থাকে না। ব্রাহ্মণের গুণ না থাকিলেও, শাস্ত্রজ্ঞান বা অধ্যাত্মজীবন না থাকিলেও এবং রাজনীতি বা কৃষি-বাণিজ্যাদি বা চাকরি করিলেও সে-ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বলিয়াই বিবেচিত হইতে থাকে, সামাজিক বিধান তাহাকে বিশেষ অধিকার দিতে থাকে। অপর দিকে একজন শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণভূষিত হইলেও সে উচ্চ অধিকার হইতে চিরদিন বঞ্চিতই হয়; মানুষ হিসাবে তাহা অপেক্ষা শতগুণে অধম একজন ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভূত ব্যক্তির নিকটও সে অস্পৃশ্যরূপেই গণ্য হয়। ধর্মের বা বর্ণবিভাগের ইহা অপেক্ষা বিকৃত রূপ আর কি হইতে পারে? স্বামীজীর

মতে—ইহার অতি-বিকৃত অবস্থার কাল সহস্রাধিক বর্ষের অধিক নহে।

স্বামীজী বলিয়াছেন, বুদ্ধদেব হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী কালের সকল ধর্মাচার্যই ইহার বিলোপসাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই প্রচেষ্টায় স্থায়ী ফল না হওয়ার একমাত্র কারণ তাঁহারা ধর্মের সহিত ইহাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন: "ভারতের সকল সংস্কারকই এই গুরুতর ভ্রমে পড়িয়াছেন যে, পৌরোহিত্যের সর্ববিধ অত্যাচার ও অবনতির জন্য তাঁহারা ধর্মকেই দায়ী করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা হিন্দুর ধর্মরূপ এই অবিনশ্বর দুর্গকে ভাঙিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ইহার ফল কি হইল? নিষ্ফলতা। বুদ্ধ হইতে রামমোহন পর্যন্ত সকলেই এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, জাতিভেদ একটি ধর্মবিধান; সুতরাং তাঁহারা ধর্ম ও জাতি উভয়কে একসঙ্গে ভাঙিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন। জাতি একটি অচলায়তনে পরিণত সামাজিক বিধান ছাড়া আর কিছুই নহে। উহা নিজের কর্ম শেষ করিয়া এক্ষণে ভারতগগনকে দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে।"

যথার্থ ধর্মের পুনরুজ্জীবনই পথ

ভারতে মহাত্মাজী কর্তৃক অস্পৃশ্যতাবর্জনের প্রচেষ্টা চালাইবার বহু পূর্বেই স্বামীজী ইহাকে সমূলে উৎপাটিত করিবার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন—প্রেমের দ্বারা, বলিয়াছেন, "ভুলিও না—...মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।...বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই", এবং সংস্কৃতিতে অনুন্নত জনগণের সাংস্কৃতিক উন্নতিবিধানের দ্বারা, শূদ্রকে গুণগতভাবে ব্রাহ্মণত্বে উন্নয়নের দ্বারা; ব্রাহ্মণকে শূদ্রত্বে টানিয়া নামাইয়া নহে। তাঁহার প্রবর্তিত সন্ন্যাসিসঙ্ঘের—'শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের'—সন্ন্যাসিগণ শঙ্করপন্থী সন্ন্যাস-শাখার অন্যতমের অন্তর্ভুক্ত; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গুরু শ্রীমৎ তোতাপুরী শঙ্করপন্থী ছিলেন। 'ব্রাহ্মণ ছাড়া সন্ন্যাসে কাহারো অধিকার নাই'—এই মতকে শঙ্করাচার্যও রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু তিনি ইহার গুণগত দিকটিকে বংশগত ব্রাহ্মণত্ব হইতে পৃথক করেন নাই। স্বামীজী এই ব্রাহ্মণত্বকে বংশগত না রাখিয়া গুণগতই করিয়া গিয়াছেন —যথার্থ ত্যাগ-বৈরাগ্যবান যে-কেহ এই সঙ্ঘে সন্ন্যাসগ্রহণের অধিকারী; এমনকি 'হিন্দু' হইবারও প্রয়োজন নাই, যে-কোন ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন 'মানুষই' এখানে সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে পারেন। হিন্দুদের সর্বজাতির তো বটেই, খৃষ্টান এবং মুসলমানও এই সন্ন্যাসিসঙ্ঘে যোগদান করিয়াছেন। যাহাদের এতদিন 'অস্পৃশ্য' বলিয়া আমরা ঘৃণা করিয়া আসিতেছিলাম, তাহাদের তিনি শুধু বুকে জড়াইয়াই ধরেন নাই, যোগ্য অধিকারীকে ধর্মরাজ্যে সর্বোচ্চ আসনে আসীন করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সকলকেই নারায়ণজ্ঞানে সেবা করিয়াছেন ও করিতে বলিয়া গিয়াছেন। নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ীতে মঠ থাকাকালীন কয়েকজন শূদ্রকে একদিন তিনি উপবীত এবং গায়ত্রীমন্ত্র দান করিয়াছিলেন। যখন অস্পৃশ্যতা প্রবল প্রতাপে বিরাজ করিতেছে, সেই সময় হইতেই বেলুড় মঠে সর্বজাতির লোক একই সঙ্গে বসিয়া অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ একবার উৎসবের দিনে মঠে যাইয়া এই দৃশ্য দেখিয়া অভিভূত হইয়া নিজেই সকলের সঙ্গে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন: যে সমস্যা লইয়া আমরা বিব্রত,

আপনারা তাহার সহজ সমাধান করিয়া দিয়াছেন, দেখিতেছি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, সঙ্ঘগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে সর্বজাতির কাঙালদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন, সর্বজনের ব্যবহৃত পায়খানার মেজে মুছিয়া দিয়াছিলেন নিজের কেশ দ্বারা—আমি যে কোন মানুষ হইতে বড় নই, সকলেরই ভিতর একই নারায়ণ রহিয়াছেন, এই বোধকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য। সঙ্ঘজননী সারদাদেবী জয়রামবাটীতে একদিন মুসলমান আমজদের উচ্ছিষ্টস্থান স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়াছিলেন; সে-যুগে পল্লীগ্রামে একজন ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবার পক্ষে এ কাজের গুরুত্ব যে কতখানি, এখন তাহা ধারণা করাও আমাদের পক্ষে সহজ নহে। এই সর্বভূতে নারায়ণদর্শন, এই প্রেম, হৃদয়ের এই প্রসারই যথার্থ ধর্ম। এই ধর্মের পুনরুজ্জীবনই আমাদের করিতে হইবে। আর করিতে হইবে জাতিকে, বর্ণবিভাগকে বংশগত না রাখিয়া গুণগত, এবং বর্ণবিভাগের যাহা মূল লক্ষ্য—যাহারা অনুন্নত তাহাদের সাংস্কৃতিক উন্নতি-বিধানের জন্য সর্ববিধ প্রচেষ্টা। আর ভোগ- ও অধিকারবৈষম্যের বিলুপ্তিসাধন। বার বার স্বামীজী আমাদের এ-বিষয়ে সজাগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। বলিয়াছেন যে যাহারা বড়লোক তাহারা স্বেচ্ছায় অর্থ দিয়া এবং যাহারা শিক্ষিত তাহারা শিক্ষাদান করিয়া অনুন্নত জনগণকে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়া উন্নত করিতে সচেষ্ট হও। তাহা হইলে ইহারা কৃতজ্ঞ থাকিবে। আর তাহা না করিলে ইহারা যখন জাগিবে—এবং একদিন জাগিবে নিশ্চয়ই—তখন সব ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া দিবে।

আমরা ইহা করি নাই, যাহার বিষময় ফল ফলিতে শুরু হইয়াছে—ইহারা আজ জাগিয়া আমাদের সংস্কৃতিকেই ভাঙ্গিয়া ফেলিতে উদ্যতপ্রায় হইতেছে।

এখনও সময় আছে। অথচ, মানবতার এই জাগরণের দিনেও, যখন বংশগত জাতি-বিভাগ, অধিকারবাদ ও অস্পৃশ্যতা স্বাভাবিক ভাবেই দ্রুত অপস্রিয়মান, তখনও আমরা কেহ কেহ এগুলিকে সমর্থন করিবার চেষ্টা করিতেছি এবং সবচেয়ে দুঃখের বিষয় কোথাও কোথাও ধর্মের পতাকা হস্তে লইয়াই। ধর্মকে স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিবার কুফলরূপে ধর্মের প্রতিই জগৎ জুড়িয়া মানুষের যে বিতৃষ্ণা প্রকট হইয়াছে, আমাদের এরূপ প্রচেষ্টা তাহা বাড়াইয়াই দিবে। যদি আমরা ভারতীয় জাতিকে তাহার নিজস্বতা লইয়া বাঁচাইতে চাই, তাহা হইলে ধর্মকে অবলম্বন করিয়াই তাহা করিতে হইবে। (তাহা না চাহিলে ভারতকে যত সমৃদ্ধ, যত শক্তিশালী করিয়া তোলা হউক না কেন, তাহাকে পাশ্চাত্য শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ জাতিগুলিরই মত 'জীবন্ত আগ্নেয়গিরির মুখের উপরই' স্থাপিত করা হইবে)। এ কাজের সহায়ক যথার্থ ধর্মের বিকাশ—প্রেম, সহায়ক সকলকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা, এবং ধর্মের সহিত সংস্পর্শহীন, মানবতাবিরোধী, জাতির কলঙ্কস্বরূপ অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সামাজিক কু-সংস্কারগুলিকে সযত্নে পরিহার।

স্বামী প্রেমানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে লিখিত]

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

মঠ,
১৪.২.০৯

ভাই শশী,

অনেকদিন তোমায় চিঠি লিখতে পারি নাই। শরীর অসুস্থ থাকায় মহারাজের চিঠিরও উত্তর লিখিতে অশক্ত ছিলাম। প্রায় সপ্তাহকাল ভাল আছি। মহারাজের শরীর কেমন আছে লিখিবে। তিনি কি আমাদের ভুলে গেলেন? শ্রীশ্রীমহারাজের জন্মমহোৎসব তো আগতপ্রায়। মহারাজ না থাকিলে যে কার্যে উৎসাহ হয় না! তাঁর শুভাগমন যে একান্ত প্রার্থনীয়! সকলেই মহারাজ কবে আসিবেন জানিতে উৎসুক। এখানকার ভক্তমহলে মহারাজের lecture পড়ে উৎসাহ ও আনন্দের কোলাহল পড়েছে।

শুনেছিলাম উমানন্দের বসন্ত হয়েছে, আবার শুনিতেছি শুকুলেরও Small-pox হয়েছে। তাহারা কেমন আছে লিখিয়া চিন্তা দূর করিবে।

Sister দেবমাতার বই পড়ে সকলেই অতিশয় আনন্দিত। মাষ্টার মহাশয় ঐ বই রাতদিন কাছছাড়া করেন না। গিরীশ বাবু প্রত্যহ ঐ পুস্তক শুনিতেছেন। এখানে উহার খুব কাটতি হচ্ছে। কি চমৎকার কথাই বলে গেছেন! উহা এ যুগের গীতা। মঠের সকলে ভাল আছে। আমরা মহারাজের উপস্থিতি প্রতীক্ষা করিতেছি। তাঁকে বলিও ডাব্‌রি গাই সকালে /২৷০ নয় পোয়া দুধ দিচ্ছে, আরও বেশী দেবে; শ্রীশ্রীপ্রভুর পায়সান্ন দেওয়া হচ্ছে। এবার গোলাপ ফুল বেশ ফুটেছিল। আর dambia খুব ফুটেছিল। মহারাজের প্রেরিত ফুলের চারা কই এখনও তো বেরোয় নাই। জল দেওয়া হচ্ছে। শ্রীশ্রীমহারাজজীকে আমার ভালবাসা ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইবে ও তুমি জানিবে।

শ্রীশ্রীকামারপুকুরে ২৯শে ফাল্গুন মহোৎসব হইবে। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর শরীর তত ভাল নাই শুনিলাম।

সকল ভক্তদের আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানাইবে।

ইতি—
দাস বাবুরাম

জ্ঞানীর শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের যখন সাধন-অবস্থা তখন দক্ষিণেশ্বরে একদিন এক পূর্ণজ্ঞানী পরমহংস উপস্থিত হইয়াছিলেন। শুচি অশুচি ভেদ নাই, পাগলের মতো দেখিতে। পাগল ভাবিয়া প্রসাদ পাইবার পংক্তিতে কেহ তাঁহাকে বসিতে দিল না। তিনি মন্দিরের বাহিরে এঁটো পাতার স্তূপের নিকট গিয়া কুকুরদের সহিত পাত্র-সংলগ্ন উচ্ছিষ্ট চাটিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। ভাগিনেয় হৃদয়কে জড়াইয়া ধরিয়া জগজ্জননীকে ডাকিয়া শুধাইয়াছিলেন, মা, আমারও কি তবে ঐরূপ অবস্থা হবে? শ্রীরামকৃষ্ণ পরে ঐ ত্রিগুণাতীত পরমহংসের স্মৃতিপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, লোকটি পূর্ণজ্ঞানী। গঙ্গায় স্নান ক'রে মন্দিরে স্তব করতে লাগলো। সারা মন্দির কেঁপে উঠেছিল।

যদি তিনি পূর্ণজ্ঞানী তাহা হইলে তাঁহার মন্দিরে আসার প্রয়োজনই বা কি ছিল আর উহার সার্থকতাই বা কি? পূর্ণজ্ঞানী, যিনি ব্রহ্ম ব্যতীত ত্রি-সংসারে আর কিছু দেখেন না, কাহার উদ্দেশ্যে স্তব করিবেন? কি তাঁহার স্তবের ভাষা? আর স্তুতি গাহিয়া তাঁহার হৃদয়ে কি ধরনের উল্লাস জন্মিবে? চুলচেরা বিচার করিয়া এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া কঠিন। হয়তো বলা যাইতে পারে পূর্ণজ্ঞানীর বাস্তবিকই মন্দিরে গিয়া দেবদর্শন, দেবতার পূজার্চনা, স্তুতি প্রভৃতির কোনও প্রয়োজন নাই, কেননা গীতার ভাষায় (৩।১৭) তিনি আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মাতে সন্তুষ্ট—তাঁহার ক্রিয়া-অনুষ্ঠানাদি সব ফুরাইয়াছে। তবে লোকশিক্ষার জন্য তিনি ঐ সকল করিতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, দেখ পার্থ, ত্রিসংসারে আমার অপাওয়া কিছু নাই, পাইবারও কিছু নাই, কাজেই কর্তব্য বলিয়াও কিছু নাই—তথাপি অপরের নিকট উদাহরণ হিসাবে আমি কাজে ব্যাপৃত রহিয়াছি। (গীতা, ৩.২২)।

এই উত্তর কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত দক্ষিণেশ্বরের ঐ পূর্ণজ্ঞানী পরমহংসের পক্ষে খাটে না। লোকশিক্ষাদানের বালাই যে তাঁহার একেবারেই ছিল না তাহা তাঁহার হলধারীর সহিত ব্যবহারেই টের পাওয়া যায়। হলধারী কিছু উপদেশ আদায় করিবার মতলবে তাঁহার পিছু পিছু যাইতে আরম্ভ করিলে তিনি রাস্তা হইতে ইটের টুকরা কুড়াইয়া হলধারীর প্রতি ছুঁড়িতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অবশ্য আখেরে মুখ খুলিয়া হলধারীকে একটি কথা বলিয়া গিয়াছিলেন,—"যখন এই নালার জল আর গঙ্গার জলে কোন ভেদ দেখতে পাবি না তখনই জানবি পূর্ণজ্ঞান হয়েছে।"

যিনি গোঁড়া ভক্তিযোগী তিনি বলিবেন, পূর্ণজ্ঞান অধ্যাত্মজীবনের শেষ কথা নয়, বেদোপনিষদে যে অদ্বৈত সত্যের কথা আছে তাহা তো ভক্তের উপাস্য ভগবানের অঙ্গজ্যোতি মাত্র। অতএব উক্ত পূর্ণজ্ঞানী মন্দিরে গিয়া যে স্তবস্তুতি করিয়াছিলেন তাহা অতি প্রয়োজনীয় সাধনা হিসাবেই করিয়া থাকিবেন, নিজের তত্ত্বানুভূতিকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার জ্ঞানকে ভক্তির মাধুর্যরসে সিঞ্চিত করা আবশ্যক ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে সময়ে ভক্তদিগের নিকট ঐ

পূর্ণজ্ঞানী পরমহংসের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, সে সময়ে তিনি নিজে জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েরই পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি এমনভাবে ঘটনাটির বর্ণনা করিয়াছিলেন যাহাতে মনে হয় যে পূর্ণজ্ঞানীর মন্দিরে গিয়া স্তব করা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। যেন এই আচরণে কোনও বিতর্কই উঠিতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের জীবনেও এইরূপ আপাত-বিরুদ্ধ আচরণ বার বার দেখা গিয়াছে। নির্বিকল্প সমাধিতে মন লীন হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইতেছে। সেব্য ও সেবক, ভগবান ও ভক্ত এই পার্থক্য তখন মুছিয়া গিয়াছে। কে চিন্তা করিবে, কে কথা কহিবে? কিন্তু সমাধি হইতে মন যখন নামিয়া আসিয়াছে তখন অন্যরূপ আচরণ। তখন ভগবানের নাম গুণগান করিতেছেন, মন্দিরে গিয়া দেবদর্শন করিতেছেন, ভক্তি-ভক্তের প্রসঙ্গ চলিতেছে। কে বলিবে এই ব্যক্তিই কিছুক্ষণ আগে অদ্বৈতানুভূতিতে একেবারে আত্মহারা হইয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে জ্ঞান ও ভক্তির কোনও বিরোধ নাই। দর্শনের যুক্তি দিয়া জ্ঞান ও ভক্তির পূর্ণ সমন্বয় ঘটানো কঠিন হইতে পারে, কিন্তু এই যুগের অবতারপুরুষ তাঁহার জীবনে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, সাধকের নিজের অনুভূতিতে এই সমন্বয় সম্পূর্ণ সম্ভবপর। পূর্ণজ্ঞানীর হৃদয়ে এমন প্রগাঢ় প্রেমের উদয় হইতে পারে যাহা স্তবের শব্দের সহিত সম্মিলিত হইয়া পাথরের দেউলকে কাঁপাইয়া দেয়। অবাঙ্-মনসোগোচর ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানিয়াও ব্রহ্মকে বাক্যমনের এলাকায় টানিয়া আনা যায় এবং তাঁহাকে পরম প্রেমাস্পদরূপে আরাধনা করা চলে। এই আরাধনা জ্ঞানের সম্পূর্তির জন্যও নয়, লোকশিক্ষার জন্যও নয়, ইহা ব্রহ্মানুভূতিরই একটি প্রকাশবিভেদমাত্র। সচ্চিদানন্দ মহাসিন্ধুর কি পার আছে? নির্বিকল্প সমাধি ঐ সিন্ধুর একটি দৃষ্টিভঙ্গী, প্রেমে হাসা কাঁদা নাচা সেই একই মহাসিন্ধুর আর একটি প্রতিচ্ছবি। শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্বসূরি সাধক কবীরের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিতেন, “নিরাকার আমার বাবা, সাকার আমার মা।” হয়তো দক্ষিণেশ্বরে আগত ঐ পূর্ণজ্ঞানী পরমহংস কোনও কবীরপন্থী ছিলেন, তাই সংসারকে তত্ত্বজ্ঞানে নস্যাৎ করিয়া দিয়াও ভবতারিণী কালিকার পাষাণমূর্তির সামনে দাঁড়াইয়া স্তোত্র গাহিয়াছিলেন এবং মন্দির কাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

বলিও না নির্গুণ-সগুণকে সমন্বিত করিবার জন্য একটি নূতন দর্শনের প্রয়োজন। নির্গুণ একদেশী, সগুণও একদেশী—এই দুই একদেশী দাঁড়াইয়া আছে একটি পূর্ণতর সমন্বিত সত্যের উপর। একটি গালভরা নাম দিয়া এই নূতন সত্যকে প্রচার করিতে হইবে। না, কোনও নূতন সত্য আকাশ হইতে নামিয়া আসে নাই। শব্দবিলাসীদের নিকট ঐ অবতরণ প্রয়োজন হইতে পারে, পুস্তকরচনার জন্য—কিন্তু সত্যান্বেষী সাধকের প্রয়োজন মতবাদ বা দার্শনিক বিচার নয়, নিজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। শ্রীরামকৃষ্ণ এই যুগে জ্ঞান-ভক্তির সমন্বিত উপলব্ধির শিক্ষা দিয়াছেন। সেই সুপ্রাচীন আত্মবিদ্যা, সেই সন্তকুলসেবিত বহুপ্রচলিত প্রেমভক্তির পথ। আন্তরিকতা লইয়া, গোঁড়ামি বর্জন করিয়া যে-কোনও পথে চলিতে থাক, দেখিবে অপরটিতেও পৌঁছিয়া গিয়াছ। জ্ঞান এবং প্রেম একই অনুভূতির দুইটি রূপ মাত্র।

* * *

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক ধ্যানমন্ত্র লিখিত হইয়াছে ও হইতেছে। ঠাকুরের দিব্য-

জীবনের কোনও কোনও ঘটনা এবং তাঁহার লোকোত্তর চরিত্রের বিবিধ বৈশিষ্ট্য এই সকল মন্ত্রের উপজীব্য। প্রেমাস্পদের গুণগান দ্বারা তাঁহার প্রতি ভালবাসা যে বর্ধিত হয়, ইহা তো ভক্তিশাস্ত্রের সুস্পষ্ট নির্দেশ। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণের উপযুক্ত ধ্যানমালা ও স্তবস্তোত্রাদি পাঠ ও মনন করিলে ভক্তের ভাবভক্তি যে পুষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যক্তি-শ্রীরামকৃষ্ণের পশ্চাতে একটি নৈর্ব্যক্তিক শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তি কাহারও কাহারও কাছে এই নৈর্ব্যক্তিক পর্যায়ে উপনীত হইতে পারে। স্বয়ং শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দ ইহার পথপ্রদর্শক। ঠাকুরের অন্যান্য পার্ষদ ভক্তগণও কথাপ্রসঙ্গে ইহার ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। শ্রীমা সারদাদেবীকে জনৈক ভক্ত 'ঠাকুর আপনার কে?' এই প্রশ্ন করিলে মা বলিয়াছিলেন, তিনি আমার পিতা, মাতা, স্বামী, সব। পিতা-মাতা, স্বামীর বর্ণনা চলে, কিন্তু 'সব'-এর আর বর্ণনা চলে না। 'সব' হইল ইষ্টের নৈর্ব্যক্তিক লক্ষণা। সীমা যখন অসীমে হারাইয়া যায় তখনই 'সব'-এর উপলব্ধি। তাই গীতা বলিয়াছেন, বাসুদেবঃ সর্বমিতি। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-আরতি-স্তোত্রে ঠাকুরকে বলিতেছেন নিগুর্ণ-গুণময়। যে-সব অত্যদ্ভুত আধ্যাত্মিক সম্পদ তাঁহার চরিত্রকে বিভূষিত করিয়াছিল উহাদের কথা যখন চিন্তা করি তখন শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের নিকট 'গুণময়'। কিন্তু ঐ সকল চিন্তাকে ছাড়াইয়া মন যখন একটি অব্যক্ত অসীম সত্তায় স্থিতি লাভ করিতে উন্মুখ তখনও শ্রীরামকৃষ্ণ রহিয়াছেন—'নিগুর্ণ' স্বরূপে রহিয়াছেন। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ একদিন ঠাকুরের ছবি দেখাইয়া একটি ভক্তকে বলিয়াছিলেন, এই যে ছবি দেখছ, এ আসল ঠাকুর নয়। আসল ঠাকুর অন্তরের অন্তরে ধ্যানে উপলব্ধি করতে হয়।

স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিয়াছেন 'বেদমূর্তি'। বেদের কোন্ মন্ত্রগুলি তাঁহার দিব্য অঙ্গকে গঠিত করিয়াছে? জননী সারদাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিশ্চিতই বলিবেন, 'সব'। বেদ যে মন্ত্র দিয়া আরম্ভ সেই মন্ত্রে স্তুত অগ্নি ভাবুকের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণেরই রূপ—সর্বকালিমাহর বিশ্বপ্রসারী চৈতন্যজ্যোতি শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ভবতারিণী কালিকার পূজা করিতে বসিয়া মন্দিরের সকল দিক হইতে নির্গত এই জ্যোতিঃপুঞ্জকে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। নিত্যপরিবর্তনশীল জগৎপ্রপঞ্চকে শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়া যদি আচ্ছাদন করিতে চাও তাহা হইলে ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রের ধ্যান কর। ঐ মন্ত্রের 'ঈশ' শ্রীরামকৃষ্ণের নৈর্ব্যক্তিক রূপ। কেনোপনিষদের প্রথম মন্ত্র দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা আরম্ভ কর। কে তোমার মনের পিছনে বসিয়া মনের আলোড়ন-বিলোড়ন সম্পাদন করিতেছেন? কে তোমার চক্ষুকে দৃষ্টিশক্তি দিতেছেন? কে তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের পিছনে বসিয়া? কে তোমার প্রাণের প্রাণ, বাক্যের অভিব্যঞ্জক? কেনোপনিষদের সিদ্ধান্ত শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যানে প্রয়োগ কর। প্রতি-বোধবিদিতম্—শ্রীরামকৃষ্ণই আত্মচৈতন্যজ্যোতিঃ-রূপে তোমার প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়বোধকে অভিব্যক্ত করিতেছেন।

কঠোপনিষদের মন্ত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান করিলে তাঁহাকে দেখিতে পাই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অর্থাৎ সত্ত্বগুণ ও রজোগুণকে অন্ন করিয়া উহাদের সহিত মৃত্যু অর্থাৎ তমোগুণকে ব্যঞ্জনরূপে মিশাইয়া বিরাট ভোজন-পর্বে বসিয়া গিয়াছেন। উহাই তো পরমহংসের

ঠিক ঠিক বর্ণনা। তিন গুণই উদরস্থ। ত্রিগুণাতীত বালক—কোন গুণের বশ নন। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ কি আমার হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত স্থানে অন্তরাত্মারূপে বসিয়া আছেন—কঠোপনিষদের শেষে যম যাহা নচিকেতাকে বলিয়াছিলেন ?

তৈত্তিরীয় উপনিষদের 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' 'রসো বৈ সঃ' (তিনি রসস্বরূপ) মুণ্ডক উপনিষদের 'আবিঃ সন্নিহিতং' 'আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি' 'অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রঃ' ইত্যাদি বাক্য শ্রীরামকৃষ্ণের নৈর্ব্যক্তিক ধ্যানে ব্যবহার করিতে পারা যায়। মুণ্ডক উপনিষদের শেষ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে সকল খণ্ড কি করিয়া অখণ্ডে লীন হয়, সকল অংশ কি করিয়া পূর্ণে প্রবেশ করে, সকল কর্ম, সকল দেবতা কি করিয়া পরম অব্যয় তত্ত্বে একীভূত হয় তাহার বর্ণনা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানী ভক্ত ঐ মন্ত্র অবলম্বনে জননী যশোদা যেমন গোপালের মুখবিবরে জগদ্ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইয়াছিলেন সেইরূপ শ্রীরামকৃষ্ণমূর্তিতে সকল সসীম অনুভূতিকে মিলাইয়া এক করিতে সমর্থ হন। জ্ঞানীর শ্রীরামকৃষ্ণ ছান্দোগ্য উপনিষদের 'যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বনুত্তমেষূত্তমেষু (৩।১৩।৭)—স্বর্গ-মর্ত্যের পারে দেদীপ্যমান সেই চৈতন্যজ্যোতিঃ যাহা সর্বতোব্যাপ্ত, যাহা ভাল মন্দ সব কিছুকে প্রকাশ করিতেছে।

জ্ঞানীর শ্রীরামকৃষ্ণ ছান্দোগ্যের ৭ম প্রপাঠকে নারদকে সনৎকুমার কর্তৃক উপদিষ্ট 'ভূমা'—যাহা পরমসুখস্বরূপ, যাহা আপন মহিমায় সর্বদা প্রতিষ্ঠিত। ঐ ভূমাকে অনুভব করিলে 'সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ'—সকল অজ্ঞান-বন্ধনের মুক্তি হয়।

জ্ঞানীর শ্রীরামকৃষ্ণ বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য-উপদিষ্ট 'অক্ষর' পুরুষ—অদৃষ্ট দ্রষ্টা, অশ্রুত শ্রোতা, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাতা—বাক্য সে সত্যে পৌছায় না, মনও নয়—নেতি নেতি বলিয়া নিষেধ-মুখে ঋষিরা ইঙ্গিতে সে সত্যের নিরূপণ করিয়াছেন।

রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন, "প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে। সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি বোঝনারে মন ঠারে ঠোরে।" হৃদয়ের গভীর অনুভূতিকে বাক্যে প্রকাশ করা যায় না—'ঠারে ঠোরে' উহার ইঙ্গিত দেওয়া যায় মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ-উপাসকও একদিন দেখিতে পান, তাঁহার ঠাকুরের রূপগুণের বর্ণনা করিয়া নিঃশেষ করা যায় না। পুরুষ-সূক্তের পুরুষ যেমন অব্যক্ত তিন ভাগ আমাদের ধরা-ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে রাখিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপও সেইরূপ আমাদের সসীম অভিজ্ঞতার বাহিরে। নৈর্ব্যক্তিক সত্যের জ্ঞাপক বেদমন্ত্র তাঁহার ধ্যানে প্রয়োগ করিলে আমাদের ভক্তি ভালবাসা সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার 'বেদমূর্তি'কে কথঞ্চিৎ ধারণা করিতে সমর্থ হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ ও যুগসমস্যা*

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

আপনাদের আজিকার এই মহদনুষ্ঠানে এই স্থবির সন্ন্যাসীকে পুরোভাগে পতাকাহস্তে দাঁড় করাইয়া বিশ্বকল্যাণকাম অভিযা'নটি শুরু করিতে চাহিয়াছেন, সে নিমিত্ত আমি কৃতজ্ঞ। তাহার হেতু, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ—এই যুগ্ম যুগাবতার-প্রভাবমহিমা আমার তরুণ জীবনে ঐ উর্দ্ধ্বধামের সত্য শিব সুন্দরের সমাচার এবং তাহার অনুপ্রেরণা আনিয়া দিয়াছিল। সে অহেতুক কৃপার ঋণ যে কিভাবে শোধ হইবে তাহা জানি না! বহুদূরের স্বল্পতোয়া কৃচ্ছ্রগমনা সরিৎ যেমন জানে না কবে কিভাবে সজল জলদবরিষণে সরিন্নাথের যে ঋণ, সে ঋণ সে পরিশোধ করিবে! 'যাবন্নত্বা নদীনাথে নৈকান্তিক-সমর্পণম্'—তাবৎ স্বপ্নেও সেটি তো হইবার নয়!

সে অনেকদিনের কথা—পূর্বশতকের শেষ আর বর্তমান শতকের প্রথমভাগের কথা। তারপর বহু বহু সহস্রবার আমাদের এই বসুন্ধরা আপন অক্ষদণ্ডে আবর্তন করিয়াছে। ফলে, মানব-মানসে, মানবের সাধনায় এবং ব্যবহারে অনেক বিপ্লবী পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। এই তো সেদিন মর্ত্যের তিনটি প্রাণী চন্দ্রমণ্ডল পরিক্রমা করিয়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার বিজয়-বৈজয়ন্তী বিশ্বমহাকাশে উড্ডীন করিয়া আসিলেন। ইহার প্রসাদে

বিপুলতরা, এবং কাল আরও নিরবধি হইল সন্দেহ নাই। ইহার ফলে, আমাদের এই সীমিত বাস্তুভূমিটির শুধু পরিধি এবং আয়তন বাড়িল না; ইহার কাম্য ভাবী সম্পদের

বহুগুণে বাড়িয়া গেল। ভৌম অভ্যুদয়ের পন্থা বিশালতর হইল। তথাপি মনে প্রশ্ন জাগে—ততঃ কিম্?

বিজ্ঞানের যে মন্ত্র, যে যন্ত্র, যে তন্ত্র, সে সবে কুশলিনী এই মানব-মনীষা যে আশার বাণীটি আজ শোনাইল, যে অমরার সম্পদের ছবিটি আঁকিয়া ধরিল, সে আশা কি কুহকিনী, সে ছবি কি মায়া, মতি-বিভ্রম? এ প্রশ্ন আসে এইজন্য যে—যে মহীয়সী শক্তি-সাধনায় তুমি আজ এই অঘটন ঘটাইলে, এবং ভাবিকালে আরও বিস্ময়কর অনেককিছু করিবে ভাবিতেছ, সে শক্তি কি দৈত্য-দানব-শক্তির মত তোমাকে ভূরি ভূরি ঐশ্বর্য সম্পদের মাঝেই সেই 'মহতী-বিনষ্টির' পানেই টানিয়া লইবে না—যাহার সম্বন্ধে পুরাণী প্রজ্ঞানবাণী তোমায় সচেতন সাবধান করিয়াছেন? তুমি এই পৃথিবীকে অমরাপুরী করিয়া রচিবে ভাবিতেছ, কিন্তু তোমার সর্বনাশা ভ্রাতৃবিদ্বেষের ফলে, এই সমগ্র ভূমণ্ডলটাই যদি কোন ভাবী সংঘর্ষের প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ভস্ম হইয়া মহাশূন্যে মিলাইয়া যায়, তবে ওগো মহাকাশবিজয়ী! তুমি সেদিন ঐ দূরের চন্দ্র বা শুক্রগ্রহ হইতে ধরার পানে তোমার যন্ত্রদৃষ্টি ফিরাইয়া কি দেখিবে বলত? আজিকের এই নীলসিন্ধুহকুলা ত্রৈলোক্য-সুন্দরী জননী ধরণীটিকে, না, মহাজাগতিক ধূলিরাশি (cosmic dust) মাত্র? সমগ্র ভূমণ্ডলটাই যদি অতি বিস্ফোরক-গর্ভ এক আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হইতে চলে, তবে তাহার উপরে, নববিজ্ঞানের ইন্দ্রজাল

*স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উপলক্ষে নিউ এসিয়াটিক সোসাইটি হলে প্রদত্ত ভাষণ।

তাহার স্বপ্নকে মর্মরে রূপায়িত শতকোটি তাজমহলে সুষমাশ্রী অথবা এক অপরূপকল্প চন্দ্রমল্লিকা-বিশ্বপ্রদর্শনী সাজাইয়া কি সার্থকতা আনিয়া দিবে বল? হয়তো বা এ বিভীষিকা অনেক পরিমাণে অতিসন্ত্রস্ত-গণমানসের অবাস্তব-প্রতিক্রিয়া। বিজ্ঞানবিত্তার বর্তমান প্রগতির ফলে আমাদের ঐ 'মহতী বিনষ্টি' নিশ্চয়ই অবশ্যম্ভাবিনী নহে। এ বিদ্যা দ্বারা অর্জিত যে সম্পদ, সে সম্পদও 'মহতী', যে ভদ্র বা কল্যাণ, সেটিও বরেণ্য, যদি যে ভাবী বা বর্তমান মানবতার অধিকারী সে তার আপন বরণীয় মহত্ত্বে শ্রদ্ধা না হারায়, আপন লোভ-মোহ-দৃষ্টিতে ভদ্রকে ভয়াল, কুশলকে কশ্মল না করিয়া ফেলে।

সম্পদের অভাবনীয় প্রাচুর্যের সঙ্গে, যদি এমন সুসমঞ্জস সমাজব্যবস্থা এবং সর্বমঙ্গল্য যৌথজীবন সে গড়িয়া লইতে পারে, যাহার ফলে মর্ত্যের মানুষের চিরদিনের স্বপ্ন সেই 'সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী'-কে সে বাস্তবে জীবন্ত রূপ দিতে পারে, তবে বিজ্ঞানের ব্যবহারক্ষেত্রে এই জয়যাত্রা বিশ্বকল্যাণের লক্ষ্যেই হইতেছে, সন্দেহ নাই।

কিন্তু 'যদি' বলিয়া ঐ যে সর্তটি করা হইল, সেটি বড়ই বড় সর্ত, এবং সে-পরিমাণে দুষ্প্রতি-পাল্যও বটে। মানবের ইতিহাস নানা যুগে নানান বর্ত্ম অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে ঐ একই সর্তের পূরণে, ঐ একই সমস্যার সমাধানে। এখনও তাই। সমাধানের প্রকৃতি- ও পদ্ধতিভেদে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সংঘর্ষও হইয়াছে বহুবার, এখনও হইতেছে। নববিজ্ঞান সত্য-সমাধানের এক মহাশক্তিসমৃদ্ধ সাধনপদ্ধতি আমাদের বাতলাইলেন। প্রাচীন প্রজ্ঞানও তাহা করিয়াছেন। প্রাচীন, বিশেষ করিয়া বিদ্যা, শ্রদ্ধা এবং উপনিষৎ (correct mode, correct mood and correct under-standing)—এই ত্রিবেণী-সঙ্গমের বার্তা শুনাইয়াছেন, আমাদের সাধনকে বীর্যবত্তর এবং কুশলতর করিবার নিমিত্ত। নবীনের আজ্ঞায় সে প্রাচীন আপনাকে সরাসরি 'বাতিল বকেয়ার' উপেক্ষিত প্রস্তুস্তূপে ফেলিতে এখনও নারাজ। যেটি সত্য, শিব, সুন্দর, তাহার সম্বন্ধে 'সনাতন' বলিয়া তাহার বিশ্বাসে ও প্রত্যয়ে একটা কিছু আছেই। আছে বলিয়া, সে যেমন ঐ সেদিন-কার চন্দ্রমণ্ডল-পরিক্রমাকে সসম্ভ্রমে অভিনন্দন করিল, তেমনি আবার বেশী করিয়া, সমগ্র আকূতি দিয়া অভিনন্দন করিল—মহাকাশযাত্রী ব্যোমযানের ঐ ঈশ্বরোদ্দেশে যুক্ত-করপুট প্রার্থনাটিকে—

"Give us, O God, the vision which can see Thy love in the world inspite of human failure.

Give us the faith to trust Thy good-ness inspite of our ignorance and weakness. Give us the knowledge that we may continue to pray with understanding hearts, and show us what each one of us can do to set forward the coming of the day of universal peace. Amen."

হে ঈশ্বর! সেই অভ্রান্ত দৃষ্টিদীপ জ্বালাও যাহাতে এত হিংসোন্মাদনার মধ্যেও তোমার এই সৃষ্টি-রচনাকে তোমার প্রেমেরই প্রতিস্ফুরণ ও অভিব্যক্তিরূপে দেখিতে পারি; সেই আত্মবিশ্বাস ও নির্ভর দাও, যাহাতে মানুষের সকল অপূর্ণতা ও দুর্বলতার মাঝে তাহার ভাগবতী সত্তায় ও মহত্ত্বে শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি; দাও সেই বোধি বা সংবিৎ, যেটি আমাদের প্রত্যেককে এবং বিশ্বমানবকে যথার্থ কল্যাণের পন্থা দেখাইবে এবং বিশ্বশান্তির সাধনে উদ্‌বুদ্ধ করিবে!

এ প্রার্থনায় ধ্বনিত হইতেছে সেই শাশ্বত অমৃত অভয়ের বাণী, যে বাণী শোনাইবার জন্য এ দেশের ঋষি একদিন গাহিয়াছিলেন—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'। এই বাণী শোনার পর, এ বাণীর যেটি 'উপনিষৎ', কিনা, মর্ম, তাহাতে ধীর সমাহিত হইতেও বলিয়াছেন। কেন না, সত্যের সাক্ষাৎ প্রত্যয়ের ক্রমই তাই। তাই না ভাগবতের আদিতে এবং অন্তে—'ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি', 'তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি!' হ্যাঁ—শ্রবণের পর স্থিতধী হইতে হইবে, তবে না স্থিতপ্রজ্ঞ!

এ বাণী বেদান্তের বাণী। সকল কুণ্ঠাকার্পণ্য-দোষ বিদূরিত করিবার নিমিত্তই এ উদাত্ত পাঞ্চজন্য-শঙ্খধ্বনি শ্রীভগবানের মুখে। স্বামীজীর মুখে এই ধীরোদাত্ত বিশ্বজনীন অভয় অমৃত বাণীই আমরা শুনিয়াছি। সেই অমোঘ শাশ্বত বাণীর আজ জয় দিতেছি—বিজ্ঞানের অহঙ্কার বিজয়গৌরবের যে কর্ণভেদী তূর্যনাদ, তাহার মাঝেই। সে তূর্যনাদে আজ মনে হয় বিশ্বকর্ণ বধির! বোরমানের ঐ প্রার্থনা কেই বা কান পাতিয়া শুনিল জানি না। হয়তো বা কোথাও অবিশ্বাস এবং বিদ্রূপের চটুল হাস্যরোল শোনা যাইতেছে, মানবাত্মার বহিঃপ্রকোষ্ঠে, বেপরওয়া আলাপ-অপলাপের বৈঠকে। কিন্তু তথাপি বিরূপ বিভ্রান্ত হইলে চলিবে না তো আজ! সর্ববিধ ব্যবহার-জীবনের আস্তরণতলে যে মহাবিস্ফোরকরাশি পুঞ্জীভূত, তাহাদের গোপন 'ফিউজে' আগুন লাগিতে কি বড় বেশী বিলম্ব আছে?

মহাকাশবিজয়িনী বিজ্ঞানবিদ্যা এবং তৎ-প্রসাদে লব্ধ বা লব্ধব্য মহীয়সী ঋদ্ধির জয় গাহিয়া, আর সেই সঙ্গে তাহার আত্মঘ্ন হইবার যে আসন্ন অথবা দূর সম্ভাবনাটিও রহিয়াছে, এবং সে সম্ভাবনা যে কোথায়, কেনই বা রহিয়াছে, সেটি তাহাকে, চিরন্তনী যে প্রজ্ঞানোজ্জ্বল সত্যদৃষ্টি, সে দৃষ্টিতে একটিবার দেখিতে বলিয়া, আমরা আজিকার প্রথম কথাটি শেষ করিয়াছি। আমরা বলি—বিজ্ঞান এবং তাহার অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যত না মত-ও পথবিরোধ, আর তাহার অন্তরে যত না ভয়-ভরসার পাল্লাপাল্লি চলিতে থাকুক, তাহার অন্তরতম অথচ নেপথ্য আকূতি ঐ প্রার্থনায়, যেটি উদ্ধৃত করিয়াছি। মানবসত্তা ভাগবতী সত্তা, তাহার আকূতি অনুরূপ হইবার তো কথা নয়! বেদের ভাষায় ঐ আকূতি 'সমানী' হউক! সে অমানী বা বিমানী হইয়া আজও গুমরিয়া কাঁদিয়া মরিবে?

তাই চাই—কেবল মহাকাশবিজয়ী নয়, মহাকালবিজয়ী। এরূপ মহাকালবিজয়ী মহা-মানব (যাঁহাদের যুগাবতার বলি) আসিয়া থাকেন জীবের সঙ্কট-মুহূর্তের সন্ধিক্ষণে। উনবিংশের শেষার্ধ আর এই বিংশ শতাব্দীর সবটাই সন্ধিক্ষণ। সন্ধিক্ষণে আসিলেন মহামানব স্বামী বিবেকানন্দ। শিকাগোয় সর্বধর্ম-সম্মেলনে যাইয়া তিনিই মঙ্গলভৈরব নাদে জগৎকে শুনাইলেন—ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার সারাৎসার সাম্য, শান্তি, ঋদ্ধি ও মুক্তির বাণী। শোনাইলেন —যাহার দ্বারা সর্বাঙ্গীণ এবং সর্বতোভদ্র অভ্যুদয়, আর তাহার ফলে সর্ববিধ অনাত্মবন্ধন হইতে মুক্তি হয়, অর্থাৎ যাহার পর শ্রেয়ঃ নাই সেটি লাভ হয়, তাহাই ধর্ম। 'সর্বং ব্রহ্মোপ-নিষদম্', 'আত্মৈবেদং সর্বম্'—এই পরম প্রত্যয়। এ ধর্মে মানবসত্তার অবদমন ও অবমাননার এতটুকুও স্থান নাই। যে সর্বহারা তাহাকে শোষণ করা দূরে থাকুক, তাহাকে আপন আত্মা অথবা নারায়ণ-বুদ্ধিতে সেবা করাই ধর্ম। এ-হেন যে ধর্ম তাহাতে কদাপি দুর্গতি হয় না,

ধর্মের গ্লানিতেই সেটি ঘটিয়া থাকে। ইহাই মানবাত্মার প্রকৃত স্বধর্ম, এ ধর্মের গ্লানি হইল পরধর্ম বা অনাত্মধর্ম, যেটির সম্বন্ধে গীতা বলিয়াছেন—এ সৃষ্টিমহীরুহ 'ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখ' (কিনা, ভাগবতী শক্তিই এর মূলে) বটে, তবে ঐহিক বাস্তব যে 'মাটি' সেটিকে উপেক্ষা করিয়া নয়। সে মাটিকেও সে দেখে 'মা-টি'! ব্রাহ্মী দৃষ্টিতে জড়ে জাড্য বা জড়িমা নাই। অসীম স্বলসিত বস্তুর সীমিত অলসিত রূপ। যেন—শ্রীরামের পদপঙ্কজ-পরাগপরশ-বিধুরা অভিশপ্তা পাষাণী অহল্যা। তাই জড়ে ডর কি, চিতে চিদৈকস্বরূপে ভূতের ভয়ই বা কেন? তার জীবনবেদের মন্ত্র—'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥' এরূপ সর্ব-সমন্বয় এবং সর্বথা সামঞ্জস্যের বাণী স্বামীজী আমাদের শুনাইতেছেন। তাঁহার শিক্ষায় ভোগ শুধুই মর্ত্যের ধূলিতে লুটাইয়া থাকে না. সে হয় ব্রজের রজঃ অথবা মহাযোগীশ্বর শিবশঙ্করের অঙ্গের ভস্ম-বিভূতি!

এতো গেল ভক্তরসিক আর প্রজ্ঞানদৃষ্টির সমাচার। শুধু কি প্রজ্ঞান? বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও এ মরতের ধূলি ধূলিই--ইতর, অপাংক্তেয়—যতক্ষণ সে এই মাটিতে লুটাইয়া থাকে। ঊর্ধ্ব-সমীরণে যখন সে ধূলি ঐ অভ্রলোকে উঠিয়া যায়, তখন সে শুধু অপরূপ-রঞ্জনশিল্পকুহকী যাদুকরীটি নয়, সে তখন আপন ধূসর ক্ষুদ্র অঙ্গে তড়িৎকণার ওড়না জড়াইয়া হয় জ্যোতিষ্মতী—মরতের নিখিল প্রাণের পালয়িত্রী। বিজ্ঞান বলে—ব্যোমের ঐ বিপুল প্রশান্ত নীলিমা, উদয়াস্ত-গগনের ঐ হিরণ্য লাবণ্য, এ সবই ঐ অভ্রলোকচারিণী ধূলিটির মহিমায়; আবার, সিন্ধুর বাষ্পও তড়িৎকণাসমৃদ্ধা ঐ ধূলিটি না পাইলে মেঘের জলবিন্দুরূপে ঘনীভূত হয় না। তাই প্রকৃতি ধরার ধূলিকে ধরাতেই লুটাইয়া রাখে নাই। বৈরাজবিশ্বে ধূলির যে মাহাত্ম্য সে তো কোটিকণ্ঠে কীর্তন করিয়াও শেষ করা যায় না। ঊর্ধ্বে তাহার অভিযান এই ধরণীকে সব রকমেই সুন্দর, সফল ও সার্থক করিয়াছে। তাই বেদান্ত ধূলিকে অবজ্ঞা করিতে বলে না। ধূলিতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিতেই শেখায়। শুধু তাই নয়—ধূলিতেও 'মধুব্রহ্ম'—'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ'। চিরন্তনী যে মানবীয় প্রজ্ঞা, তাহার এই দুটি পক্ষপুট—বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান। এ দুয়ের কোনটিকে পঙ্গু, দুর্বল করিতে নাই। তাহারা দুটিতেও সেই—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া"—স্বামীজী এটি ভালমতেই মনে রাখিতে বলিয়াছেন

ভূতে জাড্যং কিয়াঙ্ক্যং চিতি পরিলসনং
নৈশখদ্যোতলাস্যং
সাম্যং সখ্যঞ্চ সৌখ্যং হৃদি নিজরমণং
হার্দহীনেঽপি বিশ্বে।
আত্মৈবেয়ং ত্রিলোকী চিরমভয়পদং চামৃতং
প্রত্যগাত্মা
ভূতে মূর্তশ্চ সোঽয়ং জহিহি শুচমিতি
স্বামিসূরীন্দ্রবাণী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণবিবেকানন্দৌ বিজয়েতাম্॥

ওঁ শান্তিঃ॥

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সাময়িক পত্র

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

এই চিঠি থেকেই দেখা যায়, স্বামীজী মাদ্রাজী ভক্তদের মধ্যে আলাসিঙ্গার কর্মদক্ষতায় সর্বাধিক আস্থাবান ছিলেন, এবং তাঁরই নির্দেশে আলাসিঙ্গা পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হয়েছিলেন।

ব্রহ্মবাদিনের থিয়জফি-প্রীতির বিষয়ে সন্দেহ দূর করতে আলাসিঙ্গা অতঃপর ১৫ ফেব্রুআরী সংখ্যায় আমেরিকা থেকে প্রেরিত কৃপানন্দের এক চিঠি ছাপলেন, যার মধ্যে আমেরিকায় থিয়জফি-রহস্যবাদের অতি শোচনীয় রূপ চিত্রিত।[৮] এবং তারপরে ১৪ মার্চ ম্যাক্সমূলারের যে-পত্রটি ছাপলেন, তাতে পুনশ্চ পণ্ডিতপ্রবরের থিয়জফির বিরুদ্ধে আপত্তির চেহারা দেখা গেল। ম্যাক্সমূলার লিখেছিলেন—"I have read with great pleasure the numbers of the *Brahmavadin* which you have kindly sent me. What I like is the spirit of pure Hinduism, more particularly Vedantism, unadulterated by so-called Theosophy."

এই পত্রের তলায় সম্পাদকের পক্ষ থেকে ব্রহ্মবাদিনের নীতির পুনর্ঘোষণা ছিল, যা ম্যাক্সমূলারকে জানাবার জন্য প্রধানতঃ লেখা হয়নি, হয়েছিল স্বামীজীকে আশ্বস্ত করবার জন্যই।—

"We heartily thank the Professor (Max Muller) for the advice he has given us and wish to assure him that, although we have no kind of quarrel with the 'so-called Theosophy' and the Theosophists, we find both it and them to be too occult for our understanding. It is our declared policy to propagate 'the spirit of pure Hinduism' in open day-light without any resort to the more or less dark shadows of occultism and mystic magnetism ; and in the editorial columns of the very first number of the *Brahmavadin* may be found the following statement of our view in regard to the matter,—"The sublime rationality of the Vedanta can allow the roughest handling of it, without the slightest injury to itself, and although it is sometimes spoken as *Rahasya, Guhya,* as something secret and hidden, it stands in no need of mystic justification."

স্বামীজী আশ্বস্ত হয়েছিলেন। ব্রহ্মবাদিনের আর্থিক দিকটায় তিনি আবার মনোযোগ দিলেন। টাকা পাঠালেন[৯], সকলকে গ্রাহক সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন, এবং তাতেও যখন ব্রহ্মবাদিনের অর্থকষ্ট দূর হল না, তখন ৬ অগস্ট, ১৮৯৬ তারিখে সুইজারল্যাণ্ড থেকে পুনশ্চ লিখে পাঠালেন—

"ব্রহ্মবাদিন্ কতটা আর্থিক দুরবস্থায় পড়েছে, তা তোমার পত্রে জানলাম। লণ্ডনে যখন ফিরে যাব, তখন তোমায় সাহায্য করতে চেষ্টা ক'রব।

[৮] চিঠিটি অন্যত্র থিয়জফি-প্রসঙ্গে দিয়েছি।

[৯] "এই সঙ্গে পত্রিকার জন্য তোমাকে ১৬০ ডলার পাঠালাম। আমি আমার শিষ্যদের বলেছি, যাতে তারা তোমার জন্য কিছু গ্রাহক সংগ্রহ করে।" (মার্চ, ১৮৯৬)

তুমি সুর নামিও না যেন—কাগজখানি চালিয়ে যাও; অতি শীঘ্রই এমন সাহায্য করতে পারব যে, বাজে শিক্ষকতার কাজ থেকে তুমি অব্যাহতি পাবে। ভয় পেও না; বড় বড় সব কাজ হবে, বৎস! সাহস অবলম্বন কর। 'ব্রহ্মবাদিন্' একটি রত্নবিশেষ, একে নষ্ট হ'তে দেওয়া হবে না। অবশ্য এ-জাতীয় পত্রিকাকে সর্বদাই ব্যক্তিগত বদান্যতার দ্বারা বাঁচিয়ে রাখতে হয়, আর আমরা তাই ক'রব। আরও মাস-কয়েক আঁকড়ে পড়ে থাকো।··· ভয় পেও না; টাকা ও আর সব শীঘ্রই আসবে।"

এর দুদিন পরেই ৮ আগস্ট আলাসিঙ্গাকে আবার লিখলেন—"কয়েকদিন পূর্বে তোমায় একখানি পত্র লিখেছি। সম্প্রতি আমার পক্ষে তোমায় জানান সম্ভবপর হয়েছে, ব্রহ্মবাদিন্-এর জন্য আমি এইটুকু করতে পারব: তোমায় দু-এক বছরের জন্য মাসিক ১০০্ টাকা হিসাবে অর্থাৎ বছরে ৬০ বা ৭০ পাউণ্ড হিসাবে, যাতে মাসে ১০০্ পুরা হয়, এমন সাহায্য করতে পারব, তাতে তুমি নিজে স্বাধীন হয়ে ব্রহ্মবাদিন্-এর কাজ করতে পারবে ও সেটিকে ভাল ক'রে দাঁড় করাতে পারবে। মণি আয়ার এবং অন্য কয়েকটি বন্ধু কিছু টাকা তুলে পত্রিকার মুদ্রণ প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহ করতে পারেন। গ্রাহকদের চাঁদা থেকে কত আয় হয়? তা খরচ ক'রে ভাল ভাল লেখকদের কাছ থেকে ভাল ভাল প্রবন্ধ সংগ্রহ করা চলে না কি? ব্রহ্মবাদিনে যা কিছু বেরুবে, তার সবটাই যে সকলকে বুঝতে হবে, তার কোন মানে নাই; কিন্তু দেশপ্রেম-প্রণোদিত হয়ে ও পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য সকলের এ-পত্রিকার গ্রাহক হওয়া উচিত—অবশ্য আমি হিন্দুদের লক্ষ্য করেই এ কথা বলছি।···ব্রহ্মবাদিন্‌টিকে ভালভাবে পরিচালনা করার উপর তোমার মুক্তি নির্ভর করে, এই ভাব নিয়ে উদ্দেশ্য-সিদ্ধি-বিষয়ে পূর্ণ নিষ্ঠা প্রয়োজন। এই পত্রিকাই তোমার ইষ্টদেবতা-স্বরূপ হোক; তাহলেই দেখবে সাফল্য কেমন ক'রে আসে।···এই চিঠি পেয়ে তুমি আমায় 'ব্রহ্মবাদিন্'-এর সমস্ত আয়ব্যয়ের একটা পরিষ্কার হিসাব পাঠিও—যাতে আমি বুঝতে পারি, কি করা উচিত। মনে রেখো—অখণ্ড পবিত্রতা ও গুরুর প্রতি স্বার্থশূন্য একান্ত আজ্ঞাবহতাই সকল সিদ্ধির মূল।

"দু-বৎসরের মধ্যে আমরা ব্রহ্মবাদিন্-কে এরূপ দাঁড় করাব যে পত্রিকার আয় থেকে শুধু যে খরচ চলে যাবে তা নয়, স্বতন্ত্র একটু আয়ও হবে। বিদেশে ধর্মপত্রিকার বেশী কাটতি হওয়া অসম্ভব; সুতরাং হিন্দুদের মধ্যে যদি এখনও কিছুমাত্র ধর্মজ্ঞান বা কৃতজ্ঞতা অবশিষ্ট থাকে তবে এ পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা তাদেরই করতে হবে।"

শুধু টাকাকড়ি নয়, ব্রহ্মবাদিনের সব কিছুতে স্বামীজীর মনোযোগ থিয়জফিষ্টদের সঙ্গে আপস যেমন চাইতেন না, তেমনি অযথা কলহেও তাঁর প্রবৃত্তি ছিল না। সুতরাং থিয়জফিষ্টদের নিন্দাপূর্ণ কৃপানন্দের রচনাটির প্রকাশ তিনি সমর্থন করলেন না।[১০] পত্রিকার প্রবন্ধ বা সম্পাদকীয়তে দুর্বোধ্য তাত্ত্বিকতা বা পারিভাষিক শব্দব্যবহারে বারবার আপত্তি জানালেন, কারণ তাঁর মতে, ব্রহ্মবাদিনের

১০ "তোমরা ব্রহ্মবাদিনে কৃপানন্দের একখানা পত্র ছেপেছ, কাজটা ভাল হয়নি।···ব্রহ্মবাদিনের সুরের সঙ্গে ওটি খাপ খায় না।···কোনো সম্প্রদায়—ভালই হোক আর মন্দই হোক, তাদের বিরুদ্ধে ব্রহ্মবাদিনে কিছু ছাপানো যেন না হয়। অবশ্য বুজরুকদের প্রতি গায়ে পড়ে সহানুভূতি দেখাবারও কোনো আবশ্যক নেই। (১৮৯৬-এর চিঠি)

দায়িত্ব হল 'সারা পৃথিবীকে সম্বোধন করে কথা বলা।'[১১]

পাক্ষিক ব্রহ্মবাদিন্‌কে[১২] কিছুদিনের মধ্যে মাসিকপত্রে পরিবর্তিত করতে চান আলাসিঙ্গা। ১৮৯৬, ২২শে সেপ্টেম্বর স্বামীজী ইংলণ্ড থেকে আলাসিঙ্গাকে লিখিত পত্রে ব্রহ্মবাদিন্‌ সম্বন্ধে আবার বিস্তারিত আলোচনা করেন যার শেষাংশে পূর্বোক্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে এবং ব্রহ্মবাদিনের আদর্শরূপ সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য আছে—

"যথেষ্ট প্রবন্ধ দিয়ে কাগজখানিকে বড় করতে পারবে—এমন ভরসা যদি না থাকে, তবে এখনই ওটিকে মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করা আমার ভাল মনে হচ্ছে না। এ পর্যন্ত তো পত্রিকার আকার ও প্রবন্ধগুলি আশানুরূপ নয়। এখনও অনেক বিশাল ক্ষেত্র পড়ে আছে, যেখানে আমরা প্রবেশও করিনি; যথা—তুলসীদাস, কবীর, নানক ও দক্ষিণভারতীয় সাধুদের জীবন ও বাণী। এসব অসাবধানে ও যা-তা ভাবে না লিখে সঠিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে লেখা উচিত। প্রকৃতপক্ষে এ পত্রিকার আদর্শ বেদান্ত-প্রচার তো হবেই, তা ছাড়া এটি ভারতীয় গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের মুখপত্র হবে—অবশ্য ঐ গবেষণাদি হবে ধর্ম সম্বন্ধে। তোমার উচিত কলকাতা ও বোম্বের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সংস্পর্শে আসা ও তাঁদের কাছ থেকে সযত্নে রচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ করা।"

এর কয়েকমাস পরে ১৮৯৬, ২০ নভেম্বর স্বামীজী ব্রহ্মবাদিনের ক্রমোন্নতিতে আনন্দিত হয়ে পরিতৃপ্তির সঙ্গে লিখলেন—"এখন তো আমাদের ইংরাজী পত্রিকাখানি দাঁড়িয়ে গেছে; অতঃপর বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় কয়েকখানা আরম্ভ করতে পারি।"

বৎসরাধিক পরিশ্রমের ও উদ্বেগের অন্তে স্বামীজী যে লিখতে পারলেন, পত্রিকাটি দাঁড়িয়ে গেছে—তা কিন্তু সত্য সত্যই কোনদিন দৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারেনি। স্বামীজীর প্রেরণা ও সাহায্য, এবং আলাসিঙ্গার প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে পত্রিকাটি আলাসিঙ্গার মৃত্যুকাল অবধি প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু তারপরে আলাসিঙ্গার উত্তরাধিকারীদের

১১ "ব্রহ্মবাদিনে লম্বা লম্বা সংস্কৃত প্রবন্ধ থাকায় ইউরোপ ও আমেরিকায় উহা চলার সম্ভাবনা অল্প। তুমি ওটাকে তাহলে তো গোটা সংস্কৃতে ছাপলেই পারো। সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ এবং অফুরন্ত সংস্কৃত শ্লোকাদি উদ্ধৃত করলে হিন্দুদের ও সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের হয়তো বেশ সাহায্য হ'তে পারে, কিন্তু সাধারণ পাশ্চাত্যবাসী তো আর তোমার হিন্দু দর্শনের ধার ধারে না। একান্ত যদি রাখতে চাও তো না হয় একটা প্রবন্ধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ কর—বাকিগুলিতে সংস্কৃত শব্দ না থাকাই উচিত এবং লেখা হালকা হওয়া উচিত। আমার যে সাফল্য হচ্ছে, তার কারণ আমার সহজ ভাষা। আচার্যের মহত্ত্ব হচ্ছে—তাঁর ভাষার সরলতা। তুমি যদি জনসাধারণের উপযুক্ত ক'রে বেদান্ত সম্বন্ধে লিখতে পারো, তবে 'ব্রহ্মবাদিন্‌' এখানে জনপ্রিয় হবে—নতুবা নয়। যে কয়জন গ্রাহক হয়েছে, তারা শুধু আমার প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার ফলে।" (২৩ মার্চ, ১৮৯৬)

"আবার তোমাদের জানিয়ে রাখছি, কাগজটা এতই পারিভাষিক হয়ে পড়েছে যে, এখানে এর গ্রাহক বড় হবে না। সাধারণ পাশ্চাত্যদেশবাসী ঐ সব দাঁতভাঙ্গা সংস্কৃত কথা বা পরিভাষা জানেও না, জানবার বিশেষ আগ্রহও রাখে না। এইটুকু আমি দেখছি যে, কাগজটা ভারতের পক্ষে বেশ উপযোগী হয়েছে। কোন একটা মতবিশেষের ওকালতি করা হচ্ছে, এমন একটি কথাও যেন সম্পাদকীয় প্রবন্ধে না থাকে। আর সর্বদা মনে রেখো যে তোমরা শুধু ভারত নয়, সমগ্র জগৎকে সম্বোধন ক'রে কথা ব'লছ; আর তোমরা যা বলতে চাইছ, জগৎ তার সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। প্রত্যেক অনূদিত সংস্কৃত শব্দ সাবধানে ব্যবহার ক'রো; আর ভাষা যতটা সম্ভব সহজ করবার চেষ্টা করো।" (১৮৯৬)

১২ ব্রহ্মবাদিনের Prospectus-এ সাপ্তাহিক পত্ররূপে ব্রহ্মবাদিন্‌কে আরম্ভ করার ইচ্ছার কথা বলা হয়েছিল।

যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও আর কয়েক বৎসর মাত্র চলে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। আলাসিঙ্গার দেহত্যাগের পরের বৎসর নভেম্বর মাসে এই পত্রিকার ব্যাপারে স্বামীজী ও আলাসিঙ্গার ভূমিকা সম্বন্ধে ব্রহ্মবাদিনে লেখা হয়—

"The Brahmavadin completes its fifteenth year of existence with the coming December issue. Next January, 1911, it will come of age according to the Hindu law. It sprang into being under the breath of the late lamented Swami Vivekananda. For five years it derived sustenance and nourishment from his loving hands, and fared like a *Raja*. During the next period of its apprenticeship and service as *Dasa*—a period of ten long eventful years—it has had much ado in trying to save itself from extinction. Only two events need here be mentioned. ··· One is the passing away of the Swami, the author and inspirer of this journal, the other, the passing away of Mr. M. C. Alasinga Perumal, our amiable and talented editor, to whose virtues we wish it were in our power to bear adequate testimony. That after the passing away of the revered Swami who inspired it, and after the death of Mr. Alasinga Perumal who nurtured it, the journal still lives is due to the power and glory of the hands that blessed it at its birth.··· Although the journal is not a success from a financial point of view, it has spared no pains in ministering to the higher needs of the public in its own humble way. The journal has all along endeavoured to be faithful to the high ideal with which the late Master inspired it, and has not willingly done aught that is in any way calculated to lower that ideal."

(*Brahmavadin*, November, 1910)

॥ ৫ ॥

ব্রহ্মবাদিনের ভিতরের ইতিহাস দেখলাম। সেই কঠোর সংগ্রাম, নৈরাশ্যের অন্ধকার, এবং তাকে অতিক্রম করার প্রাণপণ প্রয়াস। বাইরের ইতিহাসে কিন্তু অপরদিকে সমাদরের উজ্জ্বল আলোক। ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা পত্রিকাটি অজস্রভাবে পেয়েছিল। প্রকাশের পূর্বে এই পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে প্রচারিত প্রস্পেকটাস্‌টি[১৩] ভারতের অনেক পত্রিকায় প্রকাশিত ও সংবর্ধিত হয়।[১৪] ব্রহ্মবাদিন্ প্রকাশিত হবার পরেও প্রশংসিত হয় নানা মহলে। ইণ্ডিয়ান মিরার ২২ ডিসেম্বর, ১৮৯৫ তারিখের সম্পাদকীয়তে স্বামীজীর এই কাজকে ভারতের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল। মহাবোধি জার্নালও এই বিষয়ে ১৮৯৬, জানুয়ারীতে মন্তব্য করেছিল। ভারতের বাইরেও কয়েকটি কাগজে প্রশংসা বেরিয়েছিল।[১৫]

১৩ বিবৃতির তলায় স্বাক্ষর ছিল: "জি. ভেঙ্কটারঙ্গ রাও এম. এ; এম. সি. নানজুনডা রাও, বি. এ., এম. বি., ও. সি. এম; এম. সি. আলাসিঙ্গা পেরুমল, বি. এ."—এই তিনজনের।

১৪ যথা ইণ্ডিয়ান মিরার, ২৭ জুলাই, ১৮৯৫।

১৫ যেমন '*The world's advance thought of Portland Oreon.*' লেখে—"We gladly welcome to the journalistic brotherhood of those engaged in disseminating the Light of the New, the True and the Good, the *Brahmavadin*. He who reads this new, enlightened Hindu Publication will see that all truth is One and that the true religion of the soul is not bounded by geographical lines, nor restricted to certain creedal systems. Its editor is a ripe scholar and spiritual man. The *Brahmavadin* will be successful beyond the expectations of its projectors."

ইণ্ডিয়ান মিরার মন্তব্য করে—

"A new era of religious thought and aspiration is dawning everywhere, and it is hoped that *Brahmavadin* in its catholicity and unsectarian spirit will be in accord with the spirit of the age."

মিরারের এই আশা ব্রহ্মবাদিন্ কতখানি পূরণ করতে পেরেছিল, তার উত্তর পাই আলাসিঙ্গার মৃত্যুর পরে মাদ্রাজের বিখ্যাত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সান্ধ্য দৈনিক 'মাদ্রাজ মেল'-এর মন্তব্যের মধ্যে—

"He (Alasinga Perumal) was also instrumental, with the literary help of the Swamis of the Ramakrishna Mission in establishing the *Brahmavadin, the first and foremost Indian journal conducted in English, devoted to the exposition of Vedanta philosophy and to recording the progress of the Ramakrishna Movement, in various parts of the world.*"[১৬]

(বক্রলিপি লেখককৃত)

মিরার ও মাদ্রাজ মেলের উদ্ধৃত দুই মন্তব্যের মধ্যবর্তীকালে যে-ব্রহ্মবাদিন্ প্রকাশিত হয়েছিল, তার সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা এসেছে ম্যাক্সমূলারের মত শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক পণ্ডিতের কাছ থেকেও। ব্রহ্মবাদিনে প্রকাশিত প্রবন্ধের এক নির্বাচিত সংকলন বার করার কথা হয়।[১৭] তার ভূমিকা লিখে দিতে স্বীকৃত হন ম্যাক্সমূলার। সংকলন-গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু ম্যাক্সমূলার-লিখিত ভূমিকাটি পরে ব্রহ্মবাদিনে মুদ্রিত হয়েছিল, ১৯০১ খৃষ্টাব্দের জানুআরি মাসে। রচনাটি উদ্ধৃতির পক্ষে দীর্ঘ হলেও গুরুত্ব বিবেচনা করে মূলেই উপস্থিত করছি—

"Dear sir, I was very glad to hear that you intend to publish a selection of the articles bearing on the Vedanta philosophy which have appeared from time to time in your interesting journal, the *Brahmavadin*. I read most of the articles, when they appeared, but articles published in a journal whether weekly, monthly, or quarterly, are so soon forgotten and so difficult to find again that it would indeed seem to be a very good plan if the editors of every serious and scientific paper were to follow your example. ...This is particularly the case when a number of articles has come out during the year which have all a common subject, such as numerous articles which are contained in the twenty-four numbers of the *Brahmavadin* all treating of different aspects of the ancient and modern Vedanta philosophy and all intended to excite a more general interest in that marvellous system of philosophical and religious thought. I mean more particularly the papers contributed by Professor M. Rangacharyar of the Presidency College, Madras, Professor Vythinatham, formerly Professor of Philosophy at the same college, Mr. N. Ramanujam, of the Pschaippa's College, Madras, Mr. G. Venkata Rangam, of the same College, Professor Sundara

১৬ আলাসিঙ্গার দেহান্তের পরে 'ইণ্ডিয়ান রিভিউ' পত্রিকা ব্রহ্মবাদিন্ সম্বন্ধে লেখে—

"He (Alasinga) was also instrumental, with the literary help of the Swamis of the Ramakrishna Mission, in establishing the *Brahmavadin*, the first and foremost Indian journal conducted in English, devoted to the exposition of the Vedanta philosophy and to recording the progress of the Ramakrishna Movement in various parts of the world."

১৭ বইটির প্রস্তাবিত নাম—*Select Essays from Brahmavadin*.

Rama Iyer and several others. They treat of the religion, the ethics, the social ideals of the Vedanta, and though they do not pretend to give a complete and systematic representation of that philosophy, they touch on many points which are of great interest at the present moment when the philosophy elaborated by Badarayana in his Sutras, and fully explained by Sankaracharya and Ramanuja in their great commentaries, is beginning to claim its rightful place among the classical systems of philosophy, which have ruled the minds of men for more than the last two thousand years. It may seem indeed to superficial observers as if the very age of the Vedanta proved it to be an antiquated system of thought, not likely to help us at the present day or influence in any way our own philosophical speculations. This would be very true with regard to scientific observations, but the great problems of philosophy are the same to-day as they were thousands of years ago, and neither the careful observations on the developments of cells, or the watching of the operations of our physical organs concomitant with our perceptions, or what has truly been called Physical Psychology, is likely to bring us one step nearer to that borderland where the objective world ends and that of the subject begins.

It is right therefore that we should turn our eyes to every quarter from which new light may reasonably be expected on the ancient problems of the world, the same to-day as they were thousands of years ago. And here I know of no philosophy that has a better right to be heard and to be studied by our own philosophers than the ancient philosophy of India, and more particularly the Vedanta philosophy. Of course the principal documents in which that philosophy would be studied are the Upanishads, the Sutras and their commentaries. These we possess now in good editions and in good translations also. But what is peculiar to the Vedanta is its longevity. If it is the oldest philosophy in india, it is also the newest, for it sways the thoughts of your countrymen as much as ever. Of late years its rejuvenescence has been most surprising, and while in Europe we hardly find a single man excepting, it may be, a special scholar, who would still call himself a Platonist, or even a Cartesian or Spinozist without very considerable reservations, there are in India ever so many journals, ever so many societies which proclaim doctrines of the Vedanta, and see in them their only guide towards the truth. With many of the religious reformers of India, when the Veda had failed them the Vedanta stepped in, and if you asked those who formerly would have called themselves worshippers of Siva or Vishnu, or even simply Vaidiks, most of them would probably now prefer to be called Vedantists, whether following the interpretation of Sankarachariya or Ramanuja."

॥ ৬ ॥

ব্রহ্মবাদিন্-প্রসঙ্গ শেষ করার আগে আবার এই পত্রিকার স্থপতি আলাসিঙ্গা পেরুমলের

ব্যক্তি-চরিত্রের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করব। নিষ্কাম কর্মের যদি কোনো প্রতীক থাকে—সে এই আলাসিঙ্গা পেরুমল। তাঁর দেহ-ত্যাগের পরে মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকার মন্তব্যে ভারতের ধর্মজাগরণের ইতিহাসে আলাসিঙ্গার ভূমিকার চমৎকার উপস্থাপনা আছে :

"স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর জীবনোদ্দেশ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের মধ্য দিয়ে তিনি (আলাসিঙ্গা পেরুমল) এদেশের সাম্প্রতিক ধর্মজাগরণের ক্ষেত্রে অসাধারণ কাজ করে গেছেন। বস্তুতঃ বলা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ যখন দক্ষিণভারত ভ্রমণকালে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অপরিচিত সন্ন্যাসিরূপে মাদ্রাজে উপস্থিত হন, তখন এঁর অন্তর্দৃষ্টিতেই তাঁর মহিমা ধরা পড়ে, এবং ইনিই দেশবাসীর কাছে তাঁকে উপস্থিত করেন। ১৮৯৩ সালে শিকাগোর সু-মহান ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের পক্ষ সমর্থনের জন্য স্বামীজী এঁরই চেষ্টার ফলে যেতে পেরেছিলেন। স্বামীজীর প্রত্যাবর্তনের পরে কন্যাকুমারিকা থেকে হিমালয় পর্যন্ত ভূখণ্ডে ক্রমান্বয়ে যেসব সংবর্ধনা ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, তার মূলেও প্রধানতঃ ছিল স্বামীজী ও তাঁর কাজের জন্য এঁর ভালবাসা ও উদ্দীপনা। স্বতঃই ইনি অতীব অমায়িক ও সহৃদয় মানুষ, বন্ধুগোষ্ঠী সেজন্য খুবই বৃহৎ ছিল। বিবেকানন্দ মিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন বলে বেদান্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ভারতের, এবং ইওরোপ-আমেরিকার বহু কর্মীর সঙ্গে এঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, এবং তাঁদের উচ্চ শ্রদ্ধা ও প্রীতি ইনি লাভ করেছিলেন। বেদান্তের আধুনিক প্রবক্তারূপে সুবিখ্যাত ভূমিকা গ্রহণ করার পরেই স্বামী বিবেকানন্দ ইংরাজিতে একটি ধর্মসম্বন্ধীয় পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজন অনুভব করেন, যে পত্রিকার দ্বারা ইউরোপ ও আমেরিকায় হিন্দুধর্মকে তার সর্বাধিক বুদ্ধিগ্রাহ্য ও সার্বভৌমিক রূপে উপস্থিত করা যাবে। এ ব্যাপারে তাঁর কর্মধারার একান্ত সমর্থক ও সবিশেষ অনুগত আলাসিঙ্গা পেরুমলের কাছেই কথাটি পাড়েন। আলাসিঙ্গা তৎক্ষণাৎ কাজটি গ্রহণ করলেন। বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত ভারতীয় বন্ধুর সক্রিয় সহযোগিতায় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পত্রিকা বার করলেন, স্বামীজীর নির্দেশে পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নাম হল 'ব্রহ্মবাদিন্'। পনের বছর ধরে পত্রিকাটি চলছে। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি প্রেম ও ভক্তিতে যে পত্রিকাটি তিনি আরম্ভ করেছিলেন, তার পত্রে পত্রে আলাসিঙ্গার অদম্য উৎসাহ ও উচ্চ আদর্শের পরিচয় ছড়িয়ে আছে। ব্রহ্মবাদিন্‌কে কেন্দ্র করে আলাসিঙ্গার কার্যকলাপকে তাঁর জীবনের মূল কীর্তি বলা চলে। পত্রিকাটির উচ্চ মান তিনি কখনই নামাননি, তার জন্য বহু দুর্ভোগ ঘটেছে, প্রভূত আত্মত্যাগ করতে হয়েছে। এই ধরনের আরও কত কাজই না তাঁর পক্ষে করা সম্ভব ছিল! তাঁর অকালমৃত্যু তাই দেশের পক্ষে বিরাট ক্ষতি। সেবাই ছিল তাঁর ব্রত; বিপদে বা প্রয়োজনে মানুষ যখন তাঁর সাহায্য চেয়েছে সানন্দে তিনি তা দিয়েছেন। বিধবা মা, চার পুত্র ও এক কন্যার একটি পরিবার তিনি রেখে গেছেন। তাঁর অকাল মৃত্যুর সংবাদ সারা দেশ জুড়ে তাঁর অগণিত বন্ধুবান্ধব, ও ভক্ত ছাত্রদের হৃদয়ে গভীর শোকচ্ছায়া বিস্তার করবে। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তাঁর স্নেহময় অঙ্কে এই পবিত্র মহান আত্মাটিকে গ্রহণ করুন; প্রার্থনা করি, উচ্চ কর্তব্যবোধ নিয়ে একাগ্রচিত্তে মরজীবনে যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনি ব্রতী ছিলেন, তা যেন সত্যই সফল হয়।" (অনূদিত)

আলাসিঙ্গার কর্মপ্রচেষ্টার মূল অংশ ব্রহ্মবাদিন্ গ্রাস করে থাকলেও উদ্বৃত্ত প্রবাহে আরও বহু ভূমি সিঞ্চিত হয়েছিল। এ বিষয়ে কিছু তথ্য পাই 'দিনমণি' পত্রিকার পূর্বোক্ত রচনায় :

"১৯০৭ সালে থিরুমলাচার্য আলাসিঙ্গার সঙ্গে যোগ দেন ব্রহ্মবাদিন্‌কে ভালভাবে পরিচালনা করার জন্য। কিন্তু থিরুমলাচার্য রাজনীতিতে চরমপন্থী। ব্রহ্মবাদিনে রাজনৈতিক বিষয় আমদানি করলে সরকার পত্রিকাটির ক্ষতি করতে পারে, এই আশঙ্কা করে থিরুমলাচার্য ব্রহ্মবাদিন্ প্রেস থেকে আর একটি স্বতন্ত্র পত্রিকা আরম্ভ করলেন, তার নাম 'ইণ্ডিয়া'। কিছুদিন পরে 'ইণ্ডিয়া' তার নিজস্ব প্রেস থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। আলাসিঙ্গা লেখায় তেজ-বীর্য চাইতেন, তাই 'ইণ্ডিয়া'-তে তিনি কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীকে আনালেন। ভারতী তখন 'স্বদেশমিত্রম্'-এ কাজ করছিলেন।" (বেদান্তকেশরী দ্রষ্টব্য, ডিসেম্বর, ১৯৪১)[১৮]

এ বিষয়ে সুবিখ্যাত তামিল কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী 'ইণ্ডিয়া' কাগজে যা লিখেছিলেন, তার অংশ—

"দু-ধরনের দেশপ্রেমিক আছেন ; এক ধরনের যাঁরা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন, অন্য ধরনের যাঁরা যবনিকার অন্তরালে থাকেন, নামযশের জন্য বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা করেন না।

·আলাসিঙ্গা শেষোক্ত ধরনের। পচিআপ্পা কলেজে তিনি দীর্ঘদিন প্রধানশিক্ষক ছিলেন। অন্য অনেকগুলি কাজও তাঁর ছিল। এই সকল কাজের মধ্যে থেকেও তাঁর হৃদয়ে অনির্বাণ ছিল দেশপ্রেমের অগ্নি। বর্তমান লেখককে আলাসিঙ্গা প্রভূত সাহায্য করেছেন, তাঁর সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা ও বন্ধুত্বের সহায়তা আমি পেয়েছি। এই 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকা যাঁদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তিনি তাঁদের অন্যতম। ভগিনী নিবেদিতাকে যখন আমি কলকাতায় বলেছিলাম, 'মাদ্রাজে আপনার মত বয়সের কোনো দেশপ্রেমিক নেতা নেই যিনি আমাদের মত তরুণদের নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করতে পারেন, এক্ষেত্রে আমরা কী করব বলুন?' ভগিনী উত্তর দিয়েছিলেন, 'কেন, আলাসিঙ্গা রয়েছেন! জনজীবনের ব্যাপারে যদি কোনো প্রশ্ন জাগে, তাঁর কাছ থেকে তা তোমরা পরিষ্কার বুঝে নিতে পারো।"

আলাসিঙ্গার ত্যাগ ও স্বাধীনচিত্ততা বিষয়ে পাই—

"অভাব যদিও লেগেই থাকত, তাহলেও নিজের সামান্য আয়েই আলাসিঙ্গা সন্তুষ্ট থাকতেন। অর্থ বা ক্ষমতার লোভ তাঁর কখনই ছিল না। একবার স্বামী বিবেকানন্দের এক ধনী আমেরিকান শিষ্য আলাসিঙ্গার অর্থকষ্টে সহানুভূতি বোধ করে ভগিনী নিবেদিতার কাছে বলেন, তিনি আলাসিঙ্গাকে এক লক্ষ টাকা দেবেন, যাতে তিনি অর্থকষ্ট থেকে মুক্ত থাকেন।[১৯] ভগিনী নিবেদিতা যখন আলাসিঙ্গাকে একথা জানালেন, তখন তিনি কিছুসময় ভাবলেন তারপর ভগিনীকে বললেন, আমেরিকান ভদ্রমহোদয়কে তাঁর উদার প্রস্তাবের জন্য আমার ধন্যবাদ জানাবেন, কিন্তু আমার পক্ষে ও-টাকা

১৮ শ্রীনিবাসনের প্রবন্ধে পাই, 'ইণ্ডিয়া' কাগজ ছাড়াও 'উইকলি রিভিউ' এবং 'নেটিভ স্টেট' কাগজের সঙ্গে আলাসিঙ্গার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ ছিল।

১৯ এক লক্ষ টাকা দানের প্রস্তাব চমকপ্রদ। এই তথ্যের উৎস লেখক জানাননি।

নেওয়া সম্ভব নয়। পরে তিনি বন্ধুদের জানান, কিছু ব্যক্তিগত লাভের জন্য তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বর্জন করতে পারেন না।"

এ সকলের উপরে আছে গুরু ও শিষ্যের অপূর্ব সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ কী, তা আলাসিঙ্গা নিজের জীবন দিয়ে বুঝিয়ে গেছেন। দাক্ষিণাত্যের সুপণ্ডিত লেখক সুন্দররাম আয়ার এই বিষয়ে চমৎকার মন্তব্য করেছেন—

"প্রথমেই আমি আলাসিঙ্গা পেরুমলের নাম করব।... ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কন্যাকুমারিকা ও রামেশ্বর ঘুরে স্বামীজী প্রথম মাদ্রাজে এসেছিলেন—সেই সময় থেকে আলাসিঙ্গা যে প্রেমে ও পূজায় ব্যক্তি-বিবেকানন্দ এবং তাঁর জীবনকর্মকে গ্রহণ করেছিলেন,—স্বামীজীর কাজের সর্ববিধ পর্যায়ে প্রতিটি ব্যাপারে যে অবিচলিত উৎসাহে তিনি যুক্ত ছিলেন—আচার্যশ্রেষ্ঠের জন্যে তাঁর সেই অখণ্ড সেবার দৃষ্টান্ত আমার কাছে এক অপরূপ সৌন্দর্যময় বস্তু; জীবনের নৈরাশ্যময়, অন্ধকার প্রহরে কত সান্ত্বনা ও আনন্দই না তা আমাকে দান করেছে! স্বামী বিবেকানন্দের তুল্য দ্রষ্টাপুরুষের প্রতি পূর্ণ প্রকৃষ্ট পবিত্র শ্রদ্ধার আকৃতি এবং সুমধুর সুকোমল ভালবাসার ব্যাকুলতা বোধ করার মত মানুষ আমাদের অধঃপতিত হিন্দুসমাজ এখনো সৃষ্টি করতে পারে—এটাই ছিল আমার কাছে মহা বিস্ময়ের আবিষ্কার।" (অনূদিত—'Reminiscences' গ্রন্থ থেকে)

স্বামীজী স্বয়ং তাঁর প্রিয় শিষ্যের কথা-চিত্র একবার এঁকেছিলেন, তাঁর আপাত-কৌতুকময় রচনাভঙ্গির মধ্য থেকে কী গভীর শ্রদ্ধাই না ফুটেছিল!:

"আলাসিঙ্গা তাড়াতাড়ি একখানা টিকিট কিনে শুধু-পায়ে জাহাজে চড়ে বসল। আলাসিঙ্গা বলে, সে কখন-কখন জুতো পায়ে দেয়।...আলাসিঙ্গা পেরুমল, এডিটার 'ব্রহ্মবাদিন্‌', মাইসোরী রামানুজী 'রসম্‌'-খেকো ব্রাহ্মণ, কামানো মাথায় সমস্ত কপাল জুড়ে 'তেংকেলে' তিলক, 'সঙ্গের সম্বল গোপনে অতি যতনে' এনেছেন কি দুটো পুঁটুলি! একটায় চিঁড়ে ভাজা, আর একটায় মুড়ি-মটর। জাত বাঁচিয়ে, ঐ মুড়ি-মটর চিবিয়ে, সিলোনে যেতে হবে। আলাসিঙ্গা আর একবার সিলোনে গিয়েছিল। তাতে বেরাদারি-লোক একটু গোল করবার চেষ্টা করে, কিন্তু পেরে ওঠেনি। ভারতবর্ষে ঐটুকুই বাঁচোয়া, বেরাদারি যদি কিছু না বলল তো কারও কিছু বলবার অধিকার নেই। আর সে দক্ষিণী বেরাদারি—কোনটায় আছেন সবসুদ্ধ পাঁচ-শ, কোনটায় সাত-শ, কোনটায় হাজারটি প্রাণী—কনের অভাবে ভাগনিকে বে করে। যখন মাইসোরে প্রথম রেল হয়, যে যে ব্রাহ্মণ দূর থেকে রেলগাড়ি দেখতে গিছল, তারা জাতচ্যুত হয়। যাই-হোক, এই আলাসিঙ্গার মত মানুষ পৃথিবীতে অতি অল্প; অমন নিঃস্বার্থ, অমন প্রাণপণ খাটুনি, অমন গুরু-ভক্ত আজ্ঞাধীন শিষ্য জগতে অল্প হে ভায়া!"

(পরিব্রাজক)

আর তাঁর কী স্নেহ!

"বেচারা আলাসিঙ্গা! আমি তাহার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। আমি এইটুকু করিতে পারি যে, সে এক বৎসরের জন্য সকল সাংসারিক দায় হইতে মুক্ত থাকিবে, যাহাতে সে সমস্ত শক্তি দিয়া 'ব্রহ্মবাদিন্‌' কাগজের জন্য খাটিতে পারে। তাহাকে বলিও সে যেন চিন্তিত না হয়। তাহার কথা আমাদের সর্বদাই মনে আছে। তাহার

ভক্তির প্রতিদান আমি কখনই দিতে পারিব না।...... আলাসিঙ্গার প্রতি একটু নজর রাখিও। আমার যেন মনে হয়, সে কাজে ডুবিয়া গিয়া নিজের শরীরপাত করিতেছে। তাহাকে বলিও, শ্রমের পর বিশ্রাম এবং বিশ্রামের পর শ্রম—এইভাবেই সর্বাপেক্ষা ভাল কাজ হইতে পারে। তাহাকে আমার ভালবাসা জানাইও।' (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে পত্র, ১৮৯৮, মার্চ)

না, এও যথেষ্ট নয়—স্বামীজীর হৃদয়ের কোন্ গভীরে আলাসিঙ্গার স্থান ছিল, তা একটি স্মরণীয় ঘটনায় অব্যর্থ ফুটেছে। মিস্ ম্যাকলাউড তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

"স্বামীজী ভারতে ফিরে যাবার পরে আমি তাঁকে কোনো চিঠিই লিখিনি, অপেক্ষা করছিলাম তাঁর বার্তার জন্য। অবশেষে চিঠি পেলাম—'তুমি চিঠি লিখছ না কেন?' তখন উত্তরে লিখলাম, 'আমি কি ভারতে যেতে পারি?' উত্তর এল, 'হাঁ, আসতে পারো, যদি ক্লেদ, পতন ও দারিদ্র্য দেখতে চাও, সেই সঙ্গে কটিমাত্রবস্ত্র-পরা মানুষ ধর্মকথা বলছে—এই দৃশ্য। যদি অন্য কিছু আশা করো, কদাপি এসো না। একটি বাড়তি সমালোচনাও সহ্য হবে না।' স্বভাবতই আমি প্রথম জাহাজ ধরলাম।... বোম্বায়ে পৌঁছলাম ১২ ফেব্রুয়ারী (১৮৯৮), মিঃ আলাসিঙ্গা সেখানে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি কপালে বৈষ্ণবের রক্ততিলক ধারণ করেছিলেন। পরে কাশ্মীর যাত্রাপথে একদিন যখন স্বামীজীর সঙ্গে বসে আছি, আমি মন্তব্য করলাম, 'কী অদ্ভুত! মিঃ আলাসিঙ্গাও কপালে ঐসব বৈষ্ণবের চিহ্ন ধারণ করেন! তৎক্ষণাৎ স্বামীজী ঘুরে অতি কঠিন স্বরে বললেন, 'থামো! এ পর্যন্ত তুমি কী করেছ?' আমি কি দোষ করেছিলাম তখন জানিনি। অবশ্য উত্তরে কিছু বলিনি। আমার দুচোখ জলে ভরে গেল, আমি অপেক্ষা করে রইলাম। পরে আমি জেনেছিলাম, মিঃ আলাসিঙ্গা পেরুমল তরুণ ব্রাহ্মণ, মাদ্রাজে একটি কলেজে দর্শন পড়ান, মাইনে পান মাসে ১০০৲ টাকা, তাতে পালন করেন পিতা, মাতা, স্ত্রী ও চারটি শিশু সন্তানকে। ইনিই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেছেন বিবেকানন্দকে পাশ্চাত্যে পাঠাবার জন্য। তিনি না থাকলে হয়ত আমরা কোন দিন বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ পেতাম না। এই শোনার পরে বুঝলাম, মিঃ আলাসিঙ্গা সম্বন্ধে সামান্যতম কটাক্ষেও স্বামীজী কেন অত রুষ্ট।" (Reminiscences)

(ক্রমশঃ)

ভারতীয় নারীর আদর্শ ও শিক্ষার ধারা

স্বামী তেজসানন্দ

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সুদূর-প্রসারী দিব্যদৃষ্টিসহায়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, নারীজাতির প্রকৃত শিক্ষার উপরই ভারতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও উন্নতি নির্ভর করে। বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত নানা বাধা, বিঘ্ন ও বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ কালের অবিশ্রান্ত ধারা বাহিয়া ধীর ও অবিচলিত ভাবে তাহার ঐতিহ্যবহুল ইতিহাস রচনা করিয়া চলিয়াছে। যুগে যুগে ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়া আসিয়াছে যে, পুরুষ ও নারীর সম্মিলিত অবদানেই জাতি তাহার গৌরবময় ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে,—নারীজাতিকে দূরে রাখিয়া, অবজ্ঞা বা ঘৃণা করিয়া নহে। তাই মুক্তিমন্ত্রের উদ্গাতা স্বামী বিবেকানন্দ দৃপ্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, "মেয়েদের পূজা করিয়াই সব জাতি বড় হইয়াছে। যে-দেশে, যে-জাতিতে মেয়েদের পূজা নাই, সে-দেশ, সে-জাতি কখনও বড় হইতে পারে নাই, কস্মিন্‌-কালে পারিবেও না। তোমাদের যে এত অধঃ-পতন ঘটিয়াছে তাহার প্রধান কারণ - এই সব শক্তিমূর্তির অবমাননা করা।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "আমাদের রমণীগণের মীমাংসিতব্য অনেক সমস্যা আছে—সমস্যাগুলিও বড় গুরুতর। কিন্তু এমন একটিও সমস্যা নাই, 'শিক্ষা'—এই মন্ত্রবলে যাহার সমাধান না হইতে পারে।" "শিক্ষা বলিতে কতকগুলি শব্দ-শিক্ষা নহে; আমাদের বৃত্তিগুলির, শক্তিসমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে। শিক্ষা বলিতে ব্যক্তি-সকলকে এমন ভাবে গঠিত করা যাহাতে তাহাদের ইচ্ছা সদ্বিষয়ে ধাবিত ও সুসিদ্ধ হয়। এইরূপভাবে শিক্ষিতা হইলে আমাদের ভারতের কল্যাণ সাধনে সমর্থা নির্ভীকহৃদয়া মহীয়সী রমণীগণের অভ্যুদয় হইবে। তাহারা সঙ্ঘমিত্রা, লীলাবতী, অহল্যাবাঈ ও মীরাবাঈ-এর পদাঙ্কানুসরণে সমর্থা হইবে—তাহারা পবিত্রা স্বার্থগন্ধশূন্যা বীর রমণী হইবে; ভগবানের পাদস্পর্শে যে বীর্যলাভ হয়, তাহারা সেই বীর্যশালিনী হইবে; সুতরাং তাহারা বীর-প্রসবিনী হইবার যোগ্য হইবে।"

ভূয়োদর্শী স্বামী বিবেকানন্দের গভীর অভিজ্ঞতাপ্রসূত স্ত্রী-শিক্ষার এই উচ্চ আদর্শ সর্বতোভাবে রূপায়িত করা ভারত-কল্যাণ-চিকীর্ষু দেশ-নায়কগণের যে একটি অপরিহার্য কর্তব্য, তাহা কোন চিন্তাশীল বিদগ্ধ মনীষীই আজ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে ভারতীয় সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্যাবগাহী নারী-শিক্ষা স্বাধীন ভারতের শিক্ষা-পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু হিসাবে পরিগণিত না হইলে এবং উহা সত্বর বাস্তবে রূপায়িত করিতে না পারিলে জাতীয় জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ-সাধন যে সুদূরপরাহত, তাহা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ সুশিক্ষার মাধ্যমেই নারী-জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি ও সদ্‌বৃত্তিনিচয়ের প্রস্ফুরণ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সকলের অন্তরে গভীর আত্মপ্রত্যয়, শ্রদ্ধা, বিচারশীলতা, দায়িত্ববোধ, কর্মকুশলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী প্রকটিত হইয়া থাকে। শুধু ইহাই নহে, এতদ্দ্বারা প্রত্যেক পারিবারিক জীবনও সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির পবিত্র আবাস-ভূমি হইয়া উঠে। ইহাদের কল্যাণই যে সামাজিক তথা জাতীয় জীবনের

কল্যাণ—ভারতেতিহাস যুগে যুগে তাহার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখিয়া আসিয়াছে।

স্মরণাতীত কাল হইতে পুণ্যভূমি ভারতের তত্ত্বদর্শী ঋষি-মুনিবৃন্দ নারীজাতিকে অনন্তশক্তি-স্বরূপিণী জগজ্জননীরূপেই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন। দেখিতে পাই বেদ, উপনিষদ্, তন্ত্র, পুরাণাদি সর্বশাস্ত্রে সেই একই মহান সঙ্গীতের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। আজও ভারত-বাসী শ্রদ্ধাবনতশিরে মুক্তকণ্ঠে গাহিয়া থাকে—

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।"
—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১।৬

"যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্র এতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥"
—মনুসংহিতা, ৩৫৬।

—'হে দেবি, বেদাদি সমস্ত বিদ্যা আপনারই প্রকাশ। জগতের সমগ্র নারীমূর্তি আপনারই স্বরূপ।'

—'যেখানে স্ত্রীলোকেরা পূজিতা হন, দেবতারাও সেখানে আনন্দ করেন। যেখানে তাঁহারা পূজিতা হন না, সেখানে যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়া থাকে।'

এই সমুন্নত পবিত্র আদর্শ ভারতের সাংস্কৃতিক জীবন ও নারী-সমাজের সঙ্গে এত ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত যে, ভারতবাসী প্রাচীনকাল হইতে বিশ্বের স্ত্রী-জাতিকে দেবী-স্বরূপিণী জ্ঞান করিয়া তাহাদের সঙ্গে তদনুরূপ শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু ভারতেতিহাসের মধ্যযুগে ইসলামীয় সভ্যতার অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে যখন ভারতের বিভিন্নস্তরের জনগণ নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার চাপে দলে দলে ইসলামধর্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন ভারতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও এক বিরাট বিপ্লবের সূত্রপাত হইল। হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল সনাতনপন্থী গোঁড়া নেতৃবর্গ এই সঙ্কটকালে নারীজাতির তথা সমাজজীবনের পবিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য রক্ষাকল্পে স্ত্রী-জাতিকে বিধি-নিষেধের অষ্টপাশে আবদ্ধ করিলেন। বলা বাহুল্য, এই কঠোর অবরোধ-প্রথার কতকটা প্রয়োজন থাকিলেও, ইহার প্রবর্তনের ফলে স্ত্রী-জাতির পূর্বতন সাবলীল স্বচ্ছন্দ জীবন-ধারা, শিক্ষা-দীক্ষা বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইল এবং সমাজের অবাধ অগ্রগতির পথও বিশেষভাবে রুদ্ধ হইল।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের রাষ্ট্রগগনে আবার এক বিপদ-মেঘ সহসা আবির্ভূত হইল। প্রতীচ্য সভ্যতার অগ্রদূত ইংরেজ বণিক বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতে প্রবেশ-পূর্বক অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হিন্দু ও মুসলমান রাজন্যবর্গকে ছলে বলে কৌশলে পরাজিত করিয়া একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিল। রাজনীতি-ক্ষেত্রে বিদেশীশক্তির নিকট এই পরাভব ভারতের কৃষ্টিজগতেও এক যুগান্তরকারী বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। যুক্তিবাদী পাশ্চাত্যের আপাতরমণীয় বৈজ্ঞানিক সভ্যতা ও শিক্ষায় বিভ্রান্ত হইয়া অনেকেই আচার-ব্যবহার, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি ও চাল-চলনে প্রতীচ্যভাবাপন্ন হইয়া উঠিল এবং অনেকে ধর্মান্তরও গ্রহণ করিল। এই সঙ্কট-মুহূর্তে ভারত-রঙ্গমঞ্চে এমন একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক তথা আধ্যাত্মিক আন্দোলনের প্রয়োজন হইল যাহা সনাতনপন্থীর রক্ষণশীলতা ও উগ্রসংস্কারবাদীর প্রগতিশীলতার মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক ভারতীয় কৃষ্টি ও ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারে। এই সমূহ বিপদকালে যুগপ্রয়োজন-সিদ্ধিকল্পে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীসারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ভারত তথা

মানবেতিহাসে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ স্মরণীয় ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির সাহায্যে আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীকে দেখাইলেন যে, ভারতের ধর্ম ও কৃষ্টি একটা অলীক বা পরস্পরবিরোধী কুসংস্কারপূর্ণ কল্পনা নহে। অনন্ত শক্তি ও অফুরন্ত সম্ভাবনা উহাতে নিহিত রহিয়াছে, যাহা ভারতের পুনরুত্থান ও মুক্তির কারণ হইবে এবং বিশ্ববাসীকে প্রকৃত শান্তির সন্ধান দিবে।

ভারতবর্ষের নারীজাতির পবিত্র আদর্শ ভারতের নর-নারী ও বিশ্বজগতের সম্মুখে পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার বিশাল কর্মক্ষেত্রে সঙ্গে আনিলেন তাঁহারই শক্তিস্বরূপিণী সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে, যাঁহার সম্বন্ধে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছেন, "ও সারদা, সাক্ষাৎ সরস্বতী,—জ্ঞানদায়িনী, জ্ঞান দিতে এসেছে। ও কি যে সে? ও আমার শক্তি। ইচ্ছামাত্র দিব্যজ্ঞান দিতে পারে।" নারীজাতির হৃত গৌরব ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্যই এবার বস্তুতান্ত্রিক জড়সভ্যতার তাণ্ডবলীলার মধ্যে পুণ্যসলিলা সুরধুনীতটে তীর্থপীঠ দক্ষিণেশ্বরে ৺ভবতারিণীমন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাবে শক্তি-সাধনা, সিদ্ধসাধিকা যোগেশ্বরী ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে তন্ত্রসাধনায় গুরুরূপে বরণ এবং সাধনান্তে স্বীয় অষ্টাদশবর্ষীয়া সহধর্মিণী সারদা-দেবীকে ৺ষোড়শীদেবী জ্ঞানে আরাধনা। ভারতের নর-নারী তথা বিশ্ববাসী নির্বাকবিস্ময়ে যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এই লোকোত্তর সাধনা ও সিদ্ধি দর্শনে বিপুল আনন্দে উল্লসিত ও পুলকিত হইয়া উঠিল,—মাতৃজাতির সনাতন আদর্শ ও গৌরবান্বিত মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল,—নবযুগের অভ্যুদয় সূচিত হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর বিবাহিত জীবন গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ। ইহাদের শুচিশুভ্র যুগ্মজীবন মোহান্ধ মানবকে শিক্ষা দিয়াছে যে, বিবাহিত জীবন ইন্দ্রিয়সুখের বা ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য নহে। কেমন করিয়া এই মায়াময় ভোগ-বিলাসপূর্ণ সংসারে বৈবাহিক সম্বন্ধকে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে পরিণত করিয়া সাধন-ভজনসহায়ে ক্রমে সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারা যায়, তাহাই তাঁহাদের এই পবিত্র জীবন দ্বারা প্রকটিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমা একাধারে গৃহিণী, জননী ও সন্ন্যাসিনী এবং জ্ঞান-ভক্তির উজ্জ্বল প্রতিমা। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রিয় গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দকে এক পত্রে শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হইবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেইখানে বলিয়া। মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাইতে আসিয়াছেন; তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মিবে। শক্তির কৃপা না হইলে কি ছাই হইবে?"

স্বামী বিবেকানন্দের মানস-দুহিতা ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার বিখ্যাত 'The Master as I saw Him' (স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি) গ্রন্থে শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আমার কাছে সব সময় মনে হয়েছে তিনি যেন ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী। কিন্তু তিনি কি একটা পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি, না,—নূতন কোনো আদর্শের অগ্রদূত? তাঁর ভেতরে আমরা খুঁজে পাই সেই জ্ঞান ও মাধুর্য যা সাধারণতম নারীরও অনায়াসলভ্য। কিন্তু তবুও আমার কাছে তাঁর শিষ্টতার অপরূপত্ব ও তাঁর বিরাট খোলা হৃদয় তাঁর দেবীত্বের মতই বিস্ময়কর মনে

হয়েছে। যত নূতন বা জটিলই কোনো প্রশ্ন হোক না কেন, আমি তাঁকে উদার এবং সহৃদয় মীমাংসা দিতে ইতস্ততঃ করতে দেখিনি। তাঁর সমস্ত জীবনটাই হচ্ছে একটা একটানা নীরব প্রার্থনার মত। তাঁর জীবনের সব অভিজ্ঞতাই হচ্ছে ঐশ্বরিক রাজ্য নিয়ে, দিব্য সমাজ নিয়ে। তবুও তিনি প্রত্যেক লৌকিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে সমর্থ।"

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জীবদ্দশাতেই দেখিতে পাই, তাঁহাদের মহিমা-মণ্ডিত আধ্যাত্মিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শুদ্ধচরিত্রা ভক্তিমতী অঘোরমণি দেবী (গোপালের মা), যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস (যোগীন-মা), গোলাপসুন্দরী দেবী (গোলাপ-মা), গৌরী-মা, লক্ষ্মীমণি দেবী (লক্ষ্মী-দিদি), যোগেশ্বরী ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও রাণী রাসমণি প্রভৃতি রমণীগণ শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর চারিপাশে ভীড় জমাইয়াছিলেন এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজ-জীবনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া আদর্শভ্রষ্ট বিভ্রান্ত নর-নারীকে প্রকৃত শান্তির পথের সন্ধান দিয়াছিলেন। ইঁহাদের সমুজ্জ্বল সার্থক জীবন দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, চরম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কোন দেশ, জাতি বা ধর্মবিশেষের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে; স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে সকলেরই আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ করিবার সমান অধিকার রহিয়াছে।

বৈদিক যুগ হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিচিত্রঘটনাসমন্বিত ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই,—পুণ্যভূমি এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যুগে যুগে নানা ক্ষেত্রে নানা আদর্শে উদ্বুদ্ধ বহু মহীয়সী নারী মাতৃভূমির সেবা ও উন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। বেদ ও উপনিষদ্, তন্ত্র ও পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম-গ্রন্থ, তামিল-নাড়ুর তেভারম্, মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানের শৌর্য-বীর্যগাথা ও অন্যান্য কাহিনী সাক্ষ্যপ্রদান করে,—এই ভারতমাতার ক্রোড়েই বৈদিক ও ঔপনিষদিক যুগের স্বনামধন্যা ব্রহ্মবাদিনী মমতা ও অপালা, বাক্ ও বিশ্ববরা, গোধা ও ও রোমশা, ঘোষা ও শাশ্বতী, গার্গী ও মৈত্রেয়ী, জৈন ও বৌদ্ধযুগের শ্রাবিকা ও থেরীবৃন্দ ও দক্ষিণ ভারতের মন্ত্রদ্রষ্ট্রী আম্মায়ারগণ এবং রামায়ণ-মহাভারতীয় মহাকাব্যযুগে সীতা ও শর্বরী, অহল্যা ও সরমা, তারা ও মন্দোদরী, কৌশল্যা ও অনুসূয়া, গান্ধারী ও কুন্তী, দ্রৌপদী ও লোপমুদ্রা, সুলভা ও সাবিত্রী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া নারীগণের আবির্ভাবে ভারতের জাতীয় জীবন অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন এই ভারতভূমিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—পদ্মিনী ও দুর্গাবতী, কর্ণাবতী ও মহামায়া, জিজাবাঈ ও মুক্তাবাঈ, লক্ষ্মীবাঈ ও অহল্যাবাঈ, রাজিয়া ও চাঁদবিবি, নুরজাহান ও জাহানারা, রাণী ভবানী ও রাসমণি প্রভৃতি মহীয়সী নারীবৃন্দ, যাঁহাদের নাম তাঁহাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে অপূর্ব শৌর্য-বীর্য, অপরিসীম বুদ্ধিমত্তা ও অমূল্য অবদানের জন্য আজও ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত গভীর শ্রদ্ধার সহিত জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া থাকে। এই সকল নারীগণের অবিস্মরণীয় কীর্তি-কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে আজ এই নবযুগের প্রারম্ভে বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য— কি প্রকারে নব্যভারত-গঠনকল্পে ভারতের সেই সনাতন মহান আদর্শে উদ্দীপিত ও উজ্জীবিত করিয়া বিভ্রান্ত ম্রিয়মাণ জাতীয় জীবনকে পুনঃ সুস্থ, সবল ও শ্রীমণ্ডিত করিয়া তোলা যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের নারীজাতিকে ধর্মকে ভিত্তি করিয়া ভারতীয় সাংস্কৃতিক আদর্শানুযায়ী শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষায়তন-সমূহ নূতনভাবে গড়িয়া তুলিতে না পারিলে, বস্তুতান্ত্রিক জড়সভ্যতার প্রভাব হইতে আমাদের সুকুমারমতি বালকবালিকাদিগকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা সম্ভব হইবে না। পারিবারিক জীবন, সমাজ ও দেশমাতৃকার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধানের জন্য তাহাদের যে গভীর দায়িত্ব ও কর্তব্য রহিয়াছে এবং তাহাদের অবদানের উপর ভারতের সামগ্রিক কল্যাণ যে বহুলপরিমাণে নির্ভর করে, যে-সম্বন্ধে তাহাদিগকে সচেতন করিয়া তোলা এই স্ত্রী-শিক্ষার মহতী পরিকল্পনার একটি প্রধান অঙ্গরূপে গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "বৈদিক যুগে, উপনিষদের যুগে দেখিতে পাইবে মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া স্ত্রীলোকেরা ব্রহ্মবিচারে ঋষি-স্থানীয়া হইয়া রহিয়াছেন। হাজার হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী সগর্বে যাজ্ঞ-বল্ক্যকে ব্রহ্মবিচারে আহ্বান করিয়াছিলেন। এইসব আদর্শস্থানীয়া মেয়েদের যখন অধ্যাত্ম-জ্ঞানে অধিকার ছিল, তখন এখনই বা মেয়েদের সে অধিকার থাকিবে না কেন? একবার যাহা ঘটিয়াছে তাহা আবার অবশ্য ঘটিতে পারে, ঘটনাসমূহের পুনরাবৃত্তি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। যাজ্ঞবল্ক্যকে জনক রাজার সভায় কিরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছিল তাহা স্মরণ আছে তো? তাহার প্রধান প্রশ্নকর্তা ছিলেন বাকপটু কুমারী বাচক্নবী—তখনকার দিনে মহিলাদিগকে ব্রহ্মবাদিনী বলা হইত। তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমার এই প্রশ্নদ্বয় ধানুকের হস্তস্থিত দুইটি শাণিত তীরের ন্যায়।' এইস্থলে তাঁহার নারীত্বসম্বন্ধে কোনরূপ প্রসঙ্গ পর্যন্ত তোলা হয় নাই। আর আমাদের প্রাচীন আরণ্য-শিক্ষাপরিষদসমূহে বালক-বালিকার সমানাধিকার ছিল। তদপেক্ষা অধিক সাম্যভাব আর কি হইতে পারে?"

"কিন্তু নারীদিগের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার তাহাদের শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত; নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে।...জগতের অন্যান্য স্থানের নারীগণের ন্যায় আমাদের নারীগণও এ যোগ্যতালাভে সমর্থা।"

"বীরত্বের ভাবটাও শেখা দরকার। এ সময়ে তাহাদের মধ্যেও আত্মরক্ষা শিক্ষা করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। দেখ দেখি, ঝাঁসির রাণী কেমন ছিলেন! যে-জন্য আমার ইচ্ছা আছে কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী তৈরি করব। ব্রহ্মচারীরা কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করে দেশে দেশে, গাঁয়ে গাঁয়ে mass-এর (জনসাধারণের) মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে যত্নপর হবে। আর ব্রহ্মচারিণীরা মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে। **কিন্তু দেশী ধরনে ঐ কাজ করতে হবে।** পুরুষদের জন্য যেমন কতকগুলি centre (শিক্ষাকেন্দ্র) করতে হবে, মেয়েদের শিক্ষা দিতেও সেইরূপ কতকগুলি কেন্দ্র করতে হবে। শিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা ব্রহ্মচারিণীরা ঐ সকল কেন্দ্রে মেয়েদের শিক্ষার ভার নেবে। পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকর্ম, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্রগঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হবে। ছাত্রীদের ধর্মপরায়ণা ও নীতিপরায়ণা করতে হবে। কালে যাতে

তারা ভাল গিন্নী তৈরী হয়, তাই করতে হবে। এই সকল মেয়েদের সন্তান-সন্ততিগণ পরে সকল বিষয়ে আরও উন্নতি লাভ করতে পারবে। যাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হয়, তাদের ঘরেই বড় লোক জন্মায়।"

"আমাদের মেয়েদের একটা শিক্ষা সহজেই দেওয়া যাইতে পারে—হিন্দুর মেয়ে সতীত্ব কি জিনিস, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবে; ইহাতে তাহারা পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত কিনা! প্রথমে সেই ভাবটাই তাহাদের মধ্যে উস্‌কাইয়া দিয়া তাহাদের চরিত্রগঠন করিতে হইবে—যাহাতে তাহারা বিবাহিতা হউক বা কুমারী থাকুক, সব অবস্থাতেই সতীত্বের জন্য প্রাণ দিতে কাতর না হয়। ভারতের কল্যাণ স্ত্রী-জাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভব নয়। একপক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।···যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নেই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে-সংসারের,—সে-দেশের কখনও উন্নতির আশা নেই। এইজন্য এদের আগে তুলতে হবে—এদের জন্য আদর্শ মঠ স্থাপন করতে হবে।"

"আমি পুরুষদের যাহা বলিয়া থাকি, রমণীদিগকেও ঠিক তাহাই বলিব। ভারত ও ভারতীয় ধর্মে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা কর, তেজস্বিনী হও, আশায় বুক বাঁধ; ভারতে জন্ম বলিয়া লজ্জিতা না হইয়া উহাতে গৌরব অনুভব কর; আর স্মরণ রাখিও, আমাদের অপরাপর জাতির নিকট হইতে কিছু লইতে হইবে বটে, জগতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমাদের সহস্রগুণে অপরকে দিবার আছে। দেশীয় নারী দেশীয় পরিচ্ছদে ভারতের ঋষিমুখাগত ধর্ম প্রচার করিলে আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি এক মহান তরঙ্গ উঠিবে, যাহা সমগ্র পাশ্চাত্য ভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। এই মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, সাবিত্রী ও উভয়ভারতীর জন্মভূমিতে কি আর কোন নারীর সাহস হইবে না?"

দূরদর্শী বীরকেশরী স্বামী বিবেকানন্দের এই অগ্নিগর্ভ উপদেশ ও প্রাণস্পর্শী আহ্বানে কি আমাদের নারীসমাজ ভারতের ভাগ্যগঠনে আজ নবযুগ-প্রভাতে সাড়া দিবে না? কিভাবে ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তন করিতে হইবে, কি আদর্শে নারীদিগকে শিক্ষিতা করিয়া তুলিতে পারিলে ভারতমাতার প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে তাহা তাঁহার এই জ্ঞানগর্ভ বাণীর মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে পৃথকভাবে নারীশিক্ষার জন্য আদর্শ বিদ্যালয়সমূহ গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং তাহার পরিচালনার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত আদর্শে শিক্ষিতা মহিলাদিগকেই শিক্ষিকা-রূপে নিযুক্ত করিয়া বালিকা ও যুবতীগণের শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল রাখিয়া মধ্যপন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য, যাহাতে তাহাদের জীবন প্রাচীন ও নবীন ভাবের সমন্বয়ভূমি হইয়া দাঁড়ায় এবং ভারতীয় ঐতিহ্যকে ভিত্তি করিয়া প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দের মানস-দুহিতা ভগিনী নিবেদিতার সুচিন্তিত উক্তির মধ্যে তাঁহার গুরুদেবের বাণীরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। তিনি বলিয়াছেন—বৃত্তিকেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষার বহুল প্রচার ও পরিবর্তনের দিনে বালক-বালিকার দেহ ও মনের যুগপৎ উৎকর্ষ-বিধান-কল্পে জাতীয় শিক্ষাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে হইবে। মনুষ্যশরীরের স্নায়বিক গঠনের সহিত মস্তিষ্কের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। একটিকে বাদ দিলে অন্যটি তদ্ভাবে স্বতঃই উপেক্ষিত হইবে। তাই পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে

কারিগরি শিক্ষাকেও অতি উচ্চ স্থান প্রদান করিতে হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন—যতদিন আমরা শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া নারীজাতিকে সাদরে গ্রহণ করিতে না পারিব, ততদিন ভারতমাতার অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইবে না এবং আমাদের সকল প্রচেষ্টা ও কার্যকলাপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। ভারতমাতার প্রাণ তখনই আনন্দ ও গর্বে উল্লসিত হইয়া উঠিবে, যখন তাহারই সুশিক্ষিতা ও আদর্শচরিত্রা দুহিতৃবৃন্দ তাহার চারিপাশে সমবেত হইবে এবং তাহারই সেবা-বেদীমূলে শ্রদ্ধাবনতশিরে সামগ্রিক কল্যাণকল্পে ব্রত গ্রহণ করিবে। বলা বাহুল্য, তখনই ভারতমাতা উন্নতশিরে জগতের সম্মুখে সগৌরবে দাঁড়াইবার বিপুলশক্তি অর্জন করিবে এবং তাহার শূন্য মন্দিরে জাতীয় আরাধনার শুভ শঙ্খনাদ বাজিয়া উঠিবে—উজ্জ্বল আলোকে চতুর্দিক পুনঃ উদ্ভাসিত হইবে।

নিবেদিতা তাঁহার দিব্যদৃষ্টিসহায়ে জাতীয় জীবনের এই শুভ সুপ্রভাত আসন্ন বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। আজ ভারত-ভারতীর শিক্ষার গুরুদায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন শিক্ষার মাধ্যমে স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়িয়া তুলিতে যাঁহারা প্রয়াসী, আশা করি তাঁহারা বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতমাতার সেবায় উৎসর্গীকৃত ভগিনী নিবেদিতার সুগভীর চিন্তাপ্রসূত শিক্ষা-পরিকল্পনা সর্বতোভাবে বাস্তবে রূপায়িত করিতে চেষ্টিত হইবেন।

আমরাও আজ অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের সহিত লক্ষ্য করিতেছি—ভারতের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ভারতীয় নারী বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব-পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অতীব প্রশংসা ও দক্ষতার সঙ্গে স্ব স্ব কার্য সম্পাদন করিতেছেন। বর্তমানে উচ্চশিক্ষিতা নারীগণের মধ্য হইতেই কেহ বা শিক্ষক, অধ্যাপক, বক্তা, সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক; কেহ বা রাজনীতিবিশারদ,—বিধানসভা উজ্জ্বল করিয়া বসিয়াছেন; কেহ বা উত্তুঙ্গ দুর্গম গিরিশৃঙ্গাভিযাত্রী, আবার কেহ মন্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইঁহারা সকলেই স্ব স্ব ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহাদের সম্মিলিত অকুণ্ঠ সেবার মাধ্যমে মাতৃভূমির অশেষ গৌরববৃদ্ধি করিতেছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতের তথা বহির্জগতের সর্বত্র আজ যে নারীজাগরণের এক বিরাট সাড়া জাগিয়া উঠিয়াছে, এই নারীজাগরণের দিনে যদি স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত ভারতীয় আধ্যাত্মিক ও সংস্কৃতিক আদর্শ ও ঐতিহ্যকে ভিত্তি করিয়া তাঁহারা জীবনগঠনপূর্বক নিজ নিজ দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন করিতে সমর্থা হন, তবেই এই নারী-জাগরণ সার্থক হইয়া উঠিবে এবং নারীজাতির তথা সমগ্র মানবজাতির সমুন্নত আদর্শ ও শিক্ষার ধারাও অক্ষুণ্ণ থাকিবে; নতুবা ভারতের যে বৈশিষ্ট্য তাহাকে জগৎ-সভায় উচ্চাসন প্রদান করিয়াছে এবং যে আদর্শের জন্য বিশ্ববাসী অদ্যাবধি ভারতকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, সেই আদর্শ অটুট ও অব্যাহত রাখা সম্ভব হইবে না।

ভারতের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক জীবন একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। যুগে যুগে ভারতের নর-নারীর অক্লান্ত নীরব সাধনা ভারতের এই আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে বিকশিত ও শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। আজ সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে যে, নব্যভারত-গঠনে ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহুবিধ প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতীয় নর-নারীর শিক্ষার নিমিত্ত ভারতীয় সনাতন সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে চরিত্রগঠনমূলক বিভিন্ন শিক্ষার প্রবর্তন করিতে পারিলে ভারতের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল ও মহিমামণ্ডিত হইয়া উঠিবে এবং জগতের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে ভারত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববাসীকেও শাশ্বত-কল্যাণ-পথের নির্দেশ দিতে সমর্থ হইবে।

রামচরিতে কালিদাস ও ভবভূতি

স্বামী চেতনানন্দ

আপনাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?—এই কথা যদি কালিদাস ও ভবভূতিকে কেহ জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই নীলাকাশের দুইটি উজ্জল নক্ষত্রের মত মিটমিট করিয়া হাসিয়া পরস্পরের প্রতি মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতেন। ইহা সত্বেও যদি তাঁহাদের বলিবার জন্য পীড়াপীড়ি করা হইত, তাহা হইলে তাঁহারা চিন্তাকুল হইয়া মাথা চুলকাইয়া বলিতেন: "দেখ ভাই, ইহা সাব্যস্ত করা বিশেষ বিবেচনা-সাপেক্ষ এবং সময়সাপেক্ষ। উপরন্তু ইহা নির্ধারণ করিতে যে নৈপুণ্যের দরকার তাহা আমাদের নাই।" এই উত্তরে জিজ্ঞাসুরা কখনই খুশী হইবে না। কারণ প্রতিভার মূল্যায়ন হয় অপরের কাছে। কস্তুরীমৃগ কখনও নিজের নাভিস্থিত কস্তুরীর গন্ধ পায় না। মানুষের রূপ নিজের চোখে ধরা পড়ে না—পড়ে অপরের চোখে। সেইহেতু আমরা এই কবিকুল-শিরোমণিদ্বয়ের উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করিয়া তাঁহাদের অমরকীর্তি রামচরিতে প্রবেশ করিব।

কালিদাস ও ভবভূতি সংস্কৃতসাহিত্য-গগনে দুইটি উজ্জল জ্যোতিষ্ক। তাঁহাদের মধ্যে কে বেশী উজ্জল বলা কঠিন। উভয়েরই নিজস্বতা ও বৈশিষ্ট্য আছে। উভয়েরই কবিত্বশক্তি অসাধারণ। রসব্যাপারে পণ্ডিতেরা বলেন—শৃঙ্গারে কালিদাস শ্রেষ্ঠ; কিন্তু হৃদয়ের প্রবল আবেগ-প্রকাশে ও করুণ রসের বর্ণনায় ভবভূতি অদ্বিতীয়। সাধারণতঃ কালিদাসের রচনা অপেক্ষা ভবভূতির রচনায় অধিকতর রসবৈচিত্র্য দেখা যায়। "সংক্ষেপে বলিতে গেলে কালিদাসের রচনা—পরিপাটি, পরিচ্ছিন্ন, সুন্দর, সুমার্জিত, সুবিন্যস্ত, সুরম্য উদ্যান; এবং ভবভূতির রচনা—সুন্দর, ভীষণ, বীভৎস, নিবিড়, জটিল, বিপুল মহারণ্য।" জনৈক পণ্ডিতপ্রবরের মতে—কবিত্বে কালিদাস শ্রেষ্ঠ; কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ-তায়, সদাচারে, ধার্মিকতায় ভবভূতি বড়।

উভয়ের নাটকেই গাম্ভীর্য বিদ্যমান। তথাপি কালিদাসের নাটকগুলি ব্যঞ্জনাপ্রধান এবং ভবভূতির নাটকগুলি অভিধা-শক্তির দ্বারা সুন্দরভাবে চিত্রিত। উভয়ের উপরে কালের প্রভাব স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়। কালিদাসের কালে ভারতবর্ষে আনন্দ ও শান্তি বিরাজিত ছিল; সেইহেতু তাঁহার রচনা আমোদপ্রমোদে পরিপূর্ণ। কোথাও কোথাও সাময়িক দুঃখ প্রকাশ পাইলেও উহা চিরস্থায়ী রেখাপাত করিতে পারে নাই। কালিদাসের সমস্ত নাটকেই বিদূষক বিদ্যমান। তিনি হাস্য-পরিহাসের দ্বারা নায়ক ও শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন।

অপরদিকে ভবভূতির জীবন দুঃখের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন উহা ভারতের ঘোর অবনতির যুগ। বৌদ্ধধর্মের ঘোরতর অধঃপতন, নানাবিধ উদ্ভট ক্রিয়াকলাপে সমাজ জর্জরিত। ইহার প্রমাণ ভবভূতির মালতীমাধবে রহিয়াছে। সেখানে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনীর আশ্রম-বিগর্হিত কার্যকলাপ ও তান্ত্রিক অভিচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে ভবভূতি আপন জীবনকুসুম প্রস্ফুটিত হইতে দেরী হইতেছে দেখিয়া দুঃখপূর্ণ করুণরসের আশ্রয় লইয়াছিলেন।

নাট্যসমালোচকদের দৃষ্টিতে কালিদাসের নাটক বৈদর্ভী রীতিতে এবং ভবভূতির নাটক গৌড়ীয় রীতিতে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কালিদাসের রচনায় বহির্জগতের পরিপাটি এবং ভবভূতির রচনায় অন্তর্জগতের খুঁটিনাটি।

বিশ্বকবি গাহিয়াছেন—"হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল। পণ্ডিতেরা লড়াই করে নিয়ে তারিখ সাল॥" ইহা খুব সত্য কথা। কালিদাস ও ভবভূতির আবির্ভাব-কাল লইয়া বিস্তর মতভেদ আছে। তথাপি বিভিন্ন গ্রন্থ-দৃষ্টে মনে হয় কালিদাস ৬ষ্ঠ এবং ভবভূতি ৮ম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ববর্তী কবিদের ছায়া পরবর্তীদের উপর পতিত হওয়াই স্বাভাবিক; সেইহেতু ভবভূতির উপর কালিদাসের প্রভাব লক্ষিত হয়। ইতিহাসপাঠে জানিতে পারা যায় কালিদাস রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন এবং ভবভূতি ছিলেন কনৌজের রাজা যশোবর্মার সভাপণ্ডিত। পরবর্তীকালে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কনৌজরাজকে পরাভূত করিয়া ভবভূতিকে মহাসমাদরে কাশ্মীরে লইয়া যান। ভবভূতির পিতার নাম নীলকণ্ঠ, মাতার নাম জাতুকর্ণী এবং জন্মস্থান দক্ষিণাপথের অন্তর্গত বিদর্ভ-প্রদেশের পদ্মপুর নগরে। তিনি সর্বশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া শ্রীকণ্ঠ উপাধি পান। কালিদাসের সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী আছে। অনেকে বলেন যে, তিনি পশ্চিম মালবের বাসিন্দা ছিলেন। কে শ্রেষ্ঠ তাহা লইয়া আমাদের দেশে একটি প্রাচীন শ্লোক আছে: পুষ্পেষু জাতী নগরেষু কাঞ্চী, নারীষু রম্ভা পুরুষেষু বিষ্ণুঃ। নদীষু গঙ্গা নৃপতৌ চ রামঃ, কাব্যেষু মাঘঃ কবিঃ কালিদাসঃ॥"

রামচরিত্র বিশাল ও সুগভীর। কাহারও চক্ষে রাম অবতার, কাহারও কাছে আদর্শ মানব, আদর্শ রাজা। রামায়ণের আদিকাণ্ডে বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সমগ্রারূপিণী লক্ষ্মীঃ কমেকং সংশ্রিতা নরম্। অর্থাৎ কোন্ একটি মাত্র নরকে আশ্রয় করিয়া সমগ্রা লক্ষ্মী রূপগ্রহণ করিয়াছেন? রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে। রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।" এই আদর্শচরিত্র রামচন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশে কত মহাকাব্য, কাব্য, নাটক, গল্প, কবিতা, কথকতা, ব্রতকথার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আদিকবি বাল্মীকি হইতে আরম্ভ করিয়া সাধককবি তুলসীদাস, ভক্তকবি কৃত্তিবাস, মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মনীষীরা রামগাথা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বীরত্বব্যঞ্জক কাব্যকেই সাধারণতঃ Epic বলে; কিন্তু রামায়ণ বেদনার কাব্য। বীরত্বের অন্তরালে রহিয়াছে ব্যথা। এই ব্যথা রামচন্দ্রকে আদর্শ রাজা করিয়াছে, সীতাকে অতুলনীয় সতীত্বে দাঁড় করাইয়াছে, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, হনুমানকে আদর্শ কর্মবীরে পরিণত করিয়াছে। এই অশ্রুসিক্ত কাব্য আমাদের দুঃখভরা জীবনের প্রতিচ্ছবি। রামায়ণ আমাদের ঘরের কথায় ভরা; সেইহেতু আমাদের বড় আদরের।

কেহ কেহ মনে করেন—দুঃখে কি আনন্দ আছে? 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' (সাহিত্য-দর্পণ)। অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই কাব্য। কাব্যে যদি শুধু সুখজনক স্বীকৃত হয় তাহা হইলে করুণ প্রভৃতি রস দুঃখজনকত্ব বলিয়া তাহাদের রসত্ব নাই। ইহার উত্তর সাহিত্য-দর্পণে দেওয়া হইয়াছে: "করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্। সচেতসামনুভবঃ

প্রমাণং তত্র কেবলম্॥ কিন্তু তেষু যদা দুঃখং ন কোঽপি স্যাত্তদুন্মুখঃ। তথা রামায়ণাদীনাং ভবিতা দুঃখহেতুতা॥" অর্থাৎ করুণ প্রভৃতি রসে যে অত্যন্ত সুখ জাত হয়, সহৃদয়ের অনুভবই তাহার একমাত্র প্রমাণ। বাস্তবিক যদি তাহাতে দুঃখই থাকিত তবে সে বিষয়ে কেহ উন্মুখ হইত না এবং রামায়ণ প্রভৃতি কাব্য কেবল দুঃখেরই হেতু হইত। দুঃখের মধ্যেও আনন্দ আছে। সন্ন্যাসীদের তপস্যারূপ কৃচ্ছ্রতা, সতীনারীদের ব্রত-উপবাসরূপ কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও আনন্দ আছে।

মহাকবি কালিদাস 'রঘুবংশ' কাব্যে এবং ভবভূতি 'মহাবীরচরিত' ও 'উত্তররামচরিত' এই দুইখানি অমর নাটকে রামচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে কাব্য দুই প্রকার—দৃশ্য কাব্য ও শ্রব্য কাব্য। যাহা দেখা যায় বা অভিনয় করিয়া দেখানো যায় তাহা দৃশ্য কাব্য। যেমন অভিজ্ঞানশকুন্তলা, উত্তররামচরিত। যাহা শুনা যায় তাহা শ্রব্য কাব্য; যেমন রঘুবংশ, মেঘদূত, কাদম্বরী প্রভৃতি। সুতরাং রামচরিতে কালিদাস শ্রব্য কাব্যের এবং ভবভূতি দৃশ্য কাব্যের আশ্রয় লইয়াছেন। কালিদাস ও ভবভূতির রামচরিত্র পড়িলে একটি জিনিস স্বতঃই মনে হইবে যে কালিদাস রামচন্দ্রকে দেবতারূপে এবং ভবভূতি মহাবীররূপে আর কোথাও বা লোকোত্তর পুরুষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। রঘুবংশের প্রারম্ভে দেবগণ অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণুর কাছে নানাবিধ স্তবস্তুতি করিয়া রাবণবধের প্রার্থনা জানান। ইহার উত্তরে বিষ্ণু বলেন, "আমি দশরথের পুত্ররূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া শাণিত শরাঘাতে সেই দুরাত্মা রাক্ষসাধিপের শিরঃ-পরম্পরারূপ কমলমালা সংগ্রামভূমির বলিরূপে প্রদান করিব।" ভবভূতির রামচন্দ্র মহাবীর। অলৌকিক তাঁহার পরাক্রম। কোথাও বিন্দুমাত্র দুর্বলতা নাই।

পণ্ডিতেরা চরিত্রচিত্রণ, রসপুষ্টি, বর্ণনা-চাতুর্য, রচনাশৈলী ও ভাষার সৌকর্য প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া বলেন যে, রঘুবংশ কালিদাসের শেষের জীবনে লেখা এবং ঐকালে তাঁহার ধর্মবুদ্ধি প্রবল ও গভীর হইয়াছিল। অন্যান্য কাব্যের (কুমারসম্ভব, মেঘদূত, ঋতুসংহার) প্রারম্ভে কালিদাস মঙ্গলাচরণ করেন নাই; কিন্তু রঘুবংশের প্রথম শ্লোকে তিনি লিখিয়াছেন "বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে। জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ॥" অর্থাৎ আমি প্রচুর পরিমাণে শব্দ ও অর্থ প্রাপ্তির নিমিত্ত শব্দ ও অর্থের ন্যায় পরস্পর নিত্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট, জগতের জনক-জননীস্বরূপ শিব ও শিবানী এই উভয়কে ভক্তিসহকারে নমস্কার করি। রঘুবংশে মহাকবির বিনয় আমাদের মুগ্ধ করে—"ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।" অর্থাৎ কোথায় সেই মহান সূর্যবংশ আর কোথায় আমার মত অল্পবুদ্ধি মানুষ। অজ্ঞানবশতঃ মহৎ কর্ম সম্পাদন করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেই হেতু ভেলা লইয়া দুস্তর সাগর পার হইতে চলিয়াছি। বৃহৎ তরুশাখায় ঝুলন্ত ফল উন্নত পুরুষ ধরিতে পারেন, কিন্তু বামন ঐরূপ করিতে গেলে উপহাস্যাস্পদ হয়। "মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী" অর্থাৎ মূঢ়মতি হইয়া কবিদের যশঃপ্রার্থী হইয়াছি, সুতরাং আমি যে উপহাস্যাস্পদ হইব—ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

ভবভূতির তিনখানি নাটক প্রসিদ্ধ আছে—বীররসসমন্বিত 'মহাবীরচরিত', শৃঙ্গার-সমন্বিত 'মালতী-মাধব' এবং করুণরসসমন্বিত 'উত্তররামচরিত'। রচনাদৃষ্টে পণ্ডিতেরা বলেন

যে, ভবভূতি মহাবীরচরিত প্রথমদিকে এবং উত্তররামচরিত শেষ জীবনে রচনা করেন। সংস্কৃতনাটকে নান্দীপাঠই মঙ্গলাচরণ। উহা নির্বিঘ্নে গ্রন্থসমাপ্তির জন্য পঠিত হয়। ভবভূতি জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম এবং পরমাত্মার অংশরূপ ও অমৃতের ন্যায় সুরসা বাগ্‌দেবীকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থদ্বয় আরম্ভ করিয়াছেন। কালিদাসের মত অত বিনয় প্রকাশ করিয়া ভবভূতি রামচরিতে প্রবেশ করেন নাই। রামচরিতের অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ বিশ্লেষণ করিয়া গম্ভীরভাবে লোকোত্তর পুরুষের জীবন-সলিলে অবগাহন করিয়াছেন। নাটকের নৈপুণ্য নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "বেদ, উপনিষদ্, সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি নাটকের গুণ বাড়াইতে পারে না। বাক্য যদি গম্ভীর ও প্রাঞ্জল হয়, তাহা হইলেই অর্থের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে এবং উহাতেই নাটকের নৈপুণ্য বিকশিত হয়।" মালতী-মাধব পড়িলে বোঝা যায় যে, ভবভূতির নিজের প্রতিভার প্রতি একটি দৃঢ় আস্থা ছিল। একটি সুন্দর শ্লোকে তিনি উহা বর্ণনা করিয়াছেন: "যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং, জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ। উৎপৎস্যতে মম তু কোঽপি সমান-ধর্মা, কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥" অর্থাৎ আমার প্রতি যাহারা অবজ্ঞা প্রকাশ করে তাহারা অল্পই বোঝে; তাহাদের জন্য আমার এই রচনার প্রয়াস নহে। এ পৃথিবী বিশাল এবং কালেরও কোন সীমা নাই; যেহেতু আমার সমানধর্মী কেহ আছে বা ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিবে। ভবভূতির 'সমানধর্মা' এবং Greyর 'Kindred Soul' একার্থক। লেখক ও পাঠকের যোগসূত্র কাব্যই স্থাপন করে এবং পরম্পরং ভাবয়ন্তং না হইলে উহা রসোত্তীর্ণ হয় না। Leo Tolstoy তাঁহার What is Art গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"Every art causes those to whom the artist's feeling is translated to unite in soul with the artist and also with all who receive the same impression."

রঘুবংশ কালিদাসের ১৯ সর্গ ব্যাপী একখানি উৎকৃষ্ট বিরাট কাব্যগ্রন্থ। অন্যান্য কাব্যের মত ইহার সমস্ত অঙ্গই বিদ্যমান। দৈর্ঘ্যে একটু বেশী হইলেও উহার গাঁথুনি মজবুত। এই প্রসঙ্গে আমরা শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১২৯০ সালে বঙ্গদর্শনে লেখনীমুখে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দিতেছি: "কাব্য বা মহাকাব্য হয় একটি নায়ক, একটি নায়িকা, একটি দেশ, একটি নগর বা একটি নগরী লইয়া। সমস্তটাই বহির্জগতেরই হউক বা অন্তর্জগতেরই হউক, একটি ছোট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। অন্তর্জগতের গণ্ডীও ছোট—হয় প্রেম, নয় করুণ, নয় বীররস। রঘুবংশ গণ্ডী মানে না। যদি ইহার কোন গণ্ডী থাকে তবে উহা প্রকাণ্ড দিগ্‌দেশকাল ব্যাপিয়া। রস-ভাব বল, প্রায় সব ক'টিই উহাতে আছে। সুতরাং কি বাহিরে কি ভিতরে রঘুবংশ একখানি প্রকাণ্ড কাব্য। দেশ যদি বল, উহা সমস্ত ভারত জুড়িয়া আছে; এমন কি ভারতের বাহিরেও পারস্য দেশ, আরব-দেশ, যবন দেশ, হূন দেশ, লঙ্কা, উচাং, বোস্তাং, খোটান প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষেরও একবার চারিদিক ঘুরিয়া আসিয়া মধ্যস্থলের দেশগুলির বর্ণনা করিয়াছেন। এই কাব্যে স্বর্গ আছে, মর্ত্য আছে, নাগলোক আছে, সমুদ্র আছে, পর্বত আছে,

বন আছে, নদনদী আছে। একটা প্রকাণ্ড মহাদেশে যাহা কিছু আছে, ইহাতে সবই আছে। দেশও যেমন প্রকাণ্ড, কালও তেমন প্রকাণ্ড। ২৯ পুরুষ এই কাব্যের বিষয়।… মোটকথা, সমস্ত পৃথিবীর কবিরা যাহা কিছু বর্ণনা করেন, তাহার মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া ভালগুলি রঘুবংশে লইয়াছেন।"

রামায়ণে আদিকবি বাল্মীকি রামকে নানাভাবে রূপ দিয়াছেন; গাহিয়াছেন তাঁহার অপূর্ব কীর্তিকথা। তাহা হইলে কবি কালিদাসের আবার নূতন প্রয়াস কেন? ইহার উত্তরে শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন: "কালিদাসের চেষ্টাটা যেন বাল্মীকির উপর টেক্কা দেওয়া। তিনি রামসীতার ছবি আঁকিতে গিয়া দেখিলেন, জমিতেছে না, বাল্মীকির উপর জমিতেছে না। তখন তিনি রামসীতার আশেপাশে আরও অনেকগুলি ছবি দিয়া জিনিসটাকে প্রকাণ্ড করিয়া তুলিলেন। তুলিলেন বটে, কিন্তু বাল্মীকির ছবিখানি বজায় রাখিলেন। যেখানে বাল্মীকির বর্ণনা খুব উজ্জ্বল, কালিদাস সেখানে খুব সংক্ষেপে সারিলেন।…কিন্তু যেখানে বাল্মীকির ফাঁক পাইলেন, সেইখানেই আপনার কবিত্ব-কল্পনার লাগাম ছাড়িয়া দিলেন। এ ত গেল খাস রামায়ণে—যাহা লইয়া রঘুবংশের ১০-১৫ সর্গ। কিন্তু খাস রামায়ণের বাহিরে যে-সব ছবি, বাল্মীকিতে ত সেগুলি নাই। সেগুলি কালিদাসের নিজস্ব। এখনকার ভাষায় বলিতে গেলে বাল্মীকি যেন রাম ও সীতার দুখানি ফটোগ্রাফ তুলিয়া গিয়াছেন; আর কালিদাস তাহাতে background দিয়া তাহাকে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর, উজ্জ্বলতম করিয়া তুলিয়াছেন।"

কাব্যে যাহা দেখানো সম্ভব, নাটকে তাহা সম্ভব নহে; আবার নাটকে যাহা সম্ভব কাব্যে তাহা দেখানো যায় না। দৃশ্য কাব্য ও শ্রব্য কাব্য উভয়েই যদিও কাব্যধর্মী তবুও উভয়েরই স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আছে এবং বৈশিষ্ট্য বর্তমান। কালিদাস ৬টি সর্গে (৫২২টি শ্লোকে) আর ভবভূতি ২ খানি নাটকে (১৪টি অঙ্কে) রামচরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। কালিদাসের ন্যায় ভবভূতিও বাল্মীকিকৃত রামায়ণকে উপজীব্য করিয়া আপন আদর্শ ও ভাবানুযায়ী রামচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। কালিদাসের অপেক্ষা ভবভূতির কল্পনা সুদূরপ্রসারী। অগ্রে আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা উহার প্রমাণ দিব। ভবভূতির মালতীমাধব একটি কাল্পনিক সৃষ্টি। রঘুবংশে কালিদাসের যেমন নিজস্বতা আছে তেমনি ভবভূতির রামচরিতদ্বয় নিজস্বতায় পরিপূর্ণ। শ্রব্য কাব্য বলিয়া কালিদাস background সাজাইয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু ভবভূতি বিভিন্ন নাটকীয় চরিত্রের মুখে কথা সাজাইয়া দিয়া উহাদের জীবন্ত করিয়া দেখাইয়াছেন। নাট্যকারেরা চরিত্র-সৃষ্টি-ব্যাপারে licence লইয়া থাকেন, ইহা সর্বজন-বিদিত। ভবভূতি ঐ সুযোগ ছাড়েন নাই। কালিদাস বাল্মীকিকে টেক্কা মারিয়াছেন; ভবভূতি কিন্তু কেবল টেক্কা মারিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, আপনভাবে বিস্তার করিয়াছেন।

ভবভূতি ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ। কথিত আছে, তিনি কুমারিল ভট্টের নিকট পূর্বমীমাংসা এবং জ্ঞাননিধির নিকট উত্তরমীমাংসা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 'পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞ' ভবভূতি ধুরন্ধর তার্কিকদের ন্যায় নাটকীয় চরিত্রের মাধ্যমে সুকৌশলে বৈদিক ধর্মের উৎকর্ষ এবং ন্যায়সঙ্গতা দেখাইয়াছেন। হাস্যরস নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ, নতুবা দর্শকের একঘেয়ে লাগিবার আশঙ্কা থাকে। কালিদাসের নাটকে

বিদূষক আছে, কিন্তু ভবভূতির তিনখানি নাটকে কোথাও বিদূষক নাই। করুণরসের মধ্যে হাস্যরস পরিবেশন করা কঠিন হইলেও ভবভূতি উত্তররামচরিতের ৪র্থ অঙ্কে মুনিবালকদের দ্বারা অশ্বমেধের অশ্বকে লইয়া কিঞ্চিৎ হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন। নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা ভরতমুনি বলিয়াছেন: "ন তজ্‌জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা। ন স যোগো ন তৎ কর্ম নাটকে যন্ন দৃশ্যতে ॥" অর্থাৎ এমন কোন জ্ঞান, শিল্প, বিদ্যা, কলা, যোগ ও কর্ম নাই যাহা নাটকে দেখানো যায় না। শ্রব্য কাব্য অপেক্ষা দৃশ্য কাব্য মনের উপর অধিক রেখাপাত করে।

রঘুবংশের উপর দৃষ্টিপাত করিলে একটি জিনিস স্বতঃই উদ্ভাসিত হইয়া থাকে; উহা হইতেছে একটি মহান বংশের উত্থান ও পতন অর্থাৎ উঠতি বেলা ও পড়তি বেলা। সূর্য-বংশের সূর্য দিলীপ হইতে আরম্ভ করিয়া রঘু, অজ ও দশরথের উপর দিয়া উদিত হইয়া যখন রামচন্দ্রের উপর পড়িল তখন বেলা বারোটা। রঘুবংশ তখন গৌরবের শীর্ষে। ঐ সূর্য তারপর যখন ২৩ পুরুষ পার হইয়া ২৪ পুরুষ বা শেষ পুরুষ অগ্নিবর্ণে পৌছাইল তখন সূর্য অস্তোন্মুখ। অগ্নিবর্ণ নামেই অগ্নিবর্ণ ছিলেন; অত্যধিক ভোগোন্মত্ততার জন্য তাঁহার রাজযক্ষ্মা হয়। ইহার ফলে বিবর্ণ হইয়া কোন বংশধর না রাখিয়া মারা যান। প্রজারা অগ্নিবর্ণের এক গর্ভবতী মহিষীকে রাজপদে ন্যস্ত করেন। কালিদাস বড় নির্দয়ভাবে রঘুবংশের উপর যবনিকা টানিয়াছেন।

কালিদাস রামচন্দ্রের জন্মবৃত্তান্ত ১০ম সর্গে দেখাইয়া একটু মন্তব্য করিয়াছেন: "দশানন-কিরীটেভ্যস্তৎক্ষণং রাক্ষসশ্রিয়ঃ। মণিব্যাজেন পর্যস্তাঃ পৃথিব্যামশ্রুবিন্দবঃ ॥" অর্থাৎ রাম ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র দশাননের কিরীট হইতে রত্নচ্ছলে রাক্ষসলক্ষ্মীর অশ্রুবিন্দুসকল অবনীতলে পতিত হইল। যজ্ঞ রক্ষার জন্য বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের কাছে সর্বগুণের আকর রামচন্দ্রকে চাহিলেন। রামচন্দ্রের বয়স তখন ১৫ বৎসর। কালিদাস লিখিয়াছিলেন, "তেজসাং হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে" অর্থাৎ তেজস্বীদের বয়স-পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। রামলক্ষ্মণ কৌশিক মুনির সঙ্গে যাত্রা করিলেন এবং পথিমধ্যে তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করিলেন। এইকালে বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে তাঁহারা বহু দিব্য অস্ত্র লাভ করেন এবং সিদ্ধাশ্রমে গমন করিয়া মারীচ, সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষসকে বধ করিয়া বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা করেন। রামচন্দ্র পরে অহল্যা-উদ্ধার এবং মিথিলায় গমন করিয়া হরধনু ভঙ্গ করেন এবং জনকের অযোনিজা কন্যা সীতাকে বিবাহ করেন। ইহা সত্যই আশ্চর্যের যে, ভারতের দুই মহাকাব্য—রামায়ণ ও মহাভারত—উভয়েরই নায়িকাদ্বয় অযোনিজা।

নিমিকুলের সঙ্গে রঘুকুলের সম্বন্ধ বৈবাহিক সূত্রে দৃঢ় হইল। রামের সহিত সীতার, লক্ষ্মণের সহিত উর্মিলার, ভরতের সহিত মাণ্ডবীর এবং শত্রুঘ্নের সহিত শ্রুতকীর্তির বিবাহ হইল। রাজা দশরথ সকলকে লইয়া অযোধ্যার পথে অগ্রসর হইলেন। তিন দিন চলিবার পর কৃতান্তসম পরশুরামের সহিত রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। পরশুরাম নিজগুরু শিবের ধনুর্ভঙ্গকারী রামকে চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিলেন, "নিহত দৃপ্ত রাজন্যবর্গের গলদেশ হইতে নির্গত রুধিরপায়ী আমার এই ভয়ঙ্কর পরশু নির্দয়ভাবে পতিত হউক তাহার উপর, নিঃশঙ্কচিত্তে যে আমার গুরুর ধনু ভঙ্গ করিয়াছে এবং উচ্ছলিত নবীন যৌবনের দ্বারা যাহার অথর্ব গর্বতাপ স্ফুরিত হইয়াছে।" রসগঙ্গাধর গ্রন্থে এই উক্তিটিকে রৌদ্ররসের একটি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা

হইয়াছে। এখানে একটি কথা স্মরণীয় যে, একমাত্র রামায়ণে দেখা যায় তুই জন অবতারের পরস্পর সাক্ষাৎ। জয়দেবকৃত দশাবতার-স্তোত্রে প্রথমে 'কেশবধৃতভৃগুপতিরূপ' এবং ঠিক তাহার পরেই 'কেশবধৃতরঘুপতিরূপ' উল্লেখ আছে।

যাহা হউক, পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয়-কারী মাতৃহন্তা পরশুরামকে দেখিয়া বৃদ্ধ দশরথ ভীত হইয়া 'অর্ঘ্য অর্ঘ্য' বলিয়া জামদগ্ন্যকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ জগতে পুত্রবাৎসল্য মানুষকে এইরূপই উদ্বিগ্ন করিয়া থাকে। কালিদাস পরশুরামের বীরত্ব অত্যন্ত সাধারণভাবেই দেখাইয়াছেন। "পূর্বে 'রামনাম' উচ্চারণ করিলে কেবল আমাকেই বুঝাইত, এখন সেই নাম অভ্যুদয়োন্মুখ তোমাতে বিভক্ত হওয়াতে আমার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইতেছে। তুমি আমার এই শরাসনে গুণারোপণ করিয়া শর-সংযুক্ত ধনুক আকর্ষণ কর, যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই। ইহাতে সমর্থ হইলে তোমাকে সমবাহু-বলশালী বিবেচনা করিয়া পরাভব স্বীকার করিব অথবা আমার প্রদীপ্ত কুঠারের ভয়ে ভীত হইয়া অভয় প্রার্থনা কর।" পরশুরামের উপর্যুক্ত উক্তিতে রামচন্দ্র মৃদুহাস্য করিয়া ধনুক গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "বলুন, এই অব্যর্থ শর দ্বারা আপনার স্বৈরগতি অথবা যজ্ঞার্জিত স্বর্গলোক অবরোধ করিব?" হতদর্প পরশুরাম নতি স্বীকার করিয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে পুরাণ পুরুষ বলিয়া জানিতাম না এমন নহে; আপনি মর্ত্যে অবতরণ করিয়াছেন; এক্ষণে আপনার দিব্যতেজ দর্শন করিবার জন্য আপনাকে কুপিত করিয়াছি। যাহা হউক, আপনি আমার গতি রুদ্ধ করিবেন না, আমার পুণ্যার্জিত স্বর্গলোক অবরুদ্ধ করুন।" রামচন্দ্র তাহাই করিলেন।

ভবভূতি কালিদাসের মত রামচরিতে প্রবেশ করেন নাই। রামচন্দ্রের উপর তাঁহার প্রথম নাটক মহাবীরচরিত। বীররূপেই তিনি রামচন্দ্রকে রঙ্গমঞ্চে উঠাইয়াছেন। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে আমরা রামলক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের সিদ্ধাশ্রমে ধনুর্বাণহস্তে যজ্ঞ-রক্ষাকারিরূপে দেখি। ঐ যজ্ঞে বিশ্বামিত্র মিথিলার রাজর্ষি জনককে বলিয়া পাঠান, "তুমি এই যজ্ঞে যজমানরূপে নিমন্ত্রিত হইয়াছ জানিবে এবং সীতা ও ঊর্মিলার সঙ্গে কুশধ্বজকে এখানে পাঠাইয়া দিবে।" এই সংবাদ পাইবামাত্র জনক নিজভ্রাতা কুশধ্বজকে কন্যাদ্বয়সহ সিদ্ধাশ্রমে পাঠাইয়া দেন। যাহা হউক, নাটকের প্রারম্ভে ইহাদের পূর্বকল্পিত মিলন খুবই সুন্দর।

এ জগতে গুণানুরাগ রূপানুরাগকে দৃঢ় করে। রামচন্দ্রের তেজঃপ্রভাবে অহল্যার উদ্ধার হইলে পর সীতা চুপি চুপি সানুরাগে বলিয়া ফেলিয়াছেন, "ইহার যেরূপ শরীরের গঠন, ইহার প্রভাবও তাহারই অনুরূপ।" মহাবীর-চরিতে এই বালকাণ্ডের যথেষ্ট নূতনত্ব রহিয়াছে; যাহা অন্য কোন রামায়ণে নাই। সিদ্ধাশ্রমেই রাবণ পুরোহিত 'সর্বময়' নামক জনৈক বৃদ্ধ রাক্ষস রাবণের দূতরূপে আসিয়া জানাইলেন যে, রাবণ সীতাকে বিবাহ করিতে চান। কিন্তু কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। এমন সময় তাড়কা ভয়ঙ্কর মূর্তিতে যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করিতে আসিলে বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে রাক্ষসীকে বধ করিতে নির্দেশ দেন। রাম বলিয়া উঠিলেন, "ভগবন্ স্ত্রী খলু ইয়ম্।" অর্থাৎ ইনি যে স্ত্রীলোক! এই কথা শুনিয়া সীতার পূর্বরাগ আরও বর্ধিত হইয়াছে। সীতা বলিয়া উঠিয়াছেন, "আহা! স্ত্রীলোক বলিয়া ইহার মনের ভাবটা কেমন বদলাইয়া গেল!" যাহা হউক, রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের আদেশে তাড়কাবধ করিলেন। তিনি বিশ্বামিত্রের নিকট অলৌকিক সব দিব্যাস্ত্র লাভ করেন এবং হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করিলেন। ভবভূতির হরধনুর বর্ণনা বাল্মীকি বা কালিদাসের সঙ্গে মিলে না। তাঁহার মতে পদ্মযোনি ব্রহ্মা দেবতাদের পরাক্রমের সার দিয়া ত্রিপুরাসুর-বধের জন্য এই হরধনু তৈরি করেন। অপরদের মতে বিশ্বকর্মা ঐ ধনুর নির্মাতা। (ক্রমশঃ)

হাস্যরসিক বিবেকানন্দ

শ্রীরাধাশ্যাম দাস

ধ্যানগম্ভীর বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জীবনের বহুল ঘটনার মধ্যে কৌতুক ও রঙ্গরসপ্রিয় বিবেকানন্দের সন্ধান সহজেই পাওয়া যায়। হাস্য-কৌতুকে তাঁর এত নিপুণতা ছিল যে, যে-কোন বিষয়ে অতি সহজে রঙ্গরস পরিবেশন করতে মেতে যেতে পারতেন আর হাস্যরোলে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠত। আবার যাকে নিয়ে রঙ্গ করতেন তিনিও ক্ষেত্রবিশেষে এতে যোগদান না করে চুপ করে থাকতে পারতেন না। তা ছাড়া একসঙ্গে রাগাতে, হাসাতে আবার ভালবাসা দিয়ে আপন করে নিতে খুব কম লোকই পারে। স্বামীজীর জীবনে ঘটেছিল এরই মণি-কাঞ্চনযোগ।

তাঁর দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র ঘটনার মধ্যে ব্যঙ্গ-কৌতুকের এত ঘটনা ছড়িয়ে রয়েছে, যা সংগ্রহ করলে এক বিরাট পুঁথি হতে পারে। চারদিকে বিক্ষিপ্ত এরূপ ঘটনার সামান্য কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া গেল:

একসময় স্বামীজী আমেরিকায় অবস্থানকালে এক সভায় বক্তৃতা করতে যান। স্বামীজী বিদেশী, ভারত থেকে এসেছেন, তাই শ্রোতারা প্রথমদিকে অনেকেই এলোমেলো ভাবে স্বামীজীকে নানারূপ প্রশ্ন করতে থাকেন। শ্রোতাদের মধ্যে একটি অল্পবয়স্কা কুমারী পাদরীদের লেখা বই পড়ে এসে স্বামীজীকে প্রশ্ন করে—"স্বামীজী! আপনাদের দেশে ছোট শিশুদের গঙ্গাতে কুম্ভীরের মুখে নিক্ষেপ করে কেন?" স্বামীজীও গম্ভীরমুখে ব্যঙ্গচ্ছলে উত্তর করলেন—"ছোট মেয়েদের মাংস বেশ নরম কিনা, তাই তাদের কুমীরকে খেতে দেয়।" উত্তর শুনে শ্রোতৃবৃন্দের ভিতর সকলেই হাসতে লাগলেন আর কুমারীটিও অপ্রতিভ হয়ে গেল।[১]

আমেরিকা ধনীর দেশ। তথায় সাত'শ ধনাঢ্য ঘর আছে। তাঁরা নিজদিগকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন। তাই সাধারণের সঙ্গে মিশতে কুণ্ঠিত হতেন। একদিন স্বামীজী একস্থানে বক্তৃতা করতে যান। তথায় একটি ধনাঢ্য মহিলা এসে স্বামীজীকে প্রশ্ন করেন—"এখানে কি সাত'শ লোকের সভা?" স্বামীজী ক্ষণবিলম্ব না করে উত্তর দেন—"না, এটা চোদ্দ'শ লোকের সভা।" মহিলাটি উত্তর শুনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। চারদিকে হাসির ঢেউ খেলে যায়।[১]

স্বামীজী নিউইয়র্কে অবস্থানকালে তথাকার চীনা অধিবাসীর ইংরেজী শুনে খুব আনন্দ পেতেন। চীনাদের অনুকরণ করে তিনি বেশ রসিয়ে রসিয়ে ইংরেজী বলতেন আর হাসির রোল উঠত। তিনি চীনাদের মত করে বলতেন—"O me Melican Chinaman. Me eat polk, me eat blandy, me eat evely thing." চীনারা 'র' স্থলে 'ল' প্রয়োগ করতো, তাই pork-এর স্থলে polk, brandy-এর স্থলে blandy প্রভৃতি।[২]

স্বামীজীর লণ্ডনে অবস্থানকালের একটি কাহিনী বিশেষ কৌতুককর। স্বামীজী একবার ট্রেনে করে যাচ্ছেন, সঙ্গে এক কপর্দকও নেই। তাছাড়া আগের দিন খাবারও জোটেনি। ট্রেনে কতকগুলি বোম্বাই অঞ্চলের

লোক ছিলেন। তাঁরা ছিলেন সবাই থিওসফিষ্ট। স্বামীজীকে দেখে তাঁরা বললেন, ইনি হিমালয়ের অনেক স্থানে ঘুরে বেড়ান। নিশ্চয়ই হিমালয়ের কোন নিভৃত স্থানে মহাত্মা কুত্‌মিলারের দেখা পেয়ে থাকবেন। তাঁরা সবাই হিমালয়ের অলৌকিক ঘটনা ও মহাত্মাদিগের অনেক আজগুবি গল্প করতে থাকেন। স্বামীজী আজগুবি গল্প শুনে হাস্য সংবরণ করে গম্ভীর মুখে তাঁদের সঙ্গে আজগুবি গল্পে মিশে যান। তারপর হঠাৎ বলেন—"কুত্‌মিলারের কথা বলছেন কি, এই কা'দন আগে কুত্‌মিলারের ভাণ্ডারাতে গেছলুম। সে কি ব্যাপার! এই এত বড় বড় লাড্ডু (নিজের হাত দেখাইয়া), আর কত যে সাধু ভোজন করেছে তার ইয়ত্তা নেই! সে যে কি ব্যাপার তা আর আপনাদের কি বলবো!" এই বলে স্বামীজী আরও অধিক আজগুবি কাহিনী বলতে লাগলেন। স্বামীজী যে তাঁদের বিদ্রূপ করছেন তা তাঁরা বুঝতে না পেরে স্বামীজীর সঙ্গে মহোল্লাসে মেতে গিয়ে স্বামীজীকে বেশ ভাল করে ভোজন করালেন। ভোজনান্তে একটু সুস্থ হয়ে ভাব পরিবর্তন করে স্বামীজী নিজ মূর্তি ধারণ করে তাঁদের খুব ভৎর্সনা করলেন।[৩]

যখন যে অবস্থা ও পরিবেশে স্বামীজী থাকতেন নিজেকে তার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারতেন। তাই সহজেই তিনি ভাব-পরিবর্তনে সক্ষম হতেন। একবার স্বামীজী গাজীপুরে মুন্সেফ শিরিশচন্দ্র বসুর বাড়ীতে আছেন। তখন গাজীপুরে এক সরকারী ঠাকুর্দা ছিলেন। তিনি ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ আর গাঁজা, গুলি ও চরসে সিদ্ধপুরুষ। ঠাকুর্দার আর একটা দোষ ছিল—সবজান্তা ভাব। কোন কথা বা প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুর্দা "ও বিষয়ে আমি জানি"—বলতেন। একদিন ঠাকুর্দা শিরিশবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত আছেন। স্বামীজীও সেদিন উপস্থিত। ঠাকুর্দাকে নিয়ে সবাই খুব স্ফূর্তি করতে লাগলেন। স্বামীজীও তখন ঠাকুর্দাকে নিয়ে রঙ্গ আরম্ভ করলেন। স্বামীজী প্রথমেই ঠাকুর্দাকে বেদ পড়ে শুনাতে লাগলেন—"কস্মিংশ্চিৎ বনে ভাসুরকো নাম সিংহঃ প্রতি-বসতি স্ম"—এ হোল বেদের প্রথম স্তোত্র। স্বামীজীর মুখে বেদের নাম শুনেই ঠাকুর্দা আগে থেকে কান্না জুড়ে দেন। স্বামীজী তারপর বেদের ব্যাখ্যা শুরু করেন। কী শব্দবিন্যাস ও ভাবপূর্ণ শ্লোক! এদিকে ঠাকুর্দা হাপুস নয়নে কাঁদছেন আর রুদ্ধকণ্ঠে শোকব্যঞ্জক উহু উহু করছেন। এমন সময় শিরিশবাবু এসে পড়লেন। তিনি স্বামীজীর ব্যঙ্গ দেখে হেসে ফেললেন। স্বামীজী শিরিশবাবুকে সেখান থেকে চলে যেতে বললেন, কারণ তিনি তখন ঠাকুর্দাকে বেদ শুনাচ্ছেন। শিরিশচন্দ্র বাড়ীর ভিতর গিয়ে উচ্চস্বরে হাসতে লাগলেন। এদিকে গেঁজেল ঠাকুর্দা বেদপাঠ শুনে কেঁদে ভাসাতে লাগলেন।[৪]

আবার একদিন বলরামবাবুর বাড়ীতে গিরিশবাবু ও স্বামীজী খেতে বসেছেন পাশা-পাশি। সে সময়টা গরমের সময় বলে বলরাম-বাবু প্রচুর পাকা আমের ব্যবস্থা করেছিলেন। আম এলো; যত আম গিরিশবাবুর পাতে দিচ্ছে সবগুলি বেশ মিষ্টি আর স্বামীজীর পাতে যত দিচ্ছে সবই টক। এতে স্বামীজী চটে গিয়ে গিরিশবাবুকে বললেন—"জি. সি., আপনার পাতে যত মিষ্টি আম আর আমার পাতে যত টক; আপনি নিশ্চয়ই বাড়ীর ভেতর গিয়ে বন্দোবস্ত করে এসেছেন।" গিরিশবাবুও বাইরে গাম্ভীর্য রক্ষা করে উত্তর দেন—"আমরা গৃহী, সংসারী—আমরাই তো মজা মারবো।

তুমি সন্ন্যাসী, ফকির—পথে পথে ঘুরে বেড়াবে, তোমাদের কপালে তো খুঁটকো, টোকো আম জুটবেই।"

গিরিশবাবু বলতেন—ঝগড়া করে এমন সুখ কারও সঙ্গে হয় না। সে ঝগড়া যে কত আনন্দের, কত মিষ্টি![৫]

এমনি কত ঘটনা জানত অজানত ঘটে গেছে, যার সঠিক বিবরণ-সংগ্রহ হয়নি। সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাস্যরস-পরিবেশনে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

সাধনভজন করার জন্যে স্বামীজী কাকেও উপবাস করতে দেখলে কৌতুক করে বলতেন—"কিরে! ডালকুত্তা (hound) করছিস্ নাকি?" তিনি ডালকুত্তার গল্প খুব বলতেন। বাল্যকালে তিনি পাড়ার একজনার বাড়ীতে বেড়াতে যান। গিয়ে দেখেন একটা ছেলে একটা নেড়িকুত্তাকে ধরে নারকেল দড়ি দিয়ে আচ্ছা করে কষে পেটে বেঁধেছে আর দিনান্তে মাত্র একমুঠো ভাত বরাদ্দ করে রেখেছে। কুকুরটার হাড়-পাঁজড়া সব বের হয়ে গেছে। দাঁড়াতে পারছে না, পাগুলো থরথর করে কাঁপছে, গলায় আওয়াজ বেরুচ্ছে না। এই দেখে স্বামীজী কুকুরটাকে এমন করে বেঁধে মারার কারণ জানতে চাইলেন। ছেলেটি গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়, "একে ডালকুত্তা বানাচ্ছি।" সেই থেকেই স্বামীজী উপবাসী দেখলেই ঐ কৌতুককর কাহিনীর কথা উল্লেখ করে হাসিঠাট্টা করতেন।[৬]

স্বামীজী কৌতুক করে কত লোকের নতুন নতুন নামকরণ করেছেন। যাঁদের তিনি নতুন নাম দিয়ে ভূষিত করেছেন, সে নাম যত বিদ্রূপাত্মক বা হাস্যকরই হোক না কেন, তাঁরা বিদ্রূপ বা ঠাট্টাকে স্বামীজীর আশীর্বাদরূপে গ্রহণ করে সারা জীবন আনন্দের সঙ্গে সে নাম বহন করে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেছেন। এখানে এরূপ কয়েকটা ঘটনার কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে।

যখন স্বামীজী রাজা অজিত সিং-এর রাজ্যে অবস্থান করেন, দেওয়ান সাহেব মুন্সি জগমোহনলাল স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। একদিন স্বামীজী সকলের সামনে রাজস্থানের বিভিন্ন কাহিনী বলছিলেন টডের 'রাজস্থান' থেকে। স্বামীজী প্রায় মুখস্থ বলে যাচ্ছিলেন সমস্ত ঘটনা। কোন্ রাজা কোন্ বংশীয় এসব শুনতে শুনতে শ্রোতারা বেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। কোন্ রাজা সূর্যবংশীয়, কোন্ রাজা চন্দ্রবংশীয়, কোন্ রাজা হরিকুলবংশীয় ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল। তথায় স্থানীয় একটি মুসলমান গায়ক উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাজসভার ধ্রুপদী। খাঁ সাহেব স্বামীজীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। খাঁ সাহেব সহসা স্বামীজীকে প্রশ্ন করলেন—"স্বামীজী, কেউ চন্দ্রবংশীয়, কেউ সূর্যবংশীয়। আমিও তো রাজপুত। তবে আমি কোন্ বংশীয়?" স্বামীজী গাম্ভীর্য- ও হাস্যপূর্ণ মুখে উত্তর করলেন--"খাঁ সাহেব! চন্দ্রবংশীয়, সূর্যবংশীয় এ সব তো পুরানো হয়ে গেছে, তুমি হচ্ছ গিয়ে তারাবংশী।" খাঁ সাহেব ও অন্যান্য সকলে এ তাজা কথা শুনে ঠাট্টা বুঝেও মহানন্দ করতে লাগলেন। খাঁ সাহেব তদবধি নিজেকে তারাবংশী বলেই পরিচয় দিতেন। খাঁ সাহেব গৌরব করে বলতেন—"স্বামীজী আমাকে এ নাম দিয়েছেন, এ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ উপাধি।"[৭]

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে অক্ষয়কুমার সেনের কথা, যাঁকে স্বামীজী আদর করে 'শাঁকচুন্নী' বলে ডাকতেন। পুঁথিকার নিজেকে ধন্যজ্ঞানে 'শাঁকচুন্নী' নামেই আত্মপরিচয় দিয়েছেন। আমরা শাঁকচুন্নীর প্রথম পরিচয় পাই—

"নামটী আমার 'শাঁকচুন্নী' কল্পগাছে বাসা
লীলাপুঁথি উক্তি লিখে মিটে যেন আশা॥"[৮]

স্বামীজী পুঁথি পড়ে বলেছেন—"শাঁকচুন্নী is the future apostle for the masses of Bengal. শাঁকচুন্নীর পুঁথি and শাঁকচুন্নী himself must electrify the masses. ধন্য শাঁকচুন্নী, সাবাস্ শাঁকচুন্নী!"

তারপর আমরা স্বামীজীর দক্ষিণ-ভারতীয় শিষ্য আলাসিঙ্গার কথা মনে করতে পারি। অধ্যাপক শ্রীমন্দম্ চক্রবর্তী আলাসিঙ্গা পেরুমল ছিলেন স্বামীজীর বিশিষ্ট শিষ্য ও সহায়ক। এত বড় নামে ডাকা অসুবিধা তাই স্বামীজী অধ্যাপকের একটি সংক্ষিপ্ত ও কৌতুককর নাম দেন—'আচিঙ্গা'। অধ্যাপকের এক কনিষ্ঠ সহোদরও স্বামীজীর প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। স্বামীজী আদর করে তাঁকে ডাকতেন আচিঙ্গার ভাই 'চিচিঙ্গা' বলে। চিচিঙ্গা নামে অভিহিত হয়ে তিনি সারা জীবন নিজের পরিচয় 'চিচিঙ্গা' বলেই দিয়ে গেছেন সগর্বে। এতে তিনি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতেন।[৯]

শ্রীহরমোহন মিত্র স্বামীজীর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন অতি সরল প্রকৃতির। কোন ঘোর-প্যাঁচ তাঁর হৃদয়ে ছিল না। তাঁকে স্বামীজী আদর করে ডাকতেন 'হারমোনিয়ম' বলে।[১০]

এমনিভাবে তাঁর গুরুভাই ও ঠাকুরের গৃহী ভক্তদের নিয়েও স্বামীজীর কৌতুককর কাহিনীর অনেক ঘটনা পাওয়া যায়। যেমন শ্রীযুত গিরিশ ঘোষকে স্বামীজী আদর ও কৌতুক করে ডাকতেন জি. সি. বলে। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র হাজরাকে ডাকতেন Thousanda বলে। গঙ্গাধর মহারাজকে Ganges বলে। তাছাড়া রাখাল মহারাজ, যোগেন মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ কেউই স্বামীজীর কাছে রেহাই পাননি! ব্যঙ্গকৌতুক ও হাস্যরসের খোরাক যেন প্রতি পদেই স্বামীজীর সামনে এসে দাঁড়াতো আর তিনিও তা নিপুণভাবে প্রকাশ করে রঙ্গরসের হুল্লোড় তুলতে ছাড়তেন না।[১১]

সাধারণলোকদের নিয়েও ব্যঙ্গ-কৌতুকের অন্ত ছিল না। স্থান-কাল-পাত্রানুযায়ী কৌতুকের মাত্রারও তারতম্য হোত। একদিন একজন লোক জাত-বিচারের কথা নিয়ে খুব লম্বা লম্বা কথা বলছিলেন। স্বামীজী অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে বসে শুনছিলেন। শেষ পর্যন্ত চুপ করে থাকতে না পেরে স্বামীজীও ঠাট্টা শুরু করলেন—"ওহে, তোমাদের তো কাঁচা জাত, একটু ছুঁয়ে দিলেই জাত যায়। আমাদের কি জান—পাকা জাত, উনসত্তিক লোক ছুঁলেও জাত যায় না। আর তোমাদের ছোঁয়ার আগেই জাত গিয়েছে। আমাদের সাধুদের পাকা জাত, ছুলে কিছু হয় না, বরং তাকে সে-জাতে করে নেওয়া যায়।" তখন সে লোকটা একেবারে চুপ মেরে যায়।[১২]

মাদ্রাজের ব্রাহ্মণগণ মেননদের জাতিতে শূদ্র বলে মনে করতেন। তাঁদের জাতিবিচার খুব বেশী ছিল। তাঁরা একদিন স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেন—আচ্ছা স্বামীজী, আপনি কি জাত? স্বামীজী গম্ভীর হয়ে উত্তর দেন—I belong to king-maker caste. অর্থাৎ যে জাত রাজা সৃষ্টি করে আমি সেই জাতের লোক। স্বামীজীর কথা শুনে ব্রাহ্মণেরা একেবারে নির্বাক্। স্বামীজীকে আর জাতের প্রশ্ন করতে সাহস পাননি তাঁরা। এ ঘটনাটি নিয়ে স্বামীজী খুব কৌতুক করতেন। এমনি আরও কত কাহিনী ছড়িয়ে আছে স্বামীজীর স্বল্পস্থায়ী অলৌকিক জীবনে।[১৩]

হাল্কা ধরনের হাস্যরস থেকে আরম্ভ করে গম্ভীর ভাবের ব্যঙ্গ কৌতুক বিভিন্ন পরিবেশে মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করেই তিনি সুনিপুণ কৌতুককারের মতই পরিবেশন করেছেন। যাঁরা স্বামীজীর কৌতুক উপভোগ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তাঁরা জীবনভোর সে আনন্দরসে বিভোর হয়ে থেকেছেন। আর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে তার কিছুটা পরিবেশন করে হাসির ঢেউ তুলেছেন।

১, ২, ৫, ১২	শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী :	৩য় খণ্ড :	মহেন্দ্রনাথ দত্ত
৩, ৭, ৯, ১৩	ঐ	২য় খণ্ড	ঐ
৪, ৬ ১০, ১১	ঐ	১ম খণ্ড	ঐ
৮	শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (সমসাময়িক দৃষ্টিতে) :		ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস

স্মৃতি ও বিস্মৃতি

অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

আকস্মিক মৃত্যুর আঘাতে প্রিয়জন একদিন হঠাৎ অন্তর্হিত হয় এই ধরার ধূলি থেকে রেখে যায় শুধু স্মৃতি: কত স্নেহ, কত প্রেম, কত প্রীতি, কত কলহাস্যের গুঞ্জরণ—জীবনকে একদিন যা ভরে রেখে দিত! আর একদিন দেখা গেল 'নাই নাই সে পথিক নাই।' সঙ্গে সঙ্গে সে নিয়ে গেছে জীবনের যত সুখ, আনন্দ, বেঁচে থাকবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা! বিরাট শূন্যতাবোধ জাগে অন্তরে, নিজেকে মনে হয় অন্তহীন ধূ ধূ মরুভূমিতে একলা পথিক—আশা নেই, ভাষা নেই, নেই জীবনের সেই রঙীন আলোর ইশারা—যে আলো তাকে আকর্ষণ করতো নিত্যনতুন কর্মের পথে। জীবন যেন যন্ত্রচালিত, শুধুমাত্র কর্তব্যের বোঝা বহন করে চলতে থাকে পথিক জীবনের এ-ঘাট থেকে ও ঘাটে।

মনে হয় জীবন অর্থহীন। কাজ কি আর নিরর্থক এ জীবনের বোঝা বয়ে? জীবনের ভার ঠেলে ফেলে দিয়ে প্রিয়জন যে পথে চলে গেছে সে অসীম রহস্যলোকে ছুটে চলাই তো ভালো!

তমসাচ্ছন্ন মনের ওপর এক সময় এসে পড়ে অপার রহস্যলোকের ওপার থেকে প্রত্যাশার স্বর্ণরশ্মি। ধীরে ধীরে ভেসে ওঠে একখানি মুখ সে শোকাহত বোবা মনের আকাশে। ডেকে বলে, আমার মৃত্যু নেই; অজর, অমর আমার আত্মা। যাকে তুমি পুড়ে যেতে দেখেছ সে তো রক্তমাংসে গড়া ভঙ্গুর দেহখানি। আমার নিত্যসত্তা ছড়িয়ে আছে ওই অন্তহীন আকাশের নীলিমায়, অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জে, সূর্যের আলোকে, চাঁদের হাসিতে। নদীর কুলু কুলু ধ্বনির মধ্যে আমার হাসি উচ্ছলিত; ভোরের আলোতে বস্তুবিশ্বে আমার প্রকাশ, ফুলের পাপড়িতে আমার আধো ঘুম, আধো জাগরণ, বাতাসে বাতাসে আমার স্বর মর্মরিত, বর্ষার ধারাবর্ষণে আমার বেদনার দীর্ঘশ্বাস!

প্রকৃতিজগতে সে চিরজাগ্রত আত্মার সজীব স্পর্শে রোমাঞ্চ অনুভব করি। প্রীতিবিগলিত-চিত্তে সে নিত্যসত্তাকে জড়াতে চাই নিজ প্রাণের আলিঙ্গনে। কিন্তু কোথায় সেই নিবিড় স্পর্শ? দূরের থেকে দূরে অপসৃত হয়ে যায় সে সত্তা। মর্মবেদনার গভীর গহনে আবার শুরু হয় লক্ষ্যহীন জীবনের অন্তহীন পথ-পরিক্রমা।

এবার আর তত্ত্ব নয়। টুক্‌রো টুক্‌রো স্মৃতির কণিকা এসে দগ্ধ মনের ওপর বুলিয়ে দেয় শান্তির স্নিগ্ধ প্রলেপ। ওই হাসি, ওই গান, ওই স্নেহ, ওই প্রীতি, ফেলে-যাওয়া কত টুকিটাকি সঞ্চয়-এর মধ্যে তোমাকে নিত্য আবিষ্কার করি। স্মৃতির ভাণ্ডার নিয়ে বসে যায় বেচাকেনার হাট। স্মৃতির বোঝা দিয়ে ঘর সাজাই, স্মৃতিকে চিরন্তন করে তুলতে চাই কাব্যে-সাহিত্যে-শিল্পে-সঙ্গীতে।

কিন্তু স্মৃতিরক্ষার সাহায্যেই কী মানবাত্মাকে বন্দী রাখা যায়? আত্মা যে সর্বভারমুক্ত,—নিত্যনতুন জীবনের পথে তার অবিরাম অবিশ্রাম চলাকে রোধ করবে কে?

জীবনেরে কে রাখিতে পারে?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।

আসলে চলাটাই হল জীবনের একমাত্র ধর্ম, প্রত্যক্ষ সত্য। এই চলার বেগে স্মৃতিও একদিন বিবর্ণ হয়ে ওঠে, কোনও সময় বা হারিয়ে যায় বিস্মৃতির ঘনান্ধকারে। জীবনের রথচক্র চলে ঘর্ঘর রবে, পুরাতনের সঞ্চয় মাড়িয়ে, নতুনের অভিযানে। আসে জীবনে ব্যর্থতার বেদনা, সার্থকতার আনন্দ। আবর্তিত সে জীবনে মনে হয় পুরাতনের স্মৃতি বুঝি হয়েছে চিরতরে অবলুপ্ত, বিস্মৃতির মধ্য দিয়ে জেগে উঠেছে নবীন জীবনের জয়ধ্বনি।

জীবন স্পর্শকাতর। নবীনের আহ্বান সুরার মত উত্তেজক। সফলতার আনন্দ জীবনকে ঠেলে নিয়ে চলে নিত্য নতুন কর্মের পথে। সাময়িক ভাবে বিস্মৃতি কালো আস্তরণখানি দিয়ে ঢেকে দেয় স্মৃতির মণিমঞ্জুষাকে। তাই বলে বিস্মৃতি কী একেবারে লোপ করে দিতে পারে স্মৃতির স্বর্ণময় ঐশ্বর্যকে?

পারে না। যেহেতু বিস্মৃতি ক্ষণিকের জন্য ভুলে থাকা। স্মৃতি আত্মার সঞ্জীবনীমন্ত্র :

'ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছে
যে দোলা।
নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই'...

জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার নিত্য দ্বন্দ্বে বিগত প্রিয়জনের মধুর স্মৃতি মনের পর্দা থেকে কখন সরে যায়—মানুষ হয়ত তা ভালো করে বুঝতে পারে না। কিন্তু জীবনের কোন শুভ মুহূর্তে মানুষ আবিষ্কার করে বিস্মৃতির রহস্যাচ্ছন্ন অন্ধকারে বসে স্মৃতি আপন মনে কাজ করে চলেছে, আকর্ষণ করছে মানুষকে এক অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে নবতর চেতনার জগতে। এ ভাবে ফুটে উঠছে পৃথিবীতে নব নব সৃষ্টির ফুল—বেদনার গভীরতর অনুভূতিতে স্পন্দমান, প্রসারিত চেতনায় সমৃদ্ধ।

বর্তমান—কঠিন, কঠোর, কঙ্করময়, বিসর্পিত। শক্তি অপচিত হচ্ছে প্রতিক্ষণে। এই ক্ষয় ও ক্ষতি জীবনকে হয়ত একদিন অচল করে তুলত। কিন্তু পারে না। পারে না, যেহেতু স্মৃতির রসসুধা জীবনের মর্মকোষে বর্তমান থেকে জীবনকে করে রেখেছে সচল। স্মৃতিময় অতীত ছাড়া রুক্ষ বর্তমানের মধ্য দিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পাড়ি দেওয়া মানুষের পক্ষে হত অসম্ভব।

স্মৃতি-বিস্মৃতির দ্বন্দ্বে মানবজীবন ক্ষত-বিক্ষত। সুখে-দুঃখে, আশা-নিরাশায়, আনন্দ-বেদনায় নিত্য আবর্তিত মানবজীবনে যদি কোন প্রত্যক্ষ পরম সত্য থাকে সে সত্য—এই দ্বন্দ্ব। যে প্রিয় স্মৃতিকে সমস্ত মন প্রাণ চেতনা দিয়ে সবলে আঁকড়ে ধরতে চাই বহির্জীবনের অন্তহীন জীবনসংগ্রামে, সে স্মৃতিকেই সাময়িকভাবে ভুলে যাই—এর চাইতে জটিল রহস্য জীবনে আর কী আছে? এ রহস্যের মর্ম উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা চলেছে মানবসমাজে যুগ থেকে যুগান্তরে। ভোগী নিত্য নতুন ভোগের আয়োজন করে জীবনের চরম উত্তেজনার মধ্যে এ রহস্যকে ভুলতে চেয়েছে, তত্ত্বজ্ঞানী যোগী বৃহত্তর ভাবনা ও চেতনার জগতে খুঁজে পেয়েছে এ জটিল জীবনজিজ্ঞাসার সদুত্তর, শিল্পী নিজ সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন রেখে ভুলতে চেয়েছে এ জটিল প্রশ্ন, কর্মী সদা-প্রবহমান কর্মচাঞ্চল্যের স্রোতে ভাসমান হয়ে এড়িয়ে যেতে চায় এ জীবন-সমস্যা। উদ্‌ভ্রান্ত মিষ্টিক কবি এ জটিল প্রশ্নের রহস্যভেদ করতে না পেরে গভীর অন্তর্বেদনায় আর্তনাদ করে ওঠেন :

'এ ভুল প্রাণের ভুল
মর্মে বিজড়িত মূল
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃতবল্লরী।'

বেদনার্ত মানুষের মনে এ প্রশ্ন জাগে—জীবনের এ গভীরতম রহস্যের সমাধান কোথায়?

মহাপ্লাবন

শ্রীকানাইলাল সামন্ত

বসেছিনু অন্ধকারে বর্ষানদীতীরে
সমর্পিয়া মনপ্রাণ তটিনীর নীরে ;
ভৈরব ছুটিয়া চলে ডম্বরু বাজায়ে
দুই কূল সঁপি' দেয় ধূর্জটির পায়ে
সকল ঐশ্বর্য তার বছর-সঞ্চিত
দুর্বোধ্য কী এক মন্ত্রে করিয়া মন্ত্রিত
বুঝি তার ভয়ংকর ক্রোধ থামাবারে।
সহসা চঞ্চল মন সেই স্রোতধারে
ছুটে যায় বহে যাহা নীরব কল্লোলে
ফল্গুসম ত্রিসংসারে ; সুমহান রোলে
প্লাবন আসিলে তাহে কারা ভাগ্যবান
তার দুই কূল হয়ে করে অর্ঘ্য দান।
সেদিন আসিলে মোরে সেথায় আনিও
পূজার সে মন্ত্র প্রভু শিখাইয়া দিও।

প্রভুর জন্মদিনে

শ্রীমতী প্রীতিময়ী কর

তব, মন্দির-দ্বারে পঁহুছিতে যেই
পারেনি হে মোর প্রভু,
অন্তর মাঝে দেখেছে তোমারি রূপ,
আকুলিতমন-পুষ্পাঞ্জলি
দিয়েছে চরণে তবু,
জ্বালায়ে দিয়েছে বেদনার দীপ ধূপ !
উৎসব-বাঁশী শুনেছে নিভৃত প্রাণে,
ভরেছে হৃদয় তব দক্ষিণ দানে।
অমল আলোকে দূরে সরে গেছে
ভ্রান্তি-আঁধার যবে
রাজাধিরাজের জন্মোৎসবে
মিলেছে সে অনুভবে।

সমালোচনা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতম্—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ-প্রণীত; শ্রীকাশীনাথ শাস্ত্রী ভট্টাচার্য কর্তৃক ৫৬।৪, গ্রে স্ট্রীট্ (অরবিন্দ সরণি), কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত; পৃষ্ঠা ৮৭৮+৬২; মূল্য ২৫·০ টাকা।

প্রথম সমুদ্রদর্শনের বিস্ময় অন্তরে বহন করিয়াই এই পঞ্চসহস্রাধিকশ্লোকযুক্ত মহাগ্রন্থখানি পাঠ করিলাম—আদিতে বিস্ময়, মধ্যে বিস্ময়, অন্তে বিস্ময়! পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ও অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী-বিষয়ক স্তবাবলী সংস্কৃতে রচনা করিয়াছেন। আধুনিক যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ভারতীয় সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম ও দর্শনের প্রধানতম বাহক সংস্কৃত ভাষার পোষকতায় স্বামীজী ছিলেন সকলের অগ্রণী। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইতেছে; আশা করা যায়, ইহার আকর-গ্রন্থগুলি অচিরকাল মধ্যে সংস্কৃত ভাষায়ও অনূদিত হইবে। স্বাধীনচিন্তাধারা-সংবলিত মৌলিক সংস্কৃত রচনাও যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করিতেছে এই মহাগ্রন্থখানি।

গ্রন্থটি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর আশীর্বাণী এবং শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু মনীষীর শুভেচ্ছা-ভূষিত।

শ্রীমদ্ভাগবত কেবল শ্রীভগবানের লীলা-বিবৃতি নহে; নানাকল্মষোপহত জীবোদ্ধারেই ইহার তাৎপর্য। বর্তমান গ্রন্থকারও শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাবর্ণনার মধ্য দিয়া এই মহাজীবনের কলিকলুষনাশনরূপ গূঢ় তাৎপর্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। কি কামারপুকুর-লীলা, কি দক্ষিণেশ্বর-লীলা, কি কাশীপুর-লীলা—সর্বলীলারই একমাত্র জীবের চৈতন্যবিধানে পর্যবসান। সুতরাং ভক্ত পাঠকগোষ্ঠীর নিকট এই গ্রন্থের আকর্ষণ সহজেই অনুমেয়। ভক্তিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত গ্রন্থকারের সিদ্ধান্তসমুজ্জ্বল এই নব-ভাগবতখানি শ্রীমদ্ভাগবতের মতই নিত্য পঠিত, পাঠিত ও প্রচলিত ধারায় অনুশীলিত হইবার যোগ্য।

গ্রন্থারম্ভে প্রয়োজন আশীর্নমস্ক্রিয়াবস্তুনির্দেশ প্রভৃতি—ইহা চিরাচরিত রীতি। প্রারিপ্সিত গ্রন্থের নির্বিঘ্ন-পরিসমাপ্তিকাম গ্রন্থকার তাঁহার অন্তর্যামী পরম-ইষ্ট ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই শরণ লইতেছেন:

শ্রীরামকৃষ্ণবচসাং ন হি তুল্যমস্তি
শ্রীরামকৃষ্ণমনসামভয়ং সদৈব।
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভগবানখিলার্থদাতা
শ্রীরামকৃষ্ণপদমেব গতির্মমাস্তু॥

ভক্তের আকূতি এত মর্মস্পর্শী যে বঙ্গানুবাদের প্রয়োজন হয় না, আবার বলিতেছেন:

শ্রীরামকৃষ্ণস্য কথাপ্রসঙ্গিনঃ
স্বামিপ্রধানা জনদুঃখমোচকাঃ।
তদীয়পাদাম্বুজধূলিধূসরং
কদা ভবেদস্য শিরোঽধমস্য মে॥

—'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাই যাঁহাদের নিত্য আলোচ্য বিষয়, সেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণ রহিয়াছেন; জনগণের আর্তিহরণই তাঁহাদের একমাত্র ব্রত। তাঁহাদের পদধূলি দ্বারা কতদিনে আমার মস্তক ধূসরবর্ণে রঞ্জিত হইবে!' গ্রন্থকার আট বৎসর বয়সে আপন পিতার সহিত

শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইনি আপনার কে—আপনার পিতা, জ্যেষ্ঠতাত অথবা খুল্লতাত?' তখন তাঁহার পিতৃদেব বলিয়াছিলেন:

* * * * * সর্বেষাং নঃ পিতা হ্যয়ম্।
যথাকাশস্থিতশ্চন্দ্রঃ সর্বেষাং মাতুলো ভবেৎ॥
তথা শ্রীরামকৃষ্ণোঽয়ং ভগবান্ জগতঃ পিতা।
বৈকুণ্ঠাদবতীর্ণোঽত্র জনমঙ্গলহেতবে॥

—'ইনি আমাদের সকলের পিতা। আকাশে যখন চন্দ্র উদিত হন তখন তিনি সকলেরই মাতুল হন—সকলেই বলে চাঁদা মামা; সেইরূপ ইনিও আমাদের সকলের পরমাত্মীয়। জগতের মঙ্গলের জন্য জগৎপিতা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিজধাম বৈকুণ্ঠ হইতে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।' সেই স্মৃতিচারণের ফলস্বরূপ দীর্ঘানুধ্যানসঞ্জাত এই কবিকৃতি!

লেখক কবিযশঃপ্রার্থী নন; অর্থাগমেও তাঁহার বিন্দুমাত্র স্পৃহা নাই। আপন অন্তঃকরণের বিশুদ্ধিসম্পাদনের জন্যই তিনি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঘুন নামক কীট কাষ্ঠদংশন করিতে করিতে আকস্মিকভাবে যেমন দুই-একটি বর্ণ সৃষ্টি করে, সেইরূপ তাঁহার রচনায়ও অজ্ঞাতসারে কিছু ভাল কথা থাকিতে পারে। তাহাতে ভক্তজনের আনন্দ হইলেই লেখকের পরম সৌভাগ্য:

নাহং কবিযশঃপ্রার্থী ন মে চার্থাগমে স্পৃহা।
আত্মসংশোধনার্থায় মমায়ং পরমোদ্যমঃ॥
ঘুণাক্ষরমিব তেন যদি কস্তাপি বা ভবেৎ।
স্বল্পানন্দো মমৈবাসৌ সৌভাগ্যোদয় উত্তমঃ॥

দক্ষিণেশ্বর-লীলায় ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজক। অত্যাশ্চর্য অভূতপূর্ব এই পূজা! দিব্যভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণের পূজার বর্ণনব্যপদেশে লেখক বলিতেছেন:

আত্মবিস্মৃতভাবোঽয়ং ন কুত্রাপ্যক্ষিগোচরঃ।
নেয়ং পূজা পূজকস্য স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥

—পূজকের এই পূজা সাধারণ পূজামাত্র নয়, ইহা তাঁহার আত্মস্বরূপে অবস্থান! এই লীলায় শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন সাধনমার্গে অবস্থিতিও অসাধারণ নিপুণতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। সাধকপ্রবর অদ্বৈতবেদান্তী সন্ন্যাসী তোতাপুরী শক্তিতত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন; অবশ্য বর্তমান গ্রন্থকার এই ঘটনাটিকে অনবদ্য কাব্যসুষমায় মণ্ডিত করিয়াছেন।

লেখক স্থানে স্থানে সংস্কৃত গদ্যেরও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের একটি অনুপম সুবিদিত ঘটনা নিম্নোদ্ধৃত অংশে বিধৃত:

—আদৌ শ্রীবৈদ্যনাথধাম গত্বা তত্রস্থক্ষুধাতুরধৃতকঙ্কালমাত্রদেহ-দরিদ্রদর্শনে দয়ার্দ্রহৃদয়ো দরিদ্রদেবতা দরিদ্রসেবার্থং ··· মথুরানাথমুক্তবান্—ভো মথুর! কেবলমেকদিনমেতেষাং ভক্ষ্যদানেনোদরং পরিপূরয়। দদস্ব প্রচুরতরং তৈলং মস্তকেষু। তথা ··· পরিধেয়বস্ত্রমপি প্রযচ্ছ। এবং ভগবতোঽমৃতায়মানবচাংসি শ্রুত্বাপি বারাণসীযাত্রাসমুৎসুকো মথুরো বারাণস্যামেব দরিদ্রভোজনাদিব্যবস্থা বিধেয়েতি সাগ্রহমুক্তবান্। শ্রুত্বৈবং দরিদ্রপরমদেবতা সরোষমবদৎ। নাহং যাস্যামি বারাণস্যাম্, এভিরেবাত্র বসামি। দরিদ্রাণামেষাং নাস্তি কিং কোঽপি দাতা? ততো মথুরেণ দরিদ্রান্তর্গতং ভগবন্তমবলোক্য সত্বস্তদাজ্ঞাপূরণে কৃতে ঠাকুর ঈশস্বান্তঃপুরঃসরং পরমানন্দমবাপ।—অনুবাদের সাহায্য ছাড়াও করুণাবিগলিতমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে পাঠক সহজেই এখানে চিনিয়া লইতে পারিবেন।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীমা সারদা শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপুষ্টির সহায়িকারূপে, নিখিলমাতৃত্বের প্রতিচ্ছবিরূপে বর্ণিতা হইয়াছেন; অবশ্য এই বৃহদায়তন গ্রন্থে শ্রীশ্রীমার বিস্তৃততর রূপায়ণ ভক্তগণ স্বতই

আকাঙ্ক্ষা করেন। কাব্যখানিতে শ্রীরামকৃষ্ণের 'অখণ্ডের ঘর' শ্রীনরেন্দ্রনাথসান্নিধ্যে আমরা পরিতৃপ্ত; তবে 'রাখাল', 'বাবুরাম', 'শরৎ', 'শশী,' 'লাটু'—ইঁহাদের এবং আরও অনেকের সঙ্গে কেবল প্রাসঙ্গিক পরিচয়ে ভক্তচিত্ত উৎসাহিত হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসংবরণের পূর্বে শ্রীনরেন্দ্রনাথের নিকট আপন দিব্যস্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন। এই বর্ণনায় গীতার বিশ্বরূপ-দর্শনের ছায়া সুস্পষ্ট। ইহা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে বটে, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রামাণিক চরিতগ্রন্থে ইহা দৃষ্ট হয় না। অন্যান্য কয়েক স্থলেও এই ধরনের পুরাণানুরূপ বর্ণনা আছে, যাহা প্রামাণিক চরিতগ্রন্থে নাই। তবুও রসবিচারে এগুলির মূল্য উপেক্ষণীয় নহে। যেমন, শ্রীনরেন্দ্রনাথ পরম আকুতি সহকারে তাঁহার আরাধ্যদেবকে স্তবভঙ্গীতে বলিতেছেন:

কাহং মহামূর্খতমো দুরাত্মা
শিক্ষাপি দীক্ষা ন চ মে কথঞ্চিৎ।
সৎকর্ম-সদ্ভাব-সুপুণ্যলভ্যে
ত্বৎপাদপদ্মে ন রতির্মমাস্তি ॥
ইত্থং সুদুষ্টাশয়দুষ্টজীবে
তবানুকম্পা বিমলা বিশিষ্টা।
ন শোভতে দেব যথা ভুজঙ্গে
দত্তং পয়স্তৎ গরলং বহু স্যাৎ ॥
জ্ঞাত্বা ন তে রূপমরূপমাদ্যং
সদা সদানন্দময়ং বরেণ্যং
অনন্তকল্যাণগুণাত্মকস্য
মন্যে পুরা প্রাকৃতবিগ্রহং ত্বম্ ॥

গ্রন্থখানির প্রত্যেক সংস্কৃত শ্লোক বঙ্গভাষায় ও ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। উভয় অনুবাদই সুপাঠ্য হইয়াছে মনে করি। সর্বশ্রেণীর পাঠকের নিকট ইহা সমাদৃত হইবে। তবে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি সুপণ্ডিত গ্রন্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভাগবতম্ কথাটির 'ব' অন্তঃস্থ; অথচ ইংরেজীতে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam-রূপে—'b'-এর পরিবর্তে 'v' হওয়া উচিত ছিল। আদ্যন্ত সংস্কৃত শ্লোক দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে, অথচ কোথাও বর্গীয় ব (ৰ) এবং অন্তঃস্থ ব (ৱ)-এর পার্থক্য দর্শিত হয় নাই। ইহা অনেকের নিকট ত্রুটি বলিয়াই বিবেচিত হইবে। সাধারণ বর্ণাশুদ্ধিও একেবারে অপ্রচুর নহে। অশেষগুণসন্নিপাতে এই সকল ত্রুটিবিচ্যুতি অবশ্য হঠাৎ দৃষ্টিগোচর হয় না, তবুও আগামী সংস্করণে ইহারা পরিহৃত হইলে ভক্ত পাঠকদের যেমন উপকার হইবে তেমনি সপ্তাশীতিবর্ষবয়স্ক গ্রন্থকারের সাধনাও সর্বাংশে সফল হইবে মনে করি। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

—অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

উপনিষৎপ্রদীপম্ (ঈশোপনিষদ্ভাষ্যম্) —ডক্টর অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য। কাঠিয়া বাবার আশ্রম, পোঃ সুখচর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৪১+৪; মূল্য ২·৫০।

উপনিষদ্ ব্রহ্মবিদ্যা। এই বিদ্যালাভে অবিদ্যা বিনষ্ট হয়। ভারতের অধ্যাত্ম-জ্ঞানের ভাণ্ডার উপনিষদ্গুলির মধ্যে ঈশোপনিষদের নাম সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হইয়া থাকে। আচার্যগণ তাঁহাদের মত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধ উপনিষদ্গুলির ভাষ্য রচনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে অদ্বৈতবাদী শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যের ভাষ্যই সর্বাধিক প্রচলিত।

'উপনিষৎপ্রদীপম্' গ্রন্থখানি ঈশোপনিষদের শ্রীশ্রীনিম্বার্কাচার্য-মতানুসারী ভাষ্য। শ্রীনিম্বার্কাচার্যের মতে স্বাভাবিক ভেদাভেদ বা স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈত স্বীকৃত হইয়াছে। এই মতবাদে বলা হয়—জীবজগৎ ব্রহ্মের অংশ এবং তাহাদের স্থিতি প্রবৃত্তি প্রভৃতি ব্রহ্মের অধীন। এই মতে জীবজগৎকে সত্য বলিয়া ধরা হয় এবং মুক্তিতেও জীবের অস্তিত্ব থাকে।

আলোচ্য গ্রন্থে ঈশোপনিষদের মূল মন্ত্রগুলি, তাহাদের শব্দার্থ সহিত অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ, সরল সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'উপনিষৎপ্রদীপম্'-ভাষ্য ও ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ এবং পাদটীকায় বিভিন্ন দার্শনিক পরিভাষার তাৎপর্য দেওয়া হইয়াছে। সুপণ্ডিত গ্রন্থকারের সংস্কৃতভাষ্য-রচনায় পাণ্ডিত্য ও পরমতখণ্ডনের যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থের নামকরণটিও তাৎপর্যপূর্ণ ও সার্থক। সুধীসমাজে পুস্তকখানির যোগ্য সমাদর হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

মেদিনীপুরে বন্যার্তসেবা: রামকৃষ্ণ মিশনের মেদিনীপুর ও কাঁথি আশ্রমের তত্ত্বাবধানে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৬টি প্রাথমিক এবং একটি উচ্চ বিদ্যালয় গৃহ জানুআরি মাসের মধ্যে মেরামত করা হইয়াছে। শিশুদের ২৮৩টি পোশাক এবং ২,৩৬০ খানি ধুতি ও শাড়ী বিতরণ করা হইয়াছে।

উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবা: গত ফেব্রুআরি, ১৯৬৯, রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বন্যার্তসেবাকার্যে বিতরিত দ্রব্যসমূহ:

গুঁড়া দুধ ১,৭৩৭ কেজি, বেবি-ফুড ৫৫ টিন, স্যুপ-মিক্সচার ৪৪ টিন, বাসনপত্র ২৭৭টি, কৃষি-সরঞ্জাম ৪১১টি, কম্বল ১১৮ খানি, ধুতি ও শাড়ী ৩৪ খানি, জামা ইত্যাদি ২৭৬টি, পুরাতন বস্ত্রাদি ৬৫০। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ১৩,২৩৪। ৩০০ জনের চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করা হয়।

১১টি স্কুলে এবং ২টি কলেজে 'বুক-ব্যাঙ্ক' খুলিবার জন্য যথাক্রমে ৪,৪৬১ খানি পাঠ্যপুস্তক এবং ৭২টি তথ্য-পুস্তক দেওয়া হইয়াছে।

দুঃস্থদের জন্য ৯০টি কুটির নির্মিত হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ—(পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া): এই কেন্দ্রের ১৯৬৬-৬৭ ও ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সারদাপীঠ এবং ইহার প্রথম ইউনিট বিদ্যামন্দিরের ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় প্রতিমায় শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। সারদাপীঠের বিভিন্ন শিক্ষায়তনগুলির ছাত্রগণ সম্মিলিতভাবে তত্ত্বমন্দিরে শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা করিয়াছিল।

১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে বন্যার্তসেবাকার্যে সারদাপীঠ অংশ গ্রহণ করে এবং সেবাকার্যের জন্য কয়েকজন ছাত্র প্রেরিত হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে এবার সারদাপীঠে প্রথম সমাবর্তন-সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সারদাপীঠের কৃতকার্য ছাত্রগণকে বি.এ, বি.এসসি, বি.টি ডিপ্লোমা দেওয়া হয়।

বিদ্যামন্দির: এই আবাসিক ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রী কলেজে আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩২১ ও ৩৬৫। ছাত্রগণের বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হইয়াছিল। ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যচর্চা এবং নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হয়।

শিক্ষণমন্দির: ইহা আবাসিক মহাবিদ্যালয়। এখানে বি.টি. পড়িবার ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ের ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ১২১ ও ১৩২। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে ১২১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১১৮ জন ডিগ্রী লাভ করেন, তন্মধ্যে ৫ জন ফার্স্ট ক্লাস পাইয়াছিলেন।

শিল্পমন্দির: সরকার অনুমোদিত এই পলিটেকনিকে সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ তিন বৎসরের ডিপ্লোমা-কোর্সে শিক্ষাদানকার্য পরিচালিত হয়। বিভিন্ন বিভাগে বর্ষদ্বয়ে ৬৩৮ ও ৫১৬ জন শিক্ষা লাভ করে। শিল্পমন্দির-ছাত্রাবাসে দুই বৎসরে ১২১ ও ৯০ জন ছাত্র ছিল। শিল্পমন্দিরের ডিপ্লোমা-পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক।

শিল্পায়তন: ১৪ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক

বালকদের জন্য জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে ৬৮ জন ছাত্র লইয়া ইহা খোলা হয়। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ের ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ১২৪ ও ১১৪। ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে ৪৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪১ জন প্রথম বিভাগে এবং একজন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়।

শিল্পবিদ্যালয়: এখানে বৈদ্যুতিক কাজ, টার্নিং, ফিটিং, কার্পেনট্রি, টেলারিং, তাঁতের কাজ প্রভৃতি শিখানো হয়। ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে ৮০ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করে। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে ফাইন্যাল পরীক্ষায় ৫৫ জনের মধ্যে ৫৩ জন উত্তীর্ণ হয়।

জনশিক্ষামন্দির: ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ইহার লক্ষ্য। ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে ৯টি নৈশ বিদ্যালয়ে ৩০ জনকে শিক্ষা দেওয়া হয়; ১০২টি শিক্ষা- ও সংস্কৃতিমূলক চলচ্চিত্র দেখানো হয়, মোট ৪৩,৩৭০ জন যোগদান করে। প্রধান গ্রন্থাগার, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ও অন্যান্য ইউনিটের মাধ্যমে ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে বিনা-চাঁদায় জনসাধারণকে ২৫,১৯৯ খানি বই পড়িতে দেওয়া হয়; ২০০ জন শিশুকে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা হইয়াছিল। জনশিক্ষা-মন্দিরের আরও অনেক কাজ আছে, তন্মধ্যে যুবকগণের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য।

তত্ত্বমন্দির: এখানে সাধুব্রহ্মচারীদের জন্য নিয়মিত শাস্ত্রক্লাস ও জনসাধারণের জন্য সাপ্তাহিক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসব ও অন্যান্য সংবাদ

রাঁচি: মোরাবাদী রাঁচি মিশন আশ্রমে গত ১৬ই মার্চ, ১৯৬৯, স্বামী আদিনাথানন্দজী সমাজসেবায় যুব-সম্প্রদায়কে শিক্ষিত করিবার জন্য পরিকল্পিত 'দিব্যায়ন' শিক্ষায়তনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

চণ্ডীগড়: গত ১লা মার্চ, ১৯৬৯ চণ্ডীগড় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবের উদ্বোধনী সভায় হরিয়ানার গভর্নর শ্রী বি. এন. চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করেন।

গত ২২শে মার্চ চেরাপুঞ্জী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের বার্ষিক উৎসবসভায় আসাম ও নাগাল্যাণ্ডের গভর্ণর শ্রী বি. কে. নেহরু পৌরোহিত্য করেন।

বেলঘরিয়া: গত ২৬শে মার্চ বেলঘরিয়াস্থিত কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেণ্টস্ হোমে প্রতিমায় শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা মহানন্দের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এইদিন আশ্রমে দেড় শতাধিক সাধুসমাগম হইয়াছিল। আড়াই হাজারেরও অধিক নরনারী বসিয়া অন্ন-প্রসাদ পাইয়াছেন। স্থানীয় দুঃস্থগণের মধ্যে ১০৮ খানি শাড়ী বিতরণ করা হইয়াছে।

জামসেদপুর: রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটিতে গত ৯ই হইতে ১২ই মার্চ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয়।

৯ই মার্চ ধর্মসভায় টাটা কারখানার জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রী পি. অনন্ত (সভাপতি) ইংরেজীতে, স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক ডঃ সত্যদেব ওঝা হিন্দীতে এবং স্বামী নিরাময়ানন্দ ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড: গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় বাংলায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। ১৩ই মার্চ সন্ধ্যায় 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ।

১০ই, ১১ই ও ১২ই মার্চ প্রত্যহ সকাল ৯টায় আশ্রম কর্তৃক পরিচালিত ১১টি (৫টি উচ্চ মাধ্যমিক, ৪টি মাধ্যমিক ও ২টি উচ্চ প্রাথমিক)

বিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়; প্রথম দিন ৩টির, দ্বিতীয় দিন ৪টির ও তৃতীয় দিন ৪টির। প্রতিদিনই বিদ্যালয়গুলির ব্যাণ্ডপার্টি সমাগতদের সংবর্ধিত করে। ১০ই মার্চ সভাপতিত্ব করেন টাটা কোম্পানীর ডাইরেক্টর শ্রী আর. এস. পাণ্ডে, পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী এস. এন. মাথুর। ১১ই মার্চ সভাপতিত্ব করেন ইণ্ডিয়ান টিউব কোম্পানীর ডাইরেক্টর ও জেনারেল ম্যানেজার শ্রী জে. জি. কেসোয়ানি, পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী সীতা কেসোয়ানি এবং ভাষণ দেন স্বামী নিরাময়ানন্দ। ১২ই মার্চ টাটা কোম্পানীর শিক্ষা-বিভাগের অধিকর্তা শ্রী বি. এন. সাক্সেনা সভাপতিত্ব করেন, সিংভূম জেলা বিদ্যালয়-নিরীক্ষিকা কুমারী ই. সিতমে পারিতোষিক বিতরণ করেন।

কামারপুকুর: রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়গুলিতে গত ২৮শে ফেব্রুআরি ও ১লা মার্চ দুইদিন শ্রীশ্রীস্বামীজীর স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী বীতশোকানন্দজী; এইদিন তিনি বিদ্যালয়ের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন। দ্বিতীয় দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী নিরাময়ানন্দজী। এই দিনের সভায় প্রধানশিক্ষক ব্রহ্মচারী অভয়চৈতন্য, বিদ্যালয়ের সম্পাদক স্বামী অদ্বয়ানন্দজী ও বিশিষ্ট অতিথিদ্বয় স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানশেষে রাত্রে ছাত্রবৃন্দের দ্বারা 'রাণাপ্রতাপ' অভিনীত হয়।

কাঁথি: শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৪তম জন্মোৎসব গত ১৮ই ফেব্রুআরি এবং ২৮শে ফেব্রুআরি হইতে ৪ঠা মার্চ পর্যন্ত পাঁচদিন পূজা-পাঠাদি, প্রসাদবিতরণ, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

২৮শে ফেব্রুআরি সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। অপরাহ্নে রুইপুর শ্রীগুরু আশ্রম কর্তৃক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি সঙ্গীতে পরিবেশিত হয়। পরে ধর্মসভায় শ্রীঅশোকমোহন রায় (সভাপতি), স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ ও স্বামী মুমুক্ষানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

১লা মার্চ সকালে রহড়া বালকাশ্রমের বিদ্যার্থিগণ রামনামকীর্তন করেন। এই সভায় অধ্যাপক বনবিহারী ভট্টাচার্য (সভাপতি), স্বামী মুমুক্ষানন্দ ও স্বামী বিশ্বদেবানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

২রা মার্চ দ্বিপ্রহরে প্রায় সাতহাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে শ্রীসরোজ চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি পরিবেশন করিবার পর আয়োজিত সভায় স্বামীজীর জীবনালোচনা করেন স্বামী বিশ্বদেবানন্দ, শ্রীবিমলচন্দ্র মৈত্র এবং স্বামী মুমুক্ষানন্দ। সভান্তে সভাপতি মহারাজ প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা প্রভৃতির পুরস্কার বিতরণ করেন।

আশ্রমের কর্মসচিব স্বামী আপ্তকামানন্দ প্রতিদিনই সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ২৮শে ফেব্রুআরি ও ১লা মার্চ আশ্রমের বিদ্যার্থিগণ কর্তৃক দুটি নাটক অভিনীত হয়। ২রা মার্চ সন্ধ্যায় 'স্বামীজী' সবাকচিত্রটি প্রদর্শিত হয়।

৩রা ও ৪ঠা মার্চ সন্ধ্যায় শ্রীবঙ্কিম দাস শ্রীচৈতন্যলীলাকীর্তন পরিবেশন করেন।

স্বামী যোগীন্দ্রানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ৪ঠা মার্চ, ১৯৬৯ বেলা সাড়ে বারোটার সময় করোনারী থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হইয়া স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (শিবতোষ মহারাজ) বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ৫৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি বোম্বাই ও সোনার গাঁ আশ্রমে, দেওঘর বিদ্যাপীঠে এবং বারাণসী সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ করিয়াছেন। তিনি কর্মঠ এবং আধ্যাত্মিক জীবনে অত্যন্ত নিষ্ঠাপরায়ণ ছিলেন। মধুর ও ত্যাগপূত স্বভাবের জন্য তিনি সর্বজনপ্রিয় ছিলেন।

তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তিপ্রতিষ্ঠা

কুচবিহার: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৭শে মার্চ বিপুল আনন্দোৎসবের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তিপ্রতিষ্ঠা এবং ২৭, ২৮ ও ২৯শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

মূর্তিপ্রতিষ্ঠা করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ; তিনি ২৫শে মার্চ আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কয়েক দিন আশ্রমে ছিলেন। ২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় শ্রীমূর্তির অধিবাস এবং পরদিন মূর্তিপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিশেষ পূজাদি করেন স্বামী শর্মানন্দ। ২৭শে সকালে হরিনাম-সঙ্কীর্তন সহ মন্দির-প্রদক্ষিণের পর মূর্তি-প্রতিষ্ঠা ও পূজাদি সুসম্পন্ন হয়। ২৭, ২৮ ও ২৯শে মার্চ সন্ধ্যায় আয়োজিত ধর্মসভায় যথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচিত হয়; তিনদিনই স্বামী সৌম্যানন্দ সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং স্বামী বীতশোকানন্দ ভাষণ দেন। ইঁহারা দুইজন ছাড়া ভাষণ দেন প্রথম দিন স্বামী ইজ্যানন্দ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন স্বামী প্রণবাত্মানন্দ।

আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্মসচিব ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনারায়ণ অসুস্থতা-নিবন্ধন কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে থাকায় উৎসবে অনুপস্থিত থাকিতে বাধ্য হন; সভার উদ্বোধনী ভাষণে আশ্রমের সভাপতি শ্রীঅংশুমান দাশগুপ্ত দুঃখের সহিত সেকথা জানান।

উৎসবের কয়দিন বহু সন্ন্যাসীর, বিশেষ করিয়া স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের উপস্থিতি আশ্রমকে আনন্দমুখরিত করিয়া রাখিয়াছিল।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে লালমণিরহাটে এই আশ্রমটির প্রথম পত্তন হয়। দেশ-বিভাগের পরে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে সেখান হইতে আশ্রমটিকে উঠাইয়া ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জন্মাষ্টমীর দিনে কুচবিহারে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রী-ঠাকুরের জন্মতিথিতে বর্তমান মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন এবং ঐ বৎসর শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজার দিনে

মন্দিরপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর পটে পূজিত হইয়া আসিতেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

নিম্নলিখিত আশ্রমগুলিতে পূজা, পাঠ, ভজন ও সভাদির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে:

ফুলেশ্বর: শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাতীর্থে গত ১৮ই ফেব্রুআরি পূজাদি ও দুই হাজার নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ২২ শে ফেব্রুআরি বিকালে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ (সভাপতি), মহকুমাশাসক শ্রীনিখিলরঞ্জন দাস (প্রধান অতিথ), অধ্যক্ষ শ্রীজয়ন্ত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীঅরুণ দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক শ্রীশ্যামল বিশ্বাস। সভার প্রারম্ভে সারদাতীর্থের কর্মসচিব আশ্রমের গত বৎসরের কার্যবিবরণী পাঠ করেন। সভান্তে প্রায় সাতহাজার শ্রোতার উপস্থিতিতে শিবপুর রামকৃষ্ণ-মন্দির কর্তৃক 'সাধক রামপ্রসাদ' যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

হুগলী: হুগলী জেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘে গত ১৮ হইতে ২৩শে ফেব্রুআরি পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

১৮ই তারিখ দুপুরে প্রসাদবিতরণ এবং সন্ধ্যায় রামায়ণ-গান ও শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাকথা পরিবেশিত হয়। ১৯, ২০, ও ২১শে তারিখ ভজন ও লীলাকীর্তন হয়। ২২শে ও ২৩শে সভা হইয়াছিল। ২২ তারিখ স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ, স্বামী ভাস্বরানন্দ এবং কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রী ডি, বসু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোচনা করেন। সন্ধ্যায় রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় ছায়াচিত্রে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন প্রদর্শিত হয়। ২৩শে তারিখ সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা-জজ শ্রীনির্মলচন্দ্র দত্ত এবং পারিতোষিক বিতরণ করেন ডক্টর বাসন্তী চৌধুরী। বিচিত্রানুষ্ঠান ও শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠান্তে উৎসব সমাপ্ত হয়।

নাটশাল: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৮শে ফেব্রুআরি হইতে ২রা মার্চ পর্যন্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রথম দিন পাঁচশতাধিক ও দ্বিতীয় দিন তেরো হাজার নরনারীকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় যাত্রাভিনয় হয়।

২রা মার্চ সন্ধ্যায় বিভিন্ন বক্তা শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজী সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। রাত্রে গেঁয়োখালি তরুণ সংঘ কর্তৃক 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' থিয়েটার অভিনীত হয়।

বেলাড়া: বেলাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২রা মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সকালে প্রভাতফেরী, এবং মধ্যাহ্নে প্রায় বারো হাজার নরনারীকে বসাইয়া খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে আয়োজিত সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্থানীয় মহকুমাশাসক শ্রীনিখিলরঞ্জন দাস (সভাপতি), স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও অধ্যাপক বিশ্বনাথ দাশঘোষ। সন্ধ্যার পর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জীবন ও 'ভক্তপ্রহ্লাদ' ছায়াচিত্রে প্রদর্শিত হয়।

দিল্লী: সরোজিনী নগর ও দক্ষিণ দিল্লীর সংলগ্ন অঞ্চলে ২৩শে ফেব্রুআরি ও ৮ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে ২৩শে ফেব্রুআরি রবিবার ইংরেজী, হিন্দী, সংস্কৃত, বাংলা ও তামিল ভাষায় আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা ও ইংরেজীতে রচনা-প্রতিযোগিতা

হয়। বিভিন্ন স্কুলের প্রায় ৪০০ ছাত্রছাত্রী যোগদান করেন, ৬৮ জনকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

৮ই মার্চ সন্ধ্যায় ভারত-সেবক সমাজপ্রাঙ্গণে স্বামী ব্যোমানন্দজীর সভাপতিত্বে এক সভা হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন। ভারত সরকারের সহকারী শিক্ষা উপদেষ্টা শ্রীসুধাংশুকুমার সাহা বাংলায় বলেন। সভাপতি মহারাজ ভাষণান্তে পুরস্কার বিতরণ করেন।

চাকদহ: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সংঘের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরে গত ১৫ই ও ১৬ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব চারিপ্রহর-ব্যাপী রামকৃষ্ণনামকীর্তন, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

১৫ই মার্চ বিকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী বীতশোকানন্দ (সভাপতি) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী বিষয়ে সারগর্ভ ভাষণ দেন।

১৬ই মার্চ দুপুরে চারি হাজারের বেশী ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যার পর স্থানীয় শ্রীগুরু সংঘ কর্তৃক 'নিমাইসন্ন্যাস' পালাকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

রূপনারায়ণপুর: শ্রীরামকৃষ্ণ সাংস্কৃতিক পরিষদের উদ্যোগে গত ১৬ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্বাহ্ণে পূজান্তে জাতিধর্মনির্বিশেষে তিন সহস্রাধিক ব্যক্তিকে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে পূজা করেন স্বামী নিষ্ঠানন্দ। জনসভায় বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। আলোচনা করেন হিন্দুস্থান কেবল্‌স্-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীআই. কে. গুপ্ত (সভাপতি), স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ (প্রধান অতিথি), কেবল্‌স্-এর ওয়ার্কস ম্যানেজার, পরিষদের সভাপতি শ্রীএস্. পি. ব্যানার্জি প্রভৃতি।

পাঁচগ্রাম (মুর্শিদাবাদ): শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে গত ২২, ২৩ ও ২৪শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২২ ও ২৩ তারিখ ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে শ্রী বি. আর. বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বামী সুখদানন্দ; বক্তৃতা করেন, সেখ আনেশ আলী, শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ২৪ তারিখ কীর্তন, নরনারায়ণ-সেবা ও 'হরিশ্চন্দ্র' যাত্রাভিনয় হয়।

চণ্ডীবালা সেনের পরলোকপ্রাপ্তি

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'-প্রণেতা, শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য ও গৃহী ভক্ত ৺অক্ষয়কুমার সেনের জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ চণ্ডীবালা সেন ছিলেন শ্রীশ্রীসারদামাতার মন্ত্র-শিষ্যা। ১৩ বৎসর বয়সে তিনি দীক্ষালাভ করেন। ৮১ বৎসর বয়সে তিনি নিজ শ্বশুরালয় ময়নাপুরে ১৩ই পৌষ রবিবার, ১৩৭৫ পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। প্রার্থনা করি শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার আত্মা শান্তি লাভ করুক।

ভ্রম-সংশোধন

উদ্বোধনের গত ফাল্গুন, ১৩৭৫ সংখ্যায় ৭৫ পৃষ্ঠা, ২য় কলমের ২২, ২৩, ২৪, ২৬ ও ৩০ লাইনে, এবং ৭৬ পৃষ্ঠা, ১ম কলমের ২ ও ১০ লাইনে 'দ্রৌপদী' স্থলে 'সুভদ্রা' পড়িবেন।



দিব্য বাণী

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩০
যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩১
অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩২

(সকামকর্মের পথে, প্রবৃত্তিমার্গেতে শুধু
ইহ-পর-লোকে হয় ভোগেরই উপায় ;
সে-পথ বন্ধন আনে জন্ম-মৃত্যু-আবর্তনে,
আকীর্ণ তা মরণের ভীতির ছায়ায়।
নিবৃত্তির পথে, ত্যাগ-পথে হয় মুক্তিলাভ,
অমৃত-আনন্দ-লাভ,—সে পথ অভয়।)
যে-বুদ্ধিতে স্পষ্ট হয় ত্যাগ ও ভোগের মর্ম,
কর্তব্য ও অকর্তব্যে থাকে না সংশয়,
বোঝা যায় কোন্ পথ ভয় ও বন্ধন আনে,
অভয় ও মুক্তি লাভ কোন্ পথে থাকি,—
(চলার পথের 'পরে বিমল আলোকবর্ষী
সুবিপুল প্রভাময়) সে বুদ্ধি 'সাত্ত্বিকী' ॥
যে-বুদ্ধিতে ধর্মাধর্ম, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মর্ম,
কর্তব্য ও অকর্তব্য সব পরিজ্ঞাত
অস্পষ্টভাবেতে হয়, যথাযথভাবে নয়,—
'রাজসী' বলিয়া, পার্থ, সেই বুদ্ধি খ্যাত ॥
তমসার আবরণে অনুজ্জ্বল যেই বুদ্ধি,
অধর্মেরে ধর্ম বলি' বোঝাতে যা চায়,—
'তামসী' তাহার নাম—সর্ববিষয়েই তাহা
সর্বদাই বিপরীত জ্ঞানে নিয়ে যায় ॥

যৎ তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥৩৭
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যৎ তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥৩৮
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্॥৩৯

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮শ অধ্যায়

(সংযম ও একাগ্রতা প্রথম সাধনকালে
মনে হয় যেন দুঃখদায়ী বিষসম !
সেই প্রচেষ্টারই ফলে পরিণামে আসে কিন্তু
উচ্চতর জীবনের সুখ অনুপম।
ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে অসংযত ভোগসুখ
প্রথমেতে অতিশয় প্রিয় বোধ হয়,
সে-ভোগের পরিণাম সর্বদাই হয় কিন্তু
দুর্বিষহ অশান্তি ও দুঃখের নিলয়।)
অগ্রে যাহা বিষবৎ, তবু পরিণাম যার
মধুবর্ষী, শান্তিময়, অমৃত-উপম,—
আপন স্বরূপবোধ-, সত্যজ্ঞান-সমুদ্ভূত
সে-সুখ 'সাত্ত্বিক' সুখ, সে-সুখই উত্তম॥
ইন্দ্রিয়ের সনে যুক্ত বিষয় সম্ভোগ কালে
যে সুখ-পরশ লাগে অমৃত-সরস,
যে-সুখের পরিণাম অসীম বেদনাময়,
হলাহল-দাহ সম,—সে সুখ 'রাজস'॥
নিদ্রায় আলস্যে আর প্রমাদেতে যেই সুখ,
সেই সুখ আগে পরে সকল সময়
মোহাচ্ছন্ন করে প্রাণে, বিপুল জড়তা আনে
দেহ-মনে,—'তামস' সে-সুখেরেই কয়॥

পরলোকে ডক্টর জাকির হোসেন

গভীর দুঃখের বিষয়, গত ৩রা মে, ১৯৬৯, বেলা ১১টা ২০ মিনিটের সময় ভারতের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া মরধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

জীবনাবসানের কয়েক মিনিট পূর্ব পর্যন্তও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন, যথানিয়মে কাজ করিতেছিলেন। নিয়মমাফিক তাঁহার স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য ১১টার পর ডাক্তারগণ আসেন। তাঁহাদের বসিতে বলিয়া ১১-১৫ মিনিটের সময় তিনি বাথরুমে যান; সেখানেই সহসা হৃদ্‌রোগের আক্রমণে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান এবং উহাতেই তাঁহার জীবনাবসান ঘটে। কুড়িমিনিট পরেও তিনি যখন বাথরুম হইতে বাহির হইলেন না, তখন ডাক্তারগণ উদ্বিগ্ন হইয়া সেখানে যাইয়া তাঁহাকে মৃত অবস্থায় শায়িত দেখিতে পান। তখনই বাহিরে আনিয়া কৃত্রিম উপায়ে তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রকে পুনরায় সচল করিবার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করেন। অন্যান্য ডাক্তারকেও খবর দিয়া আনা হয়। বহু চেষ্টাতেও কিন্তু কোন ফল পাওয়া গেল না। ১১-৫৫ মিনিটের সময় চিকিৎসকগণ তাঁহাকে মৃত বলিয়া বিবৃতি দেন।

গত ৫ই মে রাত্রি ৮-৪৫ মিনিটের সময় তাঁহার কর্মজীবনের প্রথম ক্ষেত্র, তাঁহার প্রিয় 'জামিয়া মিলিয়া'তে পরিপূর্ণ সামরিক মর্যাদায় তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হয়; 'জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া'-বিদ্যায়তন-সংলগ্ন চারি একর পরিমিত এই সমাধিস্থানটি চারিজন হিন্দু সানন্দে দান করিয়াছেন।

তাঁহার মৃত্যুতে জাতি একজন সুশিক্ষিত, সুসংস্কৃত, মানবতাবাদী, উদারহৃদয় দেশসেবককে হারাইল।

ডক্টর জাকির হোসেন প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে খুব বেশীদিন জড়িত ছিলেন না; তাঁহার কর্মজীবনের অধিকাংশই ব্যয়িত হইয়াছে শিক্ষাব্রতে।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুআরি হায়দ্রাবাদে এক মধ্যবিত্ত পাঠান পরিবারে জাকির হোসেন জন্মগ্রহণ করেন; এই পরিবারের পৈতৃক ভিটা উত্তর প্রদেশের ফরাক্কাবাদ জেলার কইমগঞ্জে। তাঁহার পিতা আইনজীবী ছিলেন। তাঁহার আট বৎসর বয়সের সময় পিতা সপরিবারে মধ্যপ্রদেশের এটোয়া শহরে চলিয়া আসেন। এখানে স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া জাকির হোসেন আলিগড়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। আদর্শচরিত্র ছাত্রহিসাবে এখানে অল্পদিনেই তিনি ছাত্রমহলে সুপরিচিত হন।

অর্থনীতিতে এম. এ. পাস করিবার পর আইন পড়িবার সময় গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়া তিনি কয়েকজন সহকর্মীর সহায়তায় সাধারণ শিক্ষার সহিত বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সমন্বিত করিয়া 'জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া' নামে একটি নূতন ধরনের বিদ্যায়তন স্থাপনে সহায়তা করেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে যাইয়া তিনি আবার পড়াশুনা শুরু করেন এবং চার বৎসর পরে অর্থনীতিতে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন।

বার্লিন হইতে ফিরিবার পর ১৯২৬ হইতে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি 'জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া'র উপাচার্য-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখানে ২২ বছরের সাধনায় তিনি একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ হইয়া উঠেন। ভারতের স্বাধীনতালাভের পর ১৯৪৮ হইতে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরূপে ইহার নবরূপায়ণ-কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫৬ হইতে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ইউনেসকো-র কার্যনির্বাহক বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন।

প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে তিনি প্রথম প্রবেশ করেন ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে; জহরলাল নেহেরু তাঁহাকে রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত করিয়া আনেন। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বিহারের রাজ্য-পালের এবং ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতির আসনে অধিষ্ঠিত হন। ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়া তিনি ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে এই আসন অলঙ্কৃত করেন। রাষ্ট্রপতিরূপে তাঁহার প্রথম বাণী, 'ভারতই আমার স্বদেশ। জনগণই আমার পরিবার।'

রাষ্ট্রপতিরূপে তিনি ১৯৬৭-র জুন মাসে কানাডা, ১৯৬৮-র জুনে হাঙ্গেরী ও যুগোস্লাভিয়া এবং ১৯৬৮-র জুলাই-এ সোভিয়েট রাশিয়া ও আফগানিস্তান সফর করিয়া আসিয়াছিলেন।

•

ডক্টর হোসেন ইংরেজী ছাড়াও জার্মান, পস্তু প্রভৃতি বিদেশী ভাষায় দক্ষ ছিলেন; জার্মান ভাষায় অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। ইংরেজী ও উর্দুতে অনেকগুলি পুস্তকও তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। বার্লিনে থাকাকালীন মহাত্মা গান্ধীর জীবনী এবং 'দেওয়ান-ই-গালিব' প্রকাশ করেন। প্লেটোর 'রিপাবলিক' প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত বিদেশী পুস্তকের উর্দু অনুবাদ তিনি করিয়াছেন; তাঁহার ইংরেজী রচনার অন্যতম 'ক্যাপিট্যালিজম্।'

অত্যন্ত রুচিশীল ছিলেন তিনি। তাঁহার অতি মার্জিত ব্যবহার সর্বজনবিদিত। গোলাপ বাগানের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। জীবাশ্ম-সংগ্রহেও তাঁহার আগ্রহ ছিল প্রচুর।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি বলিয়াছেন, 'যৌবনে স্বামীজীর লেখা পড়িয়াই তো আমি স্বদেশপ্রেমের মধ্যে নূতন আলোক পাইয়াছি। স্বামীজীর ভাবে যদি যুবকগণ অনুপ্রাণিত না হয়, তাহা খুবই দুঃখজনক হইবে।' পাটনায় রাজ্যপালরূপে থাকাকালীন ফ্রেমে বাঁধানো স্বামীজীর এই বাণীটি তাঁহার টেবিলের উপর থাকিত—"মানুষই ভগবানের শ্রেষ্ঠ মন্দির, তাই মানুষের সেবাই শ্রেষ্ঠ ভগবদারাধনা।"

উদারহৃদয় এই স্বদেশসেবীর অভাব আজ দেশবাসীর অন্তরে গভীরভাবে অনুভূত হইতেছে।

তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

কথাপ্রসঙ্গে

নীতির মূল্যায়ন ও উচ্ছৃঙ্খলতা

জাতীয় চিন্তা পরিবেশনের অভাব

প্রত্যেক মানুষই সমাজের অঙ্গ; ব্যক্তির চিন্তা ও মানসিক প্রবণতাই সমাজের মান নির্ণয় করে। ব্যক্তিজীবনের নিয়ন্ত্রণে বুদ্ধি অপেক্ষা মনের সবলতা বা ইচ্ছাশক্তির প্রভাব সমধিক প্রবল, একথা সত্য কিন্তু মনকে সবল হইবার পথ দেখাইবার কাজে বুদ্ধির অবদান অনস্বীকার্য। বুদ্ধি কেবল আলোকবর্ষণ করিয়া পথ দেখাইয়া দিলেও এবং জীবনকে কোন্ পথে টানিয়া লইয়া যাইবে তাহা মন স্থির করিলেও ভাল পথ যদি তাহাকে দেখানোই না হয়, সেপথে চলিবার প্রশ্ন স্বভাবতই আর উঠে না। বিশেষ করিয়া বুদ্ধিকে যদি আপাতমনোরম অথচ পরিণামে বিষময় পথকেই কল্যাণকর পথ বলিয়া শেখানো হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিরও সমর্থন পাইয়া সেই আপাতমনোরম পথেই যে মন নিঃসঙ্কোচে চলিবে, ইহাই তো স্বাভাবিক। ইহার বিষময় ফল যখন ফলিতে শুরু করে তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল বুঝিতে পারিলেও আর ফিরিবার উপায় থাকে না।

বর্তমানে আমাদের সমাজে তাহাই ঘটিতে শুরু করিয়াছে। যে সব নীতির অনুসরণ জীবনকে উন্নততর, সবলতর, অধিকতর স্বার্থ-হীন করিয়া তোলে—এক কথায় মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়—সে নীতিগুলিকে মূল্যহীন বলিয়া যুবকগণের বুদ্ধিতে অনুপ্রবিষ্ট করাইবার, দেহসীমিত মানুষই যে মানুষের একমাত্র অস্তিত্ব—এই ধারণার শিখাতেই যুববুদ্ধিকে প্রদীপ্ত করাইবার এবং তাহারই আলোক নীতি ও সমাজের উপর ফেলিয়া সেগুলিকে দেখিবার ও সেগুলির মূল্যায়ন করিবার আয়োজন আজ প্রচুর। সেই আলোকে উদ্ভাসিত একটিমাত্র জীবনপথই আজ যুবমনের সম্মুখে উদ্ভাসিত। বলা বাহুল্য এই আলোকে উদ্ভাসিত পথ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অনুগ এবং তজ্জন্য আপাতমনোরমও। এপথে জীবন-সংগ্রাম বলিতে দৈহিক প্রয়োজনমাত্র মিটাইবার সংগ্রামই বুঝায়। 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' বলিতে এখানে মনুষ্যেতর প্রাণীর পক্ষে যাহা প্রযোজ্য মূলতঃ তাহাই—যোগ্যতম বলিতে এখানে দৈহিক বলে যোগ্যতমকেই বুঝায়। এপথে সংযম, সত্য, এমনকি দয়া-স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধা প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল শুভবৃত্তিগুলিরও কোন স্থান নাই। এখানে মানুষকে, রাষ্ট্রকে, সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য একমাত্র তরবারির—দৈহিক বলের—প্রয়োগ ছাড়া অন্য কোন বলই পরিণামে কার্যকর হয় না।

জীবনের অন্যান্য যে-সব আদর্শ আছে, যুগ যুগ ধরিয়া খুঁজিয়া মানুষ অন্যান্য যে-সব পথ আবিষ্কার করিয়াছে, সে পথগুলিকে স্পষ্টভাবে দেখিবার সুযোগও আজকাল যুব-বুদ্ধিকে দিবার ব্যবস্থা নাই, সে পথে অন্ততঃ পরীক্ষামূলক ভাবে অল্প কিছুদূর যাইয়া যাচাইয়া লইবার ব্যবস্থা থাকা তো দূরের কথা।

ইহার ফল

ইহারই ফলে, ইহারই স্বাভাবিক পরিণতি-রূপে বহু তথাকথিত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নির্বিশেষে আজ আমাদের মধ্যে জীবনবোধ সম্বন্ধে নিম্নদৃষ্টি, সঙ্কীর্ণদৃষ্টি ও বিকৃতদৃষ্টি ব্যক্তির সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। শিক্ষকদের অবমাননা বা তাঁহাদের সহিত অশালীন আচরণে বিদ্যায়তনের পবিত্রতা নষ্ট হয় বলিয়া

আজ আমরা মনে করি না; বরং মনে করি উহার প্রতিকারের প্রচেষ্টাই হয়তো বিদ্যায়তনকে অপবিত্র করিবে। বিদ্বান, হৃদয়বান, চরিত্রবান মানুষকে সব সময় আমরা পূজা পাইবার যোগ্য বলিয়া মনে করি না, আজ সে-পূজার আসনে বসাইয়াছি চিত্র-তারকাদের; ধর্ম-বা দর্শন-বিষয়ক আলোচনাসভা তো দূরের কথা, কোন প্রখ্যাত বিদ্বান ব্যক্তির বৌদ্ধিক আলোচনা-সভাতেও যুবসমাগম হয় নগণ্য; কিন্তু কোন সভায় যদি কোন চিত্র-তারকার আবির্ভাব ঘটে, তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার কথা শ্রবণ করিবার জন্য সর্বশ্রেণীর মানুষের কী বিপুল সমাগম! যে পুস্তক যত বেশী নীতিহীনতার ও নিম্নদৃষ্টির কল্পিত বর্ণনায় পূর্ণ, নীতির তথাকথিত নবমূল্যায়নে তৎপর, বাজারে তাহারই চাহিদা তত বেশী। সর্বোপরি একদল লোকের সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ সমাজ-হিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কোন কোন ক্ষেত্রে আজ শুধু স্তম্ভিতই নয়, আতঙ্কিতও করিয়া তুলিতেছে, নিরাপত্তাবোধকে শিথিল করিতেছে। চারিদিকে আজ যাহা ঘটিতেছে, বিশেষ করিয়া ৬ই এপ্রিল তারিখের রবীন্দ্র ষ্টেডিয়ামের ঘটনা এরূপ ধারণাই মনে আনিয়া দেয়। দেশবাসীকে অধিকতর চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল— যাঁহাদের উপর এইজাতীয় ঘটনার প্রতিবাদের ও প্রতিকারের দায়িত্ব ন্যস্ত, প্রথম-দিকে তাঁহাদের শ্লথ-গামিত্ব। আশ্বাসের কথা, আজ আমরা সকলেই ইহার কারণানুসন্ধানে ও এই-জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তিরোধে বদ্ধপরিকর।

স্থায়ী প্রতিকারের জন্য মূলে, শিক্ষায় সংস্কারের প্রয়োজন

এইসব উচ্ছৃঙ্খলতার পুনরাবৃত্তি রোধ করিতে হইলে কেবল সাময়িকভাবে অন্যায়-কারীদের নিরস্ত করিতে পারিলেই হইবে বলিয়া মনে হয় না। উহা তো করিতেই হইবে, কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া উহার মূলোৎপাটনও প্রয়োজন। মূল অনেক গভীরে এবং ইতোমধ্যেই বহুদূর বিস্তৃত। বিদ্যায়তনে এবং গণশিক্ষার সাধারণ ক্ষেত্রেই ইহার মূল নিহিত। শিক্ষিত মানুষের চিন্তাধারাই সাধারণ মানুষের চিন্তাকে, গণশিক্ষাকে প্রভাবিত করে। শিক্ষার্থীদের নিকট আমাদের জাতীয় উচ্চ-চিন্তার, উচ্চাদর্শের সুষ্ঠু পরিবেশনের ব্যবস্থার একান্ত অভাব। এদিকে নানাভাবে সেখানে জড়বাদী চিন্তা আসিয়া শিক্ষার্থীদের চিন্তারাজ্যে ধীরে ধীরে একটি প্রাচীর গড়িয়া তুলিতেছে, যাহা ভারতীয় চিন্তার দিকে তাহাদের দৃষ্টিপথ ক্রমশঃ রুদ্ধ করিতেছে। গণশিক্ষার ক্ষেত্রে রামায়ণ-মহাভারত-পাঠ, কথকতা, যাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে অবসরবিনোদনের সঙ্গেই পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে সরল সাবলীল-ভাবে সর্বজনের নিকট উচ্চভাব প্রচারের যে ব্যবস্থা পূর্বে ছিল, তাহাও আজ নাই। এখন তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে সিনেমা ও গল্প-সাহিত্য। কিন্তু সেগুলির মধ্য দিয়া কী ভাব প্রচারিত হয় তাহা আমরা সকলেই জানি; আর এই চিন্তারাশি এভাবে পরিবেশিত হইতেছে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই কাছে। কাজেই জীবনাদর্শ ও নীতির মূল্যায়ন যে পাল্টাইবে, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ বাড়িয়া যাইবে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। ইহার আরো বহু কারণ অবশ্যই আছে; কিন্তু মনে হয় মূল কারণ এখানেই। যে বুদ্ধি আলো দেখায়, যে মন আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাহাই সব কিছুর মূলে। বুদ্ধির নিকট সর্ববিধ আদর্শকে যাচাইয়া লইবার পথ যদি সমভাবে উন্মুক্ত রাখা না হয়, মন উচ্চতর জীবনানুভূতির

আস্বাদ হইতে যদি বঞ্চিত থাকে, তাহার পরিণাম উচ্ছৃঙ্খল হইবেই।

মানুষ দুর্বল মুহূর্তে অন্যায় কাজ করিতে পারে; সেখানে বিবেক উহাকে সীমিত রাখে, প্রত্যাবর্তনের প্রেরণা দেয়। কিন্তু বুদ্ধি যদি 'সব কিছুর অর্থকে বিপরীত করিয়া দেখিতে' শেখে, অন্যায়কেই যদি ন্যায় ভাবিতে শুরু করে, তখন অন্যায় আচরণের মূর্তি হয় অন্যরূপ। তখন উহা না করিতে পারাকেই অনেক ক্ষেত্রে মনের দুর্বলতা ও বুদ্ধির দৈন্য বলিয়াই ধরা হয়, যে উহা করিতে পারে না তাহাকে মাদকতাচ্ছন্ন, কুসংস্কারগ্রস্ত বলিয়াই মনে করা হয়। ইহা ভয়াবহ; জীবনবোধকে উন্নত না করিতে পারিলে অন্য কোনও উপায়ে ইহার প্রতিকার করা যায় বলিয়া মনে হয় না।

আর তাহা করার প্রকৃষ্ট মাধ্যম শিক্ষা। ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় চিন্তার একটা বিশেষ স্থান থাকিবে না কেন? সর্বসাধারণকে সেই চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করিবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হইবে না কেন? ইহার অর্থ এই নয় যে, আধুনিক যুগের অন্য দেশের চিন্তাগুলিকে দূরে সরাইয়া রাখিতে হইবে। তাহাও দূষণীয় এবং উন্নতির পরিপন্থী। জ্ঞানের সব দুয়ারই খোলা থাকিবে। কিন্তু আধুনিক জগতের বহুবিধ জীবন-চিন্তার অরণ্যের মধ্যে যাহা জীবনের যথার্থ কল্যাণময় পথকে চিনিয়া লইতে সহায়তা করে, যাহা আধুনিককালের সর্ববিধ বিপরীত চিন্তারই সম্মুখীন হইয়া তাহার শুভ ও অশুভ উভয়বিধ দিককেই যথাযথভাবে চিনিয়া লইতে সক্ষম, যাহা যুগ-যুগান্তর ধরিয়া জীবনের কষ্টিপাথরে সুপরীক্ষিত, যাহা আজিও মানবজাতির সর্বোচ্চ চিন্তা—ভারতের সেই সুপ্রাচীন চিন্তাকে আধুনিক মননের পাত্রে ধরিয়া সর্বাগ্রে শিক্ষার সর্বস্তরেই পরিবেশন করা হইবে না কেন? আধুনিককালের বহির্বিশ্বের চিন্তার সহিত সংযোগ না রাখিয়া কেবল আমাদের জাতীয় চিন্তায় বুদ্ধিকে আবদ্ধ রাখা যতখানি দূষণীয়, জাতীয় চিন্তাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া কেবল বহির্বিশ্বের চিন্তাকে প্রাধান্য দেওয়া তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক দূষণীয়।

অথচ তাহাই আমরা এখনো, স্বাধীনতা-লাভের পর শিক্ষাকে নিজেদের মতো করিয়া পুনর্বিন্যস্ত করিবার পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করিবার সুদীর্ঘকাল পর পর্যন্তও করিয়া চলিয়াছি। এভাবে গণশিক্ষারও কোন ব্যবস্থা করি নাই। আজ যুবমন যদি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকে, বিদ্রোহী হইয়া থাকে, আজ সমাজে সমাজবিরোধী লোকের সংখ্যা যদি অত্যধিক সংখ্যায় বাড়িয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে দোষ কাহাকে দিব? বুদ্ধিকে উজ্জ্বলতরভাবে প্রদীপ্ত করিয়া আজিকার অসংখ্য যুক্তি ও যুক্ত্যাভাসের মধ্য হইতে সত্যকে চিনিয়া লইবার মতো যথেষ্ট পরিমাণে ভাস্বর করিতে, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি তাহাকে সর্ববিধ বিপরীত অবস্থায় আঁকড়াইয়া থাকিবার মতো প্রসন্ন সবলতা মনকে দিতে যাহা প্রয়োজন, তাহার পরিবেশনের কী ব্যবস্থা আমরা করিয়াছি? মনে হয় যেন তাহাদের কল্যাণপথের সন্ধান দিবার বা সে-পথে চালিত করার মতো কেহই নাই।

শুধু ভারতে নয়, সারা জগতেই আজ মানুষ জাগিয়া উঠিয়াছে। সর্বত্র তামসিকতা ও ভয় কাটিয়া গিয়া রাজসিকতা ও আত্মবিশ্বাসের বিপুল মহান জাগরণ ঘটিতেছে; কিন্তু এই সদ্যোমুক্ত শক্তি সর্বক্ষেত্রে সর্বমানবের যথার্থ কল্যাণের পথে পরিচালিত না হইয়া এলোমেলো ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া অপচিত হইতেছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাহা সমাজের প্রভূত ক্ষতিও

করিতেছে। বর্তমান জগতে শুধু যুবমনে নয়, সর্বত্রই শক্তি ও আত্মবিশ্বাসের এই জাগরণ একটি মহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই ; কিন্তু এই ইচ্ছা ও শক্তির প্রয়োগের দিঙ্‌নির্ণয় যথাযথ ভাবে না হইলে ইহা অশুভকারী অসুরের জাগরণে পর্যবসিত হইবে। সেজন্য জাগরণও যেমন প্রয়োজন, ততোধিক প্রয়োজন মন ও বুদ্ধির শুভভাবপ্রবাহে অবগাহন।

শক্তির, আত্মবিশ্বাসের, মানুষের মতো বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছার জাগরণ যদি না চাওয়া হয় বা উহার প্রকাশের পথরোধ করিতে চাওয়া হয়, তবে তাহা মনুষ্যত্বহীনতার লক্ষণ। কোন 'মানুষই' ইহা চাহিতে পারে না, বরং ইহাতে সহায়তা করাই সর্বজনকাম্য। কাম্য নয় শুধু প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই শক্তির, এই বিশ্বাসের, এই ইচ্ছার দিগ্‌ভ্রান্তি বা বিপরীতগামিত্ব যাহা ব্যক্তিকে, সমাজকে, জাতিকে উন্নত না করিয়া অবনতই করিবে, পরিণামে সুসভ্য মানবসমাজকে পাশববলপ্রধান বুদ্ধিমান-শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যভূমিতুল্য করিয়া তুলিবে—যেখানে মানবতা হইবে নিত্যকার বলি।

বুদ্ধিকে সত্যের, উচ্চতর বাস্তবতার সন্ধান দেওয়া এবং মনকে উহার অমৃতময় আস্বাদে ও উহাতে স্থিত থাকিবার মতো শক্তিধারায় সিক্তিত করিবার ব্যবস্থা, এককথায় জীবনকে আপাত-মনোরমতায় নয়, সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রচেষ্টা করাই একমাত্র পন্থা। স্বামী বিবেকানন্দ একবার সমাজের অকল্যাণ নিবারণের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, কয়েক সহস্র যুবক যদি আদর্শ জীবন যাপন করে, তাহা হইলে তাহারই প্রভাবে আপনা-আপনি সব বিদূরিত হইবে—কাহাকেও কোন কথা বলিবারও প্রয়োজন হইবে না ; আর জীবন যদি না থাকে, কেবল বক্তৃতায় কোনদিন কোন ফলই ফলিবে না।

'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' বলিতে মনুষ্যেতর প্রাণিজগতে যেমন দেহের যোগ্যতাকেই বোঝায়, মানুষের বেলা তাহা কেবল বহিঃ-প্রকৃতির সহিত সংগ্রামের জন্য দৈহিক যোগ্যতাকেই বোঝায় না ; ক্রমবিবর্তনের পথে বহু-উন্নত মানুষের ক্ষেত্রে উহা অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করার যোগ্যতাকেও, মানসিক ও আধ্যাত্মিক যোগ্যতাকেও বোঝায়—ইহা ধারণা করা সহজ হইবে এই জীবনসাধনা দ্বারা ; উচ্ছৃঙ্খলতা যে জীবনকে অন্তঃসারশূন্য করে, সংযম যে জীবনকে শক্তি, সত্যালোক ও আনন্দে পূর্ণ করে, তাহা প্রত্যক্ষ করাইবে এই জীবনসাধনা ; ধর্মের মূল কথাগুলি যে সমকালীন মানুষের বৌদ্ধিক উৎকর্ষ- ও আবিষ্কার-ভিত্তিক অনুমান মাত্র নহে, সেগুলি সর্বকালীন সত্য, এবং যুগপ্রয়োজনে যুগে যুগে যাহা পরিবর্তিত হয় তাহা তৎকালীন পরিবেশে সে-সত্যের প্রয়োগ মাত্র—তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিবার মতো বিপুল ভাস্বরতা বুদ্ধিকে দিবে এই জীবনসাধনা।

তাই মনে হয়, বুদ্ধি ও মনকে জাতীয় সুপ্রাচীন চিরন্তন ভাবধারার সংস্পর্শে আনার ব্যবস্থা আর বিলম্ব না করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে করা একান্ত প্রয়োজন ; বিদেশী সর্ববিধ ভাবধারার সহিত পরিচয় তো সেখানে থাকিবেই।

ভারতের নিজস্ব ভাবের ভিত্তির উপর বহিরাগত ভাবের সমন্বয় এবং নীতির যথার্থ মূল্যায়ন তখনই হইবে (এখন নিজস্ব ভাব ত্যাগ করিয়া অপরের ভাবগ্রহণই হইতেছে, সমন্বয় নহে)। আর তখনই সকল শিক্ষিত দেশবাসিগণ এবং তাঁহাদের দ্বারা স্বতঃপ্রভাবিত সর্বসাধারণও আধুনিকতাকে সমাজ রাজনীতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই কল্যাণমূর্তিতে বরণ করিয়া লইতে পারিবে—যাহা সমাজে আনন্দোজ্জ্বল কল্যাণ আনিবে, আতঙ্ক নহে।

রাহুল-মাতা

শ্রীঅনিলকুমার সমাজদ্বার

কপিলবাস্তর শাক্যনায়ক শুদ্ধোদনের পত্নী মায়াদেবী পিত্রালয় দেবদহে যাবার পথে লুম্বিনী উদ্যানে অশোকতরু বা শালতরুর শাখা ধরে দাঁড়ালেন প্রসব-বেদনায় কাতর হয়ে। ক্ষণকাল পরে তিনি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। সদ্যোজাতককে পরমাদরে প্রাসাদে আনা হল। সেই পুণ্যতিথিতে আরও সাতজন পুণ্যাত্মার আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে একজন নারী। তিনিই রাহুল-মাতা।

বুদ্ধচরিতে রাহুল-মাতার নাম যশোধরা। কার তনয়া সে বিষয়ে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। 'ললিতবিস্তর'-এর মতে তিনি দণ্ডপাণি শাক্যের কন্যা; নাম গোপা। দুলব্ (তিব্বতীয় বিনয়-পিটক)-এর মতেও দণ্ডপাণি শাক্যের কন্যার নাম যশোধরা। পালি সাহিত্যের সাক্ষ্যানুসারে রাহুল-মাতা দণ্ডপাণির ভ্রাতা সুপ্পবুদ্ধের (সুপ্রবুদ্ধ) ভার্যা অমিতার (অমৃতা) তনয়া। সুপ্পবুদ্ধও শাক্যবংশীয় নেতা ছিলেন। তিনি মায়াদেবীর সহোদর ভ্রাতা হতেন আর গৌতম বুদ্ধের মামা। অনেকের মতে অমৃতা—গৌতমের পিসী ছিলেন

যাই হোক রাহুল-মাতার ইতিহাসসম্মত নাম কোন্‌টি, বলা কঠিন। পালি ত্রিপিটকের মধ্যে শুধু রাহুল-মাতা বলেই উল্লেখ আছে। সঙ্ঘের প্রাচীনগণ যে তাঁর নাম জানতেন না তাও নয়—অথচ জেনেও নামোল্লেখের কোন প্রয়োজন কেন যে উপলব্ধি করেননি, তা বোঝা যায় না। পরবর্তী বৌদ্ধ সাহিত্যেই তাঁর কত নাম পাওয়া যায়। গোপা, যশোধরা, সুভদ্দকা [সুভদ্রকা], ভদ্দকচ্চা, ভদ্দকচ্চানা [ভদ্রকাঞ্চনা], বিম্বা সুন্দরী, বিম্বা প্রভৃতি। এর মধ্যে কোন্‌টি যে তাঁর আসল নাম নির্ণয় করা কঠিন।

কাহিনীগুলিরও রচনা কোন দেশ-বিশেষের বৌদ্ধগণের নয়, একরকমও নয়। ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায়িকায় স্থানবিশেষে অদ্ভুত রূপকথার রূপান্তরও দেখা যায়। স্থবিরগণের দ্বারা পালিভাষায় লিখিত কাহিনীর সঙ্গে সংস্কৃতে রচিত কাহিনীর সঙ্গতি নেই। তাছাড়া উত্তরভারতীয় কাহিনীর সাথে দক্ষিণভারতীয় কাহিনীর সাদৃশ্যের একান্ত অভাব।

পঞ্চবিংশতি বুদ্ধের শেষ বুদ্ধকে প্রসবের সাতদিন পরে জননী মায়াদেবী ইহলোক ত্যাগ করেন। মায়াদেবীর ভগ্নী এবং সপত্নী মাতৃহারা শিশুকে মায়ের মতই যত্নে আদরে লালন-পালন করেন। শিশুর নাম হল গৌতম।

গৌতমের ষোল বছর বয়সের সময় নানা-স্থানে ঘটক গেল একটি পরমা সুন্দরী কন্যাকে মনোনীত করে আনতে। জাতি হিসেবে শাক্যেরা অহংকারী। শাক্যেরা গৌতমকে কন্যাদান করতে অস্বীকার করল। শুদ্ধোদনের ছেলে গৌতমের বিদ্যা আছে, রূপ আছে ঠিকই। কিন্তু অস্ত্রবিদ্যা? ধনুর্বিদ্যা কেন, কোন পুরুষোচিত ক্রীড়ায়ও কোন নৈপুণ্য তার নেই। ক্ষত্রিয়ের ছেলে বিবাহ করে স্ত্রীকে রক্ষা করবে কি করে? এরূপ ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া চলতেই পারে না। সমস্ত শাক্য-নায়কেরা অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন

গৌতমও শুনলেন একথা। ধনুর্বিদ্যা কি তিনি জানেন না?

রাজোদ্যানের এক প্রশস্ত স্থানে নিমন্ত্রিত শাক্যকুলের সম্মুখে কুমার নানা শস্ত্রবিদ্যার বিচিত্র এবং নবতম কৌশল প্রদর্শন করলেন।

শাক্যগণ দেখে অবাক, বিস্ময়হতবাক! স্তম্ভিত সমস্ত দর্শক! প্রত্যেক শাক্যনেতা আপন আপন তনয়া পাঠিয়ে দিলেন কপিলবাস্তুতে। তাঁদের ভেতর গৌতম পছন্দ করলেন যশোধরাকে। যশোধরার সঙ্গেই তাঁর বিবাহ হল। তেরো বৎসর যশোধরা বা গোপা স্বামীর ঘর করলেন।

আটজন ব্রাহ্মণের ভবিষ্যৎ বাণী শুনে বরাবর শঙ্কিত ছিলেন শুদ্ধোদন—কখন তাঁর নয়নপুত্তলি গৃহত্যাগী হয়! সব রকমের সাবধানতার বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন তিনি।

চিত্তে বৈরাগ্য যাতে না আসে, তার জন্য তিনি পুত্রের বাসের জন্য সুরম্য সৌধ নির্মাণ করিয়েছিলেন। সে সৌধ লোভনীয় দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ, সতর্ক প্রহরী দ্বারা বেষ্টিত, কোনই আগন্তুক সহসা যেন তথায় প্রবেশ না করতে পারে।

পিতার স্নেহবন্ধন সতর্কতা সবই নিয়তির বিধানে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। একদিন রাজপথে ভ্রমণকালে একজন করে রোগী, বৃদ্ধ, ও মৃত ব্যক্তিকে দেখার পর মানুষের দুঃখের চিরতরে মূলোচ্ছেদ করার চিন্তায় আকুল হলেন কুমার। দেখলেন একজন শান্ত যতিকেও। সন্ধান পেলেন পথের।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা। রাজ-উদ্যানের বাপীতীরে বসে বসে গৌতম অনেকক্ষণ ধরে ভাবছেন। কোনদিকে খেয়াল নেই। এমন সময় দূতীমুখে সংবাদ পেলেন তাঁর পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। প্রাসাদাভ্যন্তরে চিন্তিত কুমার প্রবেশ করলেন অতি সন্তর্পণে। বীণার ঝংকারে, নূপুরের নিক্বণে আর গানের মূর্ছনায় সমগ্র প্রাসাদ মুখরিত। মুহুর্মুহুঃ মঙ্গল শঙ্খধ্বনি।

আমোদ-প্রমোদ তিক্ততায় পর্যবসিত হল কুমারের অন্তরে। মন হল চিন্তায় ভারাক্রান্ত। এ কী আবার নতুন বাঁধন! আর না, এবার বেরুতেই হবে প্রকৃত আনন্দের সন্ধানে। ছিন্ন করতে হবে বন্ধনডোর। সমস্ত বিশ্ব তখন ঘুমে অচেতন।

বাইরে রথ প্রস্তুত ছিল, পূর্বাদেশ অনুযায়ী। গৌতম সূতিকাগারে গেলেন। দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে মাতৃত্বের অপূর্ব ছবিও অবলোকন করলেন—শয্যায় শুয়ে যশোধরা বাহুলতায় পুত্রের মস্তক ন্যস্ত করে পরম তৃপ্তিতে নিদ্রামগ্ন।

দু'পা এগুলেন ঘরের দিকে। আবার কি ভেবে থামলেন। কি জানি, যদি জেগে ওঠে! কিছুক্ষণ কি ভেবে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন সেখান থেকে।

রাজগৃহের (রাজগীরের) বেণুবন থেকে ধর্মচক্রপ্রবর্তনের পরে বুদ্ধ বহু শিষ্যসহ প্রথমবার এলেন কপিলবাস্তুতে, পিতার বিশেষ আমন্ত্রণে। নগরীর প্রান্তদেশে ন্যগ্রোধারামে রইলেন তিনি। পরের দিন ভিক্ষার জন্য বের হলেন। কথাটা চতুর্দিকে বিদ্যুতের মতন ছড়িয়ে পড়লো। আবালবৃদ্ধবনিতা বিস্মিত যশোধরাও শুনলেন।

আনন্দে পুলকে কম্পিতদেহে উন্মাদিনীর মতন দাঁড়ালেন প্রাসাদের গবাক্ষে। একটি বারের জন্যও যদি দেখতে পান তাঁর প্রাণের আরাধ্য দেবকে। আবার ভাবেন, যদি এ পথে না যান তিনি! না, ওই তো দেখা যায়,

ঐ তো সেই মানুষ। সেই অঙ্গকান্তি, সেই চলনভঙ্গিমা, দেহকান্তি পূর্বাপেক্ষা সুন্দর। পিছনে লোকে লোকারণ্য। দেবতা আজ শুধু তাঁর একলার নন, বিশ্বজনের আরাধ্য-দেবতা! অশ্রুভারাক্রান্ত যশোধরা গবাক্ষ হতে নিঃশব্দে সরে এলেন। তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হল, দেহ শীতল পাষাণের ওপর পতিত হল। দাসীরা ক্রমে তাঁকে তুলে পালঙ্কে স্থাপিত করে সেবাশুশ্রূষা করতে লাগল। অনেক পরে যশোধরা চোখ খুললেন। উন্মাদিনীর মতন চারদিকে কাকে যেন খুঁজলেন।

পিতৃভবনে গৌতম এলেন রাজা শুদ্ধোদনের নিমন্ত্রণে অনেক শিষ্য সঙ্গে নিয়ে। আহারান্তে পুররমণীগণ এলেন প্রত্যেকেই তাঁকে দর্শন করতে। এলেন না রাহুল-জননী। অভিমানিনী ভাবলেন—কেন যাবো আমি দেখা করতে? তিনি নিজে কেন দেখা করবেন না? রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত যিনি আসতে পারলেন, তিনি এখানে এসে যশোধরার সঙ্গে দেখা করতে পারেন না? তেরো বছর যাঁর সাথে আনন্দে চব্বিশ ঘণ্টা অতিবাহিত করেছেন, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেই কি তাঁকে একেবারে ভুলতে পারেন? তিনি যদি না আসেন, যশোধরাই বা উপযাচিকা হয়ে দেখা করতে যাবেন কেন? সেই মহানিশা থেকে প্রাসাদে বাস করেও এত দিন তিনি একান্ত চিত্তে তপস্বিনীর জীবনই তো যাপন করে এসেছেন!

অকস্মাৎ গৌতমের আগমনবার্তা ঘোষিত হল। তাঁর আগমনে যশোধরা বিভ্রান্ত হলেন, হলেন দিশেহারা। কি করে প্রাণদেবতাকে অভ্যর্থনা করবেন ভেবে আকুল! তাড়াতাড়ি ক্ষমাসুন্দরের জন্য বসবার আসনসজ্জা করলেন ক্ষিপ্রহস্তে।

দুজন অগ্রশাবক (ভিক্ষু) সঙ্গে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দ্বারপথে তথাগত। বিমর্ষ শুদ্ধোদন সঙ্গে আছেন। যশোধরা স্থাণুর মত দণ্ডায়মান, কিংকর্তব্যবিমূঢ়! পাষাণ-প্রতিমার দেহে যেন প্রাণ পর্যন্ত নেই!

'তোমার যেমন ইচ্ছা, তেমনি করেই তুমি আমায় অভ্যর্থনা করতে পারো, যশোধরা,' বললেন প্রেমময় মূর্তি ভগবান তথাগত স্মিত অধরে।

দিশেহারা যশোধরা স্বামীর পাদমূলে আছাড় খেয়ে পড়লেন, তাঁর পাদপঙ্কজদ্বয় নিজ শিরোপরি স্থাপন করলেন।

'ভদন্ত! আমার স্নেহশীলা পুত্রবধূ যখন শুনলেন যে তুমি কাষায়বসন ধারণ করেছো, ইনিও বহুমূল্য সাজসজ্জা ত্যাগ করে কাষায়বস্ত্র ধারণ করে—সমস্ত বিলাসসামগ্রী পরিত্যাগ করে—সন্ন্যাসিনীর মতন দিন যাপন করতে লাগলেন। ভূমিশয্যায় শয়ন, দিনান্তে ভোজন করে পরম নিষ্ঠায় রইলেন। ইনি তোমার প্রতি এমনই নিবদ্ধচিত্তা'—গুরুগম্ভীর স্বরে পুত্রকে বললেন পিতা শুদ্ধোদন।

মধুর হাসি হেসে ভগবান মধুর স্বরে বললেন—'তা আমি জ্ঞাত আছি, পিতঃ। আমার এই শেষ জন্মেই নয়—ইতঃপূর্বে চতুর্বিংশতি জন্মেও আমার প্রতি ইনি এরূপই নিবদ্ধচিত্তা ছিলেন।' তারপর তিনি পূর্বজন্মকাহিনী শুদ্ধোদনকে শোনাতে লাগলেন।

ক্রমে পাঁচদিন কেটে গেলো। যশোধরা পুত্রকে বললেন—'রাহুল! উনিই তোমার পিতা।'

রাহুল বিস্মিত! 'ইনিই আমার পিতা?'

'হ্যাঁ পুত্র, তোমার ইহকাল পরকাল, তোমার স্বর্গ, তোমার ধর্ম, তোমার পরম আরাধ্যের উনি। তুমি ওঁর কাছে গেলে না!'

সাত বৎসরের কুমারের বক্ষে যে কি যাতনা,

মা জানতেন সবই। বললেন—'যা বাবা, ওঁর কাছে যা। গিয়ে বল যে, আমার দায়জ্জ (উত্তরাধিকার) দিন।'

পুত্র গেল। ভোজনান্তে তথাগত পিতৃভবন ত্যাগ করে চলেছেন, পুত্র চাইল উত্তরাধিকার। বুদ্ধ সারিপুত্রকে আদেশ করলেন--'রাহুলকে দীক্ষা দাও'।

স্বামী গেছে, পুত্রও চিরদিনের মতন পর হল। পিতার পশ্চাদনুসরণ করল রাহুল। নারীর স্বামী পুত্র ছাড়া সংসার আর কিসের?

নারীজাতির প্রব্রজ্যাগ্রহণের অনুমতি হল। মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভিক্ষুসঙ্ঘের নেত্রী হয়েছেন। যশোধরা আরও শুনলেন যে, ভগবান তথাগত শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছেন—নয়নপুত্তলি রাহুলও শ্রমণ-বেশে সেখানে। কপিলবাস্তুর কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে শ্রাবস্তীতে চলে গেলেন যশোধরা। ভিক্ষুণীদের এক উপাশ্রমে যশোধরা আশ্রয় গ্রহণ করে তৃপ্ত হলেন।

মাঝে মাঝে রাহুল মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে। ভিক্ষুণীসঙ্ঘের অভ্যন্তরে যাওয়া নিষেধ। দ্বারপ্রান্তে মাতাপুত্রে সাক্ষাৎ হয়, কথাবার্তা হয়।

মায়ের খুব অসুখ। পেটের পীড়া। পুত্র ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করে, 'তোমার কি খেলে রোগ উপশম হবে, মা?'

ব্যথিত স্বরে রোগক্লিষ্টা যশোধরা বলেন—'যা খেলে ভাল হবে তা এখানে কোথায় পাবো, বাবা? যখন কপিলবাস্তুতে ছিলাম তখন প্রায়ই এ অসুখ আমার হতো। তখন পাকা আমের রসের সঙ্গে শর্করা মিশিয়ে খেতাম, তাতেই নিরাময় হতো। কিন্তু ভিক্ষে করে খাই, এখানে তা কোথায় পাবো, বৎস?'

চিন্তান্বিত রাহুল উপাধ্যায় সারিপুত্রের কাছে সব নিবেদন করল। সারিপুত্র মহারাজ প্রসেনজিতের নিকট হতে রাজোদ্যানের সুপক্ক আমের রস সংগ্রহ করে মাতাকে দিল।

জাতকে অন্যরকম কাহিনী আছে। মায়ের আন্ত্রিক যন্ত্রণা-উপশমের জন্য সারিপুত্র প্রসেন-জিতের কাছ থেকে লাল মাছ দিয়ে (কি মাছ তার নাম নেই) সুগন্ধ চাউলের পোলাও সংগ্রহ করেছিলেন।

থেরী অপদানের একস্থানে থেরী যশোধরার উল্লেখ আছে। সঙ্ঘে তিনি ভদ্দকচ্চানা থেরী বলেই প্রসিদ্ধা ছিলেন। সাধনমার্গেও তিনি ভিক্ষুণীশ্রেষ্ঠায় পরিগণিত ছিলেন। প্রধান শিষ্যগণের মধ্যে সারিপুত্ত, মোগল্লান বক্কুল ছাড়া বোধ হয় অন্যেরা যশোধরার মতন আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন ছিলেন না।

যশোধরার জীবনের আর বেশী কথা জানা যায় না। বুদ্ধদেবের মহানির্বাণের পূর্বেই বোধ হয় আটাত্তর বৎসর বয়সে যশোধরার দেহত্যাগ হয়। মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে তিনি ভগবান বুদ্ধের চরণধূলি গ্রহণ করে শেষ বিদায় নিয়ে এসেছিলেন।

স্বামীজীর স্বরূপ

স্বামী ধ্যানানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে-সব উক্তি রয়েছে, মুখ্যতঃ শ্রীমা সারদাদেবীর এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যদের উক্তি-সহায়ে আমরা তা আলোচনা করছি। যদিও শ্রীশ্রীমায়ের ও শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের উক্তি-নিচয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তিগুলির ব্যাখ্যা নয়—অনেকাংশে প্রতিধ্বনি বা পুনরাবৃত্তিবিশেষ—তবু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তিসমূহের মর্মগ্রহণে সহায়তা করে বলেই তাদের অবতারণা করা হচ্ছে। এই উক্তিসমূহকে চারটি পর্বে বিভক্ত করা যেতে পারে: (১) সপ্তর্ষির একজন, (২) অখণ্ডের ঘরের চারজনের একজন, (৩) 'নর'-ঋষি ও (৪) শিবাবতার।

(১) সপ্তর্ষির একজন

স্বামীজীর স্বরূপের পরিচায়ক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই উক্তিটি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের' পঞ্চম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে (১০ম সং পৃঃ ১২৪)। ঐ খণ্ডেরই চতুর্থ অধ্যায়ে তাঁর এই উক্তি রয়েছে যে, নরেন্দ্রনাথ অখণ্ডের রাজ্যে সমাধিস্থ সাতজন প্রবীণ ঋষির অন্যতম (ঐ পৃঃ ১০৫-২০৭)। এই বিষয়ে তাঁর দিব্য দর্শন যা 'লীলাপ্রসঙ্গে' প্রসন্নগম্ভীর ভাষায় বর্ণিত হয়েছে তা' অতি প্রসিদ্ধ, এইজন্য প্রাসঙ্গিক হলেও, এখানে তার উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন।

এই সম্বন্ধে 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা', ২য় ভাগে শ্রীমা সারদাদেবীর এই উক্তিগুলি পাওয়া যায়:

'আর কিছু বুঝি না, সপ্তর্ষির মধ্য থেকে একটি ঋষি এসেছিলেন—এইটি জানি।' (৪র্থ সং পৃঃ ১৬৩)। 'ঠাকুরের আবির্ভাব থেকে সত্যযুগ আরম্ভ হয়েছে। বিশেষ বিশেষ লোক তাঁর সঙ্গে এসেছেন। এই নরেন সপ্ত ঋষির মধ্যে প্রধান ঋষি। তিনি ত শত ঋষির মধ্যে বলতে পারতেন; তা না বলে সেই বড় সাত জনের মধ্যে একজন বললেন।' (ঐ পৃঃ ১৭৯)।

'বিভিন্ন দেবলোক সব আছে কিনা—জনলোক, সত্যলোক, ধ্রুবলোক। স্বামীজীকে সপ্তর্ষি থেকে এনেছিলেন, ঠাকুর বলেছেন। তাঁর কথা বেদবাক্য ত, মিথ্যা হবার জো নেই।' (ঐ পৃঃ ৭৭)।

'নরেনকে সপ্তর্ষি থেকে এনেছিলেন—তাও সবটা আসেনি।' (ঐ পৃঃ ৯৭)।

'সবটা আসেনি' শ্রীশ্রীমায়ের এই কথা ও 'লীলাপ্রসঙ্গে' (৫.৪) উল্লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—'তাঁহারই (সেই ঋষির) শরীর-মনের একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতির আকারে পরিণত হইয়া বিলোমমার্গে ধরাধামে অবতরণ করিতেছে'—একার্থক। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'র দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে 'প্রধান ঋষি' কথাটি লক্ষ্য করবার।

'স্বামিশিষ্যসংবাদে' আছে, স্বামী যোগানন্দজী গ্রন্থকার শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলতেন: 'অখণ্ডের ঘরে—যেখানে দেবদেবী-সকলও ব্রহ্ম হ'তে নিজের নিজের অস্তিত্ব পৃথক্ রাখতে পারেননি, লীন হয়ে গেছেন—

সাত জন ঋষিকে আপন আপন অস্তিত্ব পৃথক্ রেখে ধ্যানে নিমগ্ন দেখেছি; নরেন তাঁদেরই একজনের অংশাবতার।' (বাণী ও রচনা, ২য় সং, পৃঃ ৫৯)। 'অংশাবতার' কথাটি সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যদিও এটি 'অপূর্ব' নয়—প্রাগুক্তেরই 'অনুবাদ' মাত্র, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূর্বকথিত সপ্তর্ষিবিষয়ক দিব্যদর্শনের লীলাপ্রসঙ্গোক্ত বর্ণনায় 'শরীর-মনের একাংশ', এবং শ্রীশ্রীমায়ের উক্তি—'সবটা আসেনি'—এই দুটি উক্তিতেই ঐ কথা প্রকারান্তরে বলা হয়েছে।

এলাহাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ থেকে প্রকাশিত, 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দ' গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়:

'বিজ্ঞান মহারাজ রাখাল মহারাজের আহ্বানে বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ-মন্দির নির্মাণ করাইতে যান। ইহার কয়েক মাস পূর্ব হইতেই তিনি স্বামীজীর ভাবে খুব মগ্ন ছিলেন। তখন তিনি সপ্তর্ষিমণ্ডলের কোন্ ঋষি কোন্ কল্পে ছিলেন এবং বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণে তাঁহাদের কি কাজ প্রভৃতির খুব চর্চা করিতেন। সেই সময়ে নরসিংহ দাস নামক জয়পুরের এক ভদ্রলোককে দিয়া সপ্তর্ষির তৈলচিত্র তৈয়ার করান। ইহার নমুনা দেখিবার জন্য তাঁহাকে এলাহাবাদের ভরদ্বাজ আশ্রমস্থ সপ্তর্ষির মূর্তি দেখিতে পাঠান। ঐ লোকটি উক্ত মূর্তি অবলম্বনে যে ছবি তৈয়ার করেন তাহা এখনও এলাহাবাদ মঠে আছে।...বিজ্ঞান মহারাজ বলিতেন, "স্বামীজী বিশ্বব্যাপী হইলেও তাঁহার স্থান ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডলে। তিনি সেখানে থাকিয়াই জগৎ নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন ও আমাদের দেখিতেছেন।" '...

'সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ' গ্রন্থের ১২১ পৃষ্ঠায় স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর এই উক্তিটি রয়েছে:

'ঠাকুর দেখেছিলেন—স্বামীজী সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে এ পৃথিবীতে এসেছেন।'

এই বিষয়ে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'র বিবরণ (পৃঃ ৪১৪):

'বিশ্বজন-পূজনীয় প্রভু-ভক্তগণ।
পদরজ তাঁহাদের করিয়া ধারণ॥
গাইতে যখন লীলা হইয়াছি ব্রতী।
শুন কই নরেন্দ্রের স্বরূপ-ভারতী॥
এক দিন বলিছেন প্রভু বাঁকা আঁখি।
নরেন্দ্রে লীলায় আনা প্রয়োজন দেখি॥
হৃষ্ট মনে অন্বেষণে নিজে আমি যাই।
সপ্তর্ষিমণ্ডলে (?) তার যোগাসনে ঠাঁই॥'

এই উদ্ধৃতিতে 'সপ্তর্ষিমণ্ডলে' শব্দটির পরে বন্ধনীর মধ্যে জিজ্ঞাসার চিহ্নটি লক্ষণীয়। এটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য, গ্রন্থকার অক্ষয়কুমার সেনের প্রদত্ত কিনা তা অনু-সন্ধানের বিষয়।

যাইহোক, অন্তত: শ্রীশ্রীমায়ের ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর উক্তিসমূহ থেকে মনে হয়, উত্তরাকাশে আমরা যে উজ্জ্বল সাতটি নক্ষত্র দেখি সেই সপ্তর্ষিমণ্ডলেই স্বামীজীর স্থান। স্বামী তেজসানন্দ-রচিত 'যুগাচার্য বিবেকানন্দ' গ্রন্থেও এই মতেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থের ১৪২ পৃষ্ঠায় স্বামীজীর দেহত্যাগের দু'-তিন ঘণ্টা পূর্বের একটি দৃশ্যের বর্ণনা:

'মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভাগীরথী-বক্ষে যেন তরঙ্গমালার কানাকানি চলিতেছে; ঊর্ধ্বে অসীম আকাশে অগণিত নক্ষত্রের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আত্মসমাহিত বিবেকানন্দ দক্ষিণেশ্বরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কে বলিবে সেই দক্ষিণেশ্বরের দিকে তাকাইয়া আজ

তাঁহার দৃষ্টি উধ্বে´ সুদূর সপ্তর্ষিমণ্ডল পর্যন্ত প্রসারিত হইল কিনা!'

উত্তর আকাশে যে উজ্জ্বল সাতটি নক্ষত্র 'সপ্তর্ষি' নামে প্রসিদ্ধ, বৈদিক যুগ থেকেই সেগুলি ঐ 'সপ্তর্ষি' নামেই অভিহিত হয়ে আসছে। শুক্ল যজুর্বেদে আছে: 'সপ্তর্ষীন্ হ স্ম বৈ পুরক্ষা ইত্যাচক্ষতে, অমী হ্যত্তরা হি সপ্তর্ষয় উদ্যন্তি' (শতপথ ব্রাহ্মণ ২. ১. ২. ৪)। 'অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা' ঋগ্বেদের (১. ২৪. ১০) এই মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যায় যাস্ক 'ঋক্ষ'-শব্দটিকে সাধারণভাবে সমস্ত নক্ষত্রের অর্থেই নিয়েছেন; পরবর্তী কালে সায়ণাচার্য দু'রকম অর্থই করেছেন: (১) সপ্তর্ষি (ঋক্ষাঃ সপ্ত ঋষয়ঃ—সায়ণভাষ্য) (২) সমস্ত নক্ষত্র।

বৈদিক সাহিত্যে একদিকে যেমন ঐ সাতটি নক্ষত্রকে সপ্তর্ষি বলা হয়েছে, অন্যদিকে এই নক্ষত্রগুলির সঙ্গে স্পষ্টতঃ কোনও সম্পর্ক উল্লেখ না করে সপ্তর্ষি শব্দটির বহুল প্রয়োগ করা হয়েছে—ঋগ্বেদ ১০. ১০৯. ৪, ৪. ৪২. ৮, অথর্ববেদ ১১. ১. ১, ১১. ১. ৩, ১১. ১. ২৪, শুক্ল-যজুর্বেদ ১৪. ২৮ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃতিগুলি দেওয়া হ'ল না। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১৩৭ সূক্তের দেবতা হিসাবে 'বিশ্বে দেবা'-র সঙ্গে কশ্যপ, অত্রি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও বশিষ্ঠ এই সপ্ত ঋষিরও নাম উল্লিখিত হয়েছে (রমেশচন্দ্র দত্তের বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য)। শুক্ল যজুর্বেদেও এই সপ্ত ঋষিরই নাম হুবহু পাওয়া যায় (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২. ২. ৪)।

আকাশে পরিদৃশ্যমান 'সপ্তর্ষি'-নক্ষত্রমণ্ডলের সঙ্গে এই সপ্ত ঋষিদের সংযোগের কথা বর্তমানে উপলব্ধ বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া না গেলেও, পরবর্তী কালে অর্থাৎ পৌরাণিক যুগে যে এই সংযোগ সুপরিস্ফুট হয়েছিল, তা নিঃসন্দেহ। তবে পৌরাণিক বলেই সব কথা নিছক গল্প বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পুরাণের মধ্যেও কাহিনী-ব্যতিরিক্ত তত্ত্ব রয়েছে, যা বিজ্ঞান-দৃষ্টি, সত্যান্বেষী সাধকের গবেষণার বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রমথনাথ বসু-রচিত 'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থের প্রথম ভাগের ২য় সংস্করণের ১২৮ 'সপ্তর্ষির একজন' এই কথার পাদটীকায় বলা হয়েছে—'এই সপ্তর্ষি পুরাণোক্ত মরীচি, অত্রি প্রভৃতি নহেন।' এই গ্রন্থটি স্বামী শুদ্ধানন্দজী আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছিলেন এবং প্রথম সংস্করণেই (১ম খণ্ডের 'শ্রীরামকৃষ্ণচরণে' অধ্যায় দ্রষ্টব্য। প্রথম সংস্করণ ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল।) এই পাদটীকা থাকায় এই মতটি যে তাঁরও অনুমোদিত, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। মরীচি ঋষির নাম থাকায় বোঝা যায় যে পাদটীকায় উল্লিখিত ঋষি-সপ্তক প্রথম অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের ঋষি। তাঁদের নাম: মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ (হরিবংশ ৭. ৮)। পুরাণমতে প্রতি মন্বন্তরে নূতন সপ্তর্ষিদের আবির্ভাব হয়ে থাকে। এক কল্পে ১৪টি মনু। হরিবংশ, ভাগবত আদি পুরাণে প্রত্যেক মন্বন্তরের সপ্তর্ষিদের নাম দেওয়া হয়েছে। হরিবংশ, সূর্যসিদ্ধান্ত আদি গ্রন্থ অনুসারে বর্তমানে আমরা সপ্তম অর্থাৎ বৈবস্বত মনুর অধিকারে বাস করছি। এই মন্বধিকারের সপ্তর্ষিরা হচ্ছেন তাঁরাই, বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২. ২. ৪) ও ঋগ্বেদের ১০. ১৩৭ সূক্তের দেবতা হিসাবে যাঁদের নামোল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। গোত্র-প্রবর্তক, প্রবৃত্তিধর্মপরায়ণ এই সাত জন ঋষিরই শিলামূর্তি এলাহাবাদের ভরদ্বাজ আশ্রমে রয়েছে।

পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ একদিকে যেমন ভরদ্বাজ আশ্রমস্থ সপ্তর্ষির মূর্তি থেকে এলাহাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের জন্য সপ্তর্ষির তৈলচিত্র তৈরি করিয়ে রেখে গেছেন, অন্যদিকে নিবৃত্তিধর্মপরায়ণ স্বামীজীরও স্থান যে সপ্তর্ষি-মণ্ডলেই তা'ও বলেছেন। কী ভাবে তিনি এই দু'টি দিকের সামঞ্জস্যবিধান করেছিলেন তা' বর্তমানে জানা যায় না। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এলাহাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে রক্ষিত ঐ তৈলচিত্রে সাধ্বী অরুন্ধতীও স্থান পেয়েছেন, কারণ ভরদ্বাজ আশ্রমেও অরুন্ধতীর শিলামূর্তি বিরাজমান। সেখানকার পাণ্ডারা জিজ্ঞাসু যাত্রীকে আজও 'ঋষিপঞ্চমী-ব্রতকথা' নামে একটি পুস্তিকা থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিয়ে থাকেন :

কশ্যপোঽত্রির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রোঽথ গৌতমঃ।
জমদগ্নির্বশিষ্ঠশ্চ সাধ্বী চৈবাপ্যরুন্ধতী ॥

আর একটি কথা। বিষ্ণুপুরাণে (১. ১২. ৯১-৯২, ২. ৭. ১০-১৫) বলা হয়েছে যে, সূর্যচন্দ্রাদি এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল ধ্রুবলোকের অনেক নীচে; মহঃ, জন, তপঃ বা সত্যলোক যা ধ্রুবলোকের উত্তরোত্তর অনেক ঊর্ধ্বে, সপ্তর্ষি-মণ্ডল তাদের যে কত নীচে তার গাণিতিক হিসাবও সেখানে দেওয়া হয়েছে। এদিকে আবার তপোলোক সম্বন্ধে Wilson নোট দিয়েছেন—'Tapoloka, the world of the seven sages'. (Vishnu Puran—Wilson, p. 42, Note 10)। শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয়ও বিষ্ণুপুরাণ, প্রথমাংশ, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ঐ কথাই লিখেছেন—'সপ্তর্ষিমণ্ডলের যে স্থান (তপোলোক) তাহাই বনৌকস (বানপ্রস্থ)-দিগের স্থান।'

আমাদের বক্তব্য এই যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল ধ্রুবলোকের অনেক নীচেই হোক বা অনেক ঊর্ধ্বে, তপোলোকেই হোক, আধিকারিক পুরুষ স্বামীজীর সপ্তর্ষিমণ্ডলে থাকতে কোন বাধাই নেই। কারণ যে-সূর্যের অবস্থান ধ্রুব-লোকেরও বহু নীচে বলা হয়েছে, তদভিমানিনী দেবতাও একজন আধিকারিক পুরুষ। 'যাবদ্ অধিকারম্ অবস্থিতিঃ আধিকারিকাণাম্'—বেদান্তদর্শনের এই সূত্রের (৩. ৩. ৩২) ভাষ্যে আচার্য শংকর লিখেছেন :

'ভগবান্ সবিতা সহস্রযুগপর্যন্তং জগতোঽধি-কারং চরিত্বা তদবসানে উদয়াস্তময়বর্জিতং কৈবল্যম্ অনুভবতি।'

অর্থাৎ ভগবান আদিত্য এক কল্পকাল পর্যন্ত জগতের (উপর তাঁর পরমেশ্বর-প্রদত্ত) অধিকার পালন ক'রে, কল্পান্তে উদয়াস্তময়-বর্জিত কৈবল্য লাভ করেন।

স্বামীজীর স্বরূপের পরিচায়ক 'সপ্তর্ষির একজন' এই প্রথম পর্বটি আমরা এইখানেই শেষ করছি।

(২) অখণ্ডের ঘরের চার জনের একজন :

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে' আছে যে, শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব ১৮৮৩ সালের কোন এক সময়ে দক্ষিণেশ্বরে সমাগত শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালকে সম্বোধন ক'রে বলেন যে, তিনি দেখেছেন যে, নরেন্দ্রনাথ 'অখণ্ডের ঘরের চারিজনের একজন' (৫ম খণ্ড, ১০ম সং, পৃঃ ১২৩-১২৪)। সান্ন্যাল মহাশয় এই কথা স্বামী সারদানন্দজীকে বলেন এবং সেই বিবৃতি 'লীলাপ্রসঙ্গে' লিপিবদ্ধ করা হয়।

'অখণ্ডের ঘরের চারিজনের একজন' এই উক্তিটি আমাদের চতুঃসনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার—এঁরা চিরকুমার, নিবৃত্তিধর্মের প্রচারক, পরম প্রেমিক ও 'বিজ্ঞানী'। এখানে 'বিজ্ঞানী'-শব্দটির সংজ্ঞা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' আমরা

যা পাই, তাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—'নারদাদি ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি নিয়ে ছিলেন। এরি নাম বিজ্ঞান।' (৪. ১৯. ১)

'সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার—এঁরাও ব্রহ্মজ্ঞানের পর দাস-আমি, ভক্তের-আমি রেখেছিলেন। এঁরা জাহাজের মত, নিজেও পারে যান আবার অনেক লোককে পারে নিয়ে যান।' (৪, ১৬. ১)

মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে এই চতুঃসনের জ্ঞান ও ভক্তির অমূল্য উপদেশ সন্নিবিষ্ট রয়েছে। গীতাভাষ্যের ভূমিকায় শংকর জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণ নিবৃত্তিধর্মের প্রবর্তক এই সনকাদির উল্লেখ করেছেন এবং 'অপরোক্ষানুভূতি' নামক প্রকরণগ্রন্থে বলেছেন যে, এঁরা 'নিমেষার্ধং ন তিষ্ঠন্তি বৃত্তিং ব্রহ্মময়ীং বিনা।'

বাস্তবিক চতুঃসনের সঙ্গে স্বামীজীর প্রচুর সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ বিষয়ে শ্রীমা সারদাদেবীর বা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের কোনও উক্তি পাওয়া যায় না ব'লে, কোনও সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। তা'ছাড়া স্বামীজী চতুঃসনের একজন এবং সপ্তর্ষিরও একজন—এই দু'টি সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য করা সম্ভব কি? অবশ্য সান্ন্যাল মহাশয়ের পূর্বোক্ত বিবৃতিতে উল্লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তিতে একই বাক্যে রয়েছে যে, স্বামীজী অখণ্ডের ঘরের চারজনের একজন ও সপ্তর্ষিরও একজন। সম্পূর্ণ উক্তিটি এই: 'দেখ, নরেন্দ্র শুদ্ধসত্ত্বগুণী; আমি দেখিয়াছি সে অখণ্ডের ঘরের চারিজনের একজন এবং সপ্তর্ষির একজন; তাহার কত গুণ তাহার ইয়ত্তা হয় না।' এই উক্তিটি আমাদের গীতার (১০. ৬) 'মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা' ইত্যাদি জটিল শ্লোকটি স্মরণ করিয়ে দেয়—অবশ্য ভাষ্যকার শংকর ভিন্ন অন্যান্য অধিকাংশ টীকাকাররা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে। তবে এ নিয়ে কোনও বিচারের অবকাশ নেই, কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আলোক-সম্পাতী আপ্তবাক্যের এক্ষেত্রে একান্ত অভাব।

স্বামীজীর স্বরূপের পরিচায়ক এই দ্বিতীয় পর্বটি আমরা এখানেই শেষ করছি। (ক্রমশঃ)

মায়ের পূজা

শ্রীতুলসী চক্রবর্তী

মাগো তোমায় ডাকতে হলে
চাইনে জবা-বিল্বদল,
মা তোর চরণ পূজতে হলে
দিতেই হবে অশ্রুজল।
দুঃখ-সুখে, ব্যথায়, ভয়ে,
শিশু যে তার মাকে স্মরে,
মায়ের পরশ শান্ত করে
অশান্ত তার চিত্তদল।

বিশ্বজগৎ জুড়ে মাগো
তোর-ই রূপের মেলা,
সকল মনের সকল স্তরে
তোর-ই লীলা-খেলা।
তুই হলি মা লীলাময়ী,
ভক্ত-মনের কুসুমচয়ী,
চরণদুটির পরশ দিয়ে
ফোটাস মানস-কুসুমদল।

স্বামী অখণ্ডানন্দজীর স্মৃতিকথা

স্বামী জ্ঞানদানন্দ

মহাপুরুষদিগকে প্রথম দর্শনেই ধরা-ছোঁয়া যায় না। যত বেশী মেলামেশা করা যায় ততই ক্রমে তাঁহাদের উচ্চভাব কথঞ্চিৎ বোঝা যায়।

আমি মঠে সাধুদিগের নিকট হইতে পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজের সামান্য কিছু সংবাদ প্রথমে পাই; তাঁহার বাল্যজীবন, তাঁহার হিমালয়, কেদারবদরী, কাশ্মীর, তিব্বত প্রভৃতি ভ্রমণ ও রাজপুতানায় তাঁহার সেবাকার্য, মুর্শিদাবাদের দুর্ভিক্ষ, সারগাছিতে অনাথ আশ্রম-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অবগত হই। তখন হইতে তাঁহাকে দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগে।

ঠিক কখন তাঁহার প্রথম দর্শন লাভ করিয়াছিলাম মনে নাই; সম্ভবতঃ ১৯২১ বা ১৯২২ সালে—সেদিন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ভাবিয়াছিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্যকে দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম।

তিনি যখন মহারাজদের সহিত কথা বলিতেন তখন তাঁহার প্রাণখোলা হাসি, মিষ্ট বাক্য, সরলতা ও সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। কথা বলিবার সময় তাঁহার চক্ষু ও সর্বাঙ্গ দিয়া আনন্দের স্ফুরণ হইত। এমন মহাপুরুষকে দেখিয়া কার না আনন্দ হয়?

যখনই সময় হইত তখনই তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্মের সান্নিধ্যে বসিয়া তাঁহার অপূর্ব ভ্রমণ-কাহিনী শুনিয়া স্তম্ভিত হইতাম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পদসেবাদি করিয়া ধন্য হইয়াছি। ভ্রমণকালে তাঁহার রোগীর সেবা ও দয়া-দাক্ষিণ্যাদির কথা শুনিয়াও মুগ্ধ হইয়াছি।

রাজা মহারাজ ও মহাপুরুষজী তাঁহাকে পাইলে তাঁহার সহিত খুব আনন্দ করিতেন। তাঁহারা তাঁহার সহিত রঙ্গরসাদি করিয়া আমাদিগকেও আনন্দ দিতেন; তিনি যথার্থই একজন আনন্দময় পুরুষ ছিলেন।

তাঁহার জীবনবৃত্তান্তে অনেক কিছু লেখা হইয়াছে। এখানে তাঁহার সহিত আমার যে-সকল ঘটনা অল্পবিস্তর ঘটিয়াছে সেগুলি লিখিবার চেষ্টা করিব।

আমি ১৯২৫ সালে মালদহ আশ্রমের কাজে যাই। তখনকার সে আশ্রমটি ছিল অতি ক্ষুদ্রাকার, ১০৲ টাকা তাহার ভাড়া; তাহাতে একটিমাত্র পাকাঘর ও দুইটি কুঁড়েঘর; একান্ত স্থানাভাব। সামান্য কিছু চাঁদা পাওয়া যাইত; তাহাই আর মুষ্টিভিক্ষার চাউলই ছিল আমাদের সম্বল। উহারই একটি ঘরে রাত্রে গরীব ছেলেদের নৈশ পাঠশালা বসিত, আর একটিতে ছিল আমাদের রান্নাঘর। আশ্রমের অন্যান্য কাজের মধ্যে ছিল ২।৩টি স্কুল পাড়ায় পাড়ায়, একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়, ছোট একটি লাইব্রেরী এবং সামান্যভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা।

একবার এক সন্ধ্যায় একজন মুসলমান ভদ্রলোক একটি শিশুকে, বয়স ২।৩ বৎসর হইবে, আশ্রমে লইয়া উপস্থিত। ২।১টি কথাবার্তার পর তিনি অকস্মাৎ উহাকে আশ্রমে রাখিয়াই চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। তখন আশ্রমের অন্যতম কর্মী ব্রহ্মচারী গঙ্গাচৈতন্য (বর্তমানে স্বামী বগলানন্দ) উহা দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ছেলেটিকে এখানে রেখে যাচ্ছেন যে?"

তিনি বলিলেন, "এটি মুচির ছেলে, ইহার পিতামাতা মারা যাওয়ার পর আমি বাড়ি নিয়ে যাই এবং লালন-পালন করি, এখন এ খুবই অসুস্থ। তাই আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি এবং রেখে যাচ্ছি। আপনারা সকলের সেবা করেন, এরও করুন।" ইহা বলিয়া উক্ত ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন। আমরা মহাবিপদে পড়িলাম। নিজেরা কোনমতে রান্না করিয়া দুটি খাই। ইহাকে লইয়া কি করা যাইবে? কোন উপায় তো দেখিতেছি না। তখন মনে হইল পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজের কথা। ২।৩ দিন পর তাঁহাকে একখানি পত্রে ছেলেটির বিষয় সব লিখিলাম। তিনি চিঠি পাওয়ামাত্রই উহাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে বলিলেন; ২।৪ দিন পর ছেলেটিকে সারগাছি পাঠানো হইল তিনি কিন্তু ছেলেটিকে পাইয়া মহা খুশী হইলেন। আমি ৫।৬ মাস পরে মঠে যাইবার পথে পূজনীয় মহারাজজীকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই সেই ছেলেটিকে কোলে করিয়া আনন্দ করিতে করিতে আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, 'দেখ দেখ, তোমার সেই ছেলেটি।' দেখিলাম সেই ছেলেটির চেহারা ভদ্রবংশের ছেলের মত হইয়াছে। সুস্থ ও সবল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল ছেলেটির কি ভাগ্য! কোথায় সে ছিল একটি মুচির ছেলে, আর আজ সে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ, মঠ ও মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ মহারাজের কোলে উঠিয়াছে, এবং কি আদর-যত্ন পাইতেছে! পূর্বজন্মে না জানি তাহার কি সুকৃতিই ছিল!

আমি তিন দিন সেখানে ছিলাম, সেই আশ্রমের অবস্থাও ভাল নহে। সকাল ৯টার পর আমাদের এক ঠোঙ্গা মুড়ি ও সামান্য একটু গুড় দেওয়া হইত। ইহাই ছিল সেখানের জলখাবার। বেলা ১২টায় আশ্রমের ক্ষেতের মোটা চালের ভাত ও একটু ডাল। খাইতে বসিয়া দেখিলাম ডালও জলের মত পাতলা এবং শক্ত। তরকারী মাত্র বাগানের ডাঁটা ও বেগুন। রাত্রে ও দিনে ১২টার পর আহার এবং একইরূপ খাদ্য। তিন দিনই এই ছিল আমাদের আহার। বলা বাহুল্য, মহারাজজীও তাহাই খাইতেন, বেশীর মধ্যে তাঁহার ছিল একটু চা ও একটু দুধ। এত কষ্ট করিয়াও তিনি সেখানে এমন আনন্দে কাটাইতেন দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম!

এক বৎসর পরে আবার সারগাছি যাই বেলুড় মঠ যাইবার পথে। আমি যখন আশ্রমে পৌঁছিলাম তখন দেখি মহারাজজী আমাকে দেখিয়া আগাইয়া আসিতেছেন। আমি নিকটে আসিলে তিনি মৃত সন্তানের মাতারা যেমন আপন আত্মীয় দেখিয়া কান্নাকাটি করে, সেই ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে আমাকে বলিলেন, "দেখ, জ্বরে ভুগে তোমার ছেলেটি ৫।৬ দিন শয্যাগত ছিল। তারপর হঠাৎ মারা গেল। অনেক যত্ন করেছিলাম, কিছুতেই বাঁচানো গেল না।" এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। আমি আশ্চর্য হইয়া সব শুনিলাম, পরে বলিলাম, "মহারাজজী, ছেলেটির বড় ভাগ্য। আপনি তাহাকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন, এবং কত না ভালবাসিতেন! শরীর যাইবার পর শ্রীশ্রীঠাকুরই তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়াছেন নিশ্চয়ই।" এই কথা শুনিয়া তিনি শান্ত হইলেন। মহারাজজীর এই অহেতুক ভালবাসা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম।

মহাপুরুষজী প্রথম যখন অসুস্থ হইয়া পড়েন, গঙ্গাধর মহারাজজী আসিয়া মহাপুরুষজীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দাদা, ভাল হয়ে উঠুন। আপনি চলে গেলে কি

হবে ?" তাঁহার কান্না দেখিয়া অবাক্ হইলাম। গুরুভাইয়ের প্রতি গুরুভাইয়ের এত স্নেহ ও ভালবাসা! সে দৃশ্য দেখিবার মত তাঁহাদের পরস্পরের ভালবাসা কত গভীর ছিল তাহা না দেখিলে বুঝা যায় না!

গঙ্গাধর মহারাজজী সেই সময় সোনার-বাগানের বাড়ীর দক্ষিণদিকের ছোট ঘরটিতে থাকিতেন। আমি হলঘরটিতে শুইতাম। একদিন রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর ঘুমাইতেছি, তখন রাত্রি বারটা হইবে। তিনি সহসা আসিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন. "নীলকণ্ঠ, ঘুমোচ্ছ ? ওঠো, রাত্রে ঘুমুবে কি ? হাতমুখ ধুয়ে জপধ্যান কর।" আমিও বিছানা হইতে উঠিয়া মুখ হাত পা ধুইয়া জপধ্যান করিতে বসিয়া ভাবিলাম, মহারাজজী আমাকে কত ভালবাসেন, তাই আমাকে এমনভাবে ডাকিলেন। আমি জপাদি করিবার পর ৩½ টায় প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া ঠাকুরঘরে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে শয্যা হইতে উঠাইয়া আবার জপাদি করিতে বসিতাম। তিনি ৫।৬দিন আমাকে এইরূপে উঠাইতেন ও জপাদি করিতে বলিতেন। এইভাবে এত রাত্রি জাগা ও দিনে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজাসেবাদি করা আমার পক্ষে ক্রমে কষ্টকর হইয়া উঠিল। শরীর দুর্বল বোধ করিতে লাগিলাম, পূজার কাজ করিতে অসমর্থ হইলাম। তখন তাঁহাকে বলিলাম, "মহারাজ, রাত্রি জাগায় ও দিনের বেলা পূজার খাটুনিতে আমার শরীর খারাপ হইতেছে; আমি রাত্রি জাগিয়া আর জপধ্যানাদি করিতে পারিতেছি না, আমাকে আর রাত্রে দয়া করিয়া ডাকিবেন না, এতে ঠাকুরসেবার ত্রুটি হচ্ছে।" তিনি বলিলেন, "কেন ? আমরা তো শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুখের সময় দিনরাত তাঁর সেবা করেছি। তোমরা পারবে না কেন ?"

ঐ দিন রাত্রে তিনি আবার ডাকিলেন, তার পরদিন ভোরে ঐ ঘর হইতে বিছানা লইয়া অন্যত্র যাইব ঠিক করিয়া বাহির হইতেছি, এমন সময় তিনি উহা দেখিতে পাইয়া আমার বিছানা ধরিয়া আমাকে আটকাইলেন; বলিলেন, "কোথায় যাও ?" আমি বলিলাম, "রাত্রি জাগিয়া দিনে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। আমি আর এখানে থাকিব না।" তিনি বলিলেন, "আমরা সারা রাত সারা দিন কাজ করেছি; আমাদের তো কষ্ট হয় নাই। তোমরা পারবে না কেন ?" আমি বলিলাম, "মহারাজ, শ্রীশ্রীঠাকুর আপনাদের শরীর ও মন ঐ ভাবে গঠন করে দিয়েছিলেন, তাই আপনারা এমনভাবে সেবা করতে সমর্থ হয়েছিলেন; আমাদের শরীর ও মন এতটা করতে পারছে না। আপনি দয়া করে আমাদেরও সেইরূপ করে দিন।" তখন তিনি বলিলেন, "হাঁ, তা সত্য বটে। আচ্ছা, আর তোমাকে ডাকব না।" ভাবিলাম আমার মঙ্গলের জন্য তিনি কত না ভাবিতেছেন! অথচ দেখিতাম সারা রাত তাঁহার চোখে ঘুম নাই। সর্বদাই ঠাকুর-দেবতাদের নাম করিতেছেন।

এইভাবে তাঁহার কত ভালবাসাই না পাইয়াছি! আজ শেষ বয়সে এইসব কথা মনে হইলে আনন্দে স্তব্ধ হইয়া যাই।

আর একবার—তিনি তখন মঠের অধ্যক্ষ। একটি বড় পানতুয়া লইয়া সারগাছি হইতে মঠে আসিয়াছেন, ঐ পানতুয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভোগ দিবার পর তাঁহাকে উহার কিছুটা প্রসাদ দিয়া আসিলাম। রোজই সময় পাইলে তাঁহার কাছে যাইতাম এবং সেবাদি করিতাম। ঐদিন যখন তাঁহার কাছে গিয়াছি তখন তিনি আমাকে বলিলেন, 'এই যে নীলকণ্ঠ, এই পানতুয়া আছে। খাও।" আমি বলিলাম,

"আমার খিদে নেই, শরীর খারাপ।" কিন্তু তিনি বলিলেন, "না, এইটুকু খাইতে পারিবে।" আমি বারংবার না না করিতে লাগিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই ছাড়িবেন না। আমার হাতে ওটা দিয়া বলিলেন "খাও, কিচ্ছু হবে না।" অগত্যা তাহা খাইতে হইল। কিন্তু আমার কোন অসুখ হয় নাই। এইরূপে কত স্নেহ ভালবাসাদি তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি আজ তাহা স্মরণ করিয়া 'স্মর্যামি' পুনঃ পুনঃ! কত ভাগ্য ছিল তাই এইরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ সন্তানদের করুণা লাভ করিয়া ধন্য হইবার সুযোগ পাইয়াছি।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীজাবের আলি

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এ যুগের অবতার!
শুধু শাক্তের, হিন্দুর নহ—প্রিয় তুমি সবাকার!
বিভেদ-ব্যথায় ব্যথিত বিশ্ব গেলে তুমি এক করে
লভিলে দীক্ষা সকল ধর্মে বিশ্বমানব তরে।
মুসলমানের বেশভূষা পরি করেছ নামাজ, রোজা,
খৃষ্টসাধক, শ্রীশ্যামা-সেবক, বুঝেছিলে পথ সোজা!
তোমারই এ বাণী: 'যত নদনদী ছুটে চলে কলতানে
লক্ষ্য তাদের সকলেরই এক—একই সাগরের পানে!
কেহ বলে জল, কেহ ওয়াটার, কেহ কহে তারে পানি—
বহু নাম তবু জল সে একই, একথা সবাই জানি;
তেমনি তাঁহারে কেহ গড্‌ বলে, কেহ খোদা, ভগবান,
হিন্দুর রাম—তাঁরেই রহিম ডাকিছে মুসলমান।'
দেখাইলে তুমি তাঁর কাছে যেতে যত মত তত পথ
পথ যা-ই হোক, একই লক্ষ্যেই চলে সব মনোরথ।
সহজ ভাষায় সার কথাগুলি বোঝালে সকল জনে
বিবেকানন্দ সেই বারতাই ছড়ালো বিশ্বমনে।
কি যে যাদু জান, কি মন্ত্র দিয়ে করে গেলে আপনার
সাধকশ্রেষ্ঠ, ভক্তপ্রবর, এ যুগের অবতার!

রামচরিতে কালিদাস ও ভবভূতি

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী চেতনানন্দ

যাহাহউক সেই 'সর্বময়' রাক্ষস সব কিছুর সাক্ষী হইয়া লঙ্কায় রাবণ-অমাত্য মাল্যবানকে সংবাদ দিতে গেল। মন্ত্রী মাল্যবান মহেন্দ্রদ্বীপে পরশুরামের কাছে রামচন্দ্রের হরধনুভঙ্গের সংবাদ দিয়া দূত পাঠাইলেন। মাল্যবান প্রকৃত রাজনীতিবিদদের মত 'সাম-দান-ভেদ ও দণ্ড' নীতির আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে শম্ভু-শিষ্য উগ্রতেজা পরশুরামকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছেন। পরশুরামের চরিত্র ভবভূতির একটি প্রশংসনীয় সৃষ্টি। তাহাতে রহিয়াছে ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ, অপূর্ব গুরুভক্তি। ভবভূতি রামচন্দ্রের বীরত্ব-খ্যাপনে পরশুরামের চিত্র যত উজ্জ্বল করিয়াছেন, রাবণের চিত্র তত উজ্জ্বল হয় নাই। প্রবাদ আছে, 'জটীলে কুটীলে না হইলে লীলা পোষ্টাই হয় না' অর্থাৎ বিঘ্ন-কারীরা না থাকিলে প্রেম বা বীরত্ব কোনটিই বিশেষভাবে প্রকটিত হয় না। তাই মনে হয় ভবভূতি কিশোর বালক রামের প্রতি পরশুরামের ঔদ্ধত্য, অশিষ্টাচার, সর্বগ্রাসী মনোভাব একটু বেশী করিয়া দেখাইয়াছেন। রামকে দেখিয়া পরশুরামের অশ্রুও বিগলিত হইয়াছে। মানুষের চোখের জল ফেলাইতে ভবভূতি সিদ্ধ-হস্ত। একই চরিত্রে যুগপৎ বিরোধী ভাবের সংমিশ্রণ। পরশুরামের হিংস্রতার মধ্যে দেখা দিয়াছে মানবিক স্নেহ কোমলতা। তিনি রামচন্দ্রকে 'ক্ষত্রিয়ডিম্ব' বলিয়া গালাগালি করিয়া পরক্ষণেই বলিয়াছেন, "তুমি নয়নাভিরাম, আমার প্রিয়; কিন্তু গুরুর অপমান-হেতু তুমি বধ্য। আবার তুমি নূতন বিবাহ করিয়াছ। সেই নববধূর নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া তোমাকে বধ করিতে আমার বড় কষ্ট হইতেছে। এইরূপ কষ্ট আমার পূর্বে কখনও হয় নাই; অথচ পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিবার কালে আমি ক্ষত্রিয়নারীর গর্ভ হইতে ক্ষত্র-পুত্র বাহির করিয়া কাটিয়াছি।"

শত বিপদেও মহাবীর রাম নির্বিকার। ভবভূতি রামকে কোথাও উদ্বিগ্ন হইতে দেন নাই। পরশুরামের গালিগালাজ-বর্ষণ, ভীতি-প্রদর্শন সত্ত্বেও রাম তাঁহার শ্রদ্ধা বা বিনয়-প্রকাশে কার্পণ্য করেন নাই। ভবভূতি শত্রু পরশুরামের মুখ হইতে রামের মহিমা প্রকাশ করাইয়াছেন: "আশ্চর্য, আশ্চর্য! কি অচিন্তনীয় মাহাত্ম্য ও সৌজন্য! ক্রোধে গম্ভীর, পৌরুষে ধীর।" যখন অন্তঃপুর হইতে বধূদের কঙ্কণ-মোচনের জন্য জামাতা রামচন্দ্রের ডাক পড়িল, তখনও মানবিকতাবোধে পরশুরাম বলিতেছেন, "যাও, লোকধর্ম পালন করিয়া আইস।" তারপর রাম কর্তৃক পরাজিত হইয়া পরশুরাম তাঁহাকে নিজ ধনু দান করিয়া চলিয়া গেলেন।

ভবভূতি সীতাকে নারীসুলভ মৃদুতা, কোমলতা দিয়া গড়িয়াছেন। পরশুরামের ভয়ে সীতা জড়সড় ছিলেন। ইতিহাস-বিশ্রুতা ক্ষত্রিয়রমণী সংযুক্তা স্বামী পৃথ্বীরাজকে যুদ্ধের সাজ পরাইয়া দিবার কালে বলিয়াছিলেন, "তুমি চৌহান-সূর্য। তুমি এই জীবনে যশ ও সুখ দুই-ই যেমনভাবে পাত্রপূর্ণ করিয়া পান করিয়াছ, তেমন আর কেহ করে নাই। জীবন হইতেছে একটা পুরানো কাপড়; যদি ইহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে হয়, দুঃখ নাই। কারণ ভাল

করিয়া মৃত্যুবরণ করাই হইতেছে অমরতা।” সীতা সংযুক্তার মত না হইলেও তাঁহার মৃদুতা নিছক দুর্বলতা নয়। কারণ শাস্ত্র বলেন, “মৃদুতার দ্বারা কঠোর জিত, অকঠোরও জিত হয়। মৃদুতার দ্বারা অভিভূত হয় না, এমন কিছুই নাই। মৃদুতা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ অস্ত্র।”

রঘুবংশে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড ও যুদ্ধকাণ্ড মাত্র ১০৪টি শ্লোকে সমাপ্ত (দ্বাদশ সর্গ)। কালিদাস কেবল বাল্মীকির চিন্তাধারার সংগতি রক্ষা করিয়া দুই-চারিটি কথা বলিয়া কাব্যিক প্রবাহ রক্ষা করিয়াছেন। কালিদাসের উপমা তুলনাহীন। দ্বাদশ সর্গের প্রথম শ্লোকে তিনি পরবর্তী ঘটনায় ভূমিকাস্বরূপ বলিয়াছেন: উষাকালে বর্তিকার অন্তর্বর্তিনী দীপশিখা যেমন পাত্রস্থিত সমস্ত তৈল সম্ভোগ করিয়া নির্বাণোন্মুখ হয়, সেইরূপ রাজা দশরথ অন্তিম দশায় উপস্থিত ও বিষয় সম্ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া নির্বাণের সমীপবর্তী হইলেন। জরা দশরথের কর্ণে রামচন্দ্রকে রাজলক্ষ্মী প্রত্যর্পণের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কোপনা কৈকেয়ী ঈর্ষাবিষ উদ্গীরণ করিলেন। বাল্মীকি বনগমন-ব্যাপারে কৈকেয়ীর নিকট রামচন্দ্রের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন: “আমি রাজার আজ্ঞায় এখনই অগ্নিতে প্রাণবিসর্জন দিতে পারি, বিষ খাইতে পারি, সমুদ্রে পতিত হইতে পারি।” রামচন্দ্রের বনগমনে কালিদাসের অনুভব: “সীতাকে রামের পশ্চাৎগামিনী দেখিয়া বোধ হইল যেন রাজলক্ষ্মী রামগুণে পক্ষপাতিনী হইয়া, কৈকেয়ীর নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছেন।” অযোধ্যাকাণ্ডে রামচন্দ্র নির্বিকার, অপূর্ব সংযমী, সত্যে অটুট। কেহ তখন বিষাদমগ্ন, কেহ প্রতিশোধপরায়ণ, কেহ বা রাজ্যকামী—কিন্তু ঐ সব সাংসারিক বিপর্যয়ের ভিতর জ্ঞানী রামচন্দ্র কর্তব্যের বিগ্রহরূপে অবস্থিত। বৈষয়িক সংঘর্ষ সাধারণ মানুষের মত তাঁহার হৃদয়কে দোলায়িত করিতে পারে নাই। কালিদাস একটু সহানুভূতির সুরে বলিয়াছেন, “প্রশান্তচিত্ত সানুজ রামচন্দ্র সীতার সঙ্গে যৌবনকালেই বৃদ্ধ ইক্ষ্বাকুদের ব্রত আচরণ করিতে চলিলেন।”

ভবভূতির মহাবীরচরিতে অযোধ্যাকাণ্ডের বিবরণ একটু স্বতন্ত্র ধরনের। বালকাণ্ড হইতে যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত সর্বত্রই রামচন্দ্রকে দমনের জন্য রাবণের ষড়যন্ত্র দেখা যায়। রাবণের মাতামহ ও মন্ত্রী মাল্যবান এইসব ষড়যন্ত্রের উদ্যোক্তা। প্রথমে পরশুরামকে দিয়া রামকে জব্দ করিবার চেষ্টা, পরে শূর্পণখাকে মায়াবিনী হইয়া মন্থরার উপর ভর করিতে নির্দেশ এবং অবশেষে বালীকে দিয়া রামচন্দ্রের অনিষ্টসাধনের চেষ্টা। মাল্যবানের সঙ্গে শূর্পণখার কথাবার্তা ভবভূতির কল্পিত। নাট্যে ও কাব্যে সঙ্গতি রক্ষার জন্য কল্পনা দূষণীয় নহে।

মন্থরা-শরীর-প্রবিষ্ট শূর্পণখা রামলক্ষ্মণকে পাইয়া কৈকেয়ীর পত্র দেখাইতেছেন: “দেখ বৎস, পূর্বে মহারাজ আমাকে দুইটি বর দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তোমার পিতার এই পত্রখানিই এই বিষয়ের বার্তাবাহকস্বরূপ। একটি বরের দ্বারা বৎস ভরত রাজ্যশ্রী ভোগ করুক; অন্য বরের দ্বারা রাম কালহরণ না করিয়া দণ্ডকারণ্যে গমন করুক।” অযোধ্যায় তখন রামের অভিষেকের মহোৎসব ও জামদগ্ন্য-বিজয়োৎসব চলিতেছে। এমন সময় রামচন্দ্র রাজা দশরথের কাছে বনে যাইবার অনুমতি চাহিলেন। ঐ কথা শুনিয়া দশরথ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু সত্যসন্ধ রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন করিবার জন্য লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনে চলিলেন।

দর্শক ও শ্রোতা যখন করুণরসের দ্বারা অভিভূত হয়, তখন অন্য রস পরিবেশন করিয়া ঐ বিষাদের লাঘব কবি-কুশলতার পরিচায়ক। এই ক্ষেত্রে কালিদাস ও ভবভূতি উভয়েই সমান দক্ষ। কালিদাস শূর্পণখাকে লইয়া রাম-লক্ষ্মণের মধ্যে ফষ্টিনষ্টি করিয়া হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন। হাস্যরতা সীতাকে ক্রোধোন্মত্তা শূর্পণখা বলিয়াছে: "তুই শীঘ্রই ওই পরিহাসের সমুচিত ফল পাইবি; আমার দিকে দেখ্, মৃগী যেমন ব্যাঘ্রীকে উপহাস করে তুই আমাকে সেইরূপ পরিহাস করিলি, ইহা মনে রাখিস্।" তারপর লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাক কান কাটিয়া দিলেন। ফল হইল সীতাহরণ। বাল্মীকি সীতাহারা রামকে দিয়া হাহুতাশ ও বিলাপ করাইয়াছেন; কালিদাস ও ভবভূতি ওদিকে বেশী যান নাই। মানুষ আপন মন দিয়াই জগৎ গড়ে। ভক্তকবি তুলসীদাস ও কৃত্তিবাস রামচন্দ্রের নবদূর্বাদলশ্যাম কোমল দেহশ্রী অঙ্কন করিয়া তাঁহার বীরত্বের ও বৈরাগ্যের দিকটা তত দেখান নাই। মহর্ষি বাল্মীকি বনবাসোপলক্ষে বিলাপরতা কৌশল্যাকে দিয়া বলাইয়াছেন, "মহেন্দ্রধ্বজ-সঙ্কাশ উন্নতদেহ রামচন্দ্র স্বীয় পরিঘ-তুল্য-কঠিন বাহু উপাধান করিয়া কিরূপে শয়ন করিবেন?" শৃঙ্গবেরপুরে ভরত রামের তৃণশয্যা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ইঙ্গুদীমূলে কঠিন স্থণ্ডিলভূমি রামের বাহু-নিষ্পীড়নে মর্দিত হইয়া আছে, আমি তাহা চিনিতে পারিতেছি।" সুতরাং ভক্তকবিদের রামবর্ণনা 'নবনী জিনিয়া তনু অতি সুকোমল' বা 'ফুলধনু হাতে রাম বেড়ান কাননে'—বাল্মীকি, কালিদাস ও ভবভূতির সঙ্গে মিলে না।

পূর্বে আমরা সীতাকে কোমলস্বভাবা বলিয়া বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ঐ কোমলতার সঙ্গে ছিল বুদ্ধির প্রখরতা আর ছিল পতিগতপ্রাণা সতীর পতিমঙ্গলাকাঙ্ক্ষা। ইহার একটু নমুনা উল্লেখ করিয়া আমরা বালীবধের বর্ণনায় প্রবেশ করিব। বনবাসকালে ঋষি-গণের অনুরোধে রাম রাক্ষসগণের দৌরাত্ম্য-নিবারণের ভার গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে সীতা রামকে বলেন, "তিনটি কার্য পুরুষের বর্জনীয়—মিথ্যাকথা, পরদার ও অকারণ শত্রুতা। তোমার সম্বন্ধে প্রথম দুই দোষের কল্পনাই হইতে পারে না; কিন্তু তুমি রাক্ষস-গণের সঙ্গে অকারণ শত্রুতায় লিপ্ত হইতেছ বলিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে।" রাম প্রত্যুত্তরে বলেন, "ক্ষত হইতে যে ত্রাণ করে সেই ক্ষত্রিয়। আমি শরণাগত ঋষিগণকে কথা দিয়াছি। আমার যে-কোন বিপদই হউক না কেন, আমি রাজ্য এমন কি তোমাকেও পর্যন্ত ত্যাগ করিতে পারি, তথাপি সত্যভ্রষ্ট হইতে পারি না।"

কালিদাস একটি শ্লোকে বালীর উপাখ্যান শেষ করিয়াছেন। বাল্মীকি বালীকে সাহস, তেজ ও উদারতার পরাকাষ্ঠারূপে দেখাইয়াছেন। বাণবিদ্ধ বালী রামচন্দ্রকে তীব্র ভাষায় যেসব যুক্তিমণ্ডিত নিন্দাবাদ করিয়াছেন, তিনি তাহার একটিরও যথাযথ উত্তর দিতে পারেন নাই। কয়েকটি যুক্তি উদ্ধৃত করিতেছি: ১। আমি আপনার রাজ্যে যাইয়া কোন অন্যায় করি নাই, অথচ আপনি আমাকে বধ করিলেন। ২। আমার মাংস আহার করিবেন এরূপ সম্ভাবনা নাই। ৩। এখানে স্বর্ণ রৌপ্য কিংবা উৎকৃষ্ট শস্য জন্মায় না, যেহেতু আপনি এ স্থান অধিকার করিবেন। ৪। আপনি লুকাইয়া তস্করের ন্যায় আমাকে বধ করিলেন; লুকাইয়া বাণনিক্ষেপ যুদ্ধরীতিসঙ্গত নহে। ৫। যে আপনার কোন অন্যায় করে নাই, তাহাকে অন্যায়পূর্বক হত্যা করিলেন—ইহা

সাহসী যোদ্ধার কাজ নহে। ৬। সুপ্ত ব্যক্তিকে যেরূপ সর্প দংশন করে, আপনি আমার প্রতি সেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। সম্মুখ যুদ্ধে আপনার সঙ্গে দেখা হইলে আপনি নিশ্চয়ই নিহত হইতেন। ৭। রাজহত্যার ফল অনন্ত নরক ; আপনি তজ্জন্য প্রস্তুত হউন। আপনার ভিতরে হিংসা অথচ তপস্বীর মত জটাজূট চীরবাস ধারণ করিয়াছেন। আমাকে বধ করিয়া আপনি অক্ষয় অযশ অর্জন করিলেন।

বালীর এইসব উক্তির উত্তরে রামচন্দ্রের যুক্তিগুলি দৈন্যে ভরা। ভবভূতি কিন্তু ঐদিক দিয়া যান নাই। তিনি রামচন্দ্র ও বালীকে সম্মুখ যুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছেন এবং পরে বাণ-বিদ্ধ বালীকে দিয়া নাটকীয় ভাবে যুগপৎ একটি বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছেন। মতঙ্গমুনির আশ্রমে মৃত্যুপথগামী বালীই রাম ও সুগ্রীবের এবং রাম ও বিভীষণের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন করাইয়া দেন।

রামচন্দ্র কপিকুল দ্বারা অপার সমুদ্র-সলিলোপরি এক দৃঢ় সেতু বন্ধন করাইলেন ; তাহা দেখিয়া বোধ হইল যেন নারায়ণের শয়নের নিমিত্ত রসাতল হইতে শেষনাগ উত্থিত হইয়াছেন। রামচন্দ্র সেই সেতুপথে উত্তীর্ণ হইয়া পিঙ্গলবর্ণ বানরসৈন্যসহ লঙ্কা অবরোধ করিলেন। আরম্ভ হইল তুমুল যুদ্ধ। স্ববশে আনিবার জন্য রাবণ মায়াবলে জানকীকে রামের ছিন্ন মস্তক দেখাইলেন ; পরে ত্রিজটা সীতাকে সান্ত্বনা দিল। গরুড় রামলক্ষ্মণকে মেঘনাদের নাগপাশবাণ হইতে মুক্ত করিল। রাবণের শক্তিশেল লক্ষ্মণের বক্ষ বিদীর্ণ করিল ; পরে হনুমান কর্তৃক আনীত মহৌষধি লক্ষ্মণকে সুস্থ ও সঞ্জীবিত করিল। 'তুমি অতিশয় নিদ্রাপ্রিয় ; দশানন অকালে তোমাকে বৃথা জাগরিত করিয়াছেন'—কুম্ভকর্ণকে এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র তাহাকে চিরনিদ্রায় অভিভূত করাইলেন। "অরাবণমরামং বা জগদদ্যেতি নিশ্চিতঃ" অর্থাৎ আজ ব্রহ্মাণ্ড হয় রাবণশূন্য অথবা রামশূন্য হইবে—এই নিশ্চয় করিয়া রাবণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। রণস্থলে পাদচারী রামচন্দ্র ও রথারূঢ় রাবণের যুদ্ধ অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র রামের নিকট স্বীয় সারথি মাতলিসহ নিজ জৈত্ররথ পাঠাইয়া দিলেন। তুমুল যুদ্ধের পর 'দেবতাদের অবধ্য' এই বরপ্রাপ্ত রাবণ মানুষ রামের হস্তে নিহত হইলেন। রঘুবংশে কালিদাস-বর্ণিত রাম-রাবণের যুদ্ধ রৌদ্র, বীর ও ভয়ানক রসে সিক্তিত হইতে পারে নাই। কারণ কালিদাস ভবভূতির ন্যায় রামচন্দ্রকে লইয়া বীররসের অবতারণা করিতে পারেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "We have no martial music, no martial poetry either. Bhavabhuti is a little martial." প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে পরে বর্ণিত উক্তি কালিদাসকে নরম থাকের মানুষ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। "দশানন অতিশয় ক্রোধভরে জানকীর সঙ্গমসূচক রামচন্দ্রের স্পন্দমান দক্ষিণ-ভুজে শর নিক্ষেপ করিলেন।" কালিদাসের আর একটি উক্তি ধরা যাক : "অদ্বিতীয় ধনুর্ধর রামের সেই দীপ্ত অস্ত্র আকাশপথে শতধা প্রদীপ্ত হইয়া করালফণামণ্ডলধারী শেষভুজঙ্গমের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল।" আবার ঠিক তাহার পরেই রহিয়াছে, "সেই অস্ত্রাঘাতে মস্তকচ্ছেদনকালে লঙ্কেশ্বর কিছু মাত্রই কষ্ট অনুভব করিলেন না।" অবশ্য এইরূপ পাশাপাশি ভাবের বৈচিত্র্য কাব্যকে সুন্দর করিয়া তোলে—এই কথা সত্য। যুদ্ধের বর্ণনায় কালিদাস যে কম নিপুণ ছিলেন, একথা বলিলে ভুল হইবে। কারণ রঘুবংশে রঘুপুত্র

অজের সঙ্গে অন্য রাজাদের যুদ্ধ বা কুমারসম্ভবে ৪টি সর্গে (১৪, ১৫, ১৬, ১৭) ২০৯টি শ্লোকে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের সঙ্গে তারকাসুরের যুদ্ধবর্ণনা সত্যই অদ্ভুত ভীতিপ্রদ।

ভবভূতি রাবণকে বীররূপে আঁকিয়াছেন, রাবণ প্রিয়তমা ভার্যা মন্দোদরীর সাবধানোক্তি উপেক্ষা করিয়াছেন, কারণ তিনি নিজের পৌরুষে সদা আস্থাবান ছিলেন। যিনি লোকপাল ঈশ্বরদের জয় করিয়া নিজের বশে রাখিয়াছিলেন, তিনি কি আর মানুষ-বানরকে গণ্য করিবেন! মন্দোদরী চাহেন স্বামীর মঙ্গল। সেইহেতু তিনি অত্যাশ্চর্যভাবে রামের সেতুবন্ধন হইতে আরম্ভ করিয়া সব কিছু বর্ণনা করিলেন, যাহাতে রাবণ যুদ্ধ হইতে বিরত হন। বালীপুত্র অঙ্গদ রামের দূতরূপে আসিয়া সীতাকে ফিরাইয়া দিতে অথবা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বলিল। 'বানরও বক্তা হইল'—রাবণের উপহাসোক্তি অঙ্গদকে ক্রোধোন্মত্ত করিয়া তুলিল। সে হুংকার দিয়া রামের নিকট প্রত্যাবর্তন করিল। শুরু হইল যুদ্ধ।

রাম-রাবণের যুদ্ধের তুলনা রাম-রাবণের যুদ্ধ। এই তুলনাহীন যুদ্ধের কাহিনী উপস্থাপনে ভবভূতির রচনাশৈলী অপূর্ব ও মৌলিক। তিনি নিজের মুখে কিছু না বলিয়া আকাশমার্গে একটি নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করিয়া গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ ও দেবরাজ ইন্দ্রের মধ্যে কথোপকথন সংযোজনা করিয়াছেন। ঠিক যেন ফুটবলখেলার ধারাবিবরণী। দেবরাজ ও গন্ধর্বরাজের কথোপকথনে ফুটিয়া উঠিয়াছে ঐ ভয়ঙ্কর যুদ্ধের একখানি নিখুঁত ছবি। ভবভূতির মনের ইচ্ছা—আমি কিছু জানি না; মানুষরাজ ও রাক্ষসরাজের যুদ্ধের সাক্ষী দেবরাজ ও গন্ধর্ব-রাজ। ঐ প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যেও ভবভূতি রাম-রাবণের মনে বাৎসল্যরস সিঞ্চিত করিয়াছেন। একদিকে রাম ও রাবণ সংগ্রামে মত্ত, অপরদিকে লক্ষ্মণ ও মেঘনাদ। একদিকে চলিয়াছে ঘোর বাণবৃষ্টি, কিন্তু তাহার ভিতরেও দুই স্নেহাস্পদের প্রতি রাম ও রাবণের ছুটিয়াছে স্নেহদৃষ্টি। ভবভূতি বেশ মজা করিয়া বলিয়াছেন, "মানুষে লোকে বাৎসল্যং নাম কেবলমখিলেন্দ্রিয়বশীকরণ-চূর্ণমুষ্টিঃ" অর্থাৎ মনুষ্যলোকে বাৎসল্যই সমস্ত ইন্দ্রিয় বশীকরণের চূর্ণমুষ্টিস্বরূপ। শক্তিশেলে মূর্ছিত লক্ষ্মণকে দেখিয়া রামের চিত্ত যুগপৎ করুণ- ও বীররসে পূর্ণ হইয়াছিল। চিত্ররথ বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "আহা, রঘুপুঙ্গবের কি বাৎসল্য-মহিমা! উনি অনুজের অবস্থা নিজ হৃদয়ে যেন প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভব করিতেছেন।" তারপর হনুমান মহৌষধি আনিয়া লক্ষ্মণকে বাঁচাইলেন।

Suspense বা সন্দেহজনিত উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করিতে ভবভূতি অদ্বিতীয়। নাটককে মনোরম করিতে উহার ব্যবহার সর্বজনস্বীকৃত। রাম-রাবণের যুদ্ধে ইন্দ্র ও চিত্ররথের একটির পর একটি উদ্বেগ-সৃষ্টি ও উহার নিরসন সত্যই মনোজ্ঞ। রাবণ-নিধনের পর কালিদাস সীতার অগ্নিপরীক্ষা দেখান নাই, ভবভূতি দেখাইয়াছেন। লঙ্কার ভয়াবহ ধ্বংসের বিবরণ কালিদাস দেন নাই, ভবভূতি দিয়াছেন।

এবার অযোধ্যায় ফিরিবার পালা। পুষ্পক বিমানে উঠিবার পূর্বে রঘুবংশের ভাষার ও নৈসর্গিক বর্ণনার একটু মূল্যায়ন করা দরকার। সমগ্র ত্রয়োদশ সর্গে (৭১টি শ্লোক) কালিদাস তাঁহার কবিত্বশক্তির চরম উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। বাল্মীকি-রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের ৩টি সর্গে (২৮, ২৯, ৩০) বর্ষা ও শরৎ ঋতুর বর্ণনা আছে। কালিদাস রঘুবংশে সংক্ষেপে ঋতু বর্ণনা করিয়াছেন। 'ঋতুসংহার' নামক ক্ষুদ্র

কাব্যগ্রন্থে তিনি ঋতুবর্ণনায় বিন্দুমাত্র ফাঁক রাখেন নাই। কালিদাসের নামে একটি অপবাদ আছে যে, তিনি সম্ভোগের কবি। এই কথা কিন্তু নিছক অপবাদ। পাঠক-সমাজে একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, প্রথমতঃ সংস্কৃত সাহিত্য, তাহার উপর কালিদাসের রচনা অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ঐ মত খণ্ডন করিয়াছেন। মল্লিনাথ কবি কালিদাসের কুমারসম্ভব, রঘুবংশ ও মেঘদূত—এই কাব্যত্রয়ের উপর সঞ্জীবনী ব্যাখ্যার প্রারম্ভে অবতরণিকা-শ্লোকে লিখিয়াছেন: "ভারতী কালিদাসস্য দুর্ব্যাখ্যাবিষমূর্ছিতা। এষা সঞ্জীবনী ব্যাখ্যা তামদ্যোজ্জীবয়িষ্যতি॥" অর্থাৎ কালিদাসের বাণী আজ দুর্ব্যাখ্যারূপ বিষক্রিয়ায় মূর্ছাগ্রস্ত; আমার এই সঞ্জীবনী ব্যাখ্যাই তাহাকে উজ্জীবিত করিবে।

রঘুবংশের ভাষা সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন: "কালিদাসের অন্য সকল কাব্যে ও নাটকে ভাষার যে-সকল দোষ দেখা যায়, রঘুবংশে সে-সকল দোষ দেখা যায় না। 'ঋতুসংহার' ও 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' অনেক সময় দূরান্বয় দেখা যায়। 'রঘুবংশে' সে দোষ একেবারে নাই। কঠিন ও অপ্রচলিত শব্দ রঘুবংশে নাই বলিলেও হয়। যে ভাষায় কথাবার্তা চলে না তাহার একটা দোষ—উহাতে লম্বা লম্বা সমাস আসিয়া জুটিয়া যায়। কালিদাসে কিন্তু সে দোষ বড় বেশী নাই। বাণভট্টে, ভবভূতিতে ও শঙ্করাচার্যে যেরূপ দেড়গজী ও দুগজী সমাস দেখা যায়, কালিদাসে সেরূপ একেবারেই নাই। সংস্কৃত ভাষা শিখিতে হইলে, আমার বোধহয়, কালিদাসই মডেল, তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'রঘুবংশ'ই মডেল।"

কালিদাস রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গের আরম্ভে লিখিয়াছেন; অনন্তর সর্বগুণসম্পন্ন নারায়ণের অংশসম্ভূত রঘুতিলক রামনামধারী হরি পুষ্পক-রথে আরোহণপূর্বক শব্দগুণশালী আকাশপথে যাত্রাকালে সাগর ও দূর হইতে ভারতভূমি দর্শন করিয়া সুমধুর বাক্যে প্রিয়তমা জানকীকে বলিতে লাগিলেন: "মৈথিলি, দেখ—'দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা। আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবন্ধেব কলঙ্করেখা॥'" অর্থাৎ দূর হইতে সূক্ষ্মরূপে প্রতীয়মান তমালবন ও তালীবনশ্রেণীতে নীলবর্ণ বেলাভূমি লৌহচক্রতুল্য লবণাম্বুরাশির ধারায় সংলগ্ন কলঙ্করেখার ন্যায় শোভা পাইতেছে।" আলোচ্যমান শ্লোকগুলি কাব্য-সৌন্দর্যে অতুলনীয়। মহাকবি অপূর্ব কৌশলে রামসীতার অপূর্ব প্রেমচিত্র ফুটাইয়াছেন; দুঃখময়, বিরহপূর্ণ অরণ্যবাসের স্মৃতিগুলিও আজ তাঁহাদের কাছে মনোরম। বেদনা ভালবাসাকে গাঢ় করিয়া তোলে। রামচন্দ্র কখনও রাক্ষসসঙ্কুল জনস্থান, কখনও সেই বনস্থলী যেখানে তিনি সীতার নূপুর পান, কখনও পম্পা সরোবর, গোদাবরীর তীর, বিভিন্ন তপস্বীদের আশ্রম ইত্যাদি প্রিয়তমা মহিষীকে দেখাইতে দেখাইতে সুখ-দুঃখের দিনগুলির উপর দিয়া ঝটিতি উড়িয়া গেলেন। পণ্ডিতপ্রবর শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "লঙ্কাদ্বীপ হইতে সারা ভারতবর্ষের—দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্যন্ত সারা দেশের—এমন বর্ণনা আর নাই। যত বড় বড় জিনিস, সব দেখান হইল। পুরাণ কথা সব বলা হইল। পুরাণ প্রেমের কাহিনী সব মনে করিয়া দেওয়া হইল। রাম দেখাইলেন, সীতা দেখিলেন; মাঝে মাঝে সীতার উপর রামের প্রেম উথলিয়া পড়িল। এই মিলনই মিলন, চরম মিলন, পরম মিলন।"

কাব্যে যাহা সম্ভব নাটকে তাহা সম্ভব নহে। কালিদাস রঘুবংশে রামকে দিয়া এক তরফা বলাইয়াছেন; কিন্তু মহাবীর-চরিতে ভবভূতি স্বতন্ত্র। নৈসর্গিক বর্ণনা যৎসামান্য। আকাশপথে যাত্রাকালে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ বিভীষণ, সুগ্রীব প্রভৃতি সকলেরই কথাবার্তা আছে। প্রথমে প্রশ্নকারী সীতা "অস্মাভিঃ সাম্প্রতং ক প্রস্থীয়তে?" অর্থাৎ আমাদের এখন কোথায় যাইতে হইবে? লক্ষ্মণ উত্তর দিলেন: "দেবি, রঘুকুলরাজধানীমযোধ্যাং প্রতি।" অর্থাৎ রঘুকুলের রাজধানী অযোধ্যায়। ভবভূতিতেও পুরাণ কথা, আশ্রমবর্ণনা, রামচন্দ্রের বিগত দিনের বীরত্বগাথা প্রভৃতি সব কিছুই আছে। কল্পনার অশ্ব ভবভূতিও ছুটাইয়াছেন। তিনি সেই আকাশ-বিমানকে উর্ধ্বে তুলিয়া অন্তরীক্ষলোক দেখাইয়াছেন, সেখানে দিবাভাগে নক্ষত্র দেখা যায়। অশ্বমুখী কিন্নর-মিথুন নামে অদ্ভুত জীবও দেখাইয়াছেন। তারপর মধুময় পূর্ব স্মৃতিগুলি রোমন্থন করিতে করিতে তাঁহারা অযোধ্যায় উপনীত হইলেন।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত, উহা বাল্মীকির রচনা নহে—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার বহু প্রমাণ আছে। শ্রীরাজশেখর বসু মহাশয় তাঁহার বাল্মীকি-রামায়ণের ভূমিকায় উহা সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। যুদ্ধকাণ্ডের পর রামায়ণ-মাহাত্ম্য বর্ণিত হওয়ায় মনে হয় সেখানেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি। তাহা ছাড়া বাল্মীকি সীতার উপর দুইবার নিষ্ঠুরতা করেন নাই। বসু মহাশয় বালকাণ্ড হইতে যুদ্ধকাণ্ড-রচয়িতাকে পূর্বকবি ও উত্তরকাণ্ডের রচয়িতাকে উত্তরকবি বলিয়া উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন: "পূর্বকবি অগ্নিপরীক্ষা করেই সীতাকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন; কিন্তু উত্তরকবি তাঁকে নির্বাসিত এবং পরিশেষে চিরবিচ্ছিন্ন করেছেন। এ কি নিষ্ঠুরতা, না উৎকট আদর্শপ্রীতি? আমার মনে হয় উত্তরকবির আদর্শ মহৎ। তিনি আপাত-নিষ্ঠুর উপায়ে রাম ও সীতার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। পূর্বকবি অগ্নিপরীক্ষার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা উত্তরকবির মনঃপূত হয়নি, তিনি নিজের আদর্শ অনুসারে পুনর্বার সীতার পরীক্ষা বিবৃত করেছেন। সীতার অগ্নিপরীক্ষা-বৃত্তান্ত বোধ হয় কালিদাসেরও ভাল লাগেনি, তিনি রঘুবংশে এক লাইনে একটু উল্লেখ করেছেন; কিন্তু নির্বাসন আর পাতালপ্রবেশের বিবরণ সবিস্তার দিয়েছেন। বিধবা রাক্ষসীদের শাপের ফলে রাম সীতাকে অশুভ নয়নে দেখেছিলেন, এ কথা লিখে কৃত্তিবাস রামের দোষ খণ্ডন করেছেন। তুলসীদাস অগ্নি-পরীক্ষার বিবরণ অতি সংক্ষেপে সেরেছেন এবং সীতার নির্বাসন ও পাতালপ্রবেশ একেবারে বাদ দিয়েছেন।" ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' মিলনান্ত। তিনি নির্বাসন দিয়া মিলন ঘটাইয়াছেন, কিন্তু সীতাকে পাতালপ্রবেশ করান নাই।

সমালোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। রাম-চরিতে কোথাও ঔচিত্য আর কোথায় অনৌচিত্য, উহা বিবৃত করাও অপ্রাসঙ্গিক। বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, তুলসীদাস, কৃত্তিবাস প্রভৃতি সাধককবিরা সুধামাখা রামকথা জনমানসে যুগ যুগ ধরিয়া ছড়াইয়া দিতেছেন; আর ভারতের আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ পর্যন্ত সকলেই শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে উহা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

আমরা আবার রঘুবংশে ফিরিয়া যাই। জন্মদুঃখিনী সীতার কথা বিবৃত করিতে গিয়া মনে হয় কালিদাস নিজেই কষ্ট পাইতেছেন।

লঙ্কা হইতে প্রত্যাগতা সীতা কৌশল্যা ও সুমিত্রার কাছে আত্মপরিচয় দিতেছেন, "ক্লেশাবহা ভর্তুরলক্ষণাহং সীতা।" অর্থাৎ পতির ক্লেশপ্রদা আমি সেই অলক্ষণা সীতা। প্রত্যুত্তরে শ্বশ্রূমাতাগণ বলিতেছেন: "উত্তিষ্ঠ বৎসে নমু সানুজোঽসৌ বৃত্তেন ভর্ত্তা শুচিনা তবৈব। কৃচ্ছ্রং মহৎ তীর্ণ ইতি প্রিয়ার্হং তামূচতুস্তে প্রিয়মপ্যমিথ্যা।" অর্থাৎ বৎসে, উঠ, উঠ। তোমারই চরিত্রের পবিত্রতা হেতুই রামলক্ষ্মণ মহৎ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন; এইরূপ প্রিয় অথচ সত্যবাক্যে পরম প্রেমাস্পদ বধূকে সান্ত্বনা করিলেন। সীতার কপালে কোন সুখই স্থায়ী হইল না প্রজারঞ্জক রাজা রামচন্দ্র ভদ্র নামক এক গুপ্তচর দ্বারা নগরীর খবর লইয়া জানিলেন যে, রাক্ষসগৃহে অবস্থিতির পর সীতাগ্রহণের জন্য তাঁহার নিন্দা হইতেছে। কালিদাস সত্যই লিখিয়াছেন, "যশোধনানাং হি যশো গরীয়ঃ।" আপন কীর্তি বাঁচাইতে গিয়া রামচন্দ্র গর্ভবতী কান্তাকে হারাইলেন। সমষ্টি প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যক্তিগত প্রেমপ্রীতির ডোর কাটিয়া ফেলিলেন। লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন সীতাকে বনবাসে রাখিয়া আসিবার জন্য। অনুজ লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আদেশ মন হইতে অনুমোদন করেন নাই; কিন্তু লোকশ্রুতি "আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া" অর্থাৎ গুরুজনের আজ্ঞা অবিচারণীয়—অনুসারে স্বীকৃত হইলেন। বাল্মীকির তপোবনে মূর্ছিতা সীতার নিকট হইতে লক্ষ্মণের বিদায় সত্যই মর্মন্তুদ। পৃথিবীতে এমন নিষ্ঠুর একটিও দেখা যাইবে না, যে রাজমহিষী উপরন্তু গর্ভবতী সীতার দুঃখে অশ্রু ফেলিবে না বা রামচন্দ্রের অন্যায় একবাক্যে স্বীকার করিবে না। কালিদাস এমন মরমী ভাষায় এই চিত্রটি আঁকিয়াছেন যে, স্থাবর জঙ্গম সর্বত্রই শোকের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে: "নৃত্যং ময়ূরাঃ কুসুমানি বৃক্ষা দর্ভানুপাত্তান্ বিজহুর্হরিণ্যঃ। তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখভাবমত্যন্তমাসীদ্রুদিতং বনেঽপি॥" অর্থাৎ সীতার দুঃখে দুঃখিত হইয়া ময়ূরগুলি পেখম গুটাইয়া নাচ থামাইল; কুসুমাকীর্ণ বৃক্ষগুলি হইতে কুসুম ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; হরিণগুলি মুখে কচি ঘাস ধরিয়াই ছাড়িয়া দিল; আহা! সীতার দুঃখে বনভূমিও কাঁদিতে লাগিল! সে ক্রন্দন পৌঁছাইল দয়াশীল মুনি বাল্মীকির কর্ণে। তিনি সীতাকে অভয় দিয়া আশ্রয় দিলেন। কালিদাস রামের অবস্থা-বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "কৌলীন্যভীতেন গৃহান্নিরস্তা ন তেন বিদেহসুতা মনস্তঃ।" অর্থাৎ লোকাপবাদভয়ে রাম মৈথিলীকে গৃহ হইতে নির্বাসিত করেন, কিন্তু হৃদয় হইতে দূরীভূত করিতে পারেন নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে ঃ ধর্মদাস লাহা

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

লীলাবার্তা

[গদাধরের উপনয়নে ধর্মদাস]

গদাধরের উপনয়ন লীলায়ও শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার ভূমিকা স্মরণযোগ্য। ধনী কামারনীর নিকট হতে গদাধরের ভিক্ষাগ্রহণ বিষয়ে জ্যেষ্ঠ অগ্রজ শ্রীরামকুমার ছিলেন ঘোর বিরোধী।

'ব্রাহ্মণ ব্যতীত ভিক্ষা অন্য কোন জাতি।
না দেওয়ার সেই বংশে কুলোচিত রীতি॥'

—পুঁথি

সুতরাং ঐ বিষয়ে তিনি প্রবল আপত্তি জানালে এক বিষম সমস্যার সৃষ্টি হয়। এদিকে গদাধরও তার প্রতিশ্রুতি-পালনে বদ্ধপরিকর। ফলে, উভয় পক্ষের সমান জেদে উপনয়ন-অনুষ্ঠানের সমুদয় ব্যবস্থা ও আয়োজন প্রায় পণ্ড হতে বসে।

শ্রীমতী ধনী কামারনীর আকুল প্রার্থনায় একদা গদাধর তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, উপনয়নকালে সে তাঁর নিকট হতে ভিক্ষাগ্রহণ করে তাঁকেই 'ভিক্ষামাতা' করবে। কিন্তু এরূপ আচরণ তাদের বংশপরম্পরাগত কুলরীতির পরিপন্থী। তাই রামকুমার তাঁদের বংশের চিরাগত কুলাচার ও নিষ্ঠা ভঙ্গ করতে কোনক্রমেই সম্মত নন। অথচ গদাধরও তার সত্যরক্ষার জন্য কৃতসঙ্কল্প।

'হেথায় গদাই কন, ধনী কামারিনী।
ভিক্ষা যদি দেয় তবে ভিক্ষা লব আমি॥
কখন লব না ভিক্ষা অপরের হাতে।
না হয় না হবে পৈতা ক্ষতি নাই তাতে॥'

—পুঁথি

অবশেষে, সে ঘরে খিল দিয়ে অনাহারে সারাদিন আবদ্ধ থাকে। এদিকে তার উপনয়নের নির্ধারিত দিন সমুপস্থিতপ্রায়। অনুষ্ঠানের সমুদয় আয়োজনও প্রস্তুত। অথচ কোন পক্ষই নিজ মত-পরিবর্তনে সম্মত নন। এরূপ অবস্থায় স্বভাবতই স্বজনবর্গ এবং প্রতিবেশিগণ বিশেষ চিন্তান্বিত ও বিচলিত হন।

যাহোক, ঐ সংবাদ ক্রমশঃ ধর্মদাস লাহার কর্ণগোচর হয়। ঐ বিষয়ের মীমাংসার জন্য তখন তিনি স্বয়ং অগ্রসর হন। তিনি বালক গদাধরকে বুঝানোর জন্য কোনরূপ চেষ্টা করতে ভরসা পান না। কারণ তিনি জানতেন যে, সে আশৈশব সত্যাশ্রয়ী। সুতরাং তার সঙ্কল্প হতে তাকে কোনক্রমেই বিচ্যুত করা সম্ভবপর হবে না। তাই তিনি রামকুমার ও রামেশ্বরকে ঐ বিষয়ে নানাভাবে বুঝান। প্রসঙ্গতঃ তিনি তাঁদের বলেন যে, ব্রাহ্মণেতর বর্ণের নিকট হতে ভিক্ষাগ্রহণ তাঁদের চিরাচরিত কুলরীতির বিরোধী, সন্দেহ নাই। তবে অন্যত্র বহু সদ্ব্রাহ্মণ-পরিবারে ঐরূপ প্রথা প্রচলিত রয়েছে। সুতরাং গদাধর ধনী কামারনীর নিকট হতে ভিক্ষা গ্রহণ ক'রলে, তাঁদের নিন্দাভাজন হবার কোনও আশঙ্কা নাই। অতএব এক্ষেত্রে বালকের সন্তোষ ও শান্তির জন্য, সর্বোপরি তার সত্যরক্ষার জন্য, ঐরূপ করা মনে হয় কখনই দূষণীয় হবে না।

শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহাকে রামকুমার ও রামেশ্বর সর্বদাই মান্য করতেন। যাহোক, পিতৃসুহৃদের ঐরূপ পরামর্শে ও উপদেশে

অবশেষে তাঁরা নিজেদের জেদ পরিবর্তন করেন এবং গদাধরকে ঐ বিষয়ে সম্মতি দেন। তাঁদের এই ব্যবস্থায় লাহাবাবু পরম সন্তুষ্ট হন। অতঃপর নির্ধারিত দিনে গদাধরের শুভ উপনয়ন-অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয় এবং যথাসময়ে গদাধর ধাত্রীমাতা ধনী কামারনীর নিকট হতে ভিক্ষা গ্রহণ ক'রে নিজ প্রতিশ্রুতি পালন করে।

[লাহাভবনে পণ্ডিতসভায় গদাধর]

লাহাপরিবারের কারও শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে একবার লাহাভবনে বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সমাগম হয়। একত্র সম্মিলিত হয়ে পরস্পর তাঁরা শাস্ত্রীয় বিচার ও বিতর্কাদি আরম্ভ করেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁরা কোন এক দুরূহ বিষয়ের অবতারণা করে তার বিচার ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। পরস্পর বহু আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পরও তাঁরা ঐ বিষয়ের স্থির মীমাংসায় উপনীত হতে পারেন না। অবশেষে সভায় তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা ও হইচই শুরু হয়। হট্টগোল শুনে আশে-পাশে যে যেখানে ছিল, কৌতূহলবশে সকলেই সেখানে উপস্থিত হয়।

'সঙ্গী সনে রঙ্গ করি শিশু গদাধর।
উপনীত হইলেন সভার ভিতর॥'—পুঁথি

গদাধর সহচরদের সঙ্গে খেলা-ধুলায় অন্যত্র মত্ত ছিল। পণ্ডিতদের হইচই শুনে বন্ধুদের সঙ্গে সেও সেখানে ছুটে আসে এবং তাড়াতাড়ি তাঁদের সভার মধ্যে প্রবেশ করে। তাঁদের বিতর্ক শুনে, উপস্থিত বুদ্ধিবলে সে সহজেই ঐ বিষয়ের মীমাংসার সূত্র খুঁজে পায়। তখন সে অতি চমৎকার উপমা সহায়ে অকাট্য যুক্তি দ্বারা অনায়াসেই ঐ বিষয়টির মীমাংসা ক'রে দেয়। তার বয়স তখন মাত্র দশ বছর। ঐ বয়সে তার অনন্যসাধারণ জ্ঞান ও অত্যাশ্চর্য প্রতিভা দেখে সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলী ও উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের বিস্ময় ও আনন্দের অবধি থাকে না।

'যেসব পণ্ডিত শাস্ত্রে আগুয়ান দূর।
কহে আছে দৈবশক্তি নিশ্চয় শিশুর॥'

—পুঁথি

সমবেত সকলকেই সে পরম চমৎকৃত করে। তার সিদ্ধান্তে উপস্থিত পণ্ডিতবর্গ সকলেই একমত হন এবং তার উচ্চ প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠেন। অদ্ভুত প্রতিভাধর এই বালক মহাত্মা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র—তার এই পরিচয় জেনে তাঁরা পরম আহ্লাদিত হন এবং হৃষ্টচিত্তে তাকে অজস্র আশীর্বাদ করেন।

'গ্রামবাসিমধ্যে কথা রাষ্ট্র হয় পরে।
পণ্ডিতমণ্ডলী আজি পরাস্ত বিচারে॥
গদাইর কাছে হৈল সবে পরাজয়।
কি আশ্চর্য কি আশ্চর্য সকলেতে কয়॥'

—পুঁথি

[গদাধরের বিবাহে ধর্মদাস]

গদাধরের বিবাহকালে ধর্মদাস লাহা জীবিত ছিলেন। সে সময় তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ। বিবাহের পর বালিকাবধূ সারদা কামারপুকুরে শ্বশুরালয়ে আগমন করে। ঐসময় একদিন সকালে লাহাবাবু তাকে বাড়ির পিছনে খেজুর কুড়াতে দেখেন। তিনি অনুমানে বুঝতে পারলেও ঐ বালিকাই নববধূ কি না, তা সঠিকভাবে জানার জন্য আগ্রহভরে শ্রীমতী চন্দ্রাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। চন্দ্রমণির উত্তরে তিনি স্বীয় অনুমানের যথার্থ সমর্থন লাভ করে পরম আহ্লাদিত হন। অতঃপর একান্ত হৃষ্টচিত্তে তিনি সারদার উদ্দেশে স্বীয় অন্তরের অশেষ শুভ কামনা জ্ঞাপন করেন।

লাহাগিন্নীর ভূমিকা

শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার ভক্তিমতী পত্নী শ্রীরামকৃষ্ণলীলা-বৃত্তান্তে 'লাহাগিন্নী' নামে পরিচিতা। এই পুণ্যশীলা রমণীর নাম জানা যায় না। তিনি অতিশয় সরলা, দয়াবতী, ধর্মশীলা ও দেবদ্বিজপরায়ণা ছিলেন। তাঁর সুমধুর প্রকৃতি ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য প্রতিবেশিনীরা তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখতেন। তিনি ছিলেন চন্দ্রমণি দেবীর অন্তরঙ্গ বয়স্যা এবং তাঁরই প্রায় সমবয়স্কা। চাটুয্যে পরিবারের সঙ্গে তাঁর নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ও মধুর প্রেম-সম্বন্ধ দেখা যায়। তাঁর পুত্র ও কন্যাগণের মধ্যে কেবল প্রসন্নময়ী ও গয়াবিষ্ণুর নাম উল্লেখিত রয়েছে। আর অপর কারও নাম বা বৃত্তান্ত জানা যায় না। প্রসন্নময়ী ছিলেন সম্ভবতঃ কাত্যায়নী দেবীর সমবয়স্কা আর গয়াবিষ্ণু ছিল গদাধরের সমবয়সী।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শৈশব- ও বাল্যলীলাকাণ্ডে লাহাগিন্নীর ভূমিকা স্মরণীয়। গদাধরের শুভ আবির্ভাব-লগ্নে চাটুয্যে কুটীরে এই পূতস্বভাবা রমণীকে উপস্থিত দেখা যায়। সুতরাং ঐ দেবশিশু ভূমিষ্ঠ হবার অব্যবহিত পরে যে দু-চার জন প্রতিবেশিনী তাকে সূতিকাগারে প্রথম দর্শন করেছিলেন, তিনি সেই মহাভাগ্যবতী-গণেরও অন্যতমা।

গদাধরের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ অপত্য-স্নেহ ও প্রগাঢ় বাৎসল্যপ্রীতি। তিনি তাকে পুত্রাধিক স্নেহযত্ন ও আদর-আপ্যায়ন করতেন। গদাধর ছিল তাঁর পুত্র গয়াবিষ্ণুর একান্ত অন্তরঙ্গ সহচর ও স্যাঙাত। এই সূত্রে সে ছিল তাঁর 'ধর্মপুত্র'। এজন্যেও তিনি তাকে সর্বদাই গভীর মমতা ও প্রীতির চক্ষে দেখতেন। তার শৈশবে ও বাল্যে তিনি তাকে বহু কোলে পিঠেও ধারণ করেছিলেন এবং তার লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণে চন্দ্রাদেবীকেও তিনি সক্রিয়ভাবে বহু সাহায্য করেছিলেন।

'পুত্রনির্বিশেষে বাসে লাহার গৃহিণী।
কতই গদাই কন না যায় বাখানি ॥
যত্নে পোষা কত গাই দুধ দেয় কত।
নানাবিধ দুগ্ধদ্রব্য ঘরে জনমিত ॥
খাওয়াতেন গদাধরে পরম যতনে।
গদাই কতই কন শুনিতেন কানে ॥'—পুঁথি

সখা গয়াবিষ্ণুর টানে গদাধর অতি শৈশব-কাল হতেই লাহাভবনের অন্তঃপুরে ঘনঘন গতায়াত শুরু করে। তার আগমনে লাহাগিন্নীর অন্তরে স্বভাবতই গভীর প্রীতির সঞ্চার হত। তিনি তার জন্যে প্রত্যহ ক্ষীর-সর, নাড়ু-ননী প্রভৃতি সযত্নে তুলে রাখতেন। সে উপস্থিত হলে তিনি বিশেষ আদর সহকারে ঐগুলি তাকে উপহার দিতেন। তাকে কোলে নিয়ে তিনি কত আদর স্নেহ করতেন এবং নিজ হাতে তাকে ঐ সকল মিষ্টান্ন খাইয়েও দিতেন। তার মধুর ভোজনে রঙ্গ দেখে তিনি অপার আনন্দ লাভ করতেন। কখন কখন তিনি মনোহর বেশ-ভূষা করে তাকে সাজিয়েও দিতেন। সে তাঁদের অন্তঃপুরে সখা গয়াবিষ্ণুর সঙ্গে কত মধুর খেলা-ধূলা ও আমোদ-আহ্লাদ করে বেড়াত।—'সসঙ্গী কানাই যেন নন্দের অঙ্গনে।' তিনি নির্নিমেষ নয়নে ঐ মনোহর দৃশ্য দেখতেন এবং অপার সুখোল্লাসে আত্মহারা হয়ে পড়তেন।

কোন কোন দিন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গদাধর লাহাভবনে উপস্থিত না হলে তিনি তার জন্যে অতিশয় উৎকণ্ঠিতা ও ব্যাকুলা হয়ে পড়তেন। অবশেষে তিনি ঐ সকল মিষ্টান্ন সামগ্রী নিয়ে তার সন্ধানে নিজেই চাটুয্যে কুটীরে উপনীতা হতেন, তথায় গদাধরের

সাক্ষাৎ পেলে ঐগুলি পরম সমাদরে তিনি তাকে উপহার দিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তার সাক্ষাৎ না পেলে তিনি ঐগুলি তাকে দেওয়ার জন্য বয়স্যা চন্দ্রার নিকট রেখে আসতেন। আবার কোন কোন দিন বিশেষ অসুবিধা-বশতঃ নিজে অসমর্থা হলে তিনি ঐগুলি গদাধরকে উপহার দেওয়ার জন্য প্রসন্নময়ী প্রভৃতির হাত দিয়েও চাটুয্যে কুটীরে পাঠিয়ে দিতেন।

গদাধরের শুভ বিবাহ-উৎসবে নববধূ সারদাকে সাজানোর জন্য চন্দ্রাদেবী লাহাগিন্নীর নিকট হতে কতকগুলি অলঙ্কার চেয়ে আনেন। বালিকা-বধূকে ঐসকল অলঙ্কার পরিয়ে সাজানো হয়। গহনাগুলি তার অঙ্গে বেশ মানায় এবং তার সুকোমল অঙ্গের শোভাও বৃদ্ধি করে অনেকখানি। যা হোক, গা-ভরতি সুন্দর সুন্দর গহনা পরে সারদা পরম আহ্লাদিতা হয় এবং মনের আনন্দে কদিন বেশ সেজে থাকে। অতঃপর তার পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তনের দিন আসন্নপ্রায় হলে চন্দ্রাদেবী কিছুটা দুর্ভাবনায় পড়েন। কারণ গহনাগুলি তার পূর্বেই লাহাগিন্নীকে ফেরত দেওয়া দরকার। কিন্তু বালিকা-বধূর অঙ্গ হতে ঐগুলি কোন্ প্রাণে তিনি খুলবেন! যা হোক, জননীর মনোভাব বুঝতে পেরে গদাধর রাত্রিকালে নিদ্রিতা বধূর অঙ্গ হতে অতি সন্তর্পণে ঐ গহনাগুলি খুলে নেন এবং লাহাগিন্নীকে ফেরত দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি জননীর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেন। যাহোক বালিকা-বধূর মনে কষ্ট হবে ভেবে লাহাগিন্নী ঐগুলি ফেরত নিতে সম্মতা হন না। কিন্তু চন্দ্রাদেবী তাঁকে অনেক করে বুঝিয়ে এবং বিশেষ পীড়াপীড়ি করে ঐগুলি তাঁকে ফেরত দিয়ে আসেন।

গয়াবিষ্ণুর ভূমিকা

'অখিলের নাথ যিনি জগতের পিতা।
সঙ্গে তাঁর গয়াবিষ্ণু করিল মিত্রতা॥'
—পুঁথি

শ্রীরামকৃষ্ণের আদ্যলীলা-কাণ্ডে ধর্মদাস-পুত্র গয়াবিষ্ণুর ভূমিকাও বিশেষ স্মরণীয়। নবযুগাবতারের বাল্যলীলা-বৃত্তান্তে কামার-পুকুরের যে-সকল শিশু ও বালককে তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ সহচররূপে চিহ্নিত দেখা যায়, গয়াবিষ্ণু লাহা তাদেরই বিশিষ্টতম। সে ছিল গদাধরের সমবয়সী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। অতি শৈশবকাল হ'তেই তাদের উভয়ের মধ্যে নিবিড় সৌহার্দ্য ও মধুর সখ্য-সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। তারা উভয়েই উভয়কে গভীরভাবে ভালবাসত এবং সর্বদাই একসঙ্গে থাকত ও একত্র খেলা-ধূলা ক'রত। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের উভয়ের হৃদ্যতা এবং সম্প্রীতিও নিবিড়তর হয়ে ওঠে। অতঃপর তারা উভয়ে পাঠাভ্যাস এবং আহার-বিহারাদিও একত্র করতে থাকে। বস্তুতঃ তারা উভয়েই উভয়ের প্রতি এরূপ অনুরক্ত হয়ে ওঠে যে, স্বল্পকালও পরস্পর ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকতে পারত না। কদাচিৎ ঐরূপ ঘটলে উভয়েই বিষম বিরহ-বেদনায় কাতর হয়ে পড়ত।

গদাধর ও গয়াবিষ্ণুর আশৈশব ঐরূপ অদ্ভুত অন্তরঙ্গতা প্রতিবেশিগণের বিমুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং ধর্মদাস লাহাও বালকদ্বয়ের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ও অপূর্ব সম্প্রীতি লক্ষ্য ক'রে পরম আহ্লাদিত হয়েছিলেন। অবশেষে ধর্মদাস লাহা শুভদিনে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান ক'রে তাদের উভয়ের 'স্যাঙাত'-সম্বন্ধ পাতিয়ে দেন। ঐবিষয়ে সুহৃদ ধর্মদাসকে ক্ষুদিরামও আন্তরিক উৎসাহ দান করেন। যাহোক, ঐ মধুর সম্বন্ধ-

স্থাপনের পর গদাধর ও গয়াবিষ্ণু উভয়েই উভয়কে স্যাঙাত সম্ভাষণ করত।

'কর্তৃপক্ষ উভয়ের পিরীতি দেখিয়ে।
দিয়াছিলা পরস্পরে সেঙ্গাত পাতায়ে॥
সেঙ্গাতের নামান্তর সখা কই যারে।
কি সৌভাগ্য গয়াবিষ্ণু সখা পায় কারে॥
—পুঁথি

গয়াবিষ্ণুকে ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রমণি পুত্রবৎ স্নেহ-আদর ক'রতেন। গয়াবিষ্ণু গদাধরের সহপাঠীও ছিল। লাহাবাবুর পাঠশালায় তারা উভয়ে একই শ্রেণীতে পড়ত। তাদের উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা দেখে শিক্ষক মহাশয়ও চমৎকৃত হন। পাঠাভ্যাসের পর তারা উভয়ে পাঠশালার সন্নিকটে শ্রীরাম মল্লিক, গঙ্গাবিষ্ণু লাহা প্রভৃতি সমবয়সী ও সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে বিচিত্র খেলাধুলা, হাস্য-কৌতুক ও রঙ্গ-অভিনয়ে মত্ত হত। গ্রামে অথবা নিকটের কোন পল্লীতে যেখানে যাত্রা, পাঁচালী, কথকতা, পুরাণপাঠ, সংকীর্তন ও পার্বণ-উৎসবাদি হত, সেখানে গদাধর ও গয়াবিষ্ণু একত্র গমন করত। পথে-ঘাটে-মাঠে, মাণিকরাজার আমবাগানে, লাহাবাবুর অতিথিশালায়, রাখাল বালকদের সঙ্গে গোচারণে, প্রতিবেশিগণের গৃহে—সর্বত্র তাদের উভয়কে একসঙ্গে উপস্থিত দেখা যায়। বৃন্দার মা, ধনী কামারনী, শঙ্করী প্রমুখ প্রতিবেশিনীরা গদাধরকে মিষ্টান্ন নাড়ু প্রভৃতি উপহার দিলে অথবা অতিথিশালায় সাধু-বৈষ্ণবেরা তাকে ঠাকুর-প্রসাদ প্রদান করলে, সে গয়াবিষ্ণুকে ভাগ দিয়ে তবে ভোজন করত।

বিভিন্ন স্থানে যাত্রা-অভিনয় প্রভৃতি শুনে গদাধর বড় বড় পালা কণ্ঠস্থ ক'রে ফেলে এবং অভিনেতাদের ভঙ্গিমাগুলিও হুবহু আয়ত্ত ক'রে নেয়। অতঃপর সে বিভিন্ন পালার গানগুলি অবিকল গেয়ে এবং দৃশ্যগুলির নিখুঁত অভিনয় দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত ক'রে দেয়। যাহোক, সঙ্গীতে ও অভিনয়ে তার অসাধারণ দক্ষতা দেখে গয়াবিষ্ণু, গঙ্গাবিষ্ণু, শ্রীরাম মল্লিক প্রমুখ বয়স্যগণ তাকে 'অধিকারী' ক'রে একটি সৌখীন যাত্রার দল গড়ে তোলে। বৃদ্ধ চিনু শাঁখারীও তাদের ঐ দলভুক্ত হন।

'চিনিবাস বড় চিনে গদাই শিশুকে।
না রহে গদাই যেথা চিনু নাহি থাকে॥'
—পুঁথি

তাদের অভিনয়-শিক্ষার স্থান নির্ধারিত হয় মাণিক রাজার আমবাগান। দলের সকলের আগ্রহে গদাধরকেই অভিনয়-শিক্ষা-দানের ভার গ্রহণ করতে হয়। পাঠশালে বিদ্যাভ্যাসের পর প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে তারা সেখানে মিলিত হয়ে অভিনয়-শিক্ষা আরম্ভ করে। গদাধরের অভিনব শিক্ষায় তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিজ নিজ ভূমিকার সমস্ত পাঠ ও গান মুখস্থ ক'রে ফেলে এবং অভিনয়ের ভাব-ভঙ্গিমাগুলিও সুন্দরভাবে আয়ত্ত ক'রে নেয়! পালাগুলির প্রধান প্রধান চরিত্রের ভূমিকাসকল গদাধরকেই গ্রহণ ক'রতে হয়।

অতঃপর প্রতিদিন শ্রীরামচন্দ্র- ও শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক লীলাভিনয়ে তারা ঐ আম্রকানন মুখরিত ক'রে তোলে। তাদের যাত্রাভিনয়ের সংবাদ অচিরে শিক্ষক মহাশয়ের কর্ণগোচর হয় এবং গ্রামবাসিগণও তা শুনতে পান। অবশেষে শিক্ষক মহাশয়ের আগ্রহে পাঠশালেও তাদের দলের অভিনয় আরম্ভ হয়। তারা পাঠশালাও মাতিয়ে তোলে! গ্রামবাসীরাও অনেকে ছুটে আসেন। তাদের অভিনয় শিক্ষক মহাশয় এবং উপস্থিত অন্যান্য সকলকেই

পরম চমৎকৃত করে। সকলেই গদাধরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। যাহোক, ঐ যাত্রার দলগঠনে গয়াবিষ্ণু এবং গঙ্গাবিষ্ণুরই উৎসাহ অধিকতর দেখা যায়।

জ্যেষ্ঠ অগ্রজ শ্রীরামকুমারের সঙ্গে কলকাতা যাত্রার সময় গদাধর গয়াবিষ্ণুপ্রমুখ প্রিয় বন্ধুদের ছেড়ে আসতে বিশেষ ব্যথিত হন। তাঁর উক্ত বয়স্যগণও তাঁর জন্য বিষম বেদনা অনুভব করেন। কলকাতায় এসেও তাকে তাঁদের জন্য ব্যাকুল দেখা যায়। অতঃপর তিনি যখনই কামারপুকুরে ফিরে গিয়েছেন, তখনই তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরম প্রীতি লাভ করেছেন। গয়াবিষ্ণু প্রভৃতিও তাঁদের প্রাণাধিক প্রিয় সখাকে পেয়ে যারপরনাই উল্লসিত হয়েছেন। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সেই মধুর সখ্য-সম্বন্ধ তখনও অক্ষুণ্ণ দেখা যায়।

সাধকোত্তর জীবনেও শ্রীরামকৃষ্ণ গয়াবিষ্ণু, শ্রীরাম মল্লিক প্রমুখ বাল্য সহচরদের কথা ভোলেননি। তিনি যখনই কামারপুকুরে ফিরে গিয়েছেন, তখনই তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তাঁরা তখনও শৈশবের সেই সারল্য ও প্রাণখোলা অমায়িক ভাবটি লক্ষ্য ক'রে বিমুগ্ধ রয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে কিন্তু তাঁদের জীবনধারায় আমূল পরিবর্তন তথা ঘোর সংসার-আসক্তির নগ্ন প্রকাশ দেখে বিশেষ ব্যথিত হতে দেখা যায়।

যাহোক, গয়াবিষ্ণু ও শ্রীরাম মল্লিক দক্ষিণেশ্বরেও শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে একাধিক বার মিলিত হয়েছেন। তাঁদের আগমনে তিনিও পরম আহ্লাদিত হয়েছেন এবং তাঁদের যথেষ্ট সমাদর ও যত্ন-আপ্যায়ন করেছেন। তাঁর টানে দক্ষিণেশ্বরে তাঁরা কয়েকবার কদিন বাসও করেছেন।

গয়াবিষ্ণু লাহার কথা

'নাম গয়াবিষ্ণু লাহা তামলির জাত।
যেই বংশে গয়াবিষ্ণু প্রভুর সেঙ্গাত॥
বড় মানে গঙ্গাবিষ্ণু প্রভু গদাধরে।
শ্রীপদে বিশ্বাস তাঁর অটল অন্তরে॥'—পুঁথি

শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলামঞ্চে গঙ্গাবিষ্ণু লাহা একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। সে ছিল গদাধরের প্রায় সমবয়সী এবং তার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সহচরদের অন্যতম। পাঠশালে সে গদাধরের সহপাঠীও ছিল। প্রধানতঃ তারই উৎসাহে গদাধর গয়াবিষ্ণুপ্রমুখ বন্ধুদের নিয়ে যাত্রার দল গড়েছিল। ঐ দলে গঙ্গাবিষ্ণু কেবল অভিনয়ই নয়, প্রধান বেশকারেরও কাজ করত।

গঙ্গাবিষ্ণু ছিল কামরপুকুরের লাহাবাবুদেরই বংশের সন্তান। সে সম্ভবতঃ ধর্মদাস লাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। যাহোক, গদাধরের সহিত সম্পর্কিত তার কিছু কিছু বৃত্তান্ত প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা হয়েছে। তার বিষয়ে অতিরিক্ত আর একটিমাত্র বিবরণী পাওয়া যায়।

সাধনপর্ব সমাপন ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ যেবার ভাগিনেয় হৃদয়রামসহ কামারপুকুরে প্রত্যাবর্তন করেন, সেবার গঙ্গাবিষ্ণুর পুত্রের প্রাণসংশয়-পীড়া হয়। ঐ বালককে মরণাপন্ন দেখে গঙ্গাবিষ্ণু ও তার পরিবারস্থ অন্যান্য সকলে স্বভাবতই নিদারুণ বিচলিত হয়ে পড়েন। বিশেষজ্ঞ বৈদ্যগণের আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বালকের আরোগ্যের কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না। বরং তার অবস্থার দিন দিন শোচনীয় অবনতিই ঘটতে থাকে। অবশেষে চিকিৎসকগণও তার আরোগ্যবিষয়ে নিতান্তই হতাশ হয়ে পড়েন এবং জবাব দেন।

'সকলেই বিজ্ঞতম কেহ নহে কম।
কেহ না করিতে পারে কিছু উপশম॥

বিফল কৌশল যত সমস্ত নিদান।
পুত্র হেতু গঙ্গাবিষ্ণু আকুল পরাণ॥
পরাণ সমান পুত্র প্রায় যায় ছেড়ে।
কভু ভূমে গড়াগড়ি কভু মাথা খুঁড়ে॥'-পুঁথি

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত শৈশবে ও বাল্যে গঙ্গাবিষ্ণুর নিবিড় সখ্যভাব থাকলেও তাঁর অপ্রাকৃত ঐশ্বর্যময় দেবভাবের পরিচয় তিনি অবগত ছিলেন। এ-জন্য তার প্রতি গঙ্গাবিষ্ণুর অগাধ বিশ্বাস ও অচলা ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখা যায়। কিছুতেই বালকের প্রাণরক্ষার কোন কূল-কিনারা না পেয়ে তিনি অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন এবং তাঁর নিকট তার প্রাণভিক্ষা করেন। তাঁর তীব্র কাতরতা ও ব্যাকুলতা দেখে পরম কারুণিক শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। ভাবের প্রচণ্ড আবেশে তাঁর সর্বাঙ্গ টলতে থাকে। ঐ আবেশের ভরে তিনি বারংবার ঢলে ঢলে পড়তে থাকেন এবং পরিশেষে আর্তনাদপূর্বক ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন আরম্ভ করেন। অতঃপর তিনি ধীরে ধীরে অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হয়ে বাষ্পবিজড়িত কণ্ঠে করুণাভরে গঙ্গাবিষ্ণুকে অশেষ আশীর্বাদ করেন।

'বলিলেন, নাহি দিবে বালকে ঔষধি।
মায়ের কৃপায় হবে উপশম ব্যাধি॥'—পুঁথি

অতঃপর গঙ্গাবিষ্ণু তাঁর কথায় পূর্ণ বিশ্বাস ও একান্ত নির্ভর করে সমস্ত ঔষধ ও বড়ি পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করেন এবং বালকের চিকিৎসাদি একেবারে বন্ধ ক'রে দেন। কি আশ্চর্য, তারপর মাত্র তিন দিনের মধ্যেই তাঁর সেই মরণাপন্ন পুত্র আরোগ্য লাভ করে।

উপসংহার—

অবতারপুরুষগণের দিব্য লীলাবিলাসে অংশগ্রহণকারিগণ সকলেই পরম ভাগ্যবান। এঁরা মহিমময় পুরুষগণের ভাগবতী লীলার মহিমা-বিকাশের আধার ও সহায়ক। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আত্মলীলা-মাহাত্ম্যবর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহা এবং তাঁর পরিবারবর্গ-সম্পর্কিত যেসকল খণ্ড খণ্ড বিবরণী 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে ইতস্ততঃ লিপিবদ্ধ রয়েছে, বর্তমান প্রবন্ধে মাত্র সেইগুলিই সংগ্রথিত হয়েছে।

"তাঁর (স্বামীজীর) মতে ভারতের আশার উৎস তার নিজের মধ্যে, বিদেশে কদাপি নয়।…ভারতের যৌবনকামনা আধুনিক সভ্যতার বিলাসদ্রব্য নিয়ে কিছু নাড়াচাড়া করতে পারে, সে অধিকার নিশ্চয় তার আছে—কিন্তু প্রত্যাবর্তন সে কি করবে না? করবেই, কারণ তার প্রাণের গভীরে আছে নীতি, তপস্যা আর আধ্যাত্মিকতা।"

—ভগিনী নিবেদিতা

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সাময়িক পত্র

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

দুই

প্রবুদ্ধ ভারতের দুই পর্ব

॥ ১ ॥

স্বামীজীর মাদ্রাজী ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে আলাসিঙ্গা ছাড়া আর দুটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, একজন হলেন সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়ার, অন্যজন ডাঃ ননজুণ্ডা রাও। বিজ্ঞানের অধ্যাপক নাস্তিক সিঙ্গারাভেলু স্বামীজীর স্পর্শে কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছিলেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী ডাঃ ননজুণ্ডা রাও—

"শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের সমুদ্রতীরের বাড়ি; অপরূপ চন্দ্রালোকিত রাত্রি; স্বামীজী সর্বোত্তম ভাবাবেশে আছেন। তাঁর মুখ সত্যই প্রদীপ্ত—সুস্মিত সৌম্য দেহ থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হয়ে তাঁর চারপাশে যেন জ্যোতির্বলয় সৃষ্টি করেছে। একটু আগেই গান গাইছিলেন যা প্রাণের ভিতরকে পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়েছে।··· মহামায়ার কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের সুমহান সঙ্গীত। ভাববিহ্বল কণ্ঠে গানটি একটু একটু করে অনুবাদ করে শোনাচ্ছিলেন। সেই স্মরণীয় সন্ধ্যায় সেখানে সমবেত সকলে নিঃশ্বাস রোধ করে সেই গান শুনছিল। গান শেষ হলে অসীম স্তব্ধতা, যা সভয় সম্ভ্রমে অভিভূত করে দিয়েছিল। স্বামীজী আবার যখন কথা আরম্ভ করলেন, তখনই নীরবতা ভাঙল। তিনি বললেন, কখনো-কখনো কিভাবে তাঁর উপর শক্তি ভর করে, তখন তিনি একেবারে বদলে যান, সেই সময়ে যারা তাঁর সংস্পর্শে আসে তাদের জীবন কিভাবে বদলে দেন। তিনি বলে চললেন, ঐ সব সময়ে তাঁর মনে হয়, একটা বিরাট শক্তি তাঁর দেহের অণুপরমাণুর মধ্যে শিহরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে—প্রভাবিত করে সব কিছু; যদি তখন কেউ তাঁকে স্পর্শ করে, তার সমাধির অনুভূতি লাভ হয়, চির রহস্যের দ্বার তার কাছে খুলে যায়, পার্থিব আকর্ষণ ছিন্ন হয়ে যায়, সহস্র বর্ষের সাধনার ফল সে এক মুহূর্তে লাভ করে। স্বামীজী যেই কথা শেষ করেছেন, শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন সহসা উঠে পড়ে স্বামীজীর কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁর দুই পা আঁকড়ে ধরলেন। ইনি পরলোকগত পি. সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়ার; তখন মাদ্রাজ ক্রিশ্চান কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক; স্বামীজী এঁকে আদর করে 'কিডি' বলে ডাকতেন, সেই নামেই ইনি বেশী পরিচিত; মহাপ্রাণ মানুষ, ঐকান্তিকতার প্রতিমূর্তি, নিজ বিশ্বাসকে কর্মে পরিণত করতেন নির্ভয় সাহসে। সিঙ্গারাভেলু স্বামীজীর পাদধারণ করলে স্বামীজী দুই হাতে তাঁকে স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন, কিন্তু বললেন, 'এ তুমি কী করলে? এতখানি ঝুঁকি নিলে কেন? সে যাই হোক, এর পরিণাম থেকে তোমার অব্যাহতি নেই।' ঠিক তখনি আমরা সকলে দেখলুম, সিঙ্গারাভেলুর মুখে চরম তৃপ্তির আলো। সেই মুহূর্তে তিনি কী অনুভব করেছিলেন কেউ জানে না, কারণ বহু অনুরোধেও এ বিষয়ে কিছু বলতেন না, কিন্তু অন্ততঃ এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—সেদিন থেকে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। তিনি সংসারত্যাগ করেছিলেন—স্ত্রীপুত্রাদি সব কিছু—অধ্যাপনা

ছেড়ে দিয়েছিলেন—অতঃপর শুধু স্বামীজীর কাজই করে গেছেন। তাঁকে যাঁরা জানতেন, তাঁদের সকলেরই মনে আছে, জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করে গিয়েছিলেন—ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাধনায় ও ধ্যানে নিমজ্জিত থাকতেন।"

স্বামীজীকে তাঁর দিব্য ভাবানুভূতির মুহূর্তে স্পর্শ করার 'ভয়ঙ্কর অর্থ' স্বামীজী জানতেন; তিনি সভয়ে ভেবেছিলেন—কোন্ প্রেরণায় বিষদংশন সিঙ্গারাভেলু স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন! স্বামীজীর সেই সানন্দ ভীতি ফুটে উঠেছে সিঙ্গারাভেলুকে লেখা একটি পত্রে—

"তোমার এত শীঘ্র সংসারত্যাগের সঙ্কল্প শুনে আমি বড়ই দুঃখিত হলাম। ফল পাকলে আপনি গাছ থেকে পড়ে যায়। অতএব সময়ের অপেক্ষা কর। তাড়াতাড়ি ক'রো না। বিশেষতঃ, কোনো আহাম্মকির কাজ ক'রে অপরকে কষ্ট দেবার অধিকার কারো নেই। সবুর করো, ধৈর্য ধরে থাকো, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।" (২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪, আমেরিকা থেকে লেখা)

'কিডি' ছিলেন স্বামীজী-প্রবর্তিত দ্বিতীয় ইংরাজী পত্র 'Awakened India'-এর (Prabuddha Bharat) ম্যানেজার। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অকালে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পরে প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য তাঁর প্রয়াস, এবং তাঁর আধ্যাত্মিক চরিত্রের বিষয়ে ব্রহ্মবাদিনে লেখা হয়:

"· So simple and good at heart, so learned in the knowledge of the East and the West, and so self-sacrificing in the cause of Truth. Brilliant as his University career was, it never turned his head, and his thirst for knowledge went on increasing till it culminated in complete renunciation of all worldliness in 1894. This event is attributed by many to his having chanced to come in *contact* with Swami Vivekananda. Every one who had the pleasure of his frindship knew the earnestness and sincerity of purpose that sang through his system—the main cause of the success of the *Awakened India*, whose manager he was from the outset—and was sanguine of his perseverance and ultimate success in the matter of spiritual realization. No one can say exactly what progress he had made in that direction. But let us learn what that inward fulness noticeable about him in his later days really means. Let us try to follow in his footsteps and ascend to the Peak of Promise and like him." (*Brahmavadin* ; Nov. 1901)

প্রবুদ্ধ ভারতের পিছনে ছিলেন আর একজন ব্যক্তি—মাদ্রাজের একজন সেরা ডাক্তার—ননজুণ্ডা রাও। স্বামীজীর একান্ত ভক্ত এই ডাক্তারের বিবেকানন্দ-স্মৃতি কিয়দংশে অল্প পূর্বে উদ্ধৃত করেছি, পরেও করব—এখানে অধিকন্তু স্মরণ করিয়ে দেব, ডাঃ ননজুণ্ডা রাও দার্শনিক চিন্তায় পারঙ্গম ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর '*Cosmic Consciousness of the Vedantic idea of Mukti*' গ্রন্থ ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয়ে সারা দেশের সুধীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থটি শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনানুভূতির আলোকে লিখিত হয়। এ

ছাড়া ডাক্তারের অন্য উল্লেখযোগ্য রচনাও আছে।

প্রবুদ্ধ ভারতের উৎপত্তির ইতিহাস অনুসন্ধানের পূর্বে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের পরিচয় দেওয়ার ঔচিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু এমন করেছি এই জন্য যে, এই জাতীয় পত্রিকাগুলি কখনই অর্থাকাঙ্ক্ষা বা যশাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত নয়—এদের পিছনে থাকে সাধনার জীবন। প্রবুদ্ধ ভারতের ক্ষেত্রে আরও একজনের 'সাধনার' উল্লেখ করতে হবে—তিনি পত্রিকার প্রথম পর্যায়ের সম্পাদক রাজন আয়ার। তাঁর কথায় আসার আগে পত্রিকাটির সূচনা-কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করা যাক।

প্রবুদ্ধ ভারতের জীবনের দুটি ভাগ—প্রথম ভাগ অল্পস্থায়ী—প্রায় দুই বৎসরের। দ্বিতীয় পর্বের বয়স ইতিমধ্যেই ৭০ বৎসর পেরিয়ে গেছে, ভরসা করা যায় আরও বহু বৎসর সে পত্রিকা জীবিত থাকবে। প্রবুদ্ধ ভারত এখন ইংরাজীতে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান মাসিক এবং ভারতবর্ষের ধর্ম- ও দর্শন-সংক্রান্ত পত্রিকাগুলির মধ্যে বোধ হয় শ্রেষ্ঠ।

প্রবুদ্ধ ভারতের পরবর্তী মর্যাদা তার সূচনা-পর্বে আরোপ করার প্রয়োজন নেই—পত্রিকাটি প্রথমাবধি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল নিজ সামর্থ্যে, এবং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে এই পত্রিকার তৎকালীন পরিচালকবর্গ যখন সম্পাদকের মৃত্যুর কারণে পত্রিকা বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত করেন, তখন সংযত গর্বের সঙ্গে তাঁরা পত্রিকাটির উল্লেখযোগ্য বিক্রয়সংখ্যা এবং আর্থিক সাফল্যের বিষয়টি জানিয়েছিলেন।

প্রবুদ্ধ ভারত মাদ্রাজেই শুরু হয়, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে, স্বামীজীর অনুমোদনে তাঁর মাদ্রাজী ভক্তদের দ্বারা। এর কয়েক মাস আগে মাদ্রাজ থেকে স্বামীজীর ভক্তরা 'ব্রহ্মবাদিন' প্রকাশ করেছেন, সে ক্ষেত্রে আবার নতুন একটি ইংরাজী পত্রিকা বার করার কারণ কি? সে কারণ কি আলাসিঙ্গার সঙ্গে বন্ধুদের মতভেদ? তা নয় বলেই বোধ হয়, কারণ আলাসিঙ্গার বিষয়ে যে-সকল লেখা পাচ্ছি, সেগুলিতে আছে প্রবুদ্ধ ভারত আরম্ভের পিছনেও আলাসিঙ্গার ইচ্ছা সক্রিয় ছিল। এ বিষয়ে এম. জি. শ্রীনিবাসন লিখেছেন।

"The Prabuddha Bharata also owes its origin to Alasinga. It was he who first proposed that as the *Brahmavadin* was of a more advanced standard, generally suitable to Vedantic scholars and elderly persons, another journal in English should be started for the benefit of youths and less educated persons containing simpler and less scholarly contributions. It was Alasinga who selected B. R. Rajan Iyer as the first Editor of the *Prabuddha Bharata*, which was started in the year 1896 through the joint efforts of Alasinga, Dr. Nanjunda Rao and G. G. Narasimhachar." (P. B. Aug 1947)

শ্রীনিবাসনের বক্তব্য সত্য বলেই মনে হয়. কারণ আমরা দেখেছি, স্বামীজী বারবার চিঠিতে ব্রহ্মবাদিনের দুরূহ প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয়ের বিরুদ্ধে আপত্তি করেছেন। বেদান্তের সত্যকে সর্বমানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার পক্ষে

১ 'দিনমণি' পত্রিকার পূর্বকথিত প্রবন্ধেও একই তথ্য আছে। সম্ভবতঃ শ্রীনিবাসন 'দিনমণির' বিবরণের উপরই নির্ভর করেছেন এখানে।

নিশ্চয় ঐ কঠিন রীতিতে রচিত দার্শনিক প্রবন্ধগুলি উপযোগী ছিল না। অপরপক্ষে 'ব্রহ্মবাদিন' তার গুরুভার দার্শনিক আলোচনাদির জন্য ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলীতে যে সমাদর পেয়েছে, তাও সরলীকরণের ফলে নষ্ট হবার সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় পত্রিকার কথা ওঠে, এবং আলাসিঙ্গার মাথাতেও উঠতে পারে

কিন্তু ব্যাপারটি আলাসিঙ্গার মাথাতেই উঠেছিল, ঠিক এমন কোনো সমসাময়িক প্রমাণ আমরা পাইনি। স্বামীজীর পত্রাবলী থেকে ডাঃ ননজুণ্ডা রাওয়ের প্রারম্ভিক পরিকল্পনার কথাই পেয়েছি। অবশ্য ডাঃ রাওয়ের পিছনে আলাসিঙ্গা থাকতে পারেন।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিলের স্বামীজীর চিঠিতে প্রথম এই কাগজটির পরিকল্পনার উল্লেখ দেখি। স্বামীজী ডাঃ ননজুণ্ডা রাওকে নিউইয়র্ক থেকে লিখলেন :

"ছেলেদের প্রস্তাবিত কাগজের বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, এবং তা চালিয়ে যাবার জন্য আমি যথাসাধ্য সাহায্যও ক'রব। আপনার উচিত 'ব্রহ্মবাদিন'-এর ধারা অবলম্বন ক'রে কাগজটাকে স্বাধীনমতাবলম্বী করা; কেবল ভাষা ও লেখাগুলো যাতে আরও সহজবোধ্য হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখবেন। ধরুন, আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে যে-সব অপূর্ব গল্প ছড়ানো আছে, তা সহজবোধ্য ভাষায় আবার লেখা ও জনপ্রিয় করা দরকার; এই একটা মস্ত সুযোগ রয়েছে, যা হয়তো আপনারা স্বপ্নেও ভাবেননি। এই জিনিসটাই আপনাদের কাগজের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হবে। যেমন সময় পাবো, তেমন আপনাদের জন্য আমি যত বেশী পারি গল্প লিখব। কাগজটাকে খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ করবার চেষ্টা একেবারে ত্যাগ করুন, তার জন্য 'ব্রহ্মবাদিন্' রয়েছে। এভাবে চললে কাগজটা ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে নিশ্চয়ই। ভাষাটা যতদূর সম্ভব সহজ করবেন, তা হলেই আপনারা সফল হবেন। গল্পের ভেতর দিয়ে ভাব দেওয়াই হবে প্রধান বৈশিষ্ট্য। কাগজটাকে জটিল দার্শনিক তত্ত্ববহুল মোটেই করবেন না লেনদেনের দিকটা সম্পূর্ণরূপে নিজের হাতে রাখবেন—'অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট'।

এই চিঠি থেকে দেখা যায়, আলোচ্য পত্রিকার দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ননজুণ্ডা রাওয়ের, এবং স্বামীজী ব্রহ্মবাদিনের ক্ষেত্রে যেমন আলাসিঙ্গাকে ভারার্পণ করেছিলেন, এক্ষেত্রে ননজুণ্ডার উপর তেমনি ভার দিলেন। আমাদের অনুমান, ননজুণ্ডাই এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ছিলেন।[২]

স্বামীজীর চিঠির উদ্ধৃত অংশ থেকে দেখা যায়, তিনি পরিষ্কারভাবে ব্রহ্মবাদিনের সঙ্গে আলোচ্য পত্রিকার চরিত্রগত পার্থক্য দেখিয়েছিলেন, এবং সংস্কৃতসাহিত্যে ছড়ানো 'অপূর্ব গল্পরাজি'কে জনপ্রিয় করে তোলা যে পত্রিকাটির অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত—তাও জানালেন।

আরও একটি জিনিস পেলাম—স্বা পত্রিকাটিকে 'সাহায্য' করার প্রতিশ্রুতি দিলেও

---

২ টাকাকড়ির ব্যাপারে এঁকে পুনশ্চ স্বামীজীর দৃঢ় নির্দেশ—"ভারতে সংঘবদ্ধভাবে আমরা যত কাজ করি, তার সব একটা দোষে পণ্ড হয়ে যায়। আমরা এখনও কাজের ধারা ঠিক ঠিক শিখিনি। কাজকে ঠিক ঠিক কাজ বলেই ধরতে হবে—এর ভেতর বন্ধুত্বের অথবা চক্ষুলজ্জার স্থান নেই। যার ওপর ভার থাকবে, সে সব টাকাকড়ির অতি পরিষ্কার হিসেব রাখবে; এমন কি যদি কাউকে পরমুহূর্তে না খেয়ে মরতে হয়, তবুও 'শাকের কড়ি মাছে' দেবে না। একেই বলে বৈষয়িক সততা।"

পত্রের শেষাংশে জানালেন, সে-সাহায্য আর্থিক নয়, অন্ততঃ ব্যক্তিগতভাবে তিনি কোনো আর্থিক সাহায্য করতে পারবেন না, আর্থিক সাহায্য করতে সমর্থ এমন লোক জুটিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। এই পত্রিকাটিকে স্বামীজী প্রথম পর্যায়ে আর্থিক সাহায্য করেছেন, এমন উল্লেখ পরবর্তী কোনো চিঠিতেও পাই না।

স্বামীজী যদি পত্রিকাটিকে আর্থিক সাহায্য না করে থাকেন, তার একমাত্র কারণ, দেবার মত টাকা তাঁর হাতে ছিল না। শেষের দিকে আমেরিকায় তিনি বিনা অর্থে শিক্ষা দিয়েছেন। কিভাবে দিয়েছেন তা তাঁর জীবনী-গ্রন্থগুলিতে বিশেষভাবে আলোচিত। কিন্তু স্বামীজীর যথেষ্ট আগ্রহ ও সমর্থন ছিল পত্রিকাটি সম্বন্ধে। তাঁর বহু শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা, ব্রহ্মবাদিনের মতই এই পত্রিকাতে বেরিয়েছে, এবং তিনি তাঁর একটি প্রিয় আকাঙ্ক্ষা—সংস্কৃত কাব্য ও পুরাণের গল্পরচনা—এই পত্রিকা মারফত পূরণ করবেন, একথা অনেকবার বলেছেন।*

সবচেয়ে বড় কথা, স্বামীজী তাঁর শ্রেষ্ঠ দান দিলেন পত্রিকাটির জন্য—তাঁর ইচ্ছাশক্তিকে বাঙ্ময় করে পাঠালেন ডাঃ ননজুণ্ডা রাওয়ের আত্মাকে জাগাতে—

"বীরের মত এগিয়ে চলুন। এক দিনে বা এক বছরে সফলতার আশা করবেন না। সর্বদা শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ধরে থাকুন। দৃঢ় হউন; ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা বিসর্জন দিন। নেতার আদেশ মেনে চলুন; আর সত্য, স্বদেশ ও সমগ্র মানবজাতির নিকট চিরবিশ্বস্ত হউন; তা হলেই আপনি জগৎ কাঁপিয়ে তুলবেন। মনে রাখবেন ব্যক্তিগত 'চরিত্র' এবং 'জীবন'ই শক্তির উৎস, অন্য কিছু নহে। **এই চিঠিখানা রেখে দেবেন এবং যখনই উদ্বেগ ও ঈর্ষার ভাব মনে উঠবে, তখনই এই শেষের কটা লাইন পড়বেন।** ঈর্ষাই সমস্ত দাসজাতির ধ্বংসের কারণ। এ থেকেই আমাদের জাতির সর্বনাশ। এটি সর্বদা পরিত্যাজ্য। আপনার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হোক; আপনার সাফল্য কামনা করি।"

[স্থূলাক্ষর লেখকের নির্দেশে] (১৪ এপ্রিল, ১৮৯৬—৭-২৩৬)

আরও একবার স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে ব্রহ্মবাদিনের জন্য যে 'মন্ত্র' দিয়েছিলেন, ননজুণ্ডাকেও সেই মন্ত্র লিখে পাঠালেন—

"চাই অদম্য উৎসাহ। যখন যা কর, তখনকার মতো তাই হবে ভগবৎসেবা। এই পত্রিকাটি এখনকার মতো আপনার আরাধ্য-দেবতা হোক, তাহলেই সফল হবেন।"

প্রবুদ্ধ ভারতের আলোচনা স্বামীজী যে কটি চিঠিতে করেছেন, তার বেশ কয়েকটিতে একটি বিশেষ বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছিল—

* স্বামীজীর এই ইচ্ছাকে, তাঁর আরো অনেক ইচ্ছার মত ফলবতী করে তোলেন ভগিনী নিবেদিতা তাঁর Cra le Tales of Hinduism প্রভৃতি গ্রন্থে। স্বামীজীর কাছে শোনা বহু গল্প এই গ্রন্থে দিয়েছেন, একথা ভগিনী তাঁর নানা পত্রে জানিয়েছেন। স্বামীজী ১৮৯৬ সালে আলাসিঙ্গাকে লেখা চিঠিতে প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য গল্প লেখার ইচ্ছার কথা বলেছেন—('আমি একটু সময় পেলেই প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য কয়েকটি গল্প লিখব'); পুনশ্চ ২৮ অক্টোবর লিখেছেন—'প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য একটি গল্প আরম্ভ করেছি, শেষ হলেই পাঠিয়ে দেব'; প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও তিনি সহজ প্রবন্ধ বা বক্তৃতা প্রবুদ্ধ ভারতে ছাপতে নির্দেশ দিতেন, যেমন—আলাসিঙ্গাকে ২২ সেপ্টেম্বর '৯৬ তারিখে লিখেছেন, 'জ্ঞানযোগের বক্তৃতাগুলি তুমি অনায়াসে ছাপতে পারো আর ননজুণ্ডা রাও প্রবুদ্ধ ভারতে ছাপাতে পারেন।' প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশিত স্বামীজীর রচনার চরিত্র পাঠক মূল গ্রন্থ (Vivekananda in Indian Newspapers) থেকে দেখে নেবেন।

বিস্ময়ের এবং কৌতুকের কথা তা হল—'মলাট সমালোচনা।' এখানে পুনশ্চ আরও একটি ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের অগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পাচ্ছি—কলাশিল্পের প্রতি তাঁর অনুরাগ। পরে তার বিস্তারিত আলোচনা করব—এখানে তাঁর এই বিষয়ের প্রাসঙ্গিক বক্তব্যমাত্র উদ্ধৃত করছি। এই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেব—কিছু পূর্বে ব্রহ্মবাদিন সম্বন্ধে স্বামীজীর যে-সব মন্তব্য উদ্ধৃত করেছি—সেখানেও প্রচ্ছদের ব্যাপারে স্বামীজীর মনোযোগের কথা আছে।[৪] স্বামীজী ১৪ জুলাই ১৮৯৬, প্রবুদ্ধ ভারতের[৫] প্রথম দিকের কয়েকটি সংখ্যা পেয়ে যে পত্র লেখেন, তার সবটাই পত্রিকার বিষয়ে আলোচনা। তিনি আমাদের উল্লিখিত প্রচ্ছদ-পত্রের বিষয়ে বলেন—

"একটি বিষয়ে কিন্তু আমায় একটু মন্তব্য করতে হ'ল—মলাটটা একেবারে রুচিহীন—অতি বিশ্রী ও কদর্য। সম্ভব হ'লে এটাকে বদলে ফেলুন। এটাকে ভাবব্যঞ্জক অথচ সরল করুন—আর এতে মানুষের মূর্তি মোটেই রাখবেন না। বটবৃক্ষ মোটেই প্রবুদ্ধ হওয়ার চিহ্ন নয়, পাহাড়ও তা নয়, ঋষিরাও নন, ইওরোপীয় দম্পতিও নন। পদ্মফুলই হচ্ছে পুনরভ্যুত্থানের প্রতীক। চারুশিল্পে আমরা বড়ই পেছিয়ে আছি, বিশেষতঃ চিত্রশিল্পে। বনে বসন্ত জেগেছে, বৃক্ষলতায় নবকিশলয় আর মুকুল দেখা দিয়েছে—এই ভাবের একটি বনের ছবি আঁকুন দেখি। কত ভাবই তো রয়েছে—ধীরে ধীরে তা চিত্রশিল্পে ফুটিয়ে তুলুন। লণ্ডনের গ্রীনম্যান কোম্পানি যে 'রাজযোগ' ছেপেছে, তাতে আমার তৈরী প্রতীকটি দেখুন—আপনি বম্বেতে তা পাবেন। আমি নিউইয়র্কে রাজযোগ সম্বন্ধে যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলাম, সেগুলি এই পুস্তকে আছে।"

যে উচ্চ শিল্পবোধ থেকে স্বামীজী প্রবুদ্ধ ভারতের প্রবন্ধ সমালোচনা করেছিলেন—সে রসদৃষ্টি তখন ভারতবর্ষে ছিল না। স্বামীজীর মাদ্রাজী ভক্তেরা এই মলাটটির শিল্পোৎকর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহিত ছিলেন। চিত্রটির মধ্য দিয়ে তাঁরা একটা বিরাট বক্তব্য প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলেন, তা তাঁরা প্রবুদ্ধ ভারতের প্রথম সংখ্যার সূচনাপত্রেই লিখে জানিয়েছিলেন।

"Here is the wonder of Providential disposition, that the eyes of the western world were themselves turned towards India, turned, not as of old for the gold and silver she could give, but for the more lasting treasures contained in her ancient sacred literature. Christian Missionaries in their eagerness to vilify the Hindu, had opened an ancient magic chest, the very smell of whose contents caused them to faint. Oriental scholars, the Livingstones of Eastern literature, had unwittingly invoked a deity which it was not in their power to appease. As philologists are succeeded by philosophers, Colebrookes and Caldwells give birth to Schopenhaurs and Deussens. *The white man and fair*

[৪] ২৪ অক্টোবর ১৮৯৫, ২০শে ডিসেম্বর ১৮৯৫-এর চিঠি দ্রষ্টব্য।

[৫] ডাঃ ননজুণ্ডা রাও নূতন পত্রিকার নামের ব্যাপারে 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামটিকে গ্রহণ করেছিলেন। পাঠকদের জানা আছে, এই নামটি স্বামীজী মাদ্রাজের প্রস্তাবিত সংঘের জন্য দিয়েছিলেন। পত্রিকার জন্য এই নামটি স্বয়ং স্বামীজী দিতে বলেন, অথবা স্বামীজী-রচিত সংঘের নামটি ননজুণ্ডা গ্রহণ করেন, জানা যায়নি।

lady stray into the Indian woods and there come across the Hindu sage under the banyan tree. The hoary tree, the cool shade, the refreshing stream, and above all the hoarier, cooler and more refreshing philosophy that falls from his lips, enchant them. The discovery is published; pilgrims multiply. A Sanyasin from our midst carries the altar-fire across the seas. The spirit of the Upanishads makes a progress in distant lands. The procession develops into a festival. Its noise reaches Indian shores and behold, our Motherland is awakening." (Italics are mine)

(*Ourselves* : P. B. July, 1896)

উপরের বক্তব্য কিভাবে প্রবুদ্ধ ভারতের প্রসঙ্গে চিত্রায়িত হয়েছিল, তা গ্রন্থমধ্যে প্রদত্ত প্রতিলিপি থেকে পাঠকগণ দেখে নেবেন। সম্ভবতঃ ছবিটিতে সে যুগের ভারতীয় চিত্রশিল্পের মান অনুযায়ী দর্শনীয় কিছু ছিল, নচেৎ পুণার বিশিষ্ট পত্রিকা 'মারহাট্টা' অবিলম্বে প্রবন্ধের প্রশংসা করে লিখত না—'The front page is almost picturesque'—, এবং ধরে নেওয়া যেতে পারে এই ধরনের প্রশংসা মুখে বা লেখায় পত্রিকার কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট পেয়েছিলেন;— এক্ষেত্রে তাই পত্রিকার 'প্রাণপুরুষে'র নিন্দাটা বড় বেজেছিল সংগঠকদের কাছে। নিশ্চয় তাঁরা স্বামীজীকে ক্ষোভ প্রকাশ করে চিঠি লিখেছিলেন। স্বামীজী ২৬শে আগষ্ট উত্তরে জানালেন—

"মলাটের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমার আপত্তি এই যে, ওটি বড্ড রঙচঙে, চটকদার (tawdry); আর তাতে অনাবশ্যক একগাদা মূর্তির সমাবেশ করা হয়েছে। নক্সা হওয়া চাই সাদাসিধে, ভাবদ্যোতক অথচ সংক্ষিপ্ত (condensed)।"

এই মলাট সমালোচনা করে স্বামীজীর বোধ হয় আশঙ্কা হল—এর দ্বারা উল্টো উৎপত্তি না হয়! গৌণ বস্তুর বিরুদ্ধে আপত্তি যেন মুখ্যের ব্যাপারে সংগঠকদের নিরুৎসাহ করে না তোলে। সুতরাং ঐ পত্রেই তিনি লিখলেন—

"বীরের মত কাজ ক'রে চলুন; (মলাটের) নক্সা-টক্সার চিন্তা এখন থাক, ঘোড়া হ'লে লাগামের জন্য আটকাবে না। আমরণ কাজ করে যান—আমি আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি আর আমার শরীর চলে গেলেও আমার শক্তি আপনাদের সঙ্গে কাজ করবে। জীবন তো আসে যায়—ধন, মান, ইন্দ্রিয়ভোগ সবই দুদিনের জন্য। ক্ষুদ্র সংসারী কীটের মত মরার চেয়ে কর্মক্ষেত্রে সত্য প্রচার করে মরা ভাল—ঢের ভাল। চলুন—এগিয়ে চলুন।"

তাহলেও শিল্পবোধ এমন একটা জিনিস, যার বিষয়ে আপস চলে না। প্রচ্ছদ-ব্যাপারটা স্বামীজীকে কাঁটার মত বিঁধছিল। তিনি ননজুণ্ডাদের উপর এ বিষয়ে ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। কিছুদিন পরে একটি চিঠিতে (চিঠিটি লণ্ডন থেকে লেখা; তারিখে ১৮৯৬ আছে, দিন বা মাস দেওয়া নেই) আলাসিঙ্গাকে লিখলেন—"তোমার (অর্থাৎ ব্রহ্মবাদিনের) ও প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য লোহার ব্লক সমেত নক্সা পাঠাব।"

এই ব্লক ও নক্সা স্বামীজী সত্যই পাঠিয়েছিলেন কিনা জানা যায়নি।

॥ ৩ ॥

পত্রিকা আরম্ভের পূর্বে ব্রহ্মবাদিনের মতই এই পত্রিকার প্রসপেকটাস বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়। বিস্ময়ের কথা, পত্রিকার মুখ্য

সংগঠক ডাঃ ননজুণ্ডার নাম স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে নেই। অপরপক্ষে ডাঃ ননজুণ্ডার স্বাক্ষর কিন্তু ব্রহ্মবাদিনের প্রসপেকটাসে ছিল। প্রবুদ্ধ ভারতের ক্ষেত্রে স্বাক্ষরকারীদের নাম—"P. Aiyasani, M.A., B.L., B. R. Rajan Ayer, B.A., G. G. Narasima Charya, B.A., B. V. Kamesvara Iyer, B.A.।" এঁরা কেউই ব্রহ্মবাদিনের প্রসপেকটাসে স্বাক্ষরকারী ছিলেন না। এর থেকে সহজেই বোঝা যায় এই দুটি কাগজ সমবেত সহযোগিতায় পরিচালিত হয়েছিল।

প্রবুদ্ধ ভারতের প্রসপেকটাস *Indian Mirror*-এ প্রকাশিত হয় ১৪ জুন, ১৮৯৬। অন্যান্য পত্রেও প্রকাশিত হয়েছিল। মিরারে ব্রহ্মবাদিনের সঙ্গে এই পত্রিকার সম্পর্কের বিষয়ে লেখা হয়—"It will be a sort of supplement to the *Brahmavadin* and seek to do for students, youngmen and others, what that is already doing so successfully for the more advanced classes." এই উদ্দেশ্যের জন্য পত্রিকাটির রচনাগুলি হবে—"Simple, homely and interesting"—এর মধ্যে "Pouranic and classical episodes illustrative of those great truths and those high ideals" থাকবে। প্রসপেকটাসে পত্রিকার ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দের সমর্থনের কথা জানানো হয়, এবং যেহেতু এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কোনো 'personal gain' করবার ইচ্ছা নেই, তাই এই মাসিক পত্রিকার চাঁদা নির্ধারিত হয় 'at the very low figure of Re 1/8 per annum, including postage.'

প্রসপেকটাসে যে-সব কথা বলা হল, তা যে স্বামীজীর সঙ্গে পরামর্শক্রমে লিখিত তা সহজেই বোঝা গেছে পূর্বোদ্ধৃত স্বামীজীর পত্রাংশের সাহায্যে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যার একেবারে গোড়ায় '*ourselves*' নামে যে সম্পাদকীয় বিবৃতি প্রচারিত হয় তাতে আরও বিস্তারিতভাবে পত্রিকার উদ্দেশ্য ও ভাবী কার্যক্রমের আলোচনা করা হয়েছিল এবং ডাঃ ননজুণ্ডা রাওকে স্বামীজী এ ব্যাপারে যেসব চিঠি লিখেছিলেন, তার থেকে বেশ কিছু উদ্ধৃত করে স্বামীজীর নির্দেশগুলি তুলে ধরা হয়েছিল বিস্তারিতভাবে। সেই দীর্ঘ সম্পাদকীয়—যাতে বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত বেদান্ত আন্দোলনের মূল দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত করার চেষ্টা ছিল—আমরা উদ্ধৃত করছি না; তবে ভারতবর্ষে কোন্ সামাজিক ও ধর্মীয় পটভূমিকায় পত্রিকাটির উদ্ভব হল, তা দেখাতে উক্ত রচনার প্রথম অনুচ্ছেদটি উপস্থিত করা প্রয়োজন :

"The ready response with which our prospectus has been favoured on all sides, the eagerness with which our movement has been welcomed, and the support that has been generously promised to us in several quarters, all show that the time is ripe for similar undertakings, that there is a real demand in the country for spiritual nourishment—for the refreshment of the soul. But a few years ago, *Prabuddha Bharata* or the *Brahmavadin* would have been utterly impossible. The promise of many a western 'ism' had to be tried, and the problem of life had itself been forgotten for a while in the noise and novelty of the steam-engine and the electric tram; but unfortunately steam-engines and electric trams do not clear up the mystery; they only thicken it. This was found out, and a cry, like that of the hungry lion, arose for religion and

things of the soil. Science eagerly offered its latest discoveries, but all its evolution theories and heredity doctrines did not go deep enough. Agnosticism offered its philosophy of indifference, but no amount of that kind of opium-eating could cure the fever of the heart. The Christian Missionary offered his creed, but as a creed it would not suit; India had grown too big for that coat." (*Ourselves :* P. B. July, 1896)

ব্রহ্মবাদিনের মতই প্রবুদ্ধ ভারতও তার আবির্ভাবে সাদরে অভ্যর্থিত হয়েছিল নানা পত্রিকায়। নিছক সাংবাদিক ভদ্রতা থেকে ঐ অভ্যর্থনা জানানো হয়নি, আসলে অভ্যর্থিত হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের আন্দোলন, যা অনেকের কাছে ভারতের নবজাগরণের আন্দোলন। নচেৎ প্রবুদ্ধ ভারতের আবির্ভাবে পত্রে পত্রে দীর্ঘ সম্পাদকীয় রচিত হত না নিশ্চয়।[৬]

প্রকাশের অব্যবহিত পরেই প্রবুদ্ধ ভারত যে সাফল্য অর্জন করেছিল, তা সত্যই 'অভাবিত', কারণ দেখা যাবে এক বৎসরের মধ্যে এই পত্রিকা সমগ্র ভারতবর্ষে 'সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা'! বর্ষপূর্তিতে এই পত্রিকায় যে 'Retrospect' লেখা হয়, তার থেকে ঐ সংবাদ পাই। পঁচিশ বছর বয়সের সম্পাদক ঐ সংবাদ জানাতে গিয়ে খুবই ভাবাবেগ প্রকাশ করে ফেলেছিলেন, ২৫ বছরের পক্ষে যা স্বাভাবিক; তিনি সহকর্মীদের 'sincerity of purpose and purity of heart'-এর প্রশস্তি না করে পারেননি। স্বামীজীর আশীর্বাদই যে পত্রিকার সাফল্যের মূলে, তাও জানানো হয়েছিল। রচনাটি অবশ্যই আবেগে অসংযত, নিজেদের নিঃস্বার্থ প্রয়াসের ঘোষণায় কিছু উচ্চভাষিত—কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে, এই ধরনের উচ্চভাষণের মূলে যে আদর্শ ও আত্ম-বিশ্বাস থাকে তাই জগৎকে নাড়া দেয় চিরদিন। রচনার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

"বর্তমান সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে প্রবুদ্ধ ভারতের প্রথম বর্ষপূর্তি ঘটল। এবার নিশ্চয় প্রশ্ন করার সময় এসেছে—এইকালে আমরা কী শিখেছি? আমরা নিজেদের এই প্রশ্ন করেছি। উত্তরে বলতে পারি, শিখেছি অনেক কিছুই। বাস্তবিক পক্ষে, এই পত্রিকার ক্ষুদ্র ইতিহাস প্রচুর শিক্ষাপ্রদ; তার মধ্যে সর্বপ্রধান একটি শিক্ষা, যা আমরা অর্থাৎ পত্রিকা-সংশ্লিষ্ট সকলে পেয়েছি এবং যে-শিক্ষাকে আমরা যদি জীবনের শেষ পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যেতে পারি আমাদেরই মঙ্গল হবে, সে শিক্ষা হল—উদ্দেশ্য-নিষ্ঠা ও হৃদয়ের পবিত্রতা এই 'লৌহ যুগে' পর্যন্ত অলৌকিক কাণ্ড ঘটায়। যখন আমরা পত্রিকাটি আরম্ভ করেছিলাম তখন পৃথিবী উদ্ধার করব—এ জাতীয় বিরাট কোনো ভাববিলাস আমাদের ছিল না। আমরা শুধু চেয়েছিলাম নিজেদের উন্নতি করতে—আমাদের কেমন যেন বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল, যা আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর তা হয়ত অন্য কারো কারো পক্ষেও মঙ্গলকর হতে পারে। নামযশ, প্রতিপত্তি, টাকাকড়ি প্রভৃতি কিছু লাভ করার উদ্দেশ্যও আমাদের ছিল না। পত্রিকাটি আরম্ভ করার বাসনা যেন আমরা দৈববশে পেয়ে গিয়েছিলাম, এবং ভবিষ্যতে এর ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন,

৬ মারহাট্টা, ১৮৯৬, ১২ জুলাই, ইণ্ডিয়ান মিরার, ১৪ জুন, মহাবোধি সোসাইটি জার্নাল, অক্টোবর, ১৮৯৬ সংখ্যায় এই পত্রিকাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। ব্রহ্মবাদিন, ৪ জুলাই সংখ্যায় স্বভাবতই এই পত্রিকার পরিচয় দিয়েছিল।

এই কাজে যে সম্পূর্ণ পবিত্র হৃদয়ে আমাদের প্রবেশ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, তার জন্য ঈশ্বরের কাছে অনন্ত কৃতজ্ঞ থাকব। পত্রিকা আরম্ভ করার সময়ে আমরা রাজসিক আত্মবিশ্বাস বা তামসিক উচ্চাশা—উভয় বন্ধ থেকেই সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলাম। আমাদের মানসিক অবস্থা যখন এমন শান্ত ও পরিতৃপ্ত, যার স্মৃতি আমরা চিরদিন আনন্দে রক্ষা করব, আমরা 'যথাস্থান' থেকে অনুমতি চেয়েছিলাম, তা পেয়েছিলাম, এবং 'সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছিল।'" (অনূদিত)

যেখানে এহেন 'উদ্দেশ্য-নিষ্ঠা এবং হৃদয়ের পবিত্রতা', সেখানে বহুজন অবিলম্বে আকৃষ্ট হবেনই, তাঁরা সহানুভূতি ঢেলে দেবেনই, যার ফলে পত্রিকার অচিরে 'অভাবনীয় সাফল্য' ঘটে যাবে।—

"একেবারে শুরুতেই আমাদের গ্রাহক-সংখ্যা ১৫০০, প্রতি মাসে ধারাবাহিকভাবে তা বেড়ে এখন ৪,৫০০। এর দ্বারা আমাদের পত্রিকা সমগ্র ভারতবর্ষে সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা।" (অনূদিত)

সম্পাদক অতঃপর বিখ্যাত ব্যক্তিদের বা পত্রিকার কিছু কিছু প্রশংসাবাণী সংকলন করে দিয়েছিলেন। সেগুলি মূলেই উপস্থিত করছি :—

"Mr. H. Dharmapala, General Secretary, Mahabodhi Society, wrote, for instance—"All hail to the *Prabuddha Bharata.*···May its mellifluous fragrance purify the materialistic atmosphere of fallen India. Your efforts will be crowned with success and *Prabuddha Bharata* will surely awaken the lethargic sons of *Bharatvarsha.*"

"The following were some of the opinions with which we were favoured—

"Mrs. Besant—"I think it is admirably written and edited and should be most useful to our beloved India."

"The Harbinger of Light—"The ideal is beautifully expressed in the leading article as 'one, where religious toleration, neighbourly charity, and kindness even to animals form the leading features, where the fleeting concerns of life are subordinated to the eternal, where man strives not to externalize but to internalize himself more and more, and the whole social organism moves, as it were, with a sure instinct towards God.' The method of introducing this ideal adopted by the paper is a novel one, it is principally in the form of parables, or short stories embodying some principles or philosophical ideas.···It is a pleasant attractive form of presenting truth, and in these novel-reading days will command more attention than the gist of it if presented unclothed."

"Benry B. Small, late Secretary, Agricultural Department, Canada—"I think that *Awakened India* is a wonderful issue and full of materials that should be valued alike by Christians and all others."

"Coulson Turnbull, Ph. D.—"I am very much pleased with the *little gem* and when I return home (Chicago) shall try to assist its sale." "

সবশেষে, এই বাৎসরিক হিসাব-নিকাশের সম্পাদকীয়তে নিজেদের নিষ্কাম কর্মসাধনার

কথা জানিয়ে পত্রিকার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সানন্দে জানানো হয়েছিল—

"বর্তমানে পত্রিকাটির যে রূপ, একে তার চেয়ে আকর্ষণীয়, শিক্ষাপ্রদ এবং পাঠযোগ্য করে তুলতে আমাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি হবে না, একথা জানাতে পারি। বেদান্ত বিষয়ে সুপরিচিত লেখকদের সহযোগিতালাভের ব্যবস্থা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে, এবং যদি ঈশ্বরেচ্ছা থাকে, পত্রিকাটি সর্বদিকে উন্নত হয়ে উঠবে। আমাদের পক্ষে এইটুকু বলতে পারি, প্রচণ্ড উৎসাহ ও ঐকান্তিকতা নিয়ে আমরা কাজ করে যাব, ফল যাই হোক না কেন।" (ক্রমশঃ)

প্রজ্ঞা

শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত

মন্ত্রে সে তো উচ্চারিত করেছে সত্যকে
সনাতন আঙিনায়, স্থির শান্ত চোখের দৃষ্টিকে
মেলে দিয়ে সুদূরের দিগন্তের পানে।
সে-দৃষ্টিতে অন্ধকার হ'লো পুণ্য শ্লোক :
ভীতি নেই, নেই কোনো শোক।

চেতনার ভোর থেকে অনেক মৃত্যুর ফেনা
তমসার কৃষ্ণ পক্ষ দিয়ে
করেছে ভ্রূভঙ্গী তাকে, তবু তার প্রশান্তির নীড়
যায় নিকো ভেঙে, শুধু তার গূঢ় অনুভব নিয়ে
কালের কুয়াশা ছিন্ন ক'রে,—
আশ্চর্য শিল্পীর মতো সত্যকে তুলেছে শুধু ধ'রে
আমাদের চোখের সম্মুখে ;
পাই নিত্য স্পর্শ তার ধ্রুবজ্যোতি নক্ষত্রের অম্লান আলোকে

সমালোচনা

Swami Vivekananda in East and West : প্রকাশক—রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেণ্টার, ৬৮ ডিউকস এভেন্যু, লণ্ডন এন্ ১০ ও ৫৪ হলাণ্ড পার্ক, লণ্ডন ডব্লয়ু ১১; মূল্য কাপড়-বাঁধাই ও কাগজ-বাঁধাই যথাক্রমে ১৮৲ ও ১২'৫০। পুস্তকটি উদ্বোধন কার্যালয়েও পাওয়া যায়। পৃষ্ঠা পরিশিষ্টসহ ২২৩।

এক অনাস্বাদিত বিস্ময় নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব হয়েছিল বিশ্বে। বিবেকানন্দ-মানস এতই বৈচিত্র্যপূর্ণ ও দূরবগাহী যে, উহার বিশ্লেষণ এক কঠিন দুঃসাধ্য প্রয়াস। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে বিবেকানন্দের ভাব, চিন্তা, আদর্শ ও অবদান বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়েছে ১১টি প্রবন্ধে। লেখকদের মধ্যে আছেন উদ্বোধনের প্রাক্তন সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সহ ৪ জন শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাসী, প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিশেষজ্ঞ এ. এল্. ব্যাশাম সহ ৫ জন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও একজন বিশিষ্ট খ্রীষ্টান ধর্মযাজক এবং বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শের সক্রিয় রূপকার শ্রী টি. এস্. অবিনাশিলিঙ্গম্।

সকল লেখকই স্বামীজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান এবং স্বামীজীর বাণী ও রচনার উপর আধারিত প্রত্যেক প্রবন্ধই সুলিখিত। ভাষা প্রাঞ্জল ও পাণ্ডিত্যের জটিলতা থেকে মুক্ত। লেখকগণ স্বকীয় প্রত্যয়-প্রকাশে কুণ্ঠাহীন। ১১টি প্রবন্ধের মধ্যে বিশেষ উল্লেখনীয় হচ্ছে: (১) Vivekananda and the Unity of Churches and Religions (Rev. Sidney Spencer), (২) Swami Vivekananda's Universality (Swami Satprakashananda), (৩) Swami Vivekananda : A Moulder of the Modern World (A. L. Basham). গ্রন্থটির পরিশিষ্টে আছে লণ্ডনস্থিত ভূতপূর্ব ভারতীয় হাইকমিশনরদ্বয় শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও এম্. সি. চাগলা, বিশিষ্ট ভারতীয় নেতা ৺সি. পি. রামস্বামী আয়ার এবং লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ইংরেজ শল্যচিকিৎসক ৺কেনেথ ওয়াকারের বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

স্বামীজীর বহুমুখী মনীষার পরিচয়ে ইচ্ছুক যাঁরা তাঁদের নিকট এই স্বল্প পরিসরের পুস্তকটি অবশ্য পঠিতব্য। বইটির ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। ১৯৬৮র শেষভাগে প্রকাশিত হলেও বইটি স্বামীজীর জন্মশতবর্ষস্মরণেই রচিত হয়েছে। —স্বামী বীতশোকানন্দ

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য : প্রণবরঞ্জন ঘোষ। প্রকাশক —লেখাপড়া: ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম ৮'০০।

তরঙ্গের উত্থান-পতন আছে। ইতিহাসের কাল-তরঙ্গও উত্থান-পতনশীল। একটি দেশ বা জাতি এই তরঙ্গের তালে ওঠে বা নামে। সেই সূত্রেই নির্মিত হয় দেশ বা জাতির ইতিহাস। বাংলাদেশের প্রায় দ্বিসহস্র বর্ষের ইতিবৃত্তে খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দ এইরূপ একটি উন্নমনের কাল। প্রতীচ্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘাতে এই শতকে বাঙালীর যে 'মানস জাগরণ' ঘটে, তার ইতিহাস বিস্ময়কর ও অপূর্ব। ইউরোপীয় স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদ, মানবকেন্দ্রিক ধর্ম ও সমাজভাবনা এদেশের চিরপ্রচলিত সূক্ষ্ম নৈয়ায়িক বুদ্ধি এবং ভাবপ্রবণ অন্তরে যে প্রোজ্জ্বল দীপশিখা জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তারই উদ্ভাস এ যুগের সমাজ, শিক্ষা ও সাহিত্য-চিন্তা। বহুবিচিত্র মানব-মনীষার আবির্ভাবও

এই তুঙ্গশীর্ষ তরঙ্গান্দোলনের ফলশ্রুতি।

অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ আলোচ্য গ্রন্থখানিতে উনিশ শতকে বাঙালীর সেই নবজাগরণোৎসবের কয়েকটি দিকের আলেখ্য অঙ্কন করেছেন। এই চিত্রাঙ্কণে বিশেষ করে প্রাধান্য লাভ করেছে বাঙালীর মনন-বৈশিষ্ট্য। তিনি দেখিয়েছেন, উনিশ শতকে বাঙালীর চিন্তাধারাকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছে অধ্যাত্ম-ভাবনা। নব্য বঙ্গে প্রগতির মূল প্রেরণা শুধু বিজ্ঞান বা মানবিকতা নয়, মৌল প্রেরণা নিহিত রয়েছে অধ্যাত্ম-অনুসন্ধিৎসায়। সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-বিস্তার, সাহিত্য-চিন্তা সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রিত করেছে ভারতীয় জীবনের চিরন্তন জিজ্ঞাসা—ধর্ম-জিজ্ঞাসা। এই মর্মগত মৌল সত্যটিকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে লেখক উনিশ শতকের নয়জন বিশিষ্ট চিন্তানায়কের কর্ম-সাধনাকে অবলম্বন করেছেন: তাঁরা হলেন—রামমোহন, ডিরোজিও, প্যারীচাঁদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁদের প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্র স্বতন্ত্র, সাধনা বিভিন্নমুখী, প্রচেষ্টা পৃথক; সংহারে, সংস্কারে ও সংগঠনে তাঁদের প্রয়াস বহুবিচিত্র। কিন্তু স্বরের বিচিত্রতা ও বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁদের চিন্তায় সৃষ্ট হয়েছে একটি ঐকতান, যা সমস্ত চিন্তাধারাকে মিলিত করে এক অধ্যাত্ম-সাগর-সঙ্গমতীর্থের দিকে চালিত করেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর 'মনন ও সাহিত্য'—এই দুটি বিষয়ই অধ্যাপক শ্রীঘোষের আলোচ্য। এই আলোচনায় তিনি মূলতঃ কবি-ব্যক্তিত্বের গভীরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছেন। আলোচ্য খণ্ডে তিনি প্রধানতঃ বাংলা গদ্যে যে মননের প্রকাশ ঘটেছে, তারই দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শন করেছেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার ও ভূদেব বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে যে মুদ্রাচিহ্ন রেখে গিয়েছেন লেখক তার দিঙ্‌নির্দেশ করেছেন। কিন্তু লেখকের এই প্রচেষ্টায় বিভিন্ন মনীষীর মনন-ব্যক্তি যেরূপ প্রাধান্য পেয়েছে, সাহিত্য-ব্যক্তি তার তুলনায় অতি গৌণ স্থান লাভ করেছে। এতে হয়তো সাহিত্য-রসপিপাসু কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হতে পারেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, শ্রীঘোষের এই আলোচনা তাঁর বিরাট পরিকল্পনার একটি অংশমাত্র এবং সাহিত্য-কৃতির পরিচয় নয়, তার উৎস ও স্বরূপ নির্দেশ করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তিনি অনায়াস সঞ্চরণে সার্থকভাবেই সেই লক্ষ্য ভেদ করেছেন।

পরিশেষে, এই গ্রন্থরচনায় গ্রন্থকর্তার মানস-প্রবণতাও উদ্ঘাটিত হয়েছে। তিনি যে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত, গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ে সেই প্রত্যয়ের চিহ্ন গভীরভাবে মুদ্রিত। এই প্রত্যয় দীপ্ত কবিত্বময় ভাষায় সুপ্রকট হয়েছে 'নবভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা: শ্রীরামকৃষ্ণ' শীর্ষক শেষ নিবন্ধটিতে। 'আধুনিকতার অগ্রদূত রাজা রামমোহন' থেকে শুরু করে রাজনারায়ণ-ভূদেব পর্যন্ত অধ্যাত্ম-অনুসন্ধানের যাবতীয় ধারাপ্রবাহ যেন সার্থক ভাবে মিলিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অদ্বৈতানুভবমিশ্র জীবসেবার মুক্ত-বেণীতে। নব্যবঙ্গের সাধন-মননের পূর্ণ প্রতিষ্ঠাও এইখানে। লেখক দ্বিধাহীন ভাষায় তাঁর এই সুদৃঢ় প্রত্যয়ের কথা ব্যক্ত করেছেন। লেখকের প্রতিটি যুক্তি ও বিশ্লেষণ এই প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় বিষয়-পরিবেশন যেমন মনোজ্ঞ হয়েছে, প্রকাশের ভাষাতেও এসেছে প্রশান্ত প্রসন্নতা। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি। —শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

রবীন্দ্র-পরিচয়—শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত ও শ্রীক্ষিতীশ গুপ্ত। প্রকাশক: জাহ্নবী সাহিত্য মন্দির, ৫ শ্রীনাথ মুখার্জি লেন, কলিকাতা ৩০। পৃষ্ঠা—১৩৮; মূল্য চার টাকা।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে 'রবীন্দ্র-পরিচয়' একটি নূতন সংযোজন।

রবীন্দ্রনাথ কিরূপ পরিবেশের মধ্যে মানুষ হইয়া আশ্চর্য প্রতিভার অধিকারী হইয়াছিলেন, গ্রন্থখানিতে সেই কথা সুন্দরভাবে বর্ণনা করার প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়। 'রবীন্দ্রজীবনের ঘটনা ও রচনাপঞ্জী'-শীর্ষক তথ্যপূর্ণ পরিচ্ছেদটি হইতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা হইবে। কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের কয়েকটি প্রবন্ধের মাধ্যমে কবির সাহিত্যকর্মের পরিচয় জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিকা পুস্তকখানিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। সর্বতোমুখী প্রতিভাধর ও বিরাটব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পাঠক-সাধারণের যে অনুসন্ধিৎসা তাহা এই পুস্তকখানির মাধ্যমে অনেকাংশে তৃপ্ত হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

নিত্যানন্দ-বিদ্যায়তন পত্রিকা: (১৯৬১-১৯৬৬) এড়গোদা নিত্যানন্দ বিদ্যায়তন, ডাকঘর—পরীহাটা, জেলা—মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত।

নিত্যানন্দ বিদ্যায়তনের প্রথম বর্ষ হইতে চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত চারিখানি পত্রিকার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রদের সাহিত্য-চর্চার পরিচয় পাইয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। শিক্ষকগণের লেখাগুলি সুচিন্তিত। 'ইচ্ছা করলে আমরাও বড় হতে পারি'—প্রবন্ধটি ছাত্রগণের আত্মবিশ্বাস জাগাইতে সাহায্য করিবে।

ভগিনী নিবেদিতা জন্ম-শতবার্ষিকী স্মারক সংখ্যা: (১৯৬৮)—তমলুক, মেদিনীপুর। পৃষ্ঠা—৩২

প্রসঙ্গ উদ্ধৃতি, কবিতা, গান ও প্রবন্ধের সমাবেশে প্রকাশিত স্মারক-সংখ্যাটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও আকর্ষণীয় হইয়াছে।

গোবরডাঙ্গা-খাঁটুরা উচ্চতর বহুমুখী বিদ্যালয় পত্রিকা: (১৯৬৭), খাঁটুরা (গোবরডাঙ্গা), ২৪ পরগণা। পৃষ্ঠা—১২৫।

ছাত্র শিক্ষক ও সুধীবৃন্দের লেখায় সমলঙ্কৃত হইয়া পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ছাত্রদের রচিত অনেকগুলি কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধে মৌলিকতা আছে। শিক্ষক ও সুধীজনের লেখাগুলিতে চিন্তাশীলতা বিদ্যমান। ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে কয়েকটি সুন্দর প্রবন্ধ পত্রিকাটির আকর্ষণের বস্তু।

সারদা: (নববর্ষ সংখ্যা), ১৩৭৫—শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাচক্র, ২নং নবীনকৃষ্ণ বাবু লেন, ভদ্রকালী, হুগলী। পৃষ্ঠা—৪৪।

'সারদা' ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রের শুভ নববর্ষ সংখ্যাটি গুণিজনের রচনাসমৃদ্ধ। পরিচালকগণের আন্তরিক প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত।

স্মরণিকা: (১৯৬৮)—বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ, নববারাকপুর।

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব উপলক্ষে এই ক্ষুদ্র স্মরণিকাটি 'শ্রীরামকৃষ্ণ—ভক্তিপথ,' 'বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন, 'অনিবার্য পথনির্দেশ'—এই তিনটি প্রবন্ধ লইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাপ্তি-স্বীকার

(১) **শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন:** (বঙ্গভাষায় সূত্রাকারে রচিত) স্বামী বিবেকানন্দ। সঙ্কলক ও প্রকাশক: ব্রহ্মচারী অমূল্যকুমার, ডি, ৩২/১০৪, পাতালেশ্বর, বারাণসী। পকেট সাইজ, পৃষ্ঠা—৩২; মূল্য ৩০ পয়সা।

(২) **স্বামী শুদ্ধানন্দ ও বিবেকানন্দ সোসাইটি:** শ্রীপরেশনাথ সেনগুপ্ত। বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলিকাতা ৬ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৩৮; মূল্য ৭৫ পয়সা।

(৩) **কথামৃতকুসুমাঞ্জলি:** (পদ্যে রূপান্তরিত কথামৃতের উপদেশাবলী) সঙ্কলয়িতা: শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর। পরিবেশক: টিচার্স কনসার্ন, ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। পৃষ্ঠা—৪০; মূল্য ১.২৫।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবাঃ গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত জলপাইগুড়ি শহর ও মঙ্গলঘাট অঞ্চলের বন্যার্তগণের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক শিশুখাদ্য ৩০ টিন, সুতি কম্বল ৮০ খানি, চাষের সরঞ্জাম ৯৮৪টি এবং ছাত্রদের জন্য একসার-সাইজ বুক ১৪,৫৩৩ খানি বিতরিত হইয়াছে।

পাহাড়পুরের 'রাজবাড়ীতে' নূতন সেবাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

গুজরাট বন্যার্তসেবা: সুরাট জেলায় রামকৃষ্ণ মিশন ৩০০টি 'প্রি-ফেব্রিকেটেড সিমেণ্ট কংক্রিটে'র গৃহ-নির্মাণ করিয়াছে; এগুলির মধ্যে ইতোমধ্যেই ১৮০টি গৃহ গৃহহারাদের দেওয়া হইয়া গিয়াছে। আরো গৃহনির্মাণের কাজ সন্তোষজনক ভাবে অগ্রসর হইতেছে।

কার্যবিবরণী

খেতড়ি (রাজস্থান) রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দিরের ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ খেতড়িতে যে ভবনে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, সেখানেই রামকৃষ্ণ মিশনের এই শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

বর্তমানে এই কেন্দ্র কর্তৃক একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, একটি নার্সারি স্কুল এবং একটি মাতৃমন্দির (Maternity Home) পরিচালিত হইতেছে।

গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ৩,৫৭০। পাঠাগারে ৫টি দৈনিক, ২৯টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়।

৩ হইতে ৭ বৎসরের শিশুদিগকে নার্সারি স্কুলে ভরতি করা হয়। মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১০২; তন্মধ্যে ৭৬ জন বালক এবং ২৬ জন বালিকা। ২৩ জন হরিজন বালকবালিকা এখানে শিক্ষালাভ করিতেছে। নার্সারি স্কুলটির নাম 'সারদা শিশুবিহার'। 'বাল-উদ্যান' নামে শিশুদের খেলাধুলার জন্য একটি পার্ক করা হইয়াছে, এখানে খেলার বিবিধ সরঞ্জাম আছে। শিশুদিগকে গ্রীষ্ম- ও শীত-বস্ত্র দেওয়া হয়। তাহাদের পুষ্টির জন্য প্রতিদিন দুধ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে মাতৃমন্দিরে অন্তর্বিভাগে ও বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা যথাক্রমে ৩২ ও ২১৬।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। জন্মাষ্টমী, বুদ্ধপূর্ণিমা, খৃষ্টজন্মদিন প্রভৃতিও উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শাস্ত্র-ক্লাস, আলোচনা ও বক্তৃতাদির মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব প্রচার করা হইয়া থাকে।

রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন যক্ষ্মা হাসপাতালের বার্ষিক কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৭ মার্চ, ১৯৬৮) প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে এই স্যানাটোরিয়াম স্থাপিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাকালে শয্যাসংখ্যা ছিল মাত্র ৩২। বর্তমানে স্যানাটোরিয়ামে ২৫০টি শয্যা আছে; তন্মধ্যে ২৩০টি সাধারণ ওয়ার্ডে, ১৩টি কেবিনে ও ৭টি কুটিরে।

রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবাকেন্দ্রটি একটি পূর্ণাঙ্গ টি. বি. স্যানাটোরিয়ামে পরিণত হইয়াছে। এখানে সর্বপ্রকার যক্ষ্মারোগের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রোগনির্ণয়, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের সুব্যবস্থা আছে।

আরোগ্যলাভের পর রোগীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। রোগমুক্ত রোগীদিগকে ল্যাবরেটরি, এক্স-রে, নার্সিং, স্টোর, অফিস, পাওয়ার-হাউস, ওয়াটার-ওয়ার্কস, পোলট্রি-ফার্ম, টেলারিং প্রভৃতি স্যানাটোরিয়ামের বিভিন্ন বিভাগে বৃত্তিমূলক কর্ম শিক্ষা দেওয়া হয়।

আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৫৭৮, তন্মধ্যে ৩৯০ জন রোগীকে ভরতি করা হয় এবং ১৮৮ জন রোগী পূর্ববৎসরে ভরতি হইয়াছিল। ৩৩৩ জন হাসপাতাল হইতে ছাড়া পায় এবং বর্ষশেষে ২৪৫ জন রোগী চিকিৎসাধীন থাকে। ৭৬ জন রোগীর অস্ত্রোপচার, এক্স-রে বিভাগে ৪,৩২৬টি এক্স-রে এবং ল্যাবরেটরিতে ১৬,২৮২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। ৮৬ জন রোগী সম্পূর্ণ বিনা-খরচে এবং ১৪ জন রোগী কম-খরচে চিকিৎসিত হয়; কলিকাতা ও পাটনার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রদত্ত সম্পত্তির আয় হইতে এবং জনসাধারণের দানে বিনা-ব্যয়ে ও অল্প ব্যয়ে এতগুলি রোগীকে অন্তর্বিভাগে চিকিৎসালাভের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার বদান্যতায় ১৪৫টি ফ্রি-বেডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্থানীয় দরিদ্র রোগীদিগকে বিনা-খরচে চিকিৎসার অগ্রাধিকারলাভের সুযোগ দেওয়া হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে স্যানাটোরিয়ামের বহির্বিভাগস্থ চিকিৎসালয়ে ৫০৫ জন যক্ষ্মারোগী এবং অন্যান্য রোগাক্রান্ত ৯১৭ ব্যক্তি বিনা-খরচে চিকিৎসা লাভ করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ৩৫ জন রোগী আরোগ্যলাভের পর স্থানীয় আরোগ্যোত্তর উপনিবেশে স্থান পাইয়াছে; স্যানাটোরিয়ামে ইহাদিগকে নানা প্রকার বৃত্তিমূলক কর্ম শিক্ষা দেওয়ার পর বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত করিয়া জীবিকা-নির্বাহের সুযোগ দেওয়া হইতেছে।

উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজনীয় এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠান যক্ষ্মা-হাসপাতালের বার্ষিক ব্যয় সম্পূর্ণ সঙ্কুলান হইতেছে না, আয় অপেক্ষা প্রতিবর্ষেই অধিক ব্যয় হইতেছে। আমরা সহৃদয় বদান্য জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, যাহাতে এই স্যানাটোরিয়ামটি সুপরিচালিত হইয়া জনসাধারণের সেবায় থাকিতে পারে তজ্জন্য তাঁহারা যেন মুক্তহস্তে দান করেন।

দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ১৯৬৬-৬৭ ও ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠ মিশনের প্রাচীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিক্ষায়তন। প্রাচীন গুরুকুল-আদর্শে পরিচালিত এই আবাসিক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের চরিত্রগঠন এবং শরীর-মনের সুষম বিকাশ-সাধনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়।

কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা সেণ্ট্রাল বোর্ড (নিউ দিল্লী)-এর স্বীকৃতিলাভের পর বিদ্যাপীঠে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী করা হইয়াছে। বর্তমানে এখানে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার তিনটি ধারা—সাহিত্য, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, নাগাল্যাণ্ড প্রভৃতি রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছাত্রগণ এখানে অধ্যয়ন করে। চতুর্থ হইতে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যাপীঠের মোট ছাত্রসংখ্যা ৩৫০। ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ডের সর্ব-ভারতীয় উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়াছিল বিদ্যাপীঠের ১২ জন ছাত্র, সকলেই উত্তীর্ণ হয়,

তন্মধ্যে ৪জন প্রথম এবং ৭জন দ্বিতীয় বিভাগে। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে একজন ছাত্র বিজ্ঞানে জাতীয় বৃত্তি লাভ করে।

বিদ্যাপীঠে সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, সূচীকর্ম বাগান করা প্রভৃতি শিখাইবার সুব্যবস্থা আছে। ব্যায়ামচর্চা. নানা প্রকার খেলা, ড্রিল, ভ্রমণ, ক্যাম্পিং প্রভৃতি সুযোগ্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ের ৭,০৮০ খানি পুস্তক আছে, আলোচ্য বর্ষে ১২০ খানি নূতন পুস্তক সংযোজিত হইয়াছে। পাঠাগারে ১২টি দৈনিক ও ৩৫টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়।

দাতব্য চিকিৎসালয়ে হোমিওপ্যাথিক ও অ্যালোপ্যাথিক মতে ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে মোট ৯,১৫৬জন স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র রোগী চিকিৎসিত হয়, তন্মধ্যে ৩,৮৪৭জন নূতন রোগী।

অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে স্থানীয় অনুন্নত জনসাধারণের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনার সুযোগ পাইতেছে। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত খোলা হইয়াছে। ১৬০ জন বালকবালিকা এখানে পড়াশুনা করে, দুপুরে তাহাদিগকে বিনামূল্যে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে বিহারে অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষে বিদ্যাপীঠ কর্তৃক ১০ মাস যাবৎ ব্যাপকভাবে খয়রাত্রাণকার্য করা হয়। এই সেবাকার্য চকাই, ঝাঝা, জামুই ও রিখিয়া অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রতিবৎসর বিদ্যাপীঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব এবং শ্রীশ্রীকালীপূজা, শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

উৎসব-সংবাদ

তমলুক: রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত ২৮শে মার্চ শুক্রবার হইতে ৩০ শে মার্চ রবিবার পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৪তম জন্মতিথি উপলক্ষে আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী অন্নদানন্দের সভাপতিত্বে তিনদিন ধর্মসভার অধিবেশন হয়। অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ, অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্তা ও স্বামী উমানন্দ যথাক্রমে 'ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ,' 'শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী' ও 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। ইহা ছাড়া বিভিন্ন দিনে কলিকাতার "রসরঙ্গ" সম্প্রদায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত সহ শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা ব্যাখ্যা, শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং 'রানী রাসমণি' ও 'সাবিত্রী সত্যবান' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রতিদিন শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা প্রায় তিন হাজার।

আসানসোল: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৩রা হইতে ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত পাঁচ দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বার্ষিক জন্মোৎসব ও বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন দিনে সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী বীতশোকানন্দ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন ও স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ; ইঁহারা এবং স্বামী ঈশানানন্দ, অধ্যাপক অমূল্যভূষণ সেন, অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ ও ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন। আসানসোলের শিল্পাঞ্চল, দুর্গাপুর, ধানবাদ প্রভৃতি স্থান হইতেও আসিয়া প্রত্যহ বহু ভক্ত সভায় যোগদান করিয়াছেন। উৎসবের শেষ দিন (পুরস্কার-বিতরণের দিন) বিদ্যালয়ের

ছাত্রগণ কর্তৃক 'কুশধ্বজ' নাটকাভিনয় দুর্যোগের জন্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ছাত্রগণ একটি বিজ্ঞানপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিল।

বহরমপুর : (মুর্শিদাবাদ) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে গত ৪ঠা হইতে ৬ই এপ্রিল তিনদিন পূজাদি ও আলোচনা-সভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তিনদিন সভায় আলোচনার বিষয় ছিল যথাক্রমে 'যুগস্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ', 'জগন্মাতা সারদাদেবী' ও 'পথের দিশারী বিবেকানন্দ'। প্রথম দিন সভাপতিত্ব করেন স্বামী পরশিবানন্দ, দ্বিতীয় দিন স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ ও তৃতীয় দিন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ইঁহারা এবং মৌলভী রেজাউল করীম, অধ্যক্ষ অমূল্যচরণ গুহ ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের সভান্তে শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রামায়ণগান করেন। শেষদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি, রামনামসংকীর্তন হয়; প্রায় আটশত নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। প্রত্যহ পাঁচ-ছয় শত শ্রোতা সভায় যোগদান করিয়াছেন।

জলপাইগুড়ি : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৪ঠা হইতে ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত পূজাপাঠাদি ও আলোচনাসভার মাধ্যমে শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ৪ঠা এপ্রিল শ্রীশ্রীমায়ের জীবনালোচনা করেন স্বামী প্রণবাত্মানন্দ, (সভাপতি), স্বামী অজজানন্দ ও শ্রীহরিপদ গঙ্গোপাধ্যায়। ৫ই এপ্রিল 'যুগপ্রয়োজনে স্বামী বিবেকানন্দ' বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী অজজানন্দ (সভাপতি) ও শ্রীহরিপদ গঙ্গোপাধ্যায়। ৬ই এপ্রিল স্বামী অজজানন্দ (সভাপতি), শ্রীসুধাংশুশেখর মৈত্র ও শ্রীহরিপদ গঙ্গোপাধ্যায় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। আশ্রম-সম্পাদক রামকৃষ্ণ মিশনের উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করেন। প্রথম দিন সভান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালেখ্য ও দ্বিতীয় দিন কীর্তন পরিবেশিত হয়। ৬ই এপ্রিল দুপুরে প্রায় ১২০০ ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

পরলোকে স্বামী বীরেশানন্দ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ২৫শে এপ্রিল স্বামী বীরেশানন্দ (নকুল মহারাজ) ৭৩ বৎসর বয়সে আলমোড়া আশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া সহসা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

স্বামী বীরেশানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বামী সারদা-নন্দজীর নিকট হইতে সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বারাণসী সেবাশ্রমে। এখানে তিনি সুদীর্ঘকাল শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কাজ করিয়াছিলেন; ইহা ছাড়া কনখল, কিষেণপুর, আলমোড়া প্রভৃতি কেন্দ্রেও সেবাকার্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন।

অক্লান্তকর্মা, তপস্বিস্বভাব এই সন্ন্যাসী সরল ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলেরই প্রিয় ছিলেন।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

নড়াইল: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বিগত ২৮শে ফেব্রুআরি শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয় পূজা, পাঠ, কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে। আশ্রমপ্রাঙ্গণে উৎসবে প্রায় ২৫০০ ভক্ত নরনারী বসিয়া খিচুড়িপ্রসাদধারণে পরিতৃপ্ত হন। সন্ধ্যায় ভজনের ব্যবস্থা ছিল।

শ্রীসারদা সংঘের উদ্যোগে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব গত ১২ই মার্চ হইতে ১৬ই মার্চ পর্যন্ত গোলপার্কস্থিত মহিলা-নিবাসে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে ১০১ ঘণ্টা অখণ্ড 'কথামৃত'পাঠ ও পূজা-ভজনাদি করা হয়। শেষ দিন প্রায় পাঁচশত মহিলা বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। উৎসবের কয়দিন সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী প্রতিভা কাপুর, শ্রীমতী যূথিকা দত্ত, শ্রীমতী বাণী দাশগুপ্তা প্রভৃতি।

যশোহর: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ২৮শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, পাঠ, কীর্তন প্রভৃতির পর পাঁচসহস্রাধিক ভক্ত নরনারী বসিয়া খিচুড়িপ্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে বিভিন্ন বক্তা শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী আলোচনা করেন।

বাগবাজার: শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুব-সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২৯শে ও ৩০শে মার্চ কাশিমবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউসনে স্বামী বিবেকানন্দের ১০৭তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২৯শে মার্চ পূর্বাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে সভায় স্বামী সদাত্মানন্দ (সভাপতি), স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ (প্রধান অতিথি) ও অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার স্বামীজীর বাণী আলোচনা করেন। শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সমিতির বিবৃতি দেন এবং শ্রীবিমলকুমার রায় সঙ্ঘের সম্পাদকীয় বিবৃতি পাঠ করেন।

সভান্তে 'নিবেদন' শিল্পিগোষ্ঠী কর্তৃক স্বামীজীর ভারতপ্রব্রজ্যা গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

৩০শে মার্চ সভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ (সভাপতি), অধ্যাপক বিনয়কুমার সেনগুপ্ত (প্রধান অতিথি), অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, স্বামী স্মরণানন্দ, স্বামী চিদাত্মানন্দ ও শ্রীপ্রমথনাথ দে স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সভান্তে শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী কর্তৃক সঙ্গীত, ভারতের বিশিষ্ট ব্যায়ামবীরগণ কর্তৃক ব্যায়ামপ্রদর্শনী, ও পরে 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' চলচ্চিত্র উপভোগ্য হইয়াছিল।

নূতনপুকুর: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৬ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে বার্ষিক উৎসব সকালে পল্লীপরিক্রমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাপাঠাদির মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়াছে। দুপুরে প্রায় আটশত ভক্ত নরনারী বসিয়া তৃপ্তিসহকারে খিচুড়িপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। সুরে 'কথামৃত' পরিবেশন করেন চারিগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রমের কর্মিগণ। বৈকালে ধর্মসভায় স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ (সভাপতি) ও শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল (প্রধান অতিথি)

শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী অবলম্বনে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। অধ্যাপক পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে সভায় তাঁহার লেখা পাঠ করা হয়। সভান্তে আশ্রমবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রগণ একটি নাটক অভিনয় করেন।

আলিপুরদুয়ার জং: প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শুভ জন্মোৎসব গত ১২ই হইতে ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত তিনদিন উদ্‌যাপিত হইয়াছে। স্বামী পরশিবানন্দ, স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ, স্বামী বীতশোকানন্দ, স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ও অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার এই তিন দিন ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচনা করেন। সভান্তে বেতারশিল্পী শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী রামায়ণগান পরিবেশন করেন। সভায় প্রচুর জনসমাগম হইয়াছিল।

নবব্যারাকপুর: বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ গত ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল পরিষদ-প্রাঙ্গণে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপন করেন। ১৩ই এপ্রিল স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ শোভাযাত্রা, পূজাপাঠাদি হয়। অপরাহ্ণে এক ছাত্রসম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী জয়ানন্দ। সন্ধ্যায় জনসভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ (সভাপতি), অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী (প্রধান অতিথি) ও স্বামী জয়ানন্দ স্বামীজীর ভাবধারার বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

১৪ই এপ্রিল জনসভায় ডঃ মহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার (সভাপতি) ও শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় ভাষণ দান করেন।

সতীশচন্দ্র ঘোষের পরলোকগমন

জামসেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির কর্মী ও কোষাধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র ঘোষ গত ১লা এপ্রিল রাত্রি ১০টা ১৫ মিনিটের সময় ৭৬ বৎসর বয়সে করে জপ করিতে করিতে সজ্ঞানে শ্রীরামকৃষ্ণলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে জয়রামবাটীতে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। বাংলা ১৩০০ সালে বৈশাখ মাসে তিনি অবিভক্ত বাংলার বরিশাল জেলার বাকাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জামসেদপুরে টাটা কোম্পানীতে তাঁহার কর্মজীবন অতিবাহিত হয়। তিনি বরাবর স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এই সংস্থাকে গড়িয়া তুলিতে নানারূপে সহায়তা করিয়াছেন।

তাঁহার আত্মা শ্রীভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করুক।

ভ্রম-সংশোধন

উদ্বোধনের গত বৈশাখ সংখ্যায় ১৭৭ পৃষ্ঠা ২য় কলমে ১০, ১১, ১৪ ও ১৬ লাইনে 'হলধারী' স্থলে 'হৃদয়' পড়িবেন।



দিব্য বাণী

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৭।৪

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ
অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥ ৩।২৭

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি॥ ১৩।২৯

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(জীব-চেতনার দর্পণ)—মন, বুদ্ধি, অহংকার,
(জগতের মূল উপাদান)—জল, ক্ষিতি ও অনিল, আকাশ, অনল—
এসব প্রকৃতি—আমার অষ্ট প্রকৃতি বিবিধাকার॥

জীবনে সাধিত সব কর্মই প্রকৃতির গুণে হয়,
(দেহ-মন-আদি) প্রকৃতিকে মোরা মোহের বশেতে হয়ে জ্ঞানহারা
'আমি' ব'লে ভাবি, 'আমিই কর্তা' এই বোধ জাগে তাই॥

(দৈহিক কাজ, চিন্তা, বিচার প্রভৃতি) কর্ম যত
প্রকৃতিরই দ্বারা সে-সব সাধিত ইহা যেই জন দেখে স্পষ্টতঃ,
নিজেরেও সেথা দেখে অ-কর্তা,—সেই দেখে যথাযথ॥

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ১৮।৬১

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥ ৬।৩১

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৬।৩২

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ঈশ্বর তিনি বিরাজিত সদা সবার হৃদয়মাঝে ;
সেথা হতে তিনি (মন-বুদ্ধ্যাদি) যন্ত্রে আরূঢ় জীবেরে অনাদি-
মায়াবলে পরিচালিত করেন জীবনের সব কাজে
(যন্ত্রী যেমন কলের পুতুলে চালায় পুতুল-নাচে)।

সবার হৃদয়ে আসীন আমারে পূজা করে যেই জনে
অভেদ দেখিয়া আপনারও সাথে, সে-জন যেভাবে থাকুক যে-পথে,
সে রহে সদাই আমারি মধ্যে—যুক্ত আমারি সনে ॥

অপরের সুখ-দুঃখের বেদন যার হৃদিপারাবারে
তোলে তরঙ্গ সম বেদনের, সমত্ববোধ সর্বজনের
সঙ্গেই যার, পরম যোগী তো আমি বলি শুধু তারে ॥

কথাপ্রসঙ্গে

কর্মযোগ

কর্ম না করিলে আমাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় না; দেহের ভিতর সারাক্ষণ কর্ম না চলিলে দেহ রক্ষা পায় না; আবার জগতের প্রত্যেকটি অচেতন পদার্থের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে উহার ভিতরকার অবিশ্রাম কর্মের উপর। সমগ্র জীব-জগৎই দাঁড়াইয়া আছে কর্মের উপর—স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয়বিধ দৃষ্টিতেই ইহা সত্য। কাজেই এই জগতের মধ্যে থাকিয়া, সব ছাড়িয়া নির্জন গিরিকন্দর বা অরণ্যে চলিয়া গেলেও কর্মের সংস্পর্শ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। কিন্তু কর্মের ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ দেহমন-সায়রের গভীরতম প্রদেশে এমন একটি স্থান আছে যেখানে পৌঁছিতে পারিলে কর্মের তরঙ্গ আমাদের আর স্পর্শ করিতে পারে না। এখানে পৌঁছিবার নানা পথ আছে। কর্মযোগ সেগুলির অন্যতম। ভক্তিভাব অবলম্বনে ঈশ্বরের পূজাজ্ঞানে মানবসেবার মাধ্যমে কর্মযোগের সাধনা আমাদের প্রায় সকলেরই পক্ষে সহজসাধ্য, ইহা আমাদের ব্যক্তিগত পূর্ণতা-লাভে ও বর্তমান যুগের কয়েকটি মূল সমস্যার সমাধানে সর্বাধিক প্রশস্ত পথও।

জীব-জগৎ কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত

কর্ম বলিতে অতি সাধারণভাবে বলা যায় কোন কিছুর একটি অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পরিবর্তন; জড় পদার্থেও, মনবুদ্ধিতেও। সেজন্য জীবিকার্জনের জন্য যখন আমরা ক্ষেতে বা কারখানায় উৎপাদন করি, আফিস শিক্ষায়তন প্রভৃতি স্থানে লেখাপড়া-আলোচনাদি করি, তখন যেমন কাজ করি, তেমনি কাজ করি যখন নিশ্বাস লই বা বসিয়া বসিয়া চিন্তা করি তখনও। এমনকি যখন বসিয়া বসিয়া ভাবি আমি কিছু করিতেছি না, তখনও কাজ করি, কারণ দেহে বা বাহিরের কোন বস্তুতে পরিবর্তন না ঘটাইলেও তখন আমরা মনে পরিবর্তন ঘটাই; চিন্তা করা মানেই মনে পরিবর্তন আনা যেন কোন সরোবরের স্থির বক্ষকে তরঙ্গায়িত করিয়া তোলা। যখন আমরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকি, কোন স্বপ্নও দেখি না—মন নিস্তরঙ্গ থাকে, তখনো যে-শক্তি আমাদের শরীর গঠন ও রক্ষা করে সেই প্রাণ-শক্তি কাজ করিয়া চলে; তখনো আমরা শ্বাস গ্রহণ করি, দেহে রক্তচলাচল খাদ্যপরিপাক প্রভৃতি কর্ম তখনো চলে।

স্থূল এবং সূক্ষ্ম সমগ্র জগতের অস্তিত্ব রহিয়াছে ভগবান তাঁহার ইচ্ছাপ্রসূত নিয়ম-গুলিকে সক্রিয় রাখিয়া নিরন্তর কাজ করিতেছেন বলিয়া, বা অন্য ভাষায় প্রকৃতি নিরন্তর কাজ করিতেছে বলিয়া। সূক্ষ্ম জগতের কথা সূক্ষ্মদর্শী সত্যদ্রষ্টাগণ প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন (উহা প্রত্যক্ষ করিবার পথেরও সন্ধান সকলকেই দিয়া গিয়াছেন); সাধারণ অবস্থায় আমরা উহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না বটে, কিন্তু যেটুকু আমাদের জ্ঞানগম্য সেই স্থূল জগতের অস্তিত্বই জড়বিজ্ঞানীদের মতেই নির্ভর করিতেছে এনারজির অবিশ্রাম কাজ করিবার উপর। এনারজি অবিশ্রাম বিভিন্ন এনারজিধর্মিরূপে এবং ইলেক্‌ট্রনাদি কণাধর্মিরূপে নিজেকে পরিবর্তিত করিতেছে, কণাগুলির কয়েকটিকে সবলে কেন্দ্রে বাঁধিয়া রাখিয়া ইলেকট্রনগুলিকে

তাহার চারিদিকে নিরন্তর ঘুরাইতেছে বলিয়াই বিভিন্ন পরমাণুর অস্তিত্ব; আর এই পরমাণু-গুলিকে নানা সংখ্যায় নানা ভাবে দানা পাকাইয়া রাখিতেছে বলিয়াই বিভিন্ন অণুর অস্তিত্ব সম্ভব হইতেছে। এই অণু-পরমাণুগুলিকে লইয়া এনারজি এই জড়জগৎ ফুটাইয়া তুলিতেছে। যে ইটের টুকরাটিকে আপাতদৃষ্টিতে স্থির, নিষ্কর্মা বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহার ভিতর সারাক্ষণ এনারজির এই সব কাজ চলিতেছে বলিয়াই সেটির অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে। এনারজি যদি এসব কাজ করা বন্ধ করে, তাহা হইলে যে জগৎ আমরা দেখিতেছি তাহা তৎক্ষণাৎ লুপ্ত হইয়া যাইবে।

শক্তিই পরিবর্তনসাধন বা কর্ম করে

স্থূল সূক্ষ্ম সর্বক্ষেত্রেই অবস্থার এই পরিবর্তন ঘটায় শক্তি—স্থূল বা সূক্ষ্ম শক্তি। স্থূল জগতে যে-সব পরিবর্তন ঘটে তাহা সবই তো এনারজি ঘটায়। সেখানে যে-সব পরিবর্তন চেতন প্রাণীরা ঘটায়—যেমন পাখিরা যে বাসা তৈয়ারী করে, মানুষ ঘরবাড়ী যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করে, রান্না করে ইত্যাদি, সেগুলির পিছনে আর একটি শক্তি, ইচ্ছাশক্তি বা চিন্তাশক্তি ক্রিয়াশীল থাকে; এই সূক্ষ্মতর ইচ্ছাশক্তিই স্থূলতর এনারজিকে দিয়া কাজ করাইয়া লয়। আমাদের দেহের মধ্যে যে-সব পরিবর্তন বা কাজ চলে, যেমন রক্তচলাচল, শ্বাসগ্রহণ, খাদ্যদ্রব্যকে বিশ্লিষ্ট করিয়া উহা দ্বারা দেহের বিভিন্ন অংশের উপযোগী জীবকোষ গঠন, পুষ্টি, রক্ষণ ইত্যাদি, চিন্তা করা ইচ্ছা করা প্রভৃতি, সেগুলির পিছনে ক্রিয়াশীল থাকে ইচ্ছাশক্তি বা ইচ্ছাশক্তিচালিত প্রাণশক্তি এবং এনারজি। আলো, তাপ প্রভৃতি যেমন একই এনারজির বিভিন্ন রূপ মাত্র, সূক্ষ্মদর্শী সত্যদ্রষ্টাগণের মতে তেমনি এনারজি, প্রাণশক্তি, ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি সবই একই শক্তির বিভিন্ন পরিবর্তিত রূপ মাত্র। তাঁহারা বলেন, শক্তিরূপে শক্তির সূক্ষ্মতম অবস্থা হইল চিন্তাশক্তি বা ইচ্ছাশক্তি। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেই তাঁহারা বলেন, মূল উপাদান হইতে জীবজগতের সৃষ্টি, অবস্থান ও ঐ মূল উপাদানে লয়রূপ পরিবর্তন বা কর্মগুলি সাধিত হয় সর্ববিধ শক্তির মূল উৎস বা চরম রূপ এই ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই।

কর্মযোগের মূল কথা

অবিরাম কাজ তো চলিতেছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্রই, আমাদের সমগ্র জীবন জুড়িয়া, কিন্তু 'কাজ করিতেছি' এ বোধ জাগা সম্ভব কেবলমাত্র কোন জীবের মধ্যে, যেখানে চেতনার বিকাশ রহিয়াছে। এই চেতনার সংস্পর্শে আসিয়াই মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি—প্রাণীর স্থূলদেহের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্মদেহ—চেতন বলিয়া প্রতিভাত হয়; সেখানেই 'আমি ইচ্ছা করিতেছি' 'আমি কাজ করিতেছি' বা 'আমি কিছুই করিতেছি না', এই সব বোধ জাগে। চেতনাকে প্রকাশ করিবার উপযোগী সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত মন বুদ্ধি প্রভৃতি এবং তাহাতে চেতনার সংস্পর্শ ছাড়া এ বোধ জাগা বা ইচ্ছার বিকাশ সম্ভব হয় না। এনারজি ভাবে না যে সে কাজ করিতেছে, নিজে ইচ্ছা করিয়া সে কিছু করিতেও পারে না। একখণ্ড কাঠ বা একটি মৃতদেহ আমরা আগুনে ফেলিয়া পোড়াইতে পারি—এই দাহ হইতে নিজেকে বাঁচাইবার ইচ্ছা বা 'আমি দগ্ধ হইতেছি' এ বোধ উহাদের মধ্যে জাগে না। কিন্তু একটি পিপীলিকা যদি ঐ কাঠ বা মৃতদেহের উপর বসিয়া থাকে, আগুন জ্বলিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ নিজেকে বাঁচাইবার ইচ্ছায় সেখান হইতে সরিয়া যাইবে।

সত্যদ্রষ্টাগণ কর্মযোগ-প্রসঙ্গে এই সূক্ষ্ম স্থানটি স্পর্শ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, 'আমি করিতেছি' এই বোধটুকুকে দেহ-মন-প্রাণাদির কর্মের আবর্ত হইতে সরাইয়া লও, তাহা হইলেই তুমি সত্যলাভ, ভগবানলাভ বা জ্ঞানলাভ করিবে—মৃত্যুভয়, দুঃখ প্রভৃতির হাত হইতে চিরমুক্তি লাভ করিয়া পরমানন্দের, অমৃতের অধিকারী হইবে।

যোগ শব্দের অর্থ সংযোগ; কর্মযোগ বলিতে বুঝায় কর্মের মাধ্যমে যে-পথে আমরা ভগবানের সহিত সংযুক্ত হইতে পারি তাহাই। ভগবানলাভের জন্ম ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি আরো বহু পথ আছে। সব পথেই কিন্তু ভগবান এবং সাধক উভয়কেই চেতন সত্তা বলা হয়—কোন পথে বলা হয় এ দুটি সত্তা পৃথক, কোন পথে বলা হয় এক, এই মাত্র প্রভেদ। সাধারণ অবস্থায় আমরা দেহ প্রাণ প্রভৃতি অচেতন, কর্মের আবর্তে সদা-পরিবর্তিত পদার্থগুলির সঙ্গে আমাদের চেতন সত্তাকে জড়াইয়া ফেলিয়া সেগুলির সমষ্টিকেই 'আমি' বলিয়া ভাবি, সেগুলির পরিবর্তনে নিজেকে পরিবর্তিত বলিয়া মনে করি। যে কোন পথ অবলম্বনেই আমরা ভগবানলাভ করিতে চাই না কেন, সব পথেই সাধনার মূল লক্ষ্য হইল এই চেতন ও অচেতনের সমষ্টি হইতে চেতন অংশকে, আমরা আসলে যাহা তাহাকে পৃথক করিয়া লওয়া, পৃথক বলিয়া প্রত্যক্ষ করা। সাধনা ছাড়া ইহা হয় না, স্থূল-দেহের নাশ বা মৃত্যুতেও না; তখন আমরা স্থূলদেহ হইতে পৃথক হই ঠিকই, কিন্তু প্রাণ-মন প্রভৃতি হইতে নিজেকে পৃথক ভাবিতে পারি না। যে-কোন সাধনপথ ধরিয়া নিজেকে দেহমনাদি হইতে পৃথক বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেই উপলব্ধ হইবে যে, আমাদের স্বরূপ আসলে ভগবানই—আনন্দময় নিত্য চেতন সত্তা। হয় প্রত্যক্ষ হইবে তিনিই আমার অন্তরে, সকলেরই অন্তরে থাকিয়া আমাদের মন প্রাণ প্রভৃতিকে, এমন কি সেগুলির চালক আমাদের অহঙ্কারকেও পরিচালিত করিতেছেন—তিনি যেন যন্ত্রী, আমরা যন্ত্র; অথবা তাঁহার যন্ত্ররূপ আমিবোধও থাকিবে না, প্রত্যক্ষ হইবে তিনি ও আমি এক—কর্মের কর্তা নয়, উহার সাক্ষিস্বরূপ। উভয় অবস্থায় এই সামান্য পার্থক্যটুকু থাকিলেও কোন ক্ষেত্রেই তখন আর 'আমি করিতেছি' এ বোধ জাগে না।

কর্মযোগের সাধন

কর্মযোগের সাধনায় এই উভয়বিধ ভাবে সিদ্ধ ব্যক্তিগণের উপলব্ধিকে সর্বদা ধারণায় রাখিয়া প্রত্যেকটি কর্ম করিতে হয়—একটি ভক্তির ভাব অবলম্বনে, অপরটি জ্ঞানের ভাব অবলম্বনে; জ্ঞান বা ভক্তির সংস্পর্শরহিত বিশুদ্ধ কর্মযোগের সাধনা খুবই কঠিন। সিদ্ধ ব্যক্তি-গণের আচরণ অনুকরণের প্রচেষ্টাই সাধনা। যেমন তবলা বাজানো শিখিতে হইলে যিনি ঐ বাজনায় সিদ্ধ এমন একজনের, ওস্তাদের কাছ হইতে প্রথমে দেখিয়া লইতে হয় তিনি কেমন বাজান। ওস্তাদ যেভাবে বাজাইয়া দেখাইলেন, ঠিক সেরূপ বাজনা হাতে তুলিতে শিক্ষার্থী প্রথম প্রচেষ্টায় কখনই পারিবে না, হয়তো কয়েক মাস বা কয়েক বছরের প্রচেষ্টার প্রয়োজন হইবে। তবু তবলা বাজানো শিখিতে হইলে শিক্ষার্থীকে অপটু অশিক্ষিত হাতের প্রথম চেষ্টা হইতে শুরু করিয়া শিক্ষার শেষ পর্যন্ত প্রতিবারই চেষ্টা করিতে হইবে ওস্তাদ যেমন বাজাইয়াছেন ঠিক তেমনি ভাবে বাজাইবার।

তাই ভক্তিভাব অবলম্বনে যাঁহারা কর্মের মাধ্যমে ভগবানলাভ করিতে চান, তাঁহাদের

প্রত্যেকটি কর্ম করিবার সময় স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করিতে হয়, 'ভগবান আমার মধ্যে, প্রত্যেকের মধ্যেই থাকিয়া আমাদের চালাইতেছেন,' 'তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র'; অথবা 'তাঁহারই তৃপ্তির জন্য কর্ম করিতেছি,' 'কর্মের মাধ্যমে তাঁহারই পূজা করিতেছি,' 'মানুষের ভিতর তিনিই আছেন, মানুষের সেবা তাঁহারই পূজা', ইত্যাদি। এই ভাব লইয়া কর্ম করিতে করিতে সে-ভাব ক্রমশঃ হৃদয়ে দৃঢ়মুদ্রিত এবং কর্ম ক্রমশঃ সে-ভাবানুরূপ হইতে থাকে, ক্রমশঃ হৃদয়ে ভগবানের অস্তিত্ব উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতে থাকে। আমাদের দেহমন-প্রাণাদিতে আমিত্বের বাঁধনও সেই সঙ্গে শিথিল হইতে থাকে।

জ্ঞানের ভাব অবলম্বনে যাঁহারা কর্মের পথে চলিতে চান, তাঁহাদের প্রত্যেকটি কর্মসম্পাদনের সময় ইহাই ভাবিতে চেষ্টা করিতে হয়, "স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ যে মূল উপাদানে ঠিত সেগুলি, এবং মন, বুদ্ধি ও তাহাদের মূল উপাদান—এ-সবই হইল প্রকৃতি; এই প্রকৃতির গুণেই সব কিছু ঘটিতেছে, আমি কিছুই করিতেছি না, আমি পরিবর্তনহীন চৈতন্যস্বরূপ; শুধু আমি নই সকলেই তাই। 'আমি করিতেছি' এ বোধ জাগিতেছে শুধু এই প্রকৃতির সহিত—দেহ-প্রাণ-মন প্রভৃতির সহিত —নিজেকে জড়াইয়া রাখিয়াছি বলিয়া, এইগুলিকে 'আমি' বলিয়া, এগুলির পরিবর্তনকে আমার পরিবর্তন বলিয়া ভাবিতেছি বলিয়া।" এভাবে চলিতে চলিতে তাঁহারা শেষে এই প্রকৃতি হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথকরূপে প্রত্যক্ষ করেন। তখন তাঁহাদের দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধি প্রচণ্ড-কর্মতৎপর থাকিলেও এ বোধে তাঁহারা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকেন—'নৈব কিঞ্চিৎ করোমি'—আমি কিছুই করিতেছি না। অপর কোন মানুষ কাজ করিলে বা চিন্তা করিলে, সুখদুঃখাদিতে চঞ্চল হইলে বা বিচার করিলে আমরা যতখানি স্পষ্টভাবে অনুভব করি আমি এসব করিতেছি না, নিজের সক্রিয় দেহমনাদির বেলাও তাঁহারা ততখানি স্পষ্টভাবে অনুভব করেন যে তিনি এসব কিছুই করিতেছেন না।

নিরন্তর পরিবর্তন বা কর্ম ছাড়া স্থূল-সূক্ষ্ম কোন জগতের অস্তিত্বই থাকে না; কিন্তু সে-জগতের মধ্যে থাকিলেও কর্মের পথে ভক্তি বা জ্ঞান যে-কোন ভাব লইয়াই অগ্রসর হওয়া যাউক না কেন উভয় ভাবের অন্তেই সাধক দেখেন যে, সেসব কাজের—স্থূলবস্তুর পরিবর্তনেরই হউক অথবা চিন্তা বা সুখদুঃখাদির অনুভতিরূপ চিত্তের পরিবর্তনেরই হউক—কর্তা তিনি নহেন। একজন দেখেন, 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ', 'প্রকৃতির গুণেই সব কাজ হইতেছে', আর অপরজন দেখেন, ঈশ্বরেচ্ছায় সব হইতেছে, 'তাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটিও নড়ে না', ঈশ্বরই কর্তা

ভক্তি-ভাবাশ্রিত কর্মযোগই যুগসমস্যা-সমাধানের প্রশস্ত পথ

জ্ঞান বা ভক্তি কোন অবলম্বন না রাখিয়াও কর্মযোগের সাধনা করা যায়; নিজের জন্য কোন কিছু না চাহিয়া, কর্মের সফলতায় বা বিফলতায় সমভাবে নির্বিকার থাকিয়া, আসক্তিশূন্য হইয়া কর্তব্য কর্ম করিতে পারিলে কর্মযোগসাধনের ফল লাভ করা যায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কোন অবলম্বন ছাড়া তাহা করা প্রায় সকলের পক্ষেই অসম্ভব। জ্ঞানের ভাব অবলম্বন করিয়া কর্মের পথে চলিবার লোকও বিরল। ভক্তিভাবাশ্রয়ে কর্মের পথে আমরা সকলেই চলিতে পারি।

কর্মযোগের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল—ইহার জন্ম আমাদের কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের কোন প্রয়োজনই হয় না; ক্ষেত-খামারে, কারখানায়, আফিসে, বিদ্যায়তনে, গৃহস্থালীতে, সমাজসেবার ক্ষেত্রে, রাজনীতিক্ষেত্রে আমরা যে যেখানে যাহা করিতেছি সেই কর্মকেই ইহার সাধনরূপে গ্রহণ করিতে পারি। প্রয়োজন শুধু ভাবের পরিবর্তন। কর্মযোগ-সাধনার সব কিছু নির্ভর করে কি ভাব লইয়া আমরা কাজ করিতেছি তাহার উপর, কি কর্ম করিতেছি তাহার উপর নয়।

কর্ম তো আমাদের করিতেই হয়; কর্মীর মনোভাবের উপর, কর্মের প্রতি তাহার আগ্রহ ও উদাসীনতা বা বিরক্তি, শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা প্রভৃতির উপর কর্মের মানও যে নির্ভরশীল, ইহাও আমাদের অবিদিত নয়। সর্বাধিক শ্রদ্ধার, পূজার ভাব লইয়া প্রত্যেকটি কর্ম সম্পাদনের চেষ্টা যদি আমরা সকলেই করি তাহা হইলে কর্মের দিক দিয়াই সমাজ ও রাষ্ট্রের লাভ বই লোকসান হইবে না। সেইসঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে কর্মীও লাভবান হইবেন প্রচুর পরিমাণে। এভাবে প্রত্যেক কর্মকে কর্মযোগে, ভগবানলাভের বা সত্যলাভের পথে পরিণত করার প্রচেষ্টায় সামান্য সফলতাও যদি আসে, তাহারই ফল হইবে প্রচেষ্টার তুলনায় বহুগুণ অধিক। এই কর্মযোগ-প্রসঙ্গেই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, কর্মযোগের অতি সামান্য অনুষ্ঠানও মানুষকে মহাভয়ের হাত হইতে রক্ষা করে—'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'।

ভক্তিভাবাশ্রিত কর্মযোগের সাধনা কেবল যে ব্যক্তি ও জাতিকেই লাভবান করিবে তাহা নহে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইহার অবদান হইবে অপরিমেয়। মানুষের সেবায় ভগবানেরই পূজা হইতেছে—এই ভাব লইয়া কর্ম করিতে করিতে এ বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ়তর হইতে থাকে যে, যে-ভগবান আমার ভিতর রহিয়াছেন, তিনিই রহিয়াছেন সকলের ভিতর, 'তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র'—একথা শুধু আমার বেলাই নয়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের বেলাই সত্য। ফলে, যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও কাহারো প্রতি ক্রোধ ও বিদ্বেষের ভাব হৃদয়ে আর স্থান পায় না, সব দেশের সব ধর্মের সব মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ক্রমশই হৃদয়ে গভীর হইতে থাকে; সব মানুষই যে মূলতঃ এক, আসলে সকলেই ঈশ্বর-স্বরূপ—এ ধারণার আলোক সর্ববিধ ভেদজ্ঞানের অন্ধকার সরাইয়া হৃদয়কে উদ্ভাসিত করিতে থাকে। সব মানুষের সমভাবে কল্যাণ-কামনা, সব মানুষকেই মূলতঃ এক বলিয়া ভাবা—সাম্য ও একত্বাভিমুখতা—ইহাই তো এ যুগের মানবচিত্তসায়রে সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক ব্যাপক চিন্তা-তরঙ্গ। কিন্তু এ চিন্তাকে সর্বমঙ্গল-সমন্বিত করিয়া এখনো আমরা মূর্ত করিয়া তুলিতে পারিতেছি না; বাস্তবক্ষেত্রে বাধা অনেক, আমরা এখনো তাহা সরাইবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না। যতদিন পর্যন্ত যে-কোন আকারেই হউক প্রতিদানে নিজের জন্য কিছু চাহিয়া বা উপকারকের আসনে বসিয়া আমরা মানুষের কল্যাণ করিতে চাহিব, ততদিন ইহাকে সর্বাঙ্গীণ করিয়া, সর্ববাধামুক্ত করিয়া কিছুতেই মূর্ত করিতে পারিব না। সব মানুষ যেখানে যথার্থই এক, জাতি ও সম্প্রদায়, দৈহিক ও মানসিক আকৃতি, সম্পদ ও দারিদ্র্য, বিদ্যা ও মূর্খতা প্রভৃতি ভিত্তিক কোন ভেদই যেখানে পৌছিতে পারে না, সেখানকার সন্ধান যতদিন না আমরা পাইব ততদিন যথার্থ সাম্যের ভাব, সব দেশের সব ধর্মের

সব মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা কখনও আসিবে না, এখন যেমন রহিয়াছে তেমনি কৃত্রিমরূপে এবং আলোচনায় ও আকাঙ্ক্ষাতেই তাহা থাকিয়া যাইবে।

ভক্তিভাবাশ্রিত কর্মযোগের সাধনা এই উভয় লক্ষ্যেই আমাদের পৌঁছাইয়া দিতে পারে। মানুষের কল্যাণসাধনকালে এই সাধনা সাধককে উপকারকের উচ্চাসনে বসায় না, মানুষকে সর্বোচ্চ আসনে বসাইয়া সে সাধককে বসায় তাহার পাদমূলে, পূজকের আসনে। আর মানুষকে দেখিবার সময় মানুষে-মানুষে পার্থক্য যাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকে, চিরদিনই থাকিবে, সেই দেহমনবুদ্ধি হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া সে নিবদ্ধদৃষ্টি হয় আরো গভীর প্রদেশে—যেখানে সব মানুষই এক।

সব দেশের সব মানুষকে সমভাবে ভালবাসিবার অতিপ্রয়োজনীয়তার কথা আজ আমরা আলোচনা করিতেছি যুগধর্মে, যুগপ্রয়োজনে, বিশেষ করিয়া মানবজাতির বাঁচিয়া থাকিবারই প্রয়োজনে। কিন্তু ইহাকে বাস্তবে রূপায়িত করার ঠিক পথ এখনো খুঁজিয়া পাইতেছি না। এবিষয়ে আমাদের আলোচনা ও প্রচেষ্টা শুরু হইবার বহু পূর্বে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব পথ দেখাইয়া গিয়াছেন—জনকল্যাণসাধনের এ প্রচেষ্টা ভগবদ্ভক্তিকে ভিত্তি করিয়া করিতে হইবে, নিজের কোন জাগতিক প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য তো নয়ই, করুণা করিয়াও নহে, ভগবানের পূজাজ্ঞানে উহা করিতে হইবে—'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' করিতে হইবে। ভক্তি ছাড়া মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞান করা সম্ভব নয়, ভক্তি ছাড়া স্বার্থসম্ভূত ভালবাসার সঙ্কীর্ণ বিবর হইতে বাহির হইয়া বিশ্বপ্রেমের উন্মুক্ত প্রান্তরে আসাও অসম্ভব। একদিন কর্মযোগ-প্রসঙ্গে, স্কুলহাসপাতাল-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জনহিতকর কর্মানুষ্ঠান-প্রসঙ্গে কর্মের সহিত ভগবানে ভক্তির একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়া শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, বিশ্বজনীন ভালবাসা ভগবদ্ভক্তিসহায়েই সম্ভব—"সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোকদের ভালবাসা, এটি দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়।" দয়া মানে এখানে করুণা নয়, মায়ার বিপরীতার্থক, বিশ্বপ্রেম: "মায়া কাকে বলে জান? বাপ-মা, ভাই-ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র, ভাগিনা-ভাগিনী, ভাইপো-ভাইঝি এই সব আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসা। আর দয়া মানে সর্বভূতে ভালবাসা।" "আমার জিনিস আমার জিনিস বলে সেই সকল জিনিসকে ভালবাসার নাম মায়া।" "শুধু ব্রাহ্মসমাজের লোকগুলিকে ভালবাসি, কি শুধু পরিবারদের ভালবাসি, এর নাম মায়া।" "সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া।"

প্রাচীন ভারতে সমাজবিপ্লব

ডক্টর ভকতপ্রসাদ মজুমদার

প্রত্যেক সভ্যতার মূলেই সমাজ। সমাজ আছে বলেই রাজ্য, রাষ্ট্র, রাজা, প্রজা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সমাজকে কেন্দ্র করে মানবসভ্যতার ইতিহাস রচিত হ'তে থাকে। অথচ নারাশংসীর কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত অনেকের ধারণা যে, রাজবংশমালা ও জয়পরাজয়ের ইতিহাসই হ'ল ভারতের প্রকৃত ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের ইতিহাসকে দুঃস্বপ্নকাহিনী বলেছেন। তিনি 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ঐ রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তন-স্বপ্নদৃশ্যগুলির বর্ণনা সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "ভারতবর্ষের যে-ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন-কাহিনীমাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপ-ছেলেয় ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, এক দল যদি বা যায়, কোথা হইতে আর-এক দল উঠিয়া পড়ে—পাঠান-মোগল, পর্তুগীজ-ফরাসী-ইংরেজ, সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে"। (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৪.৩৭৭-৩৭৮)।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক সি. এইচ. ফিলিপ্‌স্ মহাশয়ের সম্পাদনায় 'Historians of India, Pakistan and Ceylon' প্রকাশিত হয়েছে। এই বৃহৎ গ্রন্থটিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস যাঁরা রচনা করেছেন তাঁদের অবদান আলোচিত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে একটি পঙ্‌ক্তিও লেখা হয়নি। আর রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চেতনা সম্বন্ধে কেবলমাত্র ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বিবৃতিতে কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় (পৃঃ ৪২৭)।

ইতিহাসের যুক্তি ঠিকমতন দিতে পারা এবং ইতিহাসের ইঙ্গিত লক্ষ্য করতে পারাই চিন্তাশীল ঐতিহাসিকের কর্তব্য। যে কয়জন ভারতবর্ষের সমাজের ইতিহাস আলোচনা করেছেন তার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের অবদান অতি মূল্যবান। এঁরা পেশাদার ঐতিহাসিক নন। কিন্তু এঁদের ইতিহাসবোধ অত্যন্ত প্রখর। এঁরা কেবল সমাজের অতীত ইতিহাসের গতিই লক্ষ্য করেননি, তৎসঙ্গে ভাবীকালের সমাজকেও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন, প্রাচীনকাল হ'তে ভারতে রাষ্ট্রীয় শক্তি কোন্ কোন্ শ্রেণীর হাতে পরপর এসেছে। শুধু ভারতের নয়, সারা জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা করেই ভারতের তথা সারা জগতেরই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি অভ্রান্ত সিদ্ধান্তগুলিতে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সমাজবিকাশের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ দেখেছিলেন যে, যুগে যুগে এক একটি বর্ণ বা শ্রেণীর প্রাধান্য দেখা দেয়। অন্যান্য দেশের মত ভারতের আদিকালে পুরোহিতশ্রেণী সমাজের নেতৃত্ব করেছিল। যদিও তারা যুদ্ধ ও কূটনীতির পরামর্শ দিত, তথাপি তাদের জন্যই জড়ের উপর চেতনের অধিকার বিস্তৃত হ'ল। পুরোহিতদের প্রাধান্যের ফলেই মানুষ নিজের মধ্যে পরমাত্মার অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পেরেছিল (বর্তমান

ভারত, ৭ম সং ; পৃঃ ১৫)। কিন্তু যে শ্রেণীর আধিপত্য যতই ব্যাপক হোক না কেন তা চিরস্থায়ী হয় না। সমাজ-সমুদ্রে কোন তরঙ্গ চিরকালের জন্য মাথা উন্নত রাখতে পারে না। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মানুসারে বৌদ্ধযুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করল। চারুকলা ও সামাজিক সংস্কৃতির উন্নতি হ'ল। তারপর বর্তমান যুগ বৈশ্যযুগ। আগামীকালে আসবে শূদ্রের যুগ, শূদ্রের প্রাধান্য: "এমন সময় আসিবে যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে,...শূদ্র-ধর্মকর্ম সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে...। সোস্যালিজম্, এনার্কিজম, নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা"—('বাণী ও রচনা'—৬ষ্ঠ, ২৪১ পৃঃ)। সহস্র বৎসরের অত্যাচারে জর্জরিত শূদ্রদের আহ্বান করে বিবেকানন্দ লিখেছিলেন, "নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে-মালা-মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে, বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত থেকে" ('পরিব্রাজক', পৃঃ ৪২-৪৩)। ভারতবর্ষের সমাজে শূদ্র অথবা বৈশ্যের প্রধানতা হবে বা হয়েছিল এরূপ সিদ্ধান্তে রবীন্দ্রনাথ উপনীত হননি। তিনি লিখেছিলেন, "স্বধর্মরত শূদ্রের সংখ্যাই ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশী" (কালান্তর, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', ২৪.৩.৬৫)। আধুনিক ভারতে শূদ্রের সংখ্যাধিক্য হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ সমাজসংস্কারের নেতৃত্ব করবার ভার ব্রাহ্মণদের দিয়েছিলেন। 'ব্রাহ্মণ' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "বর্তমান সমাজেরও যদি একটা মাথার দরকার থাকে, সেই মাথাকে যদি ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা যায়, তবে তাহার স্কন্ধকে ও গ্রীবাকে একেবারে মাটির সমান করিয়া রাখিলে চলিবে না। সমাজ উন্নত না হইলে তাহার মাথা উন্নত হয় না এবং সমাজকে সর্বপ্রযত্নে উন্নত করিয়া রাখাই সেই মাথার কাজ" ('রবীন্দ্র-রচনাবলী' ৪.৩৯৫)। স্মরণ রাখা উচিত যে, রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র শব্দদ্বয় বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। ব্রাহ্মণত্ব ও যথার্থ স্বাধীনতা সমার্থক। ব্রাহ্মণ স্বার্থসংগ্রামের ঊর্ধ্বে। শূদ্রত্ব হ'ল ক্ষুদ্রত্ব। সেই ব্যক্তিই শূদ্র যে আত্মবিস্মৃত, যে চিত্তবৃত্তিকে বিসর্জন দিয়ে জাতিগত ধর্ম পালন করছে। সুতরাং ব্রাহ্মণের সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও যে ব্রাহ্মণ জড়, সে শূদ্র বলেই পরিগণিত হবে।

ভারতীয় সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল চাতুর্বর্ণ্যপ্রথা। আর্যীকরণের প্রথম স্তরেই দেখতে পাওয়া যায় এই প্রথা। এ ব্যবস্থা পৃথিবীতে অতুলনীয় এবং একদিক থেকে সর্বগ্রাসী। অন্যদিকে এ ব্যবস্থার ফলে ধর্মসূত্র ও মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের কাল থেকে রঘুনন্দন-কমলাকরের সময় পর্যন্ত আর্যবহির্ভূত জন ও কোমের স্তর-উপস্তরকে চতুর্বর্ণের কাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করানো হয়েছে। চার বর্ণের ইতিহাসই ভারতের সমাজ-চিন্তার ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের মতে প্রাচীন ভারতের আদিকালে আর্যদের মধ্যে তিনটি বর্ণ ছিল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। যাকে আমরা চতুর্থ বর্ণ বলি অর্থাৎ শূদ্র আর্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাঁর মতে অনার্য কোমগুলি যেমন, সাঁওতাল, কোল ও ধাঙড়েরা ছিল শূদ্র। আদি কোমগুলি যে আর্য ছিল না এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কোমগুলিকে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে

দস্যু, ম্লেচ্ছ, পাপ ইত্যাদি। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ, মগধ, চের ও পাণ্ড্য কোমগুলিকে বয়াংসি বা পক্ষীবিশেষ বলা হয়েছে। বোধায়নের ধর্মসূত্রের কালে আরট্ট (পাঞ্জাব), পুণ্ড্র (উত্তরবঙ্গ), বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ), কলিঙ্গ প্রভৃতি কোমের লোকেরা আর্য-অধ্যুষিত দেশে বাস করত না। এদের নিবাসস্থানকে বলা হয়েছে "সংকীর্ণযোনয়ঃ"। মনুস্মৃতিতে এবং ভাগবতে কোমবাসীদের ব্রাত্য বা পতিত এবং 'পাপ' বলা হয়েছে। সুতরাং কোমের লোকগুলি এবং শূদ্রদের বাদ দিয়ে তিনটি উচ্চ বর্ণের সবাই ছিল দ্বিজ। তিন বর্ণেরই শিক্ষালাভের সমান অধিকার ছিল। রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল যে, বর্ণগুলির মধ্যে কর্মের প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও এরা পরস্পর পরস্পরকে আদর্শের বিশুদ্ধি-রক্ষায় সাহায্য করত। যতদিন পর্যন্ত এক বর্ণের লোকেরা অন্য বর্ণের লোকেদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেছিল, যতদিন ক্ষত্রিয় রাজ্যরক্ষার সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করেছিল এবং বৈশ্যেরা আর্যসমাজ ও রাষ্ট্রকে সঞ্জীবিত করেছিল, ততদিন প্রত্যেক আর্যই ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত ছিল।

হিন্দুসমাজ জীবন্ত। তাই সমাজে বিভিন্ন বর্ণের ও শ্রেণীর লোকদের উন্নতি-অবনতি ঘটতে থাকে। বৈদিক কালের শেষের দিকে দেখা গেল ত্যাগের আদর্শ থেকে আর্যেরা বিচ্যুত হয়েছে। ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতারা বংশানুক্রমে ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্বের ব্যবস্থা করলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণের নরনারীর যৌনমিলনকে কেন্দ্র করে অসংখ্য জন ও কোমবাসীদের বর্ণব্যবস্থা আনা হ'ল। ঐ ব্যবস্থার পিছনে কোন একটি বিশেষ নিয়ম ছিল না। বৃত্তির দিকে লক্ষ্য রেখে যে জাতি-নির্ণয় হয়েছিল, তাও বলা চলে না। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুই বা ততোধিক ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত নিম্নজাতির পিতামাতা বা বৃত্তির মধ্যে মিল দেখা যায় না। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সূতের উল্লেখ অথর্ববেদে (৩. ৫. ৬. ৭) আছে। বোধায়ন-ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে যে, বৈশ্য পিতার ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভের সন্তান সূত। কিন্তু বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রে সূতের পিতা ক্ষত্রিয় ও মাতা ব্রাহ্মণী। সূতের বৃত্তি সম্বন্ধেও নানা মত। মনু (১০.৪৭) বলেন যে, সূতের বৃত্তি রথচালনা। বৈখানস স্মার্ত-সূত্র (১০. ১৩) অনুসারে সূতের কার্য ছিল রাজাকে কর্তব্য সম্বন্ধে স্মরণ করানো এবং তাঁর জন্য রন্ধন করা। যাই হোক, বৃত্তিভেদ যেদিন ধর্মশাসনের অন্তর্গত হ'ল সেদিন থেকে ভারতের দুর্দিন উপস্থিত হ'ল। বংশানুক্রমে বৃত্তি-নির্দেশের কি বিষম পরিণাম তা স্বল্প কথায় রবীন্দ্রনাথ এইভাবে ব্যক্ত করেছেন: ঐ ব্যবস্থার ফলে উচ্চতর বর্ণের চিত্তের বিকাশ অবরুদ্ধ হ'ল। নিম্নতর জাতির মধ্যে আনুষ্ঠানিক আচার ও বৃত্তি বংশানুক্রমে চলতে থাকায় মানুষ যন্ত্রে পরিণত হ'ল। কুম্ভকার, তৈলিক প্রভৃতি জাতির উল্লেখ করে তিনি লিখেছিলেন: "এই সকল হাতের কাজেরও নূতনতর উৎকর্ষ সাধন করতে গেলে চিত্ত চাই। বংশানুক্রমে স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে তার উপযুক্ত চিত্তও বাকি থাকে না, মানুষ কেবল যন্ত্র হয়ে একই কর্মের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে" ('রবীন্দ্র-রচনাবলী', ২৪.৩৬৫)। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে শূদ্র ও নিম্নজাতিরা কেন বর্ণব্যবস্থার কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসেনি? গুপ্তযুগের পূর্বেই যে শূদ্রেরা বৈশ্যদের কিছু অধিকার পেয়েছিল তা কি ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারদের দান? কৌটিল্যের সময় যে ক্ষেত্রকরেরা ফসলের অর্ধভাগ পাবার অধিকারী হয়েছিল তা কি

সমাজ-ব্যবস্থাপকদের উদারতার ফলে? মনুর ব্যবস্থা অনুসারে ব্রাহ্মণের পক্ষে সূত্রকার, চিকিৎসক, কর্মকার, স্বর্ণকার ইত্যাদির কাছ থেকে অন্নগ্রহণ করা দূষণীয় ছিল। অথচ পাল আমলের সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের দরবারগুলিতে চিকিৎসকদের অবাধ গতি দেখা যায়। প্রাচীন ভারতের শেষ পর্যায়ে সমাজে চিকিৎসকদের অবস্থা অনেক উন্নত হয়ে গিয়েছিল। তবে কি সমাজ-ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটেছিল?

সমাজবিপ্লব শব্দটি রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে ব্যবহার করেছেন। সমাজে যখন নবীন ও পুরাতনের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় তখন সমাজ-বিপ্লব ঘটে। প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের আদর্শের সংঘাতের ফলেই সমাজবিপ্লব ঘটেছিল। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের কাহিনীর মধ্যেই সমাজবিপ্লবের ইতিহাস। বশিষ্ঠ ছিলেন সনাতন ব্রাহ্মণধর্মের পরিপোষক; বিশ্বামিত্র ক্ষত্রঋষি। কিন্তু ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মধ্যে এ বিরোধ ভাবগত। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের মতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের একই সৃজন-শক্তি। তিনি ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যে দীর্ঘকালীন সংঘর্ষ দেখেননি, কেননা তাঁর ব্রাহ্মণ পূর্বধারা ও নবীন ধারার মধ্যে প্রতিবারই সমন্বয় রক্ষা করে এসেছে। আমরা যে সমাজ-বিপ্লবের কথা আলোচনা করছি, সেটি হ'ল শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সংঘর্ষ, বর্ণের সঙ্গে বর্ণের বিরোধ। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা উৎপাদক-শ্রেণীর হাতে কেন আসেনি? প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বৈশ্য-শূদ্রের অথবা বণ্টকদের সঙ্গে বহু উৎপাদনকারীর সংঘর্ষ হবার সম্ভাবনা ছিল। দানস্তুতিগুলি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ক্ষত্রিয়ের হাতেই ধনবণ্টনের ক্ষমতা ছিল। রাজার অভিষেক-উৎসবের বিবরণগুলি পড়লে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ-সংহিতার যুগে ধন উৎপাদন করত বৈশ্য ও শূদ্রেরা, ধনবণ্টন করত ক্ষত্রিয়েরা, আর ব্রাহ্মণেরা না ছিলেন উৎপাদক, না বণ্টক। সুতরাং বৈদিক যুগেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ হ'তে পারত। বৌদ্ধযুগে বৈশ্যদের প্রাধান্য ছিল। শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডদ ছিলেন শ্রেষ্ঠী। গৌতম বুদ্ধকে জেতবন দান করবার অনেক আগে থেকেই তাঁর দানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি যে শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, সেই শ্রেণীর অনেকেই বৌদ্ধসংঘের জন্য দান দিয়েছিলেন। মহাপরি-নির্বাণসূত্রের কর্মকার চুন্দ একদিকে শিল্পী, অন্যদিকে ধনশালী। সুতরাং বৌদ্ধযুগে শিল্পী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর হাতে ধন ছিল। অন্যদিকে আবার ঐ যুগেই দেখতে পাই হীন শিল্পীদের মর্মন্তুদ অবস্থা। সুত্তবিভঙ্গে কুম্ভকার, চর্মকার, তন্তুবায়, নাপিত সবাই হীন শিল্পীর দলে। এদেরও আবার নীচে হীনজাতি, যেমন রথকার, চণ্ডাল, নিষাদ, বেণুকার। গুপ্তযুগে আবার দেখতে পাই রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ামক ও শ্রেষ্ঠী শ্রেণীর মধ্যে আপসব্যবস্থা। শ্রেষ্ঠীরা রাষ্ট্রকে সাহায্য করত। মুদ্রারাক্ষসের চন্দনদাস রাষ্ট্রশ্রেষ্ঠীর সম্মান পেয়েছিলেন। বাঙ্গলাদেশে ও বৈশালীতে সার্থবাহ ও শ্রেষ্ঠীরা অধিকরণের সদস্য হত। গুপ্তযুগে অতুল ধন যে ব্যবসায়ী শ্রেণীর হাতে এসেছিল, তার বিরুদ্ধেও তো কোন শ্রেণী-আন্দোলন দেখা দেয়নি। এরই সঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত সমাজসেবক শ্রেণীর কথা। চণ্ডালের মতন জাতি প্রাচীন ও মধ্য-যুগে বরাবরই অস্পৃশ্য থেকে গেল। বৌদ্ধ-যুগেও এরা স্পৃশ্য হয়নি। বারাণসীর এক শ্রেষ্ঠী-কন্যা চণ্ডালকে দেখে চোখ ধুতে গিয়েছিল। অনুরূপ ঘটনা একবার নয়, বৌদ্ধযুগে অনেক

বারই হয়েছিল। তবু চণ্ডাল, নিষাদ, পুক্কসেরা কেন এ অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করেছিল?

নিম্নবর্ণের ও অসংখ্য উৎপাদকশ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত সমাজবিপ্লব প্রাচীন কালে না দেখা দেবার অনেকগুলি কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের মতে বংশানুক্রমে বৃত্তি-পালনের জন্যই তা সম্ভবপর হয়নি। মানুষ যখন একই কর্ম বংশানুক্রমে করতে থাকে তখন সে যন্ত্রে পরিণত হয়। যন্ত্রের চিত্ত থাকে না। তাই শিল্পী ও নিম্নশ্রেণীর সমাজ-সেবকরা নিজেদের অবস্থা উন্নত করবার চেষ্টা করেনি। এ ধরনের ভাবগত ব্যাখ্যা ছাড়াও সম্ভবতঃ বর্ণব্যবস্থা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের জন্যেই বিপ্লব দেখা দেয়নি। প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণ কেবলমাত্র সমাজসেবক। সুতরাং তাঁরা শ্রেষ্ঠ মর্যাদা পেলেও সাধারণতঃ তাদের পুঁজির বাহুল্য ছিল না। ক্ষত্রিয় কোনদিনই উৎপাদকের কাজ করেনি। বৈশ্য যদিও ধনের উৎপাদনকারী ও বণ্টনকারী, তথাপি এদের সামাজিক মর্যাদা ছিল নিম্নশ্রেণীর। তা ছাড়া বৈদিক যুগ থেকেই বৈশ্য ব্যবসায়ী ও ক্ষেত্রকর শ্রেণী করদাতা। মৌর্যযুগে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদক শ্রেণীর উপর করভার বেড়ে যায়। ব্যবসায়ীর ধনের প্রতিও রাষ্ট্রের লোলুপ দৃষ্টি সর্বদাই থাকত। প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রের গুপ্তচর ছলে ব্যবসায়ীর অর্থ হরণ করত। কুষাণ ও গুপ্তযুগে ব্যবসার বৃদ্ধি হলেও ব্যবসায়ী শ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্রের নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি পায়নি। শ্রেণী ও নিগমের প্রতি ছিল রাজার সজাগ দৃষ্টি। নারদের নিয়ম থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ী একত্র হতে পারত না। সুতরাং পুঁজি মুষ্টিমেয় বণিকের হাতে জমা হবার সম্ভাবনা কমই ছিল। তদুপরি প্রাচীন ভারতবর্ষে কেবলমাত্র উৎপাদনকারীরাই সহযোগিতা করে ব্যবসা করতে পারত। পুঁজি যাদের হাতে থাকত, তারা উৎপাদকের ব্যবসা-প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে পারত না। এ ধরনের নিয়ম থাকায় প্রাচীন ভারতবর্ষে কোন যুগেই শিল্পিশ্রেণী ধনিকশ্রেণীর কাছ থেকে অর্থসাহায্য পায়নি। বৃহদাকারের শিল্প-প্রতিষ্ঠান ভারতে এই জন্যই সম্ভবপর হয়নি, হয়তো এই কারণেই ভারতে ইংলণ্ডের মতন শিল্পবিপ্লব দেখা দেয়নি। তাই একদিকে শিল্পীরা পুঁজিপতির বিরুদ্ধে একত্র হ'তে পারেনি, আর অন্যদিকে শ্রেষ্ঠীরা পুঁজিপতিরা বিলাসময় জীবন যাপন করে বা ধর্মকার্যে অর্থব্যয় করে পুঁজি খরচ করত। শ্রেণী-বিভাজন ও বর্ণের যুগপৎ অস্তিত্বের জন্যই প্রাচীন ভারতে সমাজবিপ্লব ঘটেনি। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সাময়িক দ্বন্দ্ব হলেও, এই দুই উচ্চ বর্ণের সঙ্গে বৈশ্য, শূদ্র বা নিম্ন জাতির লোকেদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়নি। শেষোক্ত বর্ণ বা নিম্নজাতির লোকেরা নিজেদের শক্তি অথবা সাধারণ স্বত্ববুদ্ধি সম্বন্ধে সচেতন ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "সাধারণ প্রজা সমস্ত শক্তির আধার হইয়াও পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া আপনাদের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে।" তাঁর সময়ে এই সচেতনতার ঈষৎ উন্মেষ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু একতাবন্ধন তখনো আসেনি: "ভারতেতর দেশে শূদ্রেরা যেন কিঞ্চিৎ বিনিদ্র হইয়াছে।" কিন্তু, "যে একতাবলে দশ জনে লক্ষ জনের শক্তি সংগ্রহ করে, সে একতা শূদ্রে এখনও বহুদূর।" ('বর্তমান ভারত', পৃ ২৯, সপ্তম সংস্করণ)।

স্বামীজীর স্বরূপ

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী ধ্যানানন্দ

(৩) 'নর'-ঋষি :

সঙ্গীতকে উপলক্ষ্য ক'রে ১৮৮১ সালের সম্ভবতঃ নভেম্বর মাসে ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের ভবনে আনন্দোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রথম মিলন সংঘটিত হয়েছিল। এটি অবশ্য স্থূল কথা। স্বামীজীর ভাষায়—'তত্ত্বজ্ঞের এ নহে বারতা'। কারণ, প্রথম পর্বে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে অতীন্দ্রিয় দিব্য-দর্শনের কথার উল্লেখ করেছি তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তাঁদের এই মিলন প্রথম মিলন নয়। সে যাই হোক, ঐ দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথকে দক্ষিণেশ্বরে যেতে আমন্ত্রণ জানান এবং তদনুযায়ী তিনি কয়েক সপ্তাহ পরে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। নরেন্দ্রনাথ 'মন চল নিজ নিকেতনে'—এই গানটি গাইলে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে নিজ কক্ষসংলগ্ন উত্তরের নির্জন বারাণ্ডায় নিয়ে গিয়ে করযোড়ে, দেবতার মত সম্মান প্রদর্শন করে বলেন—'জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নর-রূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীর ধারণ করিয়াছ' ইত্যাদি ('লীলাপ্রসঙ্গ', ৫ম খণ্ড, ১০ম সং, পৃঃ ৬৯)। এই উদ্ধৃত বাক্যটির গঠন এমন যে, সহজেই এইরূপ ব্যাখ্যা করা যায় যে, নরেন্দ্রনাথ সেই প্রসিদ্ধ পুরাতন ঋষি 'নারায়ণ', বর্তমানে পুনরায় মনুষ্যরূপী হয়ে এসেছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা গৃহীত হতে পারে না এই কারণে যে, এর বিপরীত আপ্তবাক্য রয়েছে। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-গ্রন্থে পাওয়া যায়, স্বামী যোগানন্দজী গ্রন্থকার শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব কখনও বলতেন, 'জগৎ-পালক নারায়ণ, নর ও নারায়ণ নামে যে দুই ঋষিমূর্তি পরিগ্রহ ক'রে জগতের কল্যাণের জন্য তপস্যা করেছিলেন, নরেন সেই নর-ঋষির অবতার।' (বাণী ও রচনা ২য় সং ৯. ৫৯)।

এই প্রকরণে স্বামী সারদানন্দ-রচিত একটি সঙ্গীতের অর্থ-বিচার করা যাক—যতটুকু এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। গানটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি প্রয়োজন, কারণ তা না হ'লে সমাসবদ্ধ অন্তিম পদ 'নর-নারায়ণ'—শব্দটির অর্থ পরিষ্কার হবে না। গানটি এই :

স্তিমিত-চিৎ-সিন্ধু ভেদি, উঠিল কি জ্যোতি-ঘন,
কোটি সূর্য গলাইয়ে, ছাঁচে ঢালা কান্তি যেন,
মায়া-খণ্ডিত অখণ্ড বারি, বুঝে লীলা কেবা হেন।
উজল বালক-বেশে, অখণ্ড-ঘর-প্রবেশে,
প্রেমঘন-বাহু-পাশে, কাহারে করে ধারণ।
উঠ বীর আঁখি মেলি, ছাড় ধ্যান, চল চলি,
ধরণী ডুবাল বুঝি, অবিদ্যা-কাম-কাঞ্চন।
সুধীর ধীর পরশে, যোগী চায় সহরষে,
কণ্টকিত তনু মন, নীরবে ভাসে বয়ান ;
তারা জ্বলি ছায়াপথে, স্পর্শে ধরা আচম্বিতে,
পুণ্যভূমে উদে আজি পুনঃ নর-নারায়ণ।

(সাধনসঙ্গীত, ২য় সং, পৃঃ ১৬০)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যখন গীতোক্ত এই দিব্য দর্শনটি হয়েছিল, তখন নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিম্নলিখিত কথাই প্রমাণ :

"আশ্চর্য দর্শন সব হয়েছে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দদর্শন। তার ভিতর দেখছি, মাঝে বেড়া দেওয়া দুই থাক। এক ধারে কেদার চুণী আর আর অনেক সাকারবাদী

ভক্ত। বেড়ার আর এক ধারে টকটকে লাল সুরকীর কাঁড়ির মত জ্যোতিঃ। তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র—সমাধিস্থ।"

"ধ্যানস্থ দেখে বল্লুম, 'ও নরেন্দ্র'। একটু চোখ চাইলে। বুঝলুম, ওই একরূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে।"

(কথামৃত ৪. ২৪. ৩)

'কথামৃতে' উক্ত, এই দর্শন এবং 'লীলাপ্রসঙ্গে' উল্লিখিত পূর্বোক্ত দর্শন, যা গানটির বিষয়-বস্তু—এই দু'টি দর্শনই এক মনে হয়। স্বামীজীর জন্ম ১৮৬৩ সালে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৮৩৬-এ। সুতরাং এই দর্শনের সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বয়স ২৭ বছরের কম নয়। অর্থাৎ দর্শনটি ধৃতবিগ্রহ তাঁদের দু'জনেরই প্রাগ্-আবির্ভাব বিষয়ক। এইজন্য 'পুণ্যভূমে উদে আজি পুনঃ নর-নারায়ণ'—এই অন্তিম বাক্যটি 'তারা জলি ছায়াপথে, স্পর্শে ধরা আচম্বিতে' পঙ্‌ক্তিটির অব্যবহিত পরেই স্থান পেলেও বিষয়-বস্তুর দিক থেকে কেবলমাত্র ঐ পঙ্‌ক্তির সঙ্গেই সম্বদ্ধ নয়। ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তির 'চল চলি'—শব্দ দু'টিকেও আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। সুতরাং স্বভাবতই 'নর-নারায়ণ' এই সমাসবদ্ধ পদটির ব্যাসবাক্য হবে গানটির সামগ্রিক রূপ থেকে—অর্থাৎ হবে 'নর ও নারায়ণ' (দ্বন্দ্বসমাস)। তা' হলে স্বামী সারদানন্দজীর মত এই দাঁড়ায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব হচ্ছেন 'নারায়ণ'-ঋষি এবং স্বামীজী 'নর'-ঋষি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই দর্শনটি যদি নরেন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বে হ'ত, তাহলে এ রকম অর্থ করা স্বাভাবিক হ'ত যে, বালক-বেশী শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেন সমাধিস্থ যোগীকে জন্ম পরিগ্রহ করতে আহ্বান করছেন এবং এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে নরেন্দ্রনাথের জন্ম হচ্ছে বা অচিরেই হবে। সেক্ষেত্রে 'নর-নারায়ণ' পদটি শুধু নরেন্দ্রনাথেরই উদ্দেশে প্রযুক্ত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত হ'ত। কিন্তু দর্শনটি স্বামীজীর জন্মের পূর্বে ঘটেনি বলেই ঐ ধরনের অর্থ করা সমীচীন নয়। তা সত্ত্বেও যদি পূর্বোক্ত অন্তিম পঙ্‌ক্তিটি, কেবলমাত্র অব্যবহিত পূর্ব পঙ্‌ক্তির সঙ্গে অন্বিত করা হয়, তা'হলে 'নর-নারায়ণ' শব্দটির ব্যাসবাক্য করতে হয়—'নররূপী নারায়ণ' (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), আর এই ব্যাসবাক্যই যদি সঙ্গীত-রচয়িতার অভিপ্রেত বলে মনে হয়—কারণ এতে লীলাপ্রসঙ্গেরই ভাষা এসে যাচ্ছে, তা'হলেও 'নররূপী নারায়ণ'-এর কি ব্যাখ্যা হওয়া উচিত তা আমরা পূর্বেই বিশদভাবে আলোচনা করেছি। সুতরাং এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

সঙ্গীতোক্ত 'বালক' ও 'যোগী' এবং লীলাপ্রসঙ্গোক্ত 'দেবশিশু' ও 'ঋষি' অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও নরেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করে স্বামী গম্ভীরানন্দজী 'ভক্তমালিকা'য় লিখেছেন: 'এই যুগ্ম আত্মাই যুগে যুগে নারায়ণ ও নর-ঋষির অবতাররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্মসংস্থাপন করেন।' (১ম ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ১)। ঐ গ্রন্থেরই ৩২ পৃষ্ঠায় আছে: '(শ্রীরামকৃষ্ণদেব) বলিতেন, ও অখণ্ডের ঘর—সপ্তর্ষির এক ঋষি—নরনারায়ণ ঋষির নর।' গ্রন্থকারের আধুনিকতম রচনা 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ'—গ্রন্থেও পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, নরেন্দ্রনাথ—'নরনারায়ণের নরঋষি' (১. ১৩২)।

'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ের 'নারায়ণসকাশে নরঋষি' এই শীর্ষকটিও এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। এখানে যে শব্দশ্লেষ অলংকার রয়েছে তার প্রতি

দিলে দেখা যায় 'নর' ও 'নারায়ণ' এই দুটি শব্দের প্রত্যেকটিই একটি সামান্য ও

একটি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। বিশেষ অর্থটি নিলে আমরা পাই, শ্রীরামকৃষ্ণদেব হচ্ছেন 'নারায়ণ'-ঋষি এবং স্বামীজী হচ্ছেন 'নর'-ঋষি।

স্বামীজীর স্বরূপ আলোচনার এই তৃতীয় পর্বটি এখানেই সমাপ্ত হল।

(৪) শিবাবতার :

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—'শিব অংশে জন্মালে জ্ঞানী হয়; ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, এই বোধের দিকে মন সর্বদা যায়।' (কথামৃত', ১. ১৩. ৬)।

'যাদের শিবের অংশ তাদের জ্ঞানীর স্বভাব।' (ঐ ২. ২২. ৩)।

'সোঽহং সোঽহং কল্লেই হয় না। জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। নরেন্দ্রের চোখ সুমুখঠেলা।' (ঐ ২. ৮. ২)।

'নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর।' (ঐ ৪.২৩.৭)।

'ওর (নরেন্দ্রের) মধ্যে শিবের শক্তি আছে।' ('যুগনায়ক বিবেকানন্দ' ১. ১৩৩)।

শেষোক্ত গ্রন্থে আরও পাওয়া যায় :

'একদিন ঠাকুর দেখিলেন, একটি আলোর রেখা যেন বারাণসীর দিক হইতে কলিকাতাভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে, এবং তিনি সানন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'আমার প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে; এখানকার লোক যে, তাকে একদিন না একদিন এখানে আসতেই হবে।' (১. ১০৬)।

স্বামীজীর জীবনীতে পাওয়া যায় যে, তাঁর মা পুত্রকামনায় এক বৎসর শিবের ব্রত পালন করে স্বামীজীকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন। কাশীবাসিনী কোন এক আত্মীয়ার সাহায্যে ভুবনেশ্বরীদেবী কাশীক্ষেত্রে ৺বীরেশ্বর শিবের পূজাদির ব্যবস্থা করেছিলেন এবং স্বয়ং কলকাতায় থেকে ধ্যান-জপ, ব্রত-পূজাদিতে নিমগ্না ছিলেন। স্বামীজীর জন্মের কয়েক মাস আগে, একদিন পূজা-প্রার্থনাদির পরে স্বপ্নে তাঁর একটি দিব্য দর্শন হয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন, জটাজূটমণ্ডিত, জ্যোতির্ময়, তুষার-ধবল মহাদেবের ধ্যানমূর্তি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত। দেবাদিদেব সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হয়ে এক পুরুষ-শিশুর আকার ধারণ করলেন—যেন তাঁর নিজেরই সন্তান। এই দেবস্বপ্নটি যে মিথ্যা হবার নয়, ভুবনেশ্বরীদেবী তা অন্তরের অন্তস্তলে বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ ঐ দর্শনের ফলে তাঁর মনপ্রাণ এক অনির্বচনীয় দিব্যানন্দে ভরপুর হয়ে গিয়েছিল। পুত্রসন্তান লাভ করে জননী তার নাম রেখেছিলেন—'বীরেশ্বর'।

৺বীরেশ্বর শিবের অংশে যে স্বামীজীর জন্ম তা স্বামী শিবানন্দজী একদিন বেলুড় মঠে ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কাশীপুরের বাগানে থাকার সময়ে স্বামীজী সম্বন্ধে তিনি একটি অলৌকিক দৃশ্য দেখেছিলেন যার অন্তর্নিহিত অর্থ পরবর্তীকালে ৺বীরেশ্বর শিবের স্তোত্রপাঠে তাঁর কাছে পরিস্ফুট হয়েছিল। (শিবানন্দবাণী, ২য় ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ১৯৮-১৯৯ দ্রষ্টব্য)।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী বলতেন—'স্বামীজীকে শিবজ্ঞানে পূজা করবি। স্বামীজীর মা শিবব্রত করে স্বামীজীকে পেয়েছিলেন।' (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ১০৫)।

পূজ্যপাদ নাগ মহাশয় বলেছিলেন—'অদৃষ্টে ছিল, ঠাকুরের শ্রীচরণদর্শন করেছিলুম, তাই ধন্য হয়ে গেছি। শিবাবতার স্বামীজীকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছি, সাক্ষাৎ মা ভগবতীকে দর্শন করেছি ও মায়ের কৃপা পেয়েছি' ইত্যাদি। (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩৮৭)।

বাস্তবিক, স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলীতে এবং তাঁর বাণী ও রচনাতেও শিবের প্রভাব বহুল পরিদৃষ্ট হয়।

শিশু বীরেশ্বর রামায়ণের কাহিনী শুনে বাজার থেকে রাম ও সীতার যুগলমূর্তি কিনে এনে বাড়ীর চিলেঘরে স্থাপন করে ধ্যান ও পূজাদি করতেন। একদিন পূজাতে তাঁর অতি প্রিয় নিত্যসঙ্গী সহিসের কাছে শুনলেন—'বিয়ে করা বড় খারাপ।' শ্রোতার তখন বয়স বা বুদ্ধি হয়নি সহিসের উক্তির উৎস কোথায় তা বুঝতে। শিশুমনে সীতারামের মিলন পীড়াদায়ক হয়ে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে মনের দুঃখ জানালেন। বুদ্ধিমতী জননী হেসে বললেন—'বিলে, ওতে আর হয়েছে কি? তুই শিবপূজো কর।' সন্ধ্যার অন্ধকারে দুঃখোদ্বেল অন্তরে বিলে সীতারামের যুগলমূর্তি ছাদ থেকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে পরদিন বাজার থেকে একটি শিবমূর্তি এনে সীতারামের আসনে বসিয়ে ধ্যান শুরু করলেন।

ঘটনাটি প্রাসঙ্গিক, সন্দেহ নেই। তবে এটিকে স্বামীজীর পরবর্তী জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তাঁর রামচেতনার প্রতি অবিচার করা হবে। মাটির সীতারামমূর্তি চুরমার হয়ে গিয়েছিল সত্য, কিন্তু নিভৃত হৃদয়কন্দরে প্রতিছিল নিত্য চিন্ময় বিগ্রহ।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে' আছে, "নরেন্দ্রনাথের মাতা বলিলেন—পুত্রকামনায় কাশীধামে ৺বীরেশ্বরের নিকট বিশেষ মানত করিয়াছিলাম। ৺বীরেশ্বর বোধ হয় তাঁহার একটা ভূতকে পাঠাইয়া দিয়াছেন! না হইলে ক্রোধ হইলে সে অমন ভূতের মত অশান্ত ব্যবহার করে কেন!' বালকের ঐরূপ ক্রোধের তিনি চমৎকার ঔষধও বাহির করিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন তাহাকে কোনমতে শান্ত করিতে পারিতেছেন না, তখন ৺বীরেশ্বরকে স্মরণ করিয়া শীতল জল দুই-এক ঘড়া তাহার মাথায় ঢালিয়া দিতেন। বালকের ক্রোধ উহাতে এককালে প্রশমিত হইত।" (৫ম খণ্ড, ১০ম সং, পৃ: ৮৬-৮৭)।

প্রভাতের এই সোনালী আলো থেকে দৃষ্টিকে সরিয়ে অস্তাচলগামী আয়ুসূর্যের দিকে নিবদ্ধ করলে সেখানেও আমরা দেখি শিবেরই মহিমা! স্বামীজী বলতেন, অমরনাথ শিব তাঁকে ইচ্ছামৃত্যুবর দিয়েছিলেন। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে' আছে, 'শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে স্বামীজী বলেছিলেন—অমরনাথ-দর্শনের পর হতে আমার মাথায় চব্বিশ ঘণ্টা যেন শিব বসে আছেন, কিছুতেই নাবছেন না।' (বাণী ও রচনা, ২য় সং, ৯. ৯০)। এই প্রসঙ্গে, ঐ গ্রন্থেই বর্ণিত, বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক স্বামীজীকে কুণ্ডল, ত্রিশূল, বিভূতি, রুদ্রাক্ষ, জটাজুট দিয়ে শিবের বেশে সাজানো এবং দেবস্বপ্ন-প্রণোদিত শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক স্বামীজীর শরীরে মহাশিবের অধিষ্ঠান চিন্তা করে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজার বাসন দিয়ে তাঁর বিধিমত পূজা—এই দুটি ঘটনাও স্মরণীয়। (ঐ, পৃ: ৭৮ ও ১০২)।

ভগিনী নিবেদিতার 'স্বামীজীকে যেমন দেখিয়াছি' গ্রন্থেও স্বামীজীর শিবচেতনার বহুল পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বামীজীর শিবস্তোত্র, শিবের গান, 'বর্তমান ভারত'এ তাঁর স্বদেশমন্ত্র—হে ভারত ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ, সর্বত্যাগী শঙ্কর…… হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও' (বাণী ও রচনা ৬.২৭৯) ইত্যাদি বহু রচনা তাঁর শিবস্বরূপের ইঙ্গিত দেয়।

শিবরূপী শ্রীগুরুর উদ্দেশে সুরভারতীতে রচিত, শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর প্রসিদ্ধ 'মূর্তমহেশ্বর' সঙ্গীতটি স্বামীজীর শিবপরিচয় সুরের মাধ্যমে জগতে চিরকাল ছড়িয়ে দেবে সন্দেহ নেই।

স্বামীজীর স্বরূপ-কথার চতুর্থ পর্বটির আর একটি দিক রয়েছে। তাঁর সহোদর, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপাধন্য মহেন্দ্রনাথ দত্তের একটি উক্তিতে সেই দিকটি উল্লিখিত হয়েছে। উক্তিটি এই: 'আমাদের তিন ভাইয়ের রুদ্রাংশে জন্ম। রুদ্রাংশে না জন্মালে, কেউ-ই রুদ্রতেজ দেখাতে পারে না।' (শতবার্ষিকী 'লেখমালা', পৃঃ ১২-১৩)।

রুদ্র হচ্ছেন শিবের সংহারমূর্তি। শিব যখন বাম হন, তখন হন রুদ্র; রুদ্র যখন 'দক্ষিণ' হন, তখন হন শিব—'রুদ্র যৎ তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।' হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, যে শিবরূপ, তাই দিয়ে আমাকে সর্বদা রক্ষা কর—এই হল বৈদিক প্রার্থনা। একই পুরুষের দুটি রূপ। বাস্তবিক স্বামীজীর ভেতর এই দুটি রূপেরই সম্যক্ অভিব্যক্তি দেখা যায়। তাই, শুধু শিবরূপেরই আলোচনা করলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। রুদ্ররূপেরও আলোচনা প্রয়োজন।

'স্বামীজীর বাণী ও রচনা'তে রুদ্রতেজের বহু পরিচয় পাওয়া যায়। বলছেন স্বামীজী:

> "ঢাকঢোল দেশে তৈরী হয় না? তুরী ভেরী কি ভারতে মেলে না? ঐ সব গুরু-গম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা।…ডমরু শিঙা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে, 'মহাবীর, মহাবীর' ধ্বনিতে এবং 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' শব্দে দিগ্‌দেশ কম্পিত করতে হবে।…বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণসঞ্চার করতে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আনতে হবে। বাণী ও রচনা, ২য় সং, ৯.২১৯-২৩)

'নাচুক তাহাতে শ্যামা'-কবিতায় রুদ্রভাবের জয় জয়কার:

'মেঘমন্দ্র কুলিশ-নিস্বন, মহারণ,
ভূলোক-দ্যুলোক-ব্যাপী।
অন্ধকার উগরে আঁধার, হুহুঙ্কার
শ্বসিছে প্রলয়বায়ু॥
ঝলকি ঝলকি তাহে ভায়, রক্তকায়
করাল বিজলীজ্বালা।

* *

'ডাকে ভেরী, বাজে ঝর্‌র্ ঝর্‌র্ দামামা নক্কাড়,
বীর দাপে কাঁপে ধরা।
ঘোষে তোপ বব-বব-বম্, বব-বব-বম্
বন্দুকের কড়কড়া॥
ধূমে ধূমে ভীম রণস্থল, গরজি অনল
বমে শত জ্বালামুখী।
ফাটে গোলা লাগে বুকে গায়, কোথা উড়ে যায়
আসোয়ার ঘোড়া হাতী॥

'রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায়
মৃত্যুরূপা এলোকেশী।

* *

'আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজলপান,
প্রাণপণ, যাক্ কায়া॥'

শ্রীমা সারদাদেবীকে এক ব্যক্তি বলেছিলেন—স্বামীজী আজ বেঁচে থাকলে, কত কাজই না দেশের হ'ত! কথাটি শোনামাত্রই শ্রীশ্রীমা বলেছেন—'ও বাবা, নরেন আমার আজ থাকলে, কোম্পানি কি আর তাকে ছেড়ে দিত? জেলে পুরে রাখত। আমি তা দেখতে পারতুম না। নরেন যেন খাপখোলা তরোয়াল।' (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৪র্থ সং, পৃঃ ২০৩-২০৪)।

মায়ের এই সহজ সরল উক্তিতে স্বামীজীর রুদ্রস্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৯৬ সালে লণ্ডন শহরে বসেই স্বামীজী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রসঙ্গে বলছেন:

'বেপরোয়া হ'য়ে কাজ করতে হবে। বিধি-মতে কাজ করে যাব, তাতে যদি গুলি বুকে পড়ে, প্রথমে আমার বুকে পড়ুক।

'পড়ুক গুলি আমার বুকে; আমেরিকা, ইউরোপ একবার কিরকম কেঁপে উঠবে! তখন বুঝবে বিবেকানন্দ কি জিনিস! আমেরিকায় এমন স্থান নেই যেখানে বিশ-ত্রিশ হাজার লোক নিতান্তই আমার অনুগত নয়। আমার রক্ত পড়লে সারা জগতে একটা সাড়া পড়ে যাবে।' (লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, ২য় সং, পৃঃ ১৯১)।

এই উদ্ধৃতিটি একটি উপলক্ষণ মাত্র। এই ধরনের উদ্দীপনাপূর্ণ, রুদ্রতেজোদীপ্ত, অগ্নিগর্ভ বহু শব্দ-ঝংকার একদিন বাংলার তরুণদের প্রাণে প্রতিধ্বনি জাগিয়েছিল এবং দেশমাতৃকার বেদীমূলে হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করতে তাদের প্রোৎসাহিত করেছিল, সন্দেহ নেই।

মনে পড়ে, মারাঠী জননায়ক, বিচারপতি রানাডের সন্ন্যাসবিরোধী অভিভাষণের তীব্র প্রতিবাদে স্বামীজীর অগ্নিময়ী ভাষায় প্রবন্ধ-রচনা—ভ্রষ্ট সন্ন্যাসীকেও গৌরব দেওয়া; কারণ, সে তো জীবনে একবারও চেষ্টা করেছে শৃঙ্খল ভাঙ্গতে, কাপুরুষের মত চিরনিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেনি!

এ গৌরবদান, ভারতের অতীত যুগের সাহিত্য শতাব্দীর পর শতাব্দী পরিক্রমা করলেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে এ গৌরব দিয়েছিলেন কয়েক হাজার বছর আগে একদিন গীতাকার শ্রীকৃষ্ণ। ভগবানের বিধানে ভ্রষ্ট পায় ঊর্ধ্বলোকে পুণ্যকৃৎদের দীর্ঘকালীন সঙ্গ ও অন্তে নরলোকে পবিত্র বংশে দুর্লভ জন্ম—বলেছিলেন পার্থসারথি পার্থের সংশয় নিরসন করে। অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের এই শাশ্বত বাণীরূপকে বিশ্বাসের আলোকেই দেখতে হয় সর্বসাধারণকে। কিন্তু এ যুগে স্বামীজী ভ্রষ্টকে গৌরব দিয়েছেন, যুক্তির দিক থেকে। অবশ্য এ যুক্তিও তাঁদেরই গ্রাহ্য, যাঁরা চতুর্বর্গের তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাই স্বামীজী লিখেছিলেন:

"আদর্শটি যদি খাঁটি ও সরল হয়, তবে আমাদের একজন ভ্রষ্ট সন্ন্যাসীও যে-কোন গৃহস্থ অপেক্ষা শতগুণে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ, কারণ চলতি কথাতেই আছে—'ভালবেসে না পাওয়া বরং ভাল'।

"যে কখন উন্নত জীবনলাভের চেষ্টাই করেনি, সেই কাপুরুষের সঙ্গে তুলনায় ভ্রষ্ট সন্ন্যাসী তো বীর।"

(বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১ম সং পৃঃ ৪০০-৪০১)।

মনে পড়ে, বালী স্টেশনে স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ কর্মচারীর থানা হয়ে বরাহনগর মঠে গিয়ে স্বামীজীকে লিখে দিতে বলা যে, অখণ্ডানন্দজী তাঁর গুরুভাই এবং তদুত্তরে স্বামীজীর তেজোদৃপ্ত কণ্ঠের—'লিখে আবার দোব কি!' শুনে ও তাঁর করাল ভ্রূকুটি দেখে বেগতিক বুঝে পুলিশ-পুঙ্গবের দ্রুত পলায়ন!

মনে পড়ে, আবু রোড স্টেশনের সেই প্রসিদ্ধ ঘটনা। শ্বেতাঙ্গ রেলকর্মচারীর অভদ্র ব্যবহারে স্বামীজীর তীব্র তিরস্কার—'এই শেষ বলছি, হয় তোমার নাম ও নম্বর দাও, নতুবা লোকে দেখুক, তোমার মত কাপুরুষ দুনিয়ায় নেই।'

আর মনে পড়ে, জাহাজের সহযাত্রী খৃষ্টান মিশনারীর জামার কলার বজ্রমুষ্টিতে ধরে রুদ্রমূর্তি স্বামীজীর সেই ভয়প্রদর্শন—'আবার আমার ধর্মের নিন্দা করলে জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দোব।'

স্বামীজীর প্রাক্-সন্ন্যাস জীবনের রুদ্রভাবের ঘটনাগুলি এখানে বাদই দেওয়া গেল।

বার শো বছর ধরে যে রচনাবলী ভারতীয় সন্ন্যাসীর প্রধান উপজীব্য হয়ে রয়েছে, যা থেকে তাঁরা জেনেছেন, সন্ন্যাস কি, সন্ন্যাসীর কৃত্য কি, সন্ন্যাসের মহিমা কি, তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সন্ন্যাসী হবেন 'শান্তদর্প'। সুতরাং জামার কলার চেপে ধরা—এ আবার কোন্ দেশী সন্ন্যাসীর কৃত্য? এই প্রশ্ন মনে জাগা অস্বাভাবিক নয়। এর উত্তর এই যে, আসলে দর্প হচ্ছে 'অহং'। সেই 'অহং' চিরদিনের মত স্বামীজীর মুছে গিয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে জগদ্গুরুর শ্রীকরস্পর্শে। শিবরূপের আর রুদ্ররূপের সমন্বয় ঘটেছিল এক অখণ্ড নীরূপে। যে 'অহং' দেখা দিত, তা ছিল 'সোনার তলোয়ার', 'পোড়াদড়ি'—বাধিতের পুনরাবৃত্তি, লোককল্যাণে।

বাইরের আচরণে আমরা অনেকেই অতি বিনীত হতে পারি, কণ্ঠে আমাদের 'দাসানুদাস'-সুর অনুরণিত হতে পারে অনুক্ষণ, কিন্তু তাতে 'দর্প' যায় না। অহংকার প্রচ্ছন্নই থেকে যায়, বিনষ্ট হয় না। কিন্তু রুদ্রমূর্তি, দৃপ্তকণ্ঠ স্বামীজী চিরকালই ছিলেন শান্তদর্প। যিনি শিব তাঁরই রুদ্র হওয়া সাজে। কুসুমকোমলতা ও কুলিশ-কঠোরতার মিলনভূমি ছিল তাঁর অন্তর। একাধারে 'শান্তম্ শিবম্' ও 'রুদ্রসুন্দরম্' রূপ ছিল তাঁর।

অযোগ্য অনুচর অক্ষম লেখনী নিয়ে আরাধ্যদেবতা স্বামীজীর দুরবগাহ, অতি-লৌকিক স্বরূপের বিচার-বিমর্শ করতে প্রয়াস পেয়েছি। তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কয়েকটি উক্তির অর্থ বিশ্লেষণ করেছি। শ্রীমা সারদাদেবীর ও আপ্তপুরুষগণেরই উক্তিনিচয়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে অর্থ সমীচীন প্রতিভাত হয়েছে, তাই ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছি। তবু একথা বলব না যে, এখানে যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই বিষয়ে তাই চরম সত্য বা শেষ কথা। বিষয়টি লৌকিক নয়, সুতরাং বিশ্লেষণে ও ব্যাখ্যায় ত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাই মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বলি:

'আচার্য-চরণে মোর কোটি নমস্কার।
ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার॥'

"অনন্ত শক্তিই ধর্ম বা ঈশ্বর।"

"বীর্যলাভের প্রধান উপায় উপনিষদে বিশ্বাসী হওয়া ও বিশ্বাস করা যে আমি আত্মা……আমি সর্বশক্তিমান্।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

রামচরিতে কালিদাস ও ভবভূতি

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী চেতনানন্দ

'উত্তররামচরিতে ভবভূতির্বিশিষ্যতে' অর্থাৎ উত্তররামচরিতে ভবভূতির বহু বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। বাল্মীকি-রামায়ণের উত্তর কাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া ভবভূতির শ্রেষ্ঠ নাটক 'উত্তর-রামচরিত' রচিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, মহাবীরচরিত নাটকের উত্তরাংশ বলিয়া উহার এইরূপ নাম। কোন কোন পণ্ডিত উত্তর অর্থে উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন। কারণ যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত রামচন্দ্রের মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনদের প্রতি ভক্তি, স্ত্রী ভাই প্রজা প্রভৃতির প্রতি অনুরক্তি ও কর্তব্য লক্ষিত হয়। কিন্তু উত্তররামচরিতে প্রজানুরঞ্জনের জন্য, আদর্শস্থাপনের জন্য, পূর্ণ যৌবনে আপন মনকে বশীকৃত করিয়া স্ত্রীনির্বাসন, বর্ণাশ্রমধর্ম সংরক্ষণ, স্বর্ণসীতা গড়িয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন ইত্যাদি গুণাবলী রামচন্দ্রকে মর্যাদাবান পুরুষে পরিণত করিয়াছে। এই নাটকখানি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রকেও সমৃদ্ধ করিয়াছে এবং ভবভূতির কবিকল্পনার উৎকর্ষ দেখাইয়াছে। ভবভূতির এই নাটকে অনেক নূতন তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে—আমরা অগ্রে আলোচনা-প্রসঙ্গে উহা দেখাইব।

উত্তররামচরিতের আরম্ভটা সুন্দর; বহু দুঃখের পর রাম-সীতার মিলন আনন্দের। রাজলক্ষ্মী সন্তান-সম্ভবা। বিধি সীতাকে পুনর্বার নির্বাসনে পাঠাইবার ভূমিকাস্বরূপ রামচন্দ্রকে লোকপ্রসিদ্ধির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন: 'গর্ভবতীর যে-কোন ইচ্ছা শীঘ্রই পূর্ণ করিবে।' রামচন্দ্র সীতার সামনে প্রজাপালনের প্রতিজ্ঞাস্বরূপ বলিয়াছেন, "লোকের সন্তোষের নিমিত্ত স্নেহ, দয়া, সুখ এমন কি সীতাকে পরিত্যাগ করিতেও আমার দুঃখ নাই।" সীতা এই কথা সানন্দে অনুমোদন করিয়াছেন; কারণ তিনি তখন ঐ কথার তাৎপর্য চিন্তা করেন নাই। কালিদাস লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় ফিরিবার কালে বিভিন্ন স্মৃতিকথা টানিয়াছেন, ভবভূতি সেখানে সংক্ষেপে সারিয়া বর্তমান নাটকে চিত্রদর্শন নামে প্রথম অঙ্ক সৃষ্টি করিয়া ঐ সমস্ত পূর্ব বৃত্তান্তের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। এইরূপ আলেখ্যদর্শন ভবভূতির একান্ত নিজস্ব নহে। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলায়' (ষষ্ঠ অঙ্কে) কালিদাস বিরহকাতর রাজা দুষ্মন্তকে শকুন্তলার চিত্র দর্শন এবং ঐ চিত্রের উদ্দেশ্যগুলিকে জীবিতের ন্যায় সম্ভাষণাদি করাইয়াছেন। পরে বয়স্য চিত্র বলিয়া স্মরণ করাইয়া দিলে রাজা বলিলেন, "দর্শনসুখমনুভবতঃ সাক্ষাদিব তন্ময়েন হৃদয়েন। স্মৃতিকারিণা ত্বয়া মে পুনরপি চিত্রীকৃতা কান্তা॥" অর্থাৎ আমি তন্ময় হৃদয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রিয়াকে দর্শন করিতেছিলাম, তুমি স্মরণ করাইয়া দিয়া পুনরায় কান্তাকে চিত্রীভূতা করিয়া তুলিলে। এইভাবে দেখা যায় কালিদাসের ছায়া ভবভূতির উপর পড়িয়াছে।

ঐ সব চিত্রদর্শনকালে সীতা আবেগভরে বলিয়া ফেলিয়াছেন, "স্নিগ্ধ ও নিস্তব্ধ বনশ্রেণীর মধ্যে আবার বিচরণ করিব, আর পবিত্রতা-জনক, পাপনাশক ও শীতল ভাগীরথীর জলে অবগাহন করিব।" রাম সীতার ঐ মনোবাসনা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে সীতার অভিলাষ পূর্ণ

করিতে বলিলেন। এদিকে দুর্মুখ আসিয়া রামচন্দ্রকে প্রজাদের অসন্তোষের কথা বলিলেন। রামচন্দ্র স্থির করিলেন: যে-কোন কার্যের দ্বারা লোকের সন্তোষ করা সজ্জনের ব্রত। তথাপি তাঁহার খেদোক্তি সত্যই হৃদয়বিদারী: "হায়, বিধাতা দুঃখ-ভোগের জন্য রামের দেহে চৈতন্য দিয়াছিলেন।" নিদ্রিতা সীতার চরণযুগল মস্তকে স্পর্শ করিয়া (সীতায়াঃ পাদৌ শিরসি কৃত্বা) রামচন্দ্র বলিলেন, "দেবি, রামের মস্তকে তোমার চরণ-কমলস্পর্শ এই শেষ।" স্ত্রীর পা স্বামী মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিতেছেন ইহাতে ভবভূতির কিঞ্চিৎ মাত্রাধিক্য অনুমিত হয়। ভবভূতি ভাবিয়াছেন, এইরূপ আচরণের দ্বারা রামচন্দ্রের এই অক্ষয় অকীর্তির কিঞ্চিৎ লাঘব হইবে। তারপর লক্ষ্মণ সীতাকে লইয়া তাঁহার ইচ্ছাপূরণ করিয়া প্রকারান্তরে নির্বাসন দিয়া আসিলেন।

ভবভূতির পঞ্চবটী-প্রবেশ নামক দ্বিতীয় অঙ্কটিও স্বকপোলকল্পিত। বাল্মীকির আশ্রম হইতে আগতা আত্রেয়ীর সঙ্গে বনদেবতা বাসন্তীর কথোপকথন খুবই চমৎকার। আত্রেয়ী সীতাসখী বাসন্তীর কাছে বলিয়া চলিলেন সীতার দুর্দশার কথা, অপবাদের কথা, কুশ ও লবের জন্মকথা। আত্রেয়ী আরও বলিলেন যে, রাজার দোষ ভিন্ন প্রজাদের মধ্যে অকাল মৃত্যু হয় না; সেই হেতু রাম-রাজ্যে এক ব্রাহ্মণবালকের মৃত্যু হওয়ায় রামচন্দ্র নিজে ঐ মৃত্যুর হেতু শম্বুক নামক এক শূদ্র-তপস্বীর অন্বেষণ করিতেছেন। বাসন্তী জানিতেন যে, যজ্ঞের ধূমমাত্রপানকারী শম্বুক নামক শূদ্র এই জনস্থানেই তপস্যা করিতেছে। তিনি রামচন্দ্রের দর্শনে আশান্বিত হইলেন। আত্রেয়ী বাসন্তীকে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা বলিলেন। যজ্ঞ করিতে হইলে যজমানের সহধর্মিণীর প্রয়োজন হয়। বাসন্তী ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে আত্রেয়ী বলিলেন যে, রামচন্দ্র সীতার স্বর্ণময়ী মূর্তি গড়িয়া যজ্ঞ করিতেছেন। বাসন্তী রামচন্দ্রের ঐরূপ কড়ি-কোমল আচরণে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন: "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি। লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমর্হতি॥" অর্থাৎ লোকোত্তর পুরুষদের চিত্ত বজ্র হইতেও কঠিন আবার কুসুম হইতেও কোমল; সুতরাং সেই চিত্ত কে বুঝিতে পারে?

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের' চতুর্থ খণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণের মানুষভাব বুঝাইতে গিয়া স্বামী সারদানন্দজী ভবভূতির উপরোক্ত বিখ্যাত শ্লোক অবতারণা করিয়া লিখিয়াছেন: "অবতারশরীরে দেব এবং মানুষভাবের অদ্ভুত সম্মিলনের কথা আমরা সকলেই পড়িয়াছি বা শুনিয়াছি; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবার পূর্বে কোন মানবে যে বালকত্ব এবং কঠোর মনুষ্যত্বের একত্র সামঞ্জস্যে অবস্থান হইতে পারে, একথা ভাবি নাই।" শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি সকলের আকর্ষণের কারণ দেখাইতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "কুসুমকোমল বালক-পরিচ্ছেদে আবৃত ভিতরের বজ্রকঠোর মনুষ্যত্বই ঐ আকর্ষণের কারণ।"

ভবভূতির ছায়া নামক তৃতীয় অঙ্কটিও কাল্পনিক। পূর্ব অঙ্কে রামচন্দ্র ব্রাহ্মণকুমারকে বাঁচাইয়া দিলেন এবং শূদ্র তপস্বী শম্বুককে তাহার ঈপ্সিত লোকে প্রেরণ করিলেন। রামচন্দ্র পঞ্চবটী ও জনস্থানের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বনবাসের সেই সুখ-দুঃখে ভরা দিনগুলির স্মৃতি অনুভব করিতে লাগিলেন। ভবভূতি তৃতীয় অঙ্কের প্রারম্ভে তমসা ও মুরলা নামক নদীদ্বয়কে মানবীরূপে সৃষ্টি করিয়া রাম-সীতার মিলনের পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন। তমসা

সীতার কাহিনী বলিয়া চলিয়াছেন: "লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে বাল্মীকির তপোবনে ত্যাগ করিয়া গেলেন। তারপর সীতার প্রসববেদনা উপস্থিত হয়। তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখাবিষ্ট হইয়া নিজেকে গঙ্গার স্রোতে নিক্ষেপ করেন এবং সেখানেই দুইটি বালক প্রসব করেন। সেই সময় ভগবতী পৃথিবী ও গঙ্গা (বালক দুইটির সহিত) সীতাকে ধরিয়া পাতালে লইয়া যান। স্তন্য-দুগ্ধ-পরিত্যাগের পর তাঁহার সেই বালক দুইটিকে স্বয়ং গঙ্গাদেবী বাল্মীকির নিকট সমর্পণ করিয়া আসেন। কিন্তু বর্তমানে শম্বুকের ঘটনায় রামচন্দ্র জনস্থানে আসিয়াছেন —সরযূ নদীর মুখে গঙ্গাদেবী এই কথা শুনিয়া সীতার সহিত গুহাচারচ্ছলে গোদাবরীনদীকে দেখিতে আসিয়াছেন। কুশ ও লবের জন্ম হইতে আজ দ্বাদশ বৎসর শেষ হইয়াছে। ভগবতী গঙ্গা সীতাকে অদৃশ্য হইবার বর দিয়াছেন এবং আমাকে বলিয়াছেন, 'তমসে, তুমি সীতার সহচারিণী হও।'"

ঋষি অগস্ত্যের আশ্রমে রামচন্দ্রের সহিত বাসন্তীর সাক্ষাৎ হয় এবং ছায়া সীতা ও সহচরী তমসা রামচন্দ্রকে দর্শন করেন। ভবভূতি এখানে অলৌকিক উপায়ে রাম-সীতার মিলন ঘটাইয়াছেন। ভবভূতি রামচন্দ্রকে সীতার জন্য হাহুতাশ এমন কি মূর্ছা পর্যন্ত দেখাইয়াছেন। মহাবীরচরিতের রামচন্দ্র কঠোর, দৃঢ়, বীর; কিন্তু উত্তররামচরিতের রামচন্দ্র কোমল, দুর্বল, এমন কি নিতান্ত কাপুরুষ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় এইরূপ মনে করা অযৌক্তিক। ভবভূতি হইতেছেন নাটক-নির্মাতা; সুতরাং তাঁহাকে অপরের মনোরঞ্জন করিতে হইবে। নাটকের শ্রোতৃবর্গ স্ত্রীপুত্র-পালনকারী সাধারণ মানুষ; সেই হেতু তাহাদের মনের ভাব ভবভূতি নাটকে দেখাইয়াছেন। ইতিহাসকর্তা বাল্মীকির মত বস্তুপ্রকাশ করিয়াই তিনি মুক্ত থাকিতে পারেন না। তাহা ছাড়া বীরপুরুষের হৃদয় সদা সর্বদা যে কেবলমাত্র বীররসে ভরপুর থাকিবে এইরূপ কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। মনুষ্যহৃদয় কোন নিয়মের বশবর্তী হইয়া চলে না, সেখানে নানা ভাবের আলোড়ন উঠিতে পারে। দর্শনশাস্ত্র বলেন যে, হৃদয়ের নিজেরই একটা যুক্তি আছে, যুক্তি যে বিষয়ে নিজে অজ্ঞ। এই ব্যাপারে ভবভূতি লৌকিক উদাহরণ দিয়াছেন: জলরাশি বৃদ্ধি পাইয়া জলাশয়ের অনিষ্ট আরম্ভ করিলে তাহার জল-নিঃসারণই প্রতীকার; সেইরূপ শোকের উদ্বেলন আরম্ভ হইলে বিলাপ দ্বারাই হৃদয়কে ধারণ করা যায়।

ভবভূতি তাঁহার অমর লেখনীতে রামচন্দ্রের বিরহাবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন: "কষ্টং ভোঃ! কষ্টম্। দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগো দ্বিধা ন তু ভিদ্যতে, বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্। জ্বলয়তি তনূমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ, প্রহরতি বিধির্মর্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্॥" অর্থাৎ দারুণ কষ্ট! দারুণ কষ্ট! গাঢ় শোকাবেগ হৃদয়কে দলিত করিতেছে, কিন্তু দুইভাগে বিভক্ত করিতেছে না; বিকল দেহ মোহ বহন করিতেছে, কিন্তু একেবারে চৈতন্য ত্যাগ করিতেছে না; অন্তরের দাহ দেহকে জ্বালাইতেছে, কিন্তু একেবারে ভস্ম করিয়া ফেলিতেছে না; মর্মচ্ছেদী বিধাতা প্রহার করিতেছেন বটে, কিন্তু একেবারে জীবন নষ্ট করিতেছেন না।

আমরা আবার রঘুবংশে ফিরিয়া যাই। কালিদাস পঞ্চদশ সর্গে ১০৩টি শ্লোকে রামের অন্ত্যলীলা শেষ করিয়াছেন। তিনি নূতন কিছু বলেন নাই; আপনভাবে বাল্মীকিকে

পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। সীতাকে বিদায় দিয়া আসিয়া লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন : "কালের গতিই এই প্রকার। সকল সঞ্চয়ই পরিশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, উন্নতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়। আপনি যদি মৈথিলীর জন্য শোকবিহ্বল হন তবে যে অপবাদের ভয়ে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, সেই অপবাদই (রাম কলঙ্কিনী স্ত্রীর প্রতি আসক্ত) আবার পুরমধ্যে প্রচারিত হইবে।" বাল্মীকি এইখানে বেশ যুক্তিসম্পন্ন ব্যবহার দেখাইয়াছেন। ভবভূতি কিন্তু নিজের হৃদয়াবেগকে চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। যজ্ঞের বিঘ্নকারী লবণ রাক্ষসের বধের জন্য রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে পাঠাইলেন। শত্রুঘ্ন যাত্রাকালে বাল্মীকির তপোবনে একরাত্রি কাটান। বাল্মীকি-রামায়ণমতে সেই রাত্রেই কুশ ও লবের জন্ম হয়। নামকরণের হেতু দেখাইতে গিয়া কালিদাস লিখিয়াছেন যে, একটির কুশদ্বারা ও অপরটির লব বা গোপুচ্ছ-লোম দ্বারা গর্ভক্লেদ মার্জিত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত আদিকবি তাহাদের নাম কুশ ও লব রাখেন। ইহার পর রামচন্দ্র শম্বুক নামক শূদ্রকে বধ করিয়া মৃত ব্রাহ্মণপুত্রকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ভবভূতি বধ দেখান নাই।

ভবভূতির কথা আমরা বেশী করিয়া বলিতেছি, কারণ তিনি রামের অন্ত্যলীলায় অনেক মৌলিক অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। পূর্ববর্তী অঙ্কগুলির ন্যায় বর্তমান অঙ্কটি (কৌশল্যা ও জনক-সম্মেলন) নূতন ধরনের। সীতার শোকে পিতৃকুল ও শ্বশ্রূকুল অগ্নিব্যাপ্ত বৃক্ষের ন্যায় সন্তপ্ত। জনক, বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী কৌশল্যা প্রভৃতি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম হইতে বাল্মীকির তপোবনে উপস্থিত। মহামান্য অতিথিদের জন্য মধুপর্ক সহযোগে অর্ঘ্য দিবার রীতি আছে। পশুমাংস দিয়া মধুপর্ক প্রস্তুত করিতে হয়। বৈদিক যাগযজ্ঞে পশুহিংসার বিধি আছে। (সমাংসো মধুপর্কঃ ইতি শ্রুতেঃ)। মনু-স্মৃতিতেও মধুপর্কে পশুহিংসার কথা আছে। যাহা হউক, অঙ্কের প্রারম্ভে পূর্বকথিত অতিথিদের জন্য মধুপর্ক-পরিবেশন লইয়া ভবভূতি তপস্বী ভাণ্ডায়ন ও সৌধাতকির মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সৃষ্টি করিয়াছেন তারপর পশুহিংসার যৌক্তিকতা দেখানো হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় ভবভূতি মীমাংসক মত পোষণ করিতেন।

কৌশল্যা আশ্রম-বালকদের মধ্যে লবকে দেখিয়া "ও মা, ইহাদের মধ্যে এইটি কে? ঠিক রামভদ্রের শোভায় পরিশোভিত, সুলক্ষণ, সুন্দর এবং সুন্দরভঙ্গিসমন্বিত অঙ্গদ্বারা আমাদের নয়ন শীতল করিতেছে।" জনক, কৌশল্যা, অরুন্ধতী প্রভৃতি অভ্যাগতেরা যখন লবকে স্নেহ, আদর করিতে ব্যস্ত এবং তাহার পরিচয় জানিবার জন্য তৎপর, তখন নেপথ্যে রামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞের যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষক লক্ষ্মণপুত্র চন্দ্রকেতুর আদেশ শ্রুতিগোচর হইল। অভ্যাগতদের কাছে চন্দ্রকেতুর পরিচয় পাইয়া লবের রামায়ণের উপাখ্যান মনে পড়িল। অভ্যাগতদের অনুগ্রহাতিশয়ে লব তাঁহাদের সীতানির্বাসন পর্যন্ত 'রামায়ণ' শোনাইলেন পরবর্তী অংশ সম্বন্ধে বলিলেন : আমি জানি না; তবে ভগবান বাল্মীকি উহার কোন এক অংশকে নিজ হস্তে লিখিয়া নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সূত্রকার ভরতমুনির কাছে অভিনয়ের উপযোগী করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুশ ধনুর্বাণহস্তে সেই সঙ্গে গিয়াছিলেন।

'রাজা সার্বভৌমোঽশ্বমেধেন যজেত নাপ্যসার্বভৌমঃ' (আপস্তম্বঃ)। ক্ষত্রিয় রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা সার্বভৌম রাজা হইতেন। বাল্মীকি-শিষ্য লব রামচন্দ্রের সেই যজ্ঞীয় অশ্ব আটক করিলেন। শুরু হইল তুমুল যুদ্ধ। বীর বালক একাকী অযোধ্যার চতুরঙ্গ সেনা বিধ্বস্ত করিলেন। রথচারী চন্দ্রকেতু পাদচারী লবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওহে মহাবাহু লব, এই সকল সৈন্য দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন? এই আমি রহিয়াছি, আমার নিকটে আইস; তেজে তেজ লীন হউক। তুমি আশ্চর্য গুণাধিক্যবশতঃ আমার প্রীতিকর হইয়াছ। অতএব তুমি আমার সখা হইলে।" সারথি সুমন্ত্র বালক লবের আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, কারণ লব জৃম্ভকাস্ত্র দ্বারা সমস্ত সৈন্যকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কুমারদ্বয় পরস্পরকে স্নেহ ও অনুরাগের সঙ্গে দর্শন করিলে কি অবস্থার উদ্ভব হইল, ভবভূতি তাহার একটি মনোমুগ্ধকর বর্ণনা দিয়াছেন: ইহা কি ঈশ্বরেচ্ছাকৃত সম্মেলন, না গুণের আধিক্য? কিংবা জন্মান্তরীণ গাঢ় সম্বন্ধ নিবন্ধন কোন চিরপরিচয় অথবা দৈববশতঃ অজ্ঞাত কোন আত্মীয়-সম্বন্ধ? বিনা কারণে যে প্রণয় জন্মে, তাহার নাশ হয় না, কারণ স্নেহস্বরূপ সেই সূত্র অন্তরের মর্মস্থানগুলিকে সেলাই করিয়া দেয়।

তারপর রামচন্দ্রের কথা উঠিল। রামায়ণজ্ঞ বাল্মীকি-শিষ্য লব বলিয়া চলিলেন রামের অকীর্তির কথা—তাড়কাবধ (নারীবধ), খরের সঙ্গে যুদ্ধকালে তিন পা পিছাইয়া যাওয়া, গোপনে বালীবধ ইত্যাদি। জ্যেষ্ঠতাতের নিন্দায় চন্দ্রকেতুও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর বাধিল তুমুল সংগ্রাম। চন্দ্রকেতু আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলে লব বারুণাস্ত্র দ্বারা তাহা থামাইয়া দেন। রাবণের যুদ্ধ-বর্ণনায় ভবভূতি দেবরাজ ইন্দ্র ও গন্ধর্বরাজ চিত্রকেতুকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এখানেও তেমনি বিদ্যাধর দম্পতিকে উজ্জ্বল বিমানে উঠাইয়া যুদ্ধবর্ণনা দেওয়াইয়াছেন। ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। এমন সময় শম্বুক-বধ করিয়া রঘুনাথ রামচন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্রের আদেশে যুদ্ধ থামিল চন্দ্রকেতু রামপদে প্রণত হইলেন। চন্দ্রকেতু পরিচয় করাইয়া দিলে লব নিবেদন করিলেন, "পিতঃ, বাল্মীকির ছাত্র লব অভিবাদন করিতেছে।" লবকে দেখিয়া রামের মনের অবস্থা ভবভূতি বর্ণনা করিয়াছেন: এই বালকটি সহসাই আমার দুঃখের অবসান করিতেছে কেন? কেনই বা অন্তরাত্মাকে স্নেহার্দ্র করিতেছে? অথবা স্নেহ কোন কারণ অপেক্ষা করিয়া হইবে—ইহা তো অপ্রামাণিক! আভ্যন্তর কোন গূঢ় কারণে দুইটি হৃদয় স্নেহ-সূত্রে বাঁধা পড়ে; ভালবাসা তো কোন বাহ্য বস্তুর উপর নির্ভর করে না। তারপর লবের জৃম্ভকাস্ত্রের প্রয়োগ দেখিয়া রামচন্দ্রের মনে সেই সন্দেহটা আরও দৃঢ় হইয়াছে। কারণ উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্কে সীতাকে আলেখ্য দর্শন করাইবার সময় রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার অধীন দিব্যাস্ত্রগুলি কালে সীতার সন্তানদের হস্তগত হইবে। ঐসব অস্ত্র একমাত্র গুরুপরম্পরা আসিয়া থাকে।

আপন সন্তানের প্রতি বাৎসল্যভাব কালিদাস 'শকুন্তলা'তে দেখাইয়াছেন। হেমকূট পর্বতে ভগবান মরীচির আশ্রমে রাজা দুষ্মন্ত ভরতকে দেখিয়া বলিয়াছেন, "আমার হৃদয়ে এই বালকের প্রতি ঔরস-পুত্রের ন্যায় স্নেহ জন্মিতেছে।" ভবভূতি যেমন জৃম্ভকাস্ত্রের দ্বারা সম্বন্ধ টানিয়াছেন, কালিদাসও তেমনি ভরতের মণিবন্ধে রক্ষাকাণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন।

এইসব দৃষ্টে মনে হয় পূর্ববর্তী কবি কালিদাসের ছাপ পরবর্তী কবি ভবভূতির উপর কতভাবেই না পড়িয়াছে!

সীতা-নির্বাসন-প্রসঙ্গে কলিদাস 'রঘুবংশে' রামচন্দ্রের পত্নীপ্রেমের উপর লিখিয়াছেন: "শ্লাঘ্যস্ত্যাগোঽপি বৈদেহ্যাঃ পত্যুঃ প্রাগ্‌বংশ-বাসিনঃ। অনন্যজানেঃ সৈবাসীৎ যস্মাজ্জায়া হিরণ্ময়ী॥" অর্থাৎ মৈথিলীর পরিত্যাগও শ্লাঘনীয়, কারণ রামচন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠানকালে স্বীয় ভার্যা পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি সীতারই স্বর্ণ-মূর্তি দ্বারা সহধর্মিণীর কার্য সম্পাদিত করিয়াছিলেন। যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসেরাই ঐ যজ্ঞের রক্ষক ছিলেন। তদনন্তর মৈথিলীতনয় কুশ ও লব বাল্মীকির আদেশে তৎপরিজ্ঞাত রামায়ণ ইতস্ততঃ গান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একে রামের চরিত্র, বিশেষতঃ আদি কবি বাল্মীকির রচনা, উপরন্তু কুশ ও লব কিন্নর-সদৃশ কণ্ঠস্বরশালী। রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণ সহ সানন্দচিত্তে উহা দর্শন ও শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তারপর বাল্মীকি সীতাকে পুনর্গ্রহণের জন্য রামচন্দ্রকে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, "মৈথিলী যদি স্বীয় চরিত্র-বিষয়ে প্রজাগণের বিশ্বাস জন্মাইতে পারেন, তবেই তাহা সম্ভব।" বাল্মীকি সীতাকে তপোবন হইতে আনাইলেন। কালিদাস সীতাকে যে তপস্বিনীর বেশ পরাইয়াছেন, তাহা সত্যই সুন্দর: "কাষায়পরিবীতেন স্বপদার্পিত চক্ষুষা। অন্বমীয়ত শুদ্ধেতি শান্তেন বপুষৈব সা।" অর্থাৎ সীতার প্রশান্ত মূর্তি কাষায়বসনে আবৃত এবং তাঁহার নয়নদ্বয় নিজ চরণে সমর্পিত—ইহা দেখিয়া সকলে তাঁহাকে পবিত্রা বলিয়া অনুমান করিল।

পবিত্রতাস্বরূপিণী নারীজাতির আদর্শ সতী সীতার উদ্দেশে 'রামায়ণী কথা'য় বলা হইয়াছে: "নূতন সভ্যতার স্রোতে নূতন বিলাসকলাময় চিত্র দেখিয়া যেন সেই স্থায়ী অমর আলেখ্যের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাহীন না হই। এস মাতা! তুমি সহস্র সহস্র বৎসর গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় হিন্দুর গৃহে যে পুণ্যশক্তির সঞ্চার করিয়াছ, তাহার পুনরুদ্দীপন কর। তোমার সুকোমল অলক্তরাগরঞ্জিত পাদযুগের নূপুর-মুখর সঞ্চালনে গৃহে গৃহে স্বর্গীয় সতীত্বের বার্তা ধ্বনিত হউক। তুমি আমাদের আদর্শ নহ, তুমি আমাদের প্রাপ্ত; তুমি কবির সৃষ্টি নহ, তুমি ভগবানের দান।"

যাহা হউক, প্রজাদের সামনে সেই জনাকীর্ণ অযোধ্যার রাজসভায় রাজমহিষী সীতা নিজ সতীত্বের চরম পরীক্ষা দিতে ঢুকিলেন। সারা জীবনই তিনি দুঃখের উপর পরীক্ষা দিয়া আসিতেছিলেন, এবং প্রতি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কালিদাস লিখিয়াছেন: "বাঙ্‌মনঃকর্মভিঃ পত্যৌ ব্যভিচারো যথা ন মে। তথা বিশ্বম্ভরে দেবি! মামন্তর্ধাতুমর্হসি॥" অর্থাৎ ভগবতী বসুন্ধরে, যদি আমি বাক্য মন ও কর্ম দ্বারা পতির প্রতি কোনরূপ ব্যভিচার না করিয়া থাকি, তবে আমাকে আত্মগর্ভে স্থান দান করুন। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী বিদীর্ণ হইল। বসুধাদেবী নাগেন্দ্রফণোদ্ধৃত সিংহাসনে আপন কন্যা সীতাকে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া রামচন্দ্রের নিষেধ সত্ত্বেও অন্তর্হিত হইলেন। গুরুজনেরা ধরণীর প্রতি রামচন্দ্রের ক্রোধ শান্ত করিলেন। সীতার অন্তর্ধানে রামচন্দ্র মণিহারা ফণী হইলেন। তিনি বলিলেন, "যদি সেই মিথিলেন্দ্রনন্দিনী পৃথিবীতে একান্তই না থাকেন, আমার জীবন কি করিয়া থাকিবে? আলম্বন বিনা আশ্রয়ের স্থিতি হয় না।" কালিদাসের রামচরিতে যবনিকা পড়িল। রামচন্দ্রকে ছদ্মবেশী যম আসিয়া নিবেদন করিলেন: "ব্রহ্মার অনুরোধে

আপনি এইবার স্বর্গারোহণ করুন।" কুশ ও লবের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া রামচন্দ্র পবিত্র সরযূ নদীকে স্বর্গারোহণের সোপান করিলেন।

রামচরিতে কালিদাস বিয়োগান্ত, ভবভূতি মিলনান্ত। কালিদাস লব কুশকে দিয়া অযোধ্যার রাজসভায় রামায়ণগান করাইয়াছেন; ভবভূতি বাল্মীকির তপোবনেই উহার অনুষ্ঠান করাইয়াছেন। উত্তররামচরিতের সম্মেলন নামক শেষ অঙ্কে তপোবনের গঙ্গাতীরে রামলক্ষ্মণ ও প্রজাবর্গের সম্মুখে বাল্মীকি-বিরচিত ও অপ্সরাগণ কর্তৃক অভিনীত রামায়ণের শেষ অধ্যায় সীতা-নির্বাসন পালা শুরু হইল। রামচন্দ্র ভ্রমবশতঃ অভিনয়কে সত্য বলিয়া ক্রমাগত হাহুতাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রতিবারেই নাটক বলিয়া প্রকৃতিস্থ করিলেন। নাটকের মধ্যে নাটক প্রবেশ—ইহা সংস্কৃত নাটকের একটি টেকনিক। যাঁহারা কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' বা শ্রীহর্ষদেব-বিরচিত 'প্রিয়দর্শিকা' নাটক পড়িয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন সেখানেও নাটকের মধ্যে নাটক সৃষ্টি করিয়া এক অপূর্ব কলার উদ্ভব হইয়াছে।

কালিদাস সীতাকে পাতাল প্রবেশ করাইয়াছেন বাল্মীকি-রামায়ণের কাহিনী অনুসারে। এই দৃশ্য সত্যই করুণ। সেইহেতু ভবভূতি ওদিক দিয়া গেলেন না। তিনি গতানুগতিক পথ ছাড়িয়া নূতন পথ ধরিলেন। তিনি সীতাকে পাতাল প্রবেশ করাইলেন আবার অলৌকিক উপায়ে তুলিলেন। ইহা আমরা ছায়া নামক তৃতীয় অঙ্কে তমসার মুখে শুনিয়াছি। তারপর ভবভূতি রামচন্দ্রকে নাটক দেখাইতে দেখাইতে নাটকীয় ভাবে সীতাকে রামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত করাইলেন। বাস্তব সীতাকে সঙ্গে লইয়া অরুন্ধতী প্রবেশ করিলেন এবং পুরবাসিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জনপদবাসিগণ, আমি অরুন্ধতী। ভগবতী গঙ্গা ও পৃথিবী প্রশংসা করিয়া সীতাকে আমার নিকট অর্পণ করিয়াছেন। পূর্বে ভগবান অগ্নি ইহার পবিত্র চরিত্র নির্ণয় করিয়াছেন। সূর্যবংশের বধূ এবং যজ্ঞভূমি হইতে সমুৎপন্ন সীতাকে রামচন্দ্র পুনরায় গ্রহণ করুন—এ বিষয়ে আপনাদের মত কি?" তিরস্কৃত প্রজাগণ লজ্জিত হইয়া তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। কুশ ও লবকে সঙ্গে লইয়া বাল্মীকি মিলনের সমাপ্তি ঘটাইলেন। নাটকের যবনিকা পড়িবার পূর্বে ভবভূতি সুন্দর বলিয়াছেন: "সানুষঙ্গানি কল্যাণানি" অর্থাৎ মঙ্গল মঙ্গলের সঙ্গেই উপস্থিত হয়।"

কালিদাস ও ভবভূতি উভয়েই কাব্যসমুদ্র মন্থন করিলেন। তাহা হইতে উঠিল 'রামসুধা', যে সুধা পান করিলে মানুষ অমরত্ব লাভ করে। কালিদাস শোনাইলেন (রঘুবংশ: শ্রব্যকাব্য) আর ভবভূতি দেখাইলেন (রামচরিতদ্বয়: দৃশ্যকাব্য)। কর্ণেন্দ্রিয় কালিদাসের রামগাথা শুনিয়া সব কিছু মনের নিকট পৌঁছাইয়া দিল এবং চক্ষুরিন্দ্রিয় ভবভূতির রামচরিতনাটকদ্বয় দেখিয়া সব কিছু মনের কাছে পৌঁছাইয়া দিল। ফলে মনোজগতে একটি মধুর হিন্দোল দোল দিতে লাগিল। ঐ হিন্দোলের নাম 'রামলীলা'। ঐ রামলীলা শুনিবার ও দেখিবার জন্য মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া তাহার গেহকে ভুলিয়া, দেহকে কষ্ট দিয়া, দৈন্যকে অগ্রাহ্য করিয়া, সংসারের মায়ামোহকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া যাত্রা করিয়াছে। ঐ যাত্রা অমর তীর্থযাত্রা। 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিতপাবন সীতারাম' গাহিতে গাহিতে মানুষ চলিয়াছে অযোধ্যানগরীতে, গোদাবরী-

নদীতীরে, পঞ্চবটীবনে, রামেশ্বর সেতুবন্ধে। ভক্ত আপনভাবে ভগবানের সঙ্গে নিজ মানস সেতু বাঁধিয়াছে ঐ দীর্ঘ তীর্থযাত্রার মাধ্যমে। সে মানস চক্ষে ত্রেতাযুগের সব ঘটনা দেখিয়াছে; আপনভাবে বুঝিয়াছে সত্যস্বরূপ ভগবান রামচন্দ্র রজ ও তমের প্রতিমূর্তি রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ করিলেন।

রামনামের রূপা ও মহিমা বুঝাইতে গিয়া ভবভূতি মন্দোদরীকে দিয়া বলাইয়াছেন, "রামনামে শিলা জলে ভাসে।" নিতান্ত নির্বোধ স্ত্রীলোকের উক্তি বলিয়া রাবণ উহা উড়াইয়া দিয়াছেন। আমরাও মূঢ়তাবশতঃ ঐরূপ করি কিন্তু তীর্থযাত্রীরা জানে রামনামে অসাধ্য সাধন হয়। সেতুবন্ধে দাঁড়াইয়া তাহারা রাম-চরিতের সঙ্গে নিজেদের সেতু বাঁধে। নিজেদের মধ্যে যে তমোগুণী কুম্ভকর্ণ ও রজোগুণী রাবণ আছে, তাহাদের দমন করিবার জন্য 'শরণং তব চরণং ভবহরণং মম রাম' ভক্তির সঙ্গে উচ্চারণ করিতে থাকে। কালিদাস ও ভবভূতি সেই রামনামের জয়ডঙ্কা বাজাইয়াছেন। 'শুদ্ধব্রহ্ম পরাৎপর রাম'কে সাধারণ মানুষের অনায়াসলভ্য করিয়া দিবার জন্যই মহাকবিদের প্রয়াস। রামনামের মহিমা কীর্তন করিয়া বাল্মীকির ন্যায় কালিদাস ও ভবভূতি অমর হইয়া রহিয়াছেন।

নববর্ষে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

অন্তরমন্দির উজ্জ্বলি' মাগো,
অভয় শঙ্খ স্বনি' প্রেমে জাগো।
করুণাময়ি. তব আশিস প্রার্থি
জিনিতে পুঞ্জিত তমসা-আর্তি।
জ্যোতির্ময়ি মা, পরম শরণ্য—
যার ধ্যান ধরি' জীবন ধন্য!
হৃদয়-গ্রন্থি যত খণ্ডি' কৃপাণে
জ্বালো আলো মুক্তি বিষাণে।
কণ্টক কুসুমে মঞ্জার মাগো,
অভয় শঙ্খ স্বনি' প্রেমে জাগো।

গর্ব-দুরভিমানে নিতি হয় মা,
অরুণাভা তব পলকে লয় মা!
অমনি নিশাচর প্রাণতুফানে
ভ্রান্তিবিলাসী মায়া আনে।

তুমি কত দূরে! তবু পথহারা
পান্থ জপে তব মন্ত্র-ইসারা!
যাচি দেবি, তব চরণে হরষে
সুন্দর শরণাগতি নব বরষে।

তব ধ্রুবতারাদীপে মাগো,
অভয় শঙ্খ স্বনি' প্রেমে জাগো।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বিজ্ঞানভিক্ষু

দর্শন ও উপদেশ

"স্বামীজীকে আপনি এখনো (তাঁর দেহ-ত্যাগের পরও) দেখতে পান ?"—এই প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানানন্দজী বলিয়াছিলেন, "তিনি রয়েছেন আর দেখতে পাবো না ?"

নিজ দর্শনাদি সম্বন্ধে সত্যদ্রষ্টাগণের উক্তির মূল্য আমাদের কাছে এইখানেই সর্বাধিক। অবতারগণ, মহাপুরুষগণ দেহত্যাগের পরও সূক্ষ্ম শরীরে থাকেন—'অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরা রায়, কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়'—এ বিবৃতি শুনিয়া মনে যে বিশ্বাস আসে, তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক বিশ্বাস আসে যখন কোন 'ভাগ্যবান' বলেন, 'আমি দেখিয়াছি, আমি দেখিতে পাই।'

তাঁহাদের উপদেশ সম্বন্ধেও একই কথা। এরূপ বিশুদ্ধ-দর্শন ব্যক্তিগণ যখন নিজের ভাষায় তাঁহাদের উপলব্ধ সত্যের বিবৃতি দেন, তাহা শুনিয়া মনে যে বিশ্বাস আসে, শুধু যুক্তি-বিচারসহায়ে সে বিশ্বাস কখনো আসে না। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথার মধ্যেই এমন শক্তি নিহিত থাকে যাহা সোজাসুজি মনের উপর ক্রিয়াশীল হইয়া এই বিশ্বাস আনিয়া দেয়। সে-কথা মনের উপর হইতে একটি আবরণ যেন সরাইয়া দিয়া বিশ্বাসের স্নিগ্ধ আলোকের পথ অবারিত করে। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসি-সন্তান স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে রামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক সন্ন্যাসী একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কোন পণ্ডিতের সঙ্গে আর আপনাদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় তফাত আছে নিশ্চয়ই ?" স্বামী তুরীয়ানন্দজী উত্তর দেন, "নিশ্চয়ই ! আমাদের মুখ থেকে শুনলেই মনের অন্ধকার দূরীভূত হয়।" এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক সন্ন্যাসীর (তখন ব্রহ্মচারী) নিজের ভাষাতেই একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি: "বেলুড় মঠে বাসন্তীপূজা। পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ মঠে আছেন; পূজক রোজ তাঁকে প্রণাম করে, তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে পূজোয় বসে। তিনি রোজই জিজ্ঞাসা করেন, 'এর পরে কি ?' পূজক বিবরণ দেয়। নবমীর দিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কালকে কি হবে ?' পূজক বলল, 'সকালে সামান্য দশোপচারে পূজা হ'য়ে দর্পণ-বিসর্জন হবে। আর সন্ধ্যাবেলা প্রতিমা-বিসর্জন।' মহারাজ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাকে কোথায় বিসর্জন দেবে ?' পূজক উত্তর দিল, 'কেন মহারাজ, এই গঙ্গায়।' মহারাজ আবার বললেন, 'গঙ্গায় বিসর্জন দেবে !' পূজকের উত্তর, 'হাঁ মহারাজ, প্রত্যেকবার আমাদের গঙ্গায় বিসর্জন হয়।' তিনি স্থিরভাবে বললেন, 'মাকে বিসর্জন দেবে হৃদয়ে।' শাস্ত্রের কথা 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ পরে স্থানে স্বস্থানে পরমেশ্বরি ! যত্র ব্রহ্মাদয়ঃ সর্বে সুরাস্তিষ্ঠন্তি মে হৃদি' গুরুবাক্যে প্রত্যক্ষ হয়ে গেল। বিজয়ার দিন সকালে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, মাকে কোথায় বিসর্জন দেবে ?' পূজক বলল, 'হৃদয়ে। হৃদয়ের বস্তু বাইরে এসেছিলেন, পূজা গ্রহণ করে আবার ভেতরে চলে যাবেন।' মহারাজ বললেন. আপনি তো দেখছি পণ্ডিত লোক !..." সন্ন্যাসীটি বলেন, "'তিষ্ঠ তিষ্ঠ পরে স্থানে' ইত্যাদি মন্ত্রটি তো এর আগে কতবার পড়েছিলাম, কিন্তু তাতে যা হয়নি এঁর মুখ থেকে একটা কথা শুনেই তা হয়ে গেল।"

দর্শন

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বিভিন্ন সময়ে তাঁহার দর্শনাদির কিছু কিছু বলিয়াছেন। তবে অনেক সময় শ্রোতাদের মনের অবস্থা বুঝিয়া বিষয়টিকে একটু হাল্কা করিয়াও দিতেন। যেমন একদিন অনেক সব দর্শনের কথা বলিয়া শেষে হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "তবে কি জান? রাখাল মহারাজের আর আমার ঐ রকম দর্শনাদি খুব হত। দুজনেরই রাত্রে ঘুম কম হত কি না, তাই ঐ রকম দেখতাম। তোমরা 'ইয়ং বেঙ্গল' ওসবে বিশ্বাস করো না।"

কাশীতে সেবাশ্রমের বাড়ী নির্মাণ করাইতে যাইয়া তিনি শিবঠাকুরকে দেখার কথা বহুবার বলিয়াছেন। স্টেশন হইতে সেবাশ্রমে যাইবার পথে এক্কা উল্টাইয়া পায়ে খুব চোট লাগে, খুব যন্ত্রণা ও জ্বর হয়। রাত্রে "দেখি কি, শিবঠাকুর মৃদুমধুর হাস্যে আমার দিকে আসছেন। তখন তাঁকে বললুম, 'কি শিবঠাকুর, আমাকে এখন কি নিতে এসেছেন? আমি এখন যাব না, ঠাকুরের কাজ রয়েছে; তাই আগে করতে হবে।' ওকথা কে শোনে? তিনি স্মিত হাস্যে আমার কাছে এগিয়ে এসে আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। তাঁর শরীরটি বরফের মতো ঠাণ্ডা আর কোমল। আমার শরীরও তখন বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেল; সকল যন্ত্রণা দূর হয়ে গেল। তখন তাঁকে বললাম, 'ঠাকুর, এখন তবে আসুন! ঠাকুরের কাজ করতে হবে।' শিবঠাকুর হাসতে হাসতে চলে গেলেন। আশ্চর্য এই যে, সকালে উঠে দেখি জ্বর নেই, পায়ের ব্যথাও নেই—সব সেরে গেছে। এখনও যেন সেই প্রশান্তমূর্তি জটাজূটধারী হাসিমুখে দাঁড়ানো শিবঠাকুরকে দেখতে পাই, তাঁর সঙ্গে কথা কই, আর কত আনন্দ হয়!"

কালীঘাটে তিনি মা-কালীর দর্শনলাভ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "যখন মন্দির প্রদক্ষিণ করছি, মা কৃপা করে দর্শন দিলেন।" মা-কালীর দর্শনলাভের সময়, এবং সারনাথে ও পাঁড়েলা শিবদর্শন করিতে যাইবার পূর্বে তিনি কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ প্রত্যক্ষ করেন। কালীঘাটে "কুণ্ডলিনী সড়সড় করে উঠে একেবারে সহস্রার আলো করে দিলে।" "কাল ভোর-বেলা একটা বেশ ভাব হয়েছিল—ঐ রকম অনুভব করেছিলাম সারনাথে যাবার পূর্বেও। কালো সাপের মতো কি যেন একটা নীচ থেকে ওপরের দিকে খুব বেগে উঠছিল। এটা আর কিছু নয়, কুণ্ডলিনীর খেলা।" "কাল যদিও কথায় কথায় বলেছিলাম যে পাঁড়েলা মহাদেব দর্শন করতে যাব, কিন্তু ভিতরে যে খুব একটা আগ্রহ ছিল তা নয়। হয়তো যেতাম না। কিন্তু রাত্রিতে এক আশ্চর্য দর্শন হল। নীচ থেকে উপর ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্যোতিতে ভরে গেল। সে যে কি, তা মুখে বলা যায় না! ভারি আনন্দ হয়েছিল। বুঝতে পারলাম, শিবঠাকুর কৃপা করেছেন।"

এলাহাবাদে ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নানান্তে তিনি ত্রিবেণী মাতার দর্শন পান। অতি কমনীয় কুমারী-মূর্তি জল হইতে মাথা তুলিয়া হাত দিয়া তিনটি বেণী ঊর্ধ্বে তুলিয়া দেখাইয়া আবার জলমধ্যে অদৃশ্য হন। স্নানান্তে আশ্রমে ফিরিবার পথেও একদিন সেই ত্রিবেণী দেবীকে দেখিয়াছিলেন: "তিনটি বেণী দুলিয়ে আমার সামনে সামনে চলেছেন।"

জগন্নাথ-দর্শন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "মন্দিরে প্রবেশ করে জগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করে-ছিলাম। আলিঙ্গন করার সময় জগন্নাথ-

দেবকে ঠিক ননীর পুতুলের মতো নরম বোধ হয়েছিল।"

রামায়ণের অনুবাদ করিতে বসিলেই তিনি শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতিকে দেখিতে পাইতেন: "আমি যখন রামায়ণ লিখতে বসি, তখন জগৎ ভুল হয়ে যায়। সামনেই রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও মহাবীরজীকে প্রত্যক্ষ দর্শন করি।"

সারনাথে ও ব্রহ্মদেশের পেগুতে তিনি বুদ্ধদেবের দর্শনলাভের কথা বলিয়াছেন। সারনাথে তিনি শ্রীভগবানের নিরাকার সত্তার সহিত নিজের সত্তার একীভূত হইয়া যাইবার ও সেই নিরাকার সত্তা হইতেই তাঁহার সাকার রূপের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করার কথা বহুবার বলিয়াছেন। এই দর্শনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "এর আগে তীর্থস্থানে বা মন্দিরাদিতে কিছু কিছু দর্শন হয়ে থাকলেও এমনটি কখনো দেখিনি। এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার—একেবারে নিরাকার জ্যোতিঃসমুদ্র! ধীরে ধীরে সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছিল। আমি যেন একটি বিন্দুর মতো ঐ জ্যোতিঃসমুদ্রের কিনারায় দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে সেই আনন্দজ্যোতিঃ দর্শন করছি। তখন আমাতে আর আমি নেই। নিমেষে নিখিল বিশ্ব অদৃশ্য হয়ে এক শুদ্ধ চেতন সমুদ্রে বিলীন হয়ে গেল। এবং তন্মধ্য হতে ভেসে উঠল—বুদ্ধদেবের একটি অতি কমনীয় ও প্রেমময় রূপ! সে যে কি আনন্দ! ......ঐ ভাবের নেশা তিনদিন পর্যন্ত ছিল।"

এই প্রসঙ্গে সময়ান্তরে বলিয়াছেন, "শুকদেব যখন হিমালয়ে তপস্যা করছিলেন, তখন সকল দিক থেকে 'ব্রহ্ম' 'ব্রহ্ম' শব্দ শুনতেন। 'জ্যোতিঃ ব্রহ্ম' 'জ্যোতিঃ ব্রহ্ম' এই শব্দ পর্বতময় সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হতে শুনতেন। সেই জ্যোতিঃ কি জান? বড় স্নিগ্ধ ও মধুর। আনন্দ, শান্তি ও জ্ঞান-স্বরূপ; সেই জ্যোতিঃ চিদ্‌ঘন। ......এই জ্যোতিঃ আমি সারনাথে মিউজিয়ামে বুদ্ধদেবের মূর্তির সামনে দেখি এক অনন্ত অখণ্ড জ্যোতিঃসমুদ্র। আমি যেন তাতে একটি বিন্দুর মতন। . সমগ্র জগৎ ক্রমে বিলীন হয়ে গিয়েছিল—আমিও নেই।"

"এই থেকেই বোঝ, মহাপুরুষরা শরীর ছাড়লেও তাঁদের প্রতিমূর্তি বা ছবি জীবন্ত।... মহাপুরুষদের কৃপাতেই আমরা ঐ দিব্য জ্যোতির সন্ধান পাই।"

রেঙ্গুনে অবস্থানকালে পেগুতে বুদ্ধের শায়িত মূর্তি দেখিতে গিয়া সেখানেও তিনি বুদ্ধদেবের দর্শন পান—"বুদ্ধদেব কৃপা করে আমায় দর্শন দিয়েছেন। দেখলাম শায়িত বুদ্ধমূর্তিটি একেবারে জীবন্ত। তাঁর সৌন্দর্যের কি অপূর্ব বিভা!"

অদ্বয় অরূপ সচ্চিদানন্দই ভগবানের স্বরূপ, আমাদেরও স্বরূপ, এবং এই অরূপ সত্তা হইতেই যে বিভিন্ন ঈশ্বরীয় রূপের এবং অবতারগণের উদ্ভব—এই সত্যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি সহায়ে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়াই 'দাক্ষিণাত্যে তীর্থসমূহ কেমন দেখিলেন?'—এই প্রশ্নের উত্তরে সহজভাবে বলিয়াছিলেন, "কেমন আর দেখলুম! একই ব্যাপার। তিনিই সর্বত্র আছেন"; বলিয়াছিলেন, "সচ্চিদানন্দই ভগবান"; বলিয়াছিলেন এবং শ্রোতার হৃদয়ে গাঁথিয়া দিয়াছিলেন যে, নিজেরই স্বরূপকে প্রতিমায় আনিয়া সাকার ঈশ্বররূপে পূজা করা হয়, এবং পূজান্তে আবার নিজেরই স্বরূপে সেই সাকার রূপের বিসর্জন দিতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁহার দেহত্যাগের পরও পূর্বের ন্যায় দেখিতে পান কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানানন্দজী বলিয়াছিলেন, "তা দরকার হলে তাঁর দর্শন পাওয়া যায় বইকি।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের সময় বিজ্ঞানানন্দ

পাটনায় ছিলেন। সেই রাত্রেই তিনি সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন—"দেখি যে তিনি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। ভাবলাম তাই তো, ঠাকুর এখানে কেন? কেনই বা তাঁকে এভাবে দেখলাম! তার পর-দিনই কাগজে তাঁর দেহত্যাগের খবর পাওয়া গেল।"

স্বামীজীর দেহত্যাগের সময়ও তিনি নিকটে ছিলেন না, এলাহাবাদে ছিলেন; সেখানেই তাঁহার দর্শন পান—"স্বামীজী মহারাজের দেহ-ত্যাগের সময়ও আমার এক অলৌকিক দর্শন হয়েছিল। এলাহাবাদে ব্রহ্মবাদিন ক্লাবে ঠাকুরঘরে ধ্যান করছি—দেখলাম যে ঠাকুরের কোলে স্বামীজী বসে আছেন। দেখে ভাবলাম—এ আবার কি! তারপর বেলুড় মঠ থেকে তার পাই যে, স্বামীজী দেহত্যাগ করেছেন।"

বেলুড় মঠে স্বামীজীর ঘরে যে স্বামীজী এখনো রহিয়াছেন, তাহা তিনি দেখিতে পাইতেন—"স্বামীজী এখনো এখানে আছেন। আমি তো তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় পা টিপে টিপে যাই, যাতে তাঁর কোন অসুবিধা না হয়। তাঁর ঘরের দিকে বড় একটা তাকাইনে, পাছে চোখোচোখি হয়ে যায়।" "তিনি এই সামনের বারান্দায় বেড়ান, ছাদে পায়চারি করেন, ঘরে গান করেন, আরও কত কি!"

দাক্ষিণাত্যে কন্যাকুমারী ও বিবেকানন্দ-শিলাদর্শনের অল্প কয়েকদিন পরেই তিনি এক-দিন ভোরে বলেন, "দেখ, এইমাত্র স্বামীজীকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন।" সেদিন জহরলাল নেহেরুর গ্রেপ্তারে সমগ্র ভারতব্যাপী হরতাল ছিল।

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিন তিনি তাঁহার সব গুরুভ্রাতাদেরই সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পঁচিশে বৈশাখ এল, হে রবীন্দ্র, তব বঙ্গদেশে,
উৎসবের নব নব বেশে।
তব জন্মদিন এল, শতাধিক বৎসরের পরে,
সম্বর্ধনা মঞ্চে মঞ্চে করিয়াছি পত্রপুষ্প করে।

তুমি বাজায়েছ বাঁশি;
মনুষ্যহৃদয় চিরসৌন্দর্য-পিয়াসী,
ছুটিয়াছে সে-বাঁশির মধুবর্ষী সুরে,
বাস্তবের আবিলতা অবহেলি', ঊর্ধ্বে বহু দূরে।
সুবিমল পবিত্রতা, জোছনার মাধুর্যের মতো
নারীর হৃদয়ে সেথা শোভে যেন পুষ্প শত শত;
পুরুষ চরিত্র নিয়ে জাগিছে সেথায় মহিমায়,

দীনের আশ্রয়, আর খড়্গসম যেথায় অন্যায় ;
সুখের, শান্তির সেই 'মানুষের' লোকে,
দেখায়েছ তুমি পথ, কাব্য-কথা-সঙ্গীত-আলোকে।
অকৃতজ্ঞ নহি মোরা, ভিত-শীর্ষে রাখি তব পট,
আলোকিত অনুষ্ঠানে তব নামে রাখি পুণ্য ঘট।
ব্যবহার ? রুচি-বোধ ? শালীনতা ? অমৃতে বিশ্বাস ?
শ্রদ্ধা ? শ্রম ? সংযত বিলাস ?
ও সব তো সে-যুগের, ও সব তো পচা ও প্রাচীন !
ও সব মানি না মোরা, গুরুদেব ! আমরা স্বাধীন !

প্রতিভার বীণাখানি বাজাইলে অখণ্ড-পূজায় ;
সেই দেশ বিখণ্ডিত, আজি আরো খণ্ড হতে চায়।
রাজনীতি অন্য নীতি করি' অস্বীকার
দিকে দিকে বিস্তারিছে নিজ অধিকার।
অন্নবস্ত্র, বিদ্যাবুদ্ধি, হৃদয়ের রস
ছাঁচে ঢেলে দিতে চায় ! যান্ত্রিক হরষ !

কবিগুরু ! বিশ্বকবি ! তব নামে করি তবু জাঁক,
দিকে দিকে ডাকে যবে পঁচিশে বৈশাখ।
কিন্তু হায় ! বক্ষে কই অমলিন প্রীতির বিশ্বাস ?
অসীমের রূপে ভরা কোথা সে আকাশ ?
কাল-বোশেখীর রথে আসিয়াছে দুর্যোগের রাত,
দিকে দিকে ঘন ঘন ঘটে বজ্রপাত ;
কাঁপিছে চাঁপার কলি, মাধবীর কাঁদিছে সুবাস।
এসো কবি, রোখো সর্বনাশ।
তোমার পৌরুষ-দীপ্তি সর্বচিত্তে উদ্ভাসিত হোক,
আসুক পবিত্র তেজ, শুভ বুদ্ধি, প্রেমের আলোক।

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সাময়িক পত্র

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

॥ ৪ ॥

এমন একটি পত্রিকা—মধ্যাহ্নদীপ্ত—আরম্ভের ঠিক দু'বছর পরে, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে, এই পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় বেরুল—*Farewell*—'বিদায়'—তার মানে পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হল!! এরই নাম 'মধ্যাহ্নে অন্ধকার'।

অন্ধকার অবশ্য শেষ পর্যন্ত অনন্ত রাত্রির না হয়ে সূর্যগ্রহণের অন্ধকারতুল্য হয়েছিল, কারণ পত্রিকাটির পুনরভ্যুদয় ঘটেছিল মাত্র দু'মাসের মধ্যেই। কিন্তু ঐ বিস্ময়কর সমাপ্তির কারণ কি? আর্থিক অসুবিধা? না। *Farewell* রচনার মধ্যে পত্রিকার কর্তৃপক্ষ জানান—"The journal was a thorough success as a business concern."[৭] পত্রিকাটির মৃত্যুর কারণ ভিন্নতর—তা হল, পত্রিকা-সম্পাদকের মৃত্যু, যিনি এর 'life and soul' ছিলেন। আর্থিক ব্যাপারটি বাদ দিলে কথাটি আক্ষরিকভাবে সত্য। *Farewell*-এর সূচনাতেই তা দেখেছি—

"We regret very much to intimate to our subscribers that we are forced to stop the journal with this issue, as we find the loss sustained in the premature death of our Editor, Mr. B. R. Rajam Iyer, irreparable. Except the few 'Contributions' and the 'Extracts,' all the articles were written by him, some under the following pseudonyms :—T.C. Natarajan, M. Ranganatha Sastri, A recluse, and, Nobody-knows—who." (P. B., June, 1898)

রাজম আয়ার মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে মারা যান। তাঁর জীবন ঘটনাবহুল নয়। তাঁর দেহত্যাগের পরে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে কিছু তথ্য দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে লেখা দু'একটি স্মৃতিকথায় রাজম আয়ারের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে রাজম আয়ারের পরিচয় প্রায় নেই।

রাজম আয়ার স্বামীজীর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসেছিলেন মনে হয়। অন্ততঃ 'বেদান্তকেশরী'র ফেব্রুয়ারী, ১৯১৬ সংখ্যায় পি এন শ্রীনিবাসা-চারীর স্মৃতিকথায় তা পাই। অন্যান্য কথার সঙ্গে তিনি লিখেছিলেন—

"এই মাদ্রাজে আমরা কয়েকজন স্বামীজীর সেই বিরাট সত্তা-জাগরণী, জীবনসৃষ্টিকারী শক্তির প্রত্যক্ষদর্শী। আমি নিজে তার বিষয়ে জানি। ৬০ বছর আগেকার ঘটনার কথা বলছি। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা যাবার আগে, স্বামীজী মায়লাপুরে দুটি সত্তাকে জাগিয়ে-ছিলেন। একজন হলেন—বি আর রাজম আয়ার, *Rambles in Vedanta* গ্রন্থের তিনি অমর লেখক। স্বামীজী রাজমকে দেখেন, তাঁকে দিব্য আবেশ দান করেন, তার ফলে অধ্যাত্মরসে

৭ কিন্তু তা হলেও, পরিচালনার ব্যাপারে কিছু অব্যবস্থা ঘটেছিলই। স্বামীজী ১৮৯৮, মার্চ মাসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছিলেন—"প্রবুদ্ধ ভারত অত্যন্ত অব্যবস্থার মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়; উহার সুশৃঙ্খলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করো।"

রাজম নিমজ্জিত হয়ে যান। অপরজন সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়র। স্বামীজী তাঁকে খুবই ভালবাসতেন, 'কিডি' বলে ডাকতেন। সিঙ্গারাভেলু প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে দেন, সংসার ত্যাগ করেন এবং স্বামীজীর পদে আত্মসমর্পণ করেন। স্বামীজীর এমনই ছিল চৌম্বক শক্তি, এমনই প্রাণ-সৃষ্টিকারী, সত্তা-সৃষ্টিকারী অলৌকিক শক্তি। আমি নিজে সে জিনিস দেখেছি। আমার মধ্যে যদি কিছু আধ্যাত্মিক ভাব থাকে, তা ঐসব মানুষের জন্যই যাঁদের স্বামীজী নির্মাণ করেছিলেন; স্বামীজী করেছিলেন বলার চেয়ে বলা উচিত তা করেছিল তাঁর সেই দারুণ অগ্নিময় দৃষ্টি —ব্রহ্মণ্যশক্তিতে জলন্ত দৃষ্টি।"

প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের মূল্য সর্বাধিক। সুতরাং শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাসাচারী-প্রদত্ত তথ্যকে আমরা গ্রহণ করছি। স্বামীজী-প্রবর্তিত বেদান্তের প্রভাবও রাজম আয়ারের উপরে ছিল মেনে নিতে বাধা নেই। তাঁর *Rambles in Vedanta* গ্রন্থে (যে গ্রন্থটি প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশিত রাজমের রচনা-সংকলন) শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনচিত্র দেওয়া হয়েছে বেদান্ত-বিগ্রহরূপে। এবং তাঁর উপরে স্বামীজীর এই প্রভাবের কথা জানা ছিল বলেই স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে 'মালাবার মেল' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল।—

"And that famous periodical, edited also at his (Swamiji's) instance by the late Mr. B. R. Rajam Ayer, who too like his master (i e. Sw. Vivekananda) died, alas ! too early."

এইসকল তথ্য থেকে মনে হতে পারে স্বামীজী রাজম আয়ারের গুরু ছিলেন,[৮] কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। ভিন্ন এক ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিগত গুরু।

সে প্রসঙ্গে আসার আগে রাজমের ব্যক্তি-জীবন সম্বন্ধে প্রবুদ্ধ ভারতের জুন ১৮৯৮ সংখ্যায় G. S. K.-লিখিত *Our Late Editor* রচনা থেকে তথ্য সংকলন করে দিচ্ছি।

মাদুরা জেলার বাটলাগুন্ডু গ্রামে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাজম আয়ারের জন্ম। পিতামাতার তিনি জ্যেষ্ঠ সন্তান। বাল্যে খুবই লাজুক ছিলেন, খেলাধুলা বা বয়সোচিত মজার ব্যাপারে যোগদান করতেন না। মাদুরা থেকে এফ. এ. পরীক্ষায় পাশ করে মাদ্রাজে আসেন ১৮৮৭ সালে, সেখানে 'ক্রিশ্চান কলেজে' ভর্তি হন, এবং বি. এ. পাশ করেন ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। "পরবর্তী তিন বৎসরে, যখন তিনি মাদ্রাজে ল কলেজের ছাত্র, তখন ইংরেজ কবি ও ঔপন্যাসিকদের রচনাপাঠে যথেষ্ট মনোযোগ দেন এবং ইংরেজী কাব্যের অন্তর্নিহিত শিল্প ও ভাবপ্রতিভার ভিতরে প্রবেশ করবার মতো অপূর্ব অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন।" রাজমের কল্পনাশক্তিতে প্রবলতা এবং গভীরতা যথেষ্ট ছিল, অনুভূতিশক্তিও সবিশেষ, শেক্সপীয়র, বায়রন, কীটস, শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও জর্জ এলিয়টের জগতে ক্রমান্বয়ে বিচরণ করতেন, বিশেষত: শেলী ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রভাব

[৮] সাংবাদিক-লেখক সেন্ট নিহাল সিং ১৯৪৫ সালের অগষ্ট মাসে প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় A Backward Glance at Prabuddha Bharata নামক প্রবন্ধে কার্যত: এই ভুলই করেছিলেন :

"There (in Madras) in 1895, he chanced upon the man who was to touch his soul with a flame that was to consume such dross as had not already been burnt away—that was at the same time, to illumine his mind. This was as mentioned before, the Swami Vivekananda".

এখানে জানানো উচিত, স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতেই ছিলেন না।

ছিল সর্বাধিক। 'সত্য, শক্তি ও সৌন্দর্যের জন্ম যে গভীর ব্যাকুলতা' এঁদের কাব্যের মধ্যে রাজম দেখেছিলেন, তা রাজমের মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে সত্য ও আত্মাকে জানবার জন্ম দার্শনিক উৎকণ্ঠায় তাঁকে অধীর করে তুলল। মাত্র ইংরেজ কবিদের কাব্যানুশীলনেই তিনি আবদ্ধ ছিলেন না। বিখ্যাত তামিল ঋষি-কবি থায়ুমনবরের (Thaumanavar) কাব্যের অধ্যাত্ম-সৌন্দর্যে অবগাহন করেছিলেন এবং তাঁর কাছে সুবিখ্যাত তামিল কবি কম্বনই (Kamban) ছিলেন পৃথিবীর সর্বোচ্চ কবি-প্রতিভা। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্রিশ্চান কলেজ ম্যাগাজিনে' একটি সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখে রাজম প্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সময় থেকে 'বিবেকচিন্তামণি'তে তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস কমলাম্বল (Kamalambal) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। মহান তামিল কবি কম্বনকে (Kamban) জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে এই উপন্যাসে রাজম ঐ কবির ঐশ্বর্যময় বাগ্-ধারাগুলিকে পুনঃপ্রয়োগ করেন। শেলী ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের কল্পনার সূক্ষ্ম রসসঞ্চারের চেষ্টাও এর মধ্যে করেছিলেন এবং হিন্দু গৃহ-জীবনের সুন্দর ছবিও ছিল। কিন্তু ঔপন্যাসিকের আসল উদ্দেশ্য ছিল 'অশান্ত আত্মার অন্তর্গহনের তীব্র সংগ্রামের অভি-জ্ঞতাকে ফুটিয়ে তোলা', যে-আত্মা 'বহু যন্ত্রণার অন্তে অবশেষে পেয়েছিল অকলুষিত বিশুদ্ধ সায়রের সন্ধান, যেখানে তার যুগযুগের জ্বলন্ত তৃষ্ণা প্রশমিত হবে।' ইতোমধ্যেই রাজম আয়ার স্পষ্টতই বেদান্তদর্শনের প্রভাবে পড়েছিলেন, তাঁর উপন্যাসের পরিণতিতে দার্শনিক সিদ্ধান্তই উপস্থিত দেখতে পাওয়া যায়। কবিতার সৌন্দর্যের অতি বড় ভক্ত হয়েও ঐশ্বরিক চেতনার বিরাট তত্ত্বের কাছে কাব্যানু-ভূতিকে তাঁর খুবই সীমাবদ্ধ ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল, বড়জোর তা যেন মন্দিরের প্রবেশ-পথে একটি বিশ্রামাগার।[১]

১ রাজম কাব্যানুভূতির সীমাবদ্ধতা ও ঐশ্বরিক চেতনার অসীমত্বের কথা এইভাবে ফুটিয়েছেন—

"Poetry gives both pleasure and pain: it has to record both the greatness of the universe and the littleness of man. Then again it cannot fall in love with the sultry day, the filhy tank, the barren desert and things of that kind of which there is no lack on earth. At the best therefore poetry is but a resting place on the wayside, a *mantapa* on the road to the temple. A higher happiness than what poetry can give is the birthright of man. It is his prerogative to be eternally and changelessly happy, to rejoice as much at sultry weather as at a moonlit night, to regard with equal composure to wanton wickedness of men and their benevolent self-sacrifice, not merely to weep with joy at a Cumbrian sunset and fly into space with a singing sky-lark's flight but to 'mingle in the universe and feeling what he can never express, but cannot all conceal', become himself the sun, the setting, the splendour, the sky-lark, the singing and the sky and all the rest in the glorious universe. Man is destined to conquer the heavens, the stars, the mountains, and the rivers, along with his body, his mind, and his senses, and even in this life, to dissolve himself into boundless space, and feel all within himself the roaring sea, the high mountain, the shining stars, and the noisy cataract. In this sense, he is the Lord of the creation—its exultant and all-pervading Lord, the Para-brahman of the Vedas, and at this stage he is above all anger, all meanness and all wickedness. The rage of intellect and the storm of the senses are all over, and in the mind of the highest emancipated man, there is an eternal moony splendour, boundless beatitude that is above all expression."

(*Our late Editor* রচনায় উদ্ধৃত)

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ঐ বৈদান্তিক ঐক্য-বোধকে ব্যক্তিজীবনে উপলব্ধির স্তরে লাভ করবার জন্ম রাজম ব্যাকুল হয়ে ওঠেন—তাঁর অন্তর্জ্বালা নিবারণ করতে পারবেন এমন মানুষের সন্ধানে দু' বৎসর নানা স্থানে সন্ধান করে ফেরেন, অবশেষে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে মাদ্রাজ শহরে সেই বাঞ্ছিত জনের সন্ধান পেলেন যিনি তাঁকে শান্তি দিতে সমর্থ। তিনি সত্যই শান্তি পেয়েছিলেন, জীবনের শেষ দিন অবধি একাগ্র নিষ্ঠায় ধ্যানধারণা করে গিয়েছেন, ১৮৯৬-এর অক্টোবরে অন্ত্রের ব্যাধিতে যখন গুরুতর পীড়িত তখনো মানসিক শান্তি ক্ষুণ্ণ হয়নি। এর পরে তিনি সাধনায় এমনই মগ্ন হয়ে পড়তে থাকেন যে, প্রবুদ্ধ ভারতের কাজ পর্যন্ত তাঁর কাছে ভারস্বরূপ বোধ হয়।

১৮৯৬-এর অসুখ সারবার পরে রাজমের স্বাস্থ্য ভালই ছিল। মৃত্যুর মাস দুয়েক আগে মূত্রাশয়ের ব্যাধির সূত্রপাত হয়। গোড়ায় সে বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগ দেননি। ক্রমে তা কঠিন আকার ধারণ করে ১৩ মে, ১৮৯৮ তারিখে তাঁর জীবনান্ত ঘটায়। রাজম বিবাহিত ছিলেন। মৃত্যুকালে ধর্মপত্নী এবং বৃদ্ধ পিতামাতাকে রেখে গিয়েছিলেন।

G. S, K.-লিখিত উপরের বিবরণে স্বামীজীর প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই। তবে গুরু-লাভের পূর্বে রাজমের উপর বেদান্ত-প্রভাবের উল্লেখ আছে।[১০] শ্রীনিবাসাচারীর স্মৃতিকথার সূত্রে বলতে পারি, এই বেদান্ত-প্রভাব স্বামীজীর কাছ থেকেই রাজম পেয়েছিলেন। স্বামীজীর প্রভাব রাজমের সুপ্ত সংস্কারকে জাগিয়েছিল, তাঁকে সেই যন্ত্রণা দিয়েছিল যা অশান্ত সন্ধানে তাড়িত করে আত্মাকে—কিন্তু সম্ভবতঃ রাজমের ব্যক্তিস্বভাব বিবেকানন্দের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বকে বরণ করবার উপযোগী ছিল না। উদ্রিক্ত-তৃষ্ণ রাজমের অধ্যাত্ম-সন্ধান এবং তার পরিণতির বিষয়ে জি. এস. কে-র রচনা থেকে কিছু উল্লেখ আগে করেছি, এখন তাঁর মূল রচনার অংশ উদ্ধৃত করছি :

"In 1894, he (Rajam Iyer) seriously set his heart upon realizing this infinite happiness to which the whole creation is moving consciously or unconsciously. For two years he went about from place to place in the hope of finding someone who could cure the fever of his heart, otherwise preferring to remain alone and obscure and seeking the privacy of his own glorious light. About the close of 1895 in Madras, where he always preferred to live because, as he said, he could lose himself in that wilderness of houses to be obscure, and in this busiest part of the town, he found someone who could put him in the way of acquirnig that peace and happiness for which his soul was panting for sometime past. From this time upto his death, he addressed himself to his supreme duty with a single-mindedness, devotion and self-sacrifice which may be called truly heroic. Nothing could ruffle the sweet serenity and the even temper of his mind, and the moment of the greatest physical agony, which he experienced during the attack of intestinal obstruction in 1896, and when face to face with death now, he never fretted, faltered or feared. He sought the company of no one except that of

[১০] ঠিক পূর্ববর্তী পাদটীকায় উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

his Guru, and preferred to hide himself in the light of his own thought or rather *Existence*, for even thought and speech he felt as a burden. He was either meditating, reading devotional or philosophical works, or writing for the *Prabuddha Bharata* ; and towards the close of his short life he devoted nearly the whole of his time to meditation, so much so that he found the editing of the journal a burden."

এই রচনার লেখক 'জি এস কে' রাজমের গুরুর অন্যতম ভক্ত ছিলেন স্পষ্টই বোঝা যায়। প্রবুদ্ধ ভারতের পরিচালক-গোষ্ঠীর অনেকেই তাঁর ভক্ত হয়েছিলেন ধরে নিতে পারি। *Farewell* রচনাটি থেকে দেখতে পাই, এই গোষ্ঠীরই কোনো একজন (বা একাধিক জন) রাজমকে প্রথম উক্ত গুরুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। নিম্নে উদ্ধৃত অংশে পাঠক দেখবেন, রাজম যে স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে প্রথম ধর্মভাবে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন, তা এই রচনার লেখকের জানা ছিল না বা জানা থাকলেও তাকে বিশেষ মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন না।—

"If the articles were pleasing and edifying in a high degree, it was because the writer had himself some realization of the Truth, and his views were developed under the teaching of a great sage, the 'Muni' whose 'Maditations' appeared in the journal.

Even before he came in contact with the sage, the writer had a most marked religious bent, as shown by the leader of this issue, which was the article which first attracted our attention to him. On reading the article in the *Brahmavadin* in 1895 we felt the hand of a great man and longed to find him. And when we sought him out, we found him an unpolished diamond.[১১] He had himself been in search of a master for over two years, and we most opportunely fell in with him and took him to the sage, whom be accepted as his Guru after some preliminary discussion. He soon received the necessary polish and his thoughts found vent in the *Prabuddha Bharata* To praise his articles would look like self-praise, but those who have enjoyed and profitted by them need no such words from us. Suffice it to say that the sage above referred to, remarked of the articles that they were inspired words."

নূতন গুরুর নির্দেশে ও আশীর্বাদে এবং নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত ব্যাকুলতায় রাজম আয়ার জীবনের একেবারে শেষের দিকে সাধনায় এমনভাবে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন যে, এই অতি-আগ্রহ তাঁর মৃত্যুর কারণরূপে কোনো কোনো মহলে আলোচিত হয়েছিল, যার ফলে প্রবুদ্ধ ভারতে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পর্যন্ত প্রকাশ করতে হয়।[১২] রাজম আয়ার যে সত্যই

১১ ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যদি রাজম আয়ারের সঙ্গে প্রবুদ্ধ ভারত-পরিচালকগোষ্ঠীর প্রথম পরিচয় হয়, তাহলে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কি স্বামীজীর সঙ্গে সত্যই রাজমের সাক্ষাৎ হয়েছিল? সাক্ষাৎ হয়েছিল—এর পক্ষে বর্তমানে আমাদের হাতে প্রত্যক্ষদর্শী পি. এন. শ্রীনিবাসাচারীর স্মৃতিকথা ভিন্ন আর কিছু নেই, এবং আমরা প্রত্যক্ষদর্শীর কথা নিশ্চয় অগ্রাহ্য করতে পারি না।

১২ "Before closing we may remove a misapprehension which seems to have crept into some quarters. It was remarked that Mr. Rajam Iyer died a martyr to his philosophy. If this means an insinuation that any *yoga* practice followed by him, led to his ill-health and untimely death, we hasten to assure Mr. Rajam Iyer's friends and admirers that the *Nishta* or contemplation by which he realized the Atman was none of the common breath-stopping or tip-of-the-nose-watching kind. He lived a glorious and happy life and died a natural and peaceful death."

(*Our late Editor*)

সাধনায় শান্তিলাভ করেছিলেন তা ব্রহ্মবাদিনেও লিখিত হয়েছিল।[১৩] গুরুর প্রভাবে রাজমের রচনায় নূতন বৈশিষ্ট্যও দেখা গিয়েছিল। এ বিষয়ে প্রবুদ্ধ ভারতের মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়—

"To those who could read between the lines, it must have been evident that the *Prabuddha Bharata* presented a peculiar interpretation of the Vedanta, and in this sense the journal had a marked individuality or personality, that of its editor, or of the sage, his Guru. It is our belief that the extraordinary popularity of the journal all over the length and breadth of India and even abroad was due not so much to the Vedanta merely as such promulgated by the journal as to the peculiarly beautiful and non-mystical interpretation which the journal presented. And as there is none to our knowledge who can rightly fill the place of the saint-editor whom we have lost, we are unable to continue the journal as othtr journals or magazines might under similar circumstances have been continued."

(*Our Late Editor.*)

এই উদ্ধৃতিটি কয়েকটি প্রশ্ন অনিবার্য করে তোলে: যেখানে পত্রিকাটি ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা এবং আর্থিকভাবে সফল, সেখানে সম্পাদকের মৃত্যুতে, তিনি পত্রিকার যতকিছুই হোন না কেন, তৎক্ষণাৎ পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া কিছু অস্বাভাবিক। পত্রিকার রচনা বা নীতির ব্যাপারে কি কিছু মতভেদ হয়েছিল পরিচালকদের মধ্যে? এবং রাজমের এই 'Peculiar interpretation of Vedanta' স্বামীজী কি রকম পছন্দ করেছিলেন?[১৪]

॥ ৫ ॥

রাজম আয়ারের বেদান্ত এবং তাঁর সম্পাদিত প্রবুদ্ধ ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি যে স্বামীজীর সম্পূর্ণ অনুমোদন পায়নি তার প্রমাণ, নবপর্যায়ের প্রবুদ্ধ ভারতের প্রথম সম্পাদকীয়। ১৮৯৮-র জুন মাসের পরে প্রবুদ্ধ ভারত বন্ধ হয়েছিল, তা আবার শুরু হয় মাত্র দু'মাস পরে অগষ্ট মাস থেকে। অগষ্ট সংখ্যায় সম্পাদকীয় রচনার গোড়ায় প্রবুদ্ধ ভারতের নবপর্যায়ের নীতি ও পরিচালন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল—

"Prabuddha Bharata comes to its readers this month in a new garb. On the demise of its gifted editor, it died a natural death. But now, like a new Phœnix, emerging from its own ashes, it returns to the world after but a brief suspension of activity. Its past karma, gathered in the diffusion of the highest Vedantic thought, demanded its re-incarnation.

---

১৩ "From what we have known of him we can unhesitatingly say that if the goal of all philosophy is to secure a happy Euthanasia, then Rajam Aiyer was a real *Vedantin.* He bore suffering with heoric fortitude and met his death in a spirit of complete resignation."

(*Brahmavadin*, May 16, 1898)

১৪ লক্ষণীয় বিষয় স্বামীজীর পত্রাবলীতে রাজম আয়ারের উল্লেখ নেই (!) রাজম সম্ভবতঃ স্বামীজীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কিন্তু ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেননি। কিংবা স্বামীজী রাজমকে তাঁর বেদান্তের উপযুক্ত প্রচারক মনে করেননি। হতে পারে, স্বামীজী রাজমের উল্লেখ যে-সব চিঠিতে করেছেন, সেগুলি বিলুপ্ত। যেকোনো ক্ষেত্রেই এ কথা সত্য, পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হবার ব্যক্তি রাজম ছিলেন না স্বামীজীর কাছে।

The management under Prabuddha Bharata will henceforth appear with pretence to no higher ideal than was set up for its conduct in the first issue of the journal (July, 1896). If will strive to maintain the paper on the same lines as have been so admirably followed for the last two years, with only such additions and alterations as growing needs require.

While writing on this subject, it may not be out of place to mention that the present conductors have at their head the Swami Vivekananda, and that the pages of the magazine will be enriched by regular contributions from his pen."

(*Editorial Section*, P. B. Aug. 1898)

এর পরেই প্রবুদ্ধ ভারতের পুরাতন নীতির ও বক্তব্যের সঙ্গে বর্তমান নীতি ও বক্তব্যের পার্থক্যের কথা মার্জিত অথচ দৃঢ় ভাষায় জানানো হল। এর মধ্যে পাঠকগণ প্রবুদ্ধ ভারতের পূর্বতন প্রচ্ছদ চিত্রের বক্তব্যের বিরুদ্ধে আপত্তি লক্ষ্য করবেন :

"A word of explanation is necessary, with regard to the alteration of the title page.

Ages ago, Indian thought, travelling by many ways, reached the West, but it is only about two generations since the foremost thinker of the Occidental world, at that time, declared that the one advantage which his age possessed over all others, was in gaining access to the ideals of Ancient India. Indeed, before the time of Schopenhauer, Indian thought lay shrouded in the darkness of Western ignorance, or at best was regarded with stolid indifference as mere heathen fetishism. But ever since the rays of the mighty German genius first fell upon the Upanishads, that attitude has been slowly undergoing a change, until, as he prophesied, 'the white man and his fair lady stray into Indian woods, and there come across the Hindu sage under the banyan tree. The hoary tree, the cool shade, the refreshing stream, and above all, the hoarier, cooler and the more refreshing philosophy that falls from his lips enchant them. The discovery is published ; pilgrims multiply. A sanyasin from our midst carries the altar-fire across the seas. The spirit of the Upanishads makes a progress in distant lands. The procession develops into a festival. Its noise reaches Indian shores, and behold, our Motherland is awakening."

(*Editorial Section*, P. B., Aug. 1898)

দেখা গেল, প্রবুদ্ধ ভারত যে নীতিতে এই দুই বৎসর পরিচালিত হচ্ছিল, তাকে বর্তমান পরিচালকগণ, (আসলে স্বামী বিবেকানন্দ) 'anachronism'-এর চিহ্ন বলে মনে করেছেন। পরিবর্তিত কালের সঙ্গে পা মিলিয়ে প্রবুদ্ধ ভারত চলছিল না বলে স্বামীজীর ধারণা হয়েছিল।[১৫] প্রাচীন ভারতের মধ্যে নিমজ্জিত থাকা নয়, (প্রবুদ্ধ ভারত যা থাকতে চাইছিল রাজম আয়ারের নেতৃত্বে),—প্রাচীনের ভিতর থেকে নূতনের অভ্যুত্থানই স্বামীজীর অভিপ্রেত ছিল। তদনুযায়ী প্রবুদ্ধ ভারতের পূর্বতন মটো—'He who knows the Supreme attains the highest.' (Tait. Upa.)-এর স্থানে এল উপনিষদের আর এক বাণী ও তার বিবেকানন্দ-কৃত অনুবাদ : 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত

প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'; Arise, awake and stop not till the goal is reached.' (Katha. Upa.).

এই পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করা হল এইভাবে—

"We have also deemed it necessary to replace the old motto by another, which appeared to us more fitting to the aim and nature of the work, Prabuddha Bharata has before it. The English rendering which we publish of it, as the reader will observe, is not literal. It is a free running translation of the sense, couched in the vigorous words of the Swami Vivekananda—for as many readers will probably recollect, it is taken from one of his lectures."

(*Editorial Section*, P. B., Aug. 1898).

অসাধারণ জনপ্রিয়, চাঞ্চল্য-সৃষ্টিকারী পত্রিকা প্রবুদ্ধ ভারত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিশ্চয় ভারতপ্রেমিক ও বেদান্তপ্রেমিকেরা বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। সুতরাং অচিরকালে যখন প্রবুদ্ধ ভারতের পুনঃপ্রকাশের সংবাদ ঘোষণা করা হল, তখন অনেক পত্রিকাতে আনন্দ প্রকাশ করা হয়। পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়া স্বামীজীর কাছে নিশ্চয় বেদনাদায়ক ঠেকেছিল। নিশ্চয় শত্রু মিত্র সকলের কাছেই এটা বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত বেদান্ত-আন্দোলনের সংগঠনের পক্ষে অন্যতম পরাজয়ের স্মারক! আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে এই জাতীয় পরাজয়-স্বীকৃতি মারাত্মক। সুতরাং পত্রিকার পুনঃ-প্রকাশ নিতান্তই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল—আন্দোলনের মর্যাদা ও শক্তি প্রমাণের জন্যও অন্তত:।

তাছাড়া আরও একটি প্রয়োজন: ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন গঠিত হয়ে গেছে—তার মুখপত্র অবশ্যই চাই। ব্রহ্মবাদিন ও প্রবুদ্ধ ভারত বিবেকানন্দের সমর্থক, কিন্তু বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠানের পত্রিকা নয়, তার মালিকানা অন্যের হাতে (স্বামীজী মালিকানা ব্যক্তিগত ভাবে নিতে রাজী হননি)। পত্রিকা দুটি নীতির ব্যাপারে বিবেকানন্দ-মতাবলম্বী থাকতে পারে, ছিলও, কিন্তু তাকে যে তা থাকতেই হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। স্বামীজী যে-পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান গঠন করেননি সে-অবধি ভক্ত সমর্থকদের দ্বারা পরিচালিত পত্রিকা দিয়ে কাজ চলে যেত, কিন্তু প্রতিষ্ঠান-গঠনের পরে প্রতিষ্ঠানের বিশেষ বক্তব্য-প্রকাশক পত্রিকার প্রয়োজন হয়ে পড়ল এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত' বন্ধ হয়ে যেতে এই সুপরিচিত পত্রিকাটিকে রামকৃষ্ণ মিশনের বাহন করে তোলার সুবিধা এল। আমার আরো বিশ্বাস, যদি প্রবুদ্ধ ভারত বন্ধ নাও হত, তাহলেও হয়তো রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে নিজস্ব পত্রিকা বের করা হত। (ক্রমশঃ)

১৫ প্রবুদ্ধ ভারতের নীতি সম্বন্ধে স্বামীজীর অনমু-মোদনের ইঙ্গিত কয়েকটি পত্র থেকে আবিষ্কারের চেষ্টা করা যায়। তবে এই ইঙ্গিত-আবিষ্কার সম্পূর্ণ অনুমানমূলক। স্বামীজী ১৮৯৭-র ৯ জুলাই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখেন—"মেটিরিয়েল জোগাড় করছ না কেন, আমি নিজেই এসে কাগজ স্টার্ট করব।" এই কাগজ কি উদ্বোধন? মনে হয় না। পরের দিন মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—"মাদ্রাজে শীঘ্রই একখানি পত্রিকা আরম্ভ করা হবে, গুডউইন তারই কাজে সেখানে গেছে।" এই পরিকল্পিত পত্রিকাই বা কোন্ পত্রিকা? নিশ্চয়ই দেশীয় কোনো পত্রিকা নয়—যেহেতু ইংরাজ গুডউইন গেছেন সেই কাজে! মাদ্রাজে তখন ব্রহ্মবাদিন ও প্রবুদ্ধ ভারত চালু আছে, একথা স্মরণ রাখতে হবে। স্বামীজী কেন তৃতীয় পত্রিকার কথা ভাবলেন? আমরা মীমাংসা করতে অসমর্থ।

শিবাজী-গুরু রামদাস

শ্রীগৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

"ওহে ত্রিভুবনপতি, বুঝি না তোমার মতি
কিছুই অভাব তব নাহি,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রভু ভিক্ষা মাগি ফির তবু
সবার সর্বস্বধন চাহি।"

সাতারা নগরীর মাঝে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে চলেছেন এক সন্ন্যাসী আর তাঁর পিছনে পিছনে চলেছেন আর একজন, ভিক্ষুক বা সন্ন্যাসী নন, তিনি মারাঠা রাষ্ট্রের কর্ণধার শিবাজী। কাঁধে তাঁর ভিক্ষার ঝুলি। এ কি আশ্চর্য কাণ্ড! যাঁর কোন দুঃখ দৈন্য নেই, তাঁর এ সাধের ভিক্ষাবৃত্তি কেন? সারা নগরীর গবাক্ষদুয়ার খোলা, তার মধ্যে দিয়ে উঁকি মারছে পুরবাসীদের কৌতূহলী চোখ। মনে হয় সম্রাটের বিচিত্র খেয়াল!

শিবাজীর কথা তো আগেই বলা হয়েছে আর ঐ গেরুয়াবসন-পরা সন্ন্যাসী হলেন শিবাজীর গুরু বিখ্যাত রামাইৎ সাধু রামদাস স্বামী। শিবাজীর পথ রাজধর্মপালনের পথ, হিংসার পথ আর তাঁর গুরু রামদাসের পথ অধ্যাত্মধর্মপালনের পথ, অহিংসার পথ। তবু তাঁদের মিলনে ভারতে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে, এক নব যুগের সূচনা হয়েছিল, ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে। রামদাসের সঙ্গে শিবাজীর যখন মিলন হয়েছে তখন উভয়েই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। রামদাসকে তাঁর সাধক-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য করতে হয়েছে দুরূহ সাধনা। আর ঔরঙ্গজীবের 'পার্বত্য মূষিক' মারাঠী সর্দার শিবাজীকে বিরাট মুঘল শক্তির সঙ্গে প্রতিপদে লড়াই করতে হয়েছে, তবেই স্থাপিত হয়েছে তাঁর স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্রের ভিত্তি। শিবাজী যে আদর্শ হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছেন, তার সবখানির আদর্শ তিনি পেয়েছেন তাঁর গুরু রামদাস স্বামীর কাছ থেকে। কিন্তু তাঁর গুরু রামদাস এই আদর্শ পেলেন কোথা থেকে?

রাজা-রাজড়ার ঘরে জন্ম হয়নি রামদাসের। আজন্ম সাধক তিনি। মহারাষ্ট্রের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণবংশে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবা সূর্যপন্থজী ও মা রানুবাঈ প্রভু রামচন্দ্রজীর উপাসক। রামচন্দ্রজীর কাছে প্রার্থনা করে তাঁরা লাভ করেছিলেন রামদাসকে। নারায়ণ তাঁর বাপ-মায়ের দেওয়া নাম। অল্প বয়সে নারায়ণের পিতৃবিয়োগ হয়। সচ্ছল সংসারে মায়ের অভিভাবকত্বে বড় হয়ে ওঠেন নারায়ণ। ছেলেটি শান্ত শিষ্ট, কিন্তু একটু বাউণ্ডুলে স্বভাবের, কখন কোথায় থাকে মা ঠিক হদিস করতে পারেন না। তাঁর স্বভাব-সংশোধনের জন্য তাঁকে পাঠশালে ভরতি করে দেওয়া হল। কিন্তু অর্থকরী বিদ্যার্জনের প্রতি কোন আসক্তি প্রকাশ পেল না নারায়ণের, অতএব অতি দ্রুত বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শেষ হল। এর পর নারায়ণের কাজ হল মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়ানো বিশেষ করে রামচন্দ্রজীর মন্দিরে, মহাবীর বা হনুমানজীর মূর্তির সামনে গেলে তিনি বিহ্বল হয়ে যান। আর কষ্ট হয় মহারাষ্ট্রের গ্রামজীবনে সাধারণ মানুষের কাহিনী শুনে। একে তো তাদের জীবনে রয়েছে বিধাতা-নির্দিষ্ট দুঃখ কষ্ট রোগ শোক ইত্যাদি, তার উপর দিল্লীর মুঘল শাসকের অত্যাচারে তাদের জীবন বিষময়, না আছে স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অধিকার, না আছে

উৎপন্ন শস্যসম্পদ-ভোগের অধিকার। কি করে এদের জীবন থেকে এই অত্যাচার দূর করা যায় সেটাও নারায়ণ স্বামী ভাবতে থাকেন।

একদিন তিনি মায়ের কাছে প্রস্তাব করে বসলেন যে, তিনি সন্ন্যাসী হবেন। কারণ সংসার-জীবনের সুখও নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর মা রানুবাঈ কিন্তু তাঁর সন্ন্যাস নেবার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, ভয়ঙ্কর রকমের কান্নাকাটি জুড়ে দিলেন। মায়ের চোখে জল দেখে নারায়ণেরও মহা অস্বস্তি। মা কেঁদে বললেন, 'আমি ভাবলাম কোথায় তুই বিয়ে করে সংসারী হবি, আমার সেবা যত্ন করবি, তা নয় তুই সন্ন্যাসী হয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবি।' মাকে শান্ত করার জন্য নারায়ণ হঠাৎ বলে বসল, 'আচ্ছা মা, তুমি মেয়ের খোঁজ করো, আমি সংসারী হব।'

কিন্তু বিয়ে করা নারায়ণের হয়ে ওঠেনি; মায়ের চোখে জল দেখে বিয়েতে তো তিনি মত দিলেন, কিন্তু ভিতরে তাঁর মহা অশান্তি, তাঁর কর্তব্য কর্ম থেকে তিনি বিচ্যুত হয়ে পড়ছেন—দেশে দারুণ ম্লেচ্ছাচারের বন্যা, মুঘল অত্যাচার হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে: কে এর প্রতিকার করবে? কেন, তিনি তো রয়েছেন! হনুমানজী রামচন্দ্রের জন্য সমুদ্র পার হয়েছিলেন আর তিনি কি পারেন না মুঘল শক্তির আক্রমণ প্রতিহত করে ধর্মকে সজীব রাখতে? কিন্তু মায়ের চোখের জল? অবশেষে তিনি সংসার-ত্যাগের সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন; এখন সুযোগের অপেক্ষা, কারণ মায়ের অনুমতি নিয়ে যে যাওয়া যাবে না একথা নারায়ণ ভাল করেই বুঝেছিলেন।

সুযোগ যারা চায়, বিধাতা তাদের সুযোগ মিলিয়ে দেন। নারায়ণের বিবাহবাসর, বর এসেছে শোভাযাত্রা করে; বরকে বরাসনে বসিয়ে কন্যাকর্তা বরযাত্রীর আদর-আপ্যায়নে ব্যস্ত। নারায়ণ দেখলেন, এই মহা সুযোগ; অতএব তিনিও 'জয় রঘুবীর' বলে অন্তর্ধান করলেন। রাত্রের অন্ধকারে কাঁটাবন ঝোপ বনবাদাড় ভেঙ্গে চললেন সোজা গোদাবরী নদীর তীরে; সেখানকার মাটিতে রয়েছে প্রভু রামচন্দ্রজীর পায়ের স্পর্শ। সেখানকার মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে দিতে অনেকক্ষণ কাঁদলেন, তারপর ভোরবেলা স্নান করে উঠে জপধ্যানে মগ্ন হলেন। কিন্তু তিনি তো মন্ত্রতন্ত্র বিশেষ কিছু জানেন না, কিভাবে তিনি রামচন্দ্রজীর দেখা পাবেন এই হল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। যাই হোক ব্যাকুলতা আর চোখের জল সম্বল করে তিনি রামচন্দ্রজীর নামজপে আত্মনিয়োগ করেন। এত তন্ময় হয়ে তিনি জপ করেন যে, তাঁর দেহবোধ ভুল হয়ে যায়। সেই সময় তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন তাঁর গুরু। গুরু তাঁকে বিধিমত মন্ত্র দান করে সেই সঙ্গে সাধন-পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। আর সেই সঙ্গে তাঁর নতুন নামকরণ হল রামদাস। যাবার আগে গুরুজী বললেন, 'রামদাস, তোমার ব্যাকুলতা রয়েছে আর রয়েছে ঈশ্বরে নিষ্ঠা। প্রভুজী তোমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ধর্মরাজ্য-স্থাপনে সাহায্য করতে, কিন্তু সব আগে তোমাকে অধিকার অর্জন করতে হবে, বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রচার করতে হবে, তার জন্য চাই তোমায় সর্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা। আর কালে তোমার ইষ্টদর্শন হবে।' রামদাস আশ্চর্য হয়ে গেলেন তাঁর মনের কোণে যা রয়েছে সংকল্পের আকারে, গুরুজীর আশ্বাসে তার ঘোষণা দেখে। সংশয়াকুল

রামদাস জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি সন্ন্যাসী, সামান্য শক্তির অধিকারী। কেমন করে সম্ভব হবে ম্লেচ্ছাচারের বন্যা নিবারণ করা?' গুরুজী বললেন, 'বৎস, তাঁর কৃপাতে সবই সম্ভব, আগে তুমি শক্তি অর্জন করো, তারপর দেখবে দেশের রাজা পর্যন্ত তোমার পথ ও মত মেনে নেবে।'

এরপর আরম্ভ হল রামদাস স্বামীর নিরলস শাস্ত্রসাধনা। তারপর পর্যটন শুরু করলেন ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। এই দীর্ঘ তপস্যার সময়ে গুরুকৃপায় তাঁর ইষ্টদর্শন হয়। এরপর শুরু হল রামদাস স্বামীর আচার্য-জীবন। রামদাস স্বামী ফিরে এলেন নিজের দেশ মহারাষ্ট্রে। তখন মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক জীবনে মহাশক্তিধর শিবাজীর অভ্যুদয় ঘটেছে। 'পার্বত্য মূষিকের' জ্বালায় পরাক্রান্ত মুঘল শক্তি দাক্ষিণাত্যে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। ঔরঙ্গজীব বৃদ্ধ হয়েছেন, তিনি বুঝতে পারছেন শিবাজীকে রুখবার সামর্থ্য তাঁর নেই, শিবাজীর মনে তখন রঙীন স্বপ্ন—স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, সেখানে ন্যায় ও সত্যের শাসন থাকবে নিরঙ্কুশ। অথচ এই আদর্শের পথে পরিচালনার জন্য চাই যোগ্য ব্যক্তির মন্ত্রণা, নির্দেশ। কে দেবে তাঁকে এবিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ তিনি শুনলেন পন্ধারপুরের সাধু তুকারামের কথা। ছুটলেন তাঁর কাছে, সাধু তুকারাম বিঠ্ঠলজীর (শ্রীকৃষ্ণের) ভক্ত, পরম বৈষ্ণব, তিনি শিবাজীর অধ্যাত্মপিপাসা চরিতার্থ করতে পারেন, কিন্তু ক্ষাত্রধর্মের উৎসাহ তাঁর কাছ থেকে শিবাজী পেলেন না।

এমন সময় শিবাজীর কানে গেল রামদাস স্বামীর নাম। সাতারার কয়েক মাইল দূরে ছাফলে রামদাস তাঁর আশ্রম স্থাপন করেছেন। সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর ইষ্টবিগ্রহ শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি। তাঁর আশপাশে এসে জড়ো হয়েছেন ধর্মকামী সাধারণ মানুষের দল। তাঁদের নিয়ে রামদাস তৈরি করেছেন রামাইৎ সাধু। এই সম্প্রদায় একদিকে যেমন বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করে, সেই সঙ্গে প্রচার করে ক্ষাত্রধর্ম। ম্লেচ্ছাচার ও যবনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করবার মহতী বাণী প্রচার করেন এই সব রামাইৎ সাধু। শিবাজী দেখলেন এই তাঁর সেই গুরু যাঁর জন্যে তাঁর প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তিনি গিয়ে হাজির হলেন ছাফলের আশ্রমে। রামদাস স্বামী গভীর জঙ্গলে অধ্যাত্ম-সাধনায় মগ্ন, আসলে গুরুও চাইছেন শিবাজীকে পরীক্ষা করতে। শিবাজী বার বার আশ্রমে আসেন আর বার বার ফিরে যান। শিবাজীর রাজকোষের অর্থে ছাফলের মঠ সুন্দরভাবে তৈরী হল। রামদাস স্বামী সেদিন মঠে আছেন। শিবাজী তাঁর অভ্যাসবশতঃ মঠে বেড়াতে এসেছেন, গুরু-শিষ্যের হঠাৎ মিলন হয়ে গেল। রামদাসের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন শিবাজী, রামদাস স্বামীও তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর রামদাস আর শিবাজী এক হয়ে গেলেন, নতুন রাজধর্মের পাঠ নিলেন শিবাজী রামদাসের কাছ থেকে। সারা মারাঠা রাজ্যের উন্নতিতে রামদাস স্বামীর দান অসামান্য, কারণ শিবাজীর শক্তি আর রামদাসের পরিচালনার গুণে মারাঠা রাজ্যে হিন্দুধর্ম ও নীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

দাক্ষিণাত্যে মুঘল শক্তি হতমান, শিবাজীর রাজ্য দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করছে। রামদাস স্বামী দেখলেন তাঁর কাজ শেষ হয়েছে, এবার ফেরার সময় হয়েছে প্রভু রামচন্দ্রজীর কাছে। শিষ্য-সেবক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে, রামদাস ক্রমশঃ অন্তর্মুখ হয়ে যাচ্ছেন, একদিন তিনি তাঁদের

কাছে বললেন তাঁর আসন্ন বিচ্ছেদের কথা। তাঁদের বিষণ্ণ দেখে স্নিগ্ধমধুর কণ্ঠে রামদাস বললেন, 'তোমরা অকারণে শোক করছ কেন? আমি তোমাদের গুরু হলেও অমর নই, ঈশ্বরের বিধান মেনে চলতে আমি বাধ্য। আমি আশা করব তোমরাও সহজভাবে তাঁর বিধান মেনে নেবে।' এরপর রামদাস অধিকাংশ সময় সমাধিতে ডুবে থাকতেন। শিষ্য-সেবকরা বুঝতে পারছিলেন, তাঁর শেষ সময় এগিয়ে আসছে। এর মধ্যেই একদিন প্রকাশ পায় এই মহাপুরুষের করুণাঘন রূপ। রামদাস সকালে তাঁর আশ্রমে বসে আছেন শান্ত সমাহিত, হঠাৎ বাইরে শুনতে পাওয়া গেল করুণ ক্রন্দনের সুর—একমাত্র পুত্রের শোকে পাগলিনী জননী তাঁর মৃত সন্তান কোলে করে আশ্রমে এসে হাজির। পাগলিনীর কান্নায় রামদাস স্থির থাকতে পারেননি; তিনি বললেন, 'দেখ মায়ী, রামচন্দ্রের কৃপায় তোমার ছেলে চোখ মেলে চাইছে।' মহাপুরুষের বাক্য সফল করে শিশু জেগে উঠল ঘুম থেকে।

গুরু রামদাস দেহ রাখবেন। শীঘ্রই কানে কানে এ খবর শিবাজীর কাছে পৌঁছে গেল। শিবাজী এলেন গুরুসন্নিধানে, জিজ্ঞেস করলেন গুরুর অবর্তমানে তিনি কোথায় পাবেন শক্তির উৎস। গুরুর উক্তি 'তোমার আত্মায়, তোমার অস্তিত্বের অনুভবে আমি প্রকাশ থাকব। সেই তো তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক। তারপর শেষ দিনে গিয়ে মিলবে তুমি আমার সঙ্গে রামচন্দ্রজীর পদতলে।'

ভারতের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন শিবাজী—মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থানের নায়ক, আর অমর হয়ে আছেন শিবাজী-গুরু রামদাস।

"মানুষ হও…সদুদ্দেশ্য, সৎসাহস, সদ্বীর্য অবলম্বন কর। যদি জন্মেছ তো একটা দাগ রেখে যাও।"

"জগতের সমুদয় ধনরাশির চেয়ে মানুষ হচ্ছে বেশী মূল্যবান।"

"মানুষ চাই, আর সব হইয়া যাইবে।"

"একটা মানুষ যদি তৈরী হয় তো লাখ বক্তৃতার কাজ হবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

সমালোচনা

ভারততীর্থে নিবেদিতা: (ভগিনী নিবেদিতার রচনাবলীর সংকলন; ভগিনী নিবেদিতা শতবর্ষ জয়ন্তী প্রকাশন): সিষ্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ৫ নিবেদিতা লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩৮৬; মূল্য ৬৲ টাকা।

আমাদের জীবনভূমিতে যখন খরার প্রকোপ দেখা দেয়, তখন ঈশ্বর তাকে তাঁর করুণাধারায় সিঞ্চিত করে দেন। সেখানে আমাদের কোনও কৃতিত্ব অনুমান করতে যাওয়া নিরর্থক। নিবেদিতাকে, ঠিক এমনই, ঈশ্বরের দান হিসাবেই আমার মনে হয়। তাঁকে আমরা অর্জন করিনি, সে-যোগ্যতাও আমাদের ছিল না।

তবু তিনি একদিন সাত সাগর পাড়ি দিয়ে এই দেশে এসেছেন, এই প্রাচ্য ভূমিকে স্বদেশ-রূপে বরণ করে নিয়েছেন, তারপর গুরু বিবেকানন্দের আদর্শকে সামনে রেখে জাগিয়ে তুলেছেন সুপ্তিমগ্ন ভারতবর্ষকে। এই দেশকে যিনি তাঁর সব দিয়েছিলেন, সার্থকনামা সেই নিবেদিতাকেও আমরা স্বচ্ছন্দে ভুলতে বসেছিলাম—জাতি-হিসাবে আমরা এমনই আত্মতুষ্ট অথবা অকৃতজ্ঞ! স্বস্তির কথা, তাঁর মৃত্যুর প্রায় পাঁচ-দশক পরে এই অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ-কথিত "লোকমাতা" নিবেদিতকে জানবার আগ্রহ পাঠক-সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমে দেখা দেয়। সেই জিজ্ঞাসা মেটানোর আয়োজনও চলে তারই সঙ্গে সমতা রেখে। নিবেদিতা সম্পর্কে বাঙালী পাঠকের হাতে এখন বেশ কিছু বই। তাঁর তপশ্চর্যা-স্বরূপ কর্মকাণ্ডের কাহিনী নিবেদিতার বিভিন্ন জীবন-চরিতমূলক রচনায় বিধৃত। কয়েকটি গ্রন্থে (যেমন প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার "ভগিনী নিবেদিতা," শঙ্করীপ্রসাদ বসুর "নিবেদিতা লোকমাতা") ওই মহাজীবনের ভাষ্যও পাই। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়ের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় নিবেদিতারই রচনা-পাঠ। তাঁর সমগ্র রচনাবলীর সঙ্গে (কম্প্লিট ওয়ারকস অব নিবেদিতা: চার খণ্ড ইংরেজীতে ইতোমধ্যেই প্রকাশিত; পঞ্চম খণ্ডটি প্রকাশের অপেক্ষায়) ইংরেজী ভাষা যাঁদের অনায়ত্ত, বাঙালী পাঠক-সমাজের সেই বৃহৎ অংশের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ বহুদিন প্রায় ছিল না বললেই চলে। আলোচ্য গ্রন্থটি সেই অভাব কিছুটা দূর করল। প্রকাশিকা শ্রদ্ধাপ্রাণার এই প্রয়াস তাই বিশেষ-ভাবে অভিনন্দনের যোগ্য। "দি মাষ্টার অ্যাজ আই স হিম্"-সহ তাঁর এগারখানি বইয়ের নির্বাচিত পরিচ্ছেদ ছাড়া নিবেদিতার কয়েকটি প্রবন্ধ ও চিঠির অনুবাদ এতে সঙ্কলিত।

নিবেদিতা ভারতবর্ষকে কতখানি ভালবেসে-ছিলেন, এই দেশের মানুষকে কতখানি আপনার করে নিয়েছিলেন, তার অজস্র প্রমাণ ছড়িয়ে আছে প্রায় ৪০০পৃষ্ঠার সংকলন-গ্রন্থটির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়, ছত্রে ছত্রে। ভারতীয় রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, সমাজ-ব্যবস্থা, জীবনযাত্রা—সব কিছুর বর্ণনাতেই পাই একটি আন্তরিক আবেগের স্পর্শ। সেই আবেগ-উচ্ছ্বাস অবশ্যই যুক্তি আর বুদ্ধির হাত ধরে চলেছে। কিন্তু এখানে বড় কথা তাঁর প্রতীতি। মনে রাখা

দরকার, এদেশের সবটুকুই তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। এই আন্তরিক ইচ্ছাই হয়তো তাঁর প্রতীতির উৎস। যুক্তি এসেছে তার পরে—যার সহযোগে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন, বিশ্বাসের বস্তুকে বুদ্ধিগ্রাহ্য স্তরে করেছেন প্রতিষ্ঠিত।

ভারতীয় জীবনধারার মধ্যে তিনি পেয়েছেন শুচিতা, নিষ্ঠা আর লালিত্যের পরিচয়। এমন কি বিবিধ সংস্কার আর প্রচলিত আচারও তাঁর চোখে সুন্দররূপে প্রতিভাত। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভক্তি আর নির্বিচার আনুগত্যের ঐতিহ্যে তিনি মুগ্ধ।

ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য দেশের চেয়ে কোনও দিক দিয়েই ছোট নয়, বরং প্রতীচ্য প্রাচ্য দেশের কাছ থেকে নানা বিষয়ে পাঠ নিতে পারে—এই কথাটাই তাঁর বিভিন্ন রচনার অন্যতম উপজীব্য। শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে নিবেদিতা কলকাতার সাধারণ বাড়িতেও স্থাপত্যকলার সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছেন। বাড়ির ছাদের একটি বর্ণনা এখানে অংশতঃ তুলে দিচ্ছি: "আমার বাড়ির স্থাপত্যকলার অপর সৌন্দর্য হল বাড়ির ছাদটি।...চারিদিকে বহু দূর পর্যন্ত একই ধরনের ছাদের পর ছাদ ছড়িয়ে আছে; মধ্যে মধ্যে গাছপালা ও বাগানের সবুজ শোভা...। এখানে প্রভাতে সূর্যাস্তকালে কিংবা নিশীথে চাঁদের আলোয় সমগ্র বিশ্বের কাছে নিজেকে একা বলে অনুভব করা যায়।...অন্দরমহলে অধিকাংশ সময়ে আবদ্ধ থাকে যেসব হিন্দু ললনা, তাদের কাছে এ-রকম একটি ছাদ থাকা যে কতখানি! এখানেই তাদের জীবনদর্শন, বিমূর্ত জীবনের সঙ্গে পরিচয়—নৈর্ব্যক্তিক স্তরে তার সাক্ষাৎ-লাভ।" এই বর্ণনায় একই সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক এবং কবিসুলভ মানসিকতা পরিস্ফুট। সাধারণ ভিক্ষুকের উল্লেখেও তিনি সশ্রদ্ধ: "অধিকাংশের পরনে শুভ্র বস্ত্র, গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা—এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে ভিক্ষাপাত্র...। ...আমার আকর্ষণের পাত্র হল নিঃসঙ্গ এক ভিক্ষুক।...সে নগ্নপদ, বুদ্ধের ন্যায় পীতবসন-পরিহিত, ঈশ্বরের পবিত্র নাম নিয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করে।" (হায়, নিবেদিতার চোখ যদি আমাদের থাকত!)

এদেশে শিক্ষার প্রসার, সামাজিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রগতির প্রয়োজনীয়তার কথা অবশ্যই তিনি বলেছেন, কিন্তু প্রাচীন ভাবধারার উপরই নূতনের বিকাশ তাঁর কাম্য। তিনি ভারতের পরাধীনতার বন্ধন-মোচনের স্বপ্ন দেখেছেন। সেই স্বপ্নকে সত্য করতে হলে স্বাধীনতা-সংগ্রামে মেয়েদেরও যে সক্রিয় ভূমিকা আবশ্যক তা তিনি বিশ্বাস করতেন। দৃঢ়কণ্ঠে আহ্বান জানাতেও তাই তিনি দ্বিধা করেননি: "আজ তাঁর (ভারত-জননীর) মন্দির তমসাচ্ছন্ন। যেদিন ভারত-রমণীগণ জাতীয়তার মহারতি করতে সক্ষম হবেন, সেদিন আবার এই দেবালয় আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।"

এই সঙ্কলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংশ "দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম্" গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত কয়েকটি পরিচ্ছেদ। "গোপালের মা," "মা-কালীর কাহিনী," "বুদ্ধ-যশোধরা" প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং "পত্রাবলী"ও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীশ্রীমা এবং গোপালের মা প্রসঙ্গে তাঁর লেখায় পরম শ্রদ্ধা আর ভক্তির ভাব ফুটে উঠেছে।

শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে তাঁর একটি উক্তি ভোলবার নয়। সেটি হল: "আমার বরাবর মনে হইয়াছে যে, ভারতীয় নারীকুলের আদর্শ

সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা তিনিই (শ্রীশ্রীমা)। কিন্তু তিনি কি এক প্রাচীন আদর্শের শেষ উদাহরণস্থল অথবা এক নূতন আদর্শের প্রথম উদাহরণস্থল?" গোপালের মা-কে তিনি বলেছেন "শ্রেষ্ঠ সাধিকা"; তাঁর সঙ্গে শিশুখৃষ্ট-জননীর তুলনা করেছেন।

বিবেকানন্দের কর্মকাণ্ডের মূল আদর্শ কী?—তাঁরই বাণী: "যাহা কিছু কর, মানুষের জন্য কর। মুক্তি নহে, ত্যাগ; আত্মানুভূতি নহে, আত্মত্যাগ।" গুরুর এই মন্ত্র সম্পূর্ণতঃ নিবেদিতারও। নিবেদিতা এক জায়গায় বলছেন: "(বিবেকানন্দের) একজন শিষ্যা যেন কদাপি মঠে একদিনের পুণ্য অনুষ্ঠানের কথা বিস্মৃত না হন—যেদিন তাঁহার জীবনের প্রথম উন্মেষ-স্বরূপেই স্বামীজী তাহাকে শিবপূজা করিতে শিখান, তারপর ভগবান বুদ্ধের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করাইয়া শুভকর্ম সমাধা করেন। ...একজনকে উপলক্ষ করিয়া সকলকে উপদেশ দেন, 'যাও যিনি বুদ্ধত্বলাভের আগে পাঁচশত বার অপরের জন্য জন্মগ্রহণ ও প্রাণ বিসর্জন করেন, সেই বুদ্ধকে অনুসরণ কর।'" সেই একজন শিষ্যা অবশ্যই নিবেদিতা। এবং তিনি ওই উপদেশ শেষদিন পর্যন্তই মনে রেখেছেন, পালন করেছেন অক্ষরে অক্ষরে—জীবন দিয়ে।

আজও এই কথা যখন ভাবি, আমাদের চোখ কি তখন জলে ভরে আসে না?

—জ্যোতির্ময় বসু রায়

Souvenir, 1968—Ramakrishna Misson Seva Pratisthan (A General Hospital), 99 Sarat Bose Road, Calcutta 26. P. 44. Price: One Rupee only.

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের এবারকার স্মরণিকায় প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ: Swami Vivekananda: A Great Synthesizer, Surgical instruments as described in the Sushruta-samhita, বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, ভারতীয় নারীত্বের আদর্শে ত্যাগ ও সেবা, রোগপরিচর্যায় ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী।

এতদ্ব্যতীত 'Thritysix years of the Seva Pratisthan' প্রবন্ধটিতে প্রাথমিক অবস্থা হইতে প্রতিষ্ঠানের পরিবিস্তারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচিত। 'Our School of Nursing: Co-curricular activities'—সচিত্র এই লেখাটিতে এবং 'ওঁরা সেবার শপথ নিলেন' এই সুখপাঠ্য রচনাটিতে পরিষেবিকাগণের শিক্ষাধারা ও তাহার ভিত্তিমূলে ত্যাগের উচ্চাদর্শের কথা বর্ণিত। অন্যান্য লেখাগুলিও উচ্চকোটির।

যুগশঙ্খ (১৯৬৮)—বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির পত্রিকা, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মালদহ। পৃষ্ঠা ৭৫।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও মালদহ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক পত্রিকা 'যুগশঙ্খ' সুমুদ্রিত রচনাসম্ভারে অলঙ্কৃত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ছাত্রদের কয়েকটি কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্পে মৌলিকতা আছে; লেখাগুলি পাঠ করিলে 'শিশু-সাহিত্যিক'দের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথাও মনে হইবে। 'বিদ্যামন্দির-সংবাদ-পরিক্রমা'য় বহুমুখী বিদ্যালয়ের সারা বৎসরের কর্মধারা বিজ্ঞাপিত।

প্রাপ্তি-স্বীকার

(১) **পথের দিশারী:** শ্রীঅমিয়া দেবী। প্রকাশক: শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার, নগেন্দ্র প্রজ্ঞামন্দির, সি ২৭, বাঘা যতীন পল্লী, কলিকাতা ৩২। পৃষ্ঠা ১৩৬, মূল্য দুই টাকা।

(২) **অঠরাশ্লোকী গীতা (মরাঠী)**—পুরুষোত্তম পাণ্ডুরঙ্গ গোখলে, কন্হাড় (সাতারা)। প্রকাশক: সৌ সুলোচনা গোখলে, ৪৩৬ সোমবার পেঠ, কন্হাড়। পকেট সাইজ, পৃষ্ঠা ৩৮।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবা: গত এপ্রিল, ১৯৬৯, রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বন্যার্তসেবাকার্যে বিতরিত দ্রব্যসমূহ:

স্কুল টেক্স্ট বুক ১৩০টি, ছাত্রদের নোটবুক ১,৩৫৬ খানি এবং বিস্কুট ৪৮ টিন।

বরনেশ বাজারে সেবাকার্যের জন্য নূতন ক্যাম্প খোলা হইয়াছে; একটি 'স্কুল-কাম-কম্যুনিটি হল' এবং ৫০টি কুটির নির্মাণের কাজ শুরু করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই অঞ্চলে কয়েকটি কূপ-খননের কার্য ইতঃপূর্বেই আরম্ভ হইয়াছে।

মণ্ডলঘাট অঞ্চলে যে ২০টি কূপ খননের কার্য চলিতেছিল, তাহা প্রায় সমাপ্তির পথে। পাহাড়পুর ক্যাম্প সেবাকেন্দ্রে কুটির নির্মাণের কাজ সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে।

গুজরাট বন্যার্তসেবা: রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বন্যায় বিপর্যস্ত ব্যক্তিদের জন্য গত মে মাসে ৩০০টি চার-কুঠুরির 'প্রি-ফেব্রিকেটেড সিমেণ্ট কংক্রিটে'র গৃহ নির্মিত হইয়াছে। অনুরূপ ১,০০০টি গৃহের নির্মাণকার্য প্রায় সমাপ্ত হইতে চলিয়াছে, এই গৃহগুলিতে সুরাট জেলায় ৪,০০০ দুঃস্থ পরিবারের স্থান-সঙ্কুলান হইবে।

কার্যবিবরণী

লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্র

লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের বিংশতিতম বর্ষের কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ৫৪নং হল্যাণ্ড পার্ক, লণ্ডন ডব্লিউ ১১-তে অবস্থিত শাখাকেন্দ্রে এবং ৬৮নং ডিউকস অ্যাভেনিউ, মাসওয়েল হিল, লণ্ডন এন. ১০-এ অবস্থিত আশ্রমে পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় কার্যধারা যথারীতি অনুসৃত হইয়াছে।

হল্যাণ্ড পার্ক আশ্রম এবং মাসওয়েল হিল আশ্রমের পরিদর্শক-সংখ্যা যথাক্রমে ৩,৩৮২ ও ৪,১১৫। আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে অনুষ্ঠিত সভাসমূহের মোট শ্রোতৃসংখ্যা ৫,০৫৪।

'*Vedanta for East & West*' পত্রিকাখানি ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য বিখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনাসমৃদ্ধ '*Swami Vivekananda in East & West*' গ্রন্থখানি স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি-স্বরূপ অগস্ট মাসে প্রকাশিত হইয়াছে।

১,০০০ পাউণ্ডের অধিক মূল্যের পুস্তকাবলী ও ফটোগ্রাফ কেন্দ্র হইতে বিক্রীত হইয়াছে। ক্রেতাদিগের মধ্যে অনেকে ইওরোপ, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী।

স্বামী ঘনানন্দ হল্যাণ্ড পার্ক কেন্দ্রে ৩৫টি রবিবাসরীয় সভার পরিচালনা করেন। তিনি সেভেন ওকস্ স্কুলে বক্তৃতা দেন, জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করেন এবং ব্লুমস্‌বারি সেণ্ট্রাল ব্যাপ্টিস্ট চার্চে ভাষণ দেন। গিল্ড হলে তিনি ইংলণ্ডের মাননীয়া রানীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন। লর্ড চেম্বারলেন কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া স্বামী ঘনানন্দ বাকিংহাম গার্ডেন পার্টিতে যোগদান করেন এবং ওয়েস্ট-মিনিস্টার অ্যাবেতে মরিশাস স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দেন।

স্বামী পরহিতানন্দ লীডস্, শেফিল্ড, ব্রমলে,

আইলওয়ার্থ এবং ইস্টকোট ও চেশম কন্‌গ্রিগেশন্তাল চার্চে প্রচারকার্যের প্রসার করিয়াছেন। 'তাহারা (ধর্মগুলি) কি স্বতন্ত্র ?' —এই বিষয়ে টেলিভিশন বক্তৃতায় তিনি অংশ গ্রহণ করেন। ব্রহ্মচারী বুদ্ধচৈতন্য যে মাসে ভারত হইতে ইংলণ্ডে আসেন এবং সিটিংবোর্ন কলেজে দর্শনের ক্লাসে বক্তৃতা করেন; তিনি মাসওয়েল হিল আশ্রমে দুইটি ভাষণ দেন।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ও স্বামী আদীশ্বরানন্দ কয়েকদিন হল্যাণ্ড পার্ক কেন্দ্রে অবস্থান করেন। ফেব্রুআরি মাসে স্বামী ঘনানন্দ একজন শিক্ষানবিসকে সঙ্গে লইয়া ভারত ভ্রমণ করেন। এই এক মাসে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের বোম্বাই, নিউ দিল্লী, বারাণসী, বেলুড়, মাদ্রাজ প্রভৃতি কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করেন। জুলাই মাসে তিনি জুরিখ পরিদর্শন করেন।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী শিবানন্দের জন্মতিথি যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী, বুদ্ধপূর্ণিমা, দুর্গাষ্টমী, খৃস্ট্‌মাস ইভ যথারীতি প্রতিপালিত হইয়াছে।

ভারত সরকার এই বেদান্ত কেন্দ্রকে বার্ষিক অর্থসাহায্য করেন।

কলম্বো : সমুদ্রতটের নিকটবর্তী রামকৃষ্ণ রোডে অবস্থিত সিংহল শাখার প্রধান কর্মকেন্দ্র কলম্বো রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যবিবরণী (১৯৬৬, এপ্রিল—১৯৬৮ মার্চ) প্রকাশিত হইয়াছে।

এই আশ্রমে দৈনিক পূজাপাঠ, সাময়িক উৎসব, তামিল ও ইংরেজীতে ধর্মালোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বারা ধর্ম-ও সংস্কৃতিমূলক বক্তৃতাপ্রদানের ব্যবস্থাও সময় সময় করা হইয়া থাকে। 'পোয়া-'দিবসে (Poya-day) শ্রীমদ্ভাগবত ও বিবেকচূড়ামণি অবলম্বনে মনোজ্ঞ আলোচনা হইয়াছিল। ১৯৫২ হইতে শিশুদের জন্য 'পোয়া'-দিবস ধর্ম-ক্লাসের আয়োজন করা হইতেছে, ১৫টি শিশু লইয়া ক্লাস আরম্ভ করা হইয়াছিল। বর্তমানে শিশুসংখ্যা—৫৭৫। ২২ জন অবৈতনিক শিক্ষক শিক্ষাদানকার্য পরিচালনা করেন। ধর্মালোচনার ব্যবস্থায় শিশুদের উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। আন্তর্জাতিক কৃষ্টি-ভবন, ছাত্রাবাস প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

গ্রন্থাগারে ২,৪৫০ খানি পুস্তক আছে। অবৈতনিক পাঠাগারে ২৭ খানি সাময়িক এবং ১০ খানি দৈনিক পত্রিকা লওয়া হয়। গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

কলম্বো হইতে ১৮০ মাইল দূরে কাতারা-গামায় 'রামকৃষ্ণ মিশন মদম' ধর্মশালায় দৈনিক গড়ে ৩০০ জনেরও অধিক এবং শনি-রবিবারে গড়ে ৭০০ জন আশ্রয়প্রার্থী তীর্থযাত্রীর সমাগম হয় পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় বার্ষিক উৎসবে ১৭ দিন ধরিয়া প্রতিদিন প্রায় ১২,০০০ তীর্থ-যাত্রীকে বিনামূল্যে আহার্য এবং ২০,০০০ ব্যক্তিকে সরবৎ দেওয়া হইয়াছিল।

বাটিকালোয়া আশ্রমের উদ্যোগে জেল-খানায় কয়েদীদিগকে ও কুষ্ঠাশ্রমের রোগীদিগকে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। শিশুদের একটি বিদ্যালয় পরিচালিত হয়, ছাত্রসংখ্যা ৪২৫। কাল্লাডি-উপ্পোদাই-এ বালকদের জন্য একটি এবং আনাইপন্থী ও কারাতিভূতে বালিকাদের জন্য দুইটি অনাথাশ্রম পরিচালিত হইতেছে। এই অনাথাশ্রমগুলিতে মোট ১১৫ জন শিক্ষালাভের

সুযোগ পাইয়াছে, তন্মধ্যে ৪৫টি বালিকা।

স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী স্মৃতিভবনের তিন-চতুর্থাংশ নির্মিত হইয়াছে।

গত ৯ই মে, ১৯৬৮ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ শুভাগমন করিয়া কয়েকদিন আশ্রমে অবস্থান করেন। কলম্বো কেন্দ্রে মঠ-মিশনের অধ্যক্ষের আগমন এই প্রথম। তাঁহার আগমনে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দের আমেরিকা সফর

উনবিংশ শতাব্দীতে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোর ধর্মমহাসভায় বা পার্লামেণ্ট অব রিলিজিয়নে সাতহাজার শ্রোতাকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহারই ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেই ঐতিহাসিক শহরে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হইয়াছিল। ঐ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য শিকাগোর বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ১৯৬৮ সনের ২৫শে জুলাই এক বছরের জন্য আমেরিকায় গিয়াছিলেন। গত কয়েক মাসের মধ্যে তিনি ত্রিনিদাদ, গায়না, কানাডা এবং আমেরিকার মধ্য পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, ছাত্রছাত্রীদের সভায়, ধর্মসভায়, টেলিভিশন অনুষ্ঠানে, সাধারণ জনসভায়, কলেজের ভজনালয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, ঘরোয়া বৈঠকী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সফরের প্রথমার্ধে তিনি ত্রিশটিরও বেশী বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ভাষণ দিয়াছিলেন। 'মার্কিন বার্তা' এ প্রসঙ্গে আরও বলিতেছে :

"…সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ বলেছেন যে, ঐ সকল ছাত্র-ছাত্রীদের গভীর আগ্রহ ও সশ্রদ্ধ মনোভাব তাঁকে মুগ্ধ করেছে। 'বিশেষ করে যুবসমাজের আগ্রহে আমি আনন্দিত হয়েছি, তাদের এই আগ্রহ খুবই আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। প্রায় সকল স্থানেই শ্রোতারা গভীর আগ্রহে বেদান্তের বাণী শুনেছে, তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, গভীর আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। তারা এ সম্বন্ধে আরও শুনতে চায়।' কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় বক্তাকে পুনরায় আমেরিকা আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দের বক্তৃতা বহু ছাত্র-ছাত্রীর মনেই গভীর রেখাপাত করেছে। মিনেসোটার কার্লটন কলেজের ছাত্র অ্যান কার্টিস বলেছেন, 'একদিকে তাঁর অবিশ্বাস্য রকমের বিপুল জ্ঞান কেবলমাত্র আমাকে মুগ্ধই করেনি, আমাকে রোমাঞ্চিত করেছে এবং বুদ্ধি ও মননশীলতার ক্ষেত্রে এনে দিয়েছে বিপুল প্রেরণা। অন্যদিকে তাঁর কথাগুলি আমার অন্তরের গভীরে প্রবেশ করেছে।' ওয়েষ্টার্ণ মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যেদিন ভাষণ দেন সেদিন লেকচার হলে তিলধারণেরও জায়গা ছিল না।

উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে উইসকনসিন ইউনিয়ন লিটারেরী কমিটির চেয়ারম্যান ডেভিড মিলোফস্কী বলেছেন, 'আপনার আগমন আমাদের মনের দিগন্ত-প্রসারণে সাহায্য করেছে। আর আমরা উপলব্ধি করেছি যে, ভৌগোলিক দিক থেকে বিরাট ব্যবধান থাকলেও পৃথিবীর সকল মানুষই এক বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ। শনিবার সন্ধ্যায় আপনার বক্তৃতা শুনে আমার মনে হয়েছিল…বেদান্ত ও পশ্চিমী চিন্তা-ধারার মধ্যে পার্থক্য যেন অনেকখানি মিলিয়ে গিয়েছে।

ভার্জিনিয়ার মিলিটারী ইনষ্টিটিউটেও স্বামী রঙ্গনাথানন্দ বক্তৃতা দেন।…

আমেরিকার নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে, নানা অনুষ্ঠানে তিনি একশরও বেশী বক্তৃতা দিয়েছেন। সর্বত্রই তিনি বিপুল সাড়া পেয়েছেন, বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে। তাঁর মতে বিশ্বের কাছে ভারতের শ্রেষ্ঠ দানই হচ্ছে বেদান্তের বাণী।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ এক বছরের জন্য আমেরিকায় গিয়েছেন: ইউটা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয়ার্ধের সফর শুরু হয়েছে।"

উৎসব-সংবাদ

চেরাপুঞ্জি: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২২শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় আসামের রাজ্যপাল শ্রীব্রজকিশোর নেহেরু পৌরোহিত্য করেন। স্বাগত অভিভাষণে স্থানীয় কেন্দ্রের সম্পাদক চেরাপুঞ্জি আশ্রমের প্রারম্ভ, বিস্তার ও বর্তমান কার্যধারা সম্বন্ধে ধারাবাহিক বিবরণী পাঠ করেন।

তিনি বলেন, ১৯২৪ সালে স্বামী প্রভানন্দজী খাসিয়া পাহাড়ে মিশনের যে শিক্ষাপ্রচার-কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে আজ এই অঞ্চলে একটি উচ্চবিদ্যালয়, ২টি জুনিয়র উচ্চবিদ্যালয়, ৯টি এম ই স্কুল, ২৮টি প্রাইমারী স্কুলের মাধ্যমে দক্ষিণ খাসিয়া পাহাড়ে এক হাজার বর্গমাইল জুড়িয়া প্রায় তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিনা খরচে লেখাপড়া এবং কারিগরী বিদ্যা শিখিবার সুযোগ পাইতেছে।

সভাপতির অভিভাষণে রাজ্যপাল বলেন, 'আমি দেখিয়াছি পাশ্চাত্যদেশেও মিশনের সন্ন্যাসিগণ ভারতীয় কৃষ্টি ও বেদান্ত প্রচারের কার্যে কিরূপ সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদের জীবন ও বাণীর দ্বারা ধর্মকে ব্যাবহারিক জীবনে কিরূপে প্রয়োগ করিতে পারা যায় তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণেরই ভাবাবলম্বনে ব্যক্তিগত গণ্ডী হইতে ধর্মকে সমাজসেবার ক্ষেত্রে লইয়া আসিয়াছেন। তিনি ঈশ্বরের পূজা-জ্ঞানে সেবাকার্য করিতে বলিয়াছেন। তাই বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে বেদান্তের আদর্শই সমগ্র বিশ্বে চিন্তাশীল মানুষের মধ্যে নূতন সাড়া জাগাইয়াছে। স্বামীজীর সেবাদর্শে উদ্বুদ্ধ সন্ন্যাসিগণ মানবজাতির শ্রেষ্ঠ প্রতীক এবং সমাজের যথার্থ ভূষণস্বরূপ।'

আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি-দিবসে বিশেষ পূজাদি, শোভাযাত্রা, প্রসাদবিতরণ ও বিভিন্ন ভাষায় তাঁহাদের জীবনী ও বাণীর আলোচনা হইয়াছিল।

মনসাদ্বীপ: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে গত ৪ঠা হইতে ৮ই এপ্রিল ৫ দিন সাগরদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব পালিত হয়। সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী আপ্তকামানন্দ, স্বামী নিষ্কলানন্দ ও স্বামী ভাস্করানন্দ। স্বামী অমলানন্দ প্রথম তিন দিন ও শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় শেষ দুই দিন ভাষণ দেন।

৪ঠা এপ্রিল বিকালে আশ্রম-পরিচালিত ৩টি বিদ্যালয়ের (১টি বহুমুখী, ১টি বালকদের নিম্নবুনিয়াদি ও ১টি বালিকাদের প্রাথমিক) বার্ষিক পারিতোষিক-বিতরণী সভা আশ্রম-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী নিষ্কলানন্দ। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ

কর্তৃক বিভিন্ন ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শিত এবং সভান্তে 'বন্দীবীর' নাটক মঞ্চস্থ হয়।

৫ই এপ্রিল সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি ও হরিনামসংকীর্তন হয়। বিকালে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ শোভাযাত্রা গ্রাম পরিক্রমা করিবার পর আশ্রম-প্রাঙ্গণে স্বামী অমলানন্দের পৌরোহিত্যে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রম-অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধিদানন্দ আশ্রমের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। সভান্তে আড়াই হাজারেরও অধিক ভক্ত বসিয়া খিচুড়ি-প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাত্রে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রসঙ্ঘ কর্তৃক যাত্রানুষ্ঠান হয়।

৬ই এপ্রিল উত্তর সাগর অঞ্চলে মুড়িগঙ্গায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে স্বামী আপ্তকামানন্দের পৌরোহিত্যে ধর্মসভা হয়। স্থানীয় ছাত্রছাত্রীগণ আবৃত্তি, প্রবন্ধপাঠ, সঙ্গীত ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ করিবার পর ঐসব বিষয়ে যাহারা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে তাহাদের পুরস্কৃত করা হয়। সভান্তে আশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রসঙ্ঘের যাত্রাভিনয় পরিবেশিত হয়।

৭ই এপ্রিল দক্ষিণ সাগর অঞ্চলে নটেন্দ্রপুর নটেন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে একটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্বামী ভাস্বরানন্দ। উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক লিখিত ও প্রযোজিত শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি 'দেবপ্রণাম' সভায় পরিবেশিত হয়। সভান্তে মনসাদ্বীপ আশ্রম-পরিচালিত ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

৮ই এপ্রিল দক্ষিণ সাগর অঞ্চলে সুমতি-নগরে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। এইস্থানে 'রামকৃষ্ণ প্রগতি সঙ্ঘ' নামক ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত যুবকদের একটি সঙ্ঘের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন স্বামী আপ্তকামানন্দ। এই উপলক্ষে সকালে সঙ্ঘের নবনির্মিত গৃহে ঠাকুরের পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে স্বামী নিষ্কলানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভা হয়। সভায় আবৃত্তি প্রভৃতিতে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। 'দেবপ্রণাম' গীতি-আলেখ্য এবং ছায়াচিত্র এখানেও প্রদর্শিত হয়।

স্বামী যোগীশ্বরানন্দের দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ২০শে মে, ১৯৬৯ বেলা সাড়ে এগারটার সময় স্বামী যোগীশ্বরানন্দ (উপুদা) মহারাজ ৮৪ বৎসর বয়সে কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ঢাকা মঠে যোগদান করেন, সেখানে সেবাকার্যে (relief works) তিনি প্রায়শই অংশ গ্রহণ করিতেন। ইহার পর কিছুকাল তিনি বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে অবস্থান করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। তাঁহার সন্ন্যাস-জীবনের অধিকাংশই বেলুড় মঠে অতিবাহিত হয়। স্বামী যোগীশ্বরানন্দ কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কর্মের মধ্যে না থাকিলেও সর্বদা কঠোর সাধুজীবন যাপন করিতেন। অনাড়ম্বর সাধু-জীবন, প্রেমপূর্ণ ব্যবহার ও সরলতার জন্য তিনি ছোট বড় সকলেরই খুব প্রিয় ছিলেন।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

বাগড়া: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৮ই ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, প্রভাত-ফেরী, কীর্তন, উপনিষৎপাঠ প্রভৃতির পর প্রায় একহাজার ভক্ত নরনারী বসিয়া খিচুড়ি-প্রসাদ গ্রহণ করেন।

আগরতলা: বিগত ১৯শে এপ্রিল হইতে ২৬শে এপ্রিল পর্যন্ত ৮ দিন আখাউড়া রোডস্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদেশ্বরী মঠে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব প্রভাতফেরী, ভাগবত-পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রতিপালিত হইয়াছে। স্বামী প্রমথানন্দ, শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপিকা অমিতা ভট্টাচার্য, অধ্যক্ষ ডঃ হীরালাল চ্যাটার্জী, অধ্যাপক শ্রীবাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য, শ্রীসুধীর ভট্টাচার্য, শ্রীরজতকান্তি গুপ্ত প্রভৃতি ২১, ২২, ২৩শে এপ্রিল শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীমতী ভানু নাগ ও শ্রীমন্মথ ভট্টাচার্য দুইদিন কীর্তন পরিবেশন করেন। ২৪শে এপ্রিল শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি হয় এবং প্রায় ৪ হাজার নরনারী খিচুড়ি-প্রসাদ গ্রহণ করেন। ২৬শে এপ্রিল স্বামী প্রমথানন্দ ভাষণ দেন।

বারাসত: রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে গত ২১শে এপ্রিল শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠার অষ্টম বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা-পাঠাদি ও গীতাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ণে 'আচার্য শঙ্কর' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত। রাত্রে শ্রীশ্রীকালীপূজা হয়। উৎসবে অনেক সাধু ও ভক্ত নরনারী যোগদান করেন।

আরিট: (মেদিনীপুর) রামকৃষ্ণ সংঘের উদ্যোগে গত ২৬শে ও ২৭শে এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে ২৬শে এপ্রিল শনিবার শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, পাঠ, কীর্তন ও রামায়ণগান হয়। ২৭শে এপ্রিল রবিবার সকালে শোভাযাত্রা, পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা, মধ্যাহ্নে দেড় হাজার নরনারীর মধ্যে প্রসাদবিতরণ ও অপরাহ্ণে আরিট বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের ছাত্রছাত্রীদের আবৃত্তি-প্রতি-যোগিতা এবং পুরস্কারবিতরণ ও ধর্মসভার অনুষ্ঠান হয়। এই সভায় স্বামী বিশোকাত্মা-নন্দ (সভাপতি), স্বামী অমলানন্দ, স্বামী সুশান্তানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। রাত্রে সহস্রাধিক নরনারীর সমক্ষে রামায়ণগান পরিবেশিত হয়।

হাওড়া: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম-ভবনে গত ২৬শে ও ২৭শে এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব-সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের সভায় অধ্যাপক বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী বৃহত্তর ভারতবর্ষীয় জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর ব্যাপক প্রভাবের বিষয়ে বলেন। অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ 'কবির্মনীষী রামকৃষ্ণ' প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করেন। সভাপতি স্বামী বুধানন্দ মহারাজ তাঁহার মনীষাপূর্ণ ভাষণে রামকৃষ্ণের জীবন কিভাবে মানুষের বন্ধন খণ্ডন করিয়া তাহাকে মুক্ত জীবনে উত্তীর্ণ করিতে পারে তাহা ব্যাখ্যা করেন। দ্বিতীয় দিন ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বমনীষার পটভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দের বিরাট

[ভূ]মিকার বিষয়ে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। স্বামী [...]জ্ঞানন্দ মহারাজ আধুনিক জীবনে স্বামীজীর [বা]ণীর প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করেন। [স]ভাপতি স্বামী চিদাত্মানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ [কি]ভাবে সকলের কাছের মানুষ তাহাই বিবৃত [ক]রেন। বিখ্যাত গায়ক শ্রীকালীপদ পাঠক [উ]ভয় দিনই সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

পুরুষোত্তমপুর : শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-[স]ংঘের পঁচিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে গত ২রা [মে] হইতে ছয়দিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব [ম]হাসমারোহে প্রতিপালিত হয়। প্রথম তিন দিন যথাক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত ও তাঁহাদের পুণ্যজীবন ও বাণী আলোচিত হয়। উক্ত তিন দিন স্বামী [শি]বানন্দজী, স্বামী তপনানন্দজী, স্বামী বিশোকাত্মানন্দজী, স্বামী অন্নদানন্দজী ও স্বামী ভাবাতীতানন্দজী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান এবং প্রত্যহ সান্ধ্য আলোচনাসভায় অংশ গ্রহণ করিয়া উৎসব-প্রাঙ্গণ আনন্দ-মুখর করিয়া রাখিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী ত্যাগচৈতন্য পূজা করিয়াছিলেন।

৪ঠা মে সকালে স্বামী অন্নদানন্দজী সেবা-সংঘ প্রাঙ্গণে, 'মোক্ষদা দাতব্য চিকিৎসালয়' ও 'ব্রজমোহন পাঠাগার' দ্বিতল ভবনের ভিত্তি-স্থাপন করেন।

প্রথম তিন দিন সন্ধ্যায় ভজন ও লীলা-সঙ্গীত পরিবেশন করেন তমলুকের সুবিখ্যাত গায়ক শ্রীবিষ্ণুব্রত মাইতি ও শ্রীশচীকান্ত বেরা। শেষ তিন দিন বাঁকুড়ার রামগীতিসুধাকর শ্রীদ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় রামায়ণগান পরি-বেশন করেন। তাছাড়া প্রায় দুই সহস্রাধিক নরনারী খিচুড়ি-প্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। পঁচিশ বৎসরের ইতিহাস-সমন্বিত একটি 'স্মরণী' উৎসব উপলক্ষে প্রকাশ করা হইয়াছে।

অ্যাপোলো ১০-এর চন্দ্র-প্রদক্ষিণ

গত ১৮ই মে রাত্রি ১০-১৯ মিঃ সময়ে আমেরিকার কেপ-কেনেডি হইতে কর্নেল টমাস পি. স্টাফোর্ড, জন ডবলু. ইয়ং এবং ইউজিন এ. সারনান অ্যাপোলো-১০ মহাকাশ-যানে চন্দ্র-প্রদক্ষিণের জন্য যাত্রা করিয়া সাফল্যের সহিত চন্দ্র-প্রদক্ষিণানন্তর গত ২৬শে মে রাত্রি ১০-২২ মিঃ সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরে নির্বিঘ্নে অবতরণ করিয়াছেন।

তাঁহাদের যাত্রা-পথের বিবরণ সবই অ্যাপোলো-৮-এরই মতো; কেবল পার্থক্য এই যে এবার মহাকাশযানে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের যান 'লুনার মডিউল' মহাকাশযানের সহিত সংযুক্ত ছিল। চন্দ্রপ্রদক্ষিণকালে টমাস স্টাফোর্ড ও ইউজিন সারনান 'কম্যাণ্ড মডিউল' (সেখানে মহাকাশচারীরা থাকিয়া যান পরিচালন করেন) হইতে এই 'লুনার মডিউলে' প্রবেশ ও উহাকে 'কম্যাণ্ড মডিউল' হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক-ভাবে চন্দ্র-প্রদক্ষিণকালে চন্দ্রপৃষ্ঠের প্রায় ৭ মাইল নিকট পর্যন্ত যান এবং কয়েকবার এভাবে প্রদক্ষিণ ও এত নিকট হইতে তথ্যাদি সংগ্রহের পর পুনরায় উপরে উঠিয়া 'কম্যাণ্ড মডিউলের' সহিত অবতরণযানটিকে পুনঃ সংযুক্ত করেন এবং উহা হইতে 'কম্যাণ্ড মডিউলে' ফিরিয়া আসেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিবার পর লুনার মডিউলকে মূল যান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া যাত্রিগণ আরো কয়েকবার চন্দ্রপ্রদক্ষিণানন্তর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন।

চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করিবার পূর্বের মহড়ারূপে এই অভিযানটি আয়োজিত হইয়াছিল। ইহার সাফল্য চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের সাফল্যকে সুনিশ্চিত করিয়া দিল।

ভারতের আদিমানবের শিলীভূত অস্থির সন্ধান

শিলীভূত অস্থির ভিত্তিতে মানুষের আদি-পুরুষের সন্ধান আজও চলিয়াছে। গত বছর (১৯৬৮) বসন্তকালে উত্তরভারতের শিবালিক পর্বতমালায় তথ্যানুসন্ধানী অভিযান চালানোর ফলে একটি বিরাটকায় শিলীভূত চোয়ালের সন্ধান পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা বলিয়াছেন, এধরনের যেসকল উপকরণ পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির তুলনায় এটি পঞ্চাশ লক্ষ থেকে এক কোটি বছরেরও বেশী প্রাচীন। এই চোয়ালটি জায়গ্যানটোপিথিকাস নামে প্রস্তর যুগের এক ধরনের বিরাটকায় বানরের বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা। ইহাদের পূর্বপুরুষ ছিল ডাইওপিথিকাস নামে একধরনের জীব। শিম্পাঞ্জী, গরিলা, ওরাংওটাং প্রভৃতির পূর্বপুরুষ এ সকল জীব দেড় কোটি থেকে দু কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে বিচরণ করিত।

শুক্রগ্রহে অভিযান

পৃথিবী হইতে যাত্রা করিবার পর পনেরো কোটি মাইল পথ চলিয়া রাশিয়া কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত মহাকাশ-যান 'ভেনাস-৫' ও 'ভেনাস-৬' গত ১৬ই ও ১৭ই মে শুক্রপৃষ্ঠে অবতরণ করিয়া সেখানকার বহু তথ্য পাঠাইতেছে। মহাকাশ অভিযানে রাশিয়ার এই সাফল্য বিস্ময়কর।

জানা গিয়াছে শুক্রগ্রহের চারিদিকের বায়ুমণ্ডল অতি উত্তপ্ত, উহার চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের ২০ গুণ অধিক।

পরলোকে গোকুলদাস দে

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য গোকুলদাস দে ৭৭ বৎসর বয়সে কলিকাতায় নিজ ভবনে ইষ্টচিন্তা-নিরত অবস্থায় গত ২৬শে মে পরলোক গমন করিয়াছেন।

গোকুলবাবু ছাত্রজীবন হইতেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য দর্শন ও কৃপা লাভ করেন এবং দীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠভাবে শ্রীশ্রীমায়ের ও শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদগণের সঙ্গ ও স্নেহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ও ভগিনী নিবেদিতা, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির স্মৃতিচারণ তিনি প্রায়ই করিতেন। তাঁহার এই সব স্মৃতিচারণের কিছু কিছু এবং বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কয়েকটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হইয়াছে। পালি-ভাষার এই খ্যাতিমান অধ্যাপকের কয়েকটি গবেষণা-পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সংখ্যায় লেখকগণ

১। ডক্টর ভকতপ্রসাদ মজুমদার :
রীডার (ইতিহাস), পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়

২। স্বামী ধ্যানানন্দ :
রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব কালচার, কলিকাতা

৩। স্বামী চেতনানন্দ :
অদ্বৈত আশ্রম, কলিকাতা

৪। শ্রীদিলীপকুমার রায় :
হরিকৃষ্ণ মন্দির, পুণা

৫। শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য :
কলিকাতা

৬। শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু :
লেকচারার (বাংলা), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৭। শ্রীগৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় :
বহরকুলি (বর্ধমান)



দিব্য বাণী

বিবিক্তদেশে চ সুখাসনস্থঃ
শুচিঃ সম-গ্রীব-শিরঃ-শরীরঃ ॥ ৪
অত্যাশ্রমস্থঃ সকলেন্দ্রিয়াণি
নিরুধ্য ভক্ত্যা স্বগুরুং প্রণম্য।
হৃৎপুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধং
বিচিন্ত্য মধ্যে বিশদং বিশোকম্ ॥ ৫
(...... মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং
সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৭)

—কৈবল্যোপনিষদ্

হয়ে ত্যাগপথ-চারী, রুদ্ধ করি সর্ববিধ ইন্দ্রিয়ের দ্বার—
বিষয় গ্রহণ হতে সকল ইন্দ্রিয়গণে করি প্রত্যাহার,
নির্জন প্রদেশে বসি শুচি শুদ্ধ হয়ে সুখাসনে
ঋজুভাবে—সমসূত্রে রাখি দেহ গ্রীবা ও আননে,
ভকতি-পূরিত চিত্তে নমি নিজ শ্রীগুরুদেবেরে,
বিরজ বিশোক শুদ্ধ নিরমল প্রশান্ত শিবেরে
ধ্যান করি হৃদিপদ্মে যতচিত্ত যোগিগণ করেন গমন
অজ্ঞানের পারে, যেথা সর্বসাক্ষী পরমাত্মা জগৎ-কারণ ॥

**অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্।
তথাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্॥ ৬
উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্।
ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ॥৭**

অব্যক্ত অনন্ত যিনি, বেদরাশি সৃজন যাঁহার,
চিন্তার অতীত যিনি, চিদানন্দময় পারাবার,
আদি-অন্ত-মধ্য-হীন, অবিনাশী—চিরবিদ্যমান,
অদ্বয় অরূপ যিনি, অত্যদ্ভুত যে সত্তা মহান,
নিজ শক্তি উমা সনে যুক্ত সেই শান্ত মহেশ্বরে,
নীলকণ্ঠ ত্রিনয়ন বিশ্বধাতা পরম ঈশ্বরে
ধ্যান করি হৃদিপদ্মে যতচিত্ত মুনিগণ করেন গমন
অজ্ঞানের পারে, যেথা সর্বসাক্ষী পরমাত্মা জগৎ-কারণ॥

**স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।
স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালোঽগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ॥ ৮
স এব সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্।
জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে॥ ৯**

—কৈবল্যোপনিষদ্

(বিশ্ব হতে বহু দূরে ধ্যানের গভীর দেশে করিয়া গমন
সর্বত্যাগী মুনিগণ যে সত্তারে করেন দর্শন
এ বিশ্ব রূপেও তিনি—সর্বসাক্ষী পরমাত্মা জগৎ-কারণ।)

এ বিশ্ব তাঁহারই রূপ—তিনিই ব্রহ্মা ও ইন্দ্র, হর,
স্বমহিমা-সমুজ্জ্বল সর্বোত্তম তিনিই অক্ষর,
তিনিই পালনকর্তা, প্রাণ, কাল, চন্দ্রমা, অনল,
যা-কিছু রয়েছে বিশ্বে, সম্ভাব্যও পরে যা-সকল
তিনিই সে-সব, নিত্য—সর্বকালে বিদ্যমান আপন বিভায়।
তাঁহারে জানিয়া শুধু মরণের পারে যাওয়া যায়
(জন্ম-মৃত্যু-পাশ হতে) মুক্তিলাভে নাহি আর দ্বিতীয় উপায়॥

কথাপ্রসঙ্গে

'সাকারও, নিরাকারও'

প্রত্যক্ষই জ্ঞান। বিশ্বাস আমাদের পথের অবলম্বন; বিশ্বাস ছাড়া আমরা জ্ঞানলাভের পথে অগ্রসরই হইতে পারি না। যুক্তি-বিচার হইল মনের সংশয় কাটাইয়া প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায় সেই বিশ্বাস আনিবার সহায়ক মাত্র; প্রত্যক্ষজ্ঞানের ভিত্তি ছাড়া আবার কোনওরূপ যুক্তিবিচারের সৌধও গড়িয়া উঠিতে পারে না। যুক্তিবিচারের কাজ মনে বিশ্বাস জাগানোতেই শেষ। বিচার সত্যলাভের একটি পথও বটে; কিন্তু আমরা যেন না ভুলি, সে-বিচার হইল বিশ্বাস আসিবার পর তাহাতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইবারই চেষ্টা মাত্র, সত্যাসত্য-নির্ণয়ের চেষ্টা নহে। সে-বিচারও যতক্ষণ আমরা করিতেছি, জ্ঞান হইতে আমরা বহুদূরে। প্রত্যক্ষই জ্ঞান, যাহা বিচারের সীমার অতীত।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায় যাঁহাদের সহজাত বিশ্বাস আসিয়াছে, এবং ভগবানলাভের জন্য যাঁহারা বিচার-পথ ছাড়া অন্য পথে চলিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে বিচারের প্রয়োজন খুব বেশী নেই।

'বিচারের দৃষ্টিতে' ঈশ্বরের স্বরূপ নিরাকার, তাঁহার সাকারত্ব 'বিচারের দৃষ্টিতে' একটু নিম্ন-স্তরের কথা। কিন্তু বহু পথ ধরিয়া চলিয়া ভগবানকেবহু ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "তিনি সাকারও বটে, নিরাকারও বটে, আবার তা ছাড়া কি তা কে জানে! তাঁর ইতি করা যায় না"; বিচার করিয়া, এমন কি কেবল তাঁহার নিরাকার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াও একথা কখনো বলা চলে না তিনি কেবল নিরাকারই, সাকার বা অন্য কিছু নহেন। আবার কেবল তাঁহার সাকার রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াও বলা চলে না যে তিনি কেবল সাকারই, অন্য কিছু নহেন। "তোমায় বলছি, রূপ, ঈশ্বরীয় রূপ অবিশ্বাস ক'রো না। রূপ বিশ্বাস কর।" যে দর্শন করেছে সে ঠিক জানে ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার। নিরাকারও সত্য আবার সাকারও সত্য।"

যুক্তি-বিচার দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপকে নির্গুণ নিরাকার অদ্বৈত সত্তা ছাড়া আর অন্য কোন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। কিন্তু আমরা সকলেই জানি যুক্তি-বিচার জ্ঞান নহে, জ্ঞান প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। যাঁহার উপলব্ধি "বেদ-বেদান্ত ছাড়াইয়া গিয়াছে", সেই শ্রীরামকৃষ্ণের 'তিনি সাকারও, নিরাকারও' এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিবৃতিতে আক্ষরিক অর্থেই যাঁহারা দৃঢ়বিশ্বাসবান, কেবল তাঁহাদেরই জন্য শ্রীরাম-কৃষ্ণের অন্যান্য কথার পটভূমিতে এ প্রসঙ্গ, যুক্তি-বিচারের সাহায্যে ইহার বিশ্লেষণ করিবার জন্য নহে।

জ্ঞান মনবুদ্ধির সীমার অতীত

যাহাকে ভগবান বলি, ব্রহ্ম বলি, বা আত্মা বলি তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে মনবুদ্ধির সীমানায় কোন ধারণাই হয় না। তাহা বাক্যমনের অতীত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবশ্য বলিয়াছেন তিনি শুদ্ধ মনবুদ্ধির গোচর; কিন্তু ইহাও বলিয়াছেন, "শুদ্ধ মনও যা, শুদ্ধ বুদ্ধিও তা, শুদ্ধ আত্মাও তা।" আমাদের জানা, দেখা, শোনা বা কল্পনা করা, কোন কিছুর সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে ধারণা করা অসম্ভব। কারণ এ সবই

হইল মনবুদ্ধির ভিতর দিয়া তাঁহার যে প্রকাশ তাহাই, যে 'আমি' এসব দেখে শোনে সে-ও তাহাই। যেমন, একটি রঙীন কাঁচের চিমনির ভিতর একটি বর্ণহীন আলো জ্বলিতেছে। যতক্ষণ ঐ রঙীন কাঁচটির ভিতর দিয়া আলোক প্রকাশিত হইবে, ততক্ষণ ঐ আলোয় উদ্ভাসিত বস্তুচয়কে এবং ঐ আলোর উৎসটিকেও আমাদের রঙীন বলিয়াই বোধ হইবে। রঙীন কাঁচের ওপারে না যাইতে পারিলে আলোটির বর্ণহীন স্বরূপ জানিবার উপায় আমাদের নাই। আমাদের স্বরূপ যেন ঐ বর্ণহীন আলোক, শুদ্ধ-চেতনা, আর মনবুদ্ধি যেন রঙীন কাঁচ। আমরা সাধারণ অবস্থায় যাহাকে 'আমি' বলি তাহা মনবুদ্ধির মাধ্যমে প্রকাশিত চেতনা, রঙীন আলোক। ভগবান সম্বন্ধে ধারণা করিতে যাইয়া তাঁহাকেও ইহারই অনুরূপ কিছু বলিয়া ধারণা করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। অবশ্য ভগবানের বা আমাদের স্বরূপের প্রকাশকত্ব ও অস্তিত্ববোধ মনবুদ্ধির ভিতর দিয়া আসিলেও বিলুপ্ত হয় না, বর্ণহীন আলো রঙীন হইলেও উহার প্রকাশশীলতা নষ্ট হয় না। যেমন আমরা যে চেতন সত্তা, ইহাতে আমরা সকলেই নিঃসংশয়, 'আমি আছি' এ বোধ আমাদের স্বতঃসিদ্ধ, ইহার প্রমাণের জন্য আমাদের কোন যুক্তিবিচারের আশ্রয় লইতে হয় না। মনবুদ্ধির ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইলেও আমাদের চেতনার এই প্রকাশশীলতা ও অস্তিত্ববোধ থাকিয়াই যায়। তবু, আমরা চেতন সত্তা ইহা জানা সত্ত্বেও, আমাদের এই জ্ঞান আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান নহে। কারণ মনবুদ্ধিহীন চেতনা কেমন, আমরা আসলে কিরূপ, সে সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের নাই। 'আমি' বা কোন চেতন সত্তা সম্বন্ধে ধারণা করিতে যাইলে কোন দেহমনবুদ্ধি-বিশিষ্ট প্রাণীর কথাই ধারণায় আসে আমাদের। চেতন সত্তা বলিতে আমরা বুঝি উহা এমন একটি সত্তা যাহা কোন দেহের আশ্রয়ে প্রকাশিত, যাহা নিজের ও জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগ, যাহা চিন্তাদি করিতে পারে। ভগবান সম্বন্ধে ধারণা করিতে যাইয়াও এ অবস্থায় আমরা ইহার বেশী কিছু ধারণা করিতে পারি না, কোনও-না-কোনরূপ দেহ-মন-বুদ্ধি-বিশিষ্ট সত্তার কথাই মনে জাগে। সাধারণতঃ আমাদেরই মত একজনের কথাই মনে জাগে, যাঁহার আকার আছে, যিনি আমাদেরই মত অনুভব করেন, যিনি আমাদের প্রার্থনা শুনেন, উহা পূরণ করেন ইত্যাদি (সাকার ঈশ্বর)। বড়জোর ধারণা করিতে চেষ্টা করি, তাঁহার দেহ নাই কিন্তু তিনি মন-বুদ্ধি-বিশিষ্ট—আমাদের প্রার্থনা শুনেন (নিরাকার সগুণ ব্রহ্ম)। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কোন অশরীরী চেতন সত্তার কথা ধারণা করিতে যাইলেও কোন-না-কোন একটি আকার অবলম্বন না থাকিলে চলে কি? মন-বুদ্ধির সীমার ভিতর যতক্ষণ আছি, নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে বা ভগবান সম্বন্ধে আমাদের ধারণার দৌড় এই পর্যন্তই। 'আমি আছি' এ জ্ঞান আমাদের থাকিলেও উহা মনবুদ্ধির রঙ-এ রাঙানো জ্ঞান, আমরা আসলে যাহা তাহার জ্ঞান নহে। স্বামীজী তাই বলিয়াছেন, "এক হিসাবে সকল মানুষই ব্রহ্মকে জানে; কারণ সে জানে 'আমি আছি'; কিন্তু মানুষ নিজের যথার্থ স্বরূপ জানে না। আমরা সকলেই জানি যে 'আমি আছি,' কিন্তু কি করে আছি তা জানি না।" আমরা জানি না যে আমাদের অস্তিত্ব রঙীন কাঁচকে, মনবুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া নাই, আছে উহার ভিতরকার বর্ণহীন আলোকে, শুদ্ধ চেতনায়। দেহ তো বটেই, মনবুদ্ধিও না থাকিলে এ অস্তিত্ববোধের,

আমরা আসলে যাহা তাহার কিছুই হইবে না, তাহার বিনাশ নাই কোনকালে।

আমি 'কি করে আছি' তাহা প্রত্যক্ষ করার নামই জ্ঞান। মনবুদ্ধির সীমার ভিতর থাকিয়া কি যুক্তিবিচার, কি কোন প্রত্যক্ষের সাহায্যে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই।

শাস্ত্রবাক্যও জ্ঞান নহে

তাই জ্ঞান বলিতে শব্দসমষ্টির বা শাস্ত্রার্থের, সত্যদ্রষ্টাদের বাণীর বৌদ্ধিক ধারণা বোঝায় না, জ্ঞান হইল মনবুদ্ধির অতীত সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ সনৎকুমারের নিকটে যাইয়া বলিতেছেন, "আমি বহু শাস্ত্র পড়িয়াছি কিন্তু তথাপি আমি শোকগ্রস্ত। জ্ঞানীরা বলেন, আত্মজ্ঞ পুরুষ শোকাতীত হন। এত পড়িয়াও আমার শোক যায় নাই।" তিনি পড়িয়াছেন, বৌদ্ধিক ধারণায় আনিয়াছেন যে তিনি শোকাতীত সত্তা, কিন্তু তথাপি তিনি শোকগ্রস্ত। কারণ জ্ঞান, শাস্ত্রবাক্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি তাঁহার হয় নাই—"আমি 'আত্মবিৎ' নহি, আমি শাস্ত্র মুখস্থ করিয়াছি, যুক্তিবিচার সহ বুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়াছি, কিন্তু সত্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই; আমার জ্ঞান এখনো কতকগুলি শব্দমাত্র—আমি 'মন্ত্রবিৎ', সত্যদ্রষ্টা নহি—'আত্মবিৎ' নহি।" আচার্য শঙ্কর তাই বেদান্তাদি শাস্ত্রকেও অবিদ্যার অন্তর্গত বলিয়াছেন। স্বামীজী বলিয়াছেন, 'অপরোক্ষ অনুভূতি বেদেরও অতীত, কারণ বেদেরও প্রমাণ ঐ অপরোক্ষ অনুভূতির উপর নির্ভর করে।' শ্রীরামকৃষ্ণদেব কথাটি আরো সহজ করিয়া, সরস করিয়া বলিয়াছেন, 'পাঁজিতে লেখা আছে বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না। এক ফোঁটাই পড়, তাও না।' গিরিশবাবু সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কথাটি তাঁহার খুবই মনে ধরিয়াছিল, হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, 'মশায়, এক ফোঁটাও পড়ে না, না?'

মনবুদ্ধির এই সীমার ভিতরকার জিনিস হইল আমাদের যুক্তিবিচার এবং প্রত্যক্ষদর্শিগণের বাণী বা শাস্ত্রও। প্রত্যক্ষদর্শিগণ যখন মনবুদ্ধির অতীতে যাইয়া সত্যকে উপলব্ধি করিবার পর নিজ উপলব্ধির কথা আমাদের বলেন, তখন মন-বুদ্ধির সীমার মধ্যেই যতটুকু বলা সম্ভব ততটুকুই বলিতে পারেন! আর যতটাও বা পারেন, তাহাও বলেন না, কারণ বলিয়া লাভ নাই —"বেদ যদি উচ্চতম সত্যকে উচ্চতম ভাবে বা ভাষায় আমাদের কাছে বলতেন, তাহলে আমরা বুঝতেই পারতাম না।" তাঁহাদের সেই কথাই শাস্ত্র, সত্য সম্বন্ধে তাহাই প্রমাণ, তথাপি তাহা সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান নহে, সত্যের আভাস মাত্র। 'তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ', 'তিনি মনবুদ্ধির অতীত'—এ সব কথাই তাই। সত্য সম্বন্ধে বলার, চিন্তা করার জন্য এ সবই সর্বোচ্চ কথা, একমাত্র কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু যতক্ষণ মনবুদ্ধির ভিতর আমাদের থাকিতে হইতেছে ততক্ষণ এগুলি আমাদের কাছে শব্দমাত্র, তাহার বেশী কিছু নহে। বর্ণহীন আলো কোন কালেই যে দেখে নাই, রঙীন আলোকে উদ্ভাসিত বস্তুজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানই যাহার জ্ঞানের সর্বস্ব, বর্ণহীন আলোক সম্বন্ধে তাহার ধারণা করাইতে হইলে রঙীন আলোকে আলোকিত জ্ঞানের মাধ্যমেই তাহা করিতে হইবে। তাহা আমরা বুঝিব। বর্ণহীন আলো কি? যেসব রঙীন আলোর সহিত আমরা পরিচিত, উহা তাহা নহে—উহা লাল নহে, নীল নহে, হলুদ নহে; মানুষের আসল স্বরূপ বা ভগবান আমাদের

জ্ঞান যাহা কিছুর সহিত পরিচিত তাহা নহেন—জগৎ নহেন, দেহ নহেন, মন নহেন, বুদ্ধি নহেন, মনবুদ্ধির গুণমণ্ডিত আমাদের সাধারণ অহংবোধও নহেন। কি তবে? কি তাহা ভাষায় বোঝানো অসম্ভব। যে বেলফুলের গন্ধ কখনো শুঁকে নাই, কোন বর্ণনা তাহাকে সে গন্ধ কিরূপ তাহা বুঝাইতে পারে না। যে ঘি কখনো খায় নাই, ঘি-এর আস্বাদের কোন বর্ণনাই তাহাকে সে-আস্বাদ কিরূপ তাহা ধারণা করাইতে পারে না। অজানা কোন কিছু সম্বন্ধে ধারণা করিতে যাইলে আমাদের মন তাহার পরিচিত জিনিসগুলির সহিত তুলনা করিয়া তাহা বুঝিতে চায় বা পারে। আমরা বিদ্যুতের স্পর্শে শক খাই, বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতে বা পাখা ঘুরিতে দেখি, বিদ্যুৎবাহী তার দেখি, মেঘে বিদ্যুৎ-চমক দেখি। এগুলি আমাদের ধরা-ছোঁয়ার ভিতরের জিনিস, বিদ্যুতের স্বরূপ তাহা নহে—বিদ্যুৎ আসলে কিরূপ তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। সে-সম্বন্ধে ধারণা করিতে যাইলে আমাদের বিদ্যুচ্চমক, আলো, বা পাখা, বা তার, বা এই জাতীয় কোন পরিচিত রূপ মনে ভাসিয়া উঠিবেই।

চলার পথের উপলব্ধি

বিচারের দৃষ্টিতে তাই অদ্বৈত তত্ত্ব ছাড়া আর কোন কিছুই সত্য নহে; এই অদ্বয়তত্ত্বের উপলব্ধিই জ্ঞান, আর সবই অজ্ঞান—ভগবানের সাকারত্বও অজ্ঞানের কথা। তিনি 'সাকারও, নিরাকারও' একথা আক্ষরিক অর্থে বিচারের দৃষ্টিতে গ্রহণ করা যায় না। বলিতে হয়, তাঁহার রূপ নাই, তাঁহাকে সাকাররূপে যখন দেখিতেছি, তখন সত্য হইতে, জ্ঞান হইতে একধাপ নীচে রহিয়াছি।

বিচারে অদ্বয়তত্ত্ব ছাড়া অন্য কিছুই দাঁড়াইতে পারে না ইহা ঠিকই, কিন্তু বিচার তো আর জ্ঞান নহে। জ্ঞান হইল প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় কেবল একটি উপলব্ধিই, তাহা যত উচ্চই হউক, তাঁহার স্বরূপের 'ইতি' নহে। তাছাড়া, বিচার করিয়া সত্যের দিকে অগ্রসর হইবার সময় দেহ-মন-বুদ্ধি সত্য নহে, জগৎ সত্য নহে, নামরূপবিশিষ্ট কিছুই, ঈশ্বরের সাকার রূপও সত্য নহে ইত্যাদি ভাবিয়া চলিতে হয়, উপলব্ধির একের পর একটি ধাপ ছাড়িয়া ছাড়িয়াও হয়তো উঠিতে হয়। সত্য প্রত্যক্ষ করার পূর্ব পর্যন্ত, মনবুদ্ধির সীমা—বিচারের সীমা, ভাবের সীমা, ধ্যানের সীমা অতিক্রম করার পূর্ব পর্যন্ত এসবের কোন কিছুই ভগবান নহে, ইহাই উপলব্ধি হয় ঠিকই।

ফেরার পথে

কিন্তু ইহা চলার পথের কথা। সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া ফেরার পথে এই দেহমনবুদ্ধি-অহংকে এবং জগৎকে অন্যরূপ দেখা যায়। দেখা যায়, এগুলি আছে বটে তবে পূর্বে যেভাবে আছে বলিয়া মনে হইত, সেভাবে নাই। দেহ, মন, বুদ্ধি, জগৎ—এসব নাম রূপ আছে বটে, তবে উহার ভিতর সত্তা হিসাবে সেই অদ্বয় সত্তাই, ভগবানই রহিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, ছাদে উঠিবার সময় 'এটা ছাদ নয়' বলিয়া একটির পর একটি সিঁড়ি ছাড়িয়া ছাড়িয়া উঠিতে হয়; ছাদে উঠিলে দেখা যায়, ছাদ যাহা দিয়া তৈরী, সিঁড়িও সেই একটি বস্তু দিয়া, চুণ সুরকি দিয়া তৈরী। কিন্তু নামরূপ? উহা সত্য নয় বলিয়া বোধ হইলেও উহা তো রহিয়াছে। মরীচিকাকে সত্য বলিয়া বোধ হইবার সময় উহাকে সত্য জল বলিয়া বোধ হয়; উহা মরীচিকা ইহা

বুঝিবার পর উহাকে আর সত্য জল বলিয়া বোধ হয় না ঠিকই. কিন্তু জলের রূপ একটি দেখা যায় তখনো। তিনিই জীব-জগৎ হইয়া রহিয়াছেন দেখা যায়, সত্তা হিসাবে তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই দেখা যায়, কিন্তু জীব-জগতের রূপ, অসত্য বলিয়া বোধ হইলেও, থাকিয়া যায়।

ফেরার পথে ইহা একটি উপলব্ধি—তাঁহাকে কেবল নিরাকার রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া ফিরিবার পরের উপলব্ধি, বহু সত্যদ্রষ্টার প্রত্যক্ষ করা উপলব্ধি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুধু একভাবে নয়, সাকার নিরাকার সর্ববিধ ভাবে তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন—চিনির পাহাড়ের কেবল একটি দানা নয়, অনেকগুলি দানার আস্বাদ গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারই অন্যতম উপলব্ধি—"তিনি সাকারও, নিরাকারও" ইহা যদি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করিতে চাই আমরা, তাহা হইলে বোধ হয় ইহাই ধরিয়া লইতে পারি যে, তিনি শুধু জীব-জগতের বা সাকার ঈশ্বরের সত্তাকেই ভগবান রূপে নয়, সেগুলির রূপকেও ভগবান বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। "কিন্তু এটি ধারণা করা বড় শক্ত। যিনি নিরাকার, তিনি আবার সাকার কিরূপে হবেন, এ সন্দেহ মনে উঠে।" **"যাঁরই রূপ, তিনিই অরূপ। যিনিই সগুণ, তিনিই নির্গুণ।"**

এরূপ ধরিয়া লইলে বলিতে হয় জগৎ বা আমাদের দেহমনাদি তাঁহার প্রতিমা বা মন্দির নয়, তিনিই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, স্বামী বিবেকানন্দেরও এরূপ একটি অনুভূতির বিবৃতি দিয়াছেন ভগিনী নিবেদিতা: "এই সময়ে এই চিন্তাই তাঁহার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল যে, **ঈশ্বরই জগৎ**, তিনি জগতের ভিতরে বা বাহিরে নহেন, আর জগৎ ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রতিমা নহে, পরন্তু **তিনিই এই জগৎ এবং যাহা কিছু আছে সব।**"

মোটের উপর কথা হইল, শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই কথা ও উপলব্ধি অনুযায়ী "তাঁর ইতি করা" যায় না। বিচার করিয়া বলা চলে না তিনি নিরাকারই, সাকার হইতে পারেন না। "দেখেছি বিচার করে একরকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান করে একরকম জানা যায়, আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন—সে এক।" "সাকার রূপও দেখা যায়, আবার অরূপও দেখা যায়, তা তোমায় বোঝাব কেমন ক'রে?" তাছাড়া বিচার জ্ঞান হইতে বহু দূরে, প্রত্যক্ষই জ্ঞান।

মনবুদ্ধির অতীত সত্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীদের কথাই প্রমাণ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, যাঁহার উপলব্ধি তাঁহার নিজের কথা অনুসারেই "বেদবেদান্ত ছাড়াইয়া গিয়াছে", স্পষ্টাক্ষরে নিজ উপলব্ধির কথা বলিতেছেন, "যে দেখেছে, সে ঠিকই জানে ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার। আরো তিনি কত কি আছেন, বলা যায় না।" "বিজ্ঞানী সর্বদা ঈশ্বর দর্শন করে;···চক্ষু চেয়েও দর্শন করে। কখনো নিত্য হতে লীলাতে থাকে, কখনো লীলা হতে নিত্যে।" "নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না।" "যাঁর নিত্য তাঁরই লীলা। যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য।" "আমি তাই **সাক্ষাৎ দেখেছি, বিচার আর কি করবো? আমি দেখেছি তিনিই এই সব হয়ে রয়েছেন, জীব জগৎ সবই।**"

মিস ম্যাকলাউডের অপ্রকাশিত পত্র

(স্বামী সারদানন্দকে লিখিত)

[ইংরেজী হইতে অনূদিত]

১৫ই আগষ্ট, '২০
হল্‌স ক্রফ্‌ট্‌
ষ্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভন

Dearest II,

শ্রীশ্রীমায়ের ২১শে জুলাই* তারিখে দেহত্যাগের সংবাদ প্রথমে মিসেস সেভিয়ারের কাছ থেকে পাই, পরে বসীও জানিয়েছে—মঠে শেষকৃত্য সমাধা হবার পর ফিরে গিয়ে। সেই নির্ভীক, শান্ত, তেজস্বী জীবনের দীপটি তাহলে নির্বাপিত হল,—আধুনিক হিন্দু নারীর কাছে রেখে গেল আগামী তিনহাজার বছরে নারীকে যে মহিমময় অবস্থায় উন্নীত হতে হবে, তারই আদর্শ! আমার কাছে তাঁর জীবন হল অসীম উৎসাহের জীবন—যা আমাদের সবাইকে সেই শরণদায়ী সহানুভূতিভরা জীবনতলে একত্র করেছে, যা নতুন প্রয়োজনের অনুরূপ আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ ঋজু প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠিত নতুন নতুন আদর্শের নজির সৃষ্টি করেছে! ওঃ, তাঁর জীবন অবলম্বনে আমরা প্রত্যেকেই কী দৃষ্টান্তই না দেখাতে পারি! তিনি আদর্শের নতুন নতুন নজির সৃষ্টি করে গেছেন—আমাদেরও অবশ্য তাই-ই করতে হবে—তাঁর নয়, আমাদের স্বকীয় (জীবনের নজির সৃষ্টি)! আর অন্য কোন উপায়ে জগতের সমস্যাগুলির সমাধান করা যাবে না।

আপনার বিশ্বস্ত ও প্রীতিভাজন
জে. ম্যাকলাউড

---

* ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩২৭, রাত্রি দেড়টা

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সাময়িক পত্র

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ৬ ॥

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

স্বামী বিবেকানন্দের হিমালয় আশ্রমের স্বপ্ন এবং রামকৃষ্ণ মিশনের উচ্চাঙ্গের মুখপত্রের কল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করার ব্যাপারে প্রথম-দিকে তিনজন উচ্চশ্রেণীর মানুষের জীবনোৎ-সর্গের কথা স্মরণ করতে হয়; এঁদের দুইজন ইংরাজ—ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার, তৃতীয় জন ভারতীয়—স্বামী স্বরূপানন্দ। স্বামীজীর জীবনীতে এঁদের জীবন ও সাধনার বিষয়ে যথেষ্ট সংবাদ আছে। সেই সঙ্গে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার জানুআরি, ১৯৫০ সংখ্যার '*Fifty years of Advaita Ashrama*' এবং '*Advaita Ashrama; Mayavati: Early years*' ('*A pilgrim*'- লিখিত) প্রবন্ধ দুটি উল্লেখযোগ্য। স্বামী অজজানন্দ প্রণীত 'স্বামিজীর পদপ্রান্তে' গ্রন্থেও স্বামী স্বরূপানন্দ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কিছু সংবাদ আছে। এইসব রচনা থেকে, অন্য সূত্র থেকেও তথ্য সংগ্রহ করে সংক্ষেপে উপস্থিত করব

'প্রবুদ্ধ ভারত' দ্বিতীয় পর্যায়ে অদ্বৈত আশ্রমের সঙ্গে একাঙ্গ হয়ে যাবে বলে স্বামীজীর মনে অদ্বৈত আশ্রম-সম্বন্ধীয় চিন্তার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এখানে অবশ্যই আমরা স্বামীজীর হিমালয়প্রীতির বিষয়ে বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করছি না। সংক্ষেপে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অধ্যাত্মস্বভাবে সমতলের নন, হিমালয়েরই সন্তান; হিমালয়ের অদ্বৈতকে সমতলের দ্বৈতের মধ্যে স্থাপন করাই তাঁর জীবনব্রত।

হিমালয়ে একটি আশ্রম স্থাপনের ইচ্ছা তাঁর মধ্যে প্রথমাবধি জাগরূক ছিল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী দ্বিতীয়বার লণ্ডনে আসার পরে যখন ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ারের সঙ্গে পরিচয় ঘটল, তখন থেকে এই আশ্রম স্থাপনের অভিপ্রায় ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। ক্যাপ্টেন জে এইচ সেভিয়ার এবং মিসেস শার্লট এলিজাবেথ সেভিয়ার দীর্ঘদিন ধরে সত্যসন্ধানী, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে বাঞ্ছিত সত্যকে খুঁজে পাননি, একদিন জনৈক বন্ধুর কাছে এক হিন্দু যোগীর কথা শুনেছিলেন, যিনি তখন লণ্ডনের এক বক্তৃতাকক্ষে জ্ঞানযোগের উপর ভাষণ দিচ্ছিলেন,—সেভিয়ার দম্পতি সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। তেত্রিশ বছরের প্রদীপ্ত তারুণ্যের কণ্ঠে ধ্বনিত অনন্ত জীবনের ও সত্যের বাণী—অদ্বৈত দর্শন। "অল্পভাষী, মধ্যবয়সী ভিক্টোরীয় ইংরাজ ক্যাপ্টেন ভাবলেন, এই তরুণবয়স্ক মানুষটি যা বলছেন, তা কি ইনি বুঝেছেন?" বক্তৃতাশেষে মিস ম্যাকলাউডকে জিজ্ঞাসা করলেন—"এই তরুণটিকে আপনি জানেন? এঁকে দেখে যা মনে হচ্ছে, ইনি কি তাই?" "নিশ্চয়ই"—দ্বিধাহীন কণ্ঠে মিস ম্যাকলাউড বললেন। "তাহলে এঁকে আমরা অনুসরণ করব—

ঈশ্বরের পথে"—তাঁদের আরও দ্বিধাহীন. সিদ্ধান্ত। এই প্রৌঢ় দম্পতির পক্ষে ঐ সিদ্ধান্ত আপাততঃ বিস্ময়কর মনে হলেও তা অনিবার্য ছিল, কারণ "সারা জীবন এই মানুষটিকে এবং এঁর দর্শনকে আমরা খুঁজে এসেছি।" স্বামীজীও প্রথম ব্যক্তিগত সাক্ষাতে মিসেস সেভিয়ারকে মাতৃসম্বোধন করে সরাসরি বললেন, "আপনারা ভারতবর্ষে চলুন না কেন? আমার শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি আপনাদের আমি দেব।" অতঃপর গুরু বিবেকানন্দ সেভিয়ার দম্পতিকে অদ্বৈত সত্য দান করবেন, এবং উক্ত দম্পতি তাঁদের তরুণ গুরুকে দেবেন পিতা ও মাতার স্নেহ এবং শিষ্য-শিষ্যার অখণ্ড আনুগত্য ও সেবা।

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মে সেভিয়ার দম্পতির সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণকালে স্বামীজী যখন আলপস্ পর্বতের তুষারভূমিতে বিচরণ করছিলেন, তখন স্বতঃই হিমালয়স্মৃতি তাঁর মনে ফিরে এসেছিল। হিমালয়ে মঠ স্থাপনের চির-পোষিত আকাঙ্ক্ষা তিনি প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। জীবনের কর্ম যখন সাঙ্গ হবে, হিমালয়-আবাসে তিনি চলে যাবেন, শান্তির মধ্যে, ধ্যানের মধ্যে। সেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যেরা একসঙ্গে থাকবে, তাদের শিক্ষা দিয়ে তৈরি করে দেবেন; তারপর ভারতীয়রা যাবে পাশ্চাত্যে বেদান্ত শিক্ষা দিতে, পাশ্চাত্য শিষ্যরা ভারতে থেকে যাবে এখানকার মানুষের কল্যাণকার্যে। সেভিয়াররা স্বামীজীর কথা অবশ্যই শুনেছিলেন। "এ যদি করা যায় কী অপূর্ব হবে স্বামীজী! এমন একটি মঠ করতেই হবে।"[১]

১ এই সময়কার নানা পত্রে স্বামীজীর হিমালয় আশ্রমের স্বপ্ন ও পরিকল্পনা ছড়িয়ে আছে। ৫ অগস্ট, ১৮৯৬, সুইজারল্যাণ্ড থেকে লালা বদ্রী শা'কে লেখেন, "আলমোড়ায়, কিংবা আরও ভাল হয় কাছাকাছি অন্য জায়গায় একটি মঠ করতে চাই। ...আলমোড়ার কাছে মঠস্থাপনের উপযোগী বাগান-যুক্ত এ রকম জায়গা আপনার সন্ধানে আছে? একটা গোটা পাহাড় পেলে ভাল হয়।"

ঐ বছরে ২১ নভেম্বরে লণ্ডন থেকে এঁকেই আবার লিখলেন, "মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার আলমোড়ায় বসবাস করতে যাচ্ছেন। এঁরা আমার শিষ্য-শিষ্যা আপনি জানেন, হিমালয়ে আমাদের জন্য এঁরা মঠ স্থাপন করে দেবেন। এইজন্যই আপনাকে উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করতে বলেছিলাম। একটা গোটা পাহাড় চাই, তার সামনে তুষার-শৃঙ্গমালা খোলা থাকবে।"

২০ নভেম্বর আলাসিঙ্গা পেরুমলকে—"মিঃ সেভিয়ার এবং তাঁর পত্নী আলমোড়ার কাছে একটি স্থান সংগ্রহ করছেন সেখানে আমাদের হিমালয়-কেন্দ্র স্থাপন করার ইচ্ছা। এখানে পাশ্চাত্ত্য-শিষ্যরা ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী হিসাবে বাস করবে।"

২৮ নভেম্বর হেল-ভগিনীদের—"সম্প্রতি আমি কলকাতায় একটি ও হিমালয়ে আর একটি কেন্দ্র স্থাপন করতে যাচ্ছি। প্রায় ৭০০০ ফুট উচ্চতার একটা গোটা পাহাড়ের উপর এই কেন্দ্রটি স্থাপিত হবে। পাহাড়টি গ্রীষ্মকালে বেশ শীতল থাকবে, আবার শীতকালে খুব ঠাণ্ডা হবে। ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার ঐখানে থাকবেন এবং ঐটি ইউরোপীয় কর্মিগণের কেন্দ্র হবে।"

সেভিয়ার দম্পতি স্বামীজীর সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন, এবং ১৮৯৭ সালের মে মাসে আলমোড়ায় গিয়ে স্বামীজী জনসভায় হিমালয়-কেন্দ্র স্থাপনের কথা বলেছিলেন।[২]

২ আলমোড়ায় প্রদত্ত অভিনন্দনপত্রে স্বামীজীকে কলিযুগে 'আর্যবংশীয়গণের নেতা' বলে সম্বোধন করা হয়—"শ্রীশঙ্করাচার্যের পরে এদেশে আর কেহ কখনো যে-চেষ্টা করেন নাই, আপনি সেই গুরুতর কার্য-সমাধা করিয়াছেন।" স্বামীজী হিমালয়ে মঠস্থাপনে অভিলাষী, এই সংবাদে প্রভূত আনন্দ প্রকাশ করে বলা হয়—"আচার্যপ্রবর শঙ্করও তাঁহার আধ্যাত্মিক বিজয়ের পর সনাতন ধর্মের রক্ষার জন্য হিমালয়স্থ বদরিকাশ্রমে একটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন।" অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী হৃদয় উজাড় করে হিমালয়বন্দনা করেন।—"আমাদের পূর্বপুরুষগণ শয়নে স্বপনে যে-ভূমির বিষয়ে ধ্যান করিতেন, এই সেই ভূমি—ভারতজননী পার্বতী দেবীর জন্মভূমি।

কিন্তু অবিলম্বে উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি,[৩] তখন সাময়িকভাবে আলমোড়া শহরেই একটি আশ্রয় সংগ্রহ করে নিতে হয়েছিল, কারণ আশু গুরুতর প্রয়োজন। প্রবুদ্ধ ভারতের পুনঃপ্রকাশই সেই 'প্রয়োজন'। হিমালয় কেন্দ্র এবং সংঘের মুখপত্র প্রকাশের কেন্দ্র ঘটনাচক্রে যুক্ত হয়ে গেল। স্বামীজী দেখলেন, হিমালয় আশ্রমের সঙ্গে বহিরঙ্গ কর্মরূপে পত্রিকার কাজটি জুড়ে দিলে জ্ঞান ও কর্মের সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটবে। ১৮৯৮, ১৭ জুলাই শ্রীনগর থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখলেন—"আলমোড়ায় কাগজটা বাহির করিলে অনেক কাজ এগোয়, কারণ সেভিয়ার বেচারা একটা কাজ পায় এবং আলমোড়ার লোকেও একটা পায়।"

স্বামীজী ক্যাপ্টেন সেভিয়ার প্রভৃতির সঙ্গে আলমোড়া শহরে 'টমসন হাউস' নামক একটি ভাড়াটে বাড়িতে বাস করছিলেন ১৮৯৮ সালের মে-জুন মাসে। এখানে হ্যাণ্ড প্রেসের ব্যবস্থা করে ফেললেন ক্যাপ্টেন সেভিয়ার, এবং ১৮৯৮ সালের অগস্ট মাসে প্রবুদ্ধ ভারতের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম সংখ্যা বেরুল টমসন হাউস থেকেই, সম্পাদক স্বামী স্বরূপানন্দ, ম্যানেজার ক্যাপ্টেন সেভিয়ার। স্বামীজীর দুটি কবিতা এই সংখ্যাতে বেরিয়েছিল—প্রথমটি *To the Awakened India*, অর্থাৎ 'প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি', দ্বিতীয় কবিতা '*Requiescat in Pace*' বা 'শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম।' একটি কবিতায় তিনি নূতন ভারতের উদ্দেশ্যে উদ্বোধনের আহ্বান জানিয়েছিলেন, অন্য কবিতায় এই নূতন ভারতের জন্য যে মহাপ্রাণ বিদেশী প্রাণোৎসর্গ করে গেলেন, সেই গুডউইনের জন্য পরম শান্তি প্রার্থনা করেছিলেন। নূতন ভারত বলি চায়,

---

এই সেই পবিত্র ভূমি, যথায় ভারতের প্রত্যেক যথার্থ সত্যপিপাসু আত্মা শেষ অবস্থায় আসিয়া জীবনের যবনিকাপাতে অভিলাষী হয়। এই পবিত্র ভূমির গিরিশিখরে, ইহার গভীর গহ্বরে, ইহার দ্রুতগামিনী স্রোতস্বতীসমূহের তীরে ... অপূর্ব তত্ত্বরাশি চিন্তিত হইয়াছিল। ... ইহাই সেই ভূমি, অতি বাল্যকাল হইতেই আমি যেখানে বাস করিবার কল্পনা করিতেছি। .. আমার প্রাণের বাসনা, এই ঋষিগণের প্রাচীন নিবাসভূমি, দর্শনশাস্ত্রের জন্মভূমি এই পর্বতরাজের ক্রোড়ে জীবনের শেষ কয়টা দিন কাটাইব।" হিমালয় বৈরাগ্য দান করে, জীবনের সকল ভয় হরণ করে, হিমালয়ের কোলে সাম্প্রদায়িক পার্থক্যবোধ লুপ্ত হয়, সুতরাং সার্বভৌমিক ধর্মশিক্ষার শ্রেষ্ঠ স্থান এইখানেই হওয়া সম্ভব। হিমালয়ে মঠস্থাপন-প্রসঙ্গে স্বামীজী এইসব কথা বলেছিলেন—"আমার মাথায় এখনো হিমালয়ে একটি কেন্দ্র স্থাপন করিবার সংকল্প আছে। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই স্থানটিই কেন সার্বভৌমিক ধর্মশিক্ষার প্রধান কেন্দ্ররূপে নির্বাচিত করিয়াছি, তাহা সম্ভবতঃ তোমাদিগকে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছি। হিমালয়ের সহিত আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ স্মৃতিসমূহ জড়িত। যদি ভারতের ধর্মেতিহাস হইতে হিমালয়কে বাদ দেওয়া যায়, তবে উহার অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকিবে। অতএব এখানে একটি কেন্দ্র হওয়া অবশ্যই চাই—এ কেন্দ্র কর্মপ্রধান হইবে না—এখানে নিস্তব্ধতা, শান্তি ও ধ্যানশীলতা অধিক মাত্রায় বিরাজ করিবে।" ('আলমোড়া অভিনন্দনের উত্তর')

৩ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে স্বামীজী ১০ অক্টোবর, ১৮৯৭, তারিখে মরী থেকে লেখেন—"ক্যাপ্টেন সেভিয়ার বলিতেছেন যে, তিনি জায়গার জন্য অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। মসুরীর নিকট বা অন্য কোনো central জায়গায় একটা স্থান যত শীঘ্র হয়—তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা যে, মঠ হতে দু'তিন জন এসে জায়গা select করে। তাদের মনোনীত হলেই তিনি মরী হতে গিয়ে খরিদ করে একদম বিল্ডিং শুরু করবেন। খরচ অবশ্য তিনিই পাঠাবেন।... ভাব এই যে, খুব ঠাণ্ডা স্থানেও কাজ নাই, আবার বড় গরমও না হয়। ডেরাডুন গরমী কালে অসহ্য—শীতকালে বেশ। মসুরী itself শীতকালে বোধহয় সকলের পক্ষে ঠিক নয়। তার আগিয়ে বা পেছিয়ে—অর্থাৎ বৃটিশ বা গাড়োয়াল রাজ্যে জায়গা পাওয়া যাবেই। অথচ সেই জায়গায় বারোমাস জল চাই নাইবার-খাবার জন্য। এ বিষয়ে মিঃ সেভিয়ার তোমায় খরচ পাঠিয়ে চিঠি লিখছে।"

প্রাণবলি, যে দেবে সেই ধন্য—বিবেকানন্দের কবিতা দুইটির মধ্যে ছিল তারই ইঙ্গিত।

আলমোড়ায় থাকাকালে প্রবুদ্ধ ভারতের চিন্তা স্বামীজীর মনকে কতখানি অধিকার করেছিল, তার কিছু বর্ণনা করেছেন নিবেদিতা 'স্বামীজীর সঙ্গে হিমালয়ে' গ্রন্থে।—

"এই সময়ে (জুন-জুলাই, ১৮৯৮) সদ্য-প্রতিষ্ঠিত মায়াবতী আশ্রমে মাদ্রাজ থেকে প্রবুদ্ধ ভারতের স্থানান্তর ব্যাপারটি আমাদের সকলের মন অধিকার করেছিল।[৪] এই কাগজটির প্রতি স্বামীজীর সব সময়েই বিশেষ ভালবাসা ছিল—যে চমৎকার নাম তিনি এই পত্রিকাটিকে দিয়েছেন, তার থেকেই তা বোঝা যায়। তাছাড়া নিজস্ব মুখপত্র-প্রবর্তনেও তিনি সর্বদা উৎসুক ছিলেন। আধুনিক ভারতের শিক্ষায় এই পত্রিকার মূল্য তাঁর কাছে স্বতঃপ্রতীয়মান ছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন, এই পত্রিকার মারফত তাঁর আচার্যের ভাবনা ও বাণী ছড়িয়ে পড়বে, যেমন তা ছড়াবে প্রচার ও কর্মের দ্বারা। সুতরাং নিজস্ব পত্রিকাদির বিষয়ে তাঁর দিনের পর দিন চিন্তা, যেমন বিভিন্ন কেন্দ্রের কাজের বিষয়ে। দিনের পর দিন তিনি স্বামী স্বরূপানন্দের নব সম্পাদনায় এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটির বিষয়ে কথা বলেছেন। এক অপরাহ্নে যখন আমরা একত্র বসে আছি, তিনি একটি কাগজ এনে হাজির করলেন, যাতে 'তিনি একটি চিঠি লিখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রূপ দাঁড়িয়েছে'—(*To the Awakened India* কবিতায়)।"

প্রবুদ্ধ ভারতের কাজে নিবেদিতার যোগদানের কথাও উঠেছিল। নিবেদিতা-গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে *Wanderings* গ্রন্থের পরিশেষে সংযোজিত অংশ থেকে পাই—

"The *Prabuddha Bharata's* first number had just arrived, and there was so thought of despatching Nivedita to Almora to help the Editor."

আলমোড়ার ক্যানটনমেণ্ট শহর ক্যাপ্টেন সেভিয়ারকে খুশী করতে পারছিল না। স্বামীজীর স্বপ্নের হিমালয় আশ্রম নিশ্চয় আলমোড়া শহরে স্থাপিত হতে পারে না। উপযুক্ত স্থান সংগ্রহের চেষ্টা চলছিলই। অবশেষে তা মিলল, 'লাজুক ক্যাপ্টেন এবং তাঁর কল্পনা-প্রবণ পত্নী' জায়গাটি দেখে খুশী হলেন। আলমোড়া শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে, একেবারে নির্জনে, সমগ্রই একটি গোটা পাহাড়ের উপরে সেই স্থানটি। আগে ছিল চা-বাগানের সম্পত্তি, মালিক ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন জেনারেল মিঃ ম্যাকগ্রেগর।

সাত হাজার ফুট উঁচু স্থানটি, কয়েক শো ফুট উঁচুতে একটি সুন্দর অগভীর হ্রদ, সামনে খোলা হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গমালা, অসীম নির্জনতা, যা দীর্ঘ উন্নত দেওদারের গভীর নিঃশ্বাসে মথিত হয় দিনে-রাতে—এমনই স্থানে, শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ জন্মদিনে, ১৮৯৯ সালের ২১ মার্চ অদ্বৈত আশ্রম স্থাপিত হল। জায়গাটির নাম ছিল মায়ীপট, বদলে করা হল মায়াবতী। সবচেয়ে নিকটের রেল স্টেশন সেখান থেকে ৬০ মাইল দূরে।

অদ্বৈত আশ্রম এবং প্রবুদ্ধ ভারত কার্যালয় একই সঙ্গে। প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য একটি ছোট প্রেস কিনে হাজির করা হল, কয়েক জন কর্মী রইলেন, প্রধান হয়ে রইলেন অদ্বৈত আশ্রমের প্রথম সভাপতি স্বামী স্বরূপানন্দ এবং অবশ্যই

৪ নিবেদিতা এখানে তথ্যগত ভুল করেছেন। মায়াবতী আশ্রম ঐকালে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মায়াবতী নয়, আলমোড়াতে 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র স্থানান্তর বিষয়ে তাঁরা সকলে চিন্তায় ব্যাপৃত ছিলেন।

প্রতিষ্ঠানের মুখ্য স্থপতি ক্যাপ্টেন সেভিয়ার (যিনি নামে ম্যানেজার) এবং তাঁর পত্নী মিসেস সেভিয়ার।

লোকালয় থেকে বহু দূরে সেই নির্জন পর্বতে বসে পত্রিকা চালানো যতখানি কর্ম তার থেকে বেশী সাধনা একথা না বললেও চলে, সবটাই ছিল একটি অখণ্ড আত্মানুসন্ধানের এবং লব্ধ অধ্যাত্ম-সম্পদের বিকিরণ-প্রয়াস, কিন্তু তাই বলে পত্রিকার মান নিম্নে ছিল না, স্বরূপানন্দ তা হতে দেননি আপ্রাণ চেষ্টায়। স্বামীজী ভারী খুশী হয়েছিলেন, নিউইয়র্ক থেকে অগস্ট, ১৯০০ তারিখে এক শিষ্যকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, "স্বরূপকে বলবি, আমি তার কাগজ চালানতে বিশেষ খুশী। He is doing splendid work।"

প্রসঙ্গচ্যুতি ঘটছে, কিন্তু অদ্বৈত আশ্রমকে যিনি বাস্তবে সম্ভবপর করেছিলেন, সেই ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের চরম বলিদানের কথা এখানে না বলে পারছি না। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ অক্টোবর ক্যাপ্টেন সেভিয়ার তাঁর এই স্বপ্নের আশ্রমেই দেহত্যাগ করেন। প্রায় কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা তাঁর জন্য করা যায়নি, নিরুপায় পত্নীর চোখের সামনে স্বামীর জীবনদীপ নিভে গিয়েছিল। ক্যাপ্টেনের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী হিন্দুমতে তাঁর সৎকার করা হয়, মায়াবতী আশ্রমেরই নিম্নপ্রান্তে, একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য নদীর ধারে—যেখানে গাছে-লতায়-পাতায় জড়ানো আচ্ছন্ন শান্তি এবং অশ্রান্ত জলকলতান—কোনো স্মারক চিহ্ন নেই, কারণ ক্যাপ্টেন সেভিয়ার সত্যই অদ্বৈতবাদী ছিলেন।

ক্যাপ্টেনের দেহত্যাগের সময়ে স্বামীজী বিদেশে ছিলেন, কিভাবে যেন তাঁর হৃদয় উৎকণ্ঠিত হয়েছিল, অজানা আকর্ষণে দ্রুত ভারতে ফিরে এসেছিলেন, জানুয়ারী মাসের বরফ-পড়া দিনে ছুটে গিয়েছিলেন মায়াবতীতে সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে, স্বামীজীর সেই বেপরোয়া ভালবাসা মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের পরমতম স্মৃতিসম্পদ—সে কাহিনী এখানে বলার প্রয়োজন নেই, বিবেকানন্দ-জীবনীর একটি শ্রেষ্ঠ অধ্যায় তা নিয়ে গড়ে উঠেছে।

ক্যাপ্টেন সেভিয়ার চলে গিয়েছিলেন; থেকে গিয়েছিলেন মিসেস সেভিয়ার, বৈধব্যের শুভ্রবাসে, চিরশুভ্র তুষার রাজ্যের দিকে দৃষ্টি মেলে, আশ্রম-মাতা তিনি, শুধু আশ্রমের নন, আশপাশের সমস্ত গ্রামবাসীদেরও তারা তাঁকে 'দেবী' বলত, আরও ১৭ বছর আশ্রমে কাটিয়েছিলেন, সেই নির্জনে কী করে কাটাতেন, এক বাক্যে তার উত্তর দিয়েছিলেন একবার,—"যখন মনে ভার লাগে, আমি স্বামীজীর কথা ভাবি।"

এই বিবেকানন্দ শুধুই ব্যক্তিমানুষ নন, তিনি একটা সত্যের প্রতিনিধি। "স্বামীজী একটি জানালার মত যার মধ্য দিয়ে অনন্তের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়" নিবেদিতা একবার লিখেছিলেন। সেই অনন্তকেই 'মাতাজী' লাভ করতেন অদ্বৈত আশ্রমে প্রতি মুহূর্তে।

ইতোমধ্যে আমরা স্বামী স্বরূপানন্দের বিষয়ে কিছু কিছু কথা পেয়ে গিয়েছি। দেখেছি যে, স্বরূপানন্দের সংঘে যোগদানকে স্বামীজী 'অ্যাকুইজিশন' বা রত্নলাভ বলেছেন, নিশ্চয় স্বরূপানন্দের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক চরিত্রের মহিমা অনুভব করেই ওই কথা বলেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও কিছু কথা ছিল। স্বরূপানন্দের সন্ন্যাস হয় ২৯ মার্চ, ১৮৯৮ তারিখে। স্বামীজী তখনই মিশনের নিজস্ব পত্রিকার কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন। স্বরূপানন্দের মধ্যে তিনি নিশ্চয় সেই কল্পনার ভবিষ্যৎ সার্থকতাকে দর্শন করেছিলেন। স্বরূপানন্দের পূর্বনাম

অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐকালে তিনি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'ডন' নামক ইংরাজি পত্রিকার সম্পাদক। অজয়হরি অধিকন্তু কট্টর অদ্বৈতবাদী। স্বামীজী সত্যই একজন খাঁটি অদ্বৈতবাদী চাইছিলেন, যিনি ভক্তিস্রোতে গা ভাসান দেবেন না, রামকৃষ্ণ সংঘের অন্তর্ভুক্ত এবং রামকৃষ্ণ-ভক্ত হয়েও রামকৃষ্ণ-মূর্তির পূজক হবেন না, যিনি অদ্বৈতবাদী অভারতীয়দের কাছে রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে ভারতীয় অদ্বৈত বেদান্তের প্রতিনিধিত্ব করবেন, এবং সেই অদ্বৈত ভাবনার দিক দিয়েই রামকৃষ্ণ সংঘের ইংরাজি পত্রিকাটি চালাবেন। স্বরূপানন্দ স্বামীজীর সেই অকাঙ্ক্ষিত শিষ্য।

স্বরূপানন্দ দীর্ঘজীবী হননি। গুরুর দেহ-ত্যাগের কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁর দেহান্ত হয়। *The Mysore Herald* পত্রিকায় (Aug. 28, 1906) তাঁর দেহত্যাগের পরে তাঁর বিষয়ে যা লেখা হয়েছিল তার কিছু অংশ —"The Swami was 38 years of age when he died. He took sannyasam 8 years ago and immediately became the editor of Prabuddha Bharata. He had also been the editor of 'Dawn'. He was a devoted student of Sankaracharya and was very well-known for his Sanskrit and English scholarship."

প্রবুদ্ধ ভারতে স্বরূপানন্দ সম্বন্ধে যে মূল শোকবার্তা প্রকাশিত হয়, তা হয়তো মাদার সেভিয়ারের রচনা, কিংবা তাঁরই নির্দেশে রচিত। সেই রচনাটিতে অল্পের মধ্যে স্বরূপা-নন্দের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের উচ্চরূপের কথা বলা হয়েছিল—

"...Swami Swarupananda had for some years been President of the Advaita Ashrama, Mayavati, and it was mainly owing to his exertions and zealous help that the monastery was started in March of 1899.

He brought to the Ashrama an earnestness, which compelled attention, and all who came under his influence will be most ready to admit the value of his services, who realise how much high principle and constant effort are involved in fashioning the life of, and in maintaining such an institution.

The inmates were encouraged to meditate and study and also to use their energies in various ways for the good of the community. It was under his able editorship that the Prabuddha Bharat attained to its present wide circulation. What he sought were the attainments of high ideals, which could have emanated from nothing but the greatest and purest aspirations and an inextinguishable belief in the truth of Advaita. He cherished meditation as a clue to which the soul must cling in the labyrinth of this mutable and fleeting world, as the means to inward illumination, to all that is true and eternal. Retirement from active business in the world did not hinder the multiplicity of his interest in any work directed to the spiritual and social advancement of mankind.

The Swami will be remembered by all for his gentleness, forbearance, and strength of character. Never was the voice of personal anger heard from his lips.

These few remarks give but an imperfect hint of the real man as he was to those who knew and loved him, and it was impossible to have any

association with him without respecting and loving him."

আর নিবেদিতা, যিনি একদা স্বরূপানন্দের কাছে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের পাঠ নিয়েছিলেন স্বামীজীর নির্দেশে, ধ্যানশিক্ষাও করেছিলেন, স্বরূপানন্দের প্রতি যাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল, তিনি স্বরূপানন্দের পরিচয় দিতে প্রবুদ্ধ ভারতে যা লিখেছিলেন, তার মধ্যে ব্যক্তিগত বহু অনুভূতিকে নিবেদন করেছিলেন পূজার আকারে—

"গভীর বেদনার সঙ্গে প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক ও মায়াবতী আশ্রমের সভাপতি স্বামী স্বরূপানন্দের মৃত্যুসংবাদ পড়লাম। তাঁকে হারিয়ে আমরা কতখানি হারালাম—সদ্য বিয়োগের এই পটভূমিকায় তা এখনই লিখে জানানো সম্ভব নয়, যদিচ এইটুকু জানি যে, ক্ষতি অপূরণীয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৮। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে তিনি সন্ন্যাস পান। সন্ন্যাসপ্রাপ্তির কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর উপর হিমালয় কেন্দ্রের ভার অর্পণ করা হয়। সেইসঙ্গে প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদকও হন। সেই অবধি দুই গুরুদায়িত্বের কার্যাবলী তিনি পরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পাদন করে এসেছেন, গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে এই দায়িত্বজাত নানা সম্পর্কের প্রতি কর্তব্য পালন করেছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচিতেরা তাঁর পূর্ণ-পরিণত শক্তির কথা জানতেন,—যে মহান জীবনদর্শনের জন্য তিনি আত্মোৎসর্গ করেছেন, তারই প্রচারে ঐ শক্তি সদা-প্রস্তুত ছিল। সংস্কৃতে তাঁর সমূহ পাণ্ডিত্য, এবং তিনি একনিষ্ঠ শঙ্করপন্থী ছিলেন। পূর্বাশ্রমে কুলীন ব্রাহ্মণবংশে তাঁর জন্ম। পূর্বাশ্রমের অন্যান্য কাজের মধ্যে 'ডন' পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। এঁর বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের কতখানি উচ্চ ধারণা ছিল বোঝা যায়, যখন দেখি যে, বেলুড় মঠে যোগদান করার অব্যবহিত পরেই তিনি এঁকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন—অন্যান্যের মতো প্রারম্ভিক ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়নি। স্বামীজীর এই বিশ্বাসের মর্যাদা তিনি পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করেছিলেন পরবর্তী বৎসরগুলিতে, তাঁর উন্নত অবিচলিত নিষ্ঠাভক্তির অনুসরণে। যারা তাঁর কাছে 'ধ্যান' ও 'যোগ' শিক্ষা করতে আসত, তাদের কাছে তিনি সহৃদয়, ধৈর্যশীল শিক্ষকরূপে দেখা দিতেন—সাহায্য করার, উন্নীত করার অপূর্ব সামর্থ্য যাঁর ছিল। জীবনের সংকটক্ষণে যারা তাঁর উপর নির্ভর করত, তাদের দিতেন নিরন্তর স্নেহপূর্ণ আশ্রয়। আর যে ত্যাগ, তপস্যা ও পবিত্রতার উদ্দেশ্যে তাঁর আত্মার ব্যাকুল অভিসার—তাঁর জীবন সে সকলেরই মূর্ত বিকাশরূপে প্রতীয়মান হত সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে। তথাকথিত ত্যাগ-বৈরাগ্য অনেক সময়ে আধ্যাত্মিকতার আবরণে কাপুরুষতার প্রশ্রয়,—তাঁর ক্ষেত্রে বিপরীতটাই সত্য। তাঁর মননশীল বুদ্ধি বাস্তব সমস্যার সম্পূর্ণ অনুধাবনে সমর্থ ছিল, তার সমাধানে অকুতোভয় ছিল তাঁর মন।

"আমরা যারা স্বামী স্বরূপানন্দকে জানতাম, বিরাট সম্ভাবনার শীর্ষে উন্নীত তাঁর মহৎ জীবনের অনুধ্যান করবার সময়ে একথা ভাবতেই পারি না—সে জীবনের সমাধান হয়েছে মৃত্যুতে। খুলে গেছে দ্বার, গভীর নীরবের, পূর্ণ নৈঃসঙ্গ্যের। আত্মলয়ে চির-আকাঙ্ক্ষী সাহসী আত্মা সেখানে প্রবেশ করেছে ত্বরিত বেগে। এ-জীবনের চরম ত্যাগে অর্জিত সেই মৃত্যুর মহাসন্ন্যাস নিশ্চয়ই আবার নবজন্মে বিদীর্ণ হবে পূর্ণ তেজে, নূতন প্রাণে ও দানে, প্রেমে ও জ্ঞানে—যখন পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন হবে তাঁর আবির্ভাবের।"

('নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)

প্রবুদ্ধ ভারতের পরবর্তী ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। এখনো জীবিত ও প্রভাবশালী এই পত্রিকাটি রামকৃষ্ণ সংঘ ও তার বাইরের বহু শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তির সাহায্যে ও রচনায় পুষ্ট হয়েছে। স্বরূপানন্দের দেহত্যাগের পরে স্বয়ং নিবেদিতা কিছুদিন এই পত্রিকায় সম্পাদকীয় রচনা লিখেছেন। নিবেদিতার অন্যান্য বহু রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। নিবেদিতার রচনা সমকালীন ভারতীয় শিক্ষিত মহলে অতি উচ্চ সমাদরের সঙ্গে পঠিত হত। স্বামী বিরজানন্দ বা স্বামী প্রজ্ঞানন্দের মত শক্তিশালী সন্ন্যাসী প্রবুদ্ধ ভারত ও মায়াবতীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন নানা সঙ্কটের সময়ে এবং অনেক পরে স্বামী অশোকানন্দের নির্ভয় মনীষাপূর্ণ রচনাদি এই পত্রিকার পৃষ্ঠাকে অলঙ্কৃত করেছে। 'প্রবুদ্ধ ভারত' আজও তার উচ্চ মান বজায় রেখে চলেছে।

আরও কয়েকটি পত্রিকা-সংবাদ

স্বামীজীর চিঠিপত্রের মধ্য থেকে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রস্তাবিত আরও দু'একটি পত্রিকার সংবাদ এখানে দেওয়া যায়। ইংলণ্ডে ই. টি. স্টার্ডি গোড়া থেকেই পত্রিকাপ্রকাশে উৎসাহী। স্বামীজীর সঙ্গে স্টার্ডির যখন প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেনি, পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ, তখনই তিনি বেদান্ত বিষয়ক পত্রিকার কথা স্বামীজীর কাছে উত্থাপন করেছিলেন। ১৮৯৫, ২৪ এপ্রিল তারিখে স্বামীজী নিউ-ইয়র্ক থেকে তাঁকে লেখেন—"পত্রিকা বাহির করা বিষয়ে আমি আপনার সহিত সম্পূর্ণ একমত, কিন্তু এসব করিবার মতো ব্যবসাবুদ্ধি আমার একেবারে নাই; আমি শিক্ষাদান ও ধর্মপ্রচার করিতে পারি, মধ্যে মধ্যে কিছু লিখিতে পারি। সত্যের উপর আমার গভীর বিশ্বাস। প্রভুই আমাকে সাহায্য করিবেন। এবং তিনিই প্রয়োজনমত কর্মীও পাঠাইবেন, আমি যেন কায়মনোবাক্যে পবিত্র, নিঃস্বার্থ এবং অকপট হইতে পারি।"

এর পরে আলাসিঙ্গাপ্রমুখ ভক্তগণ যখন মাদ্রাজ থেকে ব্রহ্মবাদিন প্রকাশ করে উঠতে পারছিলেন না, সে অসামর্থ্যে বিরক্ত স্বামীজী ১৮৯৫, ৯ সেপ্টেম্বর লিখেছিলেন—"আমি ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয়ত্রই কাগজ বার ক'রব, মনে করছি।" ধরে নেওয়া যায়, পত্রিকার ব্যাপারে স্টার্ডি প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর আরও কথাবার্তা হয়েছে। এর পরে ১৮৯৬ মার্চে স্বামীজী আমেরিকা থেকে আমেরিকায় পরিকল্পিত পত্রিকার বিষয়ে আলাসিঙ্গাকে লেখেন—"এখানে একখানি পত্রিকা চালাব; লণ্ডনে যাচ্ছি এবং যদি প্রভুর কৃপা হয়, তবে ওখানেও তাই ক'রব।" একই বিষয়ে স্বামীজী লণ্ডন থেকে ৫ জুন, ১৮৯৬ ওলি বুলকে লেখেন—"গুডউইন আমেরিকায় একখানি মাসিকপত্র বার করা সম্বন্ধে তোমাকে এই ডাকে একখানা চিঠি লিখছে। আমার মনে হয়, কাজটি বজায় রাখতে হ'লে এই রকমের একটা কিছু দরকার। আর সে যেভাবে কাজ করবার প্রস্তাব করছে, তাকে সেইভাবে ঐ বিষয়ে সাহায্য করবার যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রব।" এইখানে উল্লেখযোগ্য, গুডউইন স্বামীজীর সঙ্গে ইংলণ্ডে ছিলেন; স্টার্ডির সঙ্গে তাঁর বনিবনা না হওয়ায় স্বামীজী দুঃখের সঙ্গে তাঁকে আমেরিকা যেতে বলেন; এবং স্বামীজী ভাবেন, গুডউইন যদি আমেরিকা যান, তিনি সবচেয়ে সুন্দরভাবে আমেরিকায় প্রস্তাবিত কাগজটির পরিচালক হতে পারবেন।

স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব তাঁর পার্শ্বস্থ সকলকে সর্বসময় উদ্দীপ্ত রাখত ফলে তিনি কাছে থাকলে তাঁর ভক্ত বা সঙ্গীদের কর্মোৎসাহের সীমা থাকত না। স্বামীজী ডাঃ ননজুণ্ডা রাওকে ১৪ জুলাই ১৮৯৬ লিখলেন—"এখানে মুশকিল এই যে, এরা সকলেই নিজেদের কাগজ বের করতে চায়। আর এমনই হওয়া উচিত; কারণ সত্যি বলতে গেলে কোন বিদেশীই খাঁটি ইংরেজের মতো তেমন ভাল ইংরাজি লিখতে পারে না এবং খাঁটি ইংরাজিতে লিখলে ভাবের যা বিস্তার হবে, হিন্দু-ইংরাজিতে তা হ'তে পারে না। তারপর বিদেশী ভাষায় প্রবন্ধ লেখার চাইতে গল্প লেখা আরও শক্ত।"

এখানে স্পষ্ট বোঝা যায়, ইউরোপ বা আমেরিকায় ভারতবর্ষ থেকে পরিচালিত ইংরাজি ভাষায় পত্রিকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামীজী সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। সুতরাং ইংলণ্ড বা আমেরিকায় সেই দেশীয়দের পত্রিকার উপরই নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ইতিমধ্যে স্টার্ডির পত্রিকার আয়োজন আরও এগিয়েছিল। এবং এ-ব্যাপারে ম্যাক্সমূলার সাহায্য করতে রাজী হয়েছিলেন। স্টার্ডিকে লেখা ৫ অগস্ট, ১৮৯৬ চিঠিতে সেই সংবাদ পাই—"ম্যাক্সমূলার আমাদের কার্যধারা জানতে চান, এবং মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধেও খবর চান।··· আশা করি, বড় পত্রিকাখানি সম্বন্ধে ভাল ক'রে ভেবে দেখবে। আমেরিকায় কিছু টাকা তুলতে পারা যাবে এবং কাগজখানি নিজেদের হাতেই রাখা যাবে। তুমি ও ম্যাক্সমূলার কিপ্রকার কার্যধারা ঠিক কর, তা জেনে আমি আমেরিকায় পত্র লিখব ভেবেছি।" 'Big Magazine' বলতে স্বামীজী এখানে ব্রহ্মবাদিনের কথা বলেননি বলেই মনে হয়।

তাহলেও ইংলণ্ডের পত্রিকার বিষয়ে স্বামীজীর মনে একটা দ্বিধা ছিল। স্টার্ডি-প্রচেষ্টার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আশঙ্কা বোধ হয় সব সময়েই বোধ করেছেন। তাছাড়া বাইরে পত্রিকা বের হলে ব্রহ্মবাদিনের সম্ভাব্য ক্ষতি-বিষয়েও তিনি চিন্তা করতে পারেন। এ-বিষয়ে তাই অল্প কয়েকদিন পরেই, ১২ অগস্ট, স্টার্ডিকে লিখলেন, "আজ আমেরিকা থেকে একখানা চিঠি পেলাম, তা তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাদের আমি লিখেছি, আমার অভিপ্রায় এককেন্দ্রীকরণ—বর্তমান কার্যারম্ভে তো বটেই। আমি তাদের এ পরামর্শও দিয়েছি যে, অনেক-গুলি কাগজ ছাপাবার বদলে তারা ব্রহ্মবাদিনের সঙ্গে আমেরিকায় লেখা কয়েক পাতা জুড়ে শুরু করুক এবং কিছু চাঁদা তুলে আমেরিকার খরচাটা পুষিয়ে নিক। জানি না, তারা কি করবে।"

স্টার্ডি স্বামীজীর কথায় রাজী হননি বলেই মনে হয়। তিনি পত্রিকা বের করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। স্বামীজী তখন ১০ সেপ্টেম্বর তাঁকে লিখলেন—"তোমার মাসিক পত্রিকার পরি-কল্পনায় তিনি (ডয়সন) খুব আনন্দিত এবং এসব বিষয়ে লণ্ডনে তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান; শীঘ্রই তিনি সেখানে যাচ্ছেন।···"

স্টার্ডি কিন্তু যত তাড়াতাড়ি কাগজ বার করবেন ভেবেছিলেন, তা পারেননি। আলাসিঙ্গাকে লেখা এক চিঠিতে (তারিখ শুধু আছে ১৮৯৬) স্বামীজী লেখেন—"স্টার্ডির কাগজ বের করবার মতলব এখনো কাজে পরিণত হয়নি।"

স্টার্ডির কাগজ বেরিয়েছিল, যদিও তার আয়ু স্থায়ী হয়নি। স্বামীজী ২০ নভেম্বর লণ্ডন থেকে আলাসিঙ্গাকে যে পত্র লেখেন, তার মধ্যে সেই সংবাদ আছে। এই পত্রে আন্তর্জাতিক পত্রিকা সম্বন্ধে স্বামীজীর কিছু বক্তব্য পাই—

"উইম্বলডনের মিস্ নোবল একজন ভাল কর্মী। তিনিও মান্দ্রাজের দুইটি পত্রিকার জন্য গ্রাহক সংগ্রহ করতে চেষ্টা করবেন। তিনি তোমায় পত্র লিখবেন। এই সব কাজ ধীরে ধীরে, কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে গড়ে উঠবে। অল্পসংখ্যক অনুগামীরাই এই-জাতীয় কাগজের পৃষ্ঠপোষক হয়। এখন কথা এই—এরূপ আশা করা চলে না যে, তারা একসঙ্গে অত্যধিক কাজের ভার নেবে। ইংলণ্ডের কাজের জন্য তাদের অর্থ সংগ্রহ করতে হবে, বই কিনতে হবে, এখানকার পত্রিকার জন্য গ্রাহক যোগাড় করতে হবে এবং সর্বশেষে ভারতের পত্রিকার চাঁদা দিতে হবে। এতটা করা চলে না। এরূপ করলে তা ধর্মপ্রচার না হয়ে বরং ব্যবসার মতই দেখাবে। সুতরাং তোমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তবে আমার মনে হয়, এখানে জনকয়েক গ্রাহক পাওয়া যাবে। ভারতের লোকেরাই ভারতের কাগজগুলির পৃষ্ঠপোষক হবে। সব জাতির নিকট সমানভাবে গ্রহণীয় কোন কাগজ প্রকাশ করতে হ'লে সব জাতিরই লেখক সংগ্রহ করতে হবে; আর তার মানে হচ্ছে—বছরে অন্ততঃ লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে। তা ছাড়া আমার অনুপস্থিতিতেও এখানকার লোকদের কাজ থাকা চাই; তা না হলে সব ভেঙেচুরে যাবে। অতএব একখানি পত্রিকা চাই; ক্রমে আমেরিকাতেও চাই।

"এ কথা ভুলে যেও না যে, সব দেশের লোকের প্রতিই আমার টান রয়েছে, শুধু ভারতের প্রতি নয়।"

ইংলণ্ড বা আমেরিকা থেকে স্বামীজীর জীবিতকালে ঠিক কতগুলি ও কি জাতীয় পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তার সম্পূর্ণ বিবরণ আমরা সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি। ইণ্ডিয়ান মিরারে ১৮৯৬, জুলাই, আমেরিকা থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশের সংকল্পের কথা পাই। পত্রিকাটি মাসিক। 168, Brottle Street, Cambridge, Mass. U.S.A. তার প্রকাশস্থান, এমন লেখা হয়েছিল। সত্যই এই পত্রিকা বেরিয়েছিল কি না জানি না। স্বামীজীর দেহত্যাগের অল্প পূর্বে ১৯০২ সালের প্রথম দিকে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে Pacific Vedantin নামে একটি পত্রিকা সত্যই প্রকাশিত হয় এবিষয়ে ১৯০২ সালের এপ্রিল মাসের ব্রহ্মবাদিনে সংবাদ পেয়েছি। (ক্রমশঃ)

বিকাশ

শ্রীকানাইলাল সামন্ত

সহসা কিসের গন্ধে ভেঙে গেল ঘুম,
নিবিড় তখন নিশি নিথর নিঝুম।
বাহিরে আসিনু ছুটি; উন্মাদের প্রায়
ধেয়ে গেনু শরতের ফুল্ল বাগিচায়
দুর্বার কৌতুকভরে। অগণিত ফুল
সদ্যফোটা শুচি-শুভ্র অপূর্ব অতুল
সুনির্মল চন্দ্রালোকে; উদগ্র উচ্ছ্বাসে
কুসুমে কুসুমে ফিরি, প্রখর নিঃশ্বাসে
কাহারে খুঁজিনু বৃথা। ক্ষিপ্ত দিশেহারা
স্রোতস্বিনী পাশে আসি' স্ফীত শান্ত ধারা
নেহারি' রহিনু বসি। সব গেছি ভুলে
নির্জন সে রজনীর তটিনীর কূলে।
চকিতে কে কয়ে গেল শ্রবণকুহরে
ফুটেছে সে ফুল তোর আপন অন্তরে।

অভিব্যক্তি ও অনুস্যূতি*

অধ্যাপক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

নিখিল বিশ্বে দুটি প্রক্রিয়া কাজ করে চলেছে নিরন্তর। দুটিই যুগপৎ; সুতরাং একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির আলোচনা করলে আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। অথচ গত প্রায় দুশো বছর ধরে পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানে একটির ওপরেই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে; অপরটির ওপর আলোচনা প্রায় নেই-ই বললে চলে। এর ফল কিন্তু ভাল হয়নি এবং তা' খুব সংগত কারণেই। তাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে এক-পেশে; দৃষ্টিকোণ হয়েছে সংকীর্ণ, অসহিষ্ণুতা গিয়েছে বেড়ে এবং মানুষ পারস্পরিক সংগ্রামকে ধরে নিয়েছে অনিবার্য। এই প্রক্রিয়া দুটিকে বলতে পারি—(১) অভিব্যক্তি (Evolution) ও (২) অনুস্যূতি (Involution)। কেউ কেউ এদের নাম দিয়েছেন ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচ। ব্যক্তির জীবনে যেমন, তেমনি একটি জাতির জীবনে, মনুষ্য-সভ্যতার ইতিহাসে, এমনকি গোটা জাগতিক সৃষ্টিব্যাপারে এই দ্বৈতক্রিয়ার সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

একটি মানুষের কথাই ধরা যাক্—তার শিশু অবস্থা থেকে একটা বয়স পর্যন্ত ক্রমাগতই দৈহিক ও মানসিক প্রসার ও প্রকাশ দেখা যায় (ব্যক্তির কর্ম ও প্রবণতা অনুযায়ী এই প্রসার-কাল দীর্ঘ বা হ্রস্ব হতে পারে, তবে প্রসার-কাল যে একটা আছে এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই)। একেই বলতে পারি তার ব্যক্তিজীবনের অভিব্যক্তি-কাল। আবার একই জীবনে দেখা যায়, ক্রমশঃ গুটিয়ে নেবার কাল যার শেষ পরিণাম মৃত্যু; একে বলতে পারি তার অনুস্যূতি-কাল। সুতরাং সাংখ্যকার যখন বলেন, "বিনাশঃ কারণলয়ঃ", তখন তিনি ঠিকই বলেন। এদিক্ থেকে আধুনিক পদার্থবিদ্ ও সাংখ্যকারের মতের মিল লক্ষণীয়। এমনকি দৈহিক দিক্ দিয়েও শুধুমাত্র বিশেষ রূপ বা অবয়বটি ছাড়া সত্যিকারের কিছু বিনাশ হয় না মৃত্যুতে, রূপান্তর হয় মাত্র। স্বামী শিবানন্দ কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, "You have to complete the circuit"। এখানেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য।

একই ধরনের ব্যাপার জাতীয় জীবনেও লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাসে এইমত যুগবিভাগ দেখানও হয়ে থাকে। এক একটা যুগ আসে যখন জাতীয় জীবনের প্রতি বিভাগে আশ্চর্য বিকাশ ও প্রসার হতে থাকে, তারপর একটা উচ্চতম সীমা পর্যন্ত এসে সে যেন আর এগোতে পারে না। শুরু হয় অপ্রকাশ ও সংকোচের কাল, তারও নিম্নতম সীমা একটা আছে যার নীচে আর সে যেতে পারে না। কোন সময়েই কিন্তু সব কিছু প্রকাশ হচ্ছে না (রেনেশাঁস্ বা বিপ্লব হলেও না) বা সব কিছু লুপ্তও হচ্ছে না (এমনকি মহাপ্রলয় হলেও না, শুধুমাত্র অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত থাকছে—ঠাকুর যাকে বলেছেন —"মা সব সৃষ্টির বীজ কুড়িয়ে রেখে দেন।")

মহাজাগতিক ব্যাপারে হিন্দুদের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-তত্ত্বও একই ধরনের কথা বলে থাকে। বিপুল বিশ্বের সৃজন হল (স্বামীজী বলেছেন, 'Projection, not creation'—'সৃষ্টি'র যথাযথ অনুবাদ), প্রসার হল, তার স্থিতিও হল আমাদের সীমিত বিচারে (হয়তো কোটি কোটি বছর ধরে); কিন্তু মহাপ্রলয়ে

* লেখকের ইচ্ছানুসারে 'অনুস্যূতি' শব্দটি রাখা হইল। —সঃ

আবার সব বিলীন হয়ে গেল। তারপর আবার নতুন বিশ্বের সৃজন হল (কারণ সৃষ্টির বীজ সবই সূক্ষ্মতমভাবে থেকেই গিয়েছিল, প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল মাত্র)। অনাদিকাল থেকে এই-ই চলে আসছে; অনন্তকাল ধরে চলবে। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যাও এরূপ মতকে বারবার ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। জেম্‌স্ জীন্‌স্-এর "The Mysterious Universe" (বিশেষ করে, তার 'The Dying Sun' অংশটি) পড়ে তাই তত্ত্বজ্ঞানীর মনে কোন শঙ্কা জাগে না। স্বামীজী বলেছেন, শূন্যের থেকে কিছুরই উৎপত্তি হয় না। থাকে সবই, আছেও সবই—শুধু প্রকাশ আর অপ্রকাশ, ব্যক্ত আর অব্যক্ত, অভিব্যক্ত বা অনুস্যূত।

এই সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে শুধু দার্শনিক ব্যাখ্যাই যে সন্তোষজনক হয় তা নয়, ব্যবহারিক দিক্ থেকেও অনেক উপকার হয়। জীববিজ্ঞানে অভিব্যক্তিবাদ বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত। আজ লেখাপড়া-জানা লোকমাত্রই ল্যামার্ক, ডারউইন, প্যাভলভ ও জুলিয়ান হাক্সলির নাম জানে। ডারউইনের দৌলতে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (Natural selection), 'যোগ্যতমের টিঁকে থাকা' (Survival of the fittest), 'অস্তিত্বের লড়াই' (Struggle for existence) প্রভৃতি ধারণা বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের আলোচনাতেও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলতে পারি, 'Class struggle' অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রাম। কার্ল মার্ক্‌স্-এর সমাজদর্শনের এটি প্রধানতম স্তম্ভ [অবশ্য মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্-এর The Communist Manifesto ডারউইনের The Origin of Species-এর ৮।৯ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব যে ডারউইনের তত্ত্বের থেকে বেশ শক্তি পেয়েছিল একথা ঐতিহাসিক সত্য]। ইতিহাসের নজীরও তিনি এর প্রচুর দিয়েছেন। শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থাকে (Class-less society) তাই তিনি লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছেন এবং তার ব্যবস্থা কিভাবে করা যেতে পারে তার বিধানও দিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীতে সেইমত চেষ্টা বিভিন্ন দেশে হয়েছে এবং হচ্ছে। বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাও হয়েছে। সাধারণ মানুষের অগ্রগতির পথ এতে করে মুক্ত হয়েছে সন্দেহ নেই। আবহমান কাল নিপীড়িত, শোষিত চাষী-মজুর, অগণিত খেটে-খাওয়া মানুষ এই প্রথম যথার্থ স্বাধীনতার স্বাদ এতে করে পেয়েছে একথাও অনস্বীকার্য। কিন্তু মূল প্রশ্ন একটি থেকেই গেছে। সেটি হল—শ্রেণীহীন সমাজ কী সত্যিই গড়ে উঠেছে? কোন কোন দেশে ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করে দিয়ে সামন্তশ্রেণী বা ধনিক-মালিক শ্রেণীকে তুলে দেওয়া হয়েছে ঠিকই; কিন্তু শাসক (শ্রেণী) ও শাসিত (শ্রেণী) কী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও একই মর্যাদার অধিকারী? একজন সাধারণ মজুর বা চাষী এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বাধিনায়ক কী একই রকম সুবিধা ঐ দেশগুলোতে ভোগ করে থাকেন? এক কথায় উত্তর, না এবং কোনকালেই তা' হবেও না। সুতরাং যা করা হয়েছে এবং অন্য দেশেও কালক্রমে হবে তা হল শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা। বংশানুক্রমিক শ্রেণীব্যবস্থা নিশ্চিতভাবে লুপ্ত হতে চলেছে সর্বত্র; কিন্তু 'গুণকর্মবিভাগশঃ' শ্রেণী বোধহয় থেকেই যাবে চিরকাল।

এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্যে এখন ফিরে আসছি। তা'হল সংক্ষেপে অভিব্যক্তিবাদের

সঠিক মূল্যায়ন এবং একই সঙ্গে অনুস্যূতির স্বীকৃতি ও গুরুত্ব-নির্ধারণ। প্রথম, অভিব্যক্তির কথাই ধরা যাক। প্রাণিজগতে মানুষ নিঃসন্দেহে যোগ্যতম এবং এজন্য সে শুধু টিকে আছে তাই নয়, তার সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি বেড়েই চলেছে। কিন্তু আধুনিক কালে অস্তিত্বের সংগ্রাম তাকে তত করতে হচ্ছে না অন্য প্রাণীদের সঙ্গে (একমাত্র রোগবীজাণু ছাড়া) যতটা করতে হচ্ছে নিজেদের (অর্থাৎ অন্য মানুষদের) সঙ্গে। সুতরাং সংগ্রামতত্ত্বকে বেশীদূর ঠেলে নিলে বিপর্যয় অনিবার্য। পারমাণবিক যুগে অস্তিত্বের সংগ্রাম (Struggle for existence) অবলোপের সংগ্রামে (Struggle for extinction) পর্যবসিত হতে পারে। নিছক সংগ্রামকে তাই কাম্যবস্তু মনে করা যায় না। [মার্ক্স্-এঙ্গেল্স্-লেনিন অবশ্য তা বলেনওনি]। মানুষের জীবনে সংগ্রাম আছে ঠিকই। এ সংগ্রাম বাহ্যিক ও আন্তর দুই-ই। কিন্তু এ তার চূড়ান্ত কথা নয়। তার সংগ্রামও আছে, অসংগ্রামও আছে; যুদ্ধও আছে, শান্তিও আছে। সুতরাং যাঁরা perpetual revolution বা নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের কথা বলেন তাঁরাও যেমন ভুল বলেন, perennial peace বা শাশ্বত শান্তির প্রবক্তারাও তেমনই ভুল বলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদ অতিশয় ত্রুটিপূর্ণ। প্রতিযোগিতা ও সংগ্রামকে ডারউইন প্রমুখ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা অভিব্যক্তির কারণ হিসেবে নির্দেশ করেছেন। স্বামীজী বলেছেন, অভিব্যক্তির মূল কারণ হল প্রকাশ ও প্রসারের বাসনা; প্রতিযোগিতা তার ফল মাত্র; কিন্তু সর্বক্ষেত্রে অনিবার্য নয়, অভিব্যক্তির কারণ তো নয়-ই। তাঁর মতে পতঞ্জলির অভিব্যক্তিবাদ যদিও বহু প্রাচীন তথাপি আধুনিক (ডারউইন-প্রবর্তিত) অভিব্যক্তিবাদ অপেক্ষা অনেক বেশী যুক্তিসম্মত এবং গ্রহণযোগ্য। পতঞ্জলিও বলেছিলেন এক জাতি (species) কালক্রমে অপর জাতিতে রূপান্তরিত হয় তবে তা' সংগ্রাম করে নয়, প্রকৃতিকে আপূরণ করে ("জাত্যন্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ")। স্বামীজী এই 'প্রকৃত্যাপূরাৎ'-এর ইংরেজী অনুবাদ করেছেন 'The infilling of nature'. এটি কিভাবে হয় তার ব্যাখ্যাও পতঞ্জলি করেছিলেন—"ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ"। মনে করা যাক, একজন ক্ষেত্রিক অর্থাৎ চাষী তার জমির পাশেই অবস্থিত জলাশয় থেকে নালা কেটে বা পাম্প বসিয়ে বা লক্‌গেট খুলে দিয়ে তার জমিতে জল আনয়ন করে। অনুরূপভাবে এক জাতি অপর জাতিতে রূপান্তরিত হয় প্রকৃতিতে পূর্ব-নিহিত শক্তিকে আকর্ষণ ও আপূরণ করে। যেমন জলাশয়ে আগেও জল ছিল; কিন্তু ক্ষেত্রে জল আসেনি কারণ আসার পথে বাধা ছিল। প্রাণিজগতেও মানুষের উদ্ভব অনেক পরে হয়েছে অনেক প্রাণীর তুলনায় (কারণ বাধা ছিল)। তার পূর্বসূরী বিভিন্ন জাতি (species) অবশ্য ছিল। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির যে বিস্ময়কর বিকাশ মানুষের মধ্যে দেখি তা' মানুষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে এমন কিছু নয়। প্রকৃতিতে এর সবটাই ছিল (যেমন পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তে জলাশয়ে আগেও জল ছিল), শুধু প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল। উপযুক্ত দেহ না পাওয়া পর্যন্ত অপ্রকাশ ছিল মাত্র, প্রকৃতিতে অব্যক্ত বা অনুস্যূত অবস্থায় ছিল। স্বামীজী আরো বিশ্লেষণ করে বলেছেন, একটি অ্যামিবাতে যে মৌল বস্তু আছে একজন বুদ্ধতেও ঠিক তাই আছে; শুধু manifestation বা প্রকাশের তারতম্য। একটি ক্ষুদ্র বীজে যা আছে, এক বিশাল মহীরুহেও তাই আছে। অর্থাৎ বীজ হচ্ছে

যেন effect involute বা অনুস্যূত পরিণাম আর মহীরুহ যেন cause evolved বা বিকশিত বীজ। দুয়েতে একই মৌলবস্তু রয়েছে, শুধু প্রকাশমাত্রার পার্থক্য।

তাহলে দেখা গেল প্রকৃতিতে সব কিছুই আছে—কখনো খুব সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, এমন কি ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থায়; কখনো বা খুব স্থূল, ব্যক্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থায়। প্রথমটিকে বলছি অনুস্যূতি, দ্বিতীয়টিকে অভিব্যক্তি। অভিব্যক্তির জন্য সংগ্রাম অপরিহার্য নয়, অন্ততঃ মানুষের ক্ষেত্রে। সংগ্রামের নামে, প্রগতির নামে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বহু অনুষ্ঠান মানুষের ইতিহাসে হয়েছে, এখনো হচ্ছে। সুতরাং অভিব্যক্তির মূল কারণ ও প্রধান হাতিয়ার হিসেবে সংগ্রামকে ধরে নিলে যে বিপদ হয় তা আমরা বর্তমানে বিলক্ষণ বুঝতে পারছি। স্বামীজী তাই ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, বলেছেন প্রকাশ ও অভিব্যক্তির এরাই সর্বোত্তম হাতিয়ার। আধুনিক মানব-সভ্যতা নিঃসন্দেহে একটি গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন। সংগ্রামকেই টি'কে থাকার একমাত্র উপায় হিসেবে মোটামুটি ধরে নিয়েছেন অনেকেই। এর পরিণামে অভিব্যক্তি কী হবে সঠিক বলা যাচ্ছে না (অবশ্য স্বামীজী বলেছেন, 'শূদ্রযুগ'—আধুনিক পরিভাষায় dictatorship of the proletariat—'আসছে; কিন্তু কী গোলমালের মধ্য দিয়েই না আসছে!' অর্থাৎ এর পরবর্তী রাষ্ট্রিক-আর্থিক-সামাজিক অভিব্যক্তি হল সমাজতন্ত্র), তবে অশান্তি, যুদ্ধ, বিসংবাদ ও রক্তপাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে। সুতরাং অভিব্যক্তিবাদের সঠিক মূল্যায়ন ও প্রচার অবিলম্বে প্রয়োজন। ডারউইনের মতবাদের যে সব পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন আধুনিক জীববিজ্ঞানীরা করেছেন তা সমধিক প্রচারিত হওয়া দরকার। বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের, যথা রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির, ওপর ডারউইন তত্ত্বের সুদূরপ্রসারী প্রভাব আজ ফলতে শুরু করেছে। জীববিজ্ঞানী ও পদার্থ-বিজ্ঞানীদের এ বিষয়ে গুরুতর দায়িত্ব রয়েছে মনে হয়। তাঁরাই অধিকারী, তাঁরাই বলুন—অভিব্যক্তির জন্য সংগ্রাম (বিশেষ করে মানুষে মানুষে) অপরিহার্য একথা সত্য কি না। যদি সত্য না হয় তো জোরগলায় তা প্রচার করুন এবং জনসাধারণের মধ্যে সহজবোধ্য ভাষায় ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা যথাশীঘ্র করুন।

দ্বিতীয় বক্তব্য এই প্রবন্ধের—অনুস্যূতির স্বীকৃতি ও গুরুত্বনির্ধারণ। একথা অসংশয়ে বলা যায় যে, অভিব্যক্তি যে পরিমাণ স্বীকৃতি ও গুরুত্ব বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে গত একশো বছর বা ততোধিক কাল ধরে পেয়ে আসছে অনুস্যূতি তার শতভাগের একভাগও পায়নি, এর কারণ সহজেই অনুমেয়। যে কারণে আমরা জীবনকে ভালবাসি, ঠিক সেই কারণেই জীবনান্তকে বা মরণকে দূরে ঠেলে রাখতে পছন্দ করি। জীবনকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা যতখানি স্বাভাবিক, মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতাও ঠিক ততখানিই স্বাভাবিক। জীবনমুখতা ও মৃত্যুবিমুখতা একই মুদ্রার দুই পিঠ মাত্র। অভিব্যক্তির আলোচনায় আমাদের উৎসাহ কেন—না, এতে প্রকাশ, প্রসার ও প্রচারের কথা আছে। অনুস্যূতির আলোচনায় অনাগ্রহ কেন—না, এতে সংকোচ, অপ্রকাশ ও (আপাত) অনস্তিত্বের কথা আছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় উভয়েরই সমান গুরুত্ব দিতে হবে। উপনিষদের ঋষি যেমন বলেছেন, জীবনও যাঁর ছায়া, মৃত্যুও তাঁরই ছায়া; এ ক্ষেত্রেও তেমনই বলা যায়, অভিব্যক্তিতে যার প্রকাশ ও অভ্যুদয়, অনুস্যূতিতে তারই

সঙ্কোচ ও সংহরণ। অভিব্যক্তি ও অনুস্যূতি দুই-য়ে মিলিয়ে পূর্ণ জীবনচক্রের ব্যাখ্যা। এ যেন পূর্ণিমার চাঁদকে বাদ দিয়ে অষ্টমীর চাঁদকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করছি—যখন শুধু অভিব্যক্তিরই আলোচনা করছি। বাকী চক্রার্ধ বা অর্ধবৃত্তকে অর্থাৎ অনুস্যূতিকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করতে হবে, তবেই না আলোচনা হবে সম্পূর্ণ—জ্ঞানের দিক্ থেকে হবে সার্থক, দৃষ্টিভঙ্গীর দিক্ থেকে হবে অখণ্ড, প্রেমের দিক্ থেকে হবে পূর্ণ। আজ সময় এসেছে অনুস্যূতির দিকেও দৃষ্টি দেবার—নির্মানমোহ হবার এই একমাত্র উপায়। অনুস্যূতির ক্রিয়া কিভাবে জীবদেহে চলে তার সম্পর্কে যথাযথ বিশদ গবেষণা হওয়া দরকার। অভিব্যক্তির গতি-প্রকৃতি ও দেশকালে তার সীমাকে বুঝবার জন্যও এর প্রয়োজন। এতে করে যে শুধু আমাদের তাত্ত্বিক কৌতূহল চরিতার্থ হবে তাই নয়, ব্যবহারিক দিক্ থেকেও প্রচুর লাভ হবার সম্ভাবনা এতে আছে। তা' হল প্রতিযোগিতা ও সংগ্রামের দৌড় কতদূর, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কখন শুধু সম্ভবমাত্র নয়, অবশ্যগ্রহীতব্য তা' জানতে পারা যাবে। পরমাণুবিজ্ঞান ও তার বিভিন্ন সাম্প্রতিক আবিষ্কারকে জীববিজ্ঞানের অনুস্যূতিক্রিয়ার (process of involution) ব্যাখ্যায় নিয়োজিত করা যেতে পারে বলে মনে হয়। নিউক্লিক অ্যাসিড (Nucleic Acid)-এর গবেষণা, ডাঃ খোরানার Genetic Code প্রভৃতি এবিষয়ে আলোকপাত করবে কিনা তাও এ-প্রসঙ্গে বিচার্য।

একটি পুরনো উপমা মনে আসছে। কোন পাখি যেমন তার এক পাখায় উড়তে পারে না, উড়তে গেলেই উভয়পক্ষের যুগপৎ সঞ্চালন অবশ্য প্রয়োজন; তেমনই কোন জীববিদ্যার গবেষণা শুধু অভিব্যক্তির ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ হতে পারে না, অনুস্যূতিরও যুগপৎ সমান্তরাল বিশ্লেষণ, গবেষণা ও উপলব্ধি অবশ্য প্রয়োজন। প্রথমটির ওপর প্রায় সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আলোচনা হয়েছে খণ্ডিত, সিদ্ধান্ত হয়েছে ভ্রান্ত, মানবসভ্যতা হয়েছে বিভ্রান্ত। তাই স্বামীজীর অভ্রান্ত দৃষ্টি দিয়ে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার টানছি—

"...evolution must be brought in accordance with the more exact science of Physics, which can demonstrate that every evolution must be preceded by an involution." (C. W., Birth Centenary Edition, Vol. VIII, pp. 362-63).

'সুখের লাগিয়া'

শ্রীরবি ঘোষ

সাধক কবি গেয়ে গেছেন, "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু···"—এ শুধু কবিকণ্ঠেরই বাণী নয়, বিশ্বমানবের হৃদয়ের মণিকোঠায় যে ব্যথাবেদনার সকরুণ সুর চিরকাল বেজে চলে, সেই শাশ্বত সুরেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। অন্য এক বিদেশী কবিও লিখেছেন, "···যে গান আমাদের মনে করুণতম ভাব জাগিয়ে তোলে, তাহাই মধুরতম।"

কেন এমন হয়? মানব-জীবনের সুর কি শুধুই বেদনার? জীবনের মরুপথে মরীচিকার পিছনে ছুটে ছুটে যখন আমরা মন-প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করি যে তা শুধুই মায়া, দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমাদের অনর্থক প্রলোভিত ও ক্লান্ত করছে, তখনই হৃদয়-তন্ত্রীতে সেই বেদনার সুর ঝঙ্কৃত হয়, "সুখের লাগিয়া···"। এই দুর্বলতাকে যদি আমরা প্রশ্রয় না দিই, তবে মায়ার প্রভাব আমাদের কখনও অভিভূত করতে পারবে না। আমাদের শাস্ত্রের অন্যতম সারকথা স্বামী বিবেকানন্দ কম্বুকণ্ঠে প্রচার করে গেছেন এবং তাঁর মহৎ জীবন দিয়ে দেখিয়েও গেছেন যে দুর্বলতাই পাপ, দুর্বলতাই আমাদের সব দুঃখের আকর। কিন্তু মানবমনের এমনই বিচিত্র গঠন যে, এই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে বীরের মত দৃঢ়পদে আনন্দময় ও মঙ্গলময় জীবন-পথে অগ্রসর হতেও সে চায় না। এ ত মায়া। আপাত-মনোরম এই মাটির পৃথিবী ও তার যাবতীয় ইন্দ্রিয়-ভোগ্য সুখ-সম্ভার, ভোগৈশ্বর্য্য, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার এই সবের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে এই মায়া আমাদের প্রকৃত স্বরূপকে ভুলিয়ে রেখেছে। এই মায়ার গণ্ডী নির্মম হস্তে ভেঙ্গে না দিতে পারলে মুক্তি নেই।

"সুখের লাগিয়া।" কি সে সুখ, কতক্ষণ তা থাকে, তার স্বরূপ কি, তত্ত্বজিজ্ঞাসু মন নিয়ে নিরপেক্ষ ভাবে আমরা তা ক্ষণিকের জন্যও বিচার করতে বসি না। বসব কখন? আমি-আমার করেই যে ব্যস্ত! নিজকে, নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীকে মনে প্রাণে আঁকড়ে ধরে বসে আছি! বারে বারে আঘাত পাই, দেখতে পাই এই আপাত সুখ বড়ই চঞ্চল। একটুতেই যায় ফসকে। প্রতিবারেই ব্যর্থমনোরথ হবার পর তাই মনের সেই তন্ত্রবীণায় লাগে আঘাত, "সুখের লাগিয়া"···। তবু বিচার করি না, অন্ধ হয়ে আবার ছুটি সেই সুখেরই পিছনে।

কথা হল, কেবল সুখলাভের জন্য আমরা সবাই উন্মুখ; কিন্তু তা পাই কি? না। তবু অশেষ দুঃখের পর নামমাত্র সুখ পেলেও আমরা আশা করি পরে অবাধিত সুখই পাব। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়:

"সুখে দুঃখ, অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল
তবু নাহি ছাড়ে আশা।"

আমরা দুঃখকে বাদ দিয়ে কেবল সুখই পেতে চাই। কিন্তু সুখ ও দুঃখ যে একসঙ্গে জড়িত, একই মুদ্রার এ-পিঠ ও-পিঠ। একটি থেকে অন্যটিকে আলাদা করা যায় না, এককে নিলে অপরটিও নিতেই হবে। এই পৃথিবীতে আমরা যে-সুখই পাই না কেন তাহা দুঃখমিশ্রিত থাকবেই। এটি ভুলে যাই বলেই সুখের পর দুঃখ এলেই আমাদের মনে আক্ষেপ জাগে, "সুখের লাগিয়া···।"

প্রশ্ন জাগে, তবে কি অবিমিশ্র, প্রকৃত ও

স্থায়ী এবং কল্যাণময় সুখের অস্তিত্বই নেই? আছে। এমন মধুময়, কল্যাণময়, অফুরন্ত, স্থায়ী সুখ আছে, যার আস্বাদ পেলে জাগতিক সব সুখ তুচ্ছ বলে বোধ হয়। সেই অমৃতোপম সুখ, সেই অবাধিত সুখের নাম 'আনন্দ', এবং সেই আনন্দই আমাদের স্বরূপ! এই স্বরূপে, আনন্দের সাগরে পৌঁছতে পারলে জীব শিব হয় —সুখ-দুঃখের অতীতে চলে যায়। এই আনন্দের কণিকামাত্রই আমাদের জাগতিক সুখে প্রকাশ পায়—জাগতিক বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আমাদের ভেতর থেকেই মনে এর সামান্য বিকাশ ঘটে। আমরা তা বুঝতে পারি না, আমরা ভাবি বিষয়েই বুঝি সুখ নিহিত।

তাই, শ্রান্ত ও বিভ্রান্ত পথিক আমরা ছলনার কবলে পড়ে পথ ভুলে বিপাকে পড়ে ঘুরে ঘুরে দিশেহারা হই। যাঁরা এই আনন্দের সাগরে অবগাহন করে ফিরে এসেছেন তাঁরাই সেখানে পৌঁছবার পথের সন্ধান দিতে পারেন। আন্তরিকভাবে খোঁজ করলে, ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকলে তেমন দেবদুর্লভ লোকোত্তর মহাপুরুষের সন্ধান পাওয়া যায়। আমাদের শাস্ত্র বেদ, পুরাণ, বেদান্ত যে অমৃত ও আনন্দলোকের সন্ধান ও সেখানে পৌঁছুবার পথনির্দেশ দিয়েছেন, উপলব্ধিমান সত্যদ্রষ্টাগণ যুগে যুগে বারে বারে নিজ জীবনের সাধনা ও প্রত্যক্ষের দ্বারা সেগুলির সত্যতা প্রমাণিত করে গেছেন। তাঁদের নির্দেশিত পথে চলে আমরাও তা যাচাই করে নিতে পারি।

দুঃখের দ্বারা কোন প্রয়োজনই কি আমাদের সিদ্ধ হয় না? নিশ্চয় হয়। দুঃখই আমাদের আনন্দধামে যাবার জন্য ব্যাকুলতা জাগায় আগুনে পুড়ে সোনা খাঁটি হয়, নিখাদ হয়। দুঃখানলে পুড়ে জীবও খাঁটি হয়; তার মনের যাবতীয় আবিলতা পুড়ে যায়। অহমিকা, দম্ভ, স্বার্থপরতা, নীচতা, অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস আদি যত মলিনতা সব ধুয়ে মুছে যায়। মনে তখন প্রসুপ্ত দেবত্বের জাগরণ ঘটে। সত্য প্রেম পবিত্রতা ও শ্রদ্ধাবিশ্বাসের অবরুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হয়। মানুষ তখন সেই সত্যিকারের অবিকারী ও অবিনাশী সুখের, আনন্দের জন্য লালায়িত হয়। যে সুখ চেয়ে আমরা ভিখারীর মত মানুষের, বিষয়ের দ্বারে দ্বারে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াই, তখন তার স্বরূপ বুঝে বাইরে খোঁজা ছেড়ে দিয়ে তার আসল আলয়ে, নিজেরই অন্তরমাঝে চোখ ফেরাই।

জীবনের প্রারম্ভ হতেই জাগতিক শিক্ষা-দীক্ষার সাথে সাথে শাস্ত্রানুমোদিত ও গুরুপদিষ্ট পথ ধরে এদিকে যাত্রা শুরু করলে, জীবন-সায়াহ্নে এসে জীবনের হিসাব মেলাতে কোনও ব্যর্থতার অবকাশ থাকে না। কারণ সেই জীবনে কোনও খুঁত নেই, গোজামিল নেই। সেই জীবন-নদী মরুপথে শুকিয়ে যায় না, অমৃত-সাগরে মিলিত হয়। সূক্ষ্ম বিচার ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে জীবনের প্রতিটি ঘটনা, মনের প্রতিটি গতি ও তার পরিবর্তন বিশ্লেষণ করলে মনই সত্যপথ ধরতে চাইবে। আপাতদৃষ্টিতে সুখ বলতে আমরা সাংসারিক প্রাচুর্য, স্বাচ্ছন্দ্য, নীরোগতা, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, শান্তি- ও সমৃদ্ধিপূর্ণ পরিবার ও অনুকূল অবস্থাকেই বুঝি। এর সামান্যতম ব্যতিক্রম আমাদের মনে যে বিপরীত প্রতি-ক্রিয়ার সৃষ্টি করে তা দুঃখ। আমাদের চাওয়ার শেষ নাই, যতই পাই না কেন আমরা আরও চাইবো; তৃপ্তি, শান্তি কখনো এপথে আসতে পারে না। সুখের নিত্যতাও নেই, দুঃখেরও নেই। ইহারা সীমাবদ্ধ ও ক্ষণিকের। যাঁরা এই চাওয়ার পারে গেছেন, যাঁরা ভূমানন্দের স্বাদ পেয়েছেন, তাঁদের কাছে জাগতিক সুখ অতি তুচ্ছ বস্তু। তাঁরা সুখ-দুঃখের পারের

লোক। আপেক্ষিক সুখে তাঁরা উৎফুল্ল হন না ; আবার আপেক্ষিক দুঃখও তাঁদের বিচলিত করতে পারে না। সুখে দুঃখে তাঁরা অবিকার, নিরাসক্ত। কারণ তাঁদের কাম্য কিছু নেই, অপ্রাপ্য কিছু নেই। আমাদের চাওয়া আছে, আমরা বাসনার দ্বারা চালিত। কাম্যবস্তু পেলে সুখী, না পেলে দুঃখী। বাসনাই সুখ-দুঃখের মূল বলে যেখানে বাসনা নেই, সেখানে সুখ-দুঃখও নেই। এই বাসনাকে মন থেকে চির নির্বাসিত করবার প্রচেষ্টার নামই সাধনা, তপস্যা। এর দ্বারাই আমরা আমাদের আনন্দময় স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে পারি।

সংসারতাপে ক্লিষ্ট ও তাপিত আমরা, জরা ও মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত। রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্য সংসারে আমাদের সাথী। সংসারে আমরা একা এসেছি, একাই আবার এই সাধের ধরা থেকে বিদায় নিতে হবে। শুধুমাত্র কর্মফল নিয়েই এসেছি—আবার যাবার বেলায় কর্মফলই নিয়ে যেতে হবে। এই কর্মফল যাতে শুভ ও শুদ্ধ হয় তারই প্রচেষ্টা করতে পারলেই লাভবান হওয়া যায়। আপাতমনোরম ক্ষণিক সুখের জন্য নিত্য আনন্দলাভের পথ থেকে অধিকতর দূরে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে দুর্লভ মনুষ্য-জন্মের অসদ্ব্যবহার যেন না করি আমরা, অশুভ কর্মফলের বোঝা বাড়িয়ে না তুলি।

তবুও যাত্রা হয়নিক অবসান

সেখ সদরউদ্দীন

আর যে পারি না ক্লান্ত এ আমি চলেছি অনেক পথ,
আমার তরীর হাল ভেঙ্গে গেছে, ভেঙ্গে গেছে মোর রথ।

সুদূর আমায় ডাক দিয়েছিল থাকিতে পারিনি ঘরে,
অসীমের ডাকে স্থলে আর জলে চলিবার নেশা ধরে।
যৌবন যবে ছিল আতপ্ত, শিরায় তপ্ত রক্ত,
সাগরের ডাকে দিয়েছিনু সাড়া অভিযান-অনুরক্ত।
দিনেতে পেয়েছি সূর্যের আলো, রাতে ছিল কোটি তারা,
আপনার বেগে আপনি এ-আমি ছিলাম আত্মহারা।
আজিকে আমার নেই সেই বেগ, নেই দুর্বার গতি—
আজি যেন আমি শক্তিবিহীন, দুর্বল ক্ষীণ অতি।

থেমে গেছি আজ, তবুও যাত্রা হয়নিক অবসান—
অদৃশ্য এক ইঙ্গিতে নিয়ে চলিয়াছ ভগবান!
যাত্রা যেখানে ভেবেছিনু শেষ, দেখি শুরু সেখানেই,
বিশ্ব-চক্র কোথায় থামিবে ঠিকানা সে জানা নেই।

স্বামীজীর শিক্ষাদর্শের রূপায়ণ-প্রসঙ্গে

স্বামী জীবানন্দ

শিক্ষাসঙ্কটে স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ

অনেক চিন্তাশীল মনীষী বলেছেন, এখনও অনেকে অভিমত প্রকাশ ক'রে থাকেন, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের দ্বারাই ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচিত্র পথে স্বামীজীর সঞ্জীবনী বাণী আমাদের প্রকৃত পথ দেখাবে।

যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন দেশবাসীর জীবনে সর্বক্ষেত্রে উন্নতি এবং উপলব্ধি করেছিলেন এই উন্নতির মূলে শিক্ষা। স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ নিয়ে অনেক সুচিন্তিত আলোচনা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তার রূপায়ণ-প্রচেষ্টা কমই হয়েছে।

বর্তমানে শিক্ষাসঙ্কট সারাদেশব্যাপী। ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েক বৎসর যাবৎ মনে হয় যেন একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। একটি পরিকল্পনা কিছুকাল স্থায়িত্ব লাভ করতে না করতেই অন্য পরিকল্পনা সম্মুখে রাখা হচ্ছে এবং তাকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টাও চলছে। ছাত্রসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা আবার শুধু ভারতে নয়, ভারতেতর দেশসমূহেও ভয়াবহ রূপ গ্রহণ করেছে। এই অবস্থায় স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ শিক্ষানায়কদের অনুধ্যানের বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ছাত্র-সমাজের অসন্তোষের কারণ কি, তাদের অভাব কি, শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক নেই কেন?—এই সমস্ত বিষয়ের সমাধানকল্পে স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা থেকে অনেক কিছু যে পাওয়া যাবে তাতে কোন সন্দেহই নেই।

বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষার অর্থ

শিক্ষা বলতে কি বোঝায়? শিক্ষা বলতে এই বোঝায়- যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, সে 'মানুষ', সে লিখতে পড়তে পারে, দেশ-বিদেশের খবর রাখে এবং যে জগতে সে বাস করছে তার সঙ্গে পরিচিত হয়।

আরও বলা যায়, যাঁর দেহমনের সুষম গঠন হয়েছে, যাঁর বুদ্ধিবৃত্তি সুমার্জিত, যিনি বুদ্ধিবৃত্তি ঠিকমত পরিচালনা করতে পারেন, ইন্দ্রিয়গুলি যাঁর বশে আছে, যিনি ইন্দ্রিয়ের বশে নন, তিনি শিক্ষিত। শিক্ষার দ্বারা মানুষ স্বাবলম্বী হয়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে সমর্থ হয়, পরনির্ভর হতে চায় না। বলা হয়ে থাকে, যিনি সকল বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান এবং কতকগুলি বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছেন তিনিই শিক্ষিত।

Education বা শিক্ষা শব্দটির মানে bringing forth what is within—অর্থাৎ অন্তরস্থ বৃত্তি-সমূহের বিকাশ-সাধন। স্বামীজী যে শিক্ষা-সংজ্ঞা দিয়েছেন তার মধ্যে education শব্দটির তাৎপর্য পুরোপুরি তো আছেই, আরও গভীর ও ব্যাপক হয়ে উঠেছে এর অর্থ। 'Education is the manifestation of perfection already in man.'—শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মধ্যে যে পূর্ণত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ। সব মানুষেরই ভেতর পূর্ণতা সুপ্ত রয়েছে, তার বিকাশ-সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

ছাত্রদের অভিভাবকেরা কি চান? তাঁরা চান ছেলেমেয়েরা 'মানুষ' হোক। তারা স্বাস্থ্যে বিদ্যায় বুদ্ধিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক, এই-ই

হ'ল সকলের আকাঙ্ক্ষা। 'মানুষ করা' যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তবে শরীর, মস্তিষ্ক এবং হৃদয়—এই তিনটির সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে। স্বামীজী তাঁর 'man-making education'-এ এই তিনটির বিকাশ-সাধনের কথা বলেছেন। শরীর হবে সুগঠিত, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, তার সঙ্গে থাকবে ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং হৃদয়বত্তা অর্থাৎ সংবেদনশীল মন। মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ তিনি চেয়েছেন—যার মধ্যে থাকবে চারিত্রিক দৃঢ়তা, ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ।

স্বামীজীর শিক্ষাদর্শের মধ্যে একদিকে পরা-বিদ্যা অর্থাৎ অধ্যাত্ম-বিদ্যার কথা, অন্য দিকে কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, ইতিহাস, শিল্প, ললিতকলা, কারীগরী ও প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতির কথাও আছে। পরা ও অপরা—উভয় বিদ্যারই অনুশীলন প্রয়োজন, তিনি বলেছেন। সমগ্র মানবজীবনের বিকাশ-সাধন সব দিক দিয়ে না হলে শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয় না। গণশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রাম্য শিল্প, সঙ্গীত, কথকতা, লোকগাথা প্রভৃতির পুনরুজ্জীবনও তিনি চেয়েছেন। এই সবের মধ্যে গ্রাম্য জীবনের প্রাণশক্তি নিহিত আছে। গ্রামগুলিকে বাঁচাতে গেলে এগুলি উপেক্ষণীয় নয়। শিক্ষা অতীত সংস্কৃতির বাহক, বর্তমান সভ্যতার পোষক এবং ভবিষ্যৎ প্রগতির জনক।

শিক্ষার ক্ষেত্র ও সময়

শিক্ষার ক্ষেত্র বলতে স্কুল, কলেজ, বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রভৃতিকে বোঝায়। বিদ্যায়তনগুলি শিক্ষার প্রধান ক্ষেত্র হলেও শিক্ষা শুধু সেইখানেই সীমাবদ্ধ হতে পারে না। গৃহ ও সামাজিক পরিবেশকেও শিক্ষালাভের স্থান হিসাবে ধরতে হবে, কারণ বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা লাভ করা হবে তার অনুশীলনের যথার্থ ক্ষেত্র ও পরিবেশ যদি গৃহে ও সমাজে না থাকে তাহলে শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য। বিদ্যালয়ে শিক্ষকবৃন্দ, বাড়ীতে অভিভাবকগণ, সমাজে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যদি শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ-রচনায় সচেষ্ট থাকেন তবে শিক্ষার ক্ষেত্রও শুচিসুন্দর হয়ে উঠবে।

যেখানে পারা যায়, বিদ্যায়তনগুলি যথাসম্ভব কোলাহলপূর্ণ ও চিত্তবিক্ষেপকর স্থান থেকে দূরে উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত হ'লে খুব ভাল হয়। প্রকৃতির গ্রন্থপাঠে যে শিক্ষা লাভ হয়, তার আর তুলনা নেই! শরীর ও মনের উপর প্রকৃতির প্রভাব যুগপৎ ক্রিয়াশীল।

শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে স্বামীজীর যে-সব বাণী তাঁর রচনা, পত্র এবং বক্তৃতাবলীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে, সেগুলি পাঠ করলে বোঝা যায় শুধু ছাত্রজীবনই শিক্ষালাভের সময় নয়, সমগ্র জীবনটিই শিক্ষালাভের সময়। প্রসিদ্ধ উক্তিও আছে 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।' অবশ্য ছাত্রজীবনই শিক্ষার মুখ্য এবং উপযুক্ত সময়। ছাত্রজীবন বলতে বোঝা যায় প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল পর্যন্ত। বাল্য, কৈশোর ও যৌবনে শরীর-মনের গঠন হ'তে থাকে, এই সময় যে ছাঁচে শরীর-মনকে তৈরি করা যায় সেইভাবে তারা রূপ নেয়। যারা ছাত্রজীবনের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করে, তাদেরই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়।

শিক্ষার স্তরভেদে শিক্ষানীতি

স্তরভেদে বয়সানুপাতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা অর্থাৎ মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান-পদ্ধতিতে পার্থক্য স্বাভাবিকভাবেই থাকবে। প্রাথমিক স্তরে শিশুশিক্ষার ভার অভিজ্ঞ শিক্ষিকাদের উপর

অর্পিত হ'লে ভাল হবে, তাঁরা সন্তানস্নেহে ও প্রয়োজনানুযায়ী শাসনে সযত্নে শিশুদের গড়ে তুলতে পারবেন।

স্বামীজীর মতে সমস্ত শিক্ষাস্তরেই মনঃসংযোগের উপর জোর দেওয়া উচিত এবং সেইরূপ পরিবেশও যাতে থাকে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। তাঁর মতে 'Concentration is the key to success.'—একাগ্রতাই সিদ্ধিলাভের চাবিকাঠি। এক বিষয়ে যদি মন ঠিক ঠিক একাগ্র করতে পারা যায়, তবে অন্য বিষয় যত কঠিনই হোক না কেন, তাতেও মনঃসংযোগ করা যাবে। শিক্ষানীতিতে যত বেশী একাগ্রতার দিকে লক্ষ্য রাখা যাবে ততই শিক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হবে। স্বামীজীর কথা To me the very essence of education is the concentration of mind, not the collection of facts. —আমার কাছে শিক্ষার সারকথাই হচ্ছে মনঃসংযোগ, তথ্যসংগ্রহ নয়।

মানুষের অন্তরে যে জ্ঞানভাণ্ডার রয়েছে, তাকে খুলতে সাহায্য করাই হ'ল শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য। একটি মালী যেমন বাগানে কতকগুলি চারা গাছ লাগিয়ে প্রত্যেকটি গাছের যত্ন নেয়, সার জল আলো ঠিকমত পাচ্ছে কিনা দেখে, ছাগল-গরুতে পোকামাকড়ে নষ্ট করছে কিনা লক্ষ্য রাখে, তেমনি প্রত্যেকটি বালক-বালিকার জীবন-বিকাশে সাহায্য করতে হবে এবং বিকাশের পথে অন্তরায়গুলি দূর করতে হবে। গাছ যেমন অন্তর্নিহিত শক্তিবলে যথাসময়ে ফলেফুলে সুশোভিত হয়ে ওঠে, তেমনি মানবশিশু উপযুক্ত শিক্ষা লাভ ক'রে মানবতার বিকাশে ভবিষ্যতে জ্ঞানে গুণে সকলের বরণীয় হবে—এই হচ্ছে স্বামীজীর কথা।

জীবন-গঠনের মূল রহস্য হ'ল শক্তির অপচয়-নিবারণ অর্থাৎ সর্ববিষয়ে সংযম। এই দিকে যত বেশি লক্ষ্য রাখা হবে ততই বিদ্যার্থীর মধ্যে শান্ত ও সংযত ভাব আসবে এবং মেধা বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান শিক্ষানীতিতে এই দিকটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় না, এই উপেক্ষার ফলস্বরূপ দেখা যায় উচ্ছৃঙ্খলতা।

নিয়মিত পরিমিত ব্যায়াম, স্বাস্থ্যচর্চা, মুক্ত বায়ুতে খেলাধুলা প্রভৃতির মাধ্যমে শরীরকে নীরোগ ও সবল রাখা প্রয়োজন। স্বামীজীর ভাষায়, চাই: 'Muscles of iron and nerves of steel.' —পেশীসমূহ লোহার মতো শক্ত এবং স্নায়ুগুলি ইস্পাতের মতো দৃঢ়। শরীরের যেমন পুষ্টিসাধন প্রয়োজন, তেমনি মনেরও। মনের স্বাভাবিক গতির প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষা দেওয়া দরকার।

জ্ঞানলাভের পারম্পর্য মোটামুটি এইভাবে বলা যেতে পারে: প্রথমে বস্তুবিশেষের উপর মনঃসংযোগ, ক্রমশঃ বস্তুর শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং সাধারণ সূত্রের আবিষ্কার। কৌতূহল জাগলে পর্যবেক্ষণের ইচ্ছা হবেই। আবার কৌতূহল এলে একাগ্রতা আসতে বাধ্য। একাগ্রতা দ্বারাই চিন্তার সার্থকতা।

মানসিক ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী শক্তি ও স্বাধীন চিন্তার সুযোগ এবং যথাযোগ্য ব্যবস্থা থাকা চাই। শিক্ষার প্রত্যেক বিভাগেই স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তার প্রচুর সুযোগ থাকা দরকার।

আমাদের মস্তিষ্কে কেবল কতকগুলি ভাব প্রবেশ করানো হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি কার্যে কিভাবে পরিণত করা যায়, তার কোন উপায় নির্ধারিত হয় না। স্মরণ রাখতে হবে, মনুষ্যজীবনে শিক্ষার আনন্দ—প্রয়োগে, সৃষ্টিতে, গবেষণায়, উদ্ভাবনে ও আবিষ্কারে। কাব্য সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান শিল্প ললিতকলা প্রভৃতি সর্ববিভাগেই একথা

প্রযোজ্য। অতএব উচ্চশিক্ষার সর্ববিভাগেই এই সমস্ত সুযোগ যদি পূর্ণমাত্রায় দিতে পারা যায়, তবে শিক্ষাজগতে স্বর্ণযুগ আসবে। এই দিকে মনোনিবেশ ক'রে ভারতের বর্তমান শিক্ষানীতি সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন।

ছেলেদের মতো মেয়েদেরও প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। সকলেই জানেন স্বামীজী স্ত্রীশিক্ষার উপর খুব জোর দিয়েছেন।

শিক্ষক ও ছাত্র

একদিকে শিক্ষক, অপর দিকে ছাত্র, মধ্যে বিদ্যা। বিদ্যা হচ্ছে ছাত্র ও শিক্ষকের মিলন-সেতু। প্রাচীন কালে আচার্য ও শিক্ষক প্রার্থনা করতেন তাঁদের অধীত বিদ্যা যেন ফলপ্রসূ হয়, তাঁদের মধ্যে যেন বিদ্বেষভাব না থাকে, তাঁরা যেন বিদ্যার ফল সমভাবে ভোগ করেন। বর্তমানে আবার শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সেই প্রাচীন আদর্শ স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে স্নেহের সম্পর্ক কমই দেখা যায়। শিক্ষককে কেমন হ'তে হবে আর ছাত্রেরই বা জীবনচর্যা কেমন হবে সে-সম্বন্ধে স্বামীজীর অনেক কথা আছে। তিনি বলেছেন, 'শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই কতকগুলি বাধ্যতামূলক নীতি পালন করা প্রয়োজন। চিন্তায় বাক্যে ও কর্মে পবিত্রতা একান্ত আবশ্যক। ছাত্রের পক্ষে প্রকৃত জ্ঞানতৃষ্ণা এবং অধ্যবসায়ের অনুশীলন প্রয়োজন।' যদি শিক্ষক আদর্শচরিত্র হন তবে তাঁর উপদেশে কাজ হবেই। শিক্ষক সত্যাশ্রয়ী হ'লে ছাত্রেরও সত্যের প্রতি অনুরাগ আসবে। শিক্ষক যদি শ্রদ্ধাবান হন, তবে ছাত্রও হবে শ্রদ্ধাবান, ছাত্রেরও আত্মবিশ্বাস জাগবে। বলা বাহুল্য, শিক্ষকগণকে যাতে অন্নচিন্তায় বিব্রত না হ'তে হয়, তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে জ্ঞানানুশীলন ও জ্ঞানদানে ব্রতী থাকতে পারেন, তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

'ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ'। যে ছাত্র মন দিয়ে অধ্যয়ন করে তার তপস্যার ফল সে লাভ ক'রে থাকে এখনও। বর্তমানে ছাত্রজীবনে রাজনীতি যেন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে! রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগদানের আগে লেখাপড়া শেষ করা সবচেয়ে ভাল। ছাত্র-জীবন হ'ল জীবনের প্রস্তুতির সময়। রাজনীতির বিভিন্ন মতবাদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন না ক'রে কোন মতবাদে সক্রিয় অংশগ্রহণও বাঞ্ছনীয় নয়। স্কুল-কলেজগুলি যাতে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার পবিত্র স্থান হয় এবং রাজনীতির কবলমুক্ত থাকে, সেই দিকে শিক্ষক ছাত্র জননায়ক সকলেরই দৃষ্টি দিতে হবে। বর্তমানে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রসংখ্যাও বাড়ছে। বিরাট ছাত্রসমাজকে নিয়ন্ত্রিত করতে হ'লে বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার। দরিদ্র ছাত্রগণ যাতে উপযুক্ত পুষ্টিকর আহার পায়, তাদের পাঠ্যপুস্তকের অভাব না হয়—এ সবও দেখতে হবে রাষ্ট্রকে। পাঠ্য বিষয় অনর্থক ভারাক্রান্ত না ক'রে অল্প বিষয়ও যদি খুব ভালভাবে শেখানো যায় তাতেই সুফল হবে। প্রতি বৎসর যত কম পুস্তক পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হয় ততই ভাল।

জনশিক্ষা

প্রতিটি মানুষ একদিকে নিজের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হবে, সঙ্গে সঙ্গে তার চারপাশে যে অগণিত জনসাধারণ রয়েছে তাদেরও যাতে শরীর-মনের প্রকৃত উন্নতি হয় তার জন্য সমভাবে যত্নশীল হ'লে তবেই হবে প্রকৃত কল্যাণ। স্বামীজী

বলেছেন, 'Be and make.'—নিজে ভাল হও এবং অপরকে ভাল হবার পথে সাহায্য কর। এই মহাবাণী প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবশ্য-পালনীয়। ভারতে এখনও ৩৪ কোটি ৯০ লক্ষ লোক নিরক্ষর! কী ভয়াবহ অবস্থা! প্রত্যেকে যদি প্রতিজ্ঞা করেন—জীবনে অন্ততঃ দু-চার জনেরও নিরক্ষরতা দূর করব, তাহলেই অনেক কাজ হবে। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পর ছুটি থাকে, সেই অবকাশের সময় ছাত্রগণ গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিরক্ষরতা-দূরীকরণের কাজে লাগলে অদূর ভবিষ্যতে দেশ থেকে সহজেই নিরক্ষরতা নির্বাসিত হতে পারে। শিক্ষিত-অশিক্ষিতদের মধ্যে যে কৃত্রিম অচলায়তন ব্যবধানের সৃষ্টি হয়ে রয়েছে, গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে তার বন্ধন শিথিল হবে। ডাক্তারী ও ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী-লাভের পর কিছুদিন গ্রামে গ্রামে সেবার কাজ করা যেতে পারে; গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য ভাল রাখার উপায় ব'লে দেওয়া, তাদের ঘরবাড়ী কিভাবে ভাল করা যায় ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কিছু করার আছে। একথা স্মরণে থাকা দরকার যে, আমিই কেবল বড় হব বিদ্যায় স্বাস্থ্যে অর্থে সম্পদে, আর অন্যেরা বঞ্চিত থাকবে—এরূপ বুদ্ধি স্বার্থপরতারই নামান্তর এবং তা উৎকট আকার ধারণ করলে মারাত্মকও। স্বামীজী বলেছেন, বিদ্যা অর্থ যা তোমার আছে অপরের কল্যাণে তা দিতে পারলেই তার সার্থকতা। গ্রামে গ্রামে ম্যাজিক ল্যানটার্ন নিয়ে অবসর-সময়ে শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্রগণ গ্রামবাসীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন সাধারণভাবে; তাদের জানাবেন—ভারতের ইতিহাস, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতি, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ ও জৈন মহাপুরুষগণের জীবনচরিত, বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান, কায়িক শ্রমের মূল্যবোধ প্রভৃতি বিষয়; তবেই একদিকে তাঁরা পাবেন জীবনের একঘেয়েমির মধ্যে আনন্দ, অপরদিকে তাঁদের অভিজ্ঞতাও বাড়বে প্রচুর এবং জনসাধারণেরও সেবা হবে প্রকৃত।

বিশেষ চিন্তনীয় কয়েকটি বিষয়

বর্তমানে মানুষের মনে সিনেমা-শিল্পের প্রভাব অস্বাভাবিক। একে যদি জনশিক্ষার কাজে লাগানো যায় তার ফল হবে খুবই ভাল। স্বামীজী ম্যাজিক ল্যানটার্নকে কাজে লাগাতে বলেছেন। এখন সিনেমার প্রসার ও প্রচার সর্বাধিক। বিজ্ঞান-শিক্ষায় ও অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ে যদি সিনেমাকে ঠিক ঠিক কাজে লাগানো যায় তবে অনেক কঠিন বিষয়ও সহজে শিক্ষা দেওয়া যাবে। মানুষের মধ্যে সুবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি দুই-ই আছে, শিক্ষার লক্ষ্য থাকবে সুবৃত্তিগুলিকে জাগানোর দিকে। আমাদের চোখ যদি ভাল জিনিস দেখতে অভ্যস্ত হয়, কান যদি ভাল জিনিস শুনতে অভ্যস্ত হয়, তবে অশোভন ও অরুচিকর বস্তুর দিকে তারা আকৃষ্ট হবে না। ভালোর পরিবর্তে মন্দ জিনিস পরিবেশিত হ'লে তার প্রতিই আকর্ষণ ও আগ্রহ বাড়বে, কারণ মানুষ অভ্যাসের দাস। এইদিকে দৃষ্টি রেখে ফিল্ম তৈরি করতে পারলে ক্রমে তার চাহিদাও বাড়বে। আর শুধু অর্থাগমই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়।

শুধু সিনেমা নয়, পত্র-পত্রিকায় এমন সব লেখা থাকা উচিত যার দ্বারা বাস্তবিকই মন ভাল দিকে যায়, বিজ্ঞাপনের ছবিগুলিও যাতে সুরুচির পরিচায়ক হয় সে-সম্বন্ধে চিন্তা করারও প্রয়োজন রয়েছে। সংস্কৃত-শিক্ষার মাধ্যমে নীতিবোধ ধর্মপরায়ণতা ও শ্রদ্ধার ভাব রক্ষিত হয় কিনা, তাও ভেবে দেখতে হবে এবং সংস্কৃতকে অবশ্যশিক্ষণীয় করতে হবে। সংস্কৃতের

মধ্যে এমন জিনিস আছে, যা আমাদের সমাজ-জীবনকে ধরে রেখেছে; সংস্কৃতকে বর্জন করলে সমাজ-জীবনও বিপর্যস্ত হবে। সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য করলে ভারতের সংস্কৃতি রক্ষা পাবে। যদি চারদিকে উচ্ছৃঙ্খলতার খোরাক জোগানো হ'তে থাকে তবে তার ফল বিষময় হবেই।

স্বামীজী বলেছেন, ভারতের সনাতন আদর্শ—ত্যাগ ও সেবা। বাল্যকাল থেকেই তার অনুশীলন প্রয়োজন। যে ছেলেমেয়েরা বাড়ীতে নিজেদের খাবার অন্যের সঙ্গে ভাগ ক'রে খায়, নিজেদের জিনিসপত্র অপরের প্রয়োজনে দিতে পারে, অর্থাৎ যাদের ত্যাগ ও সেবার ভাব আছে অথচ স্বার্থপরতা নেই, তাদেরই প্রতি সকলের স্নেহ-ভালবাসা বেশী দেখা যায়। কর্ম-জীবনেরও সর্বক্ষেত্রে দেখা যায় ত্যাগ ও সেবার প্রভাব, তাই ত্যাগী এবং সেবাপরায়ণ ব্যক্তি সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। ছোটবেলা থেকেই যাতে এই ভাব ছেলেমেয়েদের মধ্যে বৃদ্ধি পায়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

মাধ্যমিক স্কুলের পড়াশুনা শেষ করার পূর্বে অন্ততঃ ছমাসের জন্য ছাত্রদের সামরিক শিক্ষা দেওয়া দরকার।

জাপান থেকে জাপানীদের সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে প্রশংসা ক'রে স্বামীজী চিঠি লিখেছেন। জাপানীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখবার জিনিস, তাদের রাস্তাঘাট শহর গ্রাম—সব পরিচ্ছন্ন, ছবির মতো সুন্দর, একথা অনেকেই ব'লে থাকেন। লক্ষণীয় যে, ভারতে মন্দিরের ভেতর পরিষ্কার রাখতে চেষ্টা করা হয় কিন্তু মন্দিরের চারদিকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে রাখা হয়। এই সব বলবার উদ্দেশ্য—স্বামীজীর মতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও শিক্ষার একটি বড় অঙ্গ ব'লে বিবেচিত হওয়া উচিত। দেখা যায়, রাস্তার মোড়ে মোড়ে স্তূপীকৃত জঞ্জাল, পথঘাট সব অপরিচ্ছন্ন—যেন নরককুণ্ড ও রোগবিস্তারের ক্ষেত্র ক'রে রাখা হচ্ছে! মানুষের civic sense যেন বিলুপ্ত হ'তে চলেছে! সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগ, করপোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি থেকে বয়স্ক অল্পবয়স্ক সব নাগরিককে অবশ্য-পালনীয় স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নির্দেশসূচক পুস্তিকা দিতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে বিধিগুলি যেন সযত্নে পালিত হয়।

মানুষ শিক্ষিত হ'ল কিনা বোঝা যাবে তার কার্যকলাপের মাধ্যমে। 'ফলেন পরিচীয়তে।' ফলেই বৃক্ষের পরিচয়—সুবৃক্ষ না কুবৃক্ষ। শিক্ষা লাভ করার পর কেমন মানুষ হ'ল বোঝা যাবে তার আচরণের দ্বারা, সে সুশিক্ষা লাভ করেছে না কুশিক্ষা পেয়েছে। তার আচার-আচরণে শালীনতা, রুচিবোধ, সৌন্দর্য-জ্ঞান, সংযত-জীবনচর্যা, শ্রদ্ধা প্রভৃতির মাধ্যমে পরিস্ফুট হবে সুশিক্ষা; কুশিক্ষা দ্বারাও তেমনি এর বিপরীত ভাবগুলি চরিত্রের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠবে।

ভারতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় বিদেশের খারাপ জিনিসগুলি অনুকরণ করা হয়েছে। স্বামীজী বলেছেন—নিয়মানুবর্তিতা, কর্মশীলতা, উদ্যম, ঐক্য, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণ পাশ্চাত্যবাসীদের উন্নতির মূলে। ভারত-বাসী মাত্রেরই এগুলির অনুশীলন প্রয়োজন আজ সর্বাধিক।

উপসংহার

আজ যারা ছাত্র তারাই হবে ভবিষ্যৎ নাগরিক, তাদেরই উপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তাদের জীবনে অনেক দায়িত্ব আসবে, তারা যদি সে-সব দায়িত্ব বহনের যোগ্য না হয় তবে উন্নতি ব্যাহত হবে নিঃসন্দেহ।

স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ-রূপায়ণের মূল কথা হ'ল প্রাচীন আদর্শকে পুরোপুরি মর্যাদা দিয়ে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত নব নব পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে

যুগোপযোগী ক'রে শিক্ষার সংস্কার করা। বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে শিক্ষিতব্য বিষয় পরিবেশিত হলে একঘেয়েমি দূর হবে এবং শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে। এর জন্য চাই প্রচুর অভিজ্ঞতা এবং প্রকৃত আন্তরিকতা।

বর্তমানে ছাত্রসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য সকলেই চিন্তান্বিত, এর প্রশমন সকলের সমবেত প্রচেষ্টাতেই সম্ভব। স্বামীজীর বলিষ্ঠ চিন্তাধারার সঙ্গে তরুণদের পরিচয় ঘটাতে পারলে তাদের মনে ভারতীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জাগবে এবং তারা ভুল পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হবে। আর কালক্ষেপ না ক'রে স্কুল-কলেজে এবং বাড়ীতেও স্বামীজীর গ্রন্থাবলী-পঠন-পাঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ-অবলম্বনে বাংলা তথা ভারতের সর্বত্র বিদ্যায়তন গড়ে তুলতে হবে—প্রাথমিক স্তর থেকে মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত। ব্যাপকভাবে শিক্ষায়তন-পরিচালনা যেমন দেশের উন্নতির জন্য, দেশবাসীকে সাক্ষর করবার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন, তেমনি কতকগুলি আদর্শ ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস এবং বিদ্যায়তন প্রভৃতিও রাখতে হবে। এই আদর্শ বিদ্যায়তন ও ছাত্রাবাসগুলির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সমগ্র দেশের বিদ্যায়তন ও ছাত্রাবাসসমূহ পরিচালনা করতে হবে, যখন কোন সমস্যার উদ্ভব হবে তখন এই আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকেই তার সমাধান মিলবে। আদর্শ প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে লক্ষ্যের দিকে ঠিকমত অগ্রসর হতে পারে সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

"ভারতে এমন কোন সমস্যা নাই, শিক্ষার যাদুকাঠির স্পর্শে যাহার সমাধান হয় না।"

"উপায় শিক্ষার প্রচার। প্রথম আত্মবিদ্যা—ঐকথা বললেই যে জটাজুট, দণ্ড, কমণ্ডলু ও গিরিগুহা মনে আসে, আমার বক্তব্য তা নয়। তবে কি? যে জ্ঞানে ভববন্ধন হতে মুক্তি পর্যন্ত পাওয়া যায়, তাতে আর সামান্য বৈষয়িক উন্নতি হয় না? অবশ্যই হয়। মুক্তি, বৈরাগ্য, ত্যাগ, এ সকল তো মহাশ্রেষ্ঠ আদর্শ; কিন্তু 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।' এই আত্মবিদ্যার সামান্য অনুষ্ঠানেও মানুষ মহা ভয়ের হাত হইতে বাঁচিয়া যায়। মানুষের অন্তরে যে শক্তি রহিয়াছে তাহা উদ্বুদ্ধ হইলে মানুষ অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইতে শুরু করিয়া সব কিছুই অনায়াসে করিতে পারে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

বিদেশে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীমতী বনবালা মুখোপাধ্যায়

প্রতীচ্যে যুগদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব কতদূর প্রসারিত তা দেখবার সুযোগ করিয়ে দিয়ে বেলুড় মঠের স্বামী অভয়ানন্দ মহারাজ আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। শুধুমাত্র আমেরিকায় নয়, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যুগাবতারের মন্দিরগুলি দর্শনের ব্যবস্থাও তিনি করিয়ে দিয়েছেন।

৬ই অগস্ট, ১৯৬৭ সাল। কলকাতা থেকে আমার স্বামী শ্রীমোহনকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রওনা হলাম। অনেকবার আমাদের বিদেশে যেতে হয়েছে, তবে এবারে আমাদের আকর্ষণ শুধু বিদেশ ভ্রমণ নয়—তীর্থযাত্রীর মন নিয়েই আমরা বেরিয়েছি। দমদম বিমানঘাঁটি থেকে প্লেনে কলকাতা ছেড়ে আমরা মাত্র কয়েক দিনের জন্য ব্যাংকক্, হংকং, টোকিও ও হনুলুলু ছুঁয়ে সানফ্রান্সিস্কোতে পৌঁছলাম।

সানফ্রান্সিস্কোতে পৌঁছেই হোটেল থেকে টেলিফোনে যোগাযোগ ক'রে পরিচয়পত্রটি সঙ্গে নিয়ে বেদান্ত আশ্রমের দিকে যাত্রা করলাম। অতি সুন্দর সাজানো শহর সানফ্রান্সিস্কো। মনোরম একটি বাড়ীর দরজার সামনে আমরা কলিং বেল্ বাজালাম। একজন বিদেশী দরজা খুলে আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে খবর দিলেন। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী অসুস্থতার জন্য কারো সঙ্গে দেখা করেন না। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মহারাজই স্বাগত জানালেন আমাদের। আমরা আশ্রমের মন্দির দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্রই স্বামী শ্রদ্ধানন্দ আশ্রমের গাড়ী ক'রে জনৈক আমেরিকান সন্ন্যাসীকে দিয়ে পাঠালেন মন্দির দর্শনের জন্য। মন্দিরে প্রায় আট নয় জন সন্ন্যাসিনী থাকেন। এঁদের মধ্যে যিনি বয়স্কা (আমেরিকান মহিলা) তিনি সাগ্রহে আমাদের সব দেখালেন। ওখানেও মন্দিরের মধ্যে জুতো খুলে প্রবেশ করতে হয়। মন্দিরের ভেতর ঢুকে ঠাকুর দর্শন ক'রে এই কথা ভেবে মনে মনে গর্বে আনন্দে আপ্লুত হলাম যে, কামারপুকুর পল্লীর এক দরিদ্র, প্রায়-নিরক্ষর ব্রাহ্মণসন্তান কিভাবে সারা বিশ্বে বিরাজ করছেন—শুধু মন্দিরে নয়, বহু জনের হৃদয়মন্দিরেও। বেদীর মাঝখানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁর একদিকে শ্রীশ্রীমা ও অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দ; দুধারে যীশুখৃষ্ট এবং ভগবান বুদ্ধের মূর্তি স্থাপিত।

মন্দির-সংলগ্ন বাগানটি সন্ন্যাসিনীদের হাতে তৈরী। ঠাকুরের ভোগও রান্না করেন তাঁরাই। আমাদের দেশের আশ্রমজীবন থেকে ওদেশের আশ্রমজীবনের কোনও পার্থক্য চোখে পড়ল না। যত দেখছি তত অভিভূত হয়ে পড়ছি।

সানফ্রান্সিস্কো থেকে আমরা শিকাগো রওনা হলাম। যেখানে দাঁড়িয়ে স্বামীজী ঠাকুরের বাণী প্রচার করেছিলেন, সেই পবিত্র স্থানটি না দেখা পর্যন্ত যেন আমাদের তীর্থযাত্রা পূর্ণ হচ্ছে না। সন্ধ্যায় শিকাগোর হোটেলে পৌঁছেই আশ্রমে টেলিফোন করলাম। স্বামী ভাষ্যানন্দের সঙ্গে কথাবার্তা হ'ল। তিনি তখন সদ্য ভারতবর্ষ থেকে ফিরে এসেছেন। বেলুড় মঠে তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল।

আমেরিকার বাণিজ্যকেন্দ্র শিকাগো এক মস্ত শহর। বিরাট বিরাট বাড়ী, রাস্তাও খুব চওড়া। শিকাগো শহরটি হ্রদ-পরিবেষ্টিত।

রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে কখন যে আকাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছে গিয়েছি খেয়াল ছিল না। হঠাৎ চোখে পড়লো—'বিবেকানন্দ বেদান্ত আশ্রম'। দরজার বেল্ বাজাতেই অনেক আমেরিকান যুবক এসে অভ্যর্থনা ক'রে আমাদের আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন, স্বামীজীকে খবর দিলেন। স্বামী ভাষ্যানন্দের সঙ্গে আমাদের দেখা হ'ল। তাঁকে তখন বড় পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছিলো, কেননা তিনি মাত্র আগের দিনই ভারতবর্ষ থেকে ফিরে এসেছেন। অনেক কথা হ'ল তাঁর সঙ্গে। কথার ফাঁকে তিনি আমাদের ওখানে আহারের নিমন্ত্রণ জানালেন। চারজন আমেরিকান ব্রহ্মচারীর সঙ্গে পরিচয় হ'ল। এই চারজন কুমার কিশোরদের দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়। যাঁর আকর্ষণে এঁরা এই অল্প বয়সে বিলাসোন্মত্ত, প্রলোভনে ভরা দেশে সংসারধর্ম ত্যাগ ক'রে বেদান্ত আশ্রমের শান্তি-নিলয়ে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁর মহিমার কথা মনকে আচ্ছন্ন ক'রে দিল।

স্বামী ভাষ্যানন্দের সঙ্গে আশ্রম ঘুরে ঘুরে দেখলাম। পূজার ঘরে ঢুকেই চমকে উঠলাম। বহুপরিচিত ধূপধুনার গন্ধ সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পার থেকে দক্ষিণেশ্বর-বেলুড় মঠের স্মৃতিকে ডেকে আনলো যেন। চেতনার ওপর আচ্ছন্নতা নেমে এলো—শ্রদ্ধা, বিস্ময় আর আনন্দের আচ্ছন্নতা। মনে পড়লো শ্রীরামকৃষ্ণেরই সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ তাঁরই বাণী প্রচারের জন্য এসে একদিন স্থূলদেহে ঘুরে বেড়িয়েছেন এই শহরে, তাঁর পদধূলি মেখে শিকাগো শহর ধন্য হয়েছে। পরের দিন আশ্রমের অপর একটি বাড়ী দেখার এবং আশ্রমে প্রসাদ পাওয়ার জন্য স্বামী ভাষ্যানন্দ মহারাজ আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন, আমরাও তা সানন্দে গ্রহণ করলাম।

পরদিন দুপুরের একটু পরেই রওনা হয়ে গেলাম। মহারাজের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর নির্দেশমত শিকাগো দেখতে গেলাম। অনেক আমেরিকান আশ্রমবাসী গাড়ী চালিয়ে আমাদের শিকাগো শহর দেখালেন। অনেকক্ষণ ঘোরার পর রেস্টুরেণ্টে চা-পানের জন্য থামলাম। কথায় কথায় আমরা আমেরিকান আশ্রমবাসীটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি আশ্রমবাসী হলেন কেন। তিনি জানালেন যে, তিনি পূর্বে নিউইয়র্কে কাজ করতেন। সেখানে দুচারবার আশ্রমের মহারাজের বক্তৃতা শুনে এবং স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়ে তাঁর মনে হলো, 'আমি যেন এই জিনিসটাই খুঁজছি! চাকরি আর ভাল লাগল না। সারাক্ষণ অন্যমনস্ক উদাস হয়ে থাকতাম, কি যেন খুঁজে বেড়াতাম!' যে দেশ পার্থিব সুখ ও ঐশ্বর্যের চরমে উঠেছে, তাই নিয়েই ব্যস্ত রয়েছে, সেই আমেরিকার মতো জায়গায় এধরনের ভাবান্তর বিস্ময়জনক মনে হ'ল। তিনি এখনও অনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচর্য দীক্ষা পাননি, তবে আশ্রমে ব্রহ্মচারীর মতো থাকেন। আর একটি কথা ভেবে তৃপ্তি পেলাম যে, বিদেশে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারের ফলে কত সন্তপ্ত হৃদয়ই না অমৃতধামের পথের সন্ধান পেতে পারছে!

হোটেল থেকে বেরিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম যে বাড়ীতে ছিলেন এবং যে পার্কের পাশে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছিলেন তা দেখলাম। সেখান থেকে একটি বাড়ীতে গেলাম যেখানে উপনিষদ্ এবং বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। সেখানে গিয়ে দেখলাম মাটিতে আসনের মতো ছোট ছোট গদি পাতা। তার ওপর বসে ওদেশের আধ্যাত্মিকতা-পিপাসুরা ধ্যান করেন। হলের মধ্যে ঠাকুরের একটি রঙিন পট স্থাপিত, ফুল দিয়ে খুব সুন্দরভাবে সাজানো। অতি

শান্ত পরিবেশ।

সেখান থেকে আশ্রমে ফিরে আমরা রাত্রের খাওয়া সমাধা করি; আয়োজন ও ব্যবস্থা খুবই সুন্দর। আমরা বড়ই আনন্দ পেলাম ব্রহ্মচারী-দের সুন্দর ব্যবহার ও যত্ন দেখে। তাঁদের শান্ত স্বভাব এবং মহারাজের সঙ্গে ব্যবহার খুব মধুর মনে হ'ল। ব্রহ্মচারীরাই ঠাকুরের আরতি, ঠাকুরকে সাজানো, ভোগ দেওয়া প্রভৃতি সবই করেন গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে।

আশ্রম থেকে রাত্রে আমাদের গাড়ী ক'রে পৌঁছে দিয়ে গেলেন একজন ব্রহ্মচারী। পরের দিন আমরা স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা দেওয়ার হলটি দেখতে গিয়েছিলাম। ১৮৯৩ সালে যে হলে ধর্মমহাসভার অধিবেশন হয়েছিল, সেটি এখন আর্ট ইনষ্টিট্যুটের অন্তর্ভুক্ত। ইনষ্টিট্যুটের পরিচালকগণের কাছে হলটির কোন গুরুত্ব নেই। তাই আমরা যখন সেখানে গিয়ে তত্ত্বাবধায়ককে হলটি খুলে দেবার জন্যে অনুরোধ করলাম, তখন সেই বৃদ্ধা মহিলা খানিকটা অবাক হয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, ভারতীয়রা কেন এই হলটি দেখতে চায়। তখন আমরা বুঝিয়ে দিলাম যে, ভারতবর্ষের একজন মহান সাধু এই হলে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা দিয়ে বিদেশীর চোখে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে পূর্ণ গৌরবে তুলে ধরেছিলেন। হলটির মধ্যে ঢুকে আমরা খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম যে, এইখানেই একদিন স্বামীজীর জলদগম্ভীর কণ্ঠে ওজস্বিনী ভাষা ধ্বনিত হয়েছিল, ধর্মের বিশ্বজনীনতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ঘোষিত হয়েছিল।

শিকাগোতে শুনে এলাম, স্বামী ভাষ্যানন্দ প্রায় ৪০ একর জমির ব্যবস্থা করেছেন এবং সেখানে মঠ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন। আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের যে-সব সাধুরা আছেন, তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের ফলেই শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বাণী ধীরে ধীরে আমেরিকাবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে কি বোঝায়, এঁদের কাছ থেকেই তার সঠিক পরিচয় তাঁরা পাচ্ছেন। দেশে ফিরে এসে আমরা চেষ্টা করছি, যদি শিকাগোর হলে স্বামী বিবেকানন্দের কোন প্রতিকৃতি বা চিহ্ন রাখা যায়।

শিকাগো থেকে কানাডার মন্ট্রিয়ল্ শহরে গেলাম, তখন সেখানে Expo '67 হচ্ছিল, তাই শহরে খুব ভীড়। আমরা তিনদিন ওখানে ছিলাম এবং প্রায় সব সময়ই 'এক্সপো'-৬৭টির মধ্যে কাটাতাম। 'Expo' একটি বিরাট ব্যাপার, এক মাস দেখেও শেষ করা যায় না। সারা পৃথিবীর প্রায় সব দেশই নিজের নিজের দেশের উন্নতি তুলে ধরেছে ভিন্ন ভিন্ন প্যাভিলিয়নে; বিজ্ঞানের উন্নতি দেখে মানুষ যে আজ জ্ঞানের পথে কত এগিয়ে গিয়েছে তা বেশ উপলব্ধি করা যায়। আমেরিকার ও রাশিয়ার প্যাভিলিয়নে বিশেষ দ্রষ্টব্য ছিল 'Space Craft' (মহাকাশযান), যেগুলি পৃথিবীর বাইরে পরিক্রমা ক'রে ফিরে এসেছে। ভারতবর্ষের প্যাভেলিয়নটিও বেশ সুন্দর। ভারতীয় শিল্পের উন্নতির পরিচয় এখানে গেলে পাওয়া যায়। ভারতীয় খাদ্যের চাহিদাও এখানে প্রচণ্ড।

কানাডা থেকে রওনা হয়ে নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে ক'দিন থেকে আমরা লণ্ডনে গেলাম। নিউইয়র্কে রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ মহারাজের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তিনি বাইরে থাকার জন্যে তাঁর সঙ্গে আলাপ করার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।

লণ্ডনে এসে আমরা মিশনের দুটি শাখাতেই গিয়েছিলাম। 'হল্যাণ্ড পার্ক'-এর স্বামী পরহিতানন্দ ও Muswell Hill-এর স্বামী ঘনানন্দের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা খুব আনন্দ পেয়েছি। এখানকার বাগানে নানারকম ফুল ও ফলের গাছ আছে এবং সবই ব্রহ্মচারিণীদের তত্ত্বাবধানে তৈরী।

লণ্ডনে কয়েক দিন থেকে প্যারিসে গেলাম এবং সেখানেও শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। প্যারিস থেকে জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড ও ইটালী হয়ে আমরা দেশে ফিরে আসি।

সুদূর বিদেশের এই সব কেন্দ্ররূপ উৎসগুলি থেকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা অবিরাম নিঃসৃত হচ্ছে। কত তৃষ্ণার্ত এসে সে স্নিগ্ধ সলিল পান ক'রে তৃপ্ত হচ্ছে, ধন্য হচ্ছে! আজ তাঁদের সংখ্যা হয়তো তুলনায় খুবই কম। কিন্তু একদিন তা অগণিত হবেই, একদিন এই ভাবধারা বিপুল প্লাবনে জগৎ ভাসিয়ে দেবেই। সারা পৃথিবীর মানুষ সেদিন নির্ভুল পদক্ষেপে অগ্রসর হবে এক পরম শান্তির, পরম মিলনের দিকে।

স্বামীজী

ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

তোমার সম্ভব আজ প্রয়োজন ক্ষয়িষ্ণু এ কালে।
স্বামীজী! আজকে দেশে পুঞ্জীভূত সত্যের বিকার।
মহাকার্যসম্পাদনে আজ শুধু চালাকিই সার
স্বার্থভরা দিনবৃত্তে। সৌম্য মুখোশের অন্তরালে
কামনায় পিঙ্গল দুচোখ। অদৃশ্য বাসনাজালে
চেতনার বন্দিত্ব অটুট। আত্মঘাতী মিথ্যাচার
সংশয়ী জীবনে ব্যাপ্ত। ঘোরতর তামসিকতার
মোহাবেশে নিদ্রাগত দেশ। হিংসা মারী বিষ ঢালে॥

হে বীর সন্ন্যাসী! এই আত্মভ্রষ্ট বীর্যহীন দেশে
তোমার সম্ভব হোক ভাবদেহে। পৌরুষ-সাধনা,
সেবার মহৎ চর্যা জীবরূপে শিব-আরাধনা
ত্যাগব্রত সুপ্রতিষ্ঠ হোক। গাঢ় আলস্য আবেশে
আজকে যে জাতি মগ্ন, শক্তিলভ্য সত্যের উদ্দেশে
তার উজ্জীবন হোক। স্ফূর্ত হোক শাশ্বতী প্রেরণা॥

স্থাপকায় চ ধর্মস্য

স্বামী অমৃতত্বানন্দ

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

ধর্মের সংস্থাপক, সকলধর্মস্বরূপ, অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, হে রামকৃষ্ণ, তোমাকে প্রণাম করি।

প্রণাম-মন্ত্রটির রচয়িতা স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু যুগক্রান্তির কী বিচিত্র বৈপরীত্যের প্রহসন! যে-যুগে হিন্দুধর্ম নিন্দিত, মূর্তি-পূজা ঘৃণিত, গুরুবাদ পরিত্যক্ত, অবতারবাদ অবহেলিত হ'ল, সে-যুগেই সে-নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র কলকাতার উপকণ্ঠে হিন্দুধর্মের সারস্বরূপ, মূর্তিপূজক, গুরুবাদ-অবতারবাদে বিশ্বাসী, নিরক্ষরপ্রায়, দরিদ্র ব্রাহ্মণের পাদপদ্মে অর্পিত হ'ল অমানব ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ প্রণামমন্ত্র।

যুগপ্রয়োজনে ধর্মরক্ষার জন্য ঈশ্বরের অবতার হওয়া শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ও ইতিহাসসিদ্ধ ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার। কিন্তু বরিষ্ঠ কেন? এ কি কেবল নিজ গুরুর প্রতি অতিমান-আরোপ? না। স্বামীজীর ভাষাতেই বলছি: তোমরা যত মহাপুরুষ দেখেছ, স্পষ্ট করেই বলছি যত মহাপুরুষের জীবনচরিত পাঠ করেছ, তন্মধ্যে ইঁহার জীবন পবিত্রতম।[১]...

অহো, জগতের কোন দেশে সার্বভৌম ধর্ম এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের প্রসঙ্গ আলোচিত হবার অনেক পূর্বেই এই নগরীর সন্নিকটে এমন এক ব্যক্তি বাস করতেন, যাঁর সমস্ত জীবনটাই একটি ধর্মমহাসভা-স্বরূপ ছিল।[২]

ভ্রান্ত মানুষকে পথ দেখাতে যুগ-প্রভাবে মানব-মনীষার বিকাশ অনুযায়ী ভাবধারার প্রচার করেন অবতারপুরুষ। তাই বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবধারার প্রতি জোর দেওয়া হয়। বস্তুতপক্ষে ঈশ্বর সর্বভাবময়। তথাপি ভাববিশেষের প্রচারে ভাববিশেষের মূর্ত বিগ্রহ হওয়া তাঁর সীমা নির্দেশ করা। এ-কারণে, বর্তমান আবির্ভাব সর্বভাবময় হওয়ায় তাঁকে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশ বলা যায়।

আবার সর্বপ্রকার ভাবধারার আপাতবৈচিত্র্যের মধ্যেও যিনি স্বীয় স্বকীয়তা ঠিক রাখতে পারেন, তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর বই অপর কেহ নন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রে আমরা এই বহুধা বৈপরীত্যের সমাবেশ দেখে বিস্মিত হই। তাই তিনি অবতারবরিষ্ঠ।

স্বামীজী লিখেছেন: এই নবোত্থানে নব বলে বলীয়ান মানবসন্তান বিখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যা সমষ্টীকৃত করিয়া ধারণা ও অভ্যাস করিতে সমর্থ হইবে এবং লুপ্ত বিদ্যারও পুনরাবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে; ইহার প্রথম নিদর্শনস্বরূপ শ্রীভগবান পরম কারুণিক, সর্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্বভাবসমন্বিত, সর্ববিদ্যাসহায় যুগাবতাররূপ প্রকাশ করিলেন।[৩]

অবতার স্বয়ং নিজ পরিচয় ব্যক্ত করে যান। নতুবা তাঁকে ধরা বোঝা জীবের সাধ্য নেই। তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন: সেদিন দেখলাম, আমার ভিতর থেকে সচ্চিদানন্দ বাইরে এসে রূপধারণ করে বললে, আমিই যুগে যুগে অবতার। দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব, তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।

---

১ বাণী ও রচনা, ৫ম, ২১২ পৃঃ
২ ঐ ঐ ২১১ পৃঃ
৩ ঐ ৬ষ্ঠ ৬ পৃঃ

কাশীপুরে নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন: যে রাম, যে কৃষ্ণ, ইদানীং সে-ই রামকৃষ্ণরূপে ভক্তের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

ঈশ্বর অবতীর্ণ হয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণশরীরে, তাই তিনি সর্বধর্মস্বরূপ। সর্বধর্ম কেন? তিনি একটি মত বা ধর্মের কথাই বলেননি—বলেছেন সকল ধর্মমতের সত্যতার কথা। সব মতই পথ। বলেছেন: সাকার নিরাকার দুই-ই সত্য। পুকুরের জলের উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন—জল এক, দেশভেদে নামভেদ মাত্র। সত্তা এক। বোঝালেন দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত জীবের আত্মিক বিকাশের মাত্রাভেদে সত্য। শেষে এক—অদ্বৈত।

'যখন তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, তখন তাঁকে সগুণ ব্রহ্ম আদ্যাশক্তি বলি। যখন তিনি গুণের অতীত, তখন তাঁকে নির্গুণ ব্রহ্ম, বাক্য-মনের অতীত বলা যায়; পরব্রহ্ম।' শুনিয়েছেন মানুষের যথার্থ স্বরূপের কথা, বলেছেন: মানুষের স্বধাম হচ্ছে পরব্রহ্ম। 'জীব শিব'।

এ-সব যে বলেছেন—এ কী কেবল কথার কথা? তাঁকে কি জানা যায়, দেখা যায়? কি তাঁর স্বরূপ? তিনি সাকার কি নিরাকার? সম্প্রদায়ভেদে ঈশ্বর কি অনেক? এ-সবের সমাধান তিনি যে অনবদ্য সরলতার সঙ্গে করেছেন তা কী কেবল তাত্ত্বিক আলোচনা মাত্র? এ তো তিনি বহু অধ্যয়ন করে, বহু শ্রবণ করে বলেননি। বলেছেন নিজ উপলব্ধির আলোকে—নানা পথের সাধনার ধারায় বারে বারে একই সচ্চিদানন্দের সাক্ষাৎলাভ করে। তিনি চৌষট্টিখানি তন্ত্রসাধনা, বৈষ্ণবভাব-সাধনার সব কটি, বেদান্তসাধন, যোগ, ইসলাম, খৃষ্টান প্রভৃতি বহু প্রকার সাধনা করেছেন। সে সাধন-উপার্জিত উপলব্ধির সহায়েই 'যত মত তত পথ'—এই মহাবাণী উচ্চারণ করেছেন। ঐ সাক্ষাৎকারের প্রত্যয়-দৃঢ়তা নিয়ে তাল ঠুকে বলেছেন: যেমন 'জল' 'ওয়াটার' 'পানি'… (তেমনি) তিনি এক, কেবল নাম তফাত। তাঁকে কেউ বলে 'আল্লা'; কেউ বলে 'গড'; কেউ বলছে; 'ব্রহ্ম'; কেউ 'কালী'; কেউ রাম হরি যিশু দুর্গা।

বেদ বলছেন—'যঃ ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' —যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তিনি ব্রহ্মই হ'য়ে যান। তেমনি, ধর্মের স্বরূপকে যিনি জানেন তিনি সাক্ষাৎ ধর্মবিগ্রহ—ধর্মস্বরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তো কেবল হিন্দুধর্মকেই জানেননি, তিনি জেনেছিলেন সকল ধর্মমত, হয়েছিলেন সর্বধর্ম-স্বরূপ। তাই প্রণামমন্ত্রে বলা হয়েছে 'সর্বধর্ম-স্বরূপিণে'—এই তো সগুণ-ঈশ্বরত্ব।

বেশ কথা, তিনি সর্বধর্মস্বরূপ হোন, কিন্তু অবতার যে ধর্মসংস্থাপক—তিনি কি কোন নূতন ধর্ম স্থাপনা করেছেন? উত্তরটি হাঁ-বোধকও বটে, না-বোধকও বটে। সত্যকথা এই যে, তিনি বুদ্ধাদি মহাপুরুষগণের মত কোন ব্যক্তি-নাম-কেন্দ্রিক ধর্মের প্রচলন করেননি বা সনাতন ধর্মের তত্ত্বকেও আবিষ্কার করেননি। সে-অর্থে কোন নবধর্মের সংস্থাপক তিনি নন। কিন্তু যে-ধর্মের আঙিনায় পৌঁছাবার বিভিন্ন পথ হিসাবে জগতের শত শত সম্প্রদায় বহুধা বিভিন্ন পথ নির্দেশ করেছেন—সেই সনাতন ধর্ম কালবশে মলিন ও নানাসংশয়জালে পূর্ণ হয়েছিল, তিনি তার পূর্ণস্বরূপ ব্যক্ত করেছেন। সংশয়ছেদনকেই প্রতিষ্ঠা বলে। এই অর্থে তিনি ধর্মসংস্থাপক। স্বামীজী লিখছেন: 'কিন্তু কালবশে সদাচারভ্রষ্ট, বৈরাগ্যবিহীন, একমাত্র লোকাচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্য-সন্তান…বৈদান্তিক সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রচারকারী পুরাণাদি তন্ত্রেরও মর্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া, অনন্তভাবসমষ্টি অখণ্ড সনাতন ধর্মকে বহুখণ্ডে

বিভক্ত করিয়া, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধে প্রজ্বলিত করিয়া, তন্মধ্যে পরস্পরকে আহুতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া যখন এই ধর্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকভূমিতে পরিণত করিয়াছেন—তখন আর্যজাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সততবিবদমান, আপাত-প্রতীয়মান-বহুধা-বিভক্ত, সর্বথা-প্রতিযোগী, আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম-নামক যুগ-যুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকাল-যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়—এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক, ও সার্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণ-স্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।' এই তো সনাতনধর্ম-সংস্থাপনা।

সনাতন ধর্মের অর্থ হচ্ছে, শাশ্বত সত্য—যা স্বাভাবিকভাবেই জীব-জগতের স্বরূপ। এ এক বৈজ্ঞানিক সত্য। এ সত্যে পৌছাবার জন্যই জগতের নানা দেশে ভিন্ন কালে বহু অবতারের ভাববিশেষের প্রচার। এভাবে জগতে আজ পর্যন্ত যত ধর্মমত প্রচারিত হয়েছে, তাতে করে মনে হয়েছিল ধর্মগুলি বুঝি এক কথা বলে না, বুঝি বা এক সত্যের নির্দেশ করে না। এই বিভ্রান্তি-সংশয়। এই সংশয়-তমসার নাশ করেছেন সনাতন ধর্মতত্ত্বকে স্বীয় সাধনায় উদ্দীপিত করে। তাই তিনি ধর্মসংস্থাপক।

আরো কথা, জাগতিক বিজ্ঞান সহায়ে দেহাত্মবাদী মানব নানা বাগ্‌বিস্তার ও দর্শন সহায়ে ঈশ্বরের শাশ্বত অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছিল। মানবই শ্রেষ্ঠ, তার উপর কোন তত্ত্ব নেই—এই তাদের ধারণা। তাদের যুক্তি বিজ্ঞানপ্রত্যক্ষ প্রমাণগুলির এবং ঐ সহায়ে জগতিক উন্নতির চোখ-ঝলসানো ঐশ্বর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। উপযোগবাদ নিরীশ্বর মানববাদ—এরই উপর প্রতিষ্ঠিত হ'ল। পরবর্তীকালে এল অর্থনীতিভিত্তিক সমাজবাদ। মানুষ বিভ্রান্ত হ'ল। জীব-জগতের উর্ধ্বে কোন সত্তার ক্ষেমংকর অস্তিত্বে সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলল। বিজ্ঞানের এক একটি আবিষ্কার তখন ধর্মমতের উপর যেন এক একটা বোমাবিশেষ বলে বোধ হচ্ছিল। তাই সর্বদেশের সকল ধর্মপথের পথিক এক অশান্ত নিশ্চয়তায় মৃতপ্রায় ও ধর্মসঙ্ঘগুলি জীর্ণ ভগ্নস্তূপের মতন প্রাণহীন হয়ে তাদের নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য যেন প্রহর গুণছিল। মানুষ দ্রুত বিজ্ঞানকে ধর্মের আসনে বসিয়ে জগৎজীবনের স্বরূপ উন্মোচনে এগুতে চাইলে। কিন্তু জড়বিজ্ঞান মানুষকে তার শেষ প্রশ্নগুলির মীমাংসা তখনও দিতে পারেনি, আজও যেমন পারছে না। তবু বিজ্ঞানবুদ্ধি-বিমূঢ় মানব ধর্মে বিশ্বাস হারাতে পেরেছিল—কিন্তু বিজ্ঞানে পায়নি তার অবাধ মুক্তির, নিরঙ্কুশ আনন্দের সন্ধান। তাই বীতশ্রদ্ধ মানব জড় সহায়ে যে-জীবনচর্যার রূপরেখা আঁকতে চলেছিল তাতে ক্রমাগত ছন্দপতন ঘটছিল। সে ব্যর্থ হচ্ছিল। এ-কারণেই ধর্মের কাছেই মানুষ তার শেষ প্রশ্নগুলির জন্য বিশ্বাস হারিয়েও উত্তর চাচ্ছে। প্রশ্ন ছিল তার: জড় জীবন-সত্তার অতীত কোন নিয়ামক আছেন কি?

> মানুষের স্বরূপ কি? ঈশ্বরকে কি দেখা যায়? কেউ কি দেখেছে? যদিই তিনি থাকেন তবে সমাজের ক্ষেত্রে, জীবনের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা কি? ইত্যাদি

জবাব তাকে কে দেবে? যুগবাহিত সংশয়ের ছেদক একজনই। তিনি ভগবান করুণাধৃতবিগ্রহ হয়ে আসেন মানুষের মাঝে—

মানবের বেদনার উত্তাপে তাঁর অন্তর কাঁদে। তারই জন্য তিনি অবতীর্ণ হ'ন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথকে ঐ প্রশ্নগুলির জবাব দিয়েছিলেন। দুই মহামানব। দুইয়ের মধ্য দিয়ে মানুষ পেল আশ্বাস। একজন যুগ-প্রশ্নের মূর্তি, অপর জন পুরা অপি নব—পুরাতন হ'য়েও নবীন, তাই বারে বারে আসেন উত্তর হয়ে।

তিনি বললেন: ঈশ্বর আছেন। তাঁকে দেখা যায়। মানুষ সত্তায় ব্রহ্মই।

ঈশ্বরলাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য।
বললেন: অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যেথানে ইচ্ছা যাও।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন: 'তোমাকে যেমন দেখছি, তোমাদের সাথে যেমন কথা বলছি, এরূপ ঈশ্বরকে দেখা যায় ও তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়,…'একথা আমি শপথ করে বলতে পারি।'

বলেছিলেন: মানুষের সকরুণ প্রার্থনা ঈশ্বর সর্বদা শুনে থাকেন।

বলেছিলেন: দেখ, ঈশ্বরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য, ব্যাকুল হয়ে নির্জনে গোপনে তাঁর ধ্যান চিন্তা করতে হয় ও কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে হয়—ঠাকুর, আমায় দেখা দাও।

লোক-উন্নয়নকর কর্ম করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। মানববাদের যুগ তখন। কিন্তু তার সঙ্গে নেই অনন্ত স্পর্শ, নেই ঈশ্বরান্বিত দৃষ্টি। ঠাকুর বললেন: আগে ঈশ্বর দর্শন কর। নিরাকার সাকার দুই দর্শন। বাক্যমনের অতীত যিনি, তিনিই আবার ভক্তের জন্য রূপ ধারণ করে দর্শন দেন আর কথা কন। দর্শনের পর তাঁর আদেশ লয়ে লোকহিতকর কর্ম করতে হয়।

মানব নিজ স্বরূপ জানতে চায়। সে-জানাকে অপেক্ষা করেই গড়ে ওঠে তার ব্যক্তিক ও সমষ্টি জীবনাদর্শ। জড়বাদের জড়ত্ব কাটিয়ে যে চৈতন্য শিবত্ব, ব্রহ্মত্বের ভূমাস্পর্শ তার জীবনে এল—এ কেবল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনকৃপায়।

তিনি বলেছেন: 'জীব তো সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ।' 'মানুষের স্বধাম হচ্ছে পরব্রহ্ম।' এই স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা তিনি করেছেন। এই তো ধর্মের সংস্থাপনা।

ঐ অন্তশ্চৈতন্যের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের সমাজকে রাষ্ট্রকে গঠন করতে হবে। এই ধর্মধৃত সমাজচেতনা-সংস্থাপনা তিনিই করেছেন। এ-জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন:… ঈশ্বরেচ্ছায় সকলেই যদি সেই নির্গুণ ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন, তবে বড়ই ভাল হইত; কিন্তু তাহা যখন হইবার নয়, তখন আমাদের মনুষ্যজাতির অনেকেরই পক্ষে একটি সগুণ আদর্শ না থাকিলে একেবারেই চলিবে না। এইরূপ কোন মহান্ আদর্শ পুরুষের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়া তাঁহার পতাকাতলে দণ্ডায়মান না হইয়া কোন জাতিই উঠিতে পারে না, কোন জাতিই বড় হইতে পারে না, এমন কি কোন কাজই করিতে পারে না। …রাজনীতিক, এমন কি সামাজিক বা বাণিজ্য-জগতেরও কোন আদর্শ পুরুষ কখন ভারতে সর্বসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না। আমরা চাই আধ্যাত্মিক আদর্শ। …যদি এই জাতি উঠিতে চায়, তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি—এই নামে সকলকে মাতিতে হইবে।

অন্ধ—সে অতি অন্ধ, যে সময়ের সঙ্কেত দেখিতেছে না, বুঝিতেছে না; দেখিতেছে না, সুদূরগ্রামজাত দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতামাতার এই সন্তান এখন সেই-সকল দেশে সত্য সত্যই পূজিত হইতেছেন, যে-সকল দেশের লোকেরা

শত শতাব্দী যাবৎ পৌত্তলিক উপাসনার বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া আসিতেছে।…ভারতবর্ষের পুনরুত্থানের জন্য এই শক্তির বিকাশ ঠিক সময়েই হইয়াছে।

তাই তিনি স্থাপকায় চ ধর্মস্য।

তিনি যুগোপযোগী মোক্ষধর্ম-সংস্থাপনই কেবল করেননি। করুণাবিগলিত চিত্তে ত্রিতাপদগ্ধ মানুষের ঐহিক দুঃখমোচনের কথাও ভেবেছেন। সর্বভূতান্তর্যামিত্বগুণে সকল প্রাণীর বেদনায় অধীর হতেন তিনি। তাদের সর্ববিধ দুঃখ দূরীকরণের প্রয়াসও তিনি পেয়েছেন। দেওঘরের ক্ষুধাকাতর হতশ্রী দরিদ্রের মধ্যে, রাণাঘাটে অর্থহীন প্রজার দুঃখমোচনে তাঁর ব্যথাকাতর দীপ্ত মূর্তি আমরা দেখেছি। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' এ বাণী তিনি স্বয়ং আচরণ করে দেখিয়েছেন। ধর্মকে কেবল তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় করা তাঁর বিরক্তি উৎপাদন করত। তিনি প্রত্যক্ষ উপলব্ধির জন্যই ব্যাকুল হতে বলেছেন। কেবল 'ডুব দাও', 'ডুব দাও'—এই উৎসাহ-বাণীতে তিনি সাধককে উদ্বুদ্ধ করতেন। যে যে-অবস্থায় আছে তাকে সে-অবস্থা থেকে টেনে তুলতেন ঈশ্বর-সত্তায়—এই অদ্ভুত কর্ম তাঁরই জীবনে সম্ভব ছিল।

এভাবে আরও একবার ভারতের বুকে এই আত্মসত্তা নূতন করে উন্মোচিত হ'ল—সনাতন ধর্মকে সঞ্জীবিত করে স্থাপনা করলেন এমন প্রত্যয়দৃঢ় ভিত্তির উপর যে, যার বলে ভারত ও বিশ্ব জড়বাদের ভীম আক্রমণকে প্রতিহত করে তাকেই মানবমুক্তির নির্মোক-মোচনেরই কাজে নিয়োজিত করে জড়বাদের ও অধ্যাত্মবাদের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য আনতে পারল। যেমন করে অতীতেও বিভিন্ন ভাবধারার আক্রমণে ভারতের অন্তঃপ্রবাহিত অধ্যাত্মচেতনা ঐ সকল বিজাতীয় ভাবধারাকে অপূর্ব সমন্বয়ে স্বাঙ্গীকৃত করে নিয়ে স্বীয় অপ্রতিহত প্রভাবকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল, তেমনিভাবে জড়বাদ মানবের বাহিরের অভাব-মোচনের কাজে দাসবৎ নিযুক্ত থেকে মানবকে তার স্বধাম পরব্রহ্ম-সত্তায় পৌছাতে সাহায্য করবে।—এই ভীম কর্মই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ করেছেন—

তাই আরবার নিবেদন করি প্রণাম সহস্র সহস্র মানবের সাথে।

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

৩

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে*

"আমরা ঠাকুরকে যখন দেখেছিলাম, তখন তাঁর দোহারা চেহারা ছিল, গায়ের রং খুব বেশী ফর্সা ছিল না।"

"দেখতে সাধারণ মানুষের মতনই কিন্তু মুখের হাসি ছিল অপূর্ব। অমন হাসি কারো কখনো দেখিনি। যখন হাসতেন তখন তাঁর মুখে চোখে এমন কি সর্বাঙ্গে যেন একটা আনন্দের ঢেউ খেলে যেত, আর সেই দিব্য আনন্দময় হাসি প্রাণ থেকে দুঃখকষ্ট শোকতাপ যেন চিরতরে মুছে দিত। তাঁর কণ্ঠস্বরও ছিল মধুর। এতই মধুর যে, ইচ্ছা হত বসে শুধু তাঁর কথাই শুনি। কানে যেন সুধাবর্ষণ করে। আর তাঁর চোখ দুটিও খুব উজ্জ্বল, দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ ও প্রেমপূর্ণ ছিল। যখন তাকাতেন, মনে হত যেন ভেতরকার সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন।"

"ঠাকুর ছিলেন পবিত্রতার প্রতিমূর্তি।" "ঠিক যেন একটি শিশু। শিশুর চেয়েও সরল এবং পবিত্র।...তাঁর সংস্পর্শে এসে মনে হত যেন মনের সব ময়লা ধুয়ে গেছে।"

"তাঁর নিজের অহং পুরোপুরি মিশে ছিল মায়ের সঙ্গে। মা ছাড়া আর নিজের কিছুই নেই।"

"ঠাকুরের প্রাণে ব্রহ্মানন্দের যে স্ফূর্তি, যে আনন্দে তিনি বিভোর হয়ে থাকতেন—আনন্দে অট্টহাস্য করতেন—সকলকেই সেই আনন্দের অধিকারী করতে পারছেন না বলে তিনি কতই না দুঃখ প্রকাশ করেছেন! তিনি যে আনন্দ-সাগরে ভেসে থাকতেন—জীবকেও সেই আনন্দের ভাগী করবার জন্য তাঁর অন্তর সদাই ব্যাকুল ছিল।"

"তাঁর ছবি ষট্‌চক্রভেদের মূর্তি।...আমি ঐ ছবিতে নানা জিনিস দেখতে পাই, তাই বলি।"

"ঠাকুর আমায় বলেছেন, 'দেখ, কাঁচের আলমারীর ভিতর জিনিস রাখলে যেমন সব কিছুই দেখা যায়, আমিও সকলের মনের ভেতরটা ঠিক তেমনি দেখতে পাই।'"

"ঠাকুরের যখন মা-কালীর দর্শন হল তখন তিনি মনে মনে ভাবলেন যে, আমার যদি ঠিক ঠিক দর্শন হয়ে থাকে তো তিনবার এই বড় পাথরটা লাফ দিয়ে উঠুক। যেই মনে করা আর অমনি তাই হওয়া।"

"ঠাকুরের মুখে কেবল একটি কথা শোনা যেত—জ্ঞান হোক, ভক্তি হোক। তাছাড়া অন্য কোন কথা শুনিনি। টাকাকড়ি সিদ্ধাই ইত্যাদি হোক—এসব কখনই কেউ তাঁকে বলতে শোনেনি।"

"আমার ভাল থাক সুখে থাক-র অর্থ, আর ঠাকুরের ভাল থাক সুখে থাক-র অর্থে ঢের তফাৎ। ভাল থাকার অর্থে আমি বলি টাকা-কড়ি হোক, গাড়ীজুড়ী হোক ইত্যাদি। কিন্তু ঠাকুরের কথায় বুঝতে হবে—ভক্তি বিশ্বাস লাভ হোক, ভগবদ্দর্শন হোক, ইত্যাদি।"

"বেদান্তমতে সংসারত্যাগ করতেই হবে,

*শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ যে-সব কথা বলিয়াছিলেন, সেগুলি এখানে একত্র করিয়া দেওয়া হইল। এগুলি এবং তাঁহার অন্যান্য প্রসঙ্গগুলি অধিকাংশই স্বামী গম্ভীরানন্দ-রচিত 'ভক্তমালিকা—২য় ভাগ' এবং স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত 'সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ' গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

ত্যবেই ভগবান লাভ সম্ভব। ঠাকুর কিন্তু তা বলেন না। তিনি বলেন—সংসারত্যাগ না করলেও হবে; কর্মফল ত্যাগ করে অনাসক্তভাবে সংসারে থাকতে দোষ নেই। অথচ কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করতে তিনি বলেছেন।"

"ঠাকুর ছিলেন ত্রিকালজ্ঞ। তাই তিনি বলেছিলেন, 'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ।' আবার আসবেন তা-ও বলে গেছেন।"

"আমরা তো তাঁকে (ঠাকুরকে) বুঝতে পারিনি, স্বামীজী কিছুটা বুঝতেন।"

"ঠাকুর আমাদের কত ভালবাসতেন! আমরা আর তোমাদের ভালবাসতে পারছি কই? আমরা তাঁকে দেখেই পাগল হয়েছি; কিন্তু তোমরা তাঁকে না দেখেও তাঁর নাম শুনেই পাগল! আহা, তোমরা কত ভাগ্যবান!"

"ঠাকুরকে যখন ধরেছ, ঠিক পথই ধরেছ। তিনি জীবকে ত্রাণ করতেই এসেছিলেন। তাঁর নাম জপ করে যাও, শান্তি পাবে। তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকালেই দেহ-মনের সব পাপ ধুয়ে যায়। তিনি অন্তর্যামী—সব বোঝেন। তাঁকে মনের কথা জানাবে। কিন্তু স্বার্থ নিয়ে তাঁর কাছে যাবে না।"

"ঠাকুরকে মনে মনে ডাকবে অন্তরের সহিত। আর তাঁর চরণে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেবে। তাহলেই সব হবে। আমাদের পক্ষে যা মঙ্গলের, তিনি তার বিধান করবেন।"

"ঠাকুরকে ডাকার মানে কি না—ঠাকুরের গুণের কতকাংশের অধিকারী হওয়া। যে যাঁর চিন্তা করে সে তাঁর গুণ পায়।"

"ঠাকুর তো বলেছেন, আমার এই ছবিতে ধ্যান করবি তাহলেই হবে।" "ঠাকুরকে ডাকলে কত জ্যোতিদর্শন হয়! মন-প্রাণ দিয়ে ডাকলে তবে তো? তিনি তো জ্যোতির্ময় স্বপ্রকাশ সর্বব্যাপী। তাঁর প্রকাশ সর্বত্র বিরাজমান।"

"যে যত পবিত্র হবে ঠাকুর তার কাছে ততই প্রকাশিত হবেন।"

শ্রীশ্রীমায়ের প্রসঙ্গে

"ঠাকুর চৈতন্য-স্বরূপ, মা চিন্তা-স্বরূপিণী।"

"ঠাকুর ও মাকে অভেদ-দৃষ্টিতে দেখবে। মনে রাখবে, ঠাকুরের কৃপা না হলে মাকে পাওয়া যায় না, আবার তেমনি মায়ের কৃপা না হলেও ঠাকুরকে পাওয়া যায় না। ঠাকুর যেন নারায়ণ, মা যেন লক্ষ্মী। মার কাছে শক্তি চাইতে হয়। শক্তি না হলে কোন কাজ হয় না। ঠাকুরের কাছে শ্রদ্ধা ভক্তি চাইবে।"

"মা সর্বশক্তিময়ী।"

"আমাদের মা-ই Law (ভগবদ্‌বিধান) রূপে বিরাজমানা।...একেই (এই ভগবদ্-বিধানকেই) খৃষ্টানরা Holy Ghost (ঈশ্বরের আত্মা) বলে, আর হিন্দুরা বলে শক্তি।"

"আমরা যা কিছু করি তা যেন মায়ের চরণকমলে অর্পণ করি। তাঁরই বাহ্যিক অভিব্যক্তি হচ্ছে দেশ-কাল-নিমিত্ত। তিনি বুদ্ধিরূপিণী হয়ে কি কর্তব্য তা বলে দেন; আমাদের তা-ই করতে হবে দাদা, তা-ই করতে হবে!"

"মাকে ডাকবে। তাহলেই সব হয়ে যাবে। ঠাকুর কিন্তু বড় দুষ্টু। একেবারে ঠিক ঠিক না হলে তাঁর কৃপা হয় না। মা বড় ভাল।"

"মায়ের নাম জপ করি 'মা আনন্দময়ী' বলে।...তাঁর নামেতে ভক্তি, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, বুদ্ধি, ধন, দৌলত সবই লাভ হয়। চণ্ডীতেও আছে—তিনি ঋদ্ধি সিদ্ধি সব দিতে পারেন। ঠাকুরের নামের চাইতে মায়ের নামে আমি

বল পাই বেশী।”

“মা তো রক্ষা করছেনই, ডাক আর নাই ডাক। তবে ডাকলে আরো আনন্দে বিভোর হবে।…মাকে কায়মনোবাক্যে ডাকতে পারলে ভারি আনন্দ। এতে দাদা কোন সন্দেহ নেই।…মায়ের সেই আনন্দজ্যোতিঃ তো চারদিকে ওতপ্রোতভাবে রয়েছে; আশ্চর্যের বিষয় মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারছে না।”

“আমি মা-ঠাকরুনের কাছে বেশী যেতাম না। স্বামীজী কি করে তা জানতে পারেন। শ্রীশ্রীমা তখন বলরাম-মন্দিরে। সেখানে স্বামীজী একদিন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, ‘পেসন, মাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলে?’ আমি বললাম, ‘না, মশাই!’ স্বামীজী বললেন, ‘সে কি? এক্ষুণি যাও মাকে প্রণাম করে এসো।’ তাই শুনে আমি তো মাকে প্রণাম করতে গেলাম; মনে মনে ভাবছি—কোন রকমে টিপ করে একটা প্রণাম করে চলে আসব। মাকে প্রণাম করে উঠতেই স্বামীজী পেছন থেকে বলছেন, ‘সে কি, পেসন—মাকে এই করে প্রণাম করতে হয়? সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম কর; মা যে সাক্ষাৎ জগদম্বা।’ বলেই তিনি সাষ্টাঙ্গ হয়ে মাকে প্রণাম করলেন। ……আমি কিন্তু ভাবতেই পারিনি যে, স্বামীজী আবার পেছনে পেছনে আসবেন।”

“পূর্বে ভগবানকে পিতৃভাবে আরাধনা করারই ঝোঁক ছিল। মাকে ভক্তিশ্রদ্ধা সবই করতাম, কিন্তু বাপের দিকেই টান ছিল বেশী। এখন ‘মা মা’ বলি সকাল সন্ধ্যায়—আর মনে হয়, ঠিক যেন মায়ের কোলে শিশুর মতন আছি। তাঁর কোলেই বসে রয়েছি।”

“মা আমায় কোলে করে রেখেছেন—সদা রক্ষা করছেন। দেখ না, এই তিপ্পান্ন বছরের মধ্যে মা নিজের মোহিনী মূর্তি আমায় দেখাননি। এমন কি অনেক দূরে কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকলেও চট্‌ করে তা বুঝিয়ে দেন, আর আমায় চতুর্দিকে বেষ্টন করে রাখেন। তার ভেতর অমঙ্গল আসার সাধ্য নেই।”

“সব রকমই তো কিছুটা করা গেল, এখন ঠাকুর আর মা-ই সম্বল। তাঁদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে পড়ে আছি। এখন এই মনে হচ্ছে, যেন তাঁদের নাম করে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি।”

স্বামীজী প্রসঙ্গে

“স্বামীজীকে শিবজ্ঞানে পূজা করবে।”

“স্বামীজী বলতেন—‘আমার এখানকার কাজ শেষ হয়েছে। ঠাকুর বলেছেন তাই কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু আমার চিত্ত সর্বক্ষণ ব্রহ্মে লীন হয়ে থাকে।’

“স্বামীজী মহারাজকে দেখেছি দুপুর রাত্রে ধ্যান করছেন। ঘর একেবারে আলো হয়ে গেছে। আমি পাশের ঘরে শুতাম। রাত্রে বাইরে যাবার জন্য উঠে দেখি স্বামীজীর ঘর আলো হয়ে রয়েছে।”

“স্বামীজীর বক্তৃতার একটি বিশেষত্ব দেখেছি। তিনি যখন বক্তৃতা দিতেন তখন যেন নিজেকে বিস্মৃত হয়ে গিয়ে আর একজন লোক হয়ে যেতেন।…তাঁর ক্ষমতা ছিল অতি অদ্ভুত। লোকে তাঁর কাছে যেন কেঁচো হয়ে যেত।…এখন তাঁর কথামতন কাজ হয়ে যাচ্ছে।”

“একবার দশহরার দিন; নীলাম্বর মুখুজ্জের বাড়ীতে তখন মঠ। স্বামীজীর সঙ্গে আমরা ওখানে রয়েছি। স্বামীজী তখন এমন উচ্চ ভাবভূমিতে থাকতেন যে, তা আর কি বলব!

একদিন তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গিয়ে ইলেকট্রিক শকের মতো শক পেয়েছিলাম। …ওঁদের (স্বামীজীর ও রাজামহারাজের) পরিবেষ্টনীর মধ্যে গেলে মনে হত, যেন একটা spiritual zone (আধ্যাত্মিক আবেষ্টনী) সৃষ্টি করে বসে আছেন। তার মধ্যে যে কেউ যাবে সেই-ই বুঝতে পারবে যে—যেন একটা বৈদ্যুতিক শক্তি বাহির হতে এসে তার ভিতর প্রবেশ করছে। এটা সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব হয়ে যেত।"

"একবার স্বামীজীকে আমেরিকার মিশনারীরা মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে বিষমেশানো সরবত খেতে দিয়েছিল। স্বামীজী সরবত খেতে ভাল-বাসতেন। তিনি তো ওদের কু-অভিসন্ধির বিষয় কিছুই জানতেন না। সরবত দেখে খুশী হয়ে যেই গেলাস তুলে সরবত খেতে যাচ্ছেন, —আর দেখলেন ঠাকুর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে সরবত খেতে বারণ করছেন। তিনি সেই সরবত আর খেলেন না।"

"স্বামীজী খুব কড়া লোক ছিলেন। একটু এদিক ওদিক হলেই বকুনি দিতেন।"

"স্বামীজী-মহারাজ অকারণে কাউকে বকতেন না। ভালর জন্যই বকতেন, আর ভালও বাসতেন খুব।"

"এখন তো সেরকম বকুনি মঠে আর নেই। তখন বকুনিও যেমন, পরস্পরের জন্য ভালবাসাও ছিল তেমনি।"

"স্বামীজী গুরুভাইদের এত বেশী ভাল-বাসতেন, যেন মায়ের মতন! সেজন্য কারো এতটুকু দোষ বা ত্রুটি দেখতে পারতেন না। তিনি চাইতেন, তাঁর গুরুভাইরা সকলেই তাঁর মতন হোক—তাঁর চাইতেও বড় হোক। স্বামীজীর ভালবাসার তুলনা নেই।"

"রাখাল মহারাজ আর বাবুরাম মহারাজকে স্বামীজীর বেশী ঝক্কি সামলাতে হত, আর বকুনিও খেতে হত বেশী।"

"আমি রাজা মহারাজের আওতাতে থাকতাম বলে, স্বামীজীর বকুনি বড় বেশী খাইনি।

"একবার…(স্বামীজীর একটি কথা ঠিকমত বুঝতে না পেরে তাঁর কথার) প্রতিবাদ করে বললাম—'না মশাই, আপনি ঋষি-মুনিদের সম্বন্ধে ভুল বুঝেছেন।' দেখলাম, স্বামীজীর মুখ একেবারে লাল হয়ে উঠল। রাখাল মহারাজ সেখানে পায়চারী করছিলেন। তাঁকে বললেন, 'রাজা, দেখ পেসন বলে যে আমি কিছু জানিনে বুঝিনে।' রাখাল মহারাজ তাতে উত্তর দিলেন, 'তুমিও যেমন! পেসনের কথা কি ধর্তব্যের মধ্যে? ও-তো ছেলেমানুষ, ও কি বোঝে?' অমনি স্বামীজী ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন—একেবারে বালকের মতন! রাখাল বলেছে পেসন ছেলেমানুষ ও কি বলতে কি বলে ফেলেছে, ব্যস্ তাতেই সব মিটে গেল।"

"স্বামীজী বাইরে এত জ্ঞান কর্ম প্রচার করেছেন; কিন্তু তাঁর ভিতরে ছিল প্রেমের ভাব। ভিতরটা খুবই কোমল ছিল। বাইরে পৌরুষ বিক্রম কিন্তু তাঁর প্রাণ ছিল মায়ের প্রাণের মতো কোমল, আর গুরুভাইদের প্রতি তাঁর কী গভীর ভালবাসাই না ছিল! বিশেষ করে মহারাজকে তিনি খুবই ভালবাসতেন, খুব মান্যও করতেন। ঠিক 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু' এই ভাব। তাই বলে কারো দোষ বা ত্রুটি দেখলে তা সইতে পারতেন না। যে-রাখাল মহারাজকে এত প্রাণের সহিত ভাল বাসতেন, তাঁকেই একবার এমন গালমন্দ করলেন যে মহারাজ তো একবারে কেঁদে আকুল। অবশ্য

সে ব্যাপারে পুরোপুরি দোষ ছিল আমারই। (গঙ্গার ঘাট ও পোস্তা নির্মাণের কাজে বিজ্ঞান মহারাজ স্বামীজীর ভয়ে এষ্টিমেট কম করে দিয়েছিলেন। হিসেব দেখতে গিয়ে স্বামীজী টের পান যে, এষ্টিমেটের চেয়ে খরচ অনেক বেশী হবে। তাই এই বকুনি।) আমায় বাঁচাতে গিয়ে মহারাজ দোষটা নিজের ওপর টেনে নিলেন। ···(ঘরে গিয়ে মহারাজ কাঁদছেন শুনে) "স্বামীজী একেবারে পাগলের মতন ছুটে মহারাজের ঘরে গিয়েই মহারাজকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, 'রাজা, রাজা, আমার ক্ষমা কর ভাই।···কী অন্যায়ই না করেছি, তোমায় গালাগাল দিয়েছি।'···স্বামীজীকে অমন ধারা কাঁদতে দেখে তিনি (মহারাজ) তো অবাক!···বললেন, 'গালাগাল দিয়েছ তাতে হয়েছে কি? আমায় ভালবাস বলেই তো এসব বলেছ?' স্বামীজী তখনো মহারাজকে বুকে জড়িয়ে ধরে আছেন আর বারবার বলছেন, 'আমায় ক্ষমা কর ভাই। ঠাকুর তোমায় কত আদর করতেন! তিনি কখনো তোমায় একটা কড়া কথা বলেননি। আর আমি কিনা ছাই কাজের জন্য তোমায় গালাগাল করেছি···।' ···এইভাবে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে দুজনে শান্ত হলেন। সেদিনকার দৃশ্য জীবনে আর ভুলতে পারব না।"

"স্বামীজীকে আমি যেমন ভালবাসতাম তেমন ভয়ও করতাম। যখন দেখতাম যে তাঁর মেজাজটা একটু অন্য রকমের, তখন পাশ কাটিয়ে চলে যেতাম। স্বামীজী হয়তো ডাকছেন, 'পেসন, পেসন, শোন! এদিকে আয়।' আমি দূর থেকেই 'এখন মশায় কাজে বড্ড ব্যস্ত আছি; পরে আসব' বলেই সরে পড়তাম।"

"আমি স্বামীজীর কাছে খুব বেশী যেতাম না। একদিন সন্ধ্যার পূর্বে তিনি আমায় ডেকেছেন। আমি বললাম—এখন ধ্যান করতে যাব।"

"আমি তখন বেলুড় মঠে গঙ্গার পাকা ঘাট তৈরি করছি। একদিন খুব রোদ—স্বামীজী মহারাজ মঠে উপরের বারান্দায় বসে সরবত খাচ্ছেন। আমারও তেষ্টা খুব পেয়েছে। এমন সময় স্বামীজীর একজন সেবক এসে একটি গ্লাস দিয়ে বললে—স্বামীজী আপনার জন্য সরবত পাঠিয়ে দিয়েছেন। প্রথমে তো ভীষণ নিরাশ হলাম—মনে দুঃখও হল যে তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে—আর স্বামীজী এখন এই করে ঠাট্টা করছেন! যাই হোক, মহাপুরুষের প্রেরিত প্রসাদ বলে যা দু-চার ফোঁটা ছিল গ্রহণ করলাম। খুব তৃপ্তি হল—সব তেষ্টা যেন নিমেষে মিটে গেল। আমি তো অবাক হয়ে গেলাম।"

"কিছুদিন যাবৎই আমার মনে হচ্ছিল যে, স্বামীজী তো দেশবিদেশ ঘুরে কত শত বক্তৃতাদি দিয়ে এলেন, সব রকম লোকজনের সঙ্গেই তাঁকে মেলামেশা করতে হত, মেয়েদের সঙ্গেও। ···তাই আমি ভাবতাম যে তিনি যা করে এলেন একি ঠিক ঠাকুরের ভাবানুযায়ী? তিনি এত সব মেয়েদের সঙ্গে কেন মিশলেন? এসব খুবই মনে হচ্ছিল। তাই একদিন স্বামীজীকে নিরিবিলি পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা মশাই, আপনি তো পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গেও মেলামেশা করেছেন। কিন্তু ঠাকুরের শিক্ষা ও উপদেশ তো অন্য রকম ছিল। তিনি বলতেন, সন্ন্যাসী মেয়েমানুষের পট পর্যন্ত দেখবে না। আমাকেও তিনি বিশেষ করে বলেছিলেন যে, খবরদার, কখনও মেয়েদের সঙ্গে মিশবিনি—হাজার ভক্তিমতী হলেও না। তাই আমার মনে হচ্ছিল যে আপনি কেন এমন-

ধারা করলেন ?' আমার কথা শুনে স্বামীজী খুবই গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই আমার তো তখন খুব ভয় হতে লাগল যে, কি বলতে কি বলে ফেললাম! তাঁর মুখচোখ একেবারে লাল হয়ে উঠেছে। খানিকক্ষণ পরে তিনি বলে উঠলেন, 'দেখ্ পেসন, ঠাকুরকে তুই যতটুকু বুঝেছিস, ঠাকুর কি ততটুকুই ? আর তুই ঠাকুরকে কতটুকুই বা বুঝেছিস ? জানিস, ঠাকুর আমার স্ত্রী-পুরুষের ভেদ মেরে দিয়েছেন! আত্মাতে আবার স্ত্রী-পুরুষ কিরে ? তাছাড়া ঠাকুর এসেছেন সারা দুনিয়ার জন্য। তিনি কি বেছে বেছে কেবল পুরুষদের উদ্ধার করতেই এসেছিলেন! তিনি সকলকেই উদ্ধার করবেন—স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই। তোরা নিজ নিজ বুদ্ধির মাপকাঠিতে মেপে ঠাকুরকে এত ছোট করতে চাস্! তাঁর কৃপা এ দুনিয়ার সকল নরনারী তো পাবেই ; অন্য লোকেও গিয়ে পৌঁছুবে তাঁর কৃপার প্রভাব। তিনি তোকে যা বলেছেন তা তো মিথ্যে নয়! সে খুবই সত্যি। তিনি তোকে যেভাবে উপদেশ দিয়েছেন তুই ঠিক সেইভাবেই চলবি। কিন্তু আমাকে বলেছেন অন্যরূপ। বলেছেন কিরে—স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছেন! তিনি হাত ধরে আমায় যা করাচ্ছেন আমি তাই করছি।' ...আমি আর কি বলব! ...তখন পালাতে পারলে বাঁচি!

"আমার অবস্থা দেখে স্বামীজীর দয়া হল। তিনি একটু হাসিমুখে বললেন, 'মেয়েদের ভেতর সেই আদ্যাশক্তি না জাগলে কখনও কি কোন জাত জাগে, না কোন জাত উঠতে পারে? আমি তো সারা দুনিয়াটা ঘুরে দেখলাম; সব দেশেই মেয়েদের প্রায় একই অবস্থা, বিশেষ করে আমাদের এ পোড়া দেশে।...মেয়েরা জাগলেই দেখবি সমগ্র জাতটা জেগে উঠেছে। তাই তো রে মা এসেছেন। মার আগমনের পর থেকেই সবদেশের মেয়েদের ভেতর ঠিক ঠিক জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে। এই তো সবে আরম্ভ, আরও কত কি হবে দেখবি!'...

বাস্তবিকই তো স্বামীজী ঠাকুরকে যেমন বুঝতে পেরেছিলেন তেমনটি আর কে বুঝবে? তাঁকে দিয়েই ঠাকুর তাঁর সব কাজ করিয়ে নিয়েছেন স্বামীজী একজনই হয়!"

"আমরা দেখেছি, স্বামীজী এবং রাখাল মহারাজ এ দুটি মহাপুরুষের কি অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি! জোর করে যেন তাঁদের দিকে টেনে নিচ্ছেন!...এঁদের ইচ্ছাশক্তিতে জীবের সব অশুভ সংস্কার ক্ষয় হয়।"

"স্বামীজীর ভাবরাশিকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও কর্মে প্রতিফলিত করেছেন রাখাল মহারাজ।"

সমালোচনা

মধুমুরলী : শ্রীদিলীপকুমার রায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭, পৃঃ ২১৯+৫০, মূল্য : দশ টাকা।

বাংলাদেশে আজ সুরসাধক দিলীপকুমারের পরিচয় সর্বজনবিদিত; কিন্তু সাহিত্যসাধক দিলীপকুমারকে আমরা বোধ হয় ততটা স্মরণ করি না। এজন্য দিলীপকুমার রায়ের নিজস্ব জীবনসাধনাই অনেক পরিমাণে দায়ী। তিনি সংগীতকে যতটা সর্বময় করে তুলেছেন, সাহিত্যকে ততটা সর্বস্ব করে তোলেননি। কিন্তু তাঁর অমৃতকণ্ঠ একদা জনশ্রুতির অগোচর হলেও হতে পারে, তবু তাঁর লেখা গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, সর্বোপরি স্মৃতিচারণ বহুকাল পাঠকসমাজের দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকবে। সেদিক থেকে সাহিত্যে অমরতার মূল্য বোধ হয় এখনও বেশী। আনন্দের বিষয় সাহিত্যে তাঁর অপরিমেয় দানের মহনীয় দিকটি সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডি. লিট্ উপাধির দ্বারা অভিনন্দিত। ব্যক্তিগত-ভাবে তিনি উপাধিগত স্বীকৃতির উর্ধ্বে। তবে যোগ্যজনের সম্মাননায় সমকালীন স্থির-বুদ্ধির পরিচয় মেলে—এই যা লাভ।

'অনামী' থেকে 'মধুমুরলী' অবধি দিলীপ-কুমারের কাব্য- ও সংগীত-রচনার অফুরান প্রবাহ যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা জানেন তিনি একান্তভাবে ভক্তিরসের কবি। বাংলার বৈষ্ণব-পদাবলীর রস-ঐতিহ্যে আধুনিক মনন ও চিরন্তন স্বপ্নাভিসারের মধ্যে এক অপূর্ব মেলবন্ধন সাধিত হয়েছে দিলীপকুমারের কবিতায়। হয়তো সুরধর্মের প্রাধান্যের ফলে তাঁর কবিতায় কল্পনাবৈচিত্র্য ততটা নেই, কিন্তু অন্তরঙ্গ অনুধ্যানের স্বাক্ষর তাঁর প্রথম যুগ থেকে জীবনসায়াহ্নের সব রচনাতেই সমুজ্জ্বল। সাধনা ও সাহিত্যের দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়ে কখন তাঁর সাহিত্যই সাধনা হয়ে উঠেছে, তা হয়তো কবি নিজেও খেয়াল রাখেননি। তবু ভারতীয় সাহিত্যের ঔপনিষদিক যুগ থেকে আমরা মানবচেতনার গভীরতম উপলব্ধি-রূপায়ণের যে প্রচেষ্টাকে সাহিত্যের সর্বোত্তম সার্থকতা বলে জানি, দিলীপকুমারের রচনায় সেই সার্থকতার ভক্তিরসস্নিগ্ধ প্রকাশ আধুনিক বাংলাসাহিত্যের একটি বড় অভাব পূরণ করেছে। উদাহরণ-স্বরূপ তাঁর সাম্প্রতিক সৃষ্টির একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

"তোমারে কী বলো বলিব শ্যামল? বলিবার
কথা কিছু কি আছে?
একই কথা শুধু বলি তাই বঁধু : তনু মন প্রাণ
তোমারে যাচে।
তনু গায় : "প্রতি কণিকা আমার
তোমার পূজার হোক দীপাধার,
জ্বালায়ে নামের শিখাটি তোমার ঘোষিব
উছলি : আছে সে আছে,
সুদূর আকাশে শুধু থাকে না সে, মাটির বুকেও
রাজে সে রাজে।" (ভুবারি, পৃঃ ৪৮)

গান হলেও কবিতা হিসাবে এ রচনাটির নিজস্ব মূল্য রসিকচিত্তে ধরা দেবে। গানে ও কবিতায় কৃত্রিম পার্থক্যের প্রাচীর আমরা অনেক সময় তুলে থাকি; কিন্তু বিশ্ব-ইতিহাসে সঙ্গীতেই কাব্যের সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালী কি গান বলে কেউ কবিতার ইতিহাসে বাদ দিতে পারেন?

তেমনি দিলীপকুমারের এ গ্রন্থেও 'কবিতা' অংশে বেশ কিছু গান আশ্রয় পেয়েছে। তাহলেও সুর-প্রাধান্য বাদ দিয়ে এমন কিছু কবিতা আছে, যা কবির অন্তর্লোকের দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভ্রান্তি ও আলোকের বিচিত্র মায়াজাল বুনে পাঠককে মুগ্ধ করে রাখার মতো। 'স্খলন-সিদ্ধি' কবিতাটিতে কবি-অন্তরের উন্মোচন তাই হৃদয়স্পর্শী—

আমি যে জেনেছি—মৃন্ময়তার অলীক দোলার
ওপারে নিত্য
ঝলে অম্লান তোমার মহান্ চিন্ময় বরাভয়
আদিত্য।
বাহিরে ছন্দপতন আমার হয়েছে পূজায়
বরি' অসত্যে
তবুও তোমার ধ্রুবতারাধ্যানে পাইনি
কি কূল তুফানাবর্তে ? (পৃঃ ১৪৬)

সঙ্গীতময় সাহিত্যসাধনায় দিলীপকুমার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি-নিবেদনে স্মরণ করেছেন শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীমা সারদামণিকে ; আবার ভগিনী নিবেদিতা, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র এমনি অনেক বন্দনীয় ব্যক্তিত্বকেও। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রথম অধ্যাত্ম-ইঙ্গিতবাহী।

"তোমাকে প্রণাম চির-অভিরাম শ্রীরামকৃষ্ণ
যুগাবতার!
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে মা বিনা যে কিছু
জানে না আর।
দুহাতে কেবল বিলালে অমল, জগন্মাতার
মহাপ্রসাদ,
ভুলিয়া মায়ায় ভুলিয়া ধরায় ছিলাম আমরা
যাহার স্বাদ।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, পৃঃ ৭)

বাংলাকবিতায় ছন্দোবৈচিত্র্য এবং অনুবাদের নৈপুণ্যে দিলীপকুমারের বিশেষ স্থান সুধীজনের স্বীকৃত। পয়ারের অতিপ্রাধান্য থেকে বাংলা কবিতাকে মুক্ত করার প্রধান অন্তরায় এই যে, সংস্কৃত ছন্দের লঘু-গুরু উচ্চারণ-পদ্ধতি বাংলা ভাষার উচ্চারণক্ষেত্রে কৃত্রিম ঠেকতে বাধ্য। তবু ভারতচন্দ্র থেকে বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিকুল যাঁরাই ছন্দোবৈচিত্র্যের সাধনা করেছেন, তাঁরাই সংস্কৃত ছন্দকে আশ্রয় করে বাংলা ছন্দের গতানুগতিকতা-মোচনে ব্রতী হয়েছেন। দিলীপকুমারের এ জাতীয় শুভপ্রচেষ্টার অন্যতম উদাহরণ—

হে শরণাগতি-সাধন-সারথি,
সূর্যশশাঙ্কগ্রহাধিপতি!
যার অনিন্দ্য অসাঙ্গ নিরঞ্জন বর্ণ চিরন্তন-
দীপ্তিব্রতী!
হে চিরভক্ত-অধীন! ঝরে
যার কৃপা নিতি স্নেহভরে
শঙ্কিত ম্লান বিষণ্ণ শিরে, নমি' পাদতলে ভুলি
তাপ ক্ষতি। (পার্থসারথি, পৃঃ ৬৯)

বহুভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী তীর্থমধুপ দিলীপকুমার বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যকে নানা-ভাবে সমৃদ্ধ করেছেন সন্দেহ নেই। 'মধু-মুরলী'তে ইন্দিরাদেবীর ভজন-সঙ্গীতের অপূর্ব অনুবাদগুলি তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সমগ্র কাব্যটি পরিক্রমার শেষে দিলীপকুমারের সর্বযুগবন্দ্য সেই কীর্তনটির কথাই মনে পড়ে, যে কীর্তনে অন্তরের নিত্যবৃন্দাবনে মুরলীধ্বনির নিশ্চিত সংকেত শুনতে পেয়ে কবি গাইতে পারেন—

'আমি অন্তরে তোমার বাঁশরি শুনেছি
তাই বঁধু আমি জানি।'

বাংলাসাহিত্যের অন্তরাকাশে এই নিত্য-নিঃস্বনিত মুরলীধ্বনির বাণীবহরূপে কবি ও সুরসাধক দিলীপকুমার চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। —মায়াজীত সিংহ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবা: গত মে, ১৯৬৯ রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বন্যার্তসেবাকার্যে বিতরিত দ্রব্যসমূহ: ধুতি ও শাড়ী ১০১ খানি, গম ২০ কুইন্টাল, স্কুল টেক্স্‌ট বুক ৬৪৫টি, শ্লেট ও পেন্সিল ১০০ সেট এবং ১৮টি এক্সসার-সাইজ বুক।

বরনেশ বাজার, মণ্ডলঘাট ও পাহাড়পুর অঞ্চলে মিশন কর্তৃক ১১৩টি কুটির নির্মিত হইয়াছে এবং ৪৯টি কূপ-খননের কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে।

গুজরাটে বন্যার্তসেবা: বন্যায় বিপর্যস্ত ব্যক্তিদের জন্য গৃহনির্মাণের প্রথম পর্বে সুরাট জেলায় ২২টি কলোনীতে ১,৩২৮টি পরিবারের বাসোপযোগী ৩৩২টি কুটির তৈরির কাজ আগামী জুলাই মাসের মধ্যে সম্ভবতঃ শেষ করিতে পারা যাইবে। সমাজ-মন্দির নির্মাণ এবং জল-সরবরাহের ব্যবস্থা করা দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্ভুক্ত; এই কার্য সম্পূর্ণ হইতে আরও কয়েক মাস লাগিবে। গত ২৮শে জুন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী তিনটি কলোনীর উদ্বোধন করিয়াছেন। যাহারা এখানে আশ্রয় লাভ করিয়াছে তাহাদিগকে বস্ত্রাদি, কম্বল, গৃহস্থালির জিনিসপত্র দিয়া সাহায্য করা হইয়াছে।

জুন, ১৯৬৯ পর্যন্ত মিশন কর্তৃক সুরাট জেলার ৪৫টি গ্রামে ১১,২৬০টি পরিবারের মধ্যে ৩৩,৩৮১ কেজি গম, ৪০০ কেজি চাল, রান্নার জন্য তেল ১,৭০৩ লিটার, বাসনপত্র ২০৮ সেট এবং ১৮,৩২৫ খানি পুরাতন বস্ত্রাদি বিতরিত হইয়াছে।

ছাত্রগণের কৃতিত্ব

রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রস্থ স্কুলের ছাত্রগণ পশ্চিমবঙ্গের গত উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিভিন্ন শাখার প্রথম দশটি স্থানের অনেকগুলি অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। কেন্দ্রগুলির নাম ও বিভিন্ন শাখায় তাহাদের অধিকৃত স্থানগুলি নিম্নে দেওয়া হইল।

রহড়া: বিজ্ঞান—৩য় ও ৪র্থ।

নরেন্দ্রপুর: হিউম্যানিটিজ—৯ম, চারু-কলা—১ম। কৃষি—১ম, ৪র্থ ও ৫ম।

পুরুলিয়া: টেকনোলজি—২য়, ৪র্থ, ৭ম ও ১০ম। কৃষি—২য় ও ৮ম।

সরিষা: চারুকলা—২য়।

নরেন্দ্রপুর হইতে মোট ১০৬ জন পরীক্ষা দিয়াছিল; সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে—৪৯ জন প্রথম বিভাগে এবং ৫৭ জন দ্বিতীয় বিভাগে।

রহড়া হইতে মোট ৯৩ জন পরীক্ষা দিয়াছিল; সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে—৩৩ জন প্রথম বিভাগে, ৫৮ জন দ্বিতীয় বিভাগে ও ২ জন তৃতীয় বিভাগে।

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের একজন ছাত্র গত পি. ইউ. পরীক্ষায় ২য় স্থান অধিকার করিয়াছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন পদ্ধতি

জামসেদপুর: রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। সোসাইটি-পরিচালিত পাঁচটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষাবোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষায় কেবল দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিভাগে, উত্তীর্ণ

ছাত্রদের ভরতি করা হয়। কারণ এই ছাত্রেরা অন্যত্র ভরতি হইবার সুযোগ প্রায়ই পায় না, অধিকন্তু মেধাবী ছাত্রদের সঙ্গে একত্র পড়াইলে উভয় প্রকার ছাত্রেরই উন্নতি ব্যাহত হয়।

অপর একটি বিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্রদিগকে বিশেষ উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রতিটি ছাত্রের অভিভাবকের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া মিশন কর্তৃপক্ষ কিভাবে সাহায্য দান করিলে কোন ছাত্রের বেশী উপকার হইবে তাহা স্থির করিবেন। এই অতিরিক্ত সাহায্যের ব্যয় মিশন কর্তৃপক্ষ বহন করিবেন।

হরিজনদিগের ছেলেমেয়েদের জন্য একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় মিশন কর্তৃক পরিচালিত হয়। উহাতে ছাত্রছাত্রীরা সরকারের সাহায্যে অবৈতনিক বিদ্যার্জন করে; তাহাদের পাঠ্য-পুস্তকাদির সমুদয় ব্যয়ভার বহন করে রামকৃষ্ণ মিশন। মিশনের অন্যান্য বিদ্যালয়গুলিতে সকলেই পড়িবার সুযোগ পায়।

স্থানীয় রোটারি ক্লাবের আনুকূল্যে মিশন একটি 'বুক ব্যাঙ্ক' খুলিয়াছেন। ইহাতে দুঃস্থ পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ উপকৃত হইবে।

কার্যবিবরণী

নিউ দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে মে মাসে সাধারণ-ভাবে এই কেন্দ্রের সূচনা হয় এবং ১৯৩৫ খৃঃ অক্টোবরে নিজস্ব স্থানে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

আলোচ্য বর্ষে নিয়মিত ধর্মালোচনা ও সাময়িক বক্তৃতাদির মাধ্যমে আশ্রমে এবং আশ্রমের বাহিরে বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব প্রচারিত হইয়াছে।

তুলসী-রামায়ণ অবলম্বনে হিন্দীতে ৫০টি আলোচনা হয়; মোট ২২,৬০০ জন শ্রোতা যোগদান করেন।

দিল্লী কেন্দ্রের পরিচালনাধীন গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, অবৈতনিক যক্ষ্মা-ক্লিনিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় আছে।

গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা (শিশুবিভাগসহ) মোট ১৯,৪৩৭; আলোচ্য বর্ষে ২,'৯৭ খানি গ্রন্থ সংযোজিত হইয়াছে। পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তক-সংখ্যা ১৭,৭৬৫। পাঠাগারে গড়ে দৈনিক পাঠক-সংখ্যা ৩৬৭। পাঠাগারে ১৪টি সংবাদপত্র এবং ১৪২টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। নানা দিক দিয়া গ্রন্থাগারটির উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে।

গ্রন্থাগারের বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্রবিভাগটি ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ করা হয়। এখানে ২,৬৬২ খানি পুস্তক রাখা হইয়াছে। দৈনিক গড়ে ১০৭ জন বিদ্যার্থী এখানে পড়াশুনা করে। আলোচ্য বর্ষে ৯১৬ জন ছাত্রছাত্রী এই গ্রন্থাগারের পুস্তক ব্যবহার করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে যক্ষ্মা-ক্লিনিকে (আর্যসমাজ রোড, কারলবাগে অবস্থিত) বহির্বিভাগে ১,৩৮,৬১৩ (নূতন ১,৯০৬) জন রোগী চিকিৎসিত হয়। অন্তর্বিভাগের পর্যবেক্ষণ ওয়ার্ডে ২৪৬ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৩২,৮২৭, তন্মধ্যে নূতন রোগী ৬,০০০।

সারদা মহিলা-সমিতির উদ্যোগে প্রতি রবিবার সারদা মন্দিরে ৬ হইতে ১২ বৎসরের বালক-বালিকাদিগকে ভজন, অভিনয়, সঙ্গীত ও প্রার্থনাদি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তাহাদের নৈতিক ও শারীরিক উন্নতিসাধনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। আলোচ্য বর্ষে গড়ে ৪০টি বালক-বালিকা এই ক্লাসে যোগদান

করিয়াছিল। সারদা মহিলা-সমিতির সেবা- ও কৃষ্টিমূলক কার্যাদিও প্রশংসনীয়।

শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধদেব, গুরুনানক ও আচার্য শঙ্করের জন্মদিন সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। স্বামীজীর ১০৬তম জন্মোৎসব উপলক্ষে আবৃত্তি- ও বক্তৃতা-প্রতিযোগিতায় ১,৬৬৫ জন অংশগ্রহণ করিয়াছিল, উহাদের মধ্যে কৃতকার্য প্রতিযোগীদিগকে ১,১৮১৲ টাকা মূল্যের ২১৮টি পুরস্কার দেওয়া হয়

১৩৩তম শ্রীরামকৃষ্ণজন্মোৎসব উপলক্ষে নারায়ণসেবা-দিবসে তাহিরপুর কুষ্ঠকলোনীর ১৮০ জন রোগীকে এবং সীমাপুর কলোনীর শিশু সহ ৬০০ জন দুঃস্থকে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করানো হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন সময়ে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও দিল্লীতে যে-সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, দিল্লী কেন্দ্র কর্তৃক তাহার জন্য অর্থ ও দ্রব্যাদি প্রেরণ করা হয়।

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ৬১তম বর্ষের কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৭—মার্চ, ১৯৬৮) প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রমে বর্তমানে মেডিক্যাল, সার্জিক্যাল, রেডিওলজি, এক্স-রে, ফিজিওথেরাপি প্রভৃতি সুপরিচালিত বিভাগে অ্যালোপ্যাথিক মতে আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

অন্তর্বিভাগে ১০৩টি শয্যা আছে; এই বিভাগে চক্ষুরোগী সহ আলোচ্য বর্ষে ২,২৬৬ জন রোগী ভরতি হয় এবং ১,৮১২ জন আরোগ্য-লাভ করে। অন্তর্বিভাগে চক্ষু-অস্ত্রোপচার সহ মোট ৯৯৫টি অস্ত্রোপচার করা হয়।

আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে ১,৪৮,৭৫৪ জন রোগী (পুরাতন ১,২০,০০৬) চিকিৎসিত হয় এবং চক্ষুরোগী-সহ মোট ৮০৭ জনের অস্ত্রোপচার করা হয়। বহির্বিভাগে গড়ে দৈনিক চিকিৎসিতের সংখ্যা ৪০৬।

আলোচ্য বর্ষে এক্স-রে বিভাগে ১,০৭৩টি এক্স-রে করা হয় এবং ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ১৬,৬২১টি প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়। ফিজিওথেরাপি বিভাগে ২৪৯ জন রোগী চিকিৎসালাভ করে।

আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক বিভাগে নূতন ও পুরাতন রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩,৩৩৬ ও ১৫,১৬২।

বৃন্দাবন সেবাশ্রমের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সুপরিচালিত চক্ষুবিভাগটিতে সহস্র সহস্র চক্ষুরোগী সুচিকিৎসা লাভ করিয়া নিরাময় হইতেছে।

রোগীদের জন্য একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার করা হইয়াছে; এখানে উপযুক্ত পুস্তকাবলী ও পত্রপত্রিকা রাখা হয়।

উৎসব-সংবাদ

বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৬শে ও ২৭শে এপ্রিল, যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব ও আশ্রম-বিদ্যালয়সমূহের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম দিবস অপরাহ্নে বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রগণকে পারিতোষিক বিতরণ করেন। এই দিন সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত আশ্রমের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ আবৃত্তি, বিতর্ক, সঙ্গীত প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগদান করে।

পরদিবস ছাত্রগণ উদয়াস্ত একটানা স্বামী বিবেকানন্দের বাণী পাঠ করে। বৈকাল

৪ টায় শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী স্বামী বিবেকানন্দ-লীলাগীতি পরিবেশন করেন। পরে শ্রীহৃটবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্যামাসঙ্গীত গীত হয়।

সন্ধ্যা ৬ টায় ধর্মসভায় স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ ও অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীমৎ স্বামী ধ্যানাত্মানন্দজী বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত পন্থা-অবলম্বনই মানবের চরম এবং পরম লক্ষ্য। পরে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি পরিবেশিত হয়।

বাগেরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গ ২৩শে মে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৪তম শুভ জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা, পাঠ, কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় আড়াই হাজার ভক্ত নরনারীর মধ্যে খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণ সাড়ে ছয় ঘটিকায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় জেলাশাসক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার মহোদয়। সভার প্রারম্ভে আশ্রমের কার্য-বিবরণী পাঠ ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এ যুগের অবতার' বিষয় অবলম্বনে একটি নাতি-দীর্ঘ বক্তৃতা করেন আশ্রমাধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্ত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ অবলম্বনে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন শ্রীবিমলাংশু রায়, শ্রীপরমানন্দ রায়, অধ্যাপক বিনোদবিহারী দাস, শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীবিনোদবিহারী সেন ও শ্রীঅজিত-কুমার ঘোষ। সভাপতির ভাষণান্তে সভার সমাপ্তি ঘোষিত হয়। পরে পদাবলীকীর্তন হয় রাত্রি দেড়টা পর্যন্ত।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে বার্ষিক উৎসব এবং ভক্তসম্মেলন এ বৎসর ৬ই হইতে ৮ই জুন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বিভিন্ন জেলা হইতে প্রায় ৩০০ ভক্ত এবং ১০ জন সাধু সমবেত হইয়াছিলেন। ভক্তগণ তিনটি সম্মেলনে একত্র হইয়া আদর্শ জীবন ও ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের উৎকর্ষসাধন এবং সমষ্টিগতভাবে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন। আশ্রমাধ্যক্ষ তাঁহার বার্ষিক বিবরণীতে এই আশ্রম-পরিচালিত দুইটি নার্সারী স্কুল, দুইটি নিম্ন-বুনিয়াদী, দুইটি প্রাথমিক এবং তিনটি নৈশ বিদ্যালয়, একটি হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ও তিনটি হোমিও-প্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনার কথা বর্ণনা করেন।

স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ, স্বামী গদাধরানন্দ, স্বামী ঈশানানন্দ ও স্বামী আপ্তকামানন্দ শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী, যুগাচার্য বিবেকানন্দ এবং ধর্মসমন্বয়াবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শ জীবন ও বাণী সম্বন্ধে অতি মনোরম যুগোপযোগী বক্তৃতা করেন। তাঁহারা বলেন, মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম প্রীতি ভালবাসা যতদিন না প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ততদিন মানবসমাজে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না। ইহার জন্য আমাদিগকে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অমোঘ বাণী—ঈশ্বর-জ্ঞানে মানবসেবাকে জীবনে সার্থক করিয়া তুলিবার সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বামী রঘুবীরানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে জানাইতেছি, গত ১লা জুলাই, ১৯৬৯ রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় স্বামী রঘুবীরানন্দ (সারদা মহারাজ) ৬৭ বৎসর বয়সে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বিকল হইয়া গিয়াছিল।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুন সেবাশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন।

তিনি দেওঘর বিদ্যাপীঠে দীর্ঘকাল শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, এবং কুরুক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত আর্তত্রাণকার্যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বিভিন্ন সময়ে শ্রীহট্ট, মনসাদ্বীপ ও রামহরিপুর আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে চির শান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

'অ্যাপোলো-১১'-র চন্দ্রাভিযান

গত ১৬ই জুলাই নীল এ. আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিন্স ও এডুইন ই. অ্যালড্রিন 'অ্যাপোলো-১১' মহাকাশ যানে চড়িয়া চন্দ্রাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এ অভিযানের উদ্দেশ্য চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করিয়া যন্ত্রপাতি সহ উহার পরীক্ষা, ফটো তোলা এবং চন্দ্রপৃষ্ঠ হইতে কিছু উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইয়া আসা। এইটিই হইবে মানুষের পৃথিবীর বাহিরের অপর ভূমিখণ্ডে প্রথম পদার্পণ। মনুষ্যজাতির ইতিহাসের দিক হইতে ইহা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, মানুষের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার এবং সাহসের অতুলনীয় নিদর্শন। পার্ল এস. বাক এবিষয়ে মন্তব্য করিয়াছেন, " 'অ্যাপোলো-১১' নিছক প্রতিযোগিতার বহু উর্ধ্বে। সর্বজনীন জিজ্ঞাসার উত্তর ওতে মেলে।"

অভিযানের নায়ক আর্মস্ট্রং; তিনি এবং অ্যালড্রিন মূল যান হইতে অপর একটি যানে চড়িয়া চন্দ্রপৃষ্ঠে সেই যানটিকে নামাইবেন। পরে বিশ্রামান্তে চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রথম অবতরণ করিবেন আর্মস্ট্রং; তাহার আধঘণ্টা পরে অ্যালড্রিন নামিবেন। দুইজনে প্রায় তিন ঘণ্টা চন্দ্রপৃষ্ঠে হাঁটিয়া বেড়াইয়া তথ্যসংগ্রহাদি করিবেন।

উৎসব-সংবাদ

খুলনা শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২রা মে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বাহ্ণে পূজাপাঠাদি ও বেলা ১টায় সমাগত আটশতাধিক ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সারাদিন শিল্পিবৃন্দ ভজন পরিবেশন করেন। বৈকালে ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী যোগদানন্দজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মণ্ডপে (শ্যামপুকুর, কলিকাতা) গত ৩০শে মে হইতে ২রা জুন পর্যন্ত চারদিন বিশেষ পূজা-পাঠাদি, ধর্মসভা, লীলাকীর্তন, প্রসাদবিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীর শুভ প্রতিষ্ঠার তৃতীয় বার্ষিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয় দিন শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত শ্রীসারদাদেবীর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ দেন এবং ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী বীতশোকানন্দজী, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজী ও স্বামী অমলানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং মণ্ডপের সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র পাল মণ্ডপের দ্বিতীয় বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন। তৃতীয় দিন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ কথকতা করেন এবং ধর্মসভায় সভাপতি শ্রীপুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ও কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। বিভিন্ন দিনে ভজন-সঙ্গীত, লীলাকীর্তন, বন্দনাগীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

চাঁপাপুকুর পল্লীতে (২৪ পরগণা) গত ৮ই জুন সুসজ্জিত মণ্ডপে বেলুড় মঠের স্বামী জীবানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ

ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শুভ জন্মোৎসব বিশেষ আনন্দ ও উদ্দীপনা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। . সভাপতি মহারাজ র ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও উপদেশ প্রাঞ্জল ভাষায় ভক্তগণসমক্ষে পরিবেশন করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা পটলডাঙ্গা 'শক্তি-সঙ্ঘের' সভ্যবৃন্দ কর্তৃক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-গীতি-আলেখ্য সুমধুর সঙ্গীতে পরিবেশিত হয়।

পরলোকে আশুতোষ সেনগুপ্ত

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য আশুতোষ সেনগুপ্ত গত ১৫ই মে শেষ রাত্রে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বে দেড়মাস কাল তিনি জনডিস্-এ ভুগিতেছিলেন। শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনা।

পরলোকে প্রমথকুমার নাথ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, বনগাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীপ্রমথ-কুমার নাথ হৃদ্রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ৪ঠা জুলাই পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রার্থনা করি, তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণচরণে যেন চিরশান্তি লাভ করে।

এই সংখ্যার লেখকগণ

১। শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু :
অধ্যাপক (বাংলা), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

২। শ্রীকানাইলাল সামন্ত :
কলিকাতা

৩। শ্রীঅমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় :
অধ্যাপক, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, নৈহাটি।

৪। শ্রীরবি ঘোষ :
নিউ দিল্লী

৫। সেখ সদরউদ্দীন :
খড়দহ (২৪ পরগণা)

৬। স্বামী জীবানন্দ :
উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

৭। শ্রীবনবালা মুখোপাধ্যায় :
কলিকাতা

৮। ডক্টর তারকনাথ ঘোষ, সাহিত্যভারতী
শ্রীরামপুর (হুগলী)

৯। স্বামী অমৃতত্বানন্দ :
রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড়



দিব্য বাণী

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ১৫
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৮ম অধ্যায়

(শ্রীহরি-স্মরণ-অমিয় না পিয়ে, ভোগের নেশায় রাঙায়ে মনে
শুভকাজে যারা ব্রতী রয় রাখি দৃষ্টি পুণ্যফলার্জনে,
স্বর্গাদিলোকে গিয়ে তারা পুনঃ সে-পুণ্যফল ভোগের শেষে
আবার মাটির শরীর লইয়া এই মাটিতেই ফিরিয়া আসে;—
ফিরিতেই হয় গেলেও ব্রহ্মা-নিলয়ে, সর্ব উচ্চ দেশে।)

আজীবন ধরি সতত আমার পানেই যাহার চিত্ত ধায়,
আমার স্মরণ ছাড়া যার মন অন্য কোনও কিছু না চায়
মোর সনে সদা যুক্ত সে যোগী, সুলভে আমারে পায় সেজন।
নিম্নে ভূলোক হইতে ব্রহ্ম-লোক যা সর্ব-উর্ধ্বতন
(সকাম যে জন তাহার নিকট) বারে বারে করে আবর্তন;
আমার পরমপদ যে পেয়েছে, ভগবানলাভ হয়েছে যার,
মুক্ত মহান্-আত্মা যে, শুধু পুনর্জন্ম হয় না তার,
অনিত্য সব দুঃখ-নিলয় ভুবনে ঘুরিতে হয় না আর।

কথাপ্রসঙ্গে

জন্মাষ্টমী

প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ভাদ্র কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে এক দুর্যোগময় নিশার গভীর অন্ধকারের অবসানে বিমল চন্দ্রোদয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরার কারাগৃহে নরদেহে অবতীর্ণ হন। ভারতের, সনাতন অধ্যাত্ম ভারতের ভাগ্য-গগনও তখন ঘন-অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। তাঁহার জীবন অবলম্বনে বৃন্দাবনে শুদ্ধাভক্তির পূর্ণ চন্দ্রোদয়ে এবং কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গণে 'অনন্যা', জ্ঞানমিশ্রা, ভক্তি-ভিত্তিক বিপুল কর্মোদ্যমের সূর্যোদয়ে সে অন্ধকার অপসৃত হয়।

শুদ্ধাভক্তিপথের অধিকারী অতি বিরল। আত্মীয়স্বজন, মান-অপমান সব ভুলিয়া, অতি তুচ্ছবোধে সব ছুড়িয়া ফেলিয়া, 'আমার' বলিতে আমাদের যাহা কিছু আছে তাহার সব কিছু শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে আপন হইতেও আপনার বোধে সর্বক্ষণ তাঁহার চিন্তায় মনকে নিমগ্ন রাখিতে পারে কয়জন! সর্বসাধারণের মধ্যে এই পথে, বিশেষ করিয়া মধুরভাবে সাধনের প্রচেষ্টায় তাই অধিকাংশ সময়ে দেহাভিমানী দুর্বল মন আমাদের প্রতারণা করে—ভগবানের দিকে আগাইয়া না দিয়া পিছাইয়াই আনে—সত্ত্ব-গুণের আবরণে মহাতামসিকতা আনিয়া দেয়।

বর্তমানে আমাদের জাতির এই তমো-ভাবাপন্ন অবস্থায় তাই বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োজন তত নাই যত আছে কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণের—যিনি বিন্দুমাত্র বিপথগামিত্ব দেখিলেও বজ্রকণ্ঠে গর্জিয়া উঠেন, "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ!" যিনি সর্বক্ষণ আমাদের বিপুল উদ্যমে কর্ম করিতে বলেন, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎস্মরণও করিতে বলেন—একহাতে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ধরিয়া রাখিয়া অপরহাত দিয়া কাজ করিতে বলেন।

তামসিকতা কাটাইয়া সত্ত্বগুণের উদ্বোধনের ইহাই রাজপথ, আমাদের প্রায় সকলেরই আজ ইহাই প্রয়োজন। আজ তাই প্রার্থনা জানাই অর্জুনের রথের সারথিকে, ভারতের চির-সারথিকে, ভারতের জনচিত্তে আবির্ভূত হইয়া তিনি যেন আমাদের জীবনরথকে কল্যাণপথে চালিত করেন!

সফল চন্দ্রাভিযান

গত ১৬ই জুলাই নীল আর্মস্ট্রং, এডুইন অ্যালড্রিন ও মাইকেল কলিন্স অ্যাপোলো-১১ মহাকাশযানে আমেরিকার কেপ কেনেডি উৎ-ক্ষেপণ-কেন্দ্র হইতে চন্দ্রে যাত্রা করিয়াছিলেন; গত ২১শে জুলাই মধ্যরাত্রে আর্মস্ট্রং ও অ্যালড্রিন সেখানে চন্দ্রযান নামাইয়া ও সকালে চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পণ করিয়া মানুষের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত করিলেন। পৃথিবীর বাহিরে যাইয়া অপর কোন জ্যোতিষ্কে মানুষের এই প্রথম পদার্পণ। ইহা মানুষের বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার বিরাট সাফল্য, মানুষের সাহসিকতার ও উদ্যমের গৌরবময় বিজয়। আর্মস্ট্রং, অ্যালড্রিন ও কলিন্সের নাম মানব-জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

মহাকাশ-অভিযানের এই বিজয়-উৎসবে আজ আমরা সগৌরবে স্মরণ করি ১৯৫৭

খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর তারিখের মহাকাশ-অভিযানের উদ্বোধন-উৎসবকে—যেদিন রাশিয়া হইতে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হইয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করি পরলোকগত য়ুরী গ্যাগারিনকে, যিনি ১৯৬১র ১২ই এপ্রিল মহাকাশে উঠিয়াছিলেন মানুষের প্রথম প্রতিনিধিরূপে।

মহাকাশ-অভিযানে সহস্র সহস্র কোটি টাকা ব্যয়িত হইতেছে; ইহার সার্থকতা আছে কি না, এ প্রশ্ন আজ বহু চিন্তাশীল লোকের মনে জাগিতেছে; কিন্তু অন্য কোন সার্থকতা যদি নাও থাকে, পৃথিবীর মানুষ আজ পথের অগণিত বাধা জয় করিয়া আড়াই লক্ষ মাইল দূরের জ্যোতিষ্কে পদার্পণ করিয়া ফিরিয়া আসিল—এ ঘটনাটিই কি একটি অমূল্য সার্থকতা নহে? মহাকাশ-অভিযানে ব্যয়িত না হইলেই কি এই অর্থ অনুন্নত দেশগুলির উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইত?

সে প্রশ্ন ভিন্ন প্রশ্ন। সে প্রশ্ন হইল বহিঃ-প্রকৃতিকে জয় করিতে আমরা আজ যতখানি তৎপর ও সফল হইয়াছি, অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করিবার জন্য সমভাবে তৎপর হওয়া তো দূরের কথা, এরূপ করিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়াই মনে করিতেছি কিনা সন্দেহ। যদি মনুষ্যজাতিকে বাঁচাইতে হয়, তাহা হইলে মানুষের বহিঃপ্রকৃতি-বিজয়ের পথরোধ নহে, তাহাকে অন্তঃপ্রকৃতি-বিজয়ের পথেও অগ্রসর করাইতে সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে।

ক্রমমুক্তি ও পরলোক

দেহাত্মবুদ্ধিহীনতাই মুক্তি

বন্ধন থাকিলে তবে মুক্তির প্রশ্ন উঠে। আমাদের বন্ধন কি?—এ প্রশ্নের বোধ হয় সংক্ষিপ্ত উত্তর দেহাত্মবোধ, স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহকে, দেহমনবুদ্ধিকে 'আমি' বলিয়া ভাবা। আমরা স্বরূপতঃ নিত্যমুক্ত, নিত্যানন্দময়, অমর। দেহমনকে আমি বলিয়া ভাবি বলিয়াই আমরা দেহমনের সীমায় নিজেদের আবদ্ধ করিয়া ফেলি এবং তাহারই ফলে দেহমনের চাহিদাকে আমাদেরই চাহিদা, দেহমনের রোগ-জরা-মৃত্যু, দুঃখভয় প্রভৃতিকে আমাদেরই মৃত্যু, দুঃখ প্রভৃতি মনে করিতে বাধ্য হই।

এই দেহাত্মবোধের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য আমাদের প্রয়োজন দেহমনের দাসত্বকে, উহাদের বন্ধনকে, উহাদের চাহিদাকে অস্বীকার করা,—ভোগ ও ভোগেচ্ছা কমাইয়া আনা। আর মনকে বহির্বিষয় হইতে গুটাইয়া আনিয়া সত্যের চিন্তায় বা ভগবানের চিন্তায় একাগ্র করিবার প্রয়াস। এই দুইটিরই প্রয়োজন। কারণ, দেহমনের মাধ্যমে যত বেশী ভোগ করা যায় দেহমনে আমি-বোধ তত বেশী বাড়ে, বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। আর বিষয় বা ভোগ্যবস্তুর চিন্তা যত কম করা যায়, একদিকে সেগুলিকে ভোগ করিবার ইচ্ছা বা বাসনা তত কমে, এবং অপরদিকে মন ভিতর হইতেই বিষয়নিরপেক্ষ আনন্দের, বিষয়ের সংস্পর্শ ছাড়াও জীবনকে তৃপ্তিতে ভরাইয়া রাখিবার মত একটা অবলম্বনও পাওয়া যায়; আনন্দের, তৃপ্তির, প্রসন্নতার একটা অবলম্বন ছাড়া জীবনে কোন চেষ্টাই সর্বান্তঃকরণে করা যায় না। বন্ধন-মুক্তির সর্ববিধ শাস্ত্রোক্ত বিস্তারিত বিধিনিষেধের মূল লক্ষ্য ইহাই।

কিন্তু জন্মজন্মান্তর ধরিয়া বিষয়ভোগজনিত সুখের স্মৃতি আমাদের মনে সংস্কাররূপে এত দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকে যে, আমরা ইচ্ছামাত্র

ভোগ হইতে সম্পূর্ণ বিরত হইতে বা ভোগ্যবস্তুর চিন্তা হইতে মনকে সম্পূর্ণরূপে সরাইয়া আনিয়া ঈশ্বরচিন্তায় বা আত্মচিন্তায় একাগ্র করিতে পারি না। প্রবল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী অল্পসংখ্যক কয়েকজনমাত্র পূর্ণ সংযম ও পূর্ণ একাগ্রতা সহায়ে এই জন্মেই, এই দেহে থাকাকালেই স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণাদি সর্ববিধ দেহাত্মবোধের বন্ধন এককালে ছিন্ন করিয়া সরাসরি মুক্ত হইয়া যান—দেহ থাক বা না থাক, নিজেকে কখনো তাঁহারা আর দেহমন বলিয়া ভাবেন না, সর্বাবস্থায় নিজেকে নিত্যমুক্ত নিত্যানন্দময় সত্তারূপে প্রত্যক্ষ করেন।

ক্রমমুক্তির অধিকারী ও পথ

কিন্তু সে কয়জন? তাই অধিকাংশের জন্য ব্যবস্থা—শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে সংযত ভোগ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে যথাসাধ্য ভগবচ্চিন্তা ও সৎকর্মের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে ভোগেচ্ছা কমাইয়া আনিয়া, মনকে ত্যাগমুখী করিয়া দেহাত্মবোধের বন্ধন ক্রমে ক্রমে ছিন্ন করা। ইহাই ক্রমমুক্তির পথ।

এভাবে চলিতে চলিতে আমাদের মন যখন অন্তরস্থ বিষয়নিরপেক্ষ অফুরন্ত আনন্দ-ভাণ্ডারের দ্বার খুলিতে সমর্থ হয়, যখন ইহলোকের এবং স্বর্গাদি পরলোকেরও ভোগসমূহে বীতস্পৃহ হয়, নিষ্কাম হইয়া, প্রতিদানে কিছু না চাহিয়া আমরা যখন শাস্ত্রনির্দিষ্ট শুভকার্যগুলি করিবার মত বিশুদ্ধ হই, তখন আর আমাদের মৃত্যুর পর স্থূলদেহ লইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে, এই স্থূলজগতে আসিতে হয় না (কারণ বিষয়ভোগের ইচ্ছা বা বাসনাই পুনর্জন্মের কারণ), স্থূলবন্ধনকে আর বরণ করিয়া লইতে হয় না। তখন সূক্ষ্মদেহে আমরা সূক্ষ্মজগতে বা উচ্চলোকে গমন করি এবং সেখান হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর লোকে গমন করিয়া শেষে সর্বোচ্চ লোকে যাইয়া মুক্ত হই, আমাদের নিত্য-মুক্ত স্বভাব ফিরিয়া পাই। ক্রমমুক্তির পথে এভাবে ধাপে ধাপে মুক্তি আসে।

শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে চলিয়া যাঁহারা ভগবচ্চিন্তা ও সৎকর্মের অনুষ্ঠান করেন, অথচ ভোগেচ্ছা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন না, সৎকর্মের প্রতি-দানে শুভফল বা পুণ্য অর্জন করিতে চান, তাঁহারাও উচ্চলোকে গমন করেন। এই লোকের নাম 'চন্দ্রলোক' বা স্বর্গধাম। ইহা দেবতাদের আবাসভূমি। এখানে দেবদেহ প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল তাঁহারা সুখভোগ করেন, কিন্তু শুভকর্মের ফল, পুণ্য, শেষ হইলে আবার তাঁহাদের স্থূলদেহ লইয়া এই স্থূল জগতে ফিরিয়া আসিতে হয়; সেখান হইতে তাঁহাদের নিম্নগতি হয়, উর্ধ্বগতি হয় না, মুক্তি হয় না। ইন্দ্রাদি দেবতাদের যে অমর বলা হয় উহা আপেক্ষিক অর্থে, আমাদের জীবনের তুলনায় তাঁহাদের জীবন অতি দীর্ঘ, এই অর্থে।

আধুনিক অবিশ্বাস ও স্বামী বিবেকানন্দ

এই শাস্ত্রোক্ত পরলোক সম্বন্ধে আজ অধি-কাংশ লোকের মনেই অবিশ্বাস। আদিকাল হইতে মানুষ কোন-না-কোন আকারে পর-লোকে বিশ্বাসী ছিল। জড়জগতের সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটনে বিজ্ঞানের প্রচেষ্টায় যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলির ফলে মানুষের মন হইতে অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাসগুলির সহিত পরলোকে বিশ্বাসও অপসৃত হইয়াছে। শাস্ত্রের কথা এখন অধি-কাংশ মানুষ বিশ্বাস করিতে পারে না। এখন 'বিজ্ঞানসম্মত' কথাটি মানুষের মনে বিশ্বাস উৎপাদনে ম্যাজিকের মতো কাজ করে, যেমন একদিন করিত 'বেদবাক্য' কথাটি। এই

বিশ্বাসের কারণ অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই এক—বিজ্ঞানী বা সত্যদ্রষ্টা কেহই নিজে ভালভাবে না যাচাইয়া-বাজাইয়া, না প্রত্যক্ষ করিয়া কোন সত্যই প্রচার করেন না, বা করেন নাই। তথাপি নানা কারণে এরূপ ঘটিয়াছে। আজ নয়, এই 'আধুনিক' মনোভাব উনবিংশ শতাব্দী হইতেই প্রকট। স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচার করিতে যান তখন আধুনিক মনের এই প্রবণতাটি সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন, তাই বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াই, আধুনিক মননের পাত্রে ঢালিবার উপযোগী করিয়াই বেদান্তাদি শাস্ত্রের উচ্চ তত্ত্বগুলিকে পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন: "আমি এখন বেদান্তের সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব নিয়ে খুব খাটছি। আমি স্পষ্টই আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তের ঐ তত্ত্বগুলির সম্পূর্ণ ঐক্য দেখছি; তাদের একটা পরিষ্কার হলে সঙ্গে সঙ্গে অপরটাও স্পষ্ট হয়ে যাবে।" "আমি এ বিষয়ে এমন আলোক দেখতে পাচ্ছি যা সমস্ত ভোজবাজী থেকে মুক্ত। আমি সুকঠিন যুক্তিকে প্রেমের মধুরতম রসে কোমল করে তীব্র কর্মের মশলাতে সুস্বাদু করে এবং যোগের পাকশালায় রান্না করে পরিবেশন করতে চাই, যাতে শিশুরা পর্যন্ত তা হজম করতে পারে।"

বলা বাহুল্য, শুধু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নয় তৎকালীন সর্ববিধ আধুনিক চিন্তার সহিত সুপরিচিত, আবার সর্ববিধ আধ্যাত্মিক তত্ত্বেরও প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী বিবেকানন্দই ছিলেন আধুনিক চিন্তার সহিত অধ্যাত্মচিন্তার সেতুবন্ধনের যোগ্যতম ব্যক্তি ও অগ্রদূত। তাঁহারই ভাবানুসরণ ও কথাই তাই প্রসঙ্গটি সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করার শ্রেষ্ঠ সহায়ক। সেজন্য সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের কথা সামান্য আলোচনা করিয়া তাঁহারই ভাব ও কথা আমরা উপস্থাপিত করিতেছি।

আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জগৎ

আধুনিক বিজ্ঞান জড়জগতের বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্য সম্বন্ধে যাহা বলে এবং তাহারই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে যেটুকু অনুমান করে, তাহা খুব সংক্ষেপে এভাবে বলা চলে:

জগতে যাহা কিছু সৃষ্ট পদার্থ আছে তাহাকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—জড় ও শক্তি; অথবা বলা ভাল জড়ধর্মী ও শক্তিধর্মী। কারণ যাহাকে জড় বলি তাহা ইলেকট্রন-প্রোটনাদি অতি ক্ষুদ্র কণারূপে বা অণুপরমাণুরূপে বা উহাদের সমবায়ে গঠিত আমাদের সচরাচরদৃষ্ট স্থূল বস্তুরূপে—যেরূপেই থাকুক না কেন, সর্বাবস্থায় তাহার সহিত শক্তিকে সংযুক্ত দেখা যায়—উহাদের সংযোজক- ও ধারকরূপে বা যে কোন রূপেই হউক না কেন। আবার শক্তিকেও দেখা যায় জড়ের সহিত সংযুক্ত। একমাত্র তরঙ্গ বা স্পন্দনাকারে শক্তির বিচ্ছুরণের সময় উহার সহিত জড়ের সংস্পর্শ থাকে না বলিয়াই বিজ্ঞানীরা আজকাল অনুমান করেন; পূর্বে কিন্তু তাঁহাদের ধারণা ছিল ইথার নামক অতি সূক্ষ্ম সর্বব্যাপী কোন জড় সত্তাকে শক্তি তরঙ্গাকারে স্পন্দিত করে এবং সেই তরঙ্গ অবলম্বনেই বিচ্ছুরিত হয়। কিন্তু তাঁহাদের এ ধারণা যে পরে আবার পরিবর্তিত হইবে না, তাহা জোর করিয়া কেহই বলিতে পারেন না; আলোকের কার্যের ব্যাখ্যায় কণাতত্ত্বকে গ্রহণ, পরে উহাকে বর্জন করিয়া তরঙ্গতত্ত্বের গ্রহণ এবং তাহারও পরে পুনরায় তরঙ্গতত্ত্বের সহিত কণাতত্ত্বের পুনর্গ্রহণের ন্যায় বিদ্যুৎশক্তির বিচ্ছুরণের ব্যাখ্যায় যে ইথার নামক কোন অতিসূক্ষ্ম

সর্বব্যাপী জড় সত্তার মাধ্যম ভবিষ্যতে পুনরায় গৃহীত বা প্রমাণিতই হইবে না, তাহা জোর করিয়া কেহই বলিতে পারেন না। বস্তুর গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে বিজ্ঞানের অগ্রগতি তো এখনো শেষ কথা বলিবার মতো চরম অবস্থায় আসিয়া থামে নাই।

সে যাহাই হউক, জড় ও শক্তিই যে জড়-জগতের সব বস্তুর মূল উপাদান এবং জড়ের উপর শক্তির ক্রিয়াশীল হওয়ার ফলেই যে জড়জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, পরিবর্তন ও ক্ষয়, রূপান্তর বা বিনাশ ঘটিতেছে—একথা বিজ্ঞান নির্দ্বিধায় ঘোষণা করে।

বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোকে পরলোক

আমাদের শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বও তাহাই বলে। সমস্ত জড়ধর্মী সত্তার সূক্ষ্মতম অবস্থাকে বলা হয় 'আকাশ', আর তাপ আলো বিদ্যুৎ, প্রাণশক্তি, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত সমস্ত শক্তির সূক্ষ্মতম অবস্থাকে বলা হয় 'প্রাণ'। আকাশ বলিতে 'স্পেস' বা দেশ সম্বন্ধে আমাদের যাহা ধারণা, তাহাকে শূন্য না ভাবিয়া অতিসূক্ষ্ম কোন জড় সত্তায় পূর্ণ ভাবিলে যাহা হয়, অনেকটা তাহাই।[১] আকাশ জড়ধর্মী বলিয়া উহা নিজে নিজে স্পন্দিত হইতে পারে না। প্রাণ বা শক্তি যখন উহার উপর ক্রিয়াশীল হয়, তখনই সৃষ্টি শুরু হয়। প্রাণের স্পন্দন বলিতে প্রাণ কর্তৃক উত্থাপিত আকাশের স্পন্দনই বোঝায়। প্রাণ ও আকাশ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত না হইলে স্পন্দনই হয় না, সৃষ্টিই হয় না। স্পন্দনমাত্রই হইল ক্রিয়াশীল-প্রাণ-সংযুক্ত আকাশ। এই স্পন্দন স্থূল সূক্ষ্ম বিভিন্ন পর্যায়ের আছে। স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত জগৎ ও সেগুলির অন্তর্গত বস্তু বলিতে এই স্থূল সূক্ষ্ম স্পন্দনচয়ই বুঝায়। এগুলি ছাড়া কোন জগতের কোন অস্তিত্বই থাকে না।

আমাদের চন্দ্র-সূর্য-তারকাদি-মণ্ডিত এই জগৎ বা 'লোক' স্থূলজগৎ। ইহার শাস্ত্রীয় নাম 'আদিত্যলোক'।[২] ইহা প্রাণ ও আকাশের স্থূলতম স্পন্দন সঞ্জাত। প্রাণ ও আকাশের সূক্ষ্মতম স্পন্দন সঞ্জাত জগৎগুলির নাম 'চন্দ্রলোক' 'বিদ্যুল্লোক' প্রভৃতি।

তাহার পরেরও যে জগৎ তাহা প্রাণ ও আকাশ যে সত্তার দুটি বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র, সেই সত্তা দিয়া গঠিত; প্রাণ ও আকাশ এই সত্তায় মিলিত হইয়াছে। বোধ হয় বলা চলে মূল ইচ্ছা, ভগবদিচ্ছাই সে জগতের উপাদান। তাহার পরে স্থূল সূক্ষ্ম সর্ববিধ জগতের সব কিছুর মূল সত্তা—শুদ্ধ চেতনা। উহাই চরম সত্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চরম তত্ত্ব।

এই লোকগুলির অবস্থান একটি অপরটির ঊর্ধ্বে বা নিম্নে, এভাবে বলা হইয়াছে। এখানে ঊর্ধ্ব বা নিম্ন বলিতে বুঝায় সূক্ষ্মত্ব ও স্থূলত্ব, কোন দূরত্ব নয়। একই স্থানে বিভিন্ন স্পন্দনবিশিষ্ট বহু জগৎ থাকিতে পারে। যেমন এই স্থূল জগতেই, এখানেই এখনই স্থূলবস্তু বাতাসের সঙ্গে স্থূল জগতের অন্যান্য

১ শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব বিজ্ঞানের মতোই প্রত্যক্ষজ্ঞান-ভিত্তিক। বিজ্ঞানের অগ্রগতি অব্যাহত হইলে শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি যে বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়াই গৃহীত হইবে, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; বিশেষ করিয়া স্থূলজগতের তত্ত্বগুলি যখন সবই এখনো অবিরোধী দেখা যাইতেছে। শাস্ত্রোক্ত 'আকাশ' বিজ্ঞানীদের পূর্ব-অনুমিত 'ইথারে'রই সদৃশ (স্থূল আকাশ); আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এখন না করিলেও বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে ভবিষ্যতে একদিন 'ইথার' বা সমজাতীয় কোন তত্ত্বকে বিজ্ঞানীদের পুনর্গ্রহণ করিতেই হইবে।

২ বিভিন্ন ভাবে সূক্ষ্মলোকগুলির বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। এখানে স্বামীজী 'অদ্বৈতভাবে' ব্যাখ্যা করিবার সময় যে নাম ও ক্রম দিয়াছেন, তাহাই দেওয়া হইল। প্রসঙ্গের শেষাংশে উদ্ধৃত তাঁহার কথারই ইহা বিবৃতি মাত্র।

বস্তুগুলির তুলনায় সূক্ষ্মতর বহু আকারের বেতারতরঙ্গ, আলোকতরঙ্গ প্রভৃতি একই সঙ্গে অবস্থান করিতেছে।

সব জগৎগুলিই প্রাণ ও আকাশের স্থূল বা সূক্ষ্ম বিভিন্ন স্পন্দনবিশিষ্ট বলিয়া আমাদের মন যখন সেভাবে স্পন্দিত হইতে থাকে তখন সেই স্পন্দনের অনুরূপ জগৎটিকেই শুধু সে দেখিতে পায়, অন্যগুলিকে পায় না। মনের স্থূল অবস্থায় সূক্ষ্ম জগৎ দেখা যায় না, আবার জগতের সূক্ষ্ম অবস্থা যখন দেখি তখন তাহার স্থূল রূপ আর নজরে পড়ে না। একই সঙ্গে দুটি দেখা যায় না। যেমন কোন রেডিওতে এককালে একটি মাত্র বেতারতরঙ্গই আমরা গ্রহণ করিতে পারি; যেমন খুব বেগে বৃত্তাকারে ঘূর্ণিত আলোক-বিন্দুকে যখন আলোকের বৃত্তরূপে দেখি, তখন আলোকবিন্দু বা তাহার ঘূর্ণন দেখিতে পাই না, এবং যদি বেগে ঘূর্ণিত আলোকবিন্দুকে দেখিবার মত আমাদের দৃষ্টিশক্তি সূক্ষ্ম হয়, তাহা হইলে তখন আর আমরা বৃত্তটিকে দেখিতে পাইব না, দেখিব শুধু ঘূর্ণমান আলোকবিন্দুটিকে। ঘূর্ণমান ইলেকট্রণকে দেখিবার মত যদি আমাদের দৃষ্টি-শক্তি সূক্ষ্ম হয় তখন এই জগৎকেই আর বিচিত্র রূপ ও আকার বিশিষ্ট রূপে দেখিব না—দেখিব কতকগুলি বিভিন্নপ্রকার ঘূর্ণিবিশিষ্ট কণার সমুদ্ররূপে। তাই 'চন্দ্রলোক' 'বিদ্যুল্লোক' প্রভৃতি সূক্ষ্ম জগৎ দেখিবার ও তাহাতে প্রবেশ করিবার মতো যোগ্যতা মনকে সূক্ষ্ম, বা শুদ্ধ না করিলে আসে না। একাগ্রতা ও সংযম অভ্যাসের দ্বারাই তাহা সম্ভব। শাস্ত্রে এই সব লোকে যাইবার জন্য সেই ব্যবস্থাই দেওয়া আছে এবং পরিষ্কারভাবে বলা আছে, আমরা কেবল সূক্ষ্মদেহেই সেখানে যাইতে পারি।

পরলোক সম্বন্ধে স্বামীজীর উক্তি

স্বামী বিবেকানন্দ বৈজ্ঞানিক তথ্যের সহিত সামঞ্জস্য দেখাইয়া বেদান্তাদি শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব বিষয়ে "প্রশ্নোত্তরাকারে" এক-খানি বই লিখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ সময় আমেরিকার বিখ্যাত তড়িৎ-তত্ত্ববিদ্ মিঃ নিকোলা টেস্‌লা আমাদের শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টি-তত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ ও বিশেষ-ভাবে ঐ তত্ত্বে আকৃষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন যে, "তিনি গণিতের সাহায্যে দেখাইয়া দিতে পারেন যে, জড় ও শক্তি উভয়কে অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত করা যেতে পারে।" ইহা শুনিয়া স্বামীজী মিঃ ষ্টার্ডিকে লিখিয়াছিলেন (১৩ ফেব্রুআরি, ১৮৯৬), "তা যদি প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে বৈদান্তিক সৃষ্টিতত্ত্ব দৃঢ়তম ভিত্তির উপর স্থাপিত হবে।" পূর্বোক্তভাবে বই লেখা স্বামীজীর আর হইয়া উঠে নাই, কিন্তু বহু বক্তৃতা ও লেখায় এবিষয়ে তিনি প্রচুর আলোক-পাত করিয়া গিয়াছেন। এই পত্রেই বইটির পরিকল্পনারূপে পরলোকতত্ত্ব বিষয়ে যে সংক্ষিপ্ত আভাস তিনি দিয়াছেন, তাহা এই:

"পরলোকতত্ত্ব কেবল অদ্বৈতবাদের দিক থেকে দেখানো হবে; অর্থাৎ দ্বৈতবাদী বলেন—(ক্রমমুক্তির পথে) মৃত্যুর পর আত্মা প্রথমে আদিত্যলোকে, পরে চন্দ্রলোকে ও সেখান থেকে বিদ্যুল্লোকে যান; সেখানে এক-জন পুরুষ এসে তাঁকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যান। অদ্বৈতবাদী বলেন, তারপর তিনি নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

"এখন অদ্বৈতবাদীর মতে আত্মার যাওয়া-আসা নেই, আর এই যে-সব বিভিন্ন লোক বা জগতের স্তরসমূহ—এগুলি আকাশ ও প্রাণের নানাবিধ মিশ্রণে উৎপন্ন মাত্র। অর্থাৎ সর্বনিম্ন বা অতি স্থূল স্তর হচ্ছে আদিত্যলোক বা এই

পরিদৃশ্যমান জগৎ—এখানে প্রাণ জড়-শক্তিরূপে ও আকাশ স্থূলভূতরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। তারপর হচ্ছে চন্দ্রলোক—তা আদিত্যলোককে ঘিরে আছে। এ আমাদের এই চন্দ্র একেবারেই নয়, এ দেবগণের আবাসভূমি—অর্থাৎ এখানে প্রাণ মনঃশক্তিরূপে ও আকাশ তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূত-রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। এরও ওপর বিদ্যুল্লোক—অর্থাৎ এমন এক অবস্থা, যেখানে প্রাণ আকাশের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন বললেই হয়, আর তখন বলা কঠিন যে, বিদ্যুৎ জিনিসটা জড় না শক্তি। তারপর ব্রহ্মলোক—সেখানে প্রাণও নেই, আকাশও নেই; সেখানে এই উভয়ই মূল মন বা আত্মাশক্তিতে সম্মিলিত হয়েছে। আর এখানে প্রাণ বা আকাশ না থাকায় (ব্যষ্টি) জীব সমস্ত বিশ্বকে সমষ্টিরূপে অথবা মহত্তের বা বুদ্ধির সংহতিরূপে কল্পনা করে। এঁকেই 'পুরুষ' বলে বোধ হয়—ইনিই সমষ্টি আত্মাস্বরূপ, কিন্তু ইনিও সেই সর্বাতীত নিরপেক্ষ সত্তা নন—কারণ এখানেও বহুত্ব রয়েছে। এইখান থেকেই জীব তার চরম লক্ষ্য স্বরূপ একত্বকে অনুভব করে"—বহুত্বের বন্ধন হইতে সর্ববিধ দেহাত্মবুদ্ধি হইতে চিরমুক্ত হইয়া যায়।

"তোমার আমার মধ্যে বিভিন্ন স্তরে লক্ষ লক্ষ প্রাণী থাকিতে পারে, যাহারা বিভিন্নপ্রকৃতিসম্পন্ন। তাহারাও আমাদিগকে কখনো দেখিবে না, আমরাও তাহাদিগকে কখনো দেখিতে পাইব না। একপ্রকার চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন একই লোকে অবস্থিত প্রাণীকেই আমরা দেখিতে পাই। যে যন্ত্রগুলি এক সুরে বাঁধা, সেইগুলির মধ্যে একটি বাজিলেই অন্যগুলি বাজিয়া উঠিবে। মনে কর আমরা যেরূপ প্রাণকম্পনসম্পন্ন, উহাকে আমরা 'মানবকম্পন' নাম দিতে পারি; যদি উহা পরিবর্তিত হইয়া যায়, তবে আর মনুষ্য দেখা যাইবে না, পরিবর্তে অন্যরূপ দৃশ্য আমাদের সম্মুখে আসিবে—হয়তো দেবতা বা দেবজগৎ, কিংবা অসৎ লোকের পক্ষে দানব ও দানবজগৎ; কিন্তু ঐ সবগুলিই এই এক জগতেরই বিভিন্ন ভাব মাত্র।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

বিশ্ব-শান্তি কোন্ পথে ?

স্বামী তেজসানন্দ

আজ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন-আদর্শপুষ্ট শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ এক হস্তে শান্তির প্রতীক জলপাই (olive) বৃক্ষের শাখা ও অপর হস্তে আণবিক অস্ত্র ধারণ করিয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে। সেই সঙ্গে তাহারা আবার অহর্নিশ শান্তির বাণী প্রচার করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে শান্তি-সভারও অনুষ্ঠান করিতেছে! কিন্তু তাহাদের এতাদৃশ কার্যকলাপে মনে এ-সন্দেহ স্বতই জাগিতেছে—তাহাদের অন্তর সাম্রাজ্য-লিপ্সা ও হিংসা হইতে মুক্ত কিনা।

নভোমণ্ডলে ধ্বংসাত্মক-অস্ত্রসংবলিত সন্ত্রাস-সৃজনকারী বোমারু-বিমান বজ্রনিনাদে বিচরণ-শীল, প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্যসমূহে আণবিক অস্ত্রের ধ্বংসকারিণী শক্তি পরীক্ষার্থে ভীতিপ্রদ বিস্ফোরণ, কোন মহদুদ্দেশ্যের মুখোশ পরিয়া অপর দেশকে আক্রমণের প্রচেষ্টা, জনমানসে তীব্র উত্তেজনা সর্বদা জাগরূক রাখিবার উদ্দেশ্যে বিরামবিহীন যুদ্ধ-প্রস্তুতি এবং জল-পথেও নৌ-বলবৃদ্ধির প্রতিযোগিতা ও ইহার মহড়ার তৎপরতা বিশ্বজগতের প্রতিটি শক্তিশালী জাতির দৈনন্দিন জীবনের যেন একটি স্বাভাবিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুধু ইহাই নহে, ধর্মীয় জগতেও অনেক বিদেশী শক্তির সমষ্টিগত জীবনে একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শগত নীতি-বোধেরও অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের এইসকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজ বিংশ-শতাব্দীর শেষার্ধে দাঁড়াইয়া মনে স্বতই জিজ্ঞাসা জাগিতেছে,—মানবিক সভ্যতা কি পুনঃ বর্বতার শেষস্তরে নামিয়া আসিতেছে? ইহা কি শুধু ধ্বংস ও মৃত্যুই পৃথিবীর এই বিশাল বক্ষে সৃজন করিতে থাকিবে?

আজ শান্তিপ্রিয় মানবমনে প্রশ্ন উঠিয়াছে—'বিশ্ব-শান্তি কোন্ পথে?' বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববাসীকে সম্বোধন করিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'এই পৃথিবীতে শান্তির জয় হইবে কিংবা যুদ্ধবিগ্রহের? প্রেম, মৈত্রী, ভালবাসা জয়ী হইবে কিংবা দানববৃত্তি প্রাধান্য লাভ করিবে? আধ্যাত্মিকতার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইবে কিংবা স্বার্থ-দ্বেষ-কলুষিত মোহান্ধ মানবের পাশবিক বুদ্ধি জয়ী হইবে?' তিনি এই প্রশ্নের উত্তরে নিজেই বলিয়াছিলেন,—ভারত বহুযুগ পূর্বেই ইহার সম্যক্ সমাধান করিয়াছে এবং আমরা শত বাধা-বিপর্যয়ের মধ্যেও সেই সিদ্ধান্তেই কটিবদ্ধ হইয়া অবিচলিত থাকিব। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন,—ত্যাগের মাধ্যমেই প্রকৃত শান্তি-সৌধ নির্মিত হইবে, ভোগের দ্বারা নহে। ভারতের ইহাই হইল শাশ্বত সনাতন মর্মবাণী এবং ইহাই তাহার দুর্জয় শক্তির একমাত্র আধার ও অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। ভবিষ্যৎ কালে ত্যাগবুদ্ধি-প্রসূত আধ্যাত্মিকতাই বিশ্ব-মানবকে প্রকৃত শান্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে।

স্বামীজী পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণান্তে তাঁহার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সকলকে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "যাঁহারা চক্ষু খুলিয়াছেন, যাঁহারা চিন্তাশীল এবং বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধে

সবিশেষ আলোচনা করেন, তাঁহারা দেখিবেন ভারতীয় চিন্তার এই ধীর অবিরাম প্রবাহের দ্বারা জগতের এই ভাব, গতি, চালচলন এবং সাহিত্যের কি গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে! তবে ভারতীয় প্রচারের একটি বিশেষত্ব আছে···আমরা কখনও বন্দুক বা তরবারির সাহায্যে ভাব প্রচার করি নাই।··· লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত অশ্রুত অথচ মহাফলপ্রসূ উষাকালীন ধীর শিশিরসম্পাতের ন্যায় এই শান্ত সহিষ্ণু সর্বংসহ ধর্মপ্রাণ জাতি চিন্তাজগতে আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে।" তিনি তাঁহার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিসহায়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন,—প্রাচ্যের বেদান্ত ও প্রতীচ্যের বিজ্ঞানের সমবায়ে অদূর ভবিষ্যতে এমন একটি মহতী সংস্কৃতির উদ্ভব হইবে যাহা বিবিধ ধর্ম ও কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া একত্বের ভিত্তিতে অনন্ত বিস্তারের পথ উন্মুক্ত রাখিবে, যাহা পারস্পরিক হিংসা- ও ধ্বংসাত্মক স্বার্থ-সংঘাত সৃষ্টি না করিয়া মানবজাতিকে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের সুবর্ণসূত্রে গ্রথিত করিয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবে। এই অভেদজ্ঞান বা একাত্মানুভূতিই অনন্ত প্রেম, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও নৈতিক ধর্মের মূল উৎস। শান্তিপ্রিয় মানব বেদান্তের এই উদার গম্ভীর অভয়বাণী শ্রবণ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। তিনি তাঁহার তিরোধানের কয়েক বৎসর পূর্বে ইহাও বলিয়াছিলেন,—যদি এই আধ্যাত্মিকতাকে ভিত্তি না করিয়া পাশ্চাত্যের ধ্বংসাত্মক জড়সভ্যতার তাণ্ডবলীলা চলিতে থাকে, তবে আগামী অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই এই সভ্যতা-সৌধ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধবিগ্রহের ফলে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। আজ হইতে কিঞ্চিদধিক সত্তর বৎসর পূর্বে তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, পর পর দুইটি মহাযুদ্ধে কি তাহাই প্রমাণিত হয় নাই? রাজনৈতিক আকাশ পুনঃ ঘনঘটাচ্ছন্ন,—তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় শান্তিপ্রিয় বিশ্ববাসী আজ আতঙ্কিত।

বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সর্বদেশের ও সর্বযুগের ত্রিকালদর্শী মহামানবগণ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—হিংসার দ্বারা কখনও হিংসার নিবৃত্তি হয় না। অবৈরী ভাব দ্বারাই মৈত্রী সাধিত হয়,—ইহাই ধর্ম। ভগবান যিশু তাঁহার প্রিয় প্রধান শিষ্য পিটারকে সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন,—প্রতিহিংসার উদ্দেশ্যে যে অসি উত্তোলন করে তাহাকে সেই অসির আঘাতেই প্রাণ হারাইতে হয়। দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন অতিমানবগণের এই বাণী বিশ্বসমাজে রূপায়িত করা প্রত্যেক শান্তিকামী চিন্তাশীল ব্যক্তিরই আজ প্রধান কর্তব্য।

স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মমহাসভায় বিশ্ববাসীকে সম্বোধন করিয়া ধর্মজগতে উদারতা, সহনশীলতা ও সৌভ্রাত্রের বাণী শুনাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "খ্রীষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না; কিংবা হিন্দু বা বৌদ্ধকে

হইতে হইবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্য ধর্মের সারভাগ ভিতরে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা পুষ্টিলাভ করিয়া আপনার বিশেষত্ব রক্ষা-পূর্বক নিজের প্রকৃতি অনুসারে পরিবর্ধিত হইবে। যদি এই ধর্মসম্মেলন জগতে কিছু প্রমাণ করিয়া থাকে তবে তাহা এই: সুন্দর-ভাবে ইহা প্রমাণ করিয়াছে যে, পবিত্রতা চিত্ত-শুদ্ধি বা দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মের সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক ধর্মেই অতি মহানুভব উদারচরিত্র নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এইসকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ এরূপ কল্পনা করে যে, অন্যান্য ধর্মের

বিনাশ হইয়া তাহার ধর্মই সকলকে অতিক্রম করিয়া জীবিত থাকিবে, তবে সে বাস্তবিকই কৃপার পাত্র ; তাহার জন্য আমি বড়ই দুঃখিত ; আমি তাহাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যে, তাহার ন্যায় লোকেরা বাধা দিলেও অনতিবিলম্বে প্রতি-ধর্মের পতাকার উপর লিখিত থাকিবে—'বিবাদ করিও না, পরস্পর সহায়তা কর ; বিনাশের চেষ্টা না করিয়া পরস্পরের ভাব অঙ্গীভূত ও স্বায়ত্ত কর ; কলহ ছাড়িয়া মৈত্রী ও শান্তির আশ্রয় গ্রহণ কর।' "

ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অষ্টাদশ অধিবেশনের প্রাক্কালে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে যে সুচিন্তিত ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :

"At no time in human history has the possibility of world peace and welfare been so great as at present. Science and Technology have released sources of power of remaking the world. We can now achieve ways of life under law and order that will usher in a golden era. The sources—human and material—for the achievement of this goal are today available to us. On the other hand, the potential for total destruction of human civilization is equally great. In a nuclear war there will be neither victors nor vanquished. Both of them will perish together. A war in such circumstances is sheer madness.... If we wish to avoid wars, we will have to work for peace. The only defence against war is peace. I am certain that a total ban on nuclear war will soon be adopted by all countries and prepare the way for general and complete disarmament."—অর্থাৎ বর্তমান জগতে বিশ্ব শান্তি ও বিশ্বকল্যাণ প্রতিষ্ঠার যেরূপ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে, মানুষের ইতিহাসে ইতঃপূর্বে কখনও তদ্রূপ হয় নাই। বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের মাধ্যমে জগৎকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিবার প্রভূত উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে। নিয়ম ও শৃঙ্খলার সাহায্যে আমরা নূতন স্বর্ণযুগের সূত্রপাত করিতে সমর্থ। বাস্তবিক পক্ষে, একদিকে যেমন মানবিক ও জড় উপাদানের সাহায্যে আজ কল্যাণসাধন করিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, অপর দিকে সমগ্র মানবজাতির সভ্যতার সম্পূর্ণ ধ্বংসের কারণও সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বর্তমান আণবিক যুদ্ধে বিজয়ী ও বিজিতের কোন চিহ্নই থাকিবে না। উভয়েই ধ্বংসের কুক্ষিগত হইবে। এমতাবস্থায় যুদ্ধের পরিকল্পনা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ...যদি যুদ্ধ বন্ধ করিতে চাই, তবে প্রকৃত শান্তির জন্য সমবেতভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই যুদ্ধ বন্ধ করিবার একমাত্র পন্থা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জাতিপুঞ্জের সামগ্রিকভাবে আণবিক অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের চুক্তিগ্রহণই নিরস্ত্রীকরণের পথ সুগম করিয়া তুলিবে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জীবনের গোধূলিলগ্নে তাঁহার অশীতিতম জন্মবার্ষিকীর শুভবাসরে বর্তমান সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া উৎসবমুখর শান্তিনিকেতনের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে তাঁহার সারগর্ভ মনোজ্ঞ ইংরেজী ভাষণের মাধ্যমে মানবজাতির সম্মুখে যে চিন্তাসম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্মার্থ এস্থলে আংশিক-

ভাবে পরিবেশন করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি বলিয়াছিলেন,—বর্বরতা-পিশাচ আজ মিথ্যাভান পরিহারপূর্বক বিশ্বজগৎকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় বিষদন্ত ও তীক্ষ্ণধার নখররাজি প্রকট করিয়াছে। বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাহার উদ্গীর্ণ বিষাক্ত দুর্গন্ধ সমগ্র আবহাওয়াকে দূষিত ও অপবিত্র করিয়া তুলিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার অভ্যন্তরে অপরকে ধ্বংস করিবার যে হীনবৃত্তি এতদিন লুক্কায়িত ছিল, তাহা মানবের নীতিবোধ ও শুভবুদ্ধির ব্যাপক বিলোপ-সাধনকল্পে আজ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এক শক্তির বিরুদ্ধে অপর শক্তির যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে ইহার যে কি ভয়াবহ পরিণাম, তাহা কেহ কল্পনা করিতেও সমর্থ নহে।

বিশ্বশান্তি-প্রতিষ্ঠাকল্পে ডঃ রাধাকৃষ্ণন ১৯৬৩ সালের ১৩ই মে কাবুলের এক মহতী জনসভায় ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহাও বলিয়াছিলেন—আমরা ব্যাবিলন, আসিরিয়া, গ্রীক প্রভৃতি জাতির সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, যে-সকল দেশ কেবল অস্ত্রের সাহায্যে পার্থিব উন্নতির প্রয়াস করিয়াছে, তাহারা অতীতের অতলগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যাহারা পারস্পরিক বন্ধুত্ব, প্রীতি, ভালবাসা ও সৌভ্রাতৃত্বকে মূলমন্ত্র করিয়া উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিয়াছে, তাহারাই এখনও পৃথিবীতে বিদ্যমান রহিয়াছে। যদি ইতিহাস আমাদিগকে কিছু শিক্ষা দিয়া থাকে তাহা এই যে, মানুষের মধ্যে শুভ ও অশুভ বুদ্ধি দুই-ই পাশাপাশি বিদ্যমান। অর্ধমানবিক বা পশুস্তরের অধিবাসিবৃন্দ সহজাত প্রবৃত্তি ও অন্ধ-প্রেরণায় কার্য করিয়া থাকে,—তাহাদের মধ্যে ভালমন্দের বিচারহীনতা সর্বদাই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মনুষ্যজগতে সকলের ভিতর উভয় প্রকার বৃত্তির সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও তাহারা তাহাদের বিচারবুদ্ধির সাহায্যে শুভকার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ। আমরা বর্তমানে যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছি, তাহা যদি অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করি, তবে এই শুভবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া বিশ্বমানবের কল্যাণবেদীমূলে আমাদিগকে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। উহা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

তিনি আরও বলিয়াছেন—যাঁহারা শান্তিকামী তাহারা যদি সমবেত ও সংঘবদ্ধভাবে শান্তি ও সম্প্রীতিস্থাপনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান ও শিল্পবিজ্ঞান শান্তির উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় তবেই আণবিক অস্ত্র আজ যে বিশ্বশান্তিস্থাপনের প্রবল বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা অতিক্রম করা বহুল পরিমাণে সহায়ক হইবে। মানুষের ভীতি ও সংশয় আত্মবিশ্বাসে পরিণত হইবে। Red Cross, Red Crescent এবং এবংবিধ শান্তিস্থাপক সংস্থাসমূহ বিশ্বশান্তির পক্ষে খুবই শক্তিপ্রদ সহায়ক হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে।

এই বিশ্বশান্তি-স্থাপনপ্রসঙ্গে বিখ্যাত ঐতিহাসিক A. J. Toynbee তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'Study of History' গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্মার্থ এই- যে-অসি একবার কোষ-মুক্ত হইয়া শোণিতের আস্বাদ পাইয়াছে, তাহাকে আর কোষবদ্ধ করা সম্ভব নহে; যেমন, যে-ব্যাঘ্র মনুষ্যরক্তের আস্বাদ পাইয়াছে, সে শুধু মনুষ্যই ভক্ষণ করিবে; শিকারীর হস্তে তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত জানিয়াও সে দুর্জয় মনুষ্যরক্ত-পিপাসা নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। মানব-সমাজের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। হিংসা ও অস্ত্রের সাহায্যে মুক্তি ও শান্তির সন্ধান যাহারা করে তাহাদের পরিণাম এই মনুষ্যরক্তলোলুপ

হিংস্র ব্যাঘ্রের মতোই

ভূয়োদর্শী স্বামী বিবেকানন্দ দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, কতকগুলি শুষ্ক নিয়মকানুন দ্বারা প্রকৃত শান্তিপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। মানবসমাজের উন্নতিকামী ব্যক্তিগণ, অন্ততঃ তাঁহাদের পরিচালকগণ, বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন যে তাঁহাদের ধনসাম্যাত্মক ও সমানাধিকারমূলক মতবাদসমূহের একটি আধ্যাত্মিক ভিত্তি থাকা সঙ্গত এবং একমাত্র বেদান্তই এই ভিত্তি হইবার যোগ্য। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন —কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রেই যথার্থ মঙ্গলস্থাপনের একটি মাত্র সূত্র বিদ্যমান, যে-সূত্র হইতে জানা যায় যে, 'আমি ও আমার ভাই এক'। তিনি বেদান্তের এই আত্মিক একত্বমূলক সাম্যকে মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে বলিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রকৃত শান্তি তাঁহারাই প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, যাঁহাদের মধ্যে সর্বজনীন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী জাগ্রত হইয়াছে, যাঁহাদের হৃদয়-মন প্রকৃত নিঃস্বার্থপরতা, সেবা ও সৎসাহসে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে। সেইসকল উন্নতচরিত্র ব্যক্তিগণই দেশ-বিদেশে সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূত (Cultural Ambassador)-রূপে জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া বেদান্তের গণতান্ত্রিক একাত্মতানুভূতিমূলক শাশ্বত বাণী প্রচার করিয়া সকলের হৃদয়ে শান্তির আকাঙ্ক্ষা উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ। বস্তুতঃ যাঁহারা এই উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত, তাঁহারাই প্রকৃত শান্তিসংস্থাপক ও মানবপ্রেমিক, অপরে নহে।

তিনি আরও বলিয়াছেন—এই সমুন্নত আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণই প্রত্যেক ধর্মের ও ব্যক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা মুসলমানদের মসজিদে বা খ্রীষ্টানদের গির্জায় যাইতে বিন্দুমাত্র সংকোচবোধ করিবেন না, তাঁহারা বৌদ্ধবিহারে বুদ্ধের বাণী শ্রবণ করিতে বা হিন্দুর মন্দিরে উপাসনায় যোগ দিতেও দ্বিধাবোধ করিবেন না। শুধু ইহাই নহে, বেদ বাইবেল কোরান আবেস্তা গ্রন্থসাহেব এবং এবংবিধ সর্বপ্রকার ধর্মগ্রন্থ হইতে প্রভূত জ্ঞানাহরণপূর্বক আমাদের সকলকে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করিয়া প্রীতি, ভালবাসা ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে। এই উদারতাই বস্তুতঃ স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠার প্রকৃত নিদান।

যুগযুগান্তর হইতে ভারতের ঋষি-মুনি-কণ্ঠে যে-শান্তির বাণী উদ্গীত হইয়াছে, আজ আমরা বহু চিন্তাশীল রাজনীতিবিশারদগণের কণ্ঠেও প্রায়শঃ সেই মৈত্রীর বাণীই শুনিতে পাইতেছি। আমাদের স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালের কণ্ঠেও পঞ্চশীলের কথা ও সহাবস্থানের বাণী শুনিতে পাইয়াছি। শান্তিকামী মানব এখনও গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সেই উদাত্ত গম্ভীর মর্মবাণী সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়া থাকেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এইসকল দূরদর্শী মনীষিবর্গের নীতিবাক্য ও উপলব্ধসত্যসমূহ যদি আমরা ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনে অনুশীলন করিয়া বাস্তবায়িত করিয়া তুলিতে পারি, তবে এই মানব-সভ্যতা সুনিশ্চিত ধ্বংসের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবে এবং বিশ্বে প্রকৃত শান্তিপ্রতিষ্ঠা হইবে। ইহাই জাতিপুঞ্জের প্রকৃত শান্তি-সনদ (Magna Carta of Peace)—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

স্বামী বিবেকানন্দের বিজ্ঞানচিন্তা

ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার

আমরা বর্তমানে এক বিস্ময়কর অধ্যায়ে বাস করছি। এই যুগে নানা যুগান্তকারী আবিষ্কার মানুষের জ্ঞানের প্রতিটি ভাণ্ডারকে ক'রে তুলেছে স্ফীত। প্রতিদিনই আমরা নতুন নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। অজ্ঞানতার অন্ধকার ক্রমেই অপনোদিত হচ্ছে এবং বহু যুগের কুসংস্কার যে চিরন্তন সত্যের জ্ঞানসূর্যকে আবৃত ক'রে রেখেছিল তার মুক্তি হ'লো সত্য প্রকাশিত হ'লো। মহাকাশে যেখানে আমাদের দৃষ্টি হয়ে যায় অতি সীমিত, অথবা আমাদের দৃষ্টির খুব সামনে যেসব বস্তু ছড়িয়ে আছে, তাদের প্রায় সবকিছুর সম্বন্ধে অনেক জানা হয়ে গেছে বিজ্ঞানের দৌলতে। প্রকৃতির নিয়মাবলী আরও ভালভাবে জানা হয়েছে, যেসব ধারণা কুসংস্কারের বাঁধনে জড়িয়ে ছিল তার মুক্তি ঘটেছে।

ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ বর্তমান—একথা দীর্ঘকাল ধ'রে প্রচারিত। অথচ সত্যিই তেমন বিরোধ বর্তমান নয় এবং ভবিষ্যতে উভয়ের সম্মিলন হবার সম্ভাবনা প্রবল—একথা দৃঢ়ভাবে বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। বিজ্ঞানী সত্যের অনুসন্ধানী। দর্শন এবং প্রকৃত ধর্মও তাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—ধর্মের উদ্দেশ্য যেমন 'এককে' উপস্থিত হওয়া, তাকে উপলব্ধি করা, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যও তাই। বিজ্ঞানিপ্রবর আর্নেষ্ট হেকেল বলেছেন, 'খাটি বিজ্ঞানের প্রতিটি কার্যকলাপ হচ্ছে সত্যকে জানবার প্রচেষ্টা।' —Every effort of genuine science makes for a knowledge of Truth. বিজ্ঞান কুসংস্কারের তমিস্রা বিদীর্ণ ক'রে সত্য-সুন্দরকে প্রকাশিত করে। অধ্যাপক হাক্সলি বলেছেন, 'প্রকৃত বিজ্ঞান' মানুষকে ধর্মের ছদ্মবেশে আবৃত ভেজাল বিজ্ঞানের বোঝা থেকে বিমুক্ত করে।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছেন যে, বেদান্ত এবং আধুনিক বিজ্ঞান ধর্মে, মেজাজে, উদ্দেশ্যগতভাবে এক। উভয়ই আধ্যাত্মিক অনুশাসন। এমন কি পার্থিব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে উভয় মতবাদের সাদৃশ্য বর্তমান।

লণ্ডনে থাকাকালে স্বামী বিবেকানন্দ অনেকদিন বিজ্ঞানের বিষয়ের অবতারণা করেছেন আশ্চর্যভাবে এবং তার ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন বিজ্ঞানীর মতো। তিনি জানতেন পাশ্চাত্যখণ্ডে বৈজ্ঞানিক পন্থায় অগ্রসর হতে হবে, বিজ্ঞানকে দূরে হটিয়ে দিয়ে প্রাচ্যের বক্তব্য পেশ করা সম্ভব হবে না। শুধু এজন্যেই নয়, আমার তো মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দই হলেন প্রথম সন্ন্যাসী যিনি ধর্মের বক্তব্যকে বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে বিচার ক'রে আবর্জনা দূর ক'রে সত্যকে প্রকাশ করেছেন।

উনবিংশ শতকের শেষাংশে যখন বিজ্ঞান ভারতবর্ষে তার পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, সেই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ চিন্তাধারায় আধুনিক কালের মানুষ। লণ্ডনে থাকাকালীন একদিন তিনি বলেছিলেন: পৃথিবীতে আমরা মানুষ ও নানাধরনের জীব দেখতে পাচ্ছি এবং বহুবিধ জীবে এই পৃথিবী পরিপূর্ণ, এই পৃথিবী ছাড়া সৌরমণ্ডলে বহু খগোলমণ্ডল আছে। সবগুলিই এই সূর্য

থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কোনও-না-কোন প্রকার জীব এইসকল গ্রহে থাকা সম্ভব। পৃথিবীস্থ প্রাণীর সঙ্গে অপর গোলোকের জীবাদির সৌসাদৃশ্য বা মিল না থাকতে পারে,·· নিশ্চয়ই সেখানে কোনপ্রকার প্রাণী আছে যা আমরা আজ পর্যন্ত বিশেষভাবে অবগত নই।

১৮৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব চিন্তা করেছিলেন, আধুনিক কালের বিজ্ঞানীরাও এর থেকে বেশি অগ্রসর হতে পারেননি বলেই আমার ধারণা।

পূজ্যপাদ ৺মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর এক গ্রন্থে[১] লিখেছেন, 'স্বামীজী এই দিনে অনন্তস্থানের একটা অদ্ভুত ব্যাখ্যা বা জ্ঞান সকলকে দিয়াছিলেন। যখন তিনি নীহারিকা-তথ্যের বিষয়ে বলিতে লাগিলেন তখন বোধ হইল, কি অসীম স্থান পড়িয়া রহিয়াছে যাহা আমরা কখনও উপলব্ধি করিতে পারি না! এই দিনে স্বামীজী পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক হইয়াছিলেন। দার্শনিক ভাব বা ভক্তিভাব তখন তাঁহার আদৌ ছিল না। একজন মহাবৈজ্ঞানিক বা astronomer হইয়াছিলেন। জ্যোতিষ্কমণ্ডলের বিষয়ে তাঁহার কি অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান ছিল—সেই রাত্রে তিনি তাহার কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র দিয়াছিলেন! অসীম ও অনন্ত-স্থানের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা তিনি করিতে লাগিলেন। শ্রোতৃগণ সকলেই স্তম্ভিত হইয়া রহিল।'

লণ্ডনে একদিন বক্তৃতাকালে স্বামীজী বলেছিলেন 'Life everywhere' অর্থাৎ প্রাণ সর্বত্র। ব্যাখ্যা ক'রে তিনি বলেন, 'এই সূর্য থেকে পৃথিবী, আকাশ, বায়ু, যা কিছু আমরা দেখতে পাই, বুঝতে পারি বা উপলব্ধি করতে পারি, সমস্তই প্রাণ বা জীবে পরিপূর্ণ। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম যে-কোন বস্তু নিরীক্ষণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তার মধ্যে প্রাণ আছে। অণুমাত্র স্থানেও জীবন্ত শক্তি বা প্রাণ আছে। যেমন বীজ থেকে প্রাণ, পরে অবয়ববিশিষ্ট প্রাণী সৃষ্ট হয়েছে। বায়ুতে প্রাণী বা জীবাণু পরিপূর্ণ রয়েছে। সূর্যরশ্মিও এমনি প্রাণে পূর্ণ। আকাশ বাতাস সর্বত্র প্রাণী আছে। বড়ো আকারের জীব যেমন পরিবর্ধিত ও সম্মিলিত, এইসব অণুপ্রাণী তেমনি না-ও হতে পারে। কিন্তু তাদের মধ্যে জীবন্ত শক্তি বর্তমান। এই রকম অণুপ্রাণী মিলে বড়ো আকারের প্রাণী উৎপন্ন হচ্ছে। সমস্ত সৌরমণ্ডল প্রাণীতে পরিপূর্ণ এবং খগোল থেকে এই অণুপ্রাণী বা সূক্ষ্মপ্রাণী অন্য খগোলে যাচ্ছে। সমস্ত সৌরমণ্ডল জীবন্ত ও প্রাণবিশিষ্ট। প্রাণহীন কোনও বস্তু হতে পারে না। আমাদের এই দেহকে কতগুলি চেতন জীবসমষ্টি বলা যেতে পারে। আবার তা বিশ্লেষিত হলে অন্য বস্তুতে সেই বীজসমূহ চলে যাচ্ছে। এই ভাবে বীজপরমাণুসমূহ সর্বত্র যাতায়াত করছে।'[২]

'Life everywhere' কথাটির তাৎপর্য আপাত দৃষ্টিতে আমরা যাকে প্রাণহীন ব'লে মনে করি, প্রকৃতপক্ষে সেখানেও প্রাণের সাড়া বিরাজিত। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু থেকে বিরাটকায় শরীরীর মধ্যে একই প্রাণের স্রোত ব'য়ে চলেছে, তার স্তব্ধতা নেই। অনাদি, অনন্ত কাল থেকে যে-প্রাণের সঞ্জীবনী ধারা প্রবাহিত, তার তরঙ্গ-বিক্ষোভ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে—সর্বত্র।

স্বামীজী বিশ্বাস করতেন একটা স্পন্দন এক স্থানে উঠলে ব্রহ্মাণ্ডময় তার গতি হয়

১ লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩

২ ঐ—পৃঃ ১২

লণ্ডনে একদিন স্বামীজী বলেছিলেন, 'একটা wave বা ঢেউ যদি একস্থানে দেওয়া (তোলা) হয়, তাহা হইলে সেই ঢেউ বা স্পন্দন ব্রহ্মাণ্ডময় চলিবে। আমরা যদি নিভৃতে কোনও সৎ চিন্তা করি এবং সেই চিন্তা যদি প্রবলবেগ বা দৃঢ়ভাব ধারণ করে তবে সেই স্পন্দন ব্রহ্মাণ্ডময় চলিবে। এই স্পন্দনের উপরই সৃষ্টিটা চলিতেছে। রূপ ও অবয়ব এই স্পন্দনই সৃষ্টি করিতেছে এবং সমস্ত সৃষ্টিটা ইহাতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এইজন্য একস্থানে স্পন্দন উপস্থিত হইলে সর্বত্র উহা চলিবে।'[৩]

কথাটি নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক আমরা বেতার-তরঙ্গের কথাই ধরি না কেন। বিশ্বের সুদূরতম কোণ থেকে যে-কথা উচ্চারিত হচ্ছে, আমার ঘরের রেডিও-যন্ত্রটি খুলে দিলেই তা বুঝতে পারি। সুদূর প্রান্ত থেকে যে স্বরগ্রামে কথা বলা হ'লো তা ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে, তারপর হ'লো চলমান। যে-কোন প্রান্ত থেকে সেই কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যাবে কিন্তু আমার বাড়িতে যদি রেডিও-গ্রাহক যন্ত্রটি না থাকে তাহলে কথা ধরা যাবে না। আমরা যখনই কোন চিন্তা করি সেই চিন্তা তরঙ্গাকারে চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। আমাদের সৎ বা অসৎ সব চিন্তাই সূক্ষ্মাকারে থেকে যায়, কোনটিই নষ্ট হয় না। যখন কোন মন সেই সৎ বা অসৎ চিন্তার সমস্তরে স্পন্দিত হয়, তখন সেগুলি সেই মনের উপর ক্রিয়াশীল হয়।

লণ্ডনে একদিন বক্তৃতা-প্রসঙ্গে স্বামীজী একটি চমৎকার বৈজ্ঞানিক উপমা দিয়েছিলেন—'একটি ঢিল ছুঁড়লে (পথে বাধা না পেলে) তা আবার আগেকার জায়গাতে ফিরে আসে।' তিনি বলতেন প্রায়ই, 'যদি একটা উপলখণ্ড শূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং লোকটি যদি জীবিত থাকিতে পারে, তবে তাহা পুনরায় তাহার হস্তে ফিরিয়া আসিবে। কারণ, motion বা গতি বর্তুলাকারে হইয়া থাকে। যদি পথিমধ্যে কোন প্রতিবন্ধক বা retardation না ঘটে, তাহা হইলে গতি বর্তুলাকারে প্রধাবিত হইয়া পুনরায় নিজ কেন্দ্রে প্রত্যাগমন করিবে। কারণ গতি কখনও straight line বা সরল-রেখায় হয় না।'[৪]

কথাটি একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে তা কতটা বৈজ্ঞানিক। সমস্ত গতিই বর্তুলভাবে চলছে। যে-পথকে আমরা সরলরেখা ব'লে চিহ্নিত করি, প্রকৃতপক্ষে তা বক্রপথের ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র। গতি যদি অনবরত স্পন্দিত হয় তবে বর্তুলের সৃষ্টি হয়। সৌরজগৎকেও বড়ো আকারের বর্তুল বলা যেতে পারে। যদি তার কেন্দ্রাভিগ গতি থাকে তাহলে পক্ষান্তরে কেন্দ্রাতিগ গতিও থাকবে এবং দুয়ে মিলে বর্তুলের সৃষ্টি। আলোক সরলরেখায় চলে অথচ সময়বিশেষে তার পথরেখা যে বেঁকে যায় তার প্রমাণ করেন মহাবিজ্ঞানী আইন-স্টাইন।

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে এক বক্তৃতায় স্বামীজী যে কথা বলেছেন বিজ্ঞানীরা তার থেকে এগিয়ে যেতে পেরেছেন কি না সন্দেহ। স্বামীজী বলেছেন, 'সৃষ্টিটা সমস্তই একটা undifferentiated mass of energy বা অবিভক্ত শক্তিরাশি। নূতন একটা বস্তু যদি সৃষ্টির বাহিরে তৈয়ারী করা যায়, তাহা হইলে সৃষ্টিমধ্যে উহা রাখিবার স্থান নাই। কারণ সৃষ্টিটা সর্বত্রই পরিপূর্ণ, বিচ্ছেদ বা ব্যবধান কুত্রাপি নাই।'

এই বক্তব্যের সঙ্গে স্থির-তত্ত্ব বা Steady

৩ ঐ—পৃঃ ১৩

৪ ঐ—১৭ পৃঃ

State Theory-র বেশ মিল আছে। এই তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে বিশ্ব অনন্তকাল ধরেই ছিল এবং থাকবেও। প্রাচীন নক্ষত্রসমূহ অস্তিমদশা প্রাপ্ত হলে তার স্থানে নতুন নক্ষত্র জন্ম নিচ্ছে। এক কথায় বলতে গেলে এই মহাবিশ্বের আদি নেই, অন্ত নেই। আদিতে যে-সংখ্যক নক্ষত্র ছিল, এখনও তাই-ই আছে।

একদিন বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'The sumtotal of the Cosmic Energy is the same.'[৫] অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে শক্তি রয়েছে তার পরিমাণ সব সময়েই সমান। জ্যোতিষ্কমণ্ডলের কোন-এক অংশ ধ্বংস হলে, সেই শক্তি আর একটি অনুরূপ অংশ সৃষ্টি ক'রে দেয়। এতে বিশ্বশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি কিছু হ'লো না।

বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল মনে করেন যে, বিশ্ব বিস্তারশীল—একথা সত্যি। কিন্তু বিস্তারের ফলে আন্তর্নক্ষত্র বা আন্তর্নীহারিকার শূন্যতা বেড়ে যাচ্ছে, তা তিনি মানেন না। তিনি বলেন, নব নব সৃষ্টির ফলে উৎপন্ন বস্তুনিচয়ের ধাক্কাতে বিশ্ব বেড়ে চলেছে। যদিও নক্ষত্র এবং নীহারিকাগুলি ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে, কিন্তু ফাঁকা স্থান মুহূর্তে ভরতি ক'রে দিচ্ছে নতুন বস্তু এসে।

বেলজিয়মের বিজ্ঞানী Abbe Lemaitre বলেন যে, মহাকাশ কখনও গ্যালাক্সি-বর্জিত অবস্থায় থাকবে না। হয়তো দূরবীক্ষণযন্ত্র দিয়ে অনেক গ্যালাক্সি দেখা যাবে না, কারণ তারা ক্রমে হটে যাচ্ছে। তাদের জায়গা দখল ক'রে নিচ্ছে নতুন ব্রহ্মাণ্ড। যে হারে বস্তু স'রে যাচ্ছে, ঠিক সেই হারে নতুন বস্তু তৈরী হচ্ছে। তবে এই হার খুব কম।

এই যে অনবরত বস্তুসৃষ্টি হচ্ছে তা আসবে কোথা থেকে? পদার্থ যদি শক্তির অভিব্যক্তি হয় তাহলে বিশ্বের মূল কি? এবং মধ্যেকার পরমাণু, ইলেকট্রন ইত্যাদির নাম করা কেন? কেবলমাত্র শক্তিকেই তো বিশ্বের মূল উপাদান বলা চলে। এই ব্রহ্মাণ্ড যত বিরাট হোক, যত কল্পনাতীত হোক, তার মূলে মাত্র একটি কথা—শক্তি। পদার্থ শক্তির রূপান্তরিত অবস্থামাত্র। আবার পদার্থের ধ্বংসে শক্তির উৎপত্তি। শক্তির হ্রাস নেই, বৃদ্ধি নেই, তা অবিনশ্বর। প্রশ্ন জাগে—শক্তির উৎস কোথায়, কত দূরে? এই চিরন্তন জিজ্ঞাসার উত্তরে বিজ্ঞানী শ্যাপলে বলেছেন:[৬]

'...With bold advances in Cosmogony we may in future hear less of a creator and more of such things as 'antimatter,' 'minor world', and 'closed space-time.' Finality, however, may always elude us. That the whole universe evolves, or from where, or where to—the answers to these questions may be among the unknowable.'

স্বামী বিবেকানন্দ এই সত্যের সন্ধান দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে শক্তিতে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু-নিচয় বিলীন হয়ে যাচ্ছে, আবার তার থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে বস্তু-কণিকা, এই শক্তির (energy) উৎসের কথা বেদান্তে রয়েছে। ব্যক্ত-অব্যক্তের মাঝামাঝি 'হিরণ্যগর্ভ' কি না কে জানে। বিজ্ঞান আর অগ্রসর হতে পারে না। বিশ্রুত বিজ্ঞানী

৫ ঐ—পৃঃ ২৪;

৬ Harrow Shapley: On the Evidence of Inorganic Evolution

৺ডঃ শিশিরকুমার মিত্রের কথায়[৭], 'The scientist has come to a stage beyond which he cannot proceed...Boundaries of knowledge appear to have been reached which cannot be crossed. ...The situation has made the scientist face questions which belong to the realm of metaphysics and philosophy.

বিজ্ঞানের সন্ধানী আলোক-কণা যেমন দূর করে অজ্ঞানতার পুঞ্জীভূত অন্ধকার, ঠিক তেমনি ধর্মচেতনার আলোকতরঙ্গ-স্পর্শে অপসারিত হয় অজ্ঞানতার কুজ্ঝটি। বিজ্ঞানের বাস্তব সন্ধান এবং ধর্মের সত্যানুসন্ধান যে পরস্পর-বিরোধী নয়, একটি সত্য ও সূক্ষ্ম সম্বন্ধসূত্র দিয়ে গ্রথিত—এই পরমবোধ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সংস্কার-মুক্ত চিত্তে অনুভব করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছেন ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক রমণীয়। জড়বিজ্ঞান চিন্তাজগতের যে প্রান্তে পৌঁছে খেই হারিয়ে ফেলছে, ধর্মবিজ্ঞানের অনুভূতি উপলব্ধি সেই অসমাপ্ত পথরেখাকে নিয়ে গেছে সুদূরে, মিলিত করছে জ্ঞানের এক পরম জ্যোতির্লোকে। শেষেরটি প্রথমের পরিপূরক, পরিপন্থী নয়। এই জ্যোতির্ময়ী চেতনার রঙে রাঙা হয়ে উঠেছিলেন সত্যদ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ।

৭ Presidential address at the Silver Jubilee Session of National Institute of Science, Delhi, 1960

'মামেকং শরণং ব্রজ'

শ্রীগুরুদাস দাশ

গভীর শান্তির মাঝে কর্মে যাঁর অভাবিত প্রবণতা হেরি
কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গণে, অনাসক্ত দয়াল যে পুরুষ মহান্
জীবন-মৃত্যুর যত সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান করি'
শুনালো মুক্তির বাণী—'ধর্মাধর্ম ছাড়ি' লহ আমার শরণ।'

আপন অন্তরে হের, হে মানব, জ্ঞাননেত্রে দৃষ্টিপাত করি'
পশু-ও দেবতামনে অহরহ কুরুক্ষেত্র—সংগ্রাম ভীষণ!
গভীরে তাকাও আরও—করুণার পারাবার সেথা সে সারথি
শুনায় অমৃতবাণী—'প্রণমি' শরণ লও নিখিল-শরণ।'

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বিজ্ঞানভিক্ষু

৪

উপদেশ

মন ও সংযম

"সমগ্র জগতের জন্য সচ্চিন্তাধারা প্রবাহিত করবে। সকলকার মঙ্গল হোক, এটি রোজ প্রার্থনা করা উচিত।" "সকলের মঙ্গল হোক, জগতের মঙ্গল হোক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গল হোক—এ শুভেচ্ছা সদাসর্বদা রেখো।"

"যেমন চিন্তা তেমনি কর্ম হয়ে থাকে। প্রেমপূর্ণ চিন্তা যেমন আত্মবিকাশের সহায়ক, তেমনি রাগদ্বেষপূর্ণ চিন্তা আত্মসঙ্কোচনের কারণ।"

"ভগবানকে জানা ও বোঝা অন্তর শুদ্ধ না হলে হয় না। খুব সাবধানে থাকতে হয়। একটা খারাপ ভাব মনে এলে তাতে শরীরের সমস্ত রক্ত দূষিত হয়ে যায়।"

"কখনো কুচিন্তা কোরো না। কুচিন্তা এলে কাতর প্রাণে ঠাকুরের নাম জপ করবে। দেখবে সব কুচিন্তা পালিয়ে যাবে।"

"কামক্রোধাদি দমন না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যেতেই পারে না। কর্তব্য হচ্ছে, সৎ জীবন যাপন কর, পবিত্র জীবন যাপন কর, স্বার্থহীন জীবন যাপন কর এবং সর্বোপরি সেবকের জীবন যাপন কর।...সেবা করবে কিন্তু প্রতিদানে কোন আশা রেখো না। নিজ ধর্মে আস্থাসম্পন্ন, পরধর্মে বিদ্বেষহীন আর সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলে যে-কোন অবস্থাতেই থাক না কেন, মা ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।" "রিপুদমন করতে হবে আর দৃঢ় বিশ্বাস করতে হবে যে ভগবান সর্বত্র ওতপ্রোত আছেন। ওহে, ভগবান যে অহরহ আমাদের ভিতরে ও বাইরে থেকে বলছেন—ভয় কি? ওরে, তোরা আমায় ছেড়ে যাবি কোথায়? খানিক খেলতে ইচ্ছে হয়েছে, খেলে নে; তারপর হৃদয়মধ্যেই আমাকে পাবি। যে মুহূর্তে রিপু বশীভূত হয়ে যাবে, সেই মুহূর্তেই আমাকে পাবি—জাজ্বল্যমান আনন্দময় পুরুষ রূপে ভিতরেই পাবি।" "তিনি তো কাছেই আছেন, তিনি তো প্রকাশ হয়ে আছেনই। আমরা স্ব-ইচ্ছায় তাঁকে দেখছি না। রিপুর বশবর্তী হয়ে থাকলে তাঁকে কি করে দেখা যাবে?"

"যে যত পবিত্র হবে, ঠাকুর তার কাছে তত বেশী প্রকাশিত হবেন।"

"মার কাছে চিত্তশোধনের জন্য প্রার্থনা করবে। তিনি সব ঠিক করে দেবেন।... মনকে পবিত্র কর, ক্রমে সব ঠিক হয়ে যাবে। মন যখনই পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত হবে, তখনই ভূমানন্দের আস্বাদ পাবে। সে-আনন্দের তুলনা নেই। এই পার্থিব সুখ সেই জমাটবাঁধা আনন্দের পাহাড়ের কাছে একটা কণার তুল্য। সে-সুখ একবার যে পেয়েছে, সে কি আর জাগতিক সুখে ভোলে? যে ইন্দ্রিয়সংযম করেছে তার হয়ে যাবে। সে নিজেই টের পাবে যে, ভগবানের দিকে এগিয়ে চলেছে।"

"স্বাধীন সেই, যে ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করেছে। পরাধীন সে, যে ইন্দ্রিয়ের দাস।" "যার নৈতিক চরিত্র নষ্ট হয়েছে, সে যথার্থই

মৃত। এ মৃত্যুর তুলনায় দেহের মৃত্যু কিছুই নয়। যে নৈতিকচরিত্রভ্রষ্ট তার এ জীবনের কর্মফল জন্ম-জন্মান্তরে সঙ্গে যাবে।"

"সবাই বলে মন স্থির হয় না, মন স্থির হয় না। কেন? 'প্রবেশ নিষেধ' লিখে দাও না! দুশ্চিন্তাগুলিকে মনে আসতে না দিলেই হল।"

"মন যখন কুচিন্তা দ্বারা অধিকৃত হয়, তখন ইঁদুরের বেড়ালের মুখে পড়লে যেমন হয়, ঠিক তেমনি ধারা হতাশ ও নিশ্চেষ্ট হয়ে যায়। তা কেন হতে দেবে? সে সময় সিংহবিক্রম প্রকাশ করে কুচিন্তার হাত থেকে মুক্ত হবে, তবে তো!" "আপনার মন আপনার বশে থাকবে না, একি একটা কথা হল? মনকে আপনার ওপরে উঠতে দেবেন কেন?" "ঈশ্বর এই মনের গঠন এমনই করেছেন যে, সে তোমাকে মেনে চলবেই। মন স্বভাবতঃ যদি অবাধ্য হত, তাহলে আমরা কোন কাজের জন্য দায়ী হতাম না। তাহলে মানুষ স্বাধীনও হত না আর সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীও হত না। তুমি তোমার মনের সম্পূর্ণ প্রভু। তুমি যেমনভাবে ইচ্ছা তাকে গড়ে পিটে নিতে পার। মন যখন আমাদের মুঠোর ভেতর, তখন সচ্চিন্তা ছাড়া আর কোন খাদ্য তাকে দেওয়া হবে না। (শরীরের পুষ্টির জন্য যেমন আমরা কুখাদ্য পরিহার করে তাকে পুষ্টিকর খাদ্য দিই), তেমনি মনকে পবিত্র চিন্তা সদ্বুদ্ধি ও সদালোচনার দ্বারা পুষ্ট করতে হবে—অখাদ্যরূপ কুচিন্তা বা কুসঙ্গ মনকে দেওয়া হবে না।" "মনকে ঠারে ঠোরে বোঝালে সে তো নিজেকে নিজেই ঠকানো হয়।"

"মনের কর্তা তুমিই। মনকে পবিত্র রাখ।"

"মনকে সর্বক্ষণ শ্রীভগবানে নিবিষ্ট রাখাই মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে আমরা যেন তাঁকে স্মরণ রাখি।"

"হৃদয়ের কাজ হচ্ছে ভালবাসা আর মস্তিষ্কের কাজ হচ্ছে বিচার—সদসৎবিচার। এই প্রেম ও বিচারকে এক করতে হবে। ভগবানলাভের জন্য দুটিই চাই।"

"মনটা ভয়ানক পাজী। যতক্ষণ না একটা কঠোর আঘাত লাগে ততক্ষণ ভগবানকে ঠিক ঠিক ডাকে না। ঘা খেলে তখন ঠিক ভগবন্মুখী হয়।"

"বিষয় থেকে মনকে পৃথক করতে পারলেই সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মজ্যোতি দর্শন হয়। বিষয়ই জীবকে ভগবান থেকে বিমুখ করে সংসারের দাবানলে, বাড়বানলে পুড়িয়ে মারছে।" "যখনই মনটা সংসার ও বিষয় থেকে আলাদা হয়ে শুদ্ধসত্ত্ব ও পবিত্র হয়, তখনই সেই মনে ভগবজ্জ্যোতি প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। যার এই প্রকার ভগবদ্দর্শন হয়, তার কাছে জগৎ-সংসার অন্তর্হিত হয়ে যায়। আমাদের মন সংসার ও বিষয়ের গণ্ডি দ্বারা অবরুদ্ধ রয়েছে বলেই আমরা ভগবানকে দেখতে পাচ্ছি না।"

"মন যখন higher law-এর (উচ্চতর নিয়ম—সূক্ষ্মতর সত্যের) সঙ্গে vibrate করে (স্পন্দিত হয়), তখন ভ্রূমধ্যে ইষ্টের বা চিন্ময় দেবদেবীর দর্শন হয়।"

"মহাপুরুষগণ নিম্নভূমি থেকে উচ্চভূমিতে—সেই অতীন্দ্রিয় রাজ্যে—যাবার জন্য আমাদের সাহায্য করেন। আর এইভাবেই আমরা ভবসাগর থেকে জ্যোতিঃসাগরে যাবার প্রেরণা পাই। এ তেমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়; মন আপনা-আপনি ঐ দিকে উঠে পড়ে। এ জাগতিক জিনিস দেখে মন তাতেই আকৃষ্ট আছে, স্থূল জড় পদার্থের আকর্ষণের জন্য। আবার যখন উচ্চভূমির জিনিসের দিকে, আলোকের দিকে আকর্ষণ হবে তখন সেই মনই আবার উপরে উঠতে চাইবে। জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডই

তখন ধীরে ধীরে তার কাছে অদৃশ্য হয়ে যাবে।"

"ধ্যানে মনকে উর্ধ্বে তুলে নিতে হয়—বাহেন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার—এইভাবে পরে পরে মনকে নিয়ে লয় করতে হবে আত্মবস্তুতে।"

"মানুষের চিন্তাশক্তির কেন্দ্র হচ্ছে মন, ইন্দ্রিয়গুলি যেন মনের চাকর। দেখা শোনা বোঝা ইত্যাদি সব মনের দ্বারাই হয়ে থাকে।... যে মন যত শুদ্ধ সে মন অন্যের চিন্তাধারা তত ধরতে পারে। বেতারবার্তা ধরার যেমন ব্যবস্থা ঠিক তেমনি। একটি মনে কোন চিন্তা হলে অমনি সে চিন্তা একটা স্পন্দনের সৃষ্টি করে। যে মন ভাল receiver (গ্রাহক-যন্ত্র) সে মনে ঐ চিন্তা-স্পন্দন তখনই স্পন্দিত হয়, সে তা ধরতে পারে ও বুঝতে পারে। কেবলমাত্র দরকার মন শুদ্ধ হওয়া।" "কাম ক্রোধ এসব রিপু দমন করতে হলে ঠাকুরকে স্মরণ করতে হয়, মাকে স্মরণ করতে হয়। তাহলেই মন থেকে ওসব হীন ভাব চলে যায়।" "ইষ্টমন্ত্র জপ করলে (চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি) সব হবে, সব হবে।"

"অন্তরে বাহিরে তিনিই। তাঁর দর্শন ভিতরে হলেই রিপুদমন হয়।" "তাঁর দর্শন ঠিক ঠিক হলেই রিপুদমন হয়। খুব নাম কর দাদা, কিছু ভয় নেই।"

সত্য, বিশ্বাস

"সত্যস্বরূপ ভগবানকে লাভ করতে হলে সম্পূর্ণরূপে সত্য কথা বলতে হবে, সত্য আচরণ করতে হবে।" "সত্য পথে থেকো, আর কারো অনিষ্ট কোরো না। তাহলে ভগবান কোলে টেনে নেবেন।" 'সত্যকে আঁকড়ে ধরতে হয়—একেবারে ঠিক ঠিক ধরা। মন আর মুখ এক হবে। মুখে যা বলা, কাজেও তাই করা।" "মন মুখ এক করতে না পারলে তাঁকে পাওয়া যায় না। মন মুখ এক করতে পারে তিন জন—ছেলে, পাগল আর ব্রহ্মজ্ঞানী।"

"ভগবানের কথা বেশী শুনে কি হবে? মনোমত দু-একটি কথা শুনে সাধনে লেগে পড়।" "গাদা গাদা শুনবো অথচ কোনটিই পালন করব না, এতে কোন ফল হয় না। যেটুকু শুনবে তাই জীবনে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা চাই।"

"খুব বিশ্বাস চাই, ভরসা চাই, ধৈর্য চাই। ক্রমে সব হয়ে যাবে।" "বিশ্বাসের খেই ধরে থাকতে হবে।" "জগতে এমন কোন লোক নেই যার বিশ্বাস আদৌ নেই। বিশ্বাস ছাড়া আপনি একটি নিঃশ্বাসও নিতে পারেন না।"

"বিশ্বাসই ধর্মজীবনের ভিত্তি।" "তর্ক বেশী করা ভাল নয়। এইটুকুন তো মস্তিষ্ক!... চাই বিশ্বাস, জলন্ত বিশ্বাস। ঐ বিশ্বাস আনার জন্য একটু-আধটু সৎ তর্ক করতে পারেন। কিন্তু বেশী নয়।" "বিশ্বাস চাই, নইলে শুধু তর্ক করতে গেলে গুলিয়ে যায়, পাক ওঠে। কাণ্ট প্রমুখ দার্শনিকদের অবস্থাই দেখুন না কেন! শেষকালটায় তাঁরা বললেন, 'ঈশ্বর আছেন কি না তা ঠিক জানা যায় না। তবে সৃষ্টিরহস্যের পশ্চাতে এমন একটা কিছু আছে, যার অবস্থিতিতে সব এমন সুশৃঙ্খলায় চলছে।' ওতে কি হল? ভগবানের সঙ্গে যে কথা বলা যায়, তাঁকে যে দর্শন স্পর্শন করা যায়! এসব কি তাঁদের আছে? তবে আর কি দার্শনিক বিচার? এসব দর্শনশাস্ত্র পড়ে লাভ কি?" "বই-পড়া বিদ্যা দ্বারা কাজ হয় না—বস্তুলাভ অসম্ভব। শুধু চাই বিশ্বাস।"

"প্রাচীনকালের মুনি-ঋষিরা ছিলেন

ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ। সত্যকে উপলব্ধি করে সকলের কাছে সত্যলাভের পথ উন্মোচন করে গেছেন। ঋষিরা যা বলেছেন তার পিছনে ছিল তাঁদের অলৌকিক জীবন। ধর্ম জিনিসটা বিচার- বা পাণ্ডিত্যমূলক নয়, তা হল অনুভূতিমূলক। কাণ্ট তো অত বড় দার্শনিক, অথচ বলেছেন বিয়ে না করে থাকা যায় না।" "ঋষিরা যা বলেছেন, সবই অনুভূতির উপর স্থাপিত, তথাকথিত অর্থে নয়।"

"পবিত্রতা, সত্যপরায়ণতা ও সততার ওপর জীবন গঠন করবে। আর চাই বিশ্বাস। এই ধরে থাকলে মানুষ যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তার তৃপ্তি থাকবে। এই হল ধর্ম-জীবনের লক্ষণ—সর্বাবস্থায় তৃপ্তি।"

জপ, ধ্যান, প্রার্থনা

ধর্মপিপাসুর পক্ষে দীক্ষা কি একান্ত প্রয়োজন?—এ প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানানন্দজী বলেন, "হ্যাঁ, প্রয়োজন আছে।" কিন্তু দীক্ষা নিয়ে যদি কেউ ঠিকমত কাজ না করে?—"একজন জিনিসটি নিলে। ব্যবহার করে না, কিন্তু ইচ্ছে হলেই তো ব্যবহার করতে পারে। অপরজন ইচ্ছে হলেও জিনিসটি নেই বলে ব্যবহার করতে পারবে না।"

"বীজমন্ত্রের শক্তি অমোঘ। হ্রীং, শ্রীং, ক্রীং প্রভৃতি বীজের সত্যিই বিশেষ শক্তি আছে।"

"ঠাকুর ও মা-র নাম জপ করলে তাতে স্বামীজী, রাখাল মহারাজ প্রভৃতি সকলের নাম জপ করা হয়ে গেল।"

"তাঁর নাম কর, তাতেই আত্মার শান্তি।"

"জপ করা মানে তাঁর নাম উচ্চারণ করা। তা মনের অবস্থা যেমনই থাকুক না কেন, তুমি নিয়মিত জপ করে যাবে। মনে করে নিও তুমি মন থেকে আলাদা। মনে আনন্দ বা দুঃখ যে ভাবই আসুক না, তুমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না। নিজের কাজ ঠিক করে যাবে।"

"জপ করার জন্য যেরকম ইচ্ছা বসতে পার। আসনপিঁড়ি হয়ে, পা ঝুলিয়ে, চেয়ারে বা যে-কোন রকমে বসলেই হবে।"

"যখন খুশি জপ করতে পার। সর্বাবস্থায়ই জপ করা চলে।...তবে রাত্রে একলা ঘরে নিশ্চিন্ত মনে জপ করলে খুব শীঘ্র আনন্দ পাবে।" "সময়ের জন্য ভাবনা কি? রাস্তায় চলতে চলতেও জপ-ধ্যান করা যেতে পারে। তাঁর স্মরণ-মনন নিয়ে কথা। সর্বদা তাঁর দিকে যাতে মনটি পড়ে থাকে তার জন্য চেষ্টা করা উচিত।"

"সংসারে সব কাজ করতে হবে, কিন্তু মনটি রাখতে হবে সর্বক্ষণ ভগবানের দিকে। চেষ্টা করতে হবে যাতে সর্বদা প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে তাঁর নাম করা হয়।" "এরূপ করতে পারলে তখন আর কর-জপ বা মালা-জপের প্রয়োজন হয় না। এভাবে সর্বক্ষণ জপ করার চেষ্টা করা উচিত।"

"প্রত্যহ নিয়মিতভাবে জপ-ধ্যান করার অভ্যাস বিশেষ দরকার। তাহলে ক্রমে মন স্থির হয়ে আসে।" "মন নিবিষ্ট না হলেও নিয়মিত-ভাবে সকাল-সন্ধ্যা জপ করে যাবে। ধ্যান ঠিক ঠিক না হলেও জপ-ধ্যান কখনো ছাড়তে নেই। নিরাশ হবারও কোন কারণ নেই, ক্রমে সব হবে। মন সব সময় স্থির হয় না সত্য, কিন্তু কখনো কখনো স্থির হয়ও তো? পনেরো মিনিটের মধ্যে এক মিনিটও তো মন স্থির হয়? তাতেই হবে। ধ্যান হোক আর নাই হোক, ধ্যানের চেষ্টা ছেড়ো না। জপ ধ্যানে পরিণত হয়, ধ্যান সমাধিতে। গভীর ধ্যানেই দিব্য দর্শনাদি হয়।" "বেলুড় মঠে তিনচার দিন নিরিবিলিতে এবং একান্তে বসে জপ করলে অলৌকিক অনুভূতি হয়।"

"এই তিন স্থানেই ধ্যান প্রশস্ত—হৃদয়ে, ভ্রূমধ্যে আর সহস্রারে। ঠাকুর বলতেন, হৃদয়ই ডঙ্কামারা জায়গা।" "হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে ধ্যান বিধেয়। আরে বাপু, কতই বা অন্তরতম প্রদেশে যাবে? ঠাকুর বলেছেন, 'আমার এই ছবিতে ধ্যান করবি, তাহলেই হবে।'"

"ধ্যানের প্রকৃষ্ট সময় গভীর রাত্রি। শীঘ্র শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। তখন প্রকৃতি নিস্তব্ধ থাকে, মন সহজেই স্থির হয়ে আসে।"

"খুব বিশ্বাস চাই, ধৈর্য চাই, ভরসা চাই। ক্রমে সব হয়ে যাবে।…তাঁর নাম জপ করে যাও, শান্তি পাবে।"

"শ্রীভগবানকে ভাবতে ভাবতে তন্ময় ও উন্মত্ত হতে হবে। ঈশ্বরই প্রাণের উৎস। যাঁরা মহামানব, তাঁরা সকলেই ঐ অমৃতের উৎসে অবগাহন করেছেন। তাঁর সঙ্গে সর্বতোভাবে এক না হলে সাধক বড় হয় না। …রাত্রে উঠে ধ্যান করবে।… তাঁকে এমনি কাতর প্রাণে ডাকবে, যেন ওপারে যাবার ডাক এসেছে, আর তাঁর সাক্ষাৎকার হচ্ছে।"

"ত্রিসন্ধ্যা মাকে ডাকবে—মা, বুদ্ধি দাও, যে-বুদ্ধি দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় তাই আমাদের দাও। গায়ত্রী-ধ্যানে যেমনটি আছে, তেমনিভাবে প্রার্থনা করবে।"

"আমি যে মন্ত্রটি তোমায় দিয়েছি, সেটি জপ করলেই তোমার জগৎরূপ স্বপ্নটি ভেঙ্গে যাবে।" "মূর্তিদর্শন? তা মন একটু স্থির হলেই হবে। আরো এগিয়ে যেতে হবে। জ্যোতিঃসমুদ্রে আনন্দ করতে হবে।"

বাসনা, ত্যাগ

"দেখ, ভগবান সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান। তাঁর অদেয় কিছুই নেই। লোকে যা চায়, তিনি যেন ভৃত্যের মতো তা যোগাড় করে দেন। সেইজন্যই তাঁর কাছে কিছু চাইতে নেই। তিনি স্বেচ্ছায় যা দেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে।"

"ভগবানের কাছে টাকাকড়ি তুচ্ছ জিনিস কি চাইবে? তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে যেন তিনি তোমায় পবিত্র ও নিঃস্বার্থ হওয়ার জন্য, সত্যলাভের জন্য শক্তি দেন।"

"বাসনাই যত অনিষ্টের মূল।" "বাসনা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সন্তোষধন পাওয়া যায় না। বাসনার নাশ হলে তবে নিস্তার।"

"মৃত্যুর পর মানুষের ভোগবাসনা সূক্ষ্মভাবে থাকে। মৃত্যুকালে স্থূল দেহটারই কেবল নাশ হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি, মনবুদ্ধি সবই থাকে সূক্ষ্ম-ভাবে। তখন ভোগ আরও তীব্রভাবে হয়ে থাকে। সূক্ষ্মের পর কারণ-অবস্থায়ও মন প্রভৃতি বীজাকারে থাকে। তুরীয় অবস্থায় পৌঁছুলেই পূর্ণ জ্ঞান হয়। সেজন্য কেবলমাত্র শারীরিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখলে হবে না, চাই সর্বাঙ্গীণ উন্নতি—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক।"

"বাসনা থেকেই পুনর্জন্ম হয়। সমস্ত বাসনাকে যদি একেবারে বিসর্জন দেওয়া যায়, তাহলে আর জন্ম হয় না। দেখুন না, কোন জিনিসকে ধরে আমি জোরে ধাক্কা দিয়ে চালিয়ে দিলাম—ধাক্কার সেই বেগ যতক্ষণ থাকবে, জিনিসটা চলতে থাকবে। তাতে যদি আবার ধাক্কা না দেওয়া হয়, তাহলে ঐ গতিবেগ কোন-না-কোন সময় বন্ধ হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। আমরা জন্মে জন্মে নতুন impetus (বেগ) দিয়ে থাকি—তাই জন্মান্তর চলতে থাকে। কিন্তু তা যদি বন্ধ করি, অর্থাৎ বাসনার পারে চলে যাই, তাহলে আর পুনর্জন্ম হবে না।"

"ত্যাগ না করলে ধর্মজীবনে কিছুই হবার

আশা নেই।" সব কিছু ত্যাগ করার চেষ্টা করতে হয়।"

"যদি ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে আমাদের মস্তকে শান্তিবারি বর্ষণ করতে চান, তথাপি আমরা তাঁকে বরণ করে নিতে পারবো না—তাঁর আশীর্বাদ মাথা পেতে নেবো না। কারণ তিনি আসেন ত্যাগের মূর্ত বিগ্রহরূপে—তিনি আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেন জগতের সমস্ত বিভব—আমাদের বলতে যা কিছু সংসারে আছে, সব কিছু। কিন্তু ভগবানের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে আমাদের মধ্যে খুব অল্প লোকেই প্রস্তুত। কারণ ঈশ্বর-প্রদত্ত অনন্ত বৈভব অপেক্ষা আমরা বেশী ভালবাসি জাগতিক ধনসম্পদকে।"

"ত্যাগের মতো জিনিস নাই।"

কর্ম, দেশসেবা

"সকলকে আমার এটুকু বলার আছে যে, অলস হইও না। 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।' খুব মন দিয়ে সব কাজ করতে হয়।"

"সব সময় কাজ করতে হয়। কিন্তু ফলের দিকে বেশী দৃষ্টি রাখতে নেই; কর্তব্যজ্ঞানে কাজ করে যাওয়া।...এই যে বসে আছ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলছে, এও কাজ। এর সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নাম করতে পারলে আরো বড় কাজ হয়।"

"আমাদের সব কর্মই জ্ঞানালোক বা ভগবান বা পরমহংস-অবস্থা লাভ করার জন্য। সে প্রচেষ্টা কর্মের ভেতর দিয়েই হোক অথবা সাধন-ভজনের দ্বারা হোক তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু সব প্রচেষ্টার লক্ষ্য জ্ঞানানন্দ লাভ করা।"

'এ দুনিয়া কি বসে থাকবার জন্য? এখানে কুঁড়েমি করলে চলবে কেন? যখন তুমি নিঃস্বার্থভাবে কর্মরত হবে, তখনই প্রকৃত বিশ্রামসুখ অনুভব করবে। বীরের মতো কাজ করে যাও।"

"পাশ্চাত্য জাতিরা সময়ের ঠিক ঠিক ব্যবহার করছে বলে তারা জগতে বলীয়ান হয়েছে। তোমরাও যদি সময়ের ঠিক ঠিক ব্যবহার কর তো তোমরাও অনেক কাজ করতে পারবে; শ্রীভগবান পিছনে আছেন—তাঁকে সদাসর্বদা স্মরণ করে কাজ করবে। প্রত্যেক কর্মের ফল অবশ্যম্ভাবী, এটি ভুললে চলবে না।"

"নিজের কাজ নিজেই করতে হবে।

"দৈব ও পুরুষকার দুই-ই আছে।... পাশ্চাত্যজাতীয়রা যাকে দৈব বলেছে, আমরা সেখানে মানি কর্মফল। কালের স্রোত বয়ে চলে যাচ্ছে, তাতে গা ভাসিয়ে দিলে চলবে কেন? তোমাকে নদী পার হতে হবে। স্রোতের সাহায্য নিয়ে চেষ্টা করে সাঁতার দিলে তবে তো পার হয়ে যাবে! হাল ছাড়তে নেই বা হতাশ হতে নেই। অধ্যবসায় না থাকলে কোন বড় কাজ হয় না। ভগবানলাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য—এত বড় কাজ কি সহজেই হয়? অলসতা আর কপটতাকে মোটেই প্রশ্রয় দেবে না। হয়তো পারের কাছেই এসে পড়েছ, কিন্তু তখনো যদি সাঁতার না দাও তোমাকে আবার স্রোতে টেনে নিয়ে যাবে আর নদীর গর্ভে ডুবিয়ে দেবে। নিজের সাধ্যমতন চেষ্টা করলে ভগবান দশগুণ শতগুণ অনন্তগুণ অধিক শক্তি দেবেন; তখন ডাঙা পেয়ে যাবে।...ব্যক্তিগত জীবনে যা, জাতিগত জীবনেও তাই।"

"জগতে কত রাজত্বই না কালের গর্ভে

বিলীন হয়ে গেছে আমাদের দেশেরও ঐ দশা হবে যদি না দেশবাসী নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী দেশের সেবায় লাগে। দেশ তো আর ব্যক্তিবিশেষের নয়, দেশ হল সমগ্র দেশবাসীর। যে যে-অবস্থাতেই থাকুক না কেন, দেশমাতৃকার সেবা, জনসাধারণের সেবা ও সর্বোপরি ভগবৎ-সেবা সকলেই অল্পবিস্তর করতে পারে। সকলের মঙ্গল হোক, জগতের মঙ্গল হোক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গল হোক—এ শুভেচ্ছা সদা-সর্বদা রেখো।"

"কর্মী হতে গেলে খাঁটী ও সৎ হওয়া চাই। অপরের দোষ দেখবে না, বরং নিজেরই দোষের দিকে দৃষ্টি রাখবে।" "মানুষ নিজের দুর্বলতা দেখতে পায় না, দেখতে চায়ও না। নিজের অন্যায় আচরণের সপক্ষে অনেক বৃথা যুক্তি প্রয়োগ করে।"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কানপুর কংগ্রেস দেখিতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করেন, 'কংগ্রেস কি এতই প্রয়োজনীয় ব্যাপার যে দেখতে যেতেই হবে?' উত্তরে বিজ্ঞানানন্দজী বলেন, "যেখানে কোন সৎ কাজের জন্য এত লোকসমাগম হয়, সেখানে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের পূজা হয়। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করাও ঈশ্বরের পূজা বলে জানবে।...একতাতেই ভগবানের শক্তির বিকাশ হয়।...আমাদের উন্নতি প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে। প্রত্যেক ভারত-সন্তানকেই নেতা হবার উপযুক্ত হতে হবে—অর্থাৎ চরিত্রবান, স্বার্থত্যাগী, পবিত্রাত্মা, উদারচেতা; আর ভালবাসতে হবে দেশের লোকদের। দশের যাতে ভাল হয় সেরকম কাজ যাতে প্রত্যেকে করতে পারি তার জন্য যত্নবান হতে হবে। আত্মসংযমী হয়ে ভগবানকে স্মরণ করতে হয়; তিনিই কাজের শক্তি দেবেন।...ওদেশে যেমন যীশুখৃষ্টের কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, তাঁকে সত্যের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হতে হয়েছিল, তেমনি এদেশেও আমাদেরও হতে হবে—তবেই ভারত আবার উঠবে। ভারতের গৌরব-সূর্য আবার উদিত হবে।"

"স্বার্থপরতা সমগ্র জাতিকে যেন অভিভূত করে ফেলেছে। আবার স্বার্থপরতা যদি না থাকে তো সংসার চলেও না।...ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য যে জীবন, সে তো মৃত্যুতুল্য। আর যে মৃত্যুর দ্বারা বহুর কল্যাণ হয়, তা-ই প্রকৃত জীবন। নিজের শরীর ও পরিজনবর্গকে কেন্দ্র করে যে স্বার্থপরতা গড়ে ওঠে তাতে জগতের কোন কল্যাণ হয় না। যে যত মহান, তাঁর অহং তত বিরাট।" "ত্যাগশীল হতে হবে। ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা একটু কমাতে হবে। যত বিবাদ মারামারি ছিনাছিনি—এই ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা নিয়ে। দৃষ্টিকে প্রসারিত কর—সকলের ভিতর সেই পরমপিতার প্রকাশ দেখবার চেষ্টা কর।"

"আপনারা জাগতিক নানা আন্দোলন ও ঘটনাপ্রবাহের ওপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করেন কেন?...স্বাধীনতালাভ যদি হয়েই যায় তাহলেই কি সব শান্তিপূর্ণ হয়ে যাবে? নিশ্চয়ই তা হবে না। বহির্জগতের সংগ্রাম আমাদের চিত্তচাঞ্চল্য আনয়ন করে না, পরন্তু জাগতিক বিষয়ের প্রতি আমাদের অত্যধিক আসক্তি এবং ঐগুলি পাবার জন্য যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তা থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে মানসিক চাঞ্চল্য। ...আপনারা রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা বলছিলেন? তা মহাত্মা গান্ধীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন তো! তিনি তো সংগ্রামের মধ্যে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আপনি কি বলতে চান যে, এত বহুবিধ বাহ্যিক সংগ্রামের মধ্যে থেকেও তিনি মানসিক প্রশান্তি-লাভের সাধনা বা ভগবানের স্মরণ-মনন করেন না? প্রচণ্ড জীবন-সংগ্রামের ভেতরও মানসিক

সাম্যরক্ষার সাধনা করুন। জগতে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের এ একমাত্র উপায়। গান্ধীজীর জীবনের এ ভাবটি সম্যক্‌রূপে বোঝা উচিত।"

"প্রকৃত শান্তিলাভ করতে হলে ত্যাগ চাই, আত্মসংশোধন চাই, এই হল সনাতন সত্য। তা আধ্যাত্মিক জীবনেই বলুন বা রাজনৈতিক জীবনেই বলুন—স্বার্থত্যাগের জন্য প্রস্তুত না থাকলে কোন কার্যেই সফলতা আশা করা সুদূরপরাহত। বাস্তবিকপক্ষে এই বিরাট জগৎ স্বার্থত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

"স্বোপার্জিত ধনের কিছু অংশ জগতের হিতের জন্য দেওয়া সকলেরই অবশ্যকর্তব্য, কারণ এই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। তুমি যা দেবে, তাই ফিরে পাবে।"

"বুদ্ধিমান লোক বলেন—তোমার কর্ম তোমাতেই থাক। আমি অকর্তা মাত্র—যন্ত্র-স্বরূপ হয়ে কাজ করছি।"

"তাঁর কাজ তিনিই করবেন। আমরা কি কারো উপকার করতে পারি?" (ক্রমশঃ)

আমার কৃষ্ণ

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

"কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং—কৃষ্ণচন্দ্র নিজে ভগবান্"
এ বাণী প্রচার ক'রে হে ঋষি, হে শুদ্ধ মতিমান্,
আমার কৃষ্ণকে তুমি পাঠাইয়া দিলে নির্বাসনে
মানুষের কাছ হতে বৈকুণ্ঠের সুদূর কাননে?
মানুষ কৃষ্ণেরে আমি সকাতরে ডাকি তাই আজ,
নিপীড়িত মানবতা চায় তাঁরে। স্বদেশ, সমাজ,—
সর্বসাধারণ তাঁর আদর্শ ও সহানুভূতির
আশ্রয় প্রার্থনা করে, যুক্তপাণি নম্র নতশির।
প্রপন্নের পারিজাত, দীনার্তের একান্ত আত্মীয়,
দাম্ভিকের দর্পহারী, অসত্যের ত্রাস, সত্যপ্রিয়,
সুবিশাল জ্ঞানমূর্তি, পৌরুষের জ্বলন্ত প্রতীক,
দেবত্ব হতেও যাঁর নরত্বের মূল্য সমধিক,
দুর্গত ভারতে আজ জাগিয়াছে তাঁর প্রয়োজন
ন্যায়-দণ্ডাঘাতে যাঁর অন্যায়ের পাপ-সিংহাসন
লুটায়েছে ভূমিতলে বার বার; যাঁর প্রীতি প্রেমে
মহাভারতের বুকে ধর্মরাজ্য আসিয়াছে নেমে।
অন্ত্যজেরে ভালবেসে "মানবত্বে সম অধিকার
আছে সব মানবের"—একদা এ মহামন্ত্র যাঁর
জগতে এনেছে সুখ, শান্তি, প্রাণ, প্রতিষ্ঠা, অভয়,
আমি সে কৃষ্ণকে চাই, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সাময়িক পত্রিকা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

তিন

উদ্বোধন

স্বামীজীর কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তিনি তাঁর অভিপ্রেত বস্তুকে ব্যাপক ও নির্দিষ্ট উভয় ক্ষেত্রেই আঘাত করতেন। বেদান্তের প্রথম মুখপত্র নিশ্চয়ই ইংরেজীতে হবে, যার ফলে তা সর্বভারতীয়, কিংবা আন্তর্জাতিক প্রচার পাবে, কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণের কাছে উপস্থিত হতে গেলে তাদের মাতৃভাষাকেই অবলম্বন করতে হবে। মাতৃভাষায়, জনগণের মুখের ভাষায়, কথা না বললে তাদের অন্তর স্পর্শ করা যায় না; বুদ্ধ থেকে রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরাই লোকহিতায় এসেছেন, তাঁরা জনগণের ভাষাতেই কথা বলেছেন,—একথা স্বামীজী তৎকালীন শিক্ষাভিমানীদের দৃপ্ত ভাষায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং ইংরেজীতে একটি পত্রিকা দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরেই তিনি দেশীয় ভাষায় পত্রিকার কথা ভাববেন, তাই স্বাভাবিক। রামকৃষ্ণ মিশনের সেই প্রথম দেশীয় ভাষায় পত্রিকার নাম 'উদ্বোধন'। তার ভাষা বাংলা, কারণ স্বামীজী স্বয়ং বাঙালী, এবং রামকৃষ্ণ মিশনের হেড-কোয়ার্টার বাংলাদেশে; কিন্তু স্বামীজী যে ভারতের সকল দেশীয় ভাষাতে পত্রিকা চাইতেন, তা তাঁর পত্রাবলী থেকে বোঝা যায়।

দেশীয় ভাষায় পত্রিকার কল্পনা যে স্বামীজীর মনে প্রথমাবধি সক্রিয়, তার প্রমাণ—১৮৯৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা পত্রে বিষয়টির উল্লেখ ছিল। এই কালে, স্মরণ রাখতে হবে, ব্রহ্মবাদিন প্রকাশিত হয়নি। স্বামীজী লিখেছিলেন—"তোমাদের একটা কিনা কাগজ ছাপাবার কথা ছিল, তার কি খবর?··· একটা খবরের কাগজ তোমাদের edit করতে হবে, আদ্দেক বাংলা আদ্দেক হিন্দি—পারো তো আর একটা ইংরেজীতে। পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছ—খবরের কাগজের subscriber সংগ্রহ করতে ক'দিন লাগে? যারা বাহিরে আছে, subscriber যোগাড় করুক। গুপ্ত—হিন্দি দিকটা লিখুক, বা অনেক হিন্দি লিখবার লোক পাওয়া যাবে। মিছে ঘুরে বেড়ালে চলবে না।" এখানে স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের (যাঁরা বাঙালী) বাংলা ও হিন্দির দ্বিভাষী কাগজ করতে বললেন;[১] সেই সঙ্গে ইংরেজী কাগজও। এর পরে স্বামীজী ১৮৯৫-তে লেখা এক চিঠিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে খবরের কাগজ প্রকাশের ব্যাপারে তাগিদ দেন। ঐ বৎসরের ১১ এপ্রিল রামকৃষ্ণানন্দকে একই বিষয়ে লেখেন—"মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি ও তোমরা এককাট্টা হয়ে একটা কাগজ যাতে বার করতে পারো, তার চেষ্টা দেখ দিকি।··· অনন্ত ধৈর্য, অনন্ত উদ্যোগ যাহার সহায়, সেই কার্যে সিদ্ধি হবে। পড়াশুনাটা বিশেষ করা চাই, বুঝলে শশী? মেলা মুখ্য-ফুখ্যু জড়ো করিস্‌নি বাপু। দুটো চারটে মানুষের মতো—এককাট্টা কর্ দেখি। একটা মিউও যে শুনতে পাইনি। তোমরা মহোৎসবে তো লুচিসন্দেশ বাঁটলে, আর কতকগুলো নিষ্কর্মার দল গান করলে,···

---

১ স্বামীজীর কালে ভারতের নানা স্থানে, বিশেষতঃ পশ্চিম ভারতে দ্বিভাষী পত্রিকার চল ছিল।

তোমরা কী spiritual food দিলে, তা তো শুনলাম না? তোদের যে পুরানো ভাব nil admirari—কেউ কিছুই জানে না ভাব—যতদিন না দূর হবে, ততদিন তোরা কিছুই করতে পারবিনি, ততদিন তোদের সাহস হবে না। Bullies are always cowards,—(যারা লোককে তর্জন ক'রে বেড়ায়, তারা চিরকাল কাপুরুষ)।" ১৮৯৫-র আর এক চিঠিতে হিন্দি কাগজের ব্যাপারে স্বামী অখণ্ডানন্দকে,—হিন্দি ভাষা ও হিন্দিভাষী অঞ্চল যাঁর নখদর্পণে—পুনশ্চ তাগিদ দিলেন, "যজ্ঞেশ্বর বাবু মীরাটে একটা কি সভা করেছেন ও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজ করতে চান। ভাল, তাঁর একটা কি কাগজও আছে, কালীকে সেইখানে পাঠিয়ে দাও, কালী যদি পারে মীরাটে একটা centre করুক এবং সেই কাগজটা যাতে হিন্দি ভাষাতে হয়, এমন চেষ্টা করুক—আমি কিছু কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব।" একই বৎসরে মঠে লিখলেন—"হরমোহন নাকি একটা কাগজ বার করবার যোগাড় করছিল, তার কি হ'ল? কালী, শরৎ, হরি, মষ্টার, G. C. Ghosh (গিরিশবাবু) যোগাড় ক'রে একটা যদি পারো তো ভালই বটে।"

এখানে স্বামীজী যাদের নাম করলেন, তাঁরা বাংলাদেশে সত্যই কাগজ বার করতে সমর্থ ছিলেন। এঁদের মধ্যে গিরিশ ঘোষ বাংলাদেশের প্রধান নট ও নাট্যকার; মাস্টার মহাশয় বা মহেন্দ্র গুপ্ত শিক্ষাব্রতী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান ছাত্র। সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাদের মধ্যে কালী অর্থাৎ স্বামী অভেদানন্দ, শরৎ অর্থাৎ স্বামী সারদানন্দ, হরি অর্থাৎ স্বামী তুরীয়ানন্দ যথেষ্ট শিক্ষিত, এবং এঁরা তিনজনই স্বামীজীর প্রচারে সহায়তা করবার জন্য তাঁর জীবিতকালেই পাশ্চাত্ত্যে গিয়েছিলেন! হরমোহন মিত্রের সঙ্গে পাঠকদের ইতিপূর্বে যথেষ্ট পরিচয় হয়েছে। এই 'পাগলা হরমোহন' রামকৃষ্ণ-আন্দোলন-সংক্রান্ত বহু পুস্তক-পুস্তিকার প্রকাশক, এবং কিছু ছিটগ্রস্ত হওয়ার জন্য উদ্যমে উন্মত্ত।

এই চিঠিতে একজনের উল্লেখ নেই—তাঁর নাম স্বামী ত্রিগুণাতীত। শ্রীরামকৃষ্ণের অল্প-বয়সী এই শিষ্যকে কাজের ব্যাপারে বিশেষ কেউ গণনার মধ্যে আনেননি। কিন্তু বিবেকানন্দ জানতেন, কোথা থেকে কি হয়। গুরুভাইদের সস্নেহ কৌতুকের পাত্র ঐ যুবকটির সামনে ছিল গৌরবময় কর্মজীবন, এবং পরিণতি—মর্মান্তিক কিন্তু মহান। ইনি ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সানফ্রানসিস্কোয় জনৈক উন্মাদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে যখন নিহত হন, তার পূর্বেই অন্তত: দুটো বড় কীর্তি রেখে যেতে পেরেছিলেন—উদ্বোধন পত্রিকার প্রকাশ এবং পাশ্চাত্ত্যে প্রথম হিন্দু-মন্দির-স্থাপনা। স্বামী ত্রিগুণাতীতই, আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র শহীদ।[২]

২ উদ্বোধন পত্রিকায় ১৩২২ সালের বৈশাখ মাসে স্বামী ত্রিগুণাতীতের দেহত্যাগের সংবাদ এইভাবে বেরিয়েছিল:

"আমরা অতীব শোক-সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-পদাশ্রিত প্রবীণ সন্ন্যাসিগণের অন্যতম, উদ্বোধনের প্রতিষ্ঠাতা, কালিফোর্নিয়ার বেদান্ত-প্রচারক বহুগুণাধার শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীত গত ১০ই জানুয়ারী তারিখে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণপাদপদ্মে মিলিত হইয়াছেন। শরীরত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে তিনি স্যানফ্রান্সিস্কোর হিন্দু-টেম্পলে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি একদিন সমবেত ভক্তবৃন্দ-সমক্ষে বেদান্ত-সম্বন্ধীয় বক্তৃতা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভাবরা নামক এক ব্যক্তি আসিয়া সহসা তথায় এক বোমা নিক্ষেপ করে। বোমাটা ফাটিয়া অনেককে আহত করে। ভাবরা নিজে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়; এবং স্বামী ত্রিগুণাতীত গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। ভাবরা কেন এই দুষ্কার্যের অনুষ্ঠান করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজ জীবনও মূল্যস্বরূপে প্রদান করিল, তাহা নিশ্চয়

ত্রিগুণাতীত অর্থাৎ সারদা, স্বামীজীকে জানান, স্বামীজীর ইচ্ছানুযায়ী তিনি বাংলায় পত্রিকা বার করতে চান। ১৮৯৫-তে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখেন—"সারদা কি বাংলা কাগজ বার করবে বলছে? সেটার বিশেষ সাহায্য করবে, সে মতলবটা মন্দ নয়। কারুর উৎসাহ ভঙ্গ করতে নাই। criticism একেবারে ত্যাগ করবে। যতদূর ভাল বোধ হয়, সকলকে সাহায্য করবে; যেখানটা ভাল না বোধ হয়, ধীরে বুঝিয়ে দিবে। পরস্পরকে criticise করাই সকল সর্বনাশের মূল! দল ভাঙবার ঐটি মূলমন্ত্র। 'ও কি জানে?' 'সে কি জানে?' 'তুই আবার কি করবি?'—আর তার সঙ্গে ঐ একটু মুচকে হাসি, ঐগুলো হচ্ছে ঝগড়া-বিবাদের মূলসূত্র।" স্বামীজী কিভাবে মানুষের ভিতরের শক্তি দর্শন ও আকর্ষণ করতেন, এই পত্র তার আর একটি প্রমাণ।

১৮৯৬-এর জানুয়ারীতে স্বামীজী ত্রিগুণাতীতকে তাঁর বাংলা পত্রিকা বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে চিঠি লিখলেন—ভিতরের ব্রহ্ম-জাগানো বিবেকানন্দের স্বাভাবিক রচনা—"তোর কাগজের idea অতি উত্তম বটে এবং উঠে পড়ে লেগে যা, পরোয়া নেই। ৫০০৲ টাকা পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেবো, ভাবনা নাই টাকার জন্য! আপাততঃ এই চিঠি দেখিয়ে কারুর কাছে ধার ক'রে নে। এই চিঠির জবাব-চিঠির উত্তরে আমি ৫০০৲ টাকা পাঠিয়ে দেবো। ৫০০৲ টাকায় কিছু আসে যায় কি? খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান ধর্ম প্রচারের ঢের লোক আছে, তুই আপনার দেশী ধর্মের প্রচার এখন ক'রে ওঠ দিকি। তবে কোনও আরবীজানা মুসলমান-ভায়া ধরে যদি পুরানো আরবী গ্রন্থের তর্জমা করাতে পারো, ভাল হয়। ফার্সী ভাষায় অনেক Indian History আছে। যদি সে-গুলো ক্রমে ক্রমে তর্জমা করাতে পারো, একটা বেশ regular item হবে। লেখক অনেক চাই। তারপর গ্রাহক যোগাড়ই মুশকিল। উপায়—তোরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াস, বাঙলা ভাষা যেখানে যেখানে আছে, লোক ধরে কাগজ গছিয়ে দিবি।...চালাও কাগজ, কুছ্‌ পরোয়া নাই। শশী, শরৎ, কালী প্রভৃতি সকলে পড়ে (মিলে) লিখতে আরম্ভ কর। ঘরে বসে ভাত খেলে কি হয়? তুই খুব বাহাদুরি করেছিস। বাহবা, সাবাস! গুঁজগুঁজেগুলো পেছু পড়ে থাকবে হাঁ ক'রে, আর তুই লম্ফ দিয়ে সকলের মাথায় উঠে যাবি। ওরা নিজেদের উদ্ধার করছে—না হবে ওদের উদ্ধার, না হবে আর কারুর। মোচ্ছব এমনি মাতাবি যে, দুনিয়াময় তার আওয়াজ যায়। অনেকে আছেন, যাঁরা কেবল খুঁত কাড়তে পারেন; কিন্তু কাজের বেলা তো 'খোঁজ খবর নহি পাওয়ে।' লেগে

করিয়া বলা যায় না। এই ব্যক্তি বড় অস্থিরচিত্ত ছিল এবং কয়েক বৎসর যাবৎ একটির পর একটি করিয়া ধর্মমত ও সমিতিতে যোগদান করিয়া আসিতেছিল এবং বৎসরাধিক পূর্বে কিছুদিন হিন্দু-টেম্পলেও ছিল। অনুমান হয় ধর্ম-বিষয়ে কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারিয়াই সে ঐরূপ করিয়াছে। বিশেষ যত্নে স্বামী ত্রিগুণাতীতের চিকিৎসা হইতে থাকিলেও, বিষাক্ত বিস্ফোরক দ্রব্যের সংস্পর্শে রক্ত দূষিত হইয়া সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। স্বামী বিবেকানন্দের পদাঙ্কানুসারী কর্মবীর কর্মক্ষেত্রেই বহুজন-হিতায় বহুজন-সুখায় জীবন বিসর্জন করিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে মিশনের যে ক্ষতি হইল, তাহা বর্ণনাতীত। বারান্তরে আমরা ইঁহার অপূর্ব জীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।"

১৯১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে, ক্রিসমাসের তিন দিন পরে 'হিন্দু-মন্দিরে' যখন খ্রীষ্টোৎসব হচ্ছিল, সেই সময়ে বোমাটি ছোঁড়া হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় ত্রিগুণাতীতকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন পথিমধ্যে তিনি শুধু বলেছিলেন, 'বেচারা ছেলেটি! ও এখন কোথায়?' তাঁর দেহত্যাগের দিন ১০ই জানুয়ারী সেবার স্বামীজীর জন্মতিথি পড়েছিল। আগের দিন সেবক-শিষ্যকে ত্রিগুণাতীত বলেছিলেন—পরদিন, স্বামীজীর জন্মতিথিতে তাঁর দেহান্ত হবে।

যা, যত পারিস। পরে আমি ইণ্ডিয়ায় এসে তোলপাড় ক'রে তুলব। ভয় কি? 'নাই নাই বললে সাপের বিষ উড়ে যায়।'—নাই নাই ব'লে যে নাই হয়ে যেতে হবে।···

"গঙ্গাধর খুব বাহাদুরি করছে। সাবাস! কালী তার সঙ্গে কাজে লেগেছে। খুব সাবাস! একজন মান্দ্রাজে যা, একজন বম্বে যা। তোলপাড় কর্—তোলপাড় কর্ দুনিয়া। কি ব'লব আপসোস—যদি আমার মতো দুটা তিনটা তোদের মধ্যে থাকত—ধরা কাঁপিয়ে দিয়ে চলে যেতুম্। কি করি, ধীরে ধীরে যেতে হচ্ছে। তোলপাড় কর্—তোলপাড় কর্। একটাকে চীন দেশে পাঠিয়ে দে, একটাকে জাপান দেশে পাঠা। এ গৃহস্থদের কাজ নয়।···এ সন্ন্যিসীর দলকে হুঙ্কার দিতে হবে: 'হ-র, হ-র, শম্ভো!'"

১৭ই জানুয়ারী স্বামীজী আবার লিখলেন ত্রিগুণাতীতকে—"তুমি খবরের কাগজ এখন বার করতে লেগে যাও।···হুটোপাটিতে কি কাজ হয়?···লোহার দিল্ চাই, তবে লঙ্কা ডিঙ্গুবি। বজ্রবাঁটুলের মতো হতে হবে, পাহাড় পর্বত ভেদ হয়ে যাতে যায়। আসছে শীতে আমি আসছি। দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দেবো—যে সঙ্গে আসে আসুক, তার ভাগ্যি ভাল; যে না আসবে, সে ইহকাল পরকাল পড়ে থাকবে, থাকুক। তুই কোমর বেঁধে তৈয়ার থাক। তুই আর শশী আর গঙ্গাধর—এই তিনজন দেখছি faithful···তোদের মুখে হাতে বাগ্-দেবী বসবেন—ছাতিতে অনন্তবীর্য ভগবান বসবেন—তোরা এমন কাজ করবি যে দুনিয়া তাক হয়ে দেখবে।"

২৪শে জানুয়ারী, ১৮৯৬, স্বামীজী স্বামী যোগানন্দকে লিখলেন, তিনি যেন সারদার সংকল্পে উৎসাহ দেন।

কিন্তু এর পরে কয়েক মাস চিঠিতে 'সারদার কাগজ' সম্বন্ধে উল্লেখ দেখি না। এর দুটি কারণ সম্ভবপর। আমরা আগেই বলে এসেছি, বাংলাদেশের সন্ন্যাসী বা গৃহী গুরুভাইদের ইংরেজী পত্রিকা বার করবার সামর্থ্য সম্বন্ধে স্বামীজীর মনে কিছু সন্দেহ ছিল। এ ব্যাপারে তিনি মাদ্রাজীদের উপযুক্ততর ভেবেছিলেন। মঠ-গঠন ইত্যাদি কাজকেই সন্ন্যাসীদের পক্ষে অধিকতর সম্ভবপর বুঝতে পেরেছিলেন। সুতরাং ইংরেজী পত্রিকার ব্যাপারে আলাসিঙ্গা প্রভৃতির উপর নির্ভর করেন এবং ব্রহ্মবাদিন ও প্রবুদ্ধ ভারত প্রকাশ করে মাদ্রাজী ভক্তগণ স্বামীজীর সে অভিপ্রায় সিদ্ধ করেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত যখন বাংলা পত্রিকার ব্যাপারে উঠে পড়ে লাগলেন, তখন স্বামীজী নতুন করে উৎসাহিত হলেন, কিন্তু একটা নতুন প্রতিবন্ধক দেখা গেল—অর্থের অভাব। স্বামীজীকে ব্রহ্মবাদিনের টাকার দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। ক্রমে তিনি দেখলেন, তাঁর পক্ষে নতুন টাকার ঝুঁকি নেওয়া আর সম্ভব নয়। এই বিষয়ে ১৮৯৬, ১৪ এপ্রিল ডাঃ ননজুণ্ডা রাওকে লেখেন—"কলকাতায় বাংলা ভাষায় একখানি পত্রিকা আরম্ভ করতে সাহায্য ক'রব ব'লে কথা দিয়েছি। কিন্তু ব্যাপার এই—প্রথম দু'বছরই মাত্র বক্তৃতার জন্য টাকা আদায় করেছি; গত দু'বছর আমার কাজের সঙ্গে দেনা-পাওনার কোন সম্পর্ক ছিল না। এর ফলে আপনাকে বা কলকাতার লোকদের পাঠাবার মতো টাকা আমার মোটেই নেই।" কয়েক দিন পরে ২৭ এপ্রিল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা চিঠিতে দেখি, বাংলা পত্রিকার সম্পূর্ণ দায়িত্বগ্রহণে তাঁর যেন সম্পূর্ণ ইচ্ছা নেই; "সারদা যে কাগজ বার করতে চেয়েছে, সে উত্তম কথা বটে; কিন্তু সকলে মিলেমিশে করতে পার তো আমরা

সম্মতি আছে।"

বাংলা কাগজের মতই অন্যান্য দেশীয় ভাষার পত্রিকায় স্বামীজীর কতখানি আগ্রহ ছিল, তার কিছু নিদর্শন হিন্দি পত্রিকা প্রকাশে ইচ্ছা থেকে দেখে এসেছি। দক্ষিণভারতীয় ভাষায় পত্রিকা সম্বন্ধে ডাঃ ননজুণ্ডাকে ২৬ অগস্ট, ১৮৯৬ লিখলেন—"যখন এই পত্রিকাটি (প্রবুদ্ধ ভারত) দাঁড় করিয়ে দিতে পারবেন, তখন তামিল, তেলুগু, কানাড়া প্রভৃতি দেশীয় ভাষায় ঠিক ঐ ভাবের কাগজ বের করুন।" আলাসিঙ্গাকে ২০শে নভেম্বর লিখলেন—"এখন তো আমাদের ইংরাজি পত্রিকাখানি দাঁড়িয়ে গেছে; অতঃপর ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় কয়েকখানি আরম্ভ করতে পারি।"

স্বামীজীর ইচ্ছা অনুযায়ী মাদ্রাজে তামিল পত্রিকা বার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। রাজম আয়ার এই পত্রিকারও ভারগ্রহণ করবেন ঠিক হয়; পত্রিকার নামকরণ করা হয়েছিল—'প্রবোধচন্দ্রিকা'। রাজমের মৃত্যুর সঙ্গে সেই বাসনার সমাপ্তি ঘটে।[৩]

বাংলা পত্রিকার ব্যাপারে আরও অগ্রগতির সংবাদ পাই স্বামীজীর ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরে শুদ্ধানন্দকে লেখা তাঁর ১৮৯৭, ১১ জুলাই-য়ের পত্রে—"ব্রহ্মানন্দকে বলবে, তিনি যেন অভেদানন্দ ও সারদানন্দকে—মঠে তাদের সাপ্তাহিক কার্য-বিবরণী পাঠাতে লেখেন, যেন তা পাঠাতে ত্রুটি না হয়, আর যে বাঙলা কাগজটা বার করবার কথা হচ্ছে, তার জন্য প্রবন্ধ ও প্রয়োজনীয় উপাদান যেন তারা পাঠায়। গিরিশবাবু কি কাগজটার জন্য যোগাড়যন্ত্র করছেন? অদম্য ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে কাজ ক'রে যাও ও প্রস্তুত থাকো।"

এই চিঠি থেকে মনে হয়, বাংলা পত্রিকা প্রকাশের সমস্ত আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল তখনি। কিন্তু তিন মাস কেটে যাবার পরেও পত্রিকা বেরোয়নি। ১৮৯৭, ১১ অক্টোবর স্বামীজী নানা বিষয়ে অত্যন্ত নৈরাশ্য ও অভিমান প্রকাশ করে ব্রহ্মানন্দকে যে পত্র লেখেন, তাতে ছিল—"সারদা বেচারীকে অনেক গাল দিয়েছি। কি ক'রব?...আমি গাল দিই; কিন্তু আমারও বলবার ঢের আছে। ...আমি হাঁপাতে হাঁপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর প্রবন্ধ লিখেছি।" মনে হয় এটি উদ্বোধনের বিখ্যাত প্রস্তাবনা-প্রবন্ধ।

নানা কারণে উদ্বোধনের প্রকাশ ক্রমেই পেছোতে থাকে। মূল কারণ অর্থকষ্ট। উদ্বোধন প্রকাশিত হতে আরও প্রায় দেড় বছর লেগে যায়। প্রথম প্রকাশকাল ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী। এই দেড় বৎসরের মধ্যে পত্রিকা সম্বন্ধে স্বামীজীর চিন্তা থামেনি। ১৮৯৮ খৃঃ মার্চ মাসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা তাঁর এক চিঠিতে দেখতে পাই, স্বামীজী ডন পত্রিকার ব্যাপারে (পরবর্তীকালে সতীশ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় যা বিখ্যাত হয়েছিল, স্বামী স্বরূপানন্দ গোড়ার দিকে যার সম্পাদক ছিলেন), উৎসাহ দেখাচ্ছেন—"ডন কাগজখানির প্রতি সংখ্যার জন্য ৪০৲ টাকা খরচ হইবে, এবং দুইশত গ্রাহক পাইলেই উহা নিয়মিত প্রকাশিত হইতে পারিবে, ইহা মস্ত খবর।" এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, স্বামীজী ডন পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং পত্রিকাখানি স্বামীজীর আদর্শে পরিচালিত হবে, এমন স্থির হয়েছিল।

ডন পত্রিকার সতীশ মুখোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ-

৩ "Of course the proposed Tamil journal, Probodha Chandrika, which promised to give full scope to the rich imagination, fine critical faculty and ecstatic outpouring of the departed genius, will not be started." (P. B., June, 1898)

মণ্ডলীতে পরিচিত ব্যক্তি। তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত নন, অথচ তার ভাবধারার প্রতি সহানুভূতি আছে, এমন সকলকে স্বামীজী কাজের ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ করতে চাইতেন। সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের পুরানো ভক্ত অথচ রামকৃষ্ণ সংঘের বহির্বর্তী নৃত্যগোপালের পত্রিকা-বিষয়ক পরিকল্পনাতেও তাঁর উৎসাহ ছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ২৩ এপ্রিল, ১৮৯৮ লেখেন—"নৃত্যগোপাল বলে, ইংরাজি কাগজটায় খরচ অল্প; অতএব প্রথম উহা বাহির করিয়া পরে বাংলাটা দেখা যাবে। এ-সকলও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। যোগেন কাগজের ভার লইতে রাজি আছে?... শরৎকে জিজ্ঞাসা করবে—জি. সি., সারদা, শশীবাবু প্রভৃতি প্রবন্ধ তৈয়ার রেখেছেন কিনা।"

'কলকাতা থেকে ইংরাজি কাগজ'-এর বদলে যখন আলমোড়া থেকে ইংরেজী কাগজ প্রবুদ্ধ ভারতের পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করা হল, তখন স্বভাবতই আবার বাংলা কাগজের ব্যাপারে স্বামীজীর দৃষ্টি পড়ল। বাংলা কাগজ প্রকাশের দরকারও হয়ে পড়েছিল। স্বামীজীর বিরুদ্ধে রক্ষণশীল আক্রমণ তখন বাংলা কাগজে সবেগে চলেছে, এবং বেদান্ত-আন্দোলনকে হয় ঔদাসীন্যে, নয় আঘাতে বিধ্বস্ত করার চেষ্টার সীমা ছিল না। জনসাধারণের কাছে উপস্থিত হবার মত কোনো বাংলা পত্রিকাবাহন স্বামীজীর নেই।[৪] সহজেই থাকতে পারত, যদি স্বামীজী কোনো দলীয় স্বার্থকে তোয়াজ করতে রাজী হতেন। স্বভাবতই তা তিনি পারেন না। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন গঠিত হয়ে গেছে, এবং তার প্রধান কার্যালয় হয়েছে বাংলা দেশে। সুতরাং বাংলা ভাষায় জনগণের কাছে মত ও পথের কথা উপস্থিত করার আশু প্রয়োজন। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যের প্রতি স্বামীজীর বিশেষ অনুরাগ তো ছিলই। অথচ সংকল্পের পথে প্রধান বাধা টাকার। স্বামীজী মিস ম্যাকলাউডকে অনুরোধ করে লিখলেন (২৯ এপ্রিল, ১৮৯৮): "প্রত্যুত আমি কলকাতায় একখানি কাগজ চালাব। তুমি যদি ঐ কাগজ চালু করতে আমায় সাহায্য কর, তবে খুবই কৃতজ্ঞ হব।" ম্যাকলাউড নিশ্চয় অর্থসাহায্যে রাজী হয়েছিলেন। স্বামীজী স্বামী ব্রহ্মানন্দকে কিছুদিন পরেই (২০ মে) লিখলেন: "কাগজের জন্য টাকার চেষ্টা হইতেছে। যে ১২০০৲ টাকা তোমায় কাগজের জন্য দিয়াছি, তাহা ঐ হিসাবেই যেন থাকে।" কিন্তু এতৎসত্ত্বেও কাগজের ব্যাপারে সমস্যার শেষ হয়নি। প্রায় এক মাস পরে ব্রহ্মানন্দকে আবার লিখলেন: "সারদার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, তদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য এইমাত্র যে, বাঙলা ভাষায় magazine paying করা মুশকিল, তবে সকলে মিলিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া subscriber যদি যোগাড় করা যায় তো সম্ভব বটে। এ বিষয়ে তোমাদের যে-প্রকার মত হয় করিবে। সারদা বেচারা একেবারে ভগ্ন-মনোরথ হইয়াছে। যে লোকটা এত কাজের এবং নিঃস্বার্থ, তার জন্য এক হাজার টাকা যদি জলেও যায় তো ক্ষতি কি?"

উদ্বোধন শেষ পর্যন্ত বেরিয়েছিল।[৫] আগেই জানিয়েছি, ১৮৯৯-এর জানুআরি মাসের মাঝা-

৪ শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাপ্তাহিক বসুমতী ১৮৯৬ সালে আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে পত্রিকা স্বামীজীর ইচ্ছাপূরণ করতে সমর্থ ছিল না। উপেন্দ্রনাথের সাপ্তাহিক বসুমতী সম্বন্ধে বিবরণ দিয়েছি পরিশিষ্টে।

৫ তখন উদ্বোধনের "আয়তন ছিল ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা, বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মের ছুটিতে এক মাস (দুই সংখ্যা) পাক্ষিক উদ্বোধন-প্রকাশ বন্ধ থাকিত।"

মাঝি সময়ে (১৩০৫ সনের ১লা মাঘ) পাক্ষিক পত্রিকারূপে এর প্রথম আত্মপ্রকাশ। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল দৈনিক পত্র প্রকাশ করবেন। অর্থাভাবে তা করা সম্ভব হয়নি। স্বামীজী-প্রদত্ত এক হাজার টাকার উপরে হরমোহন মিত্রের কাছ থেকে এক হাজার টাকা ধার নিয়ে কাজ আরম্ভ করা হয়।* প্রথম কার্যালয়—"কলিকাতা, কম্বুলেটোলা, ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্র লেন, গিরীন্দ্রমোহন বসাকের বাড়িতে।" "প্রথম হইতেই 'উদ্বোধন প্রেস' নামে উদ্বোধনের

"প্রথমে পাক্ষিক পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া পরে দশম বর্ষ হইতে উদ্বোধন মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।" "প্রথম বর্ষ হইতে চতুর্থ বর্ষের অষ্টাদশ সংখ্যা পর্যন্ত উদ্বোধন নিজস্ব প্রেসে ছাপা হইয়াছিল। পরে নানা কারণে প্রেসটি বিক্রয় করিয়া দিতে হয়।"

কেন প্রেসটি বিক্রয় করে দিতে হয়েছিল, তার কিছু কারণ পরে উদ্ধৃত কুমুদবন্ধু সেনের স্মৃতিকথায় পাওয়া যাবে।

উদ্বোধনের জন্য ত্রিগুণাতীত কি ধরনের প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন তা দেখা যায় ঢাকার যতীন্দ্রচন্দ্র দাসকে লেখা তাঁর দুটি চিঠি থেকে। উদ্বোধন প্রকাশিত হবার আগে, ১৯শে পৌষ, ১৩০৫ তারিখে তাঁকে লেখেন :

"আগামী ১লা মাঘ হইতে কাগজ ('উদ্বোধন' নামে বাঙ্গলা পাক্ষিক পত্র) বাহির হইবে। ছাপা হইয়া গিয়াছে।...আপনি যথার্থই নিঃস্বার্থ কার্য হিন্দুধর্মের জন্য করিতেছেন; নচেৎ 'উদ্বোধনে'র জন্য এত পরিশ্রম করিতে পারিতেন না। ঢাকায় যাবতীয় কলেজ, স্কুল ও আফিসে এবং স্টেশনে হাণ্ডবিল বিতরণ করাইবেন। তাহার দরুন পৃথক হাণ্ডবিল অদ্য পাঠাইলাম।"

৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০০ তারিখে একই জনকে লেখেন :

"অদ্য ডাকে এক হাজার হাণ্ডবিল আপনাকে পাঠাইয়াছি।...আপনাকে পদে পদে কষ্ট দিতেছি, মনে করিবেন না। আপনাদের দ্বারাই পূর্ববঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বিশেষ প্রচারকার্য হওয়া সম্ভব এবং হইতেছেও।...যাহা হউক, ঢাকায় প্রত্যেক হিন্দুর বাটীতে এক এক খানি হাণ্ডবিল দিয়া 'উদ্বোধনে'র গ্রাহক হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিবেন। হাণ্ডবিলে কি আছে তাহা সকলকেই খুব ভালরূপ বুঝাইয়া দিবেন, নচেৎ কেহ হাণ্ডবিল বুঝিতে পারিবে না। রীতিমত লেকচার দেওয়ার মত হাণ্ডবিলে কি কি বিষয় আছে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দিবেন।"

(উদ্বোধন, ভাদ্র, ১৩৫৫)

* উদ্বোধন-প্রেস কেনা হয়েছিল মিস ম্যাকলাউডের টাকায়। রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ইতিহাসে মিস ম্যাকলাউডের নাম অবিস্মরণীয়। প্রথম পর্বে বহির্ভারতে এই আন্দোলনের তিন শ্রেষ্ঠ সহায়িকা—তিনজনই মহিলা—দুইজন আমেরিকান, মিসেস ওলি বুল ও মিস ম্যাকলাউড, তৃতীয় জন আইরিশ, সিস্টার নিবেদিতা। মিসেস ওলি বুল প্রধানতঃ আর্থিক সাহায্য করেছেন, এবং সিস্টার নিবেদিতা তাঁর রচনাদির দ্বারা প্রচার চালিয়েছেন (নিবেদিতা ভারতকেই তাঁর কর্মক্ষেত্র করেছিলেন); মিস ম্যাকলাউড সম্বন্ধে বলা যায়, তিনি দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্ত্যখণ্ডে এই আন্দোলনের ধাত্রীর কাজ করেছেন। স্বামীজীর ভারতীয় কাজকেও তিনি নিজের কাজ বলে নিয়েছিলেন। অর্থে ও সামর্থ্যে তিনি যৎপরোনাস্তি করতেন—কতখানি করেছেন সে ইতিহাস যদি সম্পূর্ণ জানা যায়, দেখা যাবে প্রতিষ্ঠানগতভাবে রামকৃষ্ণ মিশন অ-সন্ন্যাসী যাঁদের কাছে ঋণী তাঁদের মধ্যে মিস ম্যাকলাউডের স্থান সর্বাগ্রে।

উদ্বোধন-প্রেস কেনার বিষয়ে ম্যাকলাউডের স্মৃতিকথায় পাই :

"মিসেস ওলি বুল মঠ-প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েক সহস্র ডলার দিয়েছিলেন। আমার সামর্থ্য অল্পই, আটশো ডলার সংগ্রহ করতেই কয়েক বছর লেগে গেল। একদিন স্বামীজীকে বললাম, 'এই আমার অল্প কিছু টাকা, আপনি প্রয়োজনে লাগাতে পারবেন।' তিনি বললেন, 'কী? কি বললে?' আমি বললাম, 'হাঁ।' 'কত?'—জিজ্ঞাসা করলেন। বললাম, 'আটশো ডলার।' তখনি স্বামী ত্রিগুণাতীতের দিকে ফিরে বললেন, 'এই তোমার টাকা, যাও, প্রেস কেনো গিয়ে।' ত্রিগুণাতীত প্রেস কিনলেন, তাই দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলা মুখপত্র উদ্বোধন বেরুল।" (*Reminiscences*)

একটি নিজস্ব প্রেস ছিল। এই প্রেসটিও গিরীন্দ্র বাবুর বাটীতেই স্থাপন করা হইয়াছিল।" প্রথম সম্পাদক (এবং প্রকাশকও) স্বামী ত্রিগুণাতীত। তিনি চতুর্থ বর্ষের কার্তিক সংখ্যা (১৩০৯) পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন।

'স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি লেখকবর্গ' উদ্বোধনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় পত্রিকাটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল অচিরে। প্রথম পর্বে স্বামীজী ছাড়া উদ্বোধনের উল্লেখযোগ্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী, ক্ষীরোদ-

উদ্বোধন স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা রচনার প্রকাশক্ষেত্র-রূপে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে মূল্যবান ভূমিকা নিয়েছিল। তার পিছনে পরোক্ষ সাহায্য ছিল এক ইংরেজী-ভাষী মহিলার।

প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি। স্বামী সারদানন্দের ওজস্বিতাপূর্ণ রচনাতেও এইকালে উদ্বোধন সমৃদ্ধ। স্বামী শুদ্ধানন্দের অনুবাদ-রচনারও উল্লেখ করতে হয়। শুদ্ধানন্দ আত্মবিশ্বাসী পুরুষ ছিলেন। স্বামীজী তাঁর ইংরাজী রচনা ও ভাষণাদির অনুবাদের কথা যখন বলেন, তখন অনেকে অতি সম্ভ্রমে পেছিয়ে যান,—এগিয়ে আসেন 'ঝাঁপ না দিলে সাঁতার শেখা যায় না' নীতিতে বিশ্বাসী স্বামী শুদ্ধানন্দ।[৭] তাঁর অনুবাদের ভাষাগত ওজস্বিতার জন্য 'জ্ঞানযোগ', 'ভারতে বিবেকানন্দ' প্রভৃতিকে অনেকে স্বামীজীর মৌলিক রচনা বলে মনে করেছেন। বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে স্বামী শুদ্ধানন্দের নাম প্রথম সারিতে।[৮]

কিন্তু আর কারো নয়, স্বামীজীর রচনাই উদ্বোধনকে মহিমান্বিত করেছিল। উদ্বোধনই বিবেকানন্দকে বাংলা লেখক করেছিল, এ গৌরব তার চিরদিনের। পত্রিকাটির প্রতি স্বামীজীর অসীম মমত্ব ছিল, সদ্য-প্রবর্তিত সংঘ-মুখপত্রের প্রতি দায়িত্বও ছিল অশেষ। অন্তরের তাগিদে যদি নাও হয়, পত্রিকার প্রয়োজনেও তাঁকে লিখতে হয়েছে। না, অন্তরের তাগিদ অল্প ছিল না। পরম প্রিয় বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যে-যোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তা পুনঃস্থাপনের ইচ্ছাও তাঁর মনে জেগেছিল। স্বামীজীর প্রায় সকল মৌলিক বাংলা লেখাই উদ্বোধনে বেরিয়েছে, উদ্বোধনের পক্ষে

৭ এই অনুবাদকার্যের সূচনা সম্বন্ধে স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখেছেন :

"সেই সময়ে স্বামীজীর ইংলণ্ডে প্রদত্ত জ্ঞানযোগ-সম্বন্ধীয় বক্তৃতাসমূহ লণ্ডন হইতে ই. টি. স্টার্ডি সাহেব কর্তৃক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইতেছে—মঠেও উহার দুই-এক কপি প্রেরিত হইতেছে। স্বামীজী দার্জিলিং হইতে তখনও ফেরেন নাই—আমরা পরম আগ্রহ সহকারে সেই উদ্দীপনাপূর্ণ অদ্বৈত তত্ত্বের অপূর্ব ব্যাখ্যাস্বরূপ বক্তৃতাগুলি পাঠ করিতেছি। বৃদ্ধ স্বামী অদ্বৈতানন্দ ভাল ইংরাজী জানেন না—কিন্তু তাঁহার বিশেষ আগ্রহ 'নরেন' বেদান্ত সম্বন্ধে বিলাতে কি বলিয়া লোককে মুগ্ধ করিয়াছে তাহা শুনেন। তাঁহার অনুরোধে আমরা তাঁহাকে সেই পুস্তিকাগুলি পড়িয়া তাহার অনুবাদ করিয়া শুনাই। একদিন স্বামী প্রেমানন্দ নূতন সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণকে বলিলেন, 'তোমরা স্বামীজীর এই বক্তৃতাগুলির বাংলা অনুবাদ কর না।' তখন আমরা অনেকে নিজ নিজ ইচ্ছামত pamphletগুলির মধ্যে যাহার যাহা ইচ্ছা সেইখানি পছন্দ করিয়া অনুবাদ আরম্ভ করিলাম। ইতিমধ্যে স্বামীজী আসিয়া পড়িয়াছেন। একদিন প্রেমানন্দ-স্বামী স্বামীজীকে বলিলেন, 'এই ছেলেরা তোমার বক্তৃতাগুলির অনুবাদ আরম্ভ করেছে।' পরে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'তোমরা কে কি অনুবাদ করেছ, স্বামীজীকে শুনাও দেখি।' তখন সকলেই নিজ নিজ অনুবাদ আনিয়া কিছু কিছু স্বামীজীকে শুনাইল। স্বামীজীও অনুবাদ সম্বন্ধে দু'একটি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—এই শব্দের এইরূপ অনুবাদ হইলে ভাল হয়, এইরূপ দুই-একটি কথাও বলিলেন। একদিন স্বামীজীর কাছে কেবল আমিই রহিয়াছি, তিনি হঠাৎ আমায় বলিলেন, 'রাজযোগটা তর্জমা কর্ না।' আমার ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে এইরূপ আদেশ স্বামীজী কেন করিলেন? আমি তাহার বহুদিন পূর্ব হইতে রাজযোগের অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতাম···রাজযোগের অনুবাদ করিলে···আমারই আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা হইবে, তদুদ্দেশ্যেই কি তিনি আমাকে এই কার্যে প্রবৃত্ত করিলেন? অথবা বঙ্গদেশে যথার্থ রাজযোগের চর্চার অভাব দেখিয়া, সর্বসাধারণের ভিতর উক্ত যোগের যথার্থ মর্ম প্রচার করিবার জন্যই তাঁহার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল।···যাহা হউক, স্বামীজীর আদেশে নিজের অনুপযুক্ততা প্রভৃতির কথা মনে না ভাবিয়া উহার অনুবাদে তখনই প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।" ('স্বামীজীর কথা' গ্রন্থ)

৮ শোনা যায় স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রথমাবধি উদ্বোধনের সম্পাদনায় সাহায্য করতেন। ত্রিগুণাতীতের পরে তিনি উদ্বোধনের সম্পাদক হন। এ বিষয়ে 'উদ্বোধন কার্যালয়' থেকে প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয়' পুস্তিকায় কিছু সংবাদ পাই, সেই সঙ্গে উদ্বোধন পত্রিকার সঙ্গে স্বামী সারদানন্দের সম্পর্কের সংবাদও :

"১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি (ত্রিগুণাতীত) আমেরিকা গমন করিবার পর উদ্বোধন পত্রিকার প্রকাশন লইয়া গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, এমন কি পত্রিকাটির প্রকাশন বন্ধ হইবার আশঙ্কাও দেখা দেয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দের একান্ত ইচ্ছা ও স্বামী সারদানন্দের প্রচেষ্টার ফলে এই সঙ্কট কাটিয়া যায়। স্বামী শুদ্ধানন্দকে পত্রিকা-সম্পাদনার ও প্রকাশনের ভার দেওয়া হয়। তাঁহার ত্যাগ, নিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা এবং অধ্যবসায় সহকারে সুযোগ্য পরিচালনার ফলেই উদ্বোধন পত্রিকার প্রকাশন অতি সুষ্ঠুভাবে চলিতে থাকে। স্বামী সারদানন্দ এই সময় হইতেই উদ্বোধনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন; অবশ্য ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ১২, ১৩নং গোপালচন্দ্র নিয়োগী লেন-এ তাঁহারই প্রচেষ্টায় নির্মিত নিজস্ব ভবনে উদ্বোধন কার্যালয় উঠিয়া আসিবার সময় হইতে উদ্বোধন কার্যালয় পরিচালনার ভার তিনি পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন।"

তা সম্পদ, মানব-চিন্তার ক্ষেত্রেও; সে রচনাগুলির গুরুত্ব এমনই ছিল যে, ইংরেজীতে অনুবাদ করেও অন্য পত্রিকা প্রকাশ করত। স্বামীজী কেবল চিন্তা-বস্তুতেই উদ্বোধনকে গরীয়ান করেননি, রীতির ক্ষেত্রেও বাংলা গদ্যে নূতন ধারার সূচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে অন্য এক অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব।

স্বামীজী তাঁর মনের কতখানি উদ্বোধনকে দিয়েছিলেন দেখতে পাই নিবেদিতার একটি চিঠি থেকে (১৯ জুলাই, ১৮৯৯):

"রাজা (স্বামীজী) তাঁর বাংলা পত্রিকার জন্য ঘাড় গুঁজে দাসের মত খাটছেন ক্যাবিনে বসে। ...বাংলা পত্রিকাটি তাঁর কাছে কী না আশীর্বাদের মত হয়েছে, তোমাকে তা বলা দরকার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এর জন্য একটি দীর্ঘ পত্র রচনা করছেন—মজাদার রসিকতায় তা পূর্ণ, সেই সঙ্গে টিপ্পনী ও মন্তব্য, এবং আর্ত ভবিষ্যৎবাণী। সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন। বিদেশীয়ানা, ব্রাহ্মপদ্ধতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে জলন্ত রোষ, জনগণের প্রতি নিবিড় আশা ও ভালবাসা, গুরুর প্রতি দীপ্ত ভক্তি, চারিপাশের জীবন সম্বন্ধে ব্যাপক সন্ধানী দৃষ্টি,—সর্বোপরি বাংলা ভাষার উপরে কিছু ইচ্ছাকৃত উৎপীড়ন, যার ফলে তাঁর লেখা বোঝা দুরূহ হয়ে উঠছে, যেমন ছিল কার্লাইলের প্রথম আবির্ভাবকালের রচনা, যা সৃষ্ট হয়েছিল দারুণ কোনো লক্ষ্য-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে।"[১] ('নিবেদিতা লোকমাতা')

[১] নিবেদিতা-কথিত 'দীর্ঘ পত্র' হচ্ছে উদ্বোধনে প্রকাশিত স্বামীজীর 'বিলাতযাত্রীর পত্র', যা কিছুদিন পরে নাম বদলে হয় 'পরিব্রাজক।' 'ভাষার উপর ইচ্ছাকৃত উৎপীড়ন' আর কিছু নয়, নিতান্ত চলিত বাংলায় লেখা, যা নিবেদিতার পক্ষে বোঝা শক্ত হয়েছিল, কারণ তিনি অনেক চেষ্টার পরেও সাধু বাংলার বেশী শিখতে পারেননি।

উদ্বোধন প্রকাশিত হবার পরে 'শিষ্য' শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে স্বামীজীর সে বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছিল। উদ্বোধনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্যের চমৎকার বিবরণ ওর মধ্য থেকে পাই।—

"স্বামীজী। (পত্রের নামটি বিকৃত ক'রে পরিহাসচ্ছলে) "উদ্বন্ধন" দেখেছিস্?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ; সুন্দর হয়েছে।

স্বামীজী। এই পত্রের ভাব, ভাষা সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে।

শিষ্য। কিরূপ?

স্বামীজী। ঠাকুরের ভাব তো সব্বাইকে দিতে হবেই; অধিকন্তু বাংলা ভাষায় নূতন ওজস্বিতা আনতে হবে। এই যেমন—কেবল ঘন ঘন verb use (ক্রিয়াপদের ব্যবহার) কল্লে ভাষার দম কমে যায়। বিশেষণ দিয়ে verbএর (ক্রিয়াপদের) ব্যবহারগুলি কমিয়ে দিতে হয়।...

শিষ্য। মহাশয়, স্বামী ত্রিগুণাতীত এই পত্রের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করেছেন—তা অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

স্বামীজী। তুই বুঝি মনে কচ্ছিস্, ঠাকুরের এই সব সন্ন্যাসী সন্তান কেবল গাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে ব'সে থাকতে জন্মেছে? এদের যে যখন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে, তখন তার উদ্যম দেখে লোকে অবাক্ হবে। এদের কাছে কাজ কি ক'রে করতে হয়, তা শেখ্।...

শিষ্য। মহাশয়, এই পত্র ১৫ দিন অন্তর বের হবে; আমাদের ইচ্ছা সাপ্তাহিক হয়।

স্বামীজী। তা তো বটে, কিন্তু funds (টাকা) কোথায়? ঠাকুরের ইচ্ছায় টাকার জোগাড় হ'লে এটাকে পরে দৈনিক করা যেতে পারে, রোজ লক্ষ কপি ছেপে কলকাতার গলিতে গলিতে free distribution (বিনা মূল্যে বিতরণ) করা যেতে পারে।

স্বামীজী। 'উদ্বোধনে' সাধারণকে কেবল positive ideas (সকল বিষয় গড়ে তোলবার আদর্শ) দিতে হবে। Negative thoughts (নেই-নেই-ভাব) মানুষকে weak (নির্জীব) ক'রে দেয়। Positive ideas (জীবন গড়ার ভাবগুলি) দিতে পারলে সাধারণে মানুষ হ'য়ে উঠবে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্প—সকল বিষয়ে যা চিন্তা ও চেষ্টা মানুষ করছে, তাতে ভুল না দেখিয়ে ঐ সব বিষয়ে কেমন ক'রে ক্রমে ক্রমে আরও ভাল রকমে করতে পারবে, তাই ব'লে দিতে হবে।... বেদ-বেদান্তের উচ্চ ভাবগুলি সাদা কথায় মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সদাচার, সদ্ব্যবহার ও বিদ্যাশিক্ষা দিয়ে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে এক ভূমিতে দাঁড় করাতে হবে।"

"সারদা বলে কাগজ চলে না আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত খুব advertise করে ছাপাক দিকি—গড় গড় করে subscriber হবে। খালি ভটচায্যিগিরি তিন ভাগ দিলে কি লোকে পছন্দ করে!

"যা হোক, কাগজটার উপর খুব নজর রাখবে। মনে জেনো যে, আমি গেছি। এই বুঝে স্বাধীনভাবে তোমরা কাজ কর। 'টাকা-কড়ি, বিদ্যাবুদ্ধি সমস্ত দাদার ভরসা' হইলেই সর্বনাশ আর কি! কাগজটার পর্যন্ত টাকা আনব, আবার লেখাও আমার সব—তোমরা কি করবে? সাহেবরা[১০] কি করছেন? আমার হয়ে গেছে। তোমরা যা করবার কর। একটা পয়সা আনবার কেউ নেই, একটা বিষয় রক্ষা করবার বুদ্ধি কারুর নেই—এক লাইন লিখবার...ক্ষমতা কারুর নাই—সব খামকা মহাপুরুষ।" (১০ আগস্ট, ১৮৯৯; লণ্ডন থেকে লেখা)। (ক্রমশঃ)

"বিশ্বাস কর, প্রভুর আজ্ঞা, ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে, জনসাধারণকে এবং দরিদ্রদিগকে সুখী করিতে হইবে।"

"যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের—গরীব-গুরবো, পাপী-তাপী, কীট-পতঙ্গ, তাদের সেবার জন্য যে তৈরী হবে—তাদের ভিতর তিনি আসবেন—তাদের মুখে সরস্বতী বসবেন, তাদের বক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বসবেন।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

১০ "সম্ভবতঃ পাশ্চাত্ত্য-প্রত্যাগত গুরুভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলা হইয়াছে।"—'বাণী ও রচনায়' প্রদত্ত টীকা।

চাঁদের দেশে

শিবদাস

১

নীল আকাশে যে সাদা মেঘের ভেলাগুলি ভেসে বেড়ায়, তাতে চড়ে কত মানুষ, কত কবি, কত জননী, কত শিশু যুগে যুগে পাড়ি দিয়েছে চাঁদের দেশে। চাঁদের দেশ থেকে কত আনন্দ এনেছেন তাঁরা। সে চাঁদ আমাদের কাছ থেকে বেদ্ বেশী নয়, এই মেঘের ওপারে, আর একটু দূরে। সে চাঁদকে আমাদের আঙিনায় নেমে এসে, খোকার কপালে টিপ দিয়ে যেতে ডাকাও হয়।

কত বিজ্ঞানীও গেছেন চাঁদের দেশে। তাঁরা তো আর মেঘের ভেলায় চড়বেন না, তাঁরা গেছেন হিসেব-নিকেশের ভেলায় চড়ে। তাঁরা হৃদয়সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান না, তাঁদের কারবার মগজের সঙ্গে। অনেক অঙ্ক-পাতি কষে তাঁরা আমাদের কাছে চাঁদের দেশের অনেক তথ্য এনে দিয়েছেন।

কিন্তু মানুষের এতদিনকার এসব যাওয়াই ছিল কল্পনায় যাওয়া। মানুষ আর চাঁদের মাঝখানের আড়াই লক্ষ মাইলের ব্যবধান তাতে একটুও কমেনি।

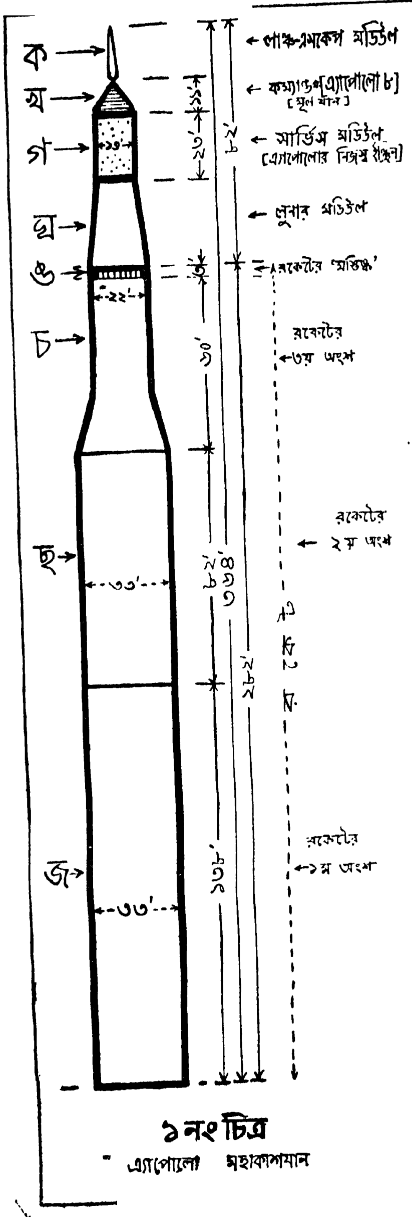
গত ২১শে জুলাই কিন্তু দু-জন মানুষ চাঁদ আর পৃথিবীর মাঝখানের এই ব্যবধানটুকু একেবারে মুছে দিয়ে সত্যিকারের ভেলায় চড়ে নীল আকাশে পাড়ি দিয়ে একেবারে সশরীরে গিয়ে অবতরণ করল চাঁদের ওপরে; (গত ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৬৮-তে মানুষ চাঁদ আর মানুষের মাঝের এই ব্যবধান কমিয়ে করেছিল ৭০ মাইল, আর গত ২১শে মে ১৯৬৯-তে মাত্র ৯ মাইল।) চাঁদের পিঠে নেমে ঘুরে বেড়িয়ে, চাঁদের মাটি, অনেক ছবি তুলে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা আবার ফিরে এসেছেন পৃথিবীতে। গত ২৪শে জুলাই রাত্রি ১০টা ১৯ মিনিটের সময়* তাঁরা তাঁদের ভেলাটিকে ভিড়িয়েছেন প্রশান্ত মহাসাগরে, হাওয়াই দ্বীপের কাছে। নীল আকাশে নয়, নিবিড়-কালো মহাকাশে পাড়ি দেবার এই ভেলাটির নাম 'আপোলো-১১'। (আগের দুটোর নাম অ্যাপেলো-৮ ও অ্যাপেলো-১০।) পৃথিবী থেকে অ্যাপোলো-১১ যাত্রা করেছিল গত ১৬ই জুলাই, রাত্রি ৭টা ২ মিনিটের সময়। যাত্রী ছিলেন তিন জন—নীল. এ. আর্মস্ট্রং, ই. এ্যালড্রিন ও মাইকেল কলিন্স।

২

কেপ কেনেডি হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায়, পূর্ব উপকূলের দক্ষিণ প্রান্তে, আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে। সেখানকার উৎক্ষেপণ-মঞ্চে সেদিন যাত্রার পূর্বে ৩৬৪´ ফুট উঁচু অ্যাপোলো-১১ যানটি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার পাশে খুব শক্ত করে তৈরী কংক্রিটের ভিত্তির ওপর নির্মিত একটি লোহার কাঠামো; কাঠামোটি কয়েক জোড়া বাহু মেলে যানটিকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। কাঠামোটির ভিতরে লিফট্ আছে। তাতে চড়ে মহাকাশচারী তিনজন সন্ধ্যা ছয়টার আগেই (১৬. ৭. ১৯৬৯) এসে উঠে বসেছিলেন মহাকাশযানটির একেবারে মাথার কাছে তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ কম্যাণ্ড মডিউলে। তাঁরা ভেতরে ঢোকার পরই বাইরে থেকে দরজটা নিশ্ছিদ্র করে বন্ধ করে দিয়ে লোকজন সবাই সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন

* সব সময়ই ভারতীয় সময় দেওয়া হল।

সাড়ে তিন মাইল দূরে উৎক্ষেপণ-পরিচালন-কেন্দ্রে। সেখান থেকেই চালু করা হবে



১ নং চিত্র

এ্যাপোলো মহাকাশযান

যানটিকে। শুধু উৎক্ষেপ করাই নয়, মহাকাশ-পথে যাওয়া-আসা নিয়ে পাঁচ লক্ষ মাইল পথ চলার সময় তাকে পরিচালনাও করা হবে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই পৃথিবী থেকে বেতারযোগে। কত দূরে যান গেল, কোন্ দিকে এখন ঘুরতে হবে, কি করতে হবে ইত্যাদি সব খবরই এবং নির্দেশই মহাকাশযাত্রীরা পাবেন নীচ থেকে। এমন কি তাঁদের রক্তের চাপ মাপা, হৃদ্স্পন্দন গোনা, সময়মত তাঁদের ঘুম থেকে জাগানো, এসবও করা হবে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকেই, বেতার-যোগে। সেই পরিচালন-কেন্দ্রটি আছে টেক্সাসের হিউস্টনে।

রাত্রি ঠিক ৭টা ২ মিনিটের সময় সাড়ে তিন মাইল দূরের উৎক্ষেপণ-কেন্দ্র থেকে মহাকাশচারীদের জানানো হল—'তোমাদের যানের রকেট চালু করা হল।' সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশযানের নীচে লাগানো রকেটটি পঞ্চমুখে বিপুল পরিমাণ অগ্নি ও ধূম উদ্গীরণ করতে লাগল আকাশফাটানো শব্দ করে। মহাকাশচারীদের মনে হল যেন প্রলয়-কালীন বজ্রনির্ঘোষ হচ্ছে। সেকেণ্ডে পনেরো টন করে জ্বালানি (১০'৬৭ টন তরল অক্সিজেন ও ৪'৩৩ টন কেরোসিন) পুড়তে শুরু করেছে তখন—সাড়ে এগারো কোটি পক্ষিরাজ ঘোড়া যেন চঞ্চল হয়েছে এই ৩,২০০ টন ওজনের যানটিকে আকাশে তুলে উড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য। যানটিকে কিন্তু তখনই ছাড়া হল না, লোহার কাঠামোটি সজোরে আঁকড়ে ধরে রইল তাকে; বাহুমুক্ত করল ৯ সেকেণ্ড পরে। ছত্রিশতলা বাড়ীর সমান উঁচু বিপুলকায় যানটি তখন প্রথমে ধীরে ধীরে পৃথিবীপৃষ্ঠ ত্যাগ করে ওপরে উঠতে লাগল। তারপর ক্রমবর্ধমান গতিতে সোজা ওপরে উঠে মুখটা একটু পূর্ব-দিকে হেলিয়ে নিল। ৬৫ সেকেণ্ডের মধ্যেই যানটির গতি শব্দের গতির চেয়েও বেশী হল। তারপর থেকে মহাকাশযাত্রীদের আর রকেটের

গর্জন শুনতে হয়নি, শব্দকে পিছনে ফেলে তাঁরা এগিয়ে চললেন।

আড়াই মিনিটের মধ্যেই যানটির গতিবেগ হল ঘণ্টায় ৬,০০০ মাইল। সেটি তখন পৃথিবী থেকে ৩৮ মাইল ওপরে উঠে এসেছে। এখানে যানটিকে তুলে দিয়ে যানটির একেবারে নীচ থেকে স্যাটার্ন-৫ রকেটের তৃতীয় অংশটি আপনি খসে গেল। রকেটের ২য় অংশটি সঙ্গে সঙ্গে চালু হয়ে গেছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত যানটি লম্বায় ছিল ৩৬৪′, এখন তার রকেটের নীচের ১৩৮′ ফুট লম্বা অংশটি খসে যাওয়ায় তার দৈর্ঘ্য দাঁড়ালো ২২৬′ ফুট। রকেট এই আড়াই মিনিটে ২,২৫০ টন জ্বালানি পুড়িয়ে ফেলেছে, পাঁচটি এফ-১ ইঞ্জিন সহ তার নিজেরও ওজন ছিল ১৫০ টন; তাই রকেটের তৃতীয় অংশটি খসে যাওয়ায় যানটির ওজন ২,৪০০ টন কমে গিয়ে দাঁড়ালো মাত্র ৮০০ টন, পৃথিবী ছেড়ে উঠার সময় যা ওজন ছিল, তার চারভাগের একভাগ মাত্র।

রকেটের ৮২′ ফুট লম্বা দ্বিতীয় অংশটি সক্রিয় হবার সঙ্গে সঙ্গে যানের গতি দ্রুততর হল। রকেটের এ অংশটিতে তুটি মাত্র জে-২ ইঞ্জিন। এ ইঞ্জিনগুলির শক্তিও অনেক কম। তবে যানটির ওজন এখন আগের ওজনের চারভাগের একভাগ মাত্র। তাই সাড়ে ছয় মিনিট পরে যানটির গতি বেড়ে গিয়ে হল ঘণ্টায় ১৪,০০০ মাইল। যানটি তখন পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ১১৮ মাইল ওপরে উঠে এসেছে, যে উচ্চতায় থেকে সে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরবে, তার প্রায় কাছাকাছি।

এখানে তুলে দিয়ে রকেটের দ্বিতীয় অংশটি খসে পড়ল, তৃতীয় অংশ সক্রিয় হল। এখন যানের দৈর্ঘ্য আরো কমে গিয়ে হল ১৪৪′ ফুট, আর ওজনও কমে গিয়ে হল মাত্র ৩০০ টন, যাত্রাকালীন ওজনের প্রায় এগারো ভাগের একভাগ। কারণ রকেটের দ্বিতীয় অংশের জ্বালানি (তরল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন) ৪৭০ টন আর তার নিজের ওজন ৩০ টন তখন কমে গেছে। স্যাটার্ন-৫ রকেটের ৬০′ লম্বা তৃতীয় ও শেষ অংশটি ২ মিনিটের কিছু বেশী সক্রিয় থেকে যানটির গতিবেগ বাড়িয়ে দিল ঘণ্টায় ১৭,০০০ মাইলে। যানটি যখন পৃথিবী-পরিক্রমার কক্ষপথে উঠে এসেছে (পৃথিবীপৃষ্ঠ ছাড়ার ১১ মিনিট ৪০ সেকেণ্ড পরে), তখন রকেটের তৃতীয় অংশটির ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া হল; এ-অংশে একটি মাত্র জে-২ ইঞ্জিন ছিল। রকেটের তৃতীয় অংশের ইঞ্জিন বন্ধ করা হল বটে, কিন্তু সেটিকে তখন যান থেকে খসিয়ে দেওয়া হল না, তার জ্বালানিও (১১৫ টন তরল হাইড্রোজেন ও তরল অক্সিজেন) নিঃশেষ হয়নি। তার আরো কাজ আছে।

পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে শুরু করার পরই যানটির একেবারে মাথায় কম্যাণ্ড মডিউলের ওপর মুকুটের মতো লাগানো লাঞ্চ-এসকেপ মডিউলটিকে যান থেকে খসিয়ে দেওয়া হল। এটির কাজ ছিল—কক্ষপথে ওঠার আগে রকেটে যদি কোন গণ্ডগোলের লক্ষণ দেখা দেয়, তাহলে সে কম্যাণ্ড মডিউলকে নীচের বাকী সব অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মহাকাশযাত্রিগণ সহ সেটিকে নিরাপদে পৃথিবীতে নামিয়ে নিয়ে আসবে। সে প্রয়োজন হয়নি। এর পরে আর কোন প্রয়োজনও নেই তার।

৩

মহাকাশযানটি ইঞ্জিন বন্ধ থাকা অবস্থাতেই নিজের গতিবেগ ও পৃথিবীর আকর্ষণের যুক্ত ফলে পৃথিবী পরিক্রমা করতে করতে যখন প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল,

অ্যাপোলো-১১-তে
:চন্দ্রাভিযান:
[১৬–২৪ জুলাই ১৯৬৯]

২নং চিত্র

তখন বিষুবরেখার কাছে আসতেই রকেটের তৃতীয় অংশটিকে আবার চালু করে যানের মুখ চাঁদের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হল। এই সময় চাঁদের কক্ষপথ (চাঁদ যে পথ ধরে পৃথিবীকে পরিক্রমা করে সেই পথ) যানটির ঠিক মাথার ওপর এসে গিয়েছিল। চাঁদের দিকে মুখ ঘোরানো হল মানে চাঁদ তখন সেখানে ছিল সেখানটা লক্ষ্য করে নয়, ২০শে জুলাই যানটি যখন চাঁদের কক্ষপথে পৌঁছুবে তখন চাঁদ যাতে যানটির কাছ থেকে ৭০ মাইল মত দূরে থাকে এমন একটি স্থানকে লক্ষ্য করে। যানটি তখন চাঁদে যাওয়ার জন্য পৃথিবীর কক্ষপথ ছেড়ে ঘণ্টায় প্রায় ২৫,০০০ মাইল বেগে মহাকাশে পাড়ি লাগাল।

মহাকাশের পথে পাড়ি দেবার অল্প কিছুক্ষণ পরেই কম্যাণ্ড মডিউল এবং সার্ভিস মডিউল যুক্ত থেকে, নীচের বাকি অংশ (লুনার মডিউল ও রকেটের তৃতীয় অংশ) হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ৫০' ফুট এগিয়ে গেল। এই সময় এই প্রক্রিয়ার ফলে ব্যবস্থামত লুনার মডিউলের বাইরের ঢাকনাগুলি খুলে খসে গেল, লুনার মডিউলের ভেতরে রক্ষিত চন্দ্রযান অনাবৃত হয়ে পড়ল; চন্দ্রযানের পায়াগুলি গোটানো অবস্থায় রকেটের তৃতীয় অংশের মধ্যে ঢোকানো ছিল। তারপর

এগিয়ে যাওয়া অংশটি একেবারে উল্টে গেল অর্থাৎ সামনের দিকের কম্যাণ্ড মডিউল পিছনে এল এবং সার্ভিস মডিউল সামনে গেল। এই অবস্থায় ধীরে ধীরে সেটি গতিবেগ কমিয়ে দিতে থাকল, যার ফলে পিছনে বিচ্ছিন্ন করা রকেটের তৃতীয় অংশের সঙ্গে সংযুক্ত লুনার মডিউলের সঙ্গে তার ৫০´ ফুটের ব্যবধান কমতে কমতে শূন্য হয়ে গেল—চন্দ্রযানের মাথার সঙ্গে কম্যাণ্ড মডিউলের মাথা ঠেকে গেল। দুটিকে বেশ ভাল-ভাবে যুক্ত করা হল তখন। উৎক্ষেপের সময় উৎক্ষেপণের সুবিধার জন্য যেভাবে যানটির বিভিন্ন অংশ সাজানো হয়েছিল, তাতে একেবারে মাথায় ছিল লাঞ্চএসকেপ মডিউল (১নং চিত্র—ক ; আগেই খসে গেছে), তার পরে কম্যাণ্ড মডিউল (খ), তার পরে সার্ভিস মডিউল (গ), তার পরে লুনার মডিউল (ঘ), তার পর সাটার্ণ-৫ রকেটের মস্তিষ্ক (ঙ), তার পর রকেটের তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম অংশ (চ, ছ ও জ ; আগেই ছ ও জ খসে গেছে)। এখন সাজানোটা দাঁড়ালো এই রকম : সামনে সার্ভিস মডিউল (গ), তার পর কম্যাণ্ড মডিউল (খ), তার পর ঢাকনাহীন লুনার মডিউল অর্থাৎ চন্দ্রযান (ঘ), তারপর রকেটের তৃতীয় অংশ (ঙ-চ)। এর পর রকেটের তৃতীয় অংশটিকে যান থেকে খসিয়ে দেওয়া হল ; যানের তখন অবশিষ্ট রইল চন্দ্রযান, তার আগে কম্যাণ্ড মডিউল, তার আগে সার্ভিস মডিউল (ঘ—খ—গ→)। রকেটের তৃতীয় অংশ খসে যাবার পর যানটি আর একবার উল্টে গিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে এল, আর সেভাবেই ছুটে চলল চাঁদের দিকে ; এই সব প্রক্রিয়ার ফলে তফাত এটুকু হল, আগে চন্দ্রযান সার্ভিস মডিউলের পিছনে পা-মোড়া হয়ে ঢাকনায় ঢাকা ছিল, এখন খোলা অবস্থায় পা-ছড়িয়ে কম্যাণ্ড মডিউলের সামনে—যানের একেবারে সামনে এল (গ—খ—ঘ→)। রকেটের তৃতীয় অংশটি খসে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রযানের গোটানো পায়াগুলি সোজা হয়ে গিয়েছিল (২নং চিত্র)।

চন্দ্রযানকে এভাবে কম্যাণ্ড মডিউলের সামনে আনার প্রয়োজন ছিল। দুজন মহাকাশচারীকে সার্ভিস মডিউল থেকে চন্দ্রযানে প্রবেশ করতে হবে চাঁদে নামার আগে, আবার ফেরার সময় চন্দ্রযান থেকে কম্যাণ্ড মডিউলের ভেতর ফিরে আসতে হবে। দুটো গায়ে গায়ে না থাকলে তা করা যায় না। অথচ উৎক্ষেপণের সময় পৃথিবী থেকে এইভাবে সাজিয়েও আনা যায় না ; কারণ তাতে যানটিকে ওপরের দিকে ক্রমশঃ সরু, শেষে একেবারে সূঁচল করা যাবে না। এদিকে পৃথিবীর চারদিক ঘেরা আবহমণ্ডলের প্রতিক্রিয়া ঠেলে তা ভেদ করে ওপরে তুলতে গেলে যানটিকে মাথার দিকে এভাবে ক্রমশঃ সরু করে আনতেই হবে। মহাকাশে এসে সে প্রয়োজন নেই, চাঁদের কাছে গিয়েও না, কারণ এসব জায়গায় আবহমণ্ডল নেই ; প্রায় কিছুই নেই যা যানটির ছুটে চলার সময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাকে পিছনে ঠেলে দিতে চাইবে। অবশ্য যানটির গতি একটু একটু করে কমে আসছিল অন্য কারণে ; পৃথিবী তাকে আকর্ষণ করছিল। এই আকর্ষণের ফলে যানটি যখন চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছেছে, চাঁদ যখন মাত্র ৩০,০০০ মাইল দূরে, তখন তার গতিবেগ ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল থেকে কমে গিয়ে দাঁড়ালো ঘণ্টায় মাত্র ২,২২৩ মাইল। এর পর যানটির ওপর পৃথিবীর টানের চেয়ে চাঁদের টানের জোর হল বেশী। তখন চাঁদের টানে যানটির গতি ক্রমশঃ বেড়ে চাঁদের ঠিক ওপাশে গিয়ে হল ঘণ্টায় ৫,৭০০ মাইল ; এই সময়, ১৯শে জুলাই রাত্রি পৌনে এগারটার সময়

মহাকাশযাত্রীরা সার্ভিস মডিউলের ইঞ্জিন চালিয়ে এই গতিবেগ কমিয়ে ঘণ্টায় ৩,৭০০ মাইল করলেন; তখন যানটি চাঁদের আকর্ষণ আর গতিবেগের মিলিত ফলে চাঁদের চারপাশে ঘুরতে আরম্ভ করল।

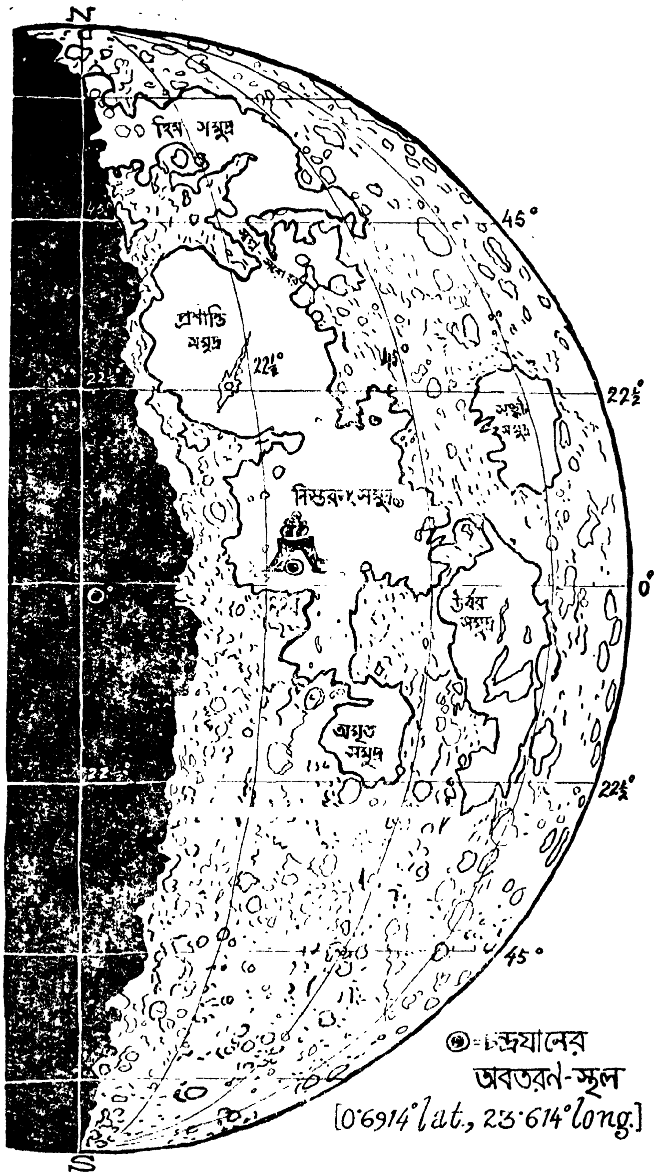
যানের গতিবেগ এভাবে না কমালে সেটি চাঁদের চারদিকে ঘুরতো না, সোজা ছুটে চলে যেত চাঁদ থেকে আরো দূরে। তখন অবশ্য চাঁদ ও পৃথিবী তাকে একই দিকে টানত, যাতে যানের গতি ক্রমশঃ কমে যেত এবং এক জায়গায় গিয়ে সে থেমে যেতই। তারপর আবার ফিরতে শুরু করত এবং ক্রমবর্ধমান গতিতে এগিয়ে এসে চাঁদকে ছাড়িয়ে ফিরে আসতো পৃথিবীতে। চন্দ্রাভিযানের পরিকল্পনাতে এই পরিস্থিতিকে যাত্রীদের একটি স্বাভাবিক নিরাপত্তার উপায় বলে ধরে রাখা হয়েছে।

অ্যাপোলো-১১ যানটি চাঁদকে একবার প্রদক্ষিণ করতে প্রায় ২ ঘণ্টা করে সময় নিচ্ছিল। এভাবে ১০ বারেরও বেশী চন্দ্র-প্রদক্ষিণের পর আর্মষ্ট্রং ও অ্যালড্রিন কম্যাণ্ড মডিউল থেকে চন্দ্রযানে প্রবেশ করলেন। কম্যাণ্ড মডিউলের মুখ ও চন্দ্রযানের মুখ যেখানে সংযুক্ত হয়েছে, সেখানে দুটিতেই ৩২" ইঞ্চি চওড়া এবং দুটি যানের সংযুক্ত অবস্থায় মোট ১৮" ইঞ্চি লম্বা একটি সুরঙ্গপথ; সে পথের কবাট খুলে প্রথমে অ্যালড্রিন ঐ সুরঙ্গপথ দিয়ে চন্দ্রযানে গেলেন; তার ২৫ মিনিট পর গেলেন আর্মষ্ট্রং। বেশ ভালভাবে তাঁরা চন্দ্রযানের যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখলেন ঠিক আছে কিনা; কারণ চাঁদে নামা ও উঠার সময় চন্দ্রযানের যন্ত্রগুলিই একমাত্র অবলম্বন।

চাঁদকে ১২ বার প্রদক্ষিণের পর, ২০শে জুলাই রাত্রি ১১টা ১৮ মিনিটের সময় চন্দ্রযান ঈগলকে মূলযান থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল। এটা ঘটল যান যখন চাঁদের ওপাশে, যখন আমাদের ও চন্দ্রযানের মাঝখানে রয়েছে চাঁদ। বিচ্ছিন্ন হবার পর চন্দ্রযান যে-পথে চন্দ্রপ্রদক্ষিণ করছিল, রাত্রি ১২-৩৮ মিনিটের সময় নিজের ইঞ্জিন চালু করে তার চেয়ে আরো একটু নীচে নামল। এদিকে মূলযানে চড়ে কলিন্স একা আগের পথেই (চাঁদ থেকে ৭০ মাইল ওপরে) চন্দ্রপরিক্রমা করে চললেন, আর দেখতে লাগলেন চন্দ্রযানের অবতরণ; বেতারে বললেন, "এই চন্দ্রযান ঈগলটি একটি কুৎসিত পাখির মত দেখাচ্ছে, কিন্তু সে নামছে বেশ ভালভাবেই"। রাত্রি ১-৩৫ মিনিটের সময় চন্দ্রযান চন্দ্রপৃঠে অবতরণ শুরু করল; চন্দ্রযান আর চন্দ্রপৃষ্ঠের দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে। প্রক্রিয়ার সবটাই পরিচালিত হচ্ছিল যন্ত্রে, কিন্তু নামার ঠিক আগে যাত্রীরা দেখলেন, যেখানটায় নামার কথা, সে জায়গাটা মোটেই সমতল নয়, এলোমেলো বড় বড় পাথরের স্তূপ সর্বত্র। সেখানে যান নামলে বিপদ; যদি ভেঙ্গে না-ও যায়, নেমে বেশী কাত হয়ে বসলে, ১৫° ডিগ্রীর বেশী হেলে বসলে, চন্দ্রযানকে আর চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ওপরে তোলাই যাবে না; তার মানে জলহীন বায়ুহীন খাদ্যহীন স্থানে নিশ্চিত মৃত্যু। যাত্রীরা তখন পরিচালনভার যন্ত্রের হাত থেকে নিজেদের হাতে নিলেন এবং যানটিকে চন্দ্রপৃষ্ঠের ৫০' ফুট ওপর দিয়ে সামনে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে কিছুদূরে সমতলভূমির ওপর নামলেন।

চন্দ্রযান চাঁদের ওপর যেখানটায় নামল, সে অঞ্চলটির নাম 'নিস্তরঙ্গ সমুদ্র'। নাম সমুদ্র হলেও এটি সমুদ্র নয়, মরুভূমির মতো; চাঁদে জলই নেই, জলে তরঙ্গ তোলার জন্য হাওয়াও নেই। বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করার সুবিধের জন্য

চাঁদের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন নাম রেখেছেন, সে-সব নামই চলে আসছে। দূর থেকে চন্দ্রপৃষ্ঠ যেখানে-যেখানে সমতল বলে মনে হয়, সেসব জায়গার নাম 'সমুদ্র' রাখা হয়েছে। যেমন 'নিস্তরঙ্গ সমুদ্র', 'প্রশান্তি সমুদ্র', 'সঙ্কট সমুদ্র', 'অমৃত সমুদ্র' ইত্যাদি। একটি এলাকার নাম 'স্বপ্ন সরোবর'—ছোট বলে সমুদ্র বলা হয়নি। পৃথিবীতে স্থান-নির্দেশের জন্য আমরা যেমন তার ওপর বিষুব-রেখা, অক্ষরেখা, দ্রাঘিমা রেখা প্রভৃতি কতকগুলি কাল্পনিক রেখা টেনে ভাগ করি, চাঁদকে বিজ্ঞানীরা সেভাবে কাল্পনিক রেখা টেনে ভাগ করেছেন। চন্দ্রযান যেখানে অবতরণ করল, সেখানটা



৩নং চিত্র

চাঁদের বিষুবরেখা থেকে প্রায় ০·৬৯১৪° উত্তরে, এবং চাঁদের যে দিকটা আমরা দেখতে পাই (চাঁদ ২৯½ দিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে, তার নিজের চারিদিকে একবার ঘোরেও ২৯½ দিনে, সেজন্য সব সময়ই চাঁদের একই পৃষ্ঠ পৃথিবী থেকে দেখা যায়), তাকে চাঁদের

উত্তর ও দক্ষিণ মেরু সংযোগ করে সমান দুভাগ করলে যে রেখায় দ্বিধাবিভক্ত হয়, সেই রেখা থেকে ২৩'৬৩৪° ডিগ্রী পূর্বে। (৩নং চিত্র)।

চন্দ্রযান যখন চাঁদের ওপর নামল, তখন তার পায়াগুলি চাঁদের মাটিতে মাত্র ২" বসে গিয়েছিল। পায়াগুলির নীচে গোলাকার পা-দানি (কিনারা-উঁচু থালার মত আকারের) লাগানো ছিল, যাতে যানটি চন্দ্রপৃষ্ঠ স্পর্শ করলে তার নামার বেগজনিত চাপ অনেকটা জায়গায় ছড়িয়ে যায়। নামার সময় উপরের দিকে ইঞ্জিনের মুখ ছিল, চাঁদের আকর্ষণে কমিয়ে যানটিকে যথাসম্ভব ধীর গতিতে নামাবার জন্য; ইঞ্জিনের গ্যাসের বেগে, যান নামার ঠিক আগে চাঁদের ধুলো ওপরে উঠে যায়—ধুলোর ঝড়ের মত যানটিকে ঢেকে ফেলে। নামার সময় জানলায় ক্যামেরা বসিয়ে ছবি তোলা হচ্ছিল; এই ধুলোর ঝড় জানলা ঢেকে দেওয়ায় ছবি ঝাপসা ওঠে কিছুক্ষণ! অবশ্য অতি অল্পক্ষণই তা ছিল।

যানটি চন্দ্রপৃষ্ঠে নেমে বসেছিল প্রায় খাড়া হয়ে—মাত্র ৪° হেলে।

খুব সুন্দরভাবে, নির্বিঘ্নে, ঠিক পরিকল্পনা-মতই পৃথিবী থেকে আড়াই লক্ষ মাইল দূরে মানুষ যান নিয়ে গিয়ে নামাল চাঁদের ওপর, ১৯৬৯-র ২১শে জুলাই, রাত্রি ১-৪৭ মিনিটের সময়।

মানুষের কত দিনের স্বপ্ন সফল হল, মানুষের জ্ঞানের—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার—কত বড় সাফল্য এটি, মানুষের অধ্যবসায়, উদ্যম ও সাহসের কত বড় নিদর্শন! এই প্রথম মহাকাশের বুকে পাড়ি দিয়ে মানুষের তৈরী ভেলা মানুষ নিয়ে পৃথিবী ছেড়ে অপর জ্যোতিষ্কে গিয়ে ভিড়ল। (ক্রমশঃ)

"মহা উদ্যম, মহা সাহস, মহা বীর্য এবং সকলের আগে মহতী আজ্ঞাবহতা—এই সকল গুণ ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির একমাত্র উপায়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

কর্মিগণের গম্য চন্দ্রলোক

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

আধুনিক জ্যোতিষ্ক-বিজ্ঞানের বলে মানব-সন্তান স্থূল শরীরেই চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং স্বভাবতই জিজ্ঞাসার উদয় হয়—হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত যে চন্দ্রলোক, যাহা পিতৃযাণমার্গের শেষ সীমা, আতিবাহিক দেবগণ কর্তৃক বাহিত না হইয়া যে-স্থলে গমনের অন্য উপায় নাই, ইষ্টাপূর্তাদি কর্মানুষ্ঠানকারিগণ বহু আয়াসের ফলে যেখানে গমনের অধিকার লাভ করেন, সেই চন্দ্রলোকে যখন মানব-সন্তান এইভাবেই গমন করিতে সমর্থ হইলেন, তখন তো বৈদিক বা স্মার্ত কর্মসকলের কোন উপযোগিতাই নাই! বেদাদি শাস্ত্রেরই বা সার্থকতা কোথায়? এই জাতীয় প্রশ্ন অনেকেরই মনে জাগা অস্বাভাবিক নহে বলিয়া এবিষয়ে কিছু শাস্ত্রীয় আলোচনা করা হইল।

হিন্দুশাস্ত্রমতে মনুষ্যগণের ভোগভূমিভূত লোক সাতটি, যথা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ এবং সত্য। এই সত্যলোকের অপর নাম ব্রহ্মলোক। বিষ্ণুপুরাণ, ২।৭ অধ্যায়ে ভূর্লোকাদির স্থান এইপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—সর্বোচ্চ পর্বতশিখর পর্যন্ত পাদগম্য স্থানই—**ভূর্লোক**। ভূমি ও সূর্যের মধ্যবর্তী সূর্যের নিম্নদেশস্থ গ্রহনক্ষত্রাদিরূপে বিরাজিত লোকসকলই **ভুবর্লোক**। পরিদৃশ্যমান উপগ্রহ চন্দ্রমা ইহারই মধ্যে অবস্থিত। এই ভুবর্লোকের অপর নাম—'অন্তরিক্ষলোক ও মরীচিলোক', ইহা "তে অন্তরিক্ষম্ আবিশতঃ, তে দিবম্ আবিশতঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১১।৪।৫।৬-৭) ইত্যাদি শ্রুতি, এবং "দ্যুলোকাৎ অধস্তাৎ অন্তরিক্ষম্ যৎ তৎ মরীচয়ঃ" (ঐতঃ উপঃ ১।১।২ ভাষ্য) ইত্যাদি বচন হইতে অবগত হওয়া যায়। সূর্যমণ্ডলের ঊর্ধ্ববর্তী জ্যোতিশ্চক্রের নাভিস্বরূপ ধ্রুবনক্ষত্র পর্যন্ত স্থলে অবস্থিত লোকসকলকে বলে—**স্বর্লোক**। ইহার অপর নাম স্বর্গলোক, "কে দিবম্ আবিশতঃ" ইত্যাদি শতপথ শ্রুতি, এবং "দ্যুলোকং স্বর্গাখ্যম্" ইত্যাদি তত্রস্থ সায়ণভাষ্য হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। ধ্রুবের ঊর্ধ্বে **মহর্লোক** (বিষ্ণুপুঃ ২।৭।৪২, কূর্মপুঃ ৪৩।১)। তাহার ঊর্ধ্বে **জনলোক**, তদূর্ধ্বে **তপোলোক** এবং তদুপরি নানা স্তরে বিভক্ত **সত্যলোক**। পাতঞ্জল যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যে এতদ্বিষয়ক বর্ণনাতে একটু তারতম্য আছে, তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। তবে সেই মতে স্বর্গলোক ধ্রুবেরও ঊর্ধ্বে অবস্থিত।

এক্ষণে আমরা কর্মিগণের গম্য যে চন্দ্রলোক, তাহা এই লোকসপ্তকের মধ্যে কোথায় অবস্থিত এবং এই পরিদৃশ্যমান উপগ্রহভূত চন্দ্রমাই সেই চন্দ্রলোক কি না, তাহা নিরূপণের প্রয়াস করিতেছি।

(ক) দেবযানমার্গ-বর্ণনাতে শ্রুতি বলিতেছেন—"আদিত্যাৎ চন্দ্রমসম্" (ছাঃ ৫।১০।২); ইহা হইতে অবগত হওয়া যায়—কর্মিগণের গম্য চন্দ্রলোক সূর্যের ঊর্ধ্বদেশে, সুতরাং দ্যুলোকের অর্থাৎ স্বর্গলোকের মধ্যে অবস্থিত। "অদোঽম্ভঃ পরেণ দিবম্" (ঐতঃ ১।১।২), এই শ্রুতির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলিয়াছেন—"বিপ্রকৃষ্টা আপঃ চান্দ্রমস্য অন্তঃপদার্থঃ" (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।১৬)। সুতরাং ঐতরেয়ক শ্রুত্যুক্ত অন্তঃশব্দে জলপূর্ণ চন্দ্রলোক গ্রহণীয়। "পরেণ

দিবম্" এই শ্রুত্যংশের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভগবান্ শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—"দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ তস্য অস্তসো লোকস্য" ইত্যাদি। সুতরাং আমাদের আলোচ্য চন্দ্রলোক সূর্যের ঊর্ধ্বে দ্যুলোকের মধ্যে অবস্থিত, ইহাই নির্ণীত হয়। কূর্মপুরাণও তাহাই বলেন—"ভূমের্যোজনলক্ষে তু ভানোর্বৈ মণ্ডলং স্থিতম্। লক্ষ্যে দিবাকরস্যাপি মণ্ডলং শশিনঃ স্মৃতম্" ॥ (কূর্মপুঃ ৪০।৮) ইত্যাদি।

(খ) আবার "বৃহন্ পাণ্ডরবাসাঃ সোমো রাজা" (বৃঃ ২।১।৩) ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে "পাণ্ডরং শুক্লং বাসঃ…অপ্-শরীরত্বাৎ চন্দ্রাভিমানিনঃ" ইত্যাদি ভাষ্যকারীয় বচন হইতে, "ভানুমণ্ডলতো যস্মাৎ দ্বিগুণং চন্দ্রমণ্ডলম্",[১] (বৃঃ ভাষ্যবার্তিক ২।৪।৫৪-৫৫), ইত্যাদি বার্তিককারের বচন হইতে, "দ্বিগুণঃ সূর্যবিস্তারাৎ বিস্তারঃ শশিনঃ স্মৃতঃ" (কূর্মপুঃ ৪০।১৪) ইত্যাদি স্মৃতিবচন হইতে এবং উক্ত ঐতরেয়ক ১।১।২ শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়—এই কর্মিগম্য চন্দ্রমা জলপূর্ণ এবং সূর্যমণ্ডলাপেক্ষা বৃহৎ

(গ) চন্দ্রলোকে গমনকরতঃ কর্মির জলময় শরীর লব্ধ হয়, ইহা "চন্দ্রমণ্ডলে আপ্যম্ আরভন্তে" (ছাঃ ৫।১০।৪ ভাষ্য), ইত্যাদি বচন হইতে অবগত হওয়া যায়। তাহা সঙ্গতও বটে, কারণ ভূর্লোকে আমাদের ক্ষিতিপ্রধান শরীরের ন্যায় জলপ্রধান চন্দ্রলোকে জলপ্রধান শরীর হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এইরূপে এতাবৎ পর্যন্ত শাস্ত্রবিচারে আমরা দেখিলাম—কর্মিগম্য শাস্ত্রীয় চন্দ্রলোক সূর্যের ঊর্ধ্বে দ্যুলোকে অবস্থিত, তাহা সূর্যাপেক্ষা বৃহৎ ও জলপূর্ণ। পাতঞ্জলের মতে তো তাহা ধ্রুবেরও ঊর্ধ্বে অবস্থিত। আর কর্মিগম্য এই চন্দ্রলোক দ্যুলোকের, অর্থাৎ স্বর্গলোকের অন্তর্গত হইলেই "স্বর্গকামো যজেত", "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ", ইত্যাদি শ্রুতিরও সার্থকতা সিদ্ধ হয়। অতএব নির্ণীত হইতে—ভুবর্লোকের মধ্যে অবস্থিত পরিদৃশ্যমান এই উপগ্রহভূত চন্দ্রমা, কর্মিগণের গম্য চন্দ্রলোক নহে।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তে একটি বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা এই—স্মৃতি বলেন, "দ্বাবিমৌ পুরুষব্যাঘ্র সূর্যমণ্ডলভেদিনৌ। পরিব্রাট্যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ ॥" (মহাভাঃ, উদ্যোগপর্ব ৩৩,৬১)। সুতরাং কর্মিগম্য শাস্ত্রীয় চন্দ্রলোক যদি সূর্যমণ্ডলের ঊর্ধ্বদেশে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে ইষ্টাপূর্তকারী কেবল কর্মী সূর্যমণ্ডল ভেদ করিয়া কিপ্রকারে সেখানে গমন করিবেন? উক্ত স্মৃতিবাক্যে তো যোগযুক্ত পরিব্রাজক এবং সম্মুখ সমরে নিহত ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহারও সূর্যমণ্ডল ভেদের প্রতিষেধই প্রতিভাত হইতেছে। এই বিরোধের সমাধান কি? তাহা বলা হইতেছে—দেবযানমার্গে আতিবাহিক দেবগণকর্তৃক বাহিত হইয়া সূর্যমণ্ডলভেদ করতঃ যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারা ঋজুমার্গাবলম্বনে ঝটিতি গমন করেন, ইহা "সঃ যাবৎ ক্ষিপ্যেৎ মনঃ তাবৎ আদিত্যং গচ্ছতি" (ছাঃ ৮।৬।৫), ইত্যাদি শ্রুতি এবং "ত্বরাবচনম্ গন্তব্যান্তরাপেক্ষয়া শৈঘ্র্যার্থত্বাৎ" (ব্র. সূঃ ৪.৩।১ সূ-ভাষ্য) ইত্যাদি ভাষ্যকারীয় বচন এবং "বক্রাধ্বনা গতিম্ অপেক্ষ্য অবক্রেণ গতিঃ ত্বরাবতী কল্প্যতে" (ন্যায়নির্ণয় ৪।৩.১) ইত্যাদি টীকাকারীয় বচন হইতে নির্ণীত হয়। ভাষ্যকারীয় বচনে "গন্তব্যান্তর' বলিতে অবশ্যই কর্মিগম্য চন্দ্রলোককে গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ শ্রুতিতে পিতৃযাণমার্গে সর্বোচ্চ স্থলে অবস্থিত চন্দ্রলোক এবং দেবযানমার্গে সত্যলোক পর্যন্ত

১ "অন্তোঽতিপাণ্ডরং বাসঃ যস্মাচ্চন্দ্রাভিমানিনঃ"

দেবলোকসমূহ ব্যতিরেকে অন্ত কোন গন্তব্য স্থান নাই। উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতিতে সত্যলোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গমনের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং 'গন্তব্যান্তর' বলিতে চন্দ্রলোককেই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে ইহাই নির্ণীত হয় যে, পিতৃযাণমার্গবাহী আতিবাহিক দেবগণ কর্মীকে লইয়া বক্রমার্গাবলম্বনে সূর্যমণ্ডলকে পরিত্যাগ করিয়া তদূর্ধ্ববর্তী কর্মিগণের গম্য জলপূর্ণ চন্দ্রলোকে গমন করেন, এবং অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিমান দেবযানমার্গবাহী আতিবাহিক দেবগণ উপাসকাদি সূর্যমণ্ডলভেদের অধিকারিগণকে লইয়া ঋজুমার্গাবলম্বনে সূর্যমণ্ডকে ভেদ করিয়াই গন্তব্য দেবলোক গমন করেন। এইরূপে উক্ত বিরোধ নিরাকৃত হইয়া পড়ে।

অতএব জ্যোতিষ্কবিজ্ঞানবলে মানবসন্তান যে চন্দ্রলোকে গমন করিতেছে, তাহা কেবল কর্মিগণের গম্য শাস্ত্রবর্ণিত চন্দ্রলোক না হওয়ায় হিন্দুগণের বেদাদিশাস্ত্রের কোনপ্রকার বিরোধ হয় না।

চলার পথে

শ্রীদীপেন্দ্র চক্রবর্তী

প্রতি পরমাণু মাঝে আত্মা মোর লীন
প্রভাসিত তত্ত্ব তার অনন্ত মাঝারে ;
তাইতো পারি না আমি স্বচ্ছদৃষ্টিহীন
পশিতে যে বিশ্বব্যাপী অরূপ আত্মারে।
রূপের সাগর মাঝে প্রাণপণ করিয়া প্রয়াস
বারে বারে আসে শ্রান্তি যখনি সন্তরি ;
হইবে কি ঐকান্তিক চেষ্টা মোর বৃথা
পাব না কি আমি হায় সিন্ধুতীরে তরী !

বিশ্বের দুয়ারপ্রান্তে দাঁড়ায়ে একাকী
গাহিতেছি নিজ মনে অসীমের গান ;
নিখিল আত্মার সাথে একদা মিলন
হইবে নিশ্চয় মোর, জানি ভগবান !

সমালোচনা

বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজ-চিন্তা: হরপ্রসাদ মিত্র। বেঙ্গল পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা-১২; পৃঃ ১৯৮; মূল্য ছয় টাকা।

সাম্প্রতিক বিবেকানন্দচর্চার পটভূমিতে অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্রের আলোচ্য গ্রন্থটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আধুনিককালে ভারতীয় মনীষীদের সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার কিছু সার্থক প্রচেষ্টা দেখা যায়। বিশেষভাবে শতবার্ষিকী-উদ্‌যাপনের আয়োজন থেকেই এ-জাতীয় প্রচেষ্টার সূত্রপাত হলেও এর দ্বারা সাধারণ পরিচয়ের অন্তরালে একই মহাপুরুষের অন্তর্লোকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনাপ্রসঙ্গে আমাদের তথ্য-সমৃদ্ধি ও উপলব্ধি-গভীরতা—দুইই ঘটে থাকে। স্বামীজীর মতো যুগমনীষাপ্রসঙ্গে এজাতীয় আলোচনা আরো বেশী প্রয়োজনীয়। কারণ, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজীর যথাযথ স্থান-নিরূপণের কাজ এদেশে এখনো বাকি। তাঁর অধ্যাত্ম-ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, চারুকলায়, কারিগরী বিদ্যায়, রাজনীতি ও অর্থনীতির বিচারে, সর্বোপরি মহত্তম মননে ও দর্শনে যে হিমালয়োপম বিকাশ দেখা দিয়েছিল, দূর থেকে তার কয়েকটি গিরিশৃঙ্গের রূপরেখামাত্র এ যাবৎকাল আলোচিত। স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের গভীরে প্রবেশের অন্তর্দৃষ্টি যে ঋষিকল্প মহাপুরুষদের থাকতে পারে, তাঁদের কথা বাদ দিলেও স্বামীজীর চিন্তাধারার নানামুখী বিশ্লেষণে সযত্ন প্রয়াস আমাদের বুধমণ্ডলীর কাছে একান্ত প্রত্যাশিত। সে প্রত্যাশা-পূরণের উদাহরণ অবশ্য বিরল। অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্রের 'বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজ-চিন্তা' এদিক থেকে আগ্রহী পাঠকের অভিনন্দন লাভ করবে।

স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্যসৃষ্টি ও সমাজ-দর্শন সম্বন্ধে এর আগে বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যে গবেষণাধর্মী আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। অধ্যাপক মিত্র পূর্ব-আলোচনার সংকেত গ্রহণ করলেও নিজস্ব পঠন ও মননের বিপুল তথ্যসম্ভারের ভিত্তিতে স্বামীজীর সাহিত্য ও সমাজ-বিষয়ে মূল চিন্তাসূত্রগুলি বিন্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর মানস-পরিমণ্ডলটি এক্ষেত্রে বিবেকানন্দ-মানসের পরিধি- ও গভীরতা-নিরূপণে সহায়ক হয়েছে।

'ভারত-সাধকের বিশ্বভাবনা' প্রবন্ধ থেকেই বিবেকানন্দের বিশ্বতোমুখী মনীষার মূল-পরিচয়টি অধ্যাপক মিত্র নিপুণ তথ্যসমাবেশে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিবেকানন্দ-মানসের প্রস্তুতিপর্বের রূপরেখা হিসাবে 'অন্বয়দৃষ্টি ও আত্মসন্ধান', 'সমাজ-মনের অবসাদমুক্তি', 'একজন পূর্বগামীর চিন্তা'—অধ্যায় তিনটি প্রণিধানযোগ্য। শেষোক্ত প্রবন্ধে আচার্য ভূদেবের সঙ্গে স্বামীজীর চিন্তাধারার ঐক্য সম্বন্ধে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখক আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তবে ভূদেবের আগে ও পরে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, রাজনারায়ণ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ পূর্বগামীদের সঙ্গে স্বামীজীর চিন্তাসূত্রের ঐক্য ও অনৈক্য আজও বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। বিবেকানন্দ-মানসের অন্তরেতিহাসে Imitation of Christ

(ঈশানুসরণ) গ্রন্থটির প্রভাব সম্বন্ধে 'বিবেকানন্দের একখানি প্রিয় গ্রন্থ' নিবন্ধটি সুন্দর আলোকপাত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের দু' বৎসর আগে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'একটি পুরাতন কথা' নিবন্ধের বক্তব্যসূত্র অনুসরণ করে লেখক স্বামীজী ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সৌসাদৃশ্য দেখাতে চেয়েছেন। একথা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনাও 'ত্যাগে'র বিশেষ মূল্য স্বীকার করে নিয়েই তাঁর জীবনসাধনাকে পরিচালিত করেছে। কিন্তু সমগ্র ভারতের পুনরুজ্জীবনে ত্যাগ ও আধ্যাত্মিকতার যে একান্ত মূল্য স্বামীজী নির্ধারণ করেছেন, রবীন্দ্রমননে ত্যাগের সেই গুরুত্ব নিশ্চয়ই অনুপস্থিত। একদিকে অধ্যাত্ম-উপলব্ধির তুঙ্গতম শীর্ষ আর একদিকে জগৎকল্যাণে আপন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত নিঃশেষে বিলোপ—এ দু'দিক থেকেই বিবেকানন্দের মানসপ্রয়াণ রবীন্দ্রভাবলোক থেকে বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত। তাই মনে হয়, অধ্যাত্মচেতনার জগতে এবং সাহিত্যচিন্তার জগতেও রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বিভিন্ন মানদণ্ডের প্রয়োজন।

উদাহরণস্বরূপ এ বইয়ের 'সাহিত্য ও সমাজ-কথায় বিবেকানন্দ' এবং 'বিবেকানন্দের সাহিত্য' প্রবন্ধ দুটি স্মরণীয়। প্রথম প্রবন্ধের প্রথম বাক্যেই লেখকের মন্তব্য—'বিবেকানন্দ সাহিত্যিক ছিলেন না।' এর ব্যাখ্যাস্বরূপ দ্বিতীয় বাক্য—'তাঁর বাংলা লেখাগুলিতে সাহিত্যগুণ আছে বটে, তবে প্রধানত সাহিত্য-স্রষ্টা হওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।' প্রধানতঃ সাহিত্যিক হওয়ার মানদণ্ড এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি নিশ্চয়। তাঁদের মতো ব্যাপক সৃষ্টির অবসর নিশ্চয় স্বামীজীর ছিল না। কিন্তু সাহিত্যের ভাষা, সৌন্দর্য, মনন-গভীরতা—এসব কিছু সম্বন্ধে তিনি রীতিমতো সজাগ লেখক। এমন কি তাঁর নিজের রচনা সম্বন্ধে তাঁর আত্মপ্রত্যয়ও —১৮৯৯-এর ১০ই আগস্ট লণ্ডন থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে লেখা চিঠিতে 'উদ্বোধন'-পত্রিকা-প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য স্মরণীয়—'সারদা বলে, কাগজ চলে না।··· আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত খুব advertise ক'রে ছাপাক দিকি—গড় গড় ক'রে subscriber হবে।' তিনি অল্প লিখেছেন বটে, কিন্তু যা লিখেছেন তা বিশেষ যত্ন করেই লিখেছেন পরিমাণগত বিচারে নয়, গুণগত বিচারেই বিবেকানন্দ জাত-সাহিত্যিক। তাঁর 'পত্রাবলী'র অধিকাংশ পত্র, 'পরিব্রাজক' বা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' যেমন চলতি ভাষার শাণিত ইস্পাতের তরবারি, তেমনি সাধুভাষায় তাঁর স্থিতধী মনস্বিতার অতুলনীয় উদাহরণ 'উদ্বোধনের প্রস্তাবনা' (বর্তমান সমস্যা), 'জ্ঞানার্জন' বা 'বর্তমান ভারতে'র মতো নিবন্ধাবলী। অপরপক্ষে তাঁর ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত কবিতার মধ্যে এমন ভাব-ভাষা-ছন্দের মিলিত সৌন্দর্য রয়েছে, যা কবিরূপে তাঁর অন্তরতম পরিচয় উদ্ঘাটিত করেছে।

সুতরাং 'বিবেকানন্দের সাহিত্য' (পৃঃ ১২৪) নিবন্ধের মন্তব্য—'···দেশের সমকালীন কাব্য-ভাষার গতি কোন্ দিকে, অথবা যে-ভাষা কবিতার উপযোগী, যাতে সাহিত্য-সচেতন সাহিত্য-রসিক মন অন্য কোনো আনুগত্য ব্যতিরেকেই সাড়া দিতে পারে, সে-ভাষা আয়ত্ত করবার মতন বিস্তৃত সময় বা তীক্ষ্ণ আগ্রহ ছিল না তাঁর।' একথা স্বীকৃতিযোগ্য নয়। গদ্যের মতো কবিতার ভাষাও স্বামীজীর একান্ত নিজস্ব। অন্য কোনো ভাষায় এই বক্তব্য আপন প্রাণসত্যে প্রতিষ্ঠা পেত না। সমকালীন হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র-বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথের থেকে বিবেকানন্দের কবি-ভাষা আলাদা এবং সেই স্বাতন্ত্র্যেই তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা।

স্বামীজীর কবিতার ভাষায় যে রুদ্রমাধুর্যের প্রকাশ ও অতল উপলব্ধির আভাস, চিরকালের বাংলা সাহিত্যে তার শ্রেষ্ঠ আসন নির্ধারিত।

ঐ একই নিবন্ধের আর একটি অংশ—"লেখক-বিবেকানন্দের মধ্যে অনুভূতি বা বক্তব্যের চাপ এতোই প্রবল ও অকৃত্রিম ছিল যে, রচনার শিল্পরীতি সম্বন্ধে তাঁকে কখনোই খুঁৎ খুঁৎ করতে হয়নি।…তাঁর ভাষারীতি তাঁর লক্ষ্যবোধেরই নিখুঁৎ অভিব্যক্তি, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের চেয়ে তিনি নিজে ছিলেন অনেক বড়ো, আরো অনেক ব্যাপক; উদ্দেশ্য সব সময়ই তাঁর সম্পূর্ণ অধীনস্থ ছিল।" (পৃঃ ১৪১) এক্ষেত্রেও 'লেখক বিবেকানন্দে'র পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ফুটেছে বলে মনে হয় না। আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা চিঠি অনুসারে জগতের মহত্তম অনুভূতিরাশি প্রতিদিনের ঘরোয়া ভাষায় কবিত্বমণ্ডিতরূপে প্রকাশের চেষ্টায় যাঁর বক্তৃতা ও রচনাবলীর সৃষ্টি, তিনি লেখার সময়ও আপন কুশলতা-সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। অভ্যস্ত সাহিত্যরুচি থেকে তাঁর সাহিত্যলোক ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু সেই-খানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাঁর সত্যের সাধনারই আর একটি রূপ তাঁর সাহিত্য-সাধনায়। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের প্রধান গুণ অধ্যাপক মিত্রের মতে 'মহাপ্রাণতা'। স্বামীজীর সবকয়টি মৌলিক বাংলা গ্রন্থেই তাঁর বেদান্ত-বিশ্বাসী, স্বদেশপ্রেমিক, আন্তর্জাতিক এবং ইতিহাস-সচেতন সত্তার যে পরিচয় অধ্যাপক মিত্র লক্ষ্য করেছেন, তার সঙ্গে একথাও যোগ করা চলে যে, স্বামীজী আপন রচনা সম্বন্ধে সচেতন শিল্পী। তাঁর ব্যক্তিত্বের বজ্রধাতু গলিয়েই তাঁর অমর ভাষাশৈলীর সৃষ্টি। অধ্যাপক মিত্রের ভাষায় 'তিনি আপন ব্যক্তিত্বগুণে এবং সহজ প্রেরণা-বশেই তাঁর নিজস্ব রীতির প্রবর্তক।' (পৃঃ ১৪০)

ভারতবর্ষের সমাজকেন্দ্রিক ইতিহাসচেতনা-প্রসঙ্গে ভূদেব, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বামীজীর তুলনামূলক আলোচনা এ গ্রন্থের নানা প্রবন্ধে, বিশেষভাবে 'বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা' প্রবন্ধে ছড়িয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখিত প্রবন্ধের মন্তব্য, "বিবেকানন্দের সমাজ-চিন্তা তাঁর সর্বদা সমাধিস্থ থাকবার মূল বাসনারই গুরু-প্রণোদিত রূপান্তর বললে অন্যায় হবে না।" … "সাম্প্রদায়িকতা-বর্জিত, ঐক্য-প্রত্যয়ী, —এবং বিজ্ঞান-সচেতন এক সমাজ না গড়ে উঠলে যথার্থ আধুনিকতার সঙ্গে ভারতীয়তার অভিপ্রেত যোগটি সম্ভব হ'তে পারে না। রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে যাঁদের অল্পবিস্তর দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেছে, আত্মস্থতাকামী সেই গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয় দলই সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে এই বিশ্বাসে আশ্রয় পান।" এদিক থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন মনীষীর সমাজচিন্তা সম্বন্ধে আরো নিশ্চিত সিদ্ধান্তমূলক আলোচনার অবকাশ নিশ্চয়ই আছে। বিশেষতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কার-আন্দোলন, পাশ্চাত্য-প্রভাবে সমাজের রূপান্তর, ভারতীয় সমাজব্যবস্থার সঠিক স্বরূপ নির্ধারণ, ভারতীয় বর্ণাশ্রম-আদর্শের ভিত্তিতে বিশ্ব-ইতিহাসের বিশ্লেষণ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিবেকানন্দের চিন্তা ও নির্দেশ আরো বিশদ-ভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। তবে, সমগ্র গ্রন্থটি পাঠান্তে বিবেকানন্দ-মানসের বিশাল ব্যাপ্তির যে পটভূমি পাঠক-মানসে রচিত হয়, তার ফলে কিছুক্ষণের মতো আমরা সবাই কবি মোহিতলালের ভাষায় 'চন্দ্রতারকার সভাতলে' আসন পাতি।

এমন একটি মনন-ঋদ্ধ, প্রসারিতদৃষ্টি, সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ-নিপুণ আলোচনাগ্রন্থ প্রকাশের জন্য এ গ্রন্থের প্রকাশকমণ্ডলী আমাদের ধন্যবাদ-ভাজন। সুচারু প্রচ্ছদপটে ও শোভন মুদ্রণে

গ্রন্থটির আদ্যন্ত যথার্থ শ্রদ্ধার ভাব পরিস্ফুট।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

চেনা শোনার বাইরে: অমিতা রায়। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট: কলিকাতা-১৩। পৃ: ২০৮; মূল্য: পাঁচ টাকা।

চেনার বাইরে হলেও রুমানিয়া শোনার বাইরে নয়। কিন্তু চেনাশোনার দেশও সে নয়। তাই স্বল্প-পরিচিত এই পূর্ব-য়ুরোপীয় দেশটির বিবরণ আমাদের মতো গৃহগতপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেরই স্বপ্নচারণের উপযুক্ত উপকরণ। তার ওপর সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত এই দেশটির ১৯৬৭ অবধি বিবর্তনের একটু আভাসও এ গ্রন্থে মেলে। ১৯২৯-তে লেখিকা তাঁর স্বামীর সঙ্গে রুমানিয়ায় গিয়ে ছাত্রীরূপে সে দেশকে আপন করে নেবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। সমস্ত বইটি জুড়ে প্রকৃতি ও মানুষের এক প্রীতিস্নিগ্ধ ছায়াছবি তাই সারাক্ষণ পাঠককে আকৃষ্ট করে রাখে। রাজনীতির কূটতর্ক না তুলে সহজ মানবতার দৃষ্টিতে এই 'নতুন দেশ'কে দেখতে পেরেছেন বলেই লেখিকা রুমানিয়াবাসীদের সঙ্গে এই ভারতের, এই বাংলার মানুষেরও মর্মবন্ধন স্থাপন করতে পেরেছেন। ১৯৬৭-তে তিনি আবার লেখিকা-রূপে স্বল্পকালীন ভ্রমণের জন্য সেদেশে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। গ্রন্থশেষে সাম্প্রতিক রুমানিয়ার সমৃদ্ধিরও কিছুটা আভাস মেলে।

ভ্রমণসাহিত্যকে অযথা তথ্যভারাক্রান্ত বা উপন্যাসরসসিক্ত না করে দূরকে কাছে আনার এই অন্তরঙ্গ প্রচেষ্টায় লেখিকার সহজ স্নিগ্ধ ভাষাভঙ্গী প্রধান সহায় হয়ে উঠেছে। যে শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা নিয়ে তিনি বিদেশকে স্বদেশ করে তুলেছিলেন, সর্বদেশের সর্বকালের সেরা ভ্রাম্যমাণদের তা-ই সবচেয়ে বড়ো সম্বল। এমন একটি আকর্ষণীয় ভ্রমণসাহিত্য-প্রকাশে সুধী প্রকাশক যথার্থ রুচির পরিচয় দিয়েছেন।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

সাংখ্যকারিকা (ঈশ্বরকৃষ্ণ-বিরচিত)—স্বামী দিবাকরানন্দ কর্তৃক অনূদিত। প্রকাশক: জগন্নাথ বর্মন, গ্রাম—মতিলাল, পো:—মন্দিরবাজার, জেলা—২৪ পরগণা। পৃষ্ঠা ১৭৫; মূল্য তিন টাকা।

মহর্ষি কপিলের সাংখ্যদর্শন ভারতীয় মনীষার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। ষড়্দর্শনের অন্যতম দর্শন সাংখ্যদর্শন। ঈশ্বরকৃষ্ণ-বিরচিত সাংখ্যকারিকা সাংখ্যশাস্ত্রের একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই একখানি গ্রন্থ অধিগত করিতে পারিলে সাংখ্যদর্শনে ব্যুৎপত্তিলাভের পথ অনেকাংশে সুগম হয়।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে সাংখ্যকারিকার মূল ৭৩টি সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া যাইবে। প্রতিটি শ্লোকের নিম্নে পদপাঠ, তৎপরে অন্বয়, শব্দার্থ, পদব্যাবৃত্তি ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। অনুবাদ সর্বত্রই সরল ও মূলানুগ হওয়ায় বিষয়বস্তু সহজবোধ্য হইয়াছে। পুস্তকের শেষাংশে মূল সংস্কৃতে 'মাঠরবৃত্তিঃ' সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থখানির মর্যাদা বাড়িয়াছে। সাংখ্যদর্শনের বিদ্যার্থিগণের নিকট এই 'সাংখ্যকারিকা'খানি সমাদৃত হইবে বলিয়া মনে হয়।

আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক অন্ধ্রে ঘূর্ণিবাত্যা-বিপর্যস্ত জনগণের সেবাকার্য

জনসাধারণ অবগত আছেন যে, গত মে মাসে অন্ধ্র প্রদেশের তিনটি জেলা ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিবাত্যায় বিধ্বস্ত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল গুন্টুর জেলা; এখানে ৯৯৮টি গ্রামের মধ্যে ৮৩২টি গ্রামই বিপর্যস্ত। এই গ্রামগুলির মধ্যে আবার সর্বাধিক বিপর্যস্ত ১৫০টি গ্রাম। এক গুন্টুর জেলাতেই ২,০০০ ব্যক্তি এবং ১,৫০,০০০ গবাদি পশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। খাদ্য বস্ত্র প্রভৃতি বিতরণ এবং গৃহহীনদের সাময়িক আশ্রয়োপযোগী কুটির নির্মাণের মাধ্যমে অন্ধ্র প্রদেশ সরকার কর্তৃক ত্বরিতগতিতে সেবাকার্য শুরু করা হইয়াছে।

এখন সেবাকার্যের প্রাথমিক পর্ব শেষ হইয়াছে এবং বাত্যাবিপর্যস্ত জনগণের জন্য স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হইতেছে। রামকৃষ্ণ মিশন গুন্টুর জেলার মহকুমা-শহর চিরালার উপকণ্ঠে ১০০টি গৃহ নির্মাণের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই ১০০টি নূতন গৃহে কুরথালা গ্রামের ১০০টি বিপর্যস্ত পরিবার পুনর্বাসন লাভ করিবে। প্রতিটি গৃহে পাথরের দেওয়াল এবং ম্যাঙ্গালোর টালির ছাদ হইবে। প্রাথমিক হিসাবে প্রত্যেকটি গৃহের জন্য আনুমানিক খরচ পড়িবে ২,০০০৲ টাকা। অতএব এই গৃহনির্মাণকার্যের জন্য এখনই ২,০০,০০০৲ টাকা প্রয়োজন। অর্থের উপযুক্ত ব্যবস্থা হইলে সেবাকার্য যথাসময়ে আরও বাড়ানো যাইবে।

'অন্ধ্র পত্রিকা'-র কর্তৃপক্ষ সেবাকার্য আরম্ভ করিবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনকে ৫০,০০০৲ টাকা দিয়া মহানুভবতা দেখাইয়াছেন।

আমরা সহৃদয় জনসাধারণের নিকট এই সেবাকার্যে মুক্তহস্তে সত্বর অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন করিতেছি, যাহাতে রামকৃষ্ণ মিশন দুর্গতদের পুনর্বাসন-কার্য যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যেই করিয়া উঠিতে পারেন।

অনুগ্রহপূর্বক সর্বপ্রকার সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন এবং যে-সেবাকার্যের জন্য সাহায্য পাঠাইবেন, তাহাও সঙ্গে লিখিয়া পাঠাইবেন; 'রামকৃষ্ণ মিশন' (Ramakrishna Mission)—এই নামে চেক পাঠাইবেন:

১) সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া

২) অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এণ্টালি রোড, কলিকাতা-১৪

৩) রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচার, গোল পার্ক, কলিকাতা-২৯

৪) রামকৃষ্ণ মঠ, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩

৫) রামকৃষ্ণ মিশন, খার, বোম্বাই-৫২

৬) রামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৪

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক,
রামকৃষ্ণ মিশন

বেলুড় মঠ (হাওড়া),
৮ই আগস্ট, ১৯৬৯

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবা : পাহাড়পুর, মণ্ডলঘাট এবং জলপাইগুড়ির উপকণ্ঠে অন্যান্য অঞ্চলে বন্যার্তদের জন্য কুটিরনির্মাণ ও কূপখনন কার্য সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হইতেছে। জলপাইগুড়ি শহরে ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলিতে বিতরণের জন্য শিক্ষা-সরঞ্জাম পাঠানো হইতেছে।

গুজরাটে বন্যার্তসেবা : বন্যায় বিপর্যস্ত ব্যক্তিদের সেবাকল্পে বসবাসের জন্য কুটির, কলোনীতে যাইবার রাস্তা ও সমাজ-মন্দিরগুলির নির্মাণকার্য এবং জল সরবরাহের ব্যবস্থাদি সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে।

অন্ধ্রে ঘূর্ণিবাত্যাপীড়িতদের সেবা : সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলসমূহের অন্যতম গুণ্টুর জেলায় প্রবল ঘূর্ণিবাত্যায় বিপর্যস্ত জনগণের জন্য সেবাকার্য রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক সম্প্রতি আরম্ভ করা হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী স্মৃতিভবন

সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রে গত ২১ জুলাই, ১৯৬৯ স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী স্মৃতিভবনের উদ্বোধন করেন সিঙ্গাপুরের মাননীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রী এস. রাজরত্নম। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে ভাষণ দেন স্বামী গম্ভীরানন্দজী।

কার্যবিবরণী

মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেণ্টস্ হোম (মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৪) ১৯০৫ প্রতিষ্ঠিত। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ইহা নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে এই শিক্ষায়তনের প্রধানতঃ তিনটি বিভাগ : (১) বিবেকানন্দ কলেজে অধ্যয়নরত বিদ্যার্থীদের জন্য একটি ছাত্রাবাস, (২) আবাসিক শিল্প-বিদ্যালয় (Technical Institute), (৩) আবাসিক উচ্চ-বিদ্যালয়।

প্রথমে মাত্র ৭টি ছাত্র লইয়া স্টুডেণ্টস্ হোম আরম্ভ করা হয়; বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৩২০। স্টুডেণ্টস্ হোমের ৬৪তম বর্ষের কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ৩১.৩.৬৯ তারিখে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যা ৩১৮; তন্মধ্যে হাই-স্কুলের ১৫৪, ওরিয়েণ্টাল স্কুলের ১১, প্রি-ইউ-নিভার্সিটি ও ডিগ্রী কোর্সের ৪৪, পলিটেক-নিকের ১০৮, পোস্ট-ডিপ্লোমায় ১ জন ছাত্র ছিল। মোট ছাত্রসংখ্যার ৯১ জন অনুন্নত সম্প্রদায়ের।

উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী হইতে একাদশ শ্রেণী—মোট ৪টি ক্লাস; শিক্ষার মাধ্যম তামিল ভাষা। আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন বিভাগ হইতে হাইস্কুলের ৫১ জন ছাত্রকে ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইয়াছে।

কলেজ-বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে ২৯ জন বি. এস-সি ডিগ্রী কোর্সে এবং একজন এম্.এ কোর্সে পড়াশুনা করিয়াছে। এই বিভাগের ৪৪ জন ছাত্রের মধ্যে প্রত্যেকেই কোন-না-কোন ভাবে স্কলারশিপ পাইয়াছে। ছাত্রদের ডিগ্রী ও প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক।

আবাসিক টেকনিক্যাল ইনষ্টিট্যুটের ৩৭ জন ছাত্র লাইসেন্‌সিয়েট মেকানিক্যাল

ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে ৩৬ জন উত্তীর্ণ হয় এবং ২৯ জন ফার্স্ট ক্লাস পায়। অন্যান্য বিভাগের ফলও সন্তোষজনক। পলিটেকনিকের ১০১ জন ছাত্রকে ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইয়াছে।

স্টুডেণ্টস্ হোমের অঙ্গীভূত না হইলেও স্টুডেণ্টস্ হোম কমিটি কর্তৃক দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে একটি মায়াপুরে অবস্থিত, নাম—শ্রীরামকৃষ্ণ সেন্‌টিনারি এলিমেণ্টারি স্কুল। এখানে প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত আছে, ২৫৭ জন বালক ও ১৯৩ জন বালিকা মোট ৪৫০ জন পড়াশুনা করে। অন্যটি চিঙ্গলপুট জেলায় মালিয়াক্কারানাই গ্রামে অবস্থিত। এই উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়টির ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৫০ (ছাত্রী ২০ জন)।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন শাখার ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। মালদহে প্রথম মঠ শাখা স্থাপিত হয় ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে। জনহিতকর কার্যের প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে মিশন শাখা খোলা হয়।

মঠ বিভাগে নিত্য পূজার্চনা ও ধর্মালোচনাদির ব্যবস্থা আছে। একাদশীতে রামনামকীর্তন হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয় এবং এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব ও অন্যান্য পুণ্য জন্মতিথি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। মাঝে মাঝে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ গ্রামে গ্রামে যাইয়া সভা ও উৎসবাদির মাধ্যমে ম্যাজিক ল্যানটার্ন সহযোগে ধর্ম- সমাজ- ও শিক্ষামূলক বক্তৃতা দিয়া থাকেন।

মিশন শাখার দুইটি বিভাগ: শিক্ষা ও সেবা। উত্তরবঙ্গ শিক্ষায় অনগ্রসর বলিয়া মিশন বিভাগে শিক্ষাদানের কাজই প্রধান। আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (ছাত্রসংখ্যা ৬৪৪), একটি নার্সারি স্কুল (ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১০৬), একটি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় (ছাত্র-ছাত্রী ২৩৬) অবস্থিত এবং প্রত্যেকটি বিদ্যালয় সুপরিচালিত।

আশ্রমের বাহিরে এবং দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে একটি নিম্ন বুনিয়াদী, ৩টি প্রাথমিক ও ৪টি নৈশ বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। রামকৃষ্ণ-পল্লীতে সারদা শিল্পনিকেতনে মহিলাদিগকে সেলাই, রেশম কাটা, খেলনা তৈরি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

আশ্রম-গ্রন্থাগারে ২,১৯১ খানি পুস্তক আছে। ২৫টি মাসিক ও ৩টি দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়। গড়ে দৈনিক পাঠক-সংখ্যা ৩০।

আশ্রমের বিবেকানন্দ শিশুসঙ্ঘে ৩১০টি শিশু শরীর-মনের সুষম গঠনের সুযোগ পাইতেছে। গ্রামেও দুইটি শিশুসঙ্ঘ পরিচালিত হইতেছে।

আশ্রমে অবস্থিত ব্রহ্মানন্দ বিদ্যার্থী ভবনে ৩৩ জন ছাত্র আছে। এখানে মেধাবী দরিদ্র ও আদিবাসী ছাত্র বিনা ব্যয়ে থাকিবার সুযোগ পায়।

আশ্রমে ১৬টি এবং বাহিরে ১৫টি ছায়াচিত্রে বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে।

সেবা-বিভাগ কর্তৃক স্থায়ী ও সাময়িক ভাবে ঔষধবিতরণ ও অন্যান্য সেবাকার্য করা হইয়া থাকে।

তিনটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধবিতরণ কেন্দ্রের মধ্যে একটি শহরে ও অন্য দুইটি গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। ঔষধবিতরণ কেন্দ্র তিনটিতে যথাক্রমে ৩০৮০৪, ২৭১৪ ও ৪৯৩২ জন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে খয়রাত্রাণ-কার্যে পুরাতন

মালদহ, গাজোল ও বামনগোলা থানায় ৪টি কেন্দ্র হইতে প্রায় ৭৫,০০০৲ টাকার যব, গম, ভুট্টা, ধুতি, শাড়ী, জামা ও গুঁড়া দুধ বিতরিত হয়।

শ্যামলাতাল (হিমালয়) বিবেকানন্দ আশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৭—মার্চ, ১৯৬৮) প্রকাশিত হইয়াছে। ৪,৯৪৪ ফুট উচ্চে হিমালয়ের শান্তিপূর্ণ ও সৌন্দর্যময় পরিবেশে এই আশ্রম ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রমটি দীর্ঘকাল ধরিয়া জনসাধারণের সেবারত।

আলোচ্য বর্ষে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ে বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৭,৫০৮ (নূতন ৪,৬৮৮)। অন্তর্বিভাগে ১২টি শয্যা আছে; এই বিভাগে ১৪৫ জন রোগী চিকিৎসালাভ করিয়াছে।

একদিকে ১৯ মাইল এবং অপরদিকে ৩৫ মাইলের মধ্যে কোন উপযুক্ত হাসপাতাল বা চিকিৎসালয় না থাকায় সেবাশ্রমটি অসহায় ও দরিদ্র পার্বত্যজনগণের একমাত্র চিকিৎসার স্থান বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

সেবাশ্রমে পশুচিকিৎসার একটি বিভাগ আছে। আলোচ্য বর্ষে পশুচিকিৎসালয়ে ১,৯৪০টি পশু চিকিৎসিত হয়।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর বক্তৃতা সফর

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রিত হইয়া গত ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে সিঙ্গাপুর হইয়া হনলুলু যাত্রা করেন এবং সেখান হইতে আমেরিকা ও ইউরোপ হইয়া অক্টোবর মাসে ভারতে ফিরিয়া আসেন। এই সফরে সিঙ্গাপুরে ১টি, হনলুলুতে ১৪টি, পোর্টল্যাণ্ড ও ওয়াশিংটনে ২টি করিয়া, স্যানফ্রানসিস্‌কোতে ৪টি, হলিউড ও চিকাগোতে ১টি করিয়া, নিউইয়র্কে ৪টি এবং ফ্রান্সের গ্রেজে ১টি বক্তৃতায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য সন্তানগণের জীবন ও বাণী এবং গীতা, অধ্যাত্মজীবন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

ইহা ছাড়া ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ও নিকটস্থ অঞ্চলে ২০টি এবং আঁটপুর, গোমো, বাকুড়া, বর্ধমান, চন্দননগর, হাজারিবাগ, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে তিনি আরো ২০টি বক্তৃতা দিয়াছেন।

উৎসব সংবাদ

বালিয়াটী (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৪তম জন্মোৎসব এবং মঠের ৪৬তম বার্ষিক উৎসব গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার হইতে ২৫শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার পর্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, হোম, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চণ্ডী ও গীতা পাঠ, ভজন-সঙ্গীত এবং ২৫শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার দ্বিপ্রহরে দরিদ্রনারায়ণসেবা হয়। অপরাহ্নে স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক জনাব মোতাহার আলী খান মজলিস্-এর সভাপতিত্বে ধর্মসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কতিপয় স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান বক্তা শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

বিবিধ সংবাদ

'লুনা-১৫'র চন্দ্রে অবতরণ

গত ১৩ই জুলাই রাশিয়া হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া যাত্রিহীন মহাকাশযান 'লুনা-১৫' গত ২১শে জুলাই রাত্রি ৯-২০ মিনিটের সময় চাঁদের 'সঙ্কটসমুদ্র' অঞ্চলে অবতরণ করিয়াছে। আমেরিকার মহাকাশযান 'অ্যাপোলো-১১' দুইজন মহাকাশচারীকে লইয়া পূর্বরাত্রে যেখানে অবতরণ করিয়াছিল, লুনা-১৫-র অবতরণস্থল সেখান হইতে প্রায় ৫০০ মাইল দূরে।

কল্যাচক শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি ও স্থানীয় শিক্ষাব্রতীদের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রব্রাজিকা শুদ্ধপ্রাণা ১৬ই এপ্রিল ও ১৭ই এপ্রিল সকালে কল্যাচক আর্যতনয়াশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ে ও ঠাকুরনগর নন্দা মহিলা বিদ্যাপীঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ আলোচনা করেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীবসন্তকুমার দাস। ২রা ও ৩রা মে সকালে ও সন্ধ্যায় সুভাষপল্লী বিবেকানন্দ শিশুনিকেতন, বড়বাড়ী শ্রীকৃষ্ণ উচ্চ বিদ্যালয় ও কল্যাচক গ্রামে স্বামী আপ্তকামানন্দজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী পুণ্যাত্মানন্দজী, শ্রীনন্দদুলাল চক্রবর্তী ও শ্রীকমল প্রামাণিক স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। ৩০শে মে কল্যাচক বিবেকানন্দ পাঠশালায় সকালে পূজাপাঠাদি হয়। বিকালে শিশুসম্মেলন ও ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার পুরস্কার-বিতরণী সভায় সভাপতি স্বামী আপ্তকামানন্দ ও প্রধান অতিথি অধ্যাপক সলিলকুমার দিন্দা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

এই সংখ্যার লেখকগণ

১। স্বামী তেজসানন্দ :
রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড়

২। ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার :
অধ্যাপক, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিট্যুট, কলিকাতা

৩। শ্রীগুরুদাস দাশ :
অধ্যাপক, টেকস্টাইল টেকনলজি, শ্রীরামপুর

৪। শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর :
নবগ্রাম, হুগলী

৫। শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু :
অধ্যাপক (বাংলা), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৬। স্বামী বিশ্বরূপানন্দ :
রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, বারাণসী

৭। শ্রীদীপেন্দ্র চক্রবর্তী :
শ্রীহট্ট, পূর্বপাকিস্তান

ভ্রম সংশোধন

[illegible] ১৩শ লাইনের [illegible] 'প্রথম অংশ' [illegible] স্থলে ১৯শে পড়িবেন।



দেবী কন্যাকুমারী মূর্তি

জ্যোতির্ভাস্বরে মূর্তিং ত্যাগসৌন্দর্যরূপিণীম্।
কুমারীং কন্যকাং দেবীং প্রণমামি তপস্বিনীম্॥

(হরিকুমারী আর্টস্-এর সৌজন্যে



দিব্য বাণী

কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশগণবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধসঙ্ঘৈঃ॥

[শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যম-চরিত্রের ধ্যান]

সোনার বরণা দুর্গা আসীনা বাহন সিংহ'পরে
কটাক্ষে তাঁর শত্রু সবার বুক কেঁপে ওঠে ডরে
(যত রিপুচয় পুড়ে ছাই হয়, যেন সে অগ্নিশিখা !)
ললাটে তাঁহার শোভার আধার বিমল চন্দ্রলিখা ;
ধরেছে কৃপাণ অতি খরশাণ, চক্র, ত্রিশূল আর
শঙ্খধারিণী শক্তিরূপিণী চতুর্হস্তে তাঁর ;
সিংহবাহনা দেবী ত্রিনয়না বিজয়দায়িনী বেশে
তেজের ছটায় ভুবন ভরায়—ত্রিজগৎ যায় ভেসে ;
করি বেষ্টন যত দেবগণ, সিদ্ধসঙ্ঘ পূজে—
ধ্যান কর তাঁর, জয়া-দুর্গার এ রূপ হৃদম্বুজে।

সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী। ৫৭
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী॥ ৫৮

—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১ম অঃ

মুক্তির কারণরূপা পরাবিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা তিনি,
সংসারবন্ধন-রূপা অবিদ্যাও তিনি, সনাতনী,
ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশাদি ঈশ্বরেরও ঈশ্বরী, জননী।
প্রসন্না হইয়া তিনি বরদান করেন যখন
খুলে যায় মুক্তিদ্বার— টুটে যায় সকল বন্ধন !

কথাপ্রসঙ্গে

পুরাণ ও শ্রীশ্রীচণ্ডী

কোন তপোবনে উপবিষ্ট কোন ঋষিকে শিষ্য প্রশ্ন করিতেছেন, ঋষি উত্তর দিতেছেন, কখনো বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিছু বলিতেছেন। ঋষির কথাগুলি মেধাবী শিষ্য সব মনে করিয়া রাখিতেছেন এবং পরবর্তী কালে তিনি উহা বহুজনকে শুনাইতেছেন। তাঁহারা আবার উহা বলিতেছেন অপরের কাছে। এমনিভাবে ছড়াইয়া যাইতেছে কথাগুলি; ক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়া নাটক, কাব্য, কথকতা প্রভৃতির মাধ্যমে ভারতের সর্বত্র সর্বসাধারণের মনে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে।

'মুনিশিষ্যোপশোভিত' তপোবনের এই চিত্রের সহিত ভারতীয় জাতির, ভারতীয় সভ্যতার সংযোগ অতি নিবিড়। ভারতের যাহা কিছু বরণীয়, যাহা কিছু মহনীয় তাহা সবই আমরা পাইয়াছি এইভাবে—তপোবনে, তপস্যা- ও ধ্যানপরায়ণ ঋষি-মুনিদের, সত্য-দ্রষ্টাদের নিকট হইতেই। সেই পুণ্য নৈমিষারণ্যের কথা মনে পড়ে; মনে পড়ে বাল্মীকির তপোবন; জ্ঞানের উৎস, জ্ঞানের প্রসারের কেন্দ্র এমনি আরও কত তপোবন, যেখানে কত ঋষি, কত শিষ্য আমাদের সভ্যতার ভিত্তি রচনা করিয়াছেন। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে, ইতিহাস-আখ্যানাদি অবলম্বনে গল্পচ্ছলে সর্বসাধারণের বুঝিবার মতো করিয়া ভগবান সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে বেদান্তনিহিত উচ্চতম সত্যগুলিকে প্রকাশ করিয়াছেন সহজ সরল-ভাবে। সেগুলিই পুরাণ।

এই পুরাণই আমাদের ভগীরথ; সাধারণের দুরধিগম্য, চিন্তারও অতীত প্রদেশ হইতে বিগলিত ও নির্ঝরিত, চিন্তার উত্তুঙ্গ শিখর-সঞ্চারী বেদান্ত-সুরধুনীকে সে নামাইয়া আনিয়াছে নিম্নের সমতলভূমিতে। ধনী-দরিদ্র-জ্ঞানী-মূর্খ-নির্বিশেষে সকলের কাছে—সন্ন্যাসীর আশ্রমে, রাজার প্রাসাদে, দীনতমের কুটীরে, সর্বত্রই ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার এই পূত পাবনী ধারাকে প্রবাহিত করিয়াছে—সকলেই যাহাতে ইহার নাগাল পাইয়া ইহার স্নিগ্ধ, প্রাণপ্রদ ধারায় শোকতাপজর্জরিত জীবনকে শীতল করিতে পারে, অবশ প্রাণকে উজ্জীবিত করিতে পারে।

পুরাণ বলিতেছে, গল্প শুনিবে এস। তোমায় দর্শনশাস্ত্রের কথা বলিব না, এমন কিছু বলিব না, যাহাতে তোমার মাথা টনটন করে। গল্প শুনিতে তুমি ভালবাস নিশ্চয়ই? সেই গল্পই তোমাকে বলিব। ভালবাসার গল্প, যুদ্ধের গল্প, সমাজজীবনের জটিল সব পরিস্থিতির গল্প, মনস্তত্ত্বের গল্প, যাহা তুমি শুনিতে চাও, তাহাই বলিব। তবে আমার প্রাণের কথা, ভারতের প্রাণবাণী কি তোমায় কিছুই শুনাইব না?—তা নয়; আমার যাহা বলিবার আছে তাহা ঐ সব গল্পের ভিতর দিয়াই বলিব। ত্যাগী, হৃদয়বান, নিষ্কলঙ্কজীবন, উপলব্ধিমান মুনি-ঋষিদের দিয়াই তোমাদের গল্প শুনাইব। তাঁহারা চিন্তার উচ্চ স্তর হইতে তোমাদের চিন্তার স্তরে নামিয়া আসিয়া তোমাদের মত করিয়াই গল্প বলিবেন। তোমাদের কল্যাণের জন্য তাঁহারা সব করিতে পারেন। তুমি পঙ্কিল ভূমিতে থাকিলে তোমাকে তুলিয়া লইবার জন্য সেখানে তাঁহারা নামিয়া আসিবেন, সস্নেহে

তোমার হাত ধরিবেন—এ আর বড় কথা কি! এই গল্পের ভিতর দিয়াই তাঁহারা ধীরে ধীরে তোমার মনকে তুলিয়া লইয়া যাইবেন আনন্দধামের পথে। একটু একটু করিয়া চন্দনলেপন করিবেন তোমার অঙ্গে। ক্রমে তুমি নিজেই ব্যাকুল হইয়া উঠিবে নিজ অঙ্গকে পঙ্কের পূতিগন্ধমুক্ত করিয়া সুরভিত চন্দনচর্চিত করিতে।

.

এমনি একটি পুরাণের নাম মার্কণ্ডেয় পুরাণ। জিজ্ঞাসু শিষ্য ক্রোষ্টুকির প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় যে সব কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই ইহার প্রধান অংশ; পুরাণের প্রারম্ভে মূল প্রশ্নকারী অবশ্য মহর্ষি ব্যাসদেবের শিষ্য জৈমিনি। শ্রীশ্রীচণ্ডী এই মার্কণ্ডেয় পুরাণেরই একটি অংশ; ইহার ১৩৭টি অধ্যায়ের মধ্যে ৮১তম হইতে ৯৩তম পর্যন্ত ১৩টি অধ্যায় 'দেবী মাহাত্ম্য' বা শ্রীশ্রীচণ্ডী।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রারম্ভে ক্রোষ্টুকি মার্কণ্ডেয় ঋষির নিকট অষ্টম মনু সূর্যপুত্র সাবর্ণির জন্ম-বৃত্তান্ত জানিতে চাহিতেছেন। উত্তরে ঋষি বলিতেছেন যে, রাজ্যহারা রাজা সুরথ জগন্মাতা, জগদ্রূপা, জগন্নিয়ামিকা, চিন্ময়ী মহাশক্তিকে মৃণ্ময়ী মূর্তির মাধ্যমে আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইয়াছিলেন, এবং ইহজন্মে সুখে রাজ্যভোগ করিবার পর স্থূলদেহান্তে সূক্ষ্মদেহ লইয়া সাবর্ণি মনুরূপে জন্মলাভ করিয়া সুদীর্ঘকাল পৃথিবী পালন করেন।

ইহারই বিস্তৃত বিবরণ শ্রীশ্রীচণ্ডীতে। কিন্তু জগন্মাতার দর্শনলাভ করিয়াও রাজা সুরথ তাঁহার নিকট ইহজন্মে ও পরজন্মে রাজ'ভোগই প্রার্থনা করিলেন। আমাদের মনের উপর ভোগেচ্ছা বা বাসনার প্রতাপ যে কত প্রবল, তাহারই নিদর্শন এটি। কিন্তু বাসনার দাসত্ব করিবার জন্যই কি মানুষের জন্ম? ইহলোক ও পরলোকের ভোগই কি জীবনের চরম লক্ষ্য? ধর্মাচরণ কি শুধু তাহারই জন্য? সকলেই কি 'কড়ায়ের ডালের খদ্দের', রাজার অনুগ্রহ লাভ করিয়া সকলেই কি তাঁহার কাছে 'লাউ-কুমড়ো' ফল চাহিয়া লয়, অমূল্য ধন ভগবান লাভ বা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে কি কেহই চায় না? জীবনপথে ভোগের আলেয়ার পিছনে ছুটিয়া এবং একের পর এক আঘাত খাইতে খাইতে চলিয়া কোন জন্মের কোন পরম শুভলগ্নে নচিকেতার মতো, মৈত্রেয়ীর মতো কাহারো মনে কি বৈরাগ্যের বিপুল শুভ্র আলোকে ভোগের অসারতা আত্মপ্রকাশ করে না? করে বৈ কি। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় সেজন্য গল্পাংশেই রাজা সুরথের সহিত সমাধি নামক একজন হৃতসম্পদ বৈশ্যকেও পাশাপাশি রাখিয়াছেন। একই সঙ্গে একই রূপে একই পথে চলিয়া তাঁহারা একই সময়ে জগন্মাতার দর্শনলাভ করেন। সমাধি কিন্তু মায়ের কাছে মুক্তি ছাড়া আর কিছুই চাহেন নাই; যদিও যাহা চাহিতেন তাহাই পাইতেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর আরম্ভটি আমাদের অতি-পরিচিত একটি মনস্তত্ত্ব-ভিত্তিক এবং দর্শন-শাস্ত্রের একটি জটিল তত্ত্ব মায়ার সহজবোধ্য রূপের গল্প দিয়া; গল্পটি নিজেই একটি সত্যের উদ্ভাসক। মাঝখানে জগৎ ও জগন্নিয়ামিকা শক্তি সম্বন্ধে উচ্চ তত্ত্ব বলা হইয়াছে, তাহাও দেবাসুর-যুদ্ধের কয়েকটি গল্পের মাধ্যমেই।

রাজা সুরথ বলবান শত্রু ও অসাধু অমাত্য-গণ কর্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া বনে চলিয়া আসিয়াছেন, মেধামুনির তপোবনে আসিয়া উঠিয়াছেন। রাজ্য, রাজভৃত্য, ধনাগার, এসব কিছুই আর এখন তাঁহার নয়,—ইহাই বাস্তব।

কিন্তু এ বাস্তবকে তাঁহার মন স্বীকার করিতেছে না, সেগুলিকে তখনো 'আমার' বলিয়া আঁকড়াইয়া থাকিয়া চিন্তার জাল বুনিতেছে—'আমার' সেই রাজধানীর কাজ অমাত্যেরা ভালভাবে চালাইতেছে তো ? 'আমার' কষ্ট-সঞ্চিত ধনভাণ্ডার তাহারা যথেচ্ছ ব্যয়ে নিঃশেষ করিতেছে না তো ? 'আমার' প্রিয় হস্তীটির পরিচর্যা ঠিকমত হইতেছে কিনা কে জানে ! হায়রে, 'আমার' বেতনভুক্ ভৃত্যেরা এখন আমার কথা ভুলিয়া অপর প্রভুর সেবা করিতেছে !

ঠিক সেই সময় সেখানে সমাধি নামে এক-জন বৈশ্য আসিলেন। তিনিও সমব্যথার ব্যথী—তাঁহার ধনলোভী অসাধু স্ত্রীপুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়গণ তাঁহার বিপুল সম্পত্তি ও অর্থাদি কাড়িয়া লইয়া শেষে তাঁহাকেও বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন; মনের দুঃখে তিনি বনে আসিয়াছেন। কিন্তু বনে আসিয়াও সেই শ্রদ্ধাপ্রেমহীন, নির্দয়, অমানুষ স্ত্রীপুত্রাদির জন্যই তাঁহার মন ব্যাকুল রহিয়াছে—তাহাদের কোন সংবাদ জানেন না, তাহারা ভাল আছে তো ?

এখানে সুরথ ও সমাধি সাধারণ মানুষের মতোই মমত্বাকৃষ্টচিত্ত হইলেও সাধারণ হইতে তাঁহাদের একটি বৈশিষ্ট্য ঋষি দেখাইয়াছেন। সাধারণ মানুষ এই হৃদয়-দৌর্বল্যকে, এই 'আমি-আমার' বোধকে স্বাভাবিক বলিয়া মানিয়া লয়—অনেক সময় এই 'পশুপক্ষিসুলভ' মমতার উপর মহত্ত্বের একটি আবরণও চড়ায়; বিশেষ করিয়া সমাধি বৈশ্যের মনোভাবকে তো আমরা 'মহত্ত্ব' বলিতেই পারি, তিনি নিজেও তাহা ভাবিতে পারিতেন —'কি মহৎ আমি ! যাহারা আমার সহিত এত অন্যায় অমানুষিক আচরণ করিয়াছে, তাহাদের প্রতিও আমি প্রেমপ্রবণ-চিত্ত !' কিন্তু সমাধি সেরূপ ভাবেন নাই। সুরথ ও সমাধি দুজনেই বুঝিয়াছেন যে, এভাবে চিন্তা করিয়া অনর্থক কষ্টভোগের কোন মানেই হয় না। তাঁহারা এরূপ চিন্তা হইতে বিরত হইবার চেষ্টাও করিতেছেন, কিন্তু কেন বুঝিতেছেন না, মন কোন কথাই শুনিতেছে না। এই বোধ, এই বিবেকই সত্যলাভের পথে প্রথম পদক্ষেপ করায়। এই 'কেন'র উত্তরের জন্যই সুরথ ও সমাধি মেধা মুনির নিকট যাইয়া সব খুলিয়া বলিলেন।

মেধা মুনি বলিলেন, "বাবা, এ-রকমই হয়; এরই নাম মায়া—মহামায়ার মায়া।" "মহামায়া কে ?" এই প্রশ্নের উত্তরেই মেধা-মুনি কয়েকটি দেবাসুর-সংগ্রামের পটভূমিকায় দেবীমাহাত্ম্য সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। মুনি বলিলেন, মহামায়াই জগতের মূল, ব্রহ্ম-স্বরূপা। তাঁহার শক্তিপ্রভাবেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ ঘটিতেছে, তিনিই এই জগতের সব কিছু হইয়াছেন, শুভ অশুভ সবই। আমাদের শুভবুদ্ধিরূপেও তিনি, অশুভ বুদ্ধি-রূপেও তিনি। তিনি সংসারে বন্ধকারী অবিদ্যা, আবার মুক্তিদাত্রী ব্রহ্মবিদ্যাও। তাঁহাকে আরাধনায় প্রসন্না করিতে পারিলে তিনি যে যাহা চায় তাহাকে তাহাই দেন। ইহজগতে অভ্যুদয়, পরজন্মে স্বর্গসুখ, অথবা মুক্তি—তাঁহার কৃপায় সবই পাওয়া যায়।

দেবাসুর-যুদ্ধের বর্ণনার তিনটি ভাগ: প্রথম চরিত্রে মহাশক্তির প্রভাবে মধুকৈটভবধ, মধ্যম ও উত্তর চরিত্রে বিভিন্ন মূর্তিতে আবি-র্ভূতা মহাশক্তি কর্তৃক যথাক্রমে মহিষাসুর ও স-সেনানী শুম্ভ-নিশুম্ভবধ। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মস্ত বড় একটি আশ্বাসের বাণী শুনি আমরা : বারে বারে জগতে অশুভ শক্তি শুভ শক্তি অপেক্ষা প্রবলতর হয়, অনেক সময় মনে হয় উহার

দমন অসাধ্য, কিন্তু এরূপ প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা যায় অমোঘ ঈশ্বরীয় বিধানে উহা বিনষ্ট হয়ই —পরিণামে শুভশক্তিরই জয় হয়। আর একটি পরম আশ্বাসের বাণী মার্কণ্ডেয় ঋষি শুনাইয়াছেন: মেধা মুনি দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা শেষে সুরথ ও সমাধিকে বলিতেছেন, 'সেই মহামায়াই আমাদের মোহগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছেন ঠিকই, কিন্তু তিনিই আবার যেমন তোমাদের বিবেক দিয়াছেন, তেমনি একদিন না একদিন সকলকেই সে বিবেক দিবেন'।—ছেলেকে খেলা করিবার জন্য তিনিই ধূলায় নামাইয়া দিয়াছেন, তিনিই আবার খেলা শেষে তাহাকে ধূলা মুছাইয়া কোলে তুলিয়া লইবেন —তিনি যে 'মা'!

ঋষির উপদেশ মত সুরথ ও সমাধি শক্তি-আরাধনায় ব্রতী হইলেন, তিন বৎসর তাঁহারা পূজা, পাঠ, ধ্যান প্রভৃতির মাধ্যমে তপস্যা করিলেন। পূজায় পুষ্প-ধূপ-দীপাদির সহিত স্বদেহ-রক্ত-সিঞ্চিত বলিও তাঁহারা মাকে নিবেদন করিতেন।

মা প্রসন্না হইয়া তাঁহাদের দেখা দিলে সুরথ ও সমাধি নিজ নিজ প্রার্থিত বর প্রাপ্ত হইলেন। সুরথকে মা বলিলেন, "তুমি তোমার হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইবে, আর কখনো তাহা হস্তচ্যুত হইবে না। দেহান্তে সাবর্ণি মনুরূপে সুদীর্ঘকাল পৃথিবীর পালক হইবে।" সমাধিকে বলিলেন, "তোমার মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মজ্ঞান হইবে।"

মা শক্তিরূপিণী। শক্তির উদ্বোধনই তাঁহার পূজা। তপঃ শব্দের অর্থ তাপ, শক্তি। যাহা করিলে আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি উদ্বোধিত হয়, তাহাই তপস্যা। আমাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মহাভারতে আছে, ধর্মব্যাধ বলিতেছেন, সংযমই শ্রেষ্ঠ তপস্যা। তপস্যাই মায়ের শ্রেষ্ঠ পূজা। আমরা ইহলোকে অভ্যুদয়, দেহান্তে সূক্ষ্মদেহে সুখভোগ বা এসব অনিত্য স্বল্প আনন্দের অতীতে পরমানন্দময়ী মায়ের কোল যাহাই চাই না কেন, তপস্যা ছাড়া কিছুই পাওয়া যাইবে না। আজ মহামায়ার পূজা-বসরে মহাশক্তির কাছে প্রার্থনা করি, সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য তিনি আমাদের সকলকেই তাঁহার পূজায় উদ্বুদ্ধ করুন, তপস্যায় ব্রতী করাইয়া আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন করুন!

"যে কোন উদ্দেশ্যেই হউক, শক্তিপূজায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে বৃথা শক্তিক্ষয় নিবারণ করিতে হইবে, সর্বশক্তির আকর অন্তরস্থ আত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহা হইতে শক্তি-অবতরণের পথ পরিষ্কার রাখিতে হইবে এবং পরে সম্যক শ্রদ্ধার সহিত আবাহন পূজা ও আত্মবলিদান করিয়া মহাশক্তির প্রসন্নতা লাভ করিতে হইবে। তবেই দেবী বরদা হইয়া সাধকের প্রাণমনে অভিনব অপূর্ব বলের সঞ্চার করিয়া ঈপ্সিত অর্থে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করিবেন এবং উহাতেই ফলসিদ্ধি করতলগত হইবে।"

—স্বামী সারদানন্দ ('ভারতে শক্তিপূজা')

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী*

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

ধর্মের প্রমাণ কি? প্রমাণ প্রত্যক্ষ অনুভূতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম সম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন, সবই নিজে প্রত্যক্ষ করে বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'যত মত, তত পথ।' হিন্দুধর্মে একথা আমরা আগেও শুনেছি, তবে ঠাকুরের কথায় বিশেষত্ব আছে। কারণ সব ধর্মমতে সাধন করে, নিজে সব প্রত্যক্ষ করেই তিনি একথা বলেছেন। সেজন্য তাঁর ভেতর সব ধর্মের পূর্ণতা পাই। হিন্দুধর্মের সব সম্প্রদায়ের তো বটেই, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মের মতেও তিনি সাধনা ও তাতে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কোন কোন পণ্ডিত ঠাকুরকে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত করতে চান। একজন ভক্ত আমাকে লিখেছেন যে, একজন পণ্ডিত লিখেছেন, ঠাকুর তন্ত্রসাধনা করেছেন—সে সাধনা বৈদিক মতের বাইরে। এসব মনগড়া:কথা, সঙ্কীর্ণতারই পরিচায়ক। শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু তন্ত্রমতেই নয়, বৈষ্ণবমতেও সাধনা করেছেন, বৈদিকমতেও সাধনা করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন। সেজন্য তাঁকে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত করা যায় না। সব ধর্মেরই মূর্ত প্রতীক তিনি। তিনি এসেছিলেন সব ধর্মকেই পুনরুজ্জীবিত করতে। স্বামীজী তাই তাঁকে "স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে" বলে প্রণাম জানিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলে গেলেন সব ধর্মই সত্য, সব ধর্মের ভেতর দিয়েই ভগবানলাভ করা যায়। আমরা ঠাকুরের আশ্রয় নিয়েছি, তাঁর কথা আপ্তবাক্য বলেই মেনে নিয়েছি। বিচার করে দেখলেও একথা বোঝা যায়। যদি হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্ট, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মগুলিকে তন্নতন্ন করে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তাহলে সে-গুলির ভেতর কতকগুলি সাধারণ জিনিস দেখতে পাব—গণিতে যাকে বলা হয় 'গরিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক'। দেখতে পাব, সব ধর্মেই 'আমি-আমার' ভাবকে দুঃখকষ্টের কারণ বলেছে; সব ধর্মেই মহাপুরুষরা এসেছেন; সব ধর্মেই প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তিরা মানুষের দুঃখে কাতর হয়েছেন ও তা দূর করার চেষ্টা করেছেন।

আমাদের অহংকার ও স্বার্থবুদ্ধিই যে সব নষ্টের গোড়া, এগুলিকে নাশ করতে পারলেই যে আমরা মুক্ত হয়ে যাব, একথা সব ধর্মেই স্বীকার করে। এই অহঙ্কারের গণ্ডী ছেড়ে বেরোবার উপায় কি?—'আমি-আমার' ভাব ছেড়ে দিয়ে 'তুমি-তোমার' ভাব আনতে হবে; সম্পূর্ণ নিষ্কাম- ও নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে পারলে আমরা মুক্ত হয়ে যেতে পারি। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হওয়া আর অনন্তপ্রেমসম্পন্ন হওয়া একই কথা। অনন্ত প্রেমই ভগবান।

অহঙ্কারকে নাশ করতে হবে, একথা সব ধর্মই বলেছে; তবে তা করার জন্য বিভিন্ন ধর্মে অবশ্য বিভিন্ন পথ দেখানো হয়েছে। মোটামুটি সে পথগুলিকে চারটে ভাগে ভাগ করা যায়—ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ। এগুলির মধ্যে যে-কোন একটি পথ ধরে আমরা অহঙ্কারকে নাশ করতে পারি। কোন ধর্ম ভক্তিমার্গে, কোন ধর্ম জ্ঞানমার্গে, কোন ধর্ম ধ্যানমার্গে জোর দিয়েছে। বৈষ্ণব

---

* কুচবিহার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৩০. ৩. ৬৯ তারিখে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন।

ও খৃষ্টধর্ম বেশী জোর দিয়েছে ভক্তিমার্গের ওপর, বৌদ্ধধর্ম ধ্যান ও বিচারের ওপর, অদ্বৈতবাদ জ্ঞানবিচারের ওপর। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে এই সব পথ ধরে গিয়ে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে বলে গেছেন, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ—যে-কোন একটা পথ ধরে গেলেই ভগবানলাভ হবে। এদিক থেকে সব ধর্মই এক। যে ধর্মমতেই, যে পথ ধরেই চল না কেন, অহঙ্কারকে বিনাশ করা নিয়েই কথা। স্বামীজী বলেছেন, "আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাহ্য- ও অন্তঃপ্রকৃতিকে বশীভূত করে আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান—এগুলির মধ্যে এক বা একাধিক বা সকল উপায়ের দ্বারা নিজের ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও। ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ ; মতবাদ, অনুষ্ঠানপদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ এসব গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।" মানুষের এই ব্রহ্মভাবকেই ব্যক্ত করতে বলছে সব ধর্ম। পূজাদি অনুষ্ঠান-পদ্ধতির দিক থেকে বিভিন্ন ধর্মে কিছু তফাত থাকতে পারে, কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্যের দিক থেকে সব ধর্মই এক।

প্রত্যেক ধর্মেই মহাপুরুষগণ আছেন। হিন্দুধর্মে যেমন মুনি-ঋষি, সেইরকম মুসলমান, খৃষ্টান ও বৌদ্ধধর্মেও আছেন। সব ধর্ম যদি সত্য না হত, তাহলে বিভিন্ন ধর্মে এই সব মহাপুরুষগণ কখনো জন্মাতেন না।

সব ধর্মই বলে ভগবান অনন্ত। অনন্ত বা অসীমকে কখনো সীমার মধ্যে আনা যায় না, অসীম ভগবানকে সসীম ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, যা কখনো উচ্ছিষ্ট হয়নি। এর অর্থ, ব্রহ্ম মনবুদ্ধির অগোচর, আমাদের চিন্তা ও বাক্যের অতীত। শাস্ত্র বলছে, যাঁকে অবলম্বন করে সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ হচ্ছে, তিনিই ব্রহ্ম : "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্ ব্রহ্মেতি।" (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ৩।১)। এসব হল সত্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত মাত্র, তটস্থ লক্ষণ। 'নেতি নেতি করে সব ত্যাগ করে গেলে যা থাকে, তাই ব্রহ্ম,' 'ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ', 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ২।১।৩)—এ সবই তাই। ভাষায় এর বেশী আর কিছু বলা চলে না। এক ব্যক্তি তাঁর দুই ছেলেকে ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য গুরুর কাছে পাঠিয়েছিলেন। ছেলে দুটি যখন পাঠ শেষ করে বাড়ী ফিরছে, তখন তিনি বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি ব্রহ্মকে জেনেছ?" ছেলেটি তখন আধঘণ্টা ধরে বোঝাতে লাগল ব্রহ্ম কি বস্তু। ছোট ছেলেকেও তিনি এই প্রশ্ন করলেন। সে চুপ করে রইল। তখন তিনি বড় ছেলেকে বললেন, "ব্রহ্ম কি, তা তুমি কিছুই বোঝনি। ব্রহ্ম যে কি, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। আমার ছোট ছেলেই ঠিক জেনেছে।" যে মনে করে আমি ব্রহ্মকে জেনে ফেলেছি, সে মোটেই জানে না ; যে মনে করে জানতে পারিনি, সেই-ই ঠিক ঠিক জেনেছে : "যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ।" (কেনোপনিষদ্ ২।৩)। কাজেই ব্রহ্মকে আমরা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারি না, বলতে গেলেই নানারকম হয়ে যায়। ভাষার সসীমতার জন্যই এরকম হয়। জাগতিক কোন জিনিসের বর্ণনা দিতে গিয়েই আমরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম বলি, ঠিকমত বর্ণনা কেউ-ই দিতে পারি না ; ব্রহ্ম তো আমাদের মনবুদ্ধির অতীত জিনিস। তাই

বিভিন্ন ধর্ম ভগবান সম্বন্ধে যা বলেছে, সেগুলিকে বিভিন্ন প্রকার এবং অনেক সময় আপাতবিরোধী বলেও মনে হয়; আসলে কিন্তু সবই এক—একই সত্যকে প্রকাশ করার চেষ্টা। সকল ধর্মের মানুষই সেই একই ভগবানকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে।

সব ধর্মই সত্য; এ নিয়ে ঝগড়া করার কিছুই নাই। তবু আমরা যে মনে করি কেবল আমার ধর্মই সত্য, সে শুধু অহংকারের জন্য। এ থেকেই বিবাদের সূত্রপাত। আজ আমাদের সব বিবাদ ভুলে যেতে হবে, সব ধর্মাবলম্বী লোকের মধ্যে পরস্পর প্রীতির ভাব আনতে হবে। এখন জগতে অধর্মের ভাব বেশী হয়েছে, অধর্মের প্রভাবে ধর্ম লুপ্ত হতে চলেছে; জড়বিজ্ঞানের প্রভাব মানুষের মনে ধর্মবিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক করেছে। এই অবস্থায় আমরা হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান এখনো যদি পরস্পর বিবাদ করে শক্তি ক্ষয় করি, তবে অধর্মের বিরুদ্ধে লড়বার শক্তি থাকবে কি করে? এখন সব ধর্মসম্প্রদায়কে ভেদাভেদ ভুলে এক হয়ে দাঁড়াতে হবে, অধর্মের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। সমস্ত শুভ-শক্তিকে একত্র করতে হবে সব অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য।

একত্র হতে হলে আমাদের সকলের অন্তরকে এক করে নিতে হবে। সে পথ তো শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়েই গেছেন; বিশ্বভ্রাতৃত্ব-স্থাপনের ভিত্তিভূমিও তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করেছিলেন, সমাধিভূমিতে উঠে উপলব্ধি করেছিলেন যে, সমস্ত জীবের মধ্যে একই ব্রহ্ম বিরাজিত। যেমন হিন্দুস্থানীতে বলে, "যো রাম দশরথকা বেটা, ওহী রাম ঘট ঘট মে লেটা"—প্রত্যেক জীবের মধ্যে রামচন্দ্র রয়েছেন। ঠাকুর এটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলে তাঁর কাছে মানুষে-মানুষে কোন ভেদ ছিল না, সবাই ছিল তাঁর আপন জন। মূর্খ হোক জ্ঞানী হোক, ধনী হোক দরিদ্র হোক, গায়ের রং শাদা হোক বা কালো হোক বা হলদে হোক,—সবাই তাঁর সমান প্রিয় ছিল। মানুষমাত্রই ছিল তাঁর আদরের জিনিস। আমরা যদি বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপন করতে চাই, তা হলে এরকম একটা সমত্ববোধের ভিত্তির ওপর না দাঁড়ালে তা সম্ভব নয়। নানা দেশে নানা ধরনের লোক, মানুষে মানুষে কত পার্থক্য! সকলের এক হবার জায়গাটা কোথায়? তা হচ্ছে এই আত্মায়—সর্ববিধ বাহ্য পার্থক্য সত্ত্বেও যেখানে সব মানুষ এক। এটা যদি উপলব্ধি করতে পারা যায়, তবেই জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সব মানুষকে এক প্রেমের ডোরে বাঁধা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব-স্থাপন সম্ভব হতে পারে।

এই একত্ববোধের দিকে, সব মানুষকে এক বলে উপলব্ধি করার দিকে অগ্রসর হবার উপায় কি? শ্রীরামকৃষ্ণ যে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-র কথা বলে গেছেন, স্বামীজী যা সারা জগতে প্রচার করেছেন, তাই হল উপায়। মানুষকে ভগবান ভেবে, তার সেবায় ভগবানের পূজো হচ্ছে ভেবে কাজ করার চেষ্টার ফলে সব মানুষই এক—এ বোধ স্বতই আসবে, মানুষের ওপর ভালবাসা ক্রমে গভীর হবে। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদেরও, ভগবান-লাভের জন্য যারা সংসার ছেড়ে এসেছে তাদেরও, এভাবে শিবজ্ঞানে জীবসেবার কাজে ব্রতী করে গেছেন। বলে গেছেন, ঠিক ভাব নিয়ে করতে পারলে জপধ্যানের মতোই তা ভগবানলাভের সাধনা হবে; কারণ ভগবানের সেবা করছি এ ভাব নিয়ে

কাজ করলে তাতে মন সর্বক্ষণ ভগবানের চিন্তাতেই থাকবে। তিনি তাই সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের নীতিবাক্য দিয়ে গেছেন, "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।" ভগবানলাভই মুখ্য উদ্দেশ্য, তবে তার উপায়রূপে যে শিবজ্ঞানে জীবসেবারূপ কর্ম, তার দ্বারা সমাজও উপকৃত হবে। শুধু সন্ন্যাসীরাই নয়, সকলেই যদি "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" কাজ করে, পরিবারের মধ্যে আত্মীয়স্বজনের সেবা, সমাজের সেবা, রাষ্ট্রসেবা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেবা—সব কাজই যদি ভগবানের পূজো মনে ক'রে করে, তাহলে তার দ্বারা জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ভগবানলাভ তো হবেই, সেই সঙ্গে রাষ্ট্র, সমাজ, সমগ্র মানবজাতিই উপকৃত হবে—অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, বিদ্বেষ এসব আপনি কমে যাবে, বিশ্বভ্রাতৃত্বস্থাপনের পথ প্রশস্ত হবে।

তবে এভাবে কাজ করতে হলে আমাদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, ভগবানলাভই জীবনের উদ্দেশ্য এবং কাজ তার সহায়কমাত্র। নিয়মিতভাবে জপধ্যান না করলে কাজের সময় ভাব রক্ষা করা যায় না; কাজকে পূজো ভাবা, মানুষকে ভগবান ভাবা যায় না; সব মানুষকে সমানভাবে ভালবাসা যায় না। সাধু-গৃহস্থ-নির্বিশেষে সকলেরই তাই নিয়মিত ভগবচ্চিন্তার প্রতি বিশেষ যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। অনেকে বলে থাকে, এত কাজের মধ্যে ভগবানের নাম করার সময় পাওয়া যায় না। সংসারের কাজ কি কখনো বন্ধ হবে? তা নয়, ওরই ভেতর সময় করে নিতে হবে। সমুদ্রের তীরে বসে সমুদ্রের ঢেউ দেখে যদি কেউ ভাবে ঢেউ থামলে স্নান করবো, তাহলে তার স্নান করা আর হবে না কখনো। সে যদি দুটি ঢেউ-এর মাঝখানে ঝট করে একটা ডুব দিয়ে আসে, তবেই তার স্নান করা হয়।

কাজের সময় সংসারে সকলের মধ্যে ইষ্টকে চিন্তা করার ও কাজকে তাঁরই পূজা জ্ঞান করে চলার চেষ্টার মাধ্যমেই ক্রমে কাজই যথার্থ পূজায় রূপান্তরিত হবে। কাজকে তখন আর বন্ধন বলে মনে হবে না। তখন সংসার বলে আলাদা আর কিছু থাকবে না—তুমি থাকবে আর তোমার ইষ্টদেবতা থাকবেন; সকলের মধ্যেই তখন ইষ্টদেবতাকে দেখতে পাবে। তখন সংসার সোনার সংসার হয়ে যাবে, কাজে বিরক্তির ভাব চলে যাবে, জীবন আনন্দে ভরপুর হবে, মধুময় হবে।

উপনিষদে আছে, স্ত্রীর কাছে স্বামী যে প্রিয় হয়, সে স্বামীর জন্য নয়, স্বামীর ভেতর যে আত্মা আছেন তার জন্য; সেরূপ স্বামীর স্ত্রীর প্রতি যে ভালবাসা, মা-বাপের সন্তানের প্রতি যে ভালবাসা, তা স্ত্রী বা সন্তানের জন্য নয়, আত্মার জন্যই।

যাঁরা প্রকৃত ধার্মিক লোক তাঁরা লোকের দুঃখে বিচলিত হন। অবতারপুরুষ বা আচার্যগণ আসেন মানুষের দুঃখকষ্ট দূর করতে; তাঁরা মানুষের দুঃখকষ্টে উদাসীন থাকবেন, একি হয় কখনো? অনেকে বলে থাকেন, ধার্মিক লোকেরা লোকের দুঃখকষ্টের দিকে তাকান না; বর্তমান সময়ে ধর্মকে সাধারণতঃ যেভাবে আমরা আচরিত হতে দেখি, তাতে অবশ্য একথা মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ধর্মে কখনই এভাব থাকতে পারে না। অপরের দুঃখকষ্টে যে উদাসীন থাকে, সে যথার্থ ধার্মিক নয়।

প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি সকলের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম দেখেন, তাঁদের দুঃখকষ্ট নিজে অনুভব করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। একদিন দক্ষিণেশ্বর কালী

বাড়ীর চাঁদনির ঘাটে দাঁড়িয়ে গঙ্গাদর্শন করছিলেন তিনি। এমন সময় গঙ্গার বুকে দুই নৌকার দুই মাঝিতে ঝগড়া বাধে, এবং একজন অপরের পিঠে খুব জোরে চাপড় মারে। সেই আঘাতের দাগ তৎক্ষণাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের পিঠেও ফুটে উঠল। এটা কি করে সম্ভব হয়? —তিনি সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন বলেই এরূপ হওয়া সম্ভব হয়েছিল। স্বামীজীর জীবনেও অনুরূপ একটি ঘটনার কথা বলছি। স্বামীজী তখন বেলুড় মঠে রয়েছেন; গঙ্গার ধারের বাড়ীটির দোতলার পূব দিকে যে বারান্দা, তার দক্ষিণ-প্রান্তে স্বামীজীর ঘর। বারান্দার পশ্চিমে একটি ছোট ও একটি বড় ঘর; এ ঘর দুটির মুখ গঙ্গার দিকে। স্বামীজী একদিন মাঝরাতে বারটার পর ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। বারান্দার পশ্চিমদিকের ঘর দুটির একটিতে তাঁর গুরুভাই স্বামী বিজ্ঞানানন্দও ছিলেন। স্বামীজীকে বারন্দায় বেড়াতে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কি ঘুম হচ্ছে না?" স্বামীজী বললেন, "দেখ্ পেসন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। ঘুমের মধ্যে একটা শক্ পেয়ে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। তার পর থেকে অস্বস্তি বোধ করছি। দেখ্, দূরে কোথাও একটা ভীষণ দুর্ঘটনা হয়েছে ও বহু লোক বিপন্ন হয়েছে।" বিজ্ঞান মহারাজ আমাদের বলে-ছিলেন, "কোথায় কোন্ দূরে হাজার হাজার লোক বিপন্ন হল, আর এখানে ঘুম হল না—এটা শুনে মনে হাসি পেল। কিন্তু স্বামীজীকে কিছু বললাম না। পরদিন সকালে খবরের কাগজে দেখলাম, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ফিজি অঞ্চলে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে বহু লোক মারা গেছে।" এইজাতীয় ঘটনা ধরার জন্য যন্ত্র আছে; কিন্তু স্বামীজীর মনই সেই যন্ত্র হয়ে উঠেছিল—মানুষের দুঃখ-কষ্টের প্রতি তাঁর স্নায়ুতন্ত্র এত সংবেদনশীল ছিল যে, সে দুঃখকষ্টের সাড়া সেখানে জাগতই; তাই এত দূরের মানুষের বিপদ তাঁর মন ধরেছিল, তাদের জন্য সমবেদনাতুর হয়েছিল।

যথার্থ ধর্মই এই একাত্মবোধ এনে দেয়—সব মানুষের মধ্যেই নিজেকে বা ভগবানকে প্রত্যক্ষ করায়। মানুষকে ভগবানজ্ঞানে সেবা করার সাধনা এ উপলব্ধি লাভের একটি রাজপথ। ঠাকুর-স্বামীজী এইটি শিখিয়ে গেছেন আমাদের। সারাজগতের দুঃখকষ্ট দূর করার জন্যই তাঁরা এসেছিলেন। সাধুই হোক বা গৃহস্থই হোক, তাঁদের এ আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারলে তবেই ভারতের উন্নতি হবে; ভারতের কেন, সারা জগতেরই হবে। আমাদেরই সে আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করে জগৎকে দেখাতে হবে। স্বামীজী এ দায়িত্ব আমাদের দিয়ে গেছেন। আমরা যেন সে দায়িত্ব বহন করতে পারি। সব বিভেদ ভুলে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলে একত্র হয়ে, সব শুভ শক্তিকে একত্র করে যেন জগতের সমস্ত অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি শুধু আদর্শের প্রতি ভালবাসা নিয়ে নয়, আদর্শকে জীবনে মূর্ত ক'রে। ঠাকুর-মা-স্বামীজীর কাছে আজ এই প্রার্থনাই করি।

স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ ঃ প্রাক্‌কথন*

ভগিনী নিবেদিতা

[অনুবাদ ঃ স্বামী বীতশোকানন্দ]

ভারত-ভ্রমণে যেসব বিদেশীরা আসেন, অল্পকালের মধ্যেই তাঁরা এখানকার সাধু ও ফকির, বা বৈরাগীদের সঙ্গে পরিচিত হন এঁরা হচ্ছেন ভারতীয় জনতার চিত্রময় অংশ এঁদের ভেতর কি হিন্দু কি মুসলমান অধিকাংশই রমতা সাধু; আবার অনেকে অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত পরিব্রাজক-সম্প্রদায়ভুক্ত। স্বতন্ত্রতার চিহ্নরূপে এঁদের সকলেরই পরিধানে গৈরিক বসন। তাছাড়া বিশেষ চিহ্নও আছে— গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, করে দণ্ড বা ত্রিশূল, মাথায় উচ্চচূড় জটাভার, মুখে ও সর্বাঙ্গে ভস্ম-বা মৃত্তিকা-লেপ। যোগী, নাগা, উদাসী এবং আরো কত সব সম্প্রদায়ের বহু সাধু সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত; একথা শঙ্করাচার্য কর্তৃক খৃষ্টীয় ৮ম শতকে প্রবর্তিত পুরীসম্প্রদায় সম্বন্ধে সমধিক সত্য। শঙ্করাচার্য নিজে সন্ন্যাসী ছিলেন এবং তাঁর অধ্যাত্মভাবধারা এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায় দু-হাজার বছর ধরে গুরুপরম্পরা বহন করে আসছেন। আলোচ্য মূল ইংরেজী গ্রন্থখানির লেখক স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এই পুরীসম্প্রদায়ভুক্ত।

বিবেকানন্দের জন্ম ও শিক্ষা বাংলাদেশে। যৌবনে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ভারতে আধুনিক যুগে তিনিই প্রথম ধর্মাচার্য, যিনি হিন্দু-গোঁড়ামির গড়া নিষেধের প্রাচীর ভেঙ্গে সাগর পেরিয়ে পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচার করতে গিয়েছিলেন। প্রথমবার গিয়েছিলেন চীন ও জাপান হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে, সেখানে ধর্মমহাসভায় হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করতে; এই ধর্মমহাসভাটি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত চিকাগো মেলার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ-রূপে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। যে-কাজ তিনি করতে যাচ্ছিলেন, তার গুরুত্ব সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ পূর্ণ সজাগ ছিলেন। হিন্দুধর্ম তখন পর্যন্ত নিজেকে প্রচারশীল ধর্ম বলে ভাবতে শেখেনি। জনৈক বন্ধু বলেন, জন্মভূমি-পরিত্যাগের প্রাক্‌কালে বিবেকানন্দকে বলতে শোনা গিয়েছিল, "আমি এমন এক ধর্ম প্রচার করতে যাচ্ছি, বৌদ্ধধর্ম যার বিদ্রোহী সন্তান, আর সমস্ত আদর্শবাদ সহ খৃষ্টধর্ম যার একটা কষ্টকল্পিত অনুকরণ মাত্র।"

চিকাগোয় প্রচারকরূপে সাফল্য অর্জনের পরের কয়েকটি বছর তিনি আমেরিকায় কর্ম ও ভ্রমণে অতিবাহিত করেন; ১৮৯৫ ও ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে দুবার ইউরোপ মহাদেশে আসেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি ভারতে ফিরলে স্বদেশবাসীরা তাঁকে যে বিপুল সংবর্ধনা জানান, তাকে 'ঐতিহাসিক' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যেখানে তিনি প্রথম অবতরণ করেন সেই কলম্বো থেকে শুরু করে যে-মাদ্রাজ থেকে তাঁকে প্রথম বিদেশে পাঠানো হয়েছিল সেই মাদ্রাজ পর্যন্ত তাঁর ভ্রমণগুলি, এবং কলকাতায় তাঁর নিজের মঠে পৌঁছুবার পর যে-সমস্ত শহর, প্রদেশ ও করদরাজ্যগুলিতে আমন্ত্রিত

* হস্তলিখিত মূল ইংরেজী পাণ্ডুলিপিটি স্বামী সারদানন্দের পুরাতন পত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে; ভগিনী নিবেদিতা আমেরিকা হইতে (কেম্ব্রিজ, মাস, ইউ. এস. এ: ১৬. ১. ১৯১১) ডাকযোগে ইহা পাঠাইয়াছিলেন। ১২ই ফেব্রুআরি তারিখ উহা বাগবাজার পৌঁছায়। আমরা যতদূর জানি, রচনাটি পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।—সঃ

হয়ে তিনি গিয়েছিলেন, সেই ভ্রমণগুলি সবই ছিল সত্যিই বিজয়ীর জয়যাত্রার অগ্রগতি। আর মুসলমান সম্প্রদায়ের সান্নিধ্যে হিন্দুভাব ক্ষুণ্ণ হওয়ার মাত্রা যেখানে খুবই কম, সেই দক্ষিণভারতে ধর্মমত ও বিশ্বাস-সংক্রান্ত মতভেদ-গুলির উপর তাঁর নির্দেশনামা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ বলে সেই সময় থেকেই স্বীকৃত হয়ে আসছে। ভারতের নাম নিয়ে চার বছর আগে যে গৈরিকভূষিত ভিক্ষুক সন্ন্যাসী ভারতের উপকূল ছেড়ে গিয়েছিলেন, ভারত এখন তাঁর জীবনোদ্দেশ্য ও বাণীকে প্রকাশ্য অভিনন্দন দ্বারা সমর্থন করল। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি এখনো কতটা সজীব সে বিষয়ে কিছুটা ধারণা হয় যখন শুনি, মাদ্রাজে ১৪ দিন ধরে স্বামীজী প্রতিদিন মধ্যাহ্নে একটা করে বৈঠক বসাতেন আর সেখানে প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণেরা দার্শনিক ও অন্যান্য বিষয়ে প্রশ্ন করতেন, আর সে প্রশ্নগুলির উত্তর স্বামীজীকে প্রথমে সংস্কৃতে ও পরে ইংরেজীতে দিতে হত। সংস্কৃত ভাষা তাঁর নিজের দেশে কোনক্রমেই মৃত নয়। স্বামীজী দ্বিতীয় এবং শেষবার পাশ্চাত্ত্যে গিয়েছিলেন ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং দু-বছর পূর্ণ হবার আগেই ১৯০২-এর ৪ঠা জুলাই দেহত্যাগ করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি প্যারিসে তিন-চার বার গিয়ে সেখানে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়েছিলেন। সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে দু-বার ভাষণও দিয়েছিলেন।

স্বদেশে তাঁর কর্মকাণ্ডে স্বামীজী কখনো ধর্মসংস্কারক বা সমাজসংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেননি। যে সম্মানের অধিকার তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, তিনি তার সুযোগ নিয়ে নিজের কোন প্রিয় সাম্প্রদায়িক মতবাদ অপরের ওপর চাপিয়ে দিতে চাননি। বর্তমান যুগ-পরিবর্তনের কালে উদ্ভূত বিভ্রান্তিগুলির প্রত্যুত্তররূপে তিনি অধ্যাত্ম হিন্দুধর্মের পতাকা তুলে ধরেছিলেন—যা আদর্শস্থানীয়, গতিশীল এবং জাতি-ও প্রথাগত সর্ববিধ বাহ্যানুষ্ঠানের ঊর্ধ্বে। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল, এমনকি বেদ এবং উপনিষদ্‌ও কেবলমাত্র ধর্মের এই কেন্দ্রীয় এবং সর্বাধিক মর্মোদ্ঘাটক রূপটি ছাড়া অন্য আর কিছুই ঘোষণা করে নাই; লিখিতই হোক বা অলিখিতই হোক, অপেক্ষা-কৃত আধুনিক কালের সন্ত ও আচার্যগণের বাণীও ছিল তাই।

পাশ্চাত্ত্যে ভারতীয় চিন্তার বার্তাবহ স্বামীজীর অবদান কিন্তু কিছু বেশী জটিল। সেখানে তাঁর বহুসংখ্যক রচনার মধ্যে আমরা দেখতে পাই, তিনি শুধু অদ্বৈততত্ত্ব বা একত্বের, সর্বব্যাপী ঈশ্বরতত্ত্বেরও সংজ্ঞানিরূপণে বা বিস্তারেই নিরত ছিলেন না, প্রাচীন জ্ঞানের একটি শাখার একজন প্রত্যক্ষদর্শী প্রামাণিক অধিকারিরূপেও কাজ করেছেন; আলোচ্য গ্রন্থটিতে তারই পরিচয় মেলে। জ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটি (রাজযোগ) সম্বন্ধে ইউরোপের কোন পরিচয়ই নেই বললেই চলে, এমন কি এর নামটি পর্যন্ত সেখানে প্রায় অজ্ঞাত।

রাজযোগ বইটি স্পষ্টতঃ দুইটি অংশে বিভক্ত—একটি অংশ মৌলিক গ্রন্থ, অপরটি ভাষ্যসমেত একটি প্রাচ্য গ্রন্থের অনুবাদ। এ ছাড়া বিষয়ানুসারে গ্রন্থটিকে আরও একভাবে দু-ভাগ করা যায়; প্রথম ভাগে আমরা যেন একটি রাগিণী শুনছি, যার বিষয়বস্তুর সঙ্গে ধর্মের সারূপ্য আছে; দ্বিতীয় ভাগটি যেন মিশ্ররাগাত্মক, যেটিকে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বলা যেতে পারে। একদিকে আমরা শুনি সেই উদাত্ত ধ্বনি: "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা, আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ

পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥" অপরদিকে আমরা যতই পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, টীকার পর টীকা পড়তে থাকি, ততই, বিশ্বাসের প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও, অন্ততঃ মানসিকতার দিক থেকে একটি প্রাচীন ও অপরিচিত মনোবিজ্ঞানের সম্মুখীন হই যেটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বকীয় পরিভাষা ও যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, এবং যা আমাদের অভ্যস্ত জ্ঞানের সঙ্গে আশ্চর্য রকমে সাদৃশ্যহীন।

দুটি দৃষ্টিকোণই ঠিক; প্রাচ্য দৃষ্টিকোণ থেকে রাজযোগ হচ্ছে ধর্ম, আর পাশ্চাত্ত্যের দিক থেকে বিজ্ঞান। সাধু ও আচার্যদের দিব্যভাব ও ভবিষ্যদ্দর্শন সম্বন্ধে আমরা পাশ্চাত্ত্য-বাসীরা যে একেবারেই অনভিজ্ঞ, তা নয়; মাঝে মাঝে এর পরিচয় আমরা পেয়েছি, এবং সেগুলিকে মানসিক বিকার বলা কখনই ঠিক নয়। ফ্রান্সী, যোয়ান, টেরেসা ও ইগনেসাস লয়লা ব্যতীত আমাদের ইতিহাস বহুলাংশে রিক্ত থেকে যেত। কিন্তু আমরা এইসব অতীন্দ্রিয় ঘটনাবলীর একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার কোন প্রয়োজনই বোধ করিনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের ভুল বোঝা সত্ত্বেও সেসব ঘটেছে, আমাদের সহানুভূতির জন্য নয়। প্রাচ্যে কিন্তু কোন ধর্মীয় ভাবকে লোকে সরলতা ও ঋজুতার সঙ্গেই সত্যের মর্যাদা দেয়, যেমন পাশ্চাত্ত্যে দেয় কোন একটি যন্ত্রের আবিষ্কারকে বা কোন যন্ত্রশিল্পের প্রক্রিয়াকে। এতেই বোঝা যায়, যে মানসিক অবস্থা ধর্ম-সমূহের উদ্ভবস্থল, স্বামী বিবেকানন্দ যাকে অতিচেতন বলে অভিহিত করেছেন, তার স্বীকৃতি প্রাচ্য মনোবিজ্ঞানের একটা পূর্ণ অঙ্গ হওয়া চাই-ই। পতঞ্জলির প্রথম অধ্যায়ের সপ্তম সূত্র "প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি"-র মতো আর কোন সূত্র আছে কি, যা বৈজ্ঞানিক আদর্শের পতাকাতলে দাঁড়িয়ে অধিকতর বেপরোয়া ও নির্ভীকভাবে হাসতে পারে? এই সূত্রের লেখকের মনে বিন্দুমাত্রও বিভ্রান্তি ছিল কি? মনের কোন বাতায়নকে রুদ্ধ করে অন্ধকার করে রাখবার প্রশ্ন ওঠে কি? ঐ শব্দগুলিই অপরোক্ষভাবে সূত্রটির প্রামাণ্যের দাবির ভিত্তি রচনা করেছে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষানুভূতির ওপর। কারো কথাকে মেনে নেবার জন্য আবেদন করা হচ্ছে না। শিষ্যকে শিক্ষাদানে "আগম-প্রমাণ" বা "আপ্তবাক্য-প্রমাণ" কথাটির বিশেষণটির পশ্চাতে যে আত্মগৌরব রয়েছে, তা লক্ষ্য করুন; "অনুমান" হচ্ছে সম্ভাব্য তত্ত্ব নির্ণয়ের নির্ভরযোগ্য পন্থাগুলির অন্যতম; কিন্তু দু'টিই প্রতক্ষানুভূতির উপর সমভাবে নির্ভরশীল। কাজেই প্রত্যক্ষই হচ্ছে সমস্ত পরীক্ষার চরম মানদণ্ড, কষ্টিপাথর। গ্রন্থাদির প্রমাণ অস্বীকার করে ধর্মের সমস্ত উপাদানগুলিকে অনুভূতির কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেবার এই আগ্রহ পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারা অনুযায়ী ধর্ম অপেক্ষা বিজ্ঞানেরই বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক—একথা সত্য নয় কি?

এই প্রাচ্য বিজ্ঞানটি, এর বিশ্বাসযোগ্যতা ধরে নিয়ে, আর একটি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনার দাবি রাখে; সেটি হচ্ছে পদ্ধতির প্রশ্ন। এই অনুসন্ধান-প্রক্রিয়াটির প্রকৃতিই এমনি যে, মানবদেহই হল তার পরীক্ষাগার, এবং (পরীক্ষার জন্য) সে-দেহের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রগুলি ছাড়া আর সবই অগ্রাহ্য। তাই বলে একথা সত্য নয় যে, সেখানে কোন পরীক্ষা করা হয় না; সমগ্র গবেষণাটিই পরীক্ষা-ভিত্তিক। আর, যখন আমরা পাঠ করি, হৃৎ-পিণ্ডকে এতখানি স্বাধিকারে আনা যায় যে, রক্তসঞ্চালনক্রিয়া ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত বা বন্ধ করা যায়, তখন রাজযোগের পথিকৃৎদের কী

সাহস ও জ্ঞাননিষ্ঠা নিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে, তার কিছুটা আভাস পাই। কোন সিদ্ধান্তের বহুবিধ অঙ্গের প্রামাণিক প্রতিষ্ঠার জন্য যে জীবনোৎসর্গের প্রয়োজন হয়—যেমন আধুনিক রসায়ন বা ভেষজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে—রাজ-যোগের ক্ষেত্রে যে তা কম প্রয়োজন হয়েছিল, একথা বিশ্বাস করার কোন অবকাশ নেই। একথা তো স্পষ্ট যে, নিয়মনিষ্ঠার কঠোরতা-বরণে আধুনিক বিজ্ঞানীদের জীবনরীতিতে পূর্বসূরীদের প্রাধান্য দিতেই হবে।

আর একটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা বাকী থাকছে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে পতঞ্জলি এই যোগসূত্রগুলি লিখেছিলেন; বিংশ শতাব্দীতে 'গ্রন্থকার' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, সে অর্থে তাঁকে গ্রন্থকাররূপে দেখা চলে না। বলা যায়, তাঁর সমকালীন তপস্যা ও মননের সঙ্গমোদ্ভূত সিদ্ধান্তগুলির লিপিকার ছিলেন তিনি। আজও তিনি যোগের আদিগুরু বলে পরিচিত। কোন বিজ্ঞানপরিষদ্ কর্তৃক কোন খৃষ্টাব্দের আবিষ্কারগুলি ঐ পরিষদের অনুমোদনক্রমে প্রকাশিত হলে ঐ আবিষ্কারের কৃতিত্ব যেমন ব্যক্তিগতভাবে ঐ পরিষদের সভাপতিকেই দেওয়া হয়,—এ বোধ হয় ঠিক সেইরকমই।

যোগসূত্রগুলি সংস্কৃতির একটা যুগের প্রতিনিধিস্বরূপ, সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ভ্রাম্যমাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনীষার অবদান। প্রকাশিত হবার বহু পূর্ব থেকেই সেগুলি ছিল; প্রকাশ-কালেই সেগুলি কয়েক শতাব্দীর পুরাতন।

উপসংহারে বলা যায় যে, এই অদ্ভুত প্রাচীন রাজযোগ আজও পর্যন্ত ভারতে প্রাণবন্ত হয়ে রয়েছে। এতে কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন এমন শিক্ষার্থী কয়েক হাজার রয়েছেন। আবার এমন লোকও আছেন, হয়তো অল্প-সংখ্যক, যাঁরা এতে অতি-উন্নত। সে যাই হোক, আমরা, এই গ্রন্থের লেখক স্বামী বিবেকানন্দের ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য উভয়বিধ শিষ্যেরাই, স্বামী বিবেকানন্দকে পূর্বোক্ত শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত বলেই সসম্ভ্রমে দেখি। তিনি সেই মহাত্মাগণের অন্যতম, যাঁদের কাছে সমাধি বা অতিচেতন অবস্থার কিছুই রহস্যাবৃত ছিল না, যাঁদের কথাগুলি "আপ্তবাক্য"।

—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা

"জাতীয় মনের হর্ম্যনির্মাণে তাঁর (স্বামীজীর) বিশ্বাস রূপ নেবে। সর্ব মত ও জাতির ত্রিশকোটি নরনারীর জীবনের ওপরই তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হবে। সেই সঙ্গে হয়ত, পৃথিবীর বিশ্বাসের জগতে নূতন যুগের অভ্যুদয়।···

"সেই মন্দিরভবনের নির্মাণে আমি যেন একটি ইটও বহনের যোগ্য হই।"

"তাঁর (স্বামীজীর) প্রাণ-মন-আত্মা এক জলন্ত মহাকাব্য, যা 'ভারত' এই নামোচ্চারণে মহারহস্যব্যাকুল।"

—ভগিনী নিবেদিতা

গীতায় সমন্বয়

স্বামী আদিনাথানন্দ

ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তার ইতিহাসে ভগবদ্‌-গীতায় বিভিন্ন উপাসনাপদ্ধতি ও আধ্যাত্মিক সাধনাকে একটি সমন্বয়মূলক দৃষ্টিকোণ হইতেই যে বিচার করা হইয়াছে, একথা অবিসংবাদিত সত্য।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে তত্ত্বসম্বন্ধে দার্শনিক মতগুলির সমন্বয়সাধনে তত বেশী তৎপর হন নাই, যতটা হইয়াছেন আধ্যাত্মিক অনুভূতিলাভের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির সম-উপযোগিতা দেখাইয়া দিতে। ইহা করিতে যাইয়া তিনি গীতায় একটি মৌলিক উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ভগবানলাভের জন্য প্রচলিত কোন পথকেই অপরগুলি অপেক্ষা ছোট বা বড় না বলিয়া বলিয়াছেন যে, চরম তত্ত্বজ্ঞান লাভের সহায়করূপে সব পথগুলিই স্ব-প্রধান; স্বামীজীর ভাষায়, জীবভাবের অবসান ঘটাইয়া মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব প্রকাশের সহায়করূপে প্রত্যেকটি সাধনমার্গই সহাবস্থানের অধিকার লাভ করিয়াছে।

ইহা সম্ভব হয় কেমন করিয়া? আমরা জানি জ্ঞানযোগ বা বুদ্ধিযোগ বা সাংখ্যযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ও রাজযোগ—এই চারিটি প্রধান সাধনপথের তত্ত্বসম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীতে ও সাধনপদ্ধতিতে পার্থক্য প্রচুর। আত্মা বা পুরুষ সত্য, প্রকৃতির অন্তর্গত সকল বস্তু ও ধারণা তাঁহাতে আরোপিত—পুরুষ-প্রকৃতি সম্বন্ধে এই সত্য মানিয়া লইয়া সাংখ্যযোগী বা জ্ঞানযোগী অগ্রসর হন। বৈদান্তিক জ্ঞানযোগীর মতে একমাত্র আত্মা ভিন্ন আর সবই মিথ্যা; যাহা কিছু দৃশ্যস্থানীয় তাহাই মিথ্যা বা মায়া—এমনকি ঈশ্বরও জড়জগতের এবং মানসজগতের বস্তুচয়ের মতোই সমভাবে মিথ্যা, মায়িক।

কোন ভক্তিপথাবলম্বীর নিকট আবার জ্ঞানযোগীর এই ধারণা বিকট বলিয়া মনে হইবে; তিনি কখনই ইহাকে প্রশ্রয় দিতে পারেন না। তাঁহার নিকট ঈশ্বরই চরম সত্য, ঈশ্বরের স্বরূপপ্রকাশক প্রতিটি উপলব্ধিই সত্য। ভক্তের নিকট ঈশ্বরের ধারণার স্থান আত্মার ধারণার ঊর্ধ্বে।

কর্মযোগী ও রাজযোগীর আবার কোন দার্শনিক ঈশ্বরীয় তত্ত্বের প্রয়োজনই নাই। তাঁহারা বাহিরের সাহায্য অস্বীকার করিয়াই আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ করেন; অজ্ঞানের পঙ্কিল আবর্ত হইতে উদ্ধারলাভের জন্য তাঁহারা একমাত্র মন ও বুদ্ধির শক্তির উপর নির্ভরশীল।

গীতার মতে, এই বিভিন্ন পথগুলির বিস্তারিত অংশে বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সবগুলিরই উদ্দেশ্য এক, এবং সব পথগুলিই সমভাবে সীমিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়, 'সবাই বলে আমার ঘড়ি ঠিক চলছে, কিন্তু কারো ঘড়িই ঠিক চলে না।'

বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বিষয়টি সম্যক-ভাবে বোঝা যায়। সব পথেরই লক্ষ্য মুক্তি, বন্ধন হইতে আমাদের মুক্ত করিয়া দেওয়া। মানুষ বাস্তবিকই স্বরূপতঃ পূর্ণ ও মুক্ত। নিজের এই মুক্ত স্বরূপ আবিষ্কার করার নামই মুক্তিলাভ—নূতন করিয়া কিছু পাওয়া নহে। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ যেমন বলিয়াছেন, "আত্মজ্ঞান নূতন কিছু সৃষ্টি নয়, আবিষ্কার মাত্র।" শঙ্কর-বেদান্তের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ইহাই। যে-সম্পদ হারাইয়া

গিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছি, আসলে তাহা যে হারায় নাই, আমার কাছেই রহিয়াছে, ইহা জানার (যেন আবার তাহা ফিরিয়া পাওয়ার) নামই আত্মজ্ঞানলাভ। আমরা পূর্ণ ও মুক্ত-স্বভাব হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞানবশতঃ আমাদের মিথ্যা ধারণা জন্মিয়াছে যে আমরা অপূর্ণ, বদ্ধ ; কাজেই সত্যলাভে আগ্রহশীল সব সাধকেরই একমাত্র কাজ হইল এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করা। অজ্ঞানের এই আবরণ উন্মোচন করিতে হইলে সাধককে ধাপে ধাপে সাজানো কয়েকটি অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতে হয়। প্রথম ধাপে ওঠা, প্রথম কাজ হইল, যে চারিটি পথের কথা বলা হইয়াছে, তাহার যে-কোন একটি অবলম্বন করিয়া লক্ষ্যাভিমুখে চলিতে শুরু করা। ক্রমে সাধক উচ্চতর ধাপগুলিতে উঠিতে থাকেন। যে-কোন পথ ধরিয়াই হউক কিছুকাল শান্তচিত্তে আন্তরিকতার সহিত সাধনা করিবার ফলে সাধকের মনের নিম্নস্তরের উত্তেজনা ও আবেগগুলি সংশোধিত হইয়া বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয় ; সাধকের মধ্যে তখন সাত্ত্বিক ভাবের প্রাধান্য ঘটে, তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি দমিত হয়, চেতনার উচ্চতর অবস্থায় অনন্যমনা হইয়া অবস্থান করিবার মতো কিছুটা মানসিক স্থৈর্য ও শক্তি তাহার আসে। সাধনার অগ্রগতির ফলে এই মানসিক স্থৈর্য ও শক্তি ক্রমবর্ধিত হইয়া এক অবস্থায় স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থালাভ সাধকের আধ্যাত্মিকতালাভের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ক্ষণ ; সাধকের মন যখন এতখানি শুদ্ধ হয়, তখন নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, তিনি আধ্যাত্মিকতার পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। জগৎ ও জীবনের পিছনে যে চিন্ময় শক্তি ক্রিয়াশীল, এই অবস্থায় স্বজ্ঞাসহায়ে সাধক তাঁহার আভাস পান, ভগবদানন্দের পূর্বাস্বাদ পান। ঐ আনন্দসাগরে সর্বক্ষণ মগ্ন হইয়া থাকিবার জন্য তাঁহার চিত্ত তখন স্বতই ধ্যানে ডুবিয়া যাইতে চায়। এ অবস্থায় আসিলে সাধক বলিতে পারেন, "অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া!" তাঁহার অগ্রগতি তখন স্বাভাবিক ও অব্যাহত। অজ্ঞানের অবশিষ্ট ক্ষীণ আবরণটুকু উন্মোচিত হইয়া অনির্বচনীয় শান্তি ও আনন্দের সঙ্গে একীভূত হওয়া তখন যে-কোন মুহূর্তে ঘটিতে পারে, তখন প্রশ্ন শুধু সময়ের।

পূর্বে যে চারি প্রকার যোগ বা সাধনপথের কথা বলা হইয়াছে, সেগুলি সবই সাধককে একই ভাবে, ঠিক একই পর্যায়ক্রমেই অধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর করায় ; কাজেই সেগুলি সবই সমধর্মী। তাছাড়া, গীতা যখন ঘোষণা করে যে, সমস্ত বেদই হইল ত্রিগুণের রাজ্যের অন্তর্গত এবং বেদকেও অতিক্রম করিয়া ত্রিগুণাতীত হওয়াই হইল আদর্শ, তখন সেই ঘোষণাই সব সাধনপথকেই আদর্শ হইতে নিম্নতর স্তরে, ত্রিগুণের রাজ্যে একই আসনে বসায় ; কোন পথই যখন আমাদের অমৃতধাম পর্যন্ত লইয়া যাইতে পারে না, সবগুলিই যখন সমভাবে সীমিত, তখন কোন পথের অপরগুলি হইতে প্রাধান্যের বা শ্রেষ্ঠত্বের দাবির প্রশ্নই উঠে না। অমৃতধামে আমাদের প্রবেশলাভ ঘটে এক অনির্বচনীয় উপায়ে, যাহাকে কখনো বলা হয় 'ভগবৎ-কৃপা', কখনো বা 'ভগবানের স্বেচ্ছানির্বাচন'—কঠোপনিষদের ভাষায় "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্" (১।২।২৩)।

'একৈকবাহং জগত্যত্র'

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে ভগবান বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া অর্জুনের মনে বিশ্বাস আনিয়া দিয়াছিলেন শ্রীভগবানই সর্বময়, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানে যাহা কিছু অভিব্যক্তি তাহা তাঁহারই বিভূতি; জন্ম ও মৃত্যু, জয় এবং পরাজয়, সুখ এবং দুঃখ, করুণ এবং কঠোর, সব তাঁহারই শক্তি, তিনি ছাড়া আর কিছু নাই। চণ্ডীতে বর্ণিত হিমালয়ের এক যুদ্ধক্ষেত্রে দেবী অম্বিকা তাঁহার সহিত সংগ্রামে রত দৈত্যরাজ শুম্ভকে ঐ একই আধ্যাত্মিক চরম সত্য শুনাইয়া দিলেন—একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। "অখিল জগৎসংসারে আমিই একা রহিয়াছি। আমা ছাড়া অন্য আর কে আছে?" (চণ্ডী ১০।৫)। শুম্ভ দেখিতেছিলেন তাঁহার প্রতিপক্ষ সিংহবাহিনী উদ্ধতা যোদ্ধ্রী একের পর এক বিচিত্র ভূষণ ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিতা বিচিত্র-মূর্তি নানা রণ-সঙ্গিনীদের আমদানী করিতেছেন এবং তাঁহাদিগকে যুদ্ধে আগাইয়া দিতেছেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই আশ্চর্যবলবীর্যশালিনী এবং নূতন নূতন যুদ্ধকৌশলে সুদক্ষা। ইঁহাদের পরাক্রমে শুম্ভের বিপুল দৈত্যবাহিনী প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, এমনকি তাঁহার অপরাজেয় মহাবীর ভ্রাতা নিশুম্ভও মৃত্যুমুখে পতিত। এমন অঘটন যে ঘটিতে পারে তাহা ত্রৈলোক্যজয়ী শুম্ভ স্বপ্নেও কখনও কল্পনা করিতে পারেন নাই। তাঁহার পৌরুষের এত বড় লাঞ্ছনা পূর্বে আর কখনও হয় নাই। বুঝিতেছিলেন, নারীর হাতে তাঁহাকেও মরিতে হইবে। পরিত্রাণ নাই। ভাবিতেছিলেন, কি কুক্ষণেই দূতের কথা শুনিয়া এই ছলনাময়ীকে রাণী করিতে চাহিয়াছিলাম! এত দুঃখেও তাঁহার হাসি পাইতেছিল! ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণকে পদানত করিয়া অবশেষে অবলার হাতে প্রাণবিয়োগ! এ কি বাস্তব, না স্বপ্ন?

যাহা হউক দানবের ঔদ্ধত্য মরিয়াও মরে না। শুম্ভ ভাবিলেন, সৈন্যসমারোহ দ্বারা যাঁহাকে জব্দ করা গেল না, নানা অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা যাঁহাকে আহত করা সম্ভব হইল না, তাঁহাকে একবার বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া দেখি। বলিলেন,

বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাঽতিমানিনী।

"বলগর্বে গর্বিতা হে উদ্ধতা নারী, দূতের মুখে তুমি সংবাদ পাঠাইয়াছিলে যে, একাই তুমি আমার সমরশক্তির সঙ্গে লড়াই করিবে। তোমার সেই আস্ফালন তো দেখিতেছি বাগাড়ম্বর মাত্র। তলে তলে যুক্তি করিয়া এই সব ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মাণী, নারসিংহী, বারাহী, কালী, কৌমারী প্রভৃতি জ্বালাময়ীদের কোথা হইতে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদেরই শক্তিতে আমার সৈন্যদের ছারখার করিলে। ইহাতে তোমার আর কি বাহাদুরী? মিথ্যাবাদিনী যাদুকরীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া হাত আর কলঙ্কিত করিতে চাই না।"

দৈত্যরাজের কটুবাক্য শুনিয়া দৈত্য-মর্দিনীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল—সেই হাসি যাহা "নগেশ্বর হিমালয়ের" সানুদেশে দেবতাদের স্তব শুনিয়া "জাহ্নবীতোয়ে" স্নানের জন্য

আগতা রঙ্গময়ী পার্বতীর মুখে প্রতিফলিত হইয়াছিল—বড় স্বচ্ছ, নির্মল, সর্বসঙ্কোচবিমুক্ত, জ্ঞানদীপ্ত হাসি—মহামায়ার স্বতঃস্ফূর্ত হাসি। কাম ও দম্ভ যে বাক্যের প্ররোচক, দেবী তাহাকে খণ্ডন করিলেন কল্যাণকরী শ্রৌতী বাণী দিয়া।

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ॥

"রে দুর্ভাগা, মোহ তোর সকল চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়াছে; তাই তুই আমার কার্যকলাপ বিচার করিতে বসিয়াছিস। কি করিয়া তোকে বুঝাইব আমি কে? রূপের পশ্চাতে অরূপ, বহুর পশ্চাতে এককে ধরিবার ক্ষমতা তো তোর মলিন বুদ্ধিতে আসিবে না। তাই তোর চোখ গেছে ঝলসাইয়া। গর্বিতা আমি নই, কেননা অপ্রাপ্যকে পাইলে তবে তো গর্ব। কিন্তু আমার তো কিছু অপ্রাপ্য নাই। বিশ্বসংসারের সকল কিছু অনাদিকাল হইতে আমার কুক্ষিগত। সর্বময়ী আমার পক্ষে গর্বের কথা উঠে না। গর্ব তোরই মূঢ় মনের মিথ্যা ভূষণ। তাই কামদৃষ্টিতে তুই আমাকে দেখিয়াছিস। আসুর দম্ভে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে নামিয়াছিস। যে-সব শক্তি-ময়ীদের অস্ত্র হানিতে দেখিতেছিস তাহারা কেহ আমা হইতে আলাদা নয়। এখন দেখ্, তোর চোখের সামনে প্রমাণ করিয়া দি একই আমার শাশ্বত সত্য। বহু একেরই বি-ভূতি—বিশেষ প্রকাশভঙ্গী মাত্র। দেখ্, এক মুহূর্তে কি করিয়া ব্রহ্মাণী ইন্দ্রাণী প্রমুখ রণময়ীরা আমারই দেহে বিলীন হইয়া যায়।"

অর্জুনের চোখে একটু জ্ঞানাঞ্জন লেপিয়া দিয়া বেদার্থপ্রকাশক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, পশ্য—দেখ। "সচরাচর সমস্ত জগৎ আমারই দেহে দেখ।" (গীতা—১১।৭), তেমনি শুম্ভাসুরের মনে ঝাঁকানি দিয়া বেদময়ী জগজ্জননীও বলিলেন, পশ্য—দেখ্। "নানা শক্তির আমাতেই অন্তঃপ্রবেশ দেখ্।" শুম্ভাসুরের ভাগ্য কম নয়। অর্জুনের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রহ্মোপলব্ধির আভাস।

ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীত্তদাম্বিকা॥

"অনন্তর ব্রহ্মাণীপ্রমুখ নানামূর্তিধারিণী সেই সেই দেবশক্তিগণ পরমেশ্বরী মহাদেবীর তনুতে প্রবেশ করিলেন! তখন অম্বিকা একাকিনীই তথায় বিদ্যমান রহিলেন।" (চণ্ডী—১০।৬)

বহুরূপিণীকে একাকিনী দেখা অথবা একক হইতে বহুরূপের সম্প্রসারণ দেখা—দুই-ই তত্ত্ব-দৃষ্টির এপিঠ ওপিঠ। অর্জুন দেখিয়াছিলেন দ্বিতীয়টি, শুম্ভাসুরকে মা দেখাইলেন প্রথমটি অর্জুন দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে মর মর হইয়াছিলেন; কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন, প্রভু, এই "সর্বতোদীপ্তিমন্ত" "দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীক্ষ-পরিব্যাপ্ত" অদ্ভুত বিশ্বরূপ আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। তোমার স্বাভাবিক শান্ত ছোট মানুষ-মূর্তিটিই আমার পক্ষে ভাল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তথাস্তু বলিয়া পুনরায় স্বাভাবিক মূর্তি ধারণ করিয়া আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। সহ্য করিতে না পারিলেও বিশ্বরূপদর্শনের ফলে অর্জুনের জ্ঞান-ভক্তি যে দৃঢ় হইয়াছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

দৈত্যরাজ শুম্ভ শক্তির নানা প্রকাশকে মহা-শক্তিময়ীর সত্তায় বিলীন হইতে দেখিয়া কতটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন তাহা মার্কণ্ডেয় মুনি লিপিবদ্ধ করেন নাই। তবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিমতো মিশ্রীর রুটি সিধা করিয়া বা উলটা করিয়া যেমন করিয়া হউক খাইলে যদি সমান মিষ্ট লাগে, তাহা হইলে মন যেমনই হউক স্বয়ং আদিশক্তির মুখে তাঁহার

তত্ত্বের উপন্যাস শুনিয়া এবং তাঁহার মধ্যে বহুত্ব ও একত্বের সামঞ্জস্য নিজের চোখে দেখিয়া শুম্ভের যে কোনও আধ্যাত্মিক লাভ হয় নাই তাহা বলা চলে না। বরং বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় শুম্ভ শত্রুবেশে দেবীরই পরম ভক্ত। চণ্ডীর ভাষায়—সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়াস্ত (চণ্ডী ৪।১৮)—মায়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া মায়ের শূলের আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে গতিলাভ। শুম্ভাসুরও নিশ্চিতই ঊর্ধ্বগতিলাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে পুরাণের এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করিয়া একজন দেবীভক্ত একটি স্তবের মধ্যে লিখিয়াছেন—

শঙ্করী হইয়া মাগো গগনে উড়িবে
মীন হয়ে রব জলে মা নখে তুলে লবে॥
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী যখন যাবে গো পরাণী
কৃপা করে দিও মাগো রাঙ্গা চরণ দুখানি॥

* * *

তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্য তুমি গো পাতাল।
তোমা হতে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই স্তবটি যে শুনিতে বড় ভালবাসিতেন, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে তাহা দেখিতে পাই। যে ভক্ত বুঝিতে পারে জগন্মাতাই স্বর্গ মর্ত্য পাতাল, জগন্মাতা হইতেই সকল বিনাশ, সে আর মৃত্যুতে ভয় পায় না। সে তখন এই কল্পনায় আনন্দ পায়—সে যেন একটি ক্ষুদ্র মাছ হইয়া জলে ভাসিতেছে আর মৃত্যুরূপা মহামায়া শঙ্খচিল-মূর্তি ধারণ করিয়া একটি আঘাতে তাহাকে তুলিয়া লইতেছেন, তাহার দেহটি ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাকে পঞ্চভূতের কারাগার হইতে মুক্তি দিতেছেন।

একৈবাহং জগত্যত্র—দেবীর মুখে চণ্ডী মহাগ্রন্থের এই উক্তি বেদান্তপ্রতিপাদ্য অদ্বৈত বাণীসমূহেরই প্রতিধ্বনি। উপনিষদের ঘোষণা—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—(এই যাহা কিছু দেখিতেছ তাহা ব্রহ্মই), ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ (এই বিশ্বসংসার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয়।), নেহ নানাস্তি কিঞ্চন (এখানে নানা বস্তু কিছু নাই, এক পরমাত্মাই আছেন।), একমেবাদ্বিতীয়ম্ (এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ) ইত্যাদি ইত্যাদি। বেদান্তের সাধক ভক্তিপথ দিয়া হউক অথবা যোগপথ বা বিচারপথ দিয়া হউক এই চরম সত্যকে উপলব্ধি করিতে চান। যেমন করিয়া হউক একে পৌঁছিতে হইবে। বৃহদারণ্যক বলিতেছেন, দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি। যতক্ষণ দ্বিতীয় দেখিতেছ ততক্ষণ ভয় থাকিবে। দ্বিতীয়কে একের মধ্যে উপলব্ধি কর। চোখের দোষে একেকে দ্বিতীয় বলিয়া দেখিতেছ। বিবেক-বৈরাগ্য-জ্ঞান-ভক্তির অঞ্জন লাগাইয়া ঐ চোখের দোষ দূর কর। তখন দেখিবে দ্বিতীয় কিছু নাই, তৃতীয় কিছু নাই, চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম কিছু নাই। একৈবাহং জগত্যত্র। সেই সত্যস্বরূপিণী চিন্ময়ী আনন্দময়ী বিশ্বমাতা সর্বকালে, আবার কালেরও অতীতে একাকিনী দাঁড়াইয়া আছেন।

মা

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

[গান : কাফি—যৎ]

সুখের আশা ছেড়ে দিয়ে এসেছি মা তোমার কোলে।
ইহকালে পরকালে চাইব না সুখ কোনো কালে॥
সুখের নেশায় ঘুরে ঘুরে   পড়িনু দুখের পাথারে
সুখের সাথে দুঃখ ফিরে—   বিবেকরূপে দিলে বলে॥
সদানন্দময়ী তুমি   তোমারি তো ছেলে আমি
সদাই আমায় রাখ কোলে, আর যাব না তোমায় ফেলে॥

আবাহনী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

[গান : রামপ্রসাদী—লঘুগুরু ছন্দে]

এস জননি, প্রাণে।
জীবন সঁপি চরণে তব বন্দন জয়গানে॥
মন্থর যত ক্লান্তি ছায় ধূসর অভিযানে,
বিদলি' এস স্বর্ণকান্তি করুণার বিধানে।
আলো তব জ্বালো মা, ম্লান এ-বিতানে,
বন্ধন যত খণ্ডন কর'—প্রার্থি নিরভিমানে।
যুগযুগান্ত সুমধুর তব মূর্ছন শুনি কানে,
রেশ তার নির্ঝরি' কর' সার্থক সন্তানে।
পুণ্য তব প্রসাদে শিবদৃষ্টিদীপদানে
মায়া যত অন্তর ছল মায়া বলি' জানে।
আশা পথহারা যত বিষণ্ণতা আনে
যাচে তব শান্তি-অঙ্ক সুধার সন্ধানে।
বিশ্বভুবন সাধন তব বরিয়া নভপানে
ধায় জননি মনমোহিনি, শরণাগতি-তানে।

বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম

ডক্টর অমিয়কুমার মজুম

একটি বহুবিতর্কিত প্রশ্ন—বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক কি? এই ত্রয়ীর মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে বের করা আজকের দিনে অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য, যেহেতু বিজ্ঞানের সঙ্গে অপর দুটির অহি-নকুল-সম্বন্ধের কথা সুপ্রচলিত। প্রকৃত সম্পর্ক অনুসন্ধানের প্রচেষ্টায় অতীতকাল থেকেই মনীষীরা বিশেষ যত্নবান। তথাপি একথা অনস্বীকার্য, বর্তমান কালেও অনেক দার্শনিক বা ধর্মপ্রবক্তা আছেন যাঁরা বিজ্ঞান থেকে সহস্র যোজন দূরে থাকতে অভিলাষী এবং বিজ্ঞানকে দানব ছাড়া তাঁরা ভাবতে কুণ্ঠিত। তেমনি বিজ্ঞানীদের মধ্যেও অনেকে আছেন যাঁদের কাছে ধর্ম বা দর্শন অবাস্তব বিধায় পরিত্যাজ্য। অথচ এক সময়ে এমন অবস্থা ছিল যখন ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু এই প্রীতির সম্পর্ক স্থায়ী হয়নি। অনুদারতার মলিন পরিবেশে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তিনটি শাখা। একথা নিঃসন্দেহ যে, তিনটিই এক নয়, যেহেতু তিনেরই স্বতন্ত্র বক্তব্য থাকা যুক্তিসঙ্গত এবং তা আছে। কিন্তু যে-বিদ্বেষের অশুভ প্রচ্ছায়াতে এ বিরোধ স্নিগ্ধতার সীমা অতিক্রম ক'রে কলরব তুলেছে, তার মূলে আমাদের অনুভূতির সীমায়িত রেশ, আমাদের জ্ঞানের সীমিত বিস্তৃতি ও সত্যবোধ-সম্পর্কিত ন্যূনতম শিথিল ধারণা। তথাপি কি প্রাচ্যের, কি পাশ্চাত্যের বহু স্থিতপ্রজ্ঞ মনীষী এই বিরোধকে মনে করেছেন 'আপাত'। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন এই তিনের মধ্যেকার সন্দেহের উর্ণনাভ অজ্ঞানতাপ্রসূত।

বিজ্ঞানের চরম কর্তব্য সত্যের অনুসন্ধান। দর্শনের সার কথাও তাই। বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে প্রভেদের কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক টেলর[১] তাঁর এক গ্রন্থে বলেছেন, যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক বিজ্ঞান আর অনুসন্ধান চালাতে অপারগ তখনই মন ও দর্শন কাজ আরম্ভ করে। দর্শনের 'ডেটা' কতগুলি নির্দিষ্ট ঘটনা নয়, যা পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের সাহায্যে সংগ্রহ করা যায়।

দর্শন কি করে? বিজ্ঞান যেসব প্রকল্পকে ব্যবহার করে, দর্শন সেই-সব প্রকল্পকে পরীক্ষা করে, কিন্তু এই প্রকল্পসমূহ থেকে নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবনের আশায় নয় বা সুপ্রাচীন কোন ধারণাকে আধুনিকীকরণের জন্য নয়। তার কাজ হলো সেই-সব প্রকল্পের চরম বাস্তব অস্তিত্বের মূল্যায়ন করা। বিজ্ঞানকে বলা যেতে পারে 'বুদ্ধিমান অনুসন্ধিৎসা'। তার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে—তা হলো ঘটনাসমূহের মধ্যে ঐক্যের ছন্দ আবিষ্কার করা। কিন্তু তার সীমা নির্দিষ্ট। ঘটনাসমূহের ফলাফলের বৃহত্তর ইঙ্গিত সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসা পূর্বে বিজ্ঞানের ছিল না।

যাঁরা জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করেন, তাঁরা তাঁদের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সহজবোধ্য ঘটনা-সমূহকে আঁকড়ে রাখতে চেষ্টা করেন। বিজ্ঞান এই জগতের উপাদানসমূহের কথা জেনেছে এবং জানিয়েছে মানুষকে। বিজ্ঞান বলেছে, এই বিশাল পৃথিবী গঠিত হয়েছে পদার্থের সাহায্যে। অণু দিয়ে তৈরী হয়েছে পদার্থ। আবার

---

১ Prof A. E. Taylor : Elements of Metaphysics

পরমাণুর সমষ্টিতে জন্ম নিয়েছে অণু। এই পরমাণু আবার ইলেকট্রন, প্রোটন, পজিট্রন, নিউট্রন, মেসন ইত্যাদি অধিকতর ক্ষুদ্রাকৃতি কণিকার সমন্বয়ে গঠিত। বিজ্ঞান এসবের হদিস পেয়েছে। সে বলে, সমগ্র পৃথিবীতে এক শক্তির অধিষ্ঠান। বিজ্ঞানের ভাষায় তার নাম 'এনার্জি'। এর পরিমাপক হচ্ছে 'বল' (force)। বিজ্ঞান বলে পদার্থ ও শক্তির সহযোগিতায় বিশ্বসৃষ্টি সম্ভব।

দার্শনিকরা চান সমগ্র বিশ্বের ঘটনাবলীর প্যাটার্ন আবিষ্কৃত হোক, আর বিজ্ঞানীরা চান অচেতন প্রকৃতির ঘটনাবলীর রহস্য উন্মোচিত হোক। হেগেল্ বলেন, চিন্তা ও কল্পনার সাহায্যে ঘটনার অনুসন্ধান করা দর্শনের কাজ। এ প্রসঙ্গে একটি কথা অবশ্য উচ্চার্য, বিজ্ঞান অধুনা কেবলমাত্র অচেতন পৃথিবীর প্রকৃতির রহস্য জানতেই প্রয়াসী নয়, তার দৃষ্টি সুদূর-প্রসারিত। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অজ্ঞাত রহস্যের সন্ধানে সে ব্রতী।

যদিও দর্শন কার্য ও কারণের মধ্যে সেতু রচনা করে, তথাপি তা বিজ্ঞানের থেকে স্বতন্ত্র পর্যায়ের। পরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে বিজ্ঞান নির্ণয় করে কার্য ও কারণের সম্বন্ধ। ক্রাউথার[২] বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় বলেছেন, প্রতিবেশের উপরে আধিপত্য স্থাপনের জন্যেই বিজ্ঞানের উদ্ভব, তথাপি সমাজ ও বিজ্ঞানের বিবর্তনে পরস্পরের অনিবার্য প্রভাব অনস্বীকার্য। মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিজ্ঞান এবং এই প্রয়োজন মেটাতে পারলেই তার সার্থকতা। সমাজের প্রয়োজনেই বিজ্ঞান—একথা এক শ্রেণীর বিজ্ঞানী স্বীকার করেন না। এডিংটন, হোয়াইটহেড্, বিশপ অব্ বার্মিংহাম প্রভৃতি মনীষীরা মনে করেন, বিজ্ঞান বিশুদ্ধ মনন-শীলতার প্রকাশমাত্র। অধ্যাপক জে. ডি. বার্নাল তাঁর এক গ্রন্থে বলেছেন, ব্রহ্মাণ্ড, জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি-রহস্য প্রভৃতি বিষয়ের গবেষণা যদি বিজ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য না হতো, তাহলে আজ যাকে বিজ্ঞান বলি তার অস্তিত্ব থাকত না। তা হয়তো কোনদিনই উদ্ভূত হতো না। কেবল-মাত্র মানুষের পার্থিব প্রয়োজনের প্রেরণাতেই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ হয়েছে একথা সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া চলে না।

তাই আমরা বুঝতে পারছি যে, মানুষের অন্তরাত্মার দুটি স্বাভাবিক প্রেরণার ফলস্বরূপ গড়ে উঠেছে বিজ্ঞান। একারণেই বিজ্ঞানের ধারা দুটি—ব্যবহারিক ও দার্শনিক। প্রথমটির লক্ষ্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সুখ, সুবিধা, সুযোগ, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায় পরিপূর্ণ ক'রে তোলা। দ্বিতীয়টির লক্ষ্য এই বিশাল জগতের বৈচিত্র্য ও নানা জটিলতার মধ্যে সুশৃঙ্খলা ও সরল নিয়মের আবিষ্কার করা এবং তার ফলে সৃষ্টি-রহস্যের সমাধানে প্রবৃত্ত হওয়া। এক শ্রেণীর বিজ্ঞানী বলেন এইটিই হলো বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের দিকে বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হচ্ছে, তার ব্যবহারিক ধারাও তত প্রসারিত হচ্ছে। যেহেতু মানুষের যাবতীয় দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায় নিহিত রয়েছে সত্যের পথে ও প্রতিষ্ঠায়।

বিজ্ঞান, দর্শন এবং ধর্ম সকলেই সত্যের অন্বেষণে প্রবৃত্ত। সত্যের সংজ্ঞা নিয়ে নানা বিতর্ক চলেছে। আধুনিক বিজ্ঞানীরাও এতে যোগ দিয়েছেন। 'সৎ' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে 'সত্য'। সৎ+য. অর্থাৎ সৎ-এর প্রকাশ হলো সত্য। দার্শনিকরা বলেন শুধু যা আছে, তা-ই কেবলমাত্র সৎ এবং সত্য

২ J. G, Crowther: The Social Relation of Science

একথা বলা অনুচিত। এখন যা আছে, তা পরে থাকবে কিনা এবং অতীতে ছিল কিনা, তার নির্ভুল উত্তরের উপর নির্ভর করে সত্যাসত্যের নির্ধারণ। দার্শনিকেরা সত্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—পারমার্থিক, ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক।

এর থেকে স্বতই প্রশ্ন উঠবে, এমন কি কোন সত্য বস্তু থাকতে পারে যা শাশ্বত, যা সনাতন, যা সার্বভৌম। বিজ্ঞানের সত্য তা হতে পারে না। বিজ্ঞানের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় প্রত্যক্ষ বা যন্ত্রযোগে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর। এবং একথা অনস্বীকার্য যে, ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি দেশ ও কালের সীমানায় নির্দিষ্ট। যুগে যুগে বিজ্ঞানের সত্যের রূপ পরিবর্তিত হয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতির পরীক্ষা দ্বারা লব্ধ কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নতুন পরীক্ষার ফলে পরিত্যক্ত হয়েছে বা পরিবর্তিত হয়েছে এমন ঘটনা খুবই স্বাভাবিক। একারণেই বিজ্ঞানের জগতে 'চরম বা পরম সত্য' বলে কিছু নেই। বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্য আপেক্ষিক। আজ বিজ্ঞানীরা সামগ্রিক বা সনাতন চরম সত্যকে সন্ধান করতে তৎপর হচ্ছেন সত্য, তথাপি তাঁরা একথা স্বীকারে অকুণ্ঠিত যে, প্রচলিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পদ্ধতির সাহায্যে বা বিচার-প্রণালীতে পারমার্থিক সত্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের সত্য পরিবর্তনশীল। তাই বিনা প্রমাণে কেন, কোন কারণেই বিজ্ঞান কোন সত্যকে ধ্রুব সত্য বলে স্বীকার করতে রাজী নয়। অর্থাৎ বিজ্ঞানে 'পরম-সত্যের' স্থান নেই।

এই যুগে সব কিছুই বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যুক্তির সাহায্যে বিচার করে যখন কোন বিষয় আমরা গ্রহণযোগ্য মনে করি তখন তাকে 'সত্য' বলেই ভাবি। আধুনিককালে বিজ্ঞান আমাদের যাবতীয় চিন্তা, যুক্তির উপরে খবরদারি করছে। তার ফলে আমাদের মধ্যে এক বিশেষ প্রবণতা জেগেছে যে, কোন প্রাকৃতিক বা মানসিক ঘটনাবলীকে বিজ্ঞানের প্রচলিত সূত্র বা তত্ত্বের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা। এমন কি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাসমূহকেও বিজ্ঞানের সত্য দিয়ে বিচার করতে চেষ্টা করি। এর ফলে এমনটি হয়েছে যা বিজ্ঞান অনুমোদন করে না, আমরা সেগুলি হয়তো বিনা দ্বিধায় বর্জন করতে পারি। প্রতিদিনই বিজ্ঞান আমাদের পুরোনো চিন্তাধারার পরিবর্তন এনে নতুন অভ্যাসে রত হতে নির্দেশনামা জারি করছে। বিজ্ঞান আজ তার নিজের গৌরবে মহিমান্বিত, বিজয়ী, যেহেতু তার অবস্থিতি সত্যের সুদৃঢ় পর্বতের উপর। তার অঙ্গে সত্যের নানা বর্ণালোকে রঞ্জিত পরিচ্ছদ। তার আহার্য হলো সত্য, 'সত্য' তার ধ্রুব লক্ষ্য,—তার জীবন, তার আত্মা। যেখানেই সে থাক্ না কেন তার সঙ্গে থাকবে সত্যের আলোক যা দূর করে যুগযুগান্তের তমিস্রা। প্রকৃতির প্রায় প্রতিটি বিভাগে অভিযান চালিয়ে এখন সে ধর্মের বিশাল ও রহস্যময় প্রদেশের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছে।

যাঁরা ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন সমন্বয় দেখতে পান না, তাঁরা ধর্মকে উপেক্ষা করেন, যেহেতু তাঁদের মতে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত 'সত্যের' মতো কোন 'সত্য' ধর্মের অনুশাসনে নেই। তাঁরা বলেন, ধর্মের উদ্দেশ্য হলো সত্য অন্বেষণ করা এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করা। কিন্তু ধর্ম তা পারে না, কারণ—ধর্মপ্রবক্তাদের অনেকে বলেন এই বিশ্বকে এক বিশাল পুরুষ শূন্য থেকে সৃষ্টি

করেছেন। কাজেই ধর্মের সাহায্যে আমাদের লাভ কি হতে পারে? বিজ্ঞান দাবী করে, বাস্তব সত্তা একটিই এবং তা থেকে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। পদার্থ-বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, বৈচিত্র্যের মধ্যেই একত্ব বিরাজিত এবং এইটেই প্রাকৃতিক নিয়ম। ক্রমবিবর্তনের তত্ত্ব, প্রাকৃতিক শক্তির (natural force) অস্তিত্ব এবং বিভিন্ন 'শক্তি'র মধ্যে সম্বন্ধ পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে, প্রাকৃতিক বিভিন্ন শক্তিসমূহ এক চিরন্তন শক্তিপ্রবাহের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। বিজ্ঞান আমাদের বলে, একই প্রাণ থেকে সৃষ্ট হয়েছে বিশ্বপ্রকৃতি। হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন, 'বস্তু, গতি ও শক্তি বাস্তব নয়, তারা বাস্তবের সাঙ্কেতিক চিহ্নমাত্র।' যদি কোন ধর্ম বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান দিতে পারে তাহলে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে ঐক্য আসতে পারে, নচেৎ হবে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, বেদান্ত তা পারে। তিনি বলেন বেদান্তের কোন বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন নেই, যেহেতু বিজ্ঞান বেদান্তের পরিপন্থী নয়। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তত্ত্ব বেদান্তের সঙ্গে মেলে এবং যা ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হতে পারে তাও না মেলার কারণ নেই।

সার জন আর্থার টমসন[৩] বলেন, বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়ের মধ্যে প্রকৃত কোন বৈপরীত্য নেই। বিজ্ঞান হলো বর্ণনামূলক এবং কোন শেষ সিদ্ধান্তের কথা শোনায় না। ধর্ম রহস্যময় এবং ব্যাখ্যা করবার অপেক্ষা রাখে। তিনি বলেন বিজ্ঞান ধর্মের সিদ্ধান্তসমূহকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। কিন্তু স্বামীজী বলেন বেদান্ত হলো এমন এক ধর্মমত যার প্রতিটি কথা বিজ্ঞান-সম্মত। স্বামী বিবেকানন্দ জোর গলায় বলেন, বিংশশতকে এমন ধর্ম চাই যা বিজ্ঞানের সকল 'সত্যের' সঙ্গে সম্পূর্ণ মিতালিবদ্ধ। এমন ধর্ম চাই যা দর্শনের সঙ্গে একত্রীভূত, যা সত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের পরীক্ষিত বা আবিষ্কৃত সত্যের পরিপন্থী কোন কিছু থাকবে না তাতে। বেদান্তের ধর্ম তাই।

আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে শক্তিমান মানুষ নিজেকে মনে করেছে দুর্জয়। লোভ, মোহ, দ্বন্দ্ব, হানাহানিতে পৃথিবীর বাতাস কলুষিত। তাই বিজ্ঞান মানুষকে জ্ঞানের সার বস্তুটি দিচ্ছে কোথায়? সর্বত্র সমান দেখা, সকল বস্তুকে সমজ্ঞান করা, সকল ভূতে নিজেকে দেখতে পেলে মানুষ হিংসা ভুলে যায়। যেহেতু নিজের মতন সে আর কাউকে ভালবাসে না। গীতার এক বাণীতে আছে—

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি
পরাং গতিম্॥

মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত শান্তি ও মুক্তি-লাভের পথের নির্ভুল নির্দেশ পাই বেদান্ত ও গীতার বাণীতে। এই বাণী সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য ও অহিংসার সুমহান বাণী। তাহলে আমাদের করণীয় কি? বিজ্ঞানের জ্ঞানের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে অধ্যাত্মবিদ্যার উপলব্ধিকে। তাহলেই আজ পৃথিবীতে যেসব গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তাদের সমাধান সহজ হবে। মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে অভিশাপ দেবে না বিজ্ঞানকে। বিজ্ঞানের আলোকে ধর্মকে আমরা সুন্দরতর ও সর্বজনগ্রাহ্য রূপেই দেখতে পাব।

---

৩ John Arthur Thomson : Introduction to Science

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সাময়িক পত্রিকা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

স্বামীজীর জোয়াল একজন সত্যিই ঘাড়ে নিয়েছিলেন, উদ্বোধনের ক্ষেত্রে, তাঁর নামোল্লেখ আগেই করেছি, স্বামীজীর পত্রেও এ ব্যাপারে বারবার তাঁর উল্লেখ আছে—তিনি প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত। তাঁর ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু তথ্য দিয়ে এই দীর্ঘ অধ্যায় শেষ করব। এক্ষেত্রে আমরা কিছু স্মৃতিকথা সরাসরি উদ্ধৃত করতে চাই। প্রত্যক্ষদর্শীর রচনার মধ্যে এমন হৃদয়স্পর্শ থাকে যা সার-সংক্ষেপ করলে বহুলাংশে নষ্ট হয়ে যায়। স্মৃতি-কথাগুলি থেকে বিবেকানন্দ ও ত্রিগুণাতীত, নেতা ও বিশ্বস্ত কর্মী উভয়েরই ছবি পাই। নেতার প্রেরণা, ইচ্ছাশক্তির প্রবলতা, প্রতিহত ইচ্ছার ক্ষুব্ধ গর্জন, তারপরেই অনন্ত ভাল-বাসার প্লাবন; অপরদিকে নেতার প্রতি কর্মীর (যে-কর্মী কিন্তু গুরুভাই, তার কম নন) আনু-গত্য ও অব্যাহত অনুরাগ এবং শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও সংগ্রাম। সারদাপ্রসন্ন কী ভালবাসাই না বাসতেন নরেন্দ্রনাথকে![১১] অভিজাত ঘরের ছেলে, পড়াশোনায় ভাল, কিন্তু খেয়ালী, মুষড়ে পড়েন সহজে, ঝাঁপিয়েও পড়েন তেমনি স্বচ্ছন্দে, ছেলেধরা মাস্টার মহাশয় (শ্রীম) তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজির করেছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ছেলেধরার কাছে—সারদা তার ফলে রামকৃষ্ণ-শিষ্য হয়েছিলেন। ঘুরে বেড়ানো বাতিক ছিল, সন্ন্যাসী হয়ে আরও বাধাবন্ধহারা, দুরতিক্রম্য তিব্বত, মানস-সরোবর পর্যন্ত পরিব্রজ্যা থেকে বাদ পড়েনি, (তাঁর ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন ইংরেজীতে ইণ্ডিয়ান মিরারে), বেপরোয়া, খাওয়ার ব্যাপারেও, প্রচুর খেতে পারতেন, প্রায় না খেয়েও থাকতে পারতেন, বিচিত্র সব শখ ছিল, 'কাকচরিত-শিক্ষা' পর্যন্ত, ব্যস্ত থাকতেন সব সময়ে, হয় কাজে, না হয় পড়াশোনায়, না হয় ধ্যানে জপে। তিনি বি. এ. পর্যন্ত পড়েছিলেন, ঘোর বৈরাগ্যের জন্য পরীক্ষা দিয়ে ওঠা হয়নি, নরেন্দ্রনাথ অন্যদিকে বি. এ. পাসের বেশী করেননি, তাহলেও নরেন্দ্রের কাছ থেকেই সব সময়ে শিখতেন—নরেন্দ্রনাথ সারদাপ্রসন্নকে

১১ এই ভালবাসার এক স্নিগ্ধ মহান ছবি এঁকেছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত:

"নরেন্দ্রনাথের পিতা একখানি মলিদা চাদর ব্যবহার করিতেন। নরেন্দ্রনাথও পরে সেই মলিদা চাদরখানি ব্যবহার করিতেন। নরেন্দ্রনাথ গুজরাটে অবস্থানকালে নিজের চিহ্নস্বরূপ সেই জীর্ণ চাদরখানি সারদা মহারাজকে পরাইয়া দিলেন। তিনি সেই জীর্ণ চাদরখানি অমূল্য মনে করিয়া আলমবাজারে লইয়া আসিলেন।...নরেন্দ্রনাথের প্রদত্ত চিহ্নস্বরূপ সেই জীর্ণ মলিদাখানি কখনো মাথায় দিয়া, কখন-বা বগলে লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেন। একদিন আলমবাজার মঠের ভিতর দিককার পূর্বদিকের খোলা ছাতে ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাঁড়ার ঘরের সম্মুখে সকলে সমবেত হইয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। শশী মহারাজ কৌতুক করিয়া বলিলেন, 'অরে শাদা, নরেন তোকে দেয় নাই; আমাকে সবচেয়ে ভালবাসে তাই তোকে দিয়ে আমাকে দিয়েছে।' নিরঞ্জন মহারাজ হাস্য করিতে করিতে বলিলেন, 'দুঃ শালা, তোকে দেবে কেন রে? তুই শালা বেঁটে, তিন তাল মোহনভোগ খাস, এ কি তোর উপযুক্ত? এ তোকে দেয়নি, শশীকেও দেয়নি, নরেন আমাকে কত ভালবাসে সেইজন্য তোর হাত দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।' এইরূপে সকলে বালকের মত নৃত্য ও আনন্দ করিতে লাগিলেন।"

('ঘটনাবলী', ২য়)

কিভাবে পড়াতেন, তার একটি ছবি দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত :

"নরেন্দ্রনাথের যখন পাথুরীর অসুখ হয় তখন ৭নং রামতনু বসুর গলির বাড়িতে সারদা মহারাজ শুশ্রূষার জন্য আসিয়া থাকিতেন। তিনি 'ক্যাসেলে'র মুদ্রিত ছবিওয়ালা শেক্সপীয়ারের গ্রন্থগুলি পড়িয়া নরেন্দ্রনাথকে শুনাইতেন এবং নরেন্দ্রনাথ একটু সুস্থবোধ করিলে সারদা মহারাজকে শেক্সপীয়ারের নানা গ্রন্থ ও কাব্যের বিষয় বুঝাইয়া দিতেন। বালক সারদা মহারাজ সম্মুখে বইখানি খুলিয়া রাখিয়া একমনে নরেন্দ্রনাথের নিকট শেক্সপীয়ারের কাব্যের সহিত সংস্কৃত কাব্যের কোথায় মিল ও বৈষম্য আছে সেই সমস্ত স্থির হইয়া বসিয়া শুনিতেন। শুনিতে শুনিতে সারদা মহারাজের মুখে ধ্যানের ভাব ফুটিয়া উঠিত। তখন তিনি আর পড়িতে পারিতেন না, বইখানি বন্ধ করিয়া স্থির মনে জপ করিতেন। তিনি যখন বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, তখনও ঠিক এই রকম একমন-প্রাণ হইয়া পড়িতেন। বৈকাল হইল, সূর্য অস্ত গেল, কিন্তু সারদা মহারাজের কোনো হুঁস থাকিত না। অন্ধকার হইয়া আসিলে আলো জ্বালিয়া আবার পড়িতে বসিতেন, এবং গভীর রাত্রি পর্যন্ত পাঠ করিতেন। এইরূপে তিনি সংস্কৃত ও ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র বিশেষরূপে শিখিয়াছিলেন।" ('ঘটনাবলী', ২য়)

পরবর্তী কয়েক বৎসর ছেড়ে একেবারে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের কথা। উদ্বোধন প্রেস কেনা হয়েছে। সারদা মহারাজ 'ওয়ার্ক' করতে বড় ব্যস্ত, প্রেস কেনার পরে ওয়ার্কের উপাদান পেয়েছেন, ফল কি হয়েছে, সাক্ষাৎদর্শী শচীন্দ্রনাথ বসু সন্ত পত্রযোগে তা জানিয়েছিলেন। একেবারে জলজলে জীবন্ত ছবিখানি, প্রায় সবটাই উদ্ধৃত করছি :

"গত সোমবার (৬ নভেম্বর, ১৮৯৮)··· স্বামীজী ও আমি (বেলুড় মঠ থেকে) বাগবাজারে আসিলাম।···হলঘরে (বলরাম বাবুর বাড়ির) বসিলেন, আমরাও বসিলাম—কেবল আমি ও রাখাল মহারাজ। কিছু পরে শরৎ চক্রবর্তী আসিল। নানাবিধ কথা হইতেছে, এমন সময় সারদা মহারাজ টলিতে টলিতে আসিয়া হাজির—জ্বর হইয়াছে।

"স্বামীজী যখন আলমোড়াতে তখন হইতে ত্রিগুণাতীত মহারাজ তাঁহাকে বারবার চিঠি লেখেন—ভাই, আমি work করিব—তুমি আমাকে ২,০০০৲ টাকা দাও, আমি প্রেস করিব, কাজ চালাইব। স্বামীজী তাঁহাকে ১,০০০৲ টাকা দিয়াছেন, বাকি ১,০০০৲ টাকা ধার করিয়াছেন। মাসে ১০৲ টাকা সুদ লাগে। ১,৫০০ টাকায় দুটি বেশ ভাল প্রেস কিনিয়াছেন, কিন্তু কিনিলে কি হইবে, কোন কাজ নাই, ঠায় বসিয়া আছেন; বড়বাজারের এক গুদামে ৮৲ টাকা ভাড়া দিয়া রাখা হইয়াছে। সুধীরের 'রাজযোগ' বইখানি (স্বামীজীর বইয়ের অনুবাদ) ছাপাইবার সঙ্কল্প হইয়াছে, কিন্তু পয়সা নাই, কাগজ আসিবে কোথা হইতে?···আমি একবার ত্রিগুণাতীত মহারাজকে বলিয়াছিলাম, 'মহারাজ, ও কাজ (প্রেসের কাজ) বড় nefarious (হীন), আপনার কর্ম নয়। অপর লোকের করা উচিত।' তখন ভারী spirit; বলিলেন, 'না, any work is sacred. আমি কাজ পেলে খুশী; কাজ করতে আমি নারাজ নই।' আমি চুপ করিয়া গেলাম। এখন রোজ ৬টার সময়ে প্রেসে যান, সেইখানেই খাওয়া-দাওয়া হয়, আর আসেন রাত ৫টার পর। রোজ সন্ধ্যার পর জ্বর হয়।

"স্বামীজী ও রাখাল মহারাজ একসঙ্গে ত্রিগুণাতীতজীকে অভ্যর্থনা করিলেন,—'কি বাবাজি, এসো, আজকের খবর কি? প্রেসের কতদূর? বল বল! বস, বস!'

"ত্রিগুণাতীত (নাকি সুরে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে)—'অঁার ভাই, অঁার পাঁরিনি—ওসব কাঁজ কি অঁামাদের পোঁষায় ভাই?··· সারাদিন তীর্থির কাকের মতন বসে থাকতে হয়; না আছে একটা কাজ, না আছে কিছু। একটা job work পাওয়া গেছে, তাতে কি হবে? ॥০ আনা বড় জোর পাওয়া যাবে। আমি প্রেস বিক্রী করে ফেলার চেষ্টা করছি।'

"স্বামীজী—'বলিস কি রে? এরই মধ্যে তোর সব শখ মিটে গেল? আর দিন কতক দেখ্, তবে ছাড়বি। এই দিকে প্রেসটা নিয়ে আয় না, কুমারটুলীর কাছে! আমরা সকলে দেখতে পেতুম।'

"ত্রিগুণাতীত—'না ভাই, সেইখানেই থাক। দিনেক দুদিন দেখা যাক। ১৫৲।২০৲ টাকা লোকসান করে বেচে দেব।'

"স্বামীজী—'ও রাখাল, বলে কি? ওর যে খুব ট্রায়াল হল দেখছি। তোর এরই মধ্যে সব গুঁড়িয়ে গেল! patience রইল না!'

"এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর চক্ষু ধক্ ধক্ করিয়া জলিয়া উঠিল। তিনি সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন ও গর্জিয়া বলিলেন—'বলিস কি রে? দে, প্রেস বিক্রী করে দে। আমার টাকার ঢের দরকার আছে। এই বেলা বিক্রী কর—১০০৲।১৫০৲ টাকা লোকসান করেও বেচে ফেল্।···কাজের নামটি হলেই এদের সব বৈরাগ্যি উপস্থিত হয়—'অঁার ভাঁই পাঁরি নি—ওঁসব কাঁজ কি অঁামাদের?' কেবল খেয়ে খেয়ে ভুঁড়ি উপুড় করে শুয়ে থাকতে পারে। যাদের কোন কাজে patience নেই তারা কি মানুষ?···তুই তিন দিন এখনো প্রেস করিসনি। যাঃ যাঃ তোকে ঢের experiment হয়েছে—তোর বড় আস্থা হয়েছিল। কে তোকে প্রেস করতে সেধেছিল? তুই-ই তো আমাকে লিখে লিখে টাকা আনালি। নিয়ে আয় না তুই তোর প্রেস এখানে, সেখানে রাখবার তোর মানে কি? আর এই তোর জর জর হচ্ছে, তুই শরীরটা দেখছিস্ না?'

"ত্রিগুণাতীত—'৮৲ টাকা ভাড়া দিতে হবে, এক মাসের এগ্রিমেণ্ট হয়েছে।'

"স্বামীজী—'দূর দূর, ছি ছি! এ বলে কি? এসব লোক কি কোন কাজ করতে পারে? ৮৲ টাকার জন্য পড়ে আছিস? তোদের এ ছোটলোকপনা কিছুতেই যাবে না। তুই আর হরমোহনটা সমান। তোদের কখনো কোনো business হবে না। সেও এক পয়সার আলু কিনতে পঞ্চাশ দোকান ঘুরবে আর ঠকে মরবে।···দে প্রেস আমাদের মঠে পৌঁছে—আমাদেরও তো একটা প্রেস চাই। দেখ্, কত লেকচার দিয়েছি, কত লিখেছি, তার অর্ধেকও ছাপা হল না। তুই আমাকে work দেখাস্? রাখাল, মনে কর, সে আজ কত দিনের কথা—আজ সে ১২।১৩ বৎসরের কথা—সেই গঙ্গার ধারে বসে আমরা কয়জনে তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে কাঁদছি। আমি বললাম, 'তাঁর অস্থি গঙ্গার ধারে রাখা উচিত, গঙ্গার ধারেই মন্দির হওয়া উচিত, কারণ তিনি গঙ্গার ধার ভালবাসতেন।···আমার শুনল না। তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে কাঁকুড়গাছির বাগানেতে রাখল। আমার প্রাণে বড় ব্যথা বেজেছিল। রাখাল, মনে কর, আমি কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। আজ ১২ বছর bull-dog-এর মতন সেই idea নিয়ে তামাম

দুনিয়া ঘুরেছি, একদিনও ঘুমোইনি। আজ দেখ, তা সফল করলাম। সেই idea আমাকে একদিনও ছাড়েনি।···এ জাতের কি আর উন্নতি আছে?'

"ত্রিগুণাতীত—'ভাই, তোমার brainটি কেমন! তোমার brainটি আমায় দিতে পারো?'

"এই কথায় খুব হাসি পড়িয়া গেল, কারণ বলিবার তারিফ ছিল। পরে ত্রিগুণাতীত বলিলেন, এ জ্বরের উপর সকালে একটু সাবু খাইয়াছিলেন; এ বেলা এক সের রাবড়ি, আধ সের কচুরী ও তদুপযুক্ত তরকারী আহার করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া স্বামীজী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—'শালা! তোর stomachটা দে দেখি—দুনিয়াটার চেহারা একেবারে বদলে দি। লাহোরে সুরজলাল বলেছিল, 'স্বামীজী, তোমায় নানকের brain আর গুরুগোবিন্দের heart এসে গিয়েছে—কেবল জগমোহনের (খেতড়ির দেওয়ান) মত পেটটি চাই।' "[১২] (উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৫৯)।

নেতার কাছে বন্ধু ও অনুগত সহকর্মীর চেহারা ঐরকম। বিবেকানন্দের কাছে সকলে উপনীত অগ্নি আহরণের জন্য। তারপরে তাঁরা কী করতেন—তাঁদের একজন ত্রিগুণাতীত কী করেছেন—তার কিছু বিবরণ দিয়েছেন কুমুদবন্ধু সেন তাঁর স্মৃতিকথায়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে (উদ্বোধন) প্রেসের প্রতিষ্ঠা, উদ্বোধন-পত্রিকা বেরুল ১৮৯৯-এর জানুয়ারী মাসে। সেই দিনটি এবং পরবর্তী দিনগুলির কথা কুমুদবন্ধু লিখেছেন:

"উদ্বোধন প্রকাশের দিন এখনো স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। কি অদম্য উৎসাহ, কি মহোচ্চ আদর্শ, কি বৈদ্যুতিক প্রেরণা এবং কি অনাবিল আনন্দ কতিপয় শিক্ষিত বাঙালী যুবকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল। স্বামীজী-লিখিত প্রস্তাবনা পাঠ করিয়া তাঁহাদের নয়ন-সম্মুখে বংলা তথা ভারতের এক ভাবী সমুজ্জ্বল ছবি উদিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র পাক্ষিক পত্রিকা, সামান্য পুঁজি, পরগৃহে অফিস, ও ছোট ছাপাখানা—তবুও ইহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনায় প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল।···আজ মনে পড়ে উদ্বোধনের সর্বপ্রথম সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের কথা। তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাতা বলিলাম, কারণ স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে, উপদেশে এবং সহায়তায় তিনি কঠোর পরিশ্রম সহকারে 'উদ্বোধন প্রেস' এবং 'উদ্বোধন পত্রিকা'র সম্পাদনার গুরু দায়িত্বভার একাকী বহন করিয়াছিলেন। কঠোর তপস্যাপূত জীবনে অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বামীজীর পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছাকে তিনি কার্যক্ষেত্রে আকার দিয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দেখিয়াছি—শীত বর্ষায় কতদিন তিনি কখনো অনাহারে, অর্ধাহারে প্রেস ও পত্রিকার কার্য দেখিতেছেন। শুধু পরিদর্শকভাবে দেখা-শুনা নহে, আজ কম্পোজিটর অনুপস্থিত, তাঁহাকে নিজে সন্ধান

১২ ত্রিগুণাতীতের অধিক আহার রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে সবিস্ময় কৌতুকের বিষয় ছিল। মহেন্দ্রনাথ দত্ত একটি মজার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। একদিন বাবুরাম মহারাজের বাড়িতে সারদা মহারাজ ও আরও-দুজনের নিমন্ত্রণ। কার্য-গতিকে সারদা মহারাজ ছাড়া কেউ হাজির হতে পারেননি। তিন জনের রান্না হয়েছিল। পাছে রুটি তরকারি নষ্ট হয়, সারদা মহারাজ একাই তিনজনের খাবার শেষ করলেন। বাবুরাম মহারাজের মা কাণ্ড দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। বৃদ্ধার সারারাত্রি উদ্বেগে গেল। না জানি কি অসুখ বাধে! পরদিন সকালে সারদা মহারাজকে সুস্থ দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "সারদা কি খায়রে! ও অনেক পাহাড়-পর্বত ঘুরে বেড়িয়েছে ও অনেক 'মোন্তর' শিখেছে, তাই উড়ো মোন্তরে উড়িয়ে দেয়, তা না হলে মানুষ কি অত খেতে পারে!"

ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ক বাঙ্গালা পাক্ষিক-পত্র ও সমালোচন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা, ডাক মাশুল সমেত। কলিকাতা, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কম্বুলেটোলা, নং ১৪ রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, উদ্বোধন-প্রেস হইতে স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। "উদ্বোধনের" প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। **। এই প্রেসে পুস্তক, চেক, বিল প্রভৃতি নানাপ্রকার ছাপা কার্য্য সুলভ মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সু-সম্পন্ন করা হয়। **।



বাঙ্গালা পাক্ষিক-পত্র।

১ম বর্ষ। ২য় সংখ্যা। ১৫ই মাঘ। ১৩০৫ সাল।

"তত্ত্বমসি, শ্বেতকেতো!"

উদ্বোধন

"তত্ত্বমসি, শ্বেতকেতো!"

স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি লেখক।

স্বামী ত্রিগুণাতীত—সম্পাদক।

সূচী।

—o—

'উদ্বোধন' পত্রিকার ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যার প্রচ্ছদপট

THE PRABUDDHA BHARATA OR AWAKENED INDIA

Table of Contents

VOL. I. SEPTEMBER 1896. [No. 3.

‘প্রবুদ্ধ ভারত’ পত্রিকার ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যার প্রচ্ছদপট

করিয়া নূতন লোক সংগ্রহ করিতে হইতেছে, কাল প্রেসম্যান অসুস্থ, কোথায় প্রেসম্যান পাওয়া যায়, তাহার সন্ধানে নানা স্থানে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কোথায় সস্তায় প্রেসের কোন্ উপকরণ পাওয়া যায়, সেই তথ্য লইবার জন্য কখনও ছুটাছুটি করিতেছেন, আবার কখনও কখনও প্রেসের লোকজনের কাজে সাহায্য করিতেছেন। ইহা ছাড়া তাঁহাকে প্রবন্ধ সংগ্রহ এবং প্রবন্ধ রচনা করিতেও হইত। ঠিক সময়ে পত্রিকা-প্রকাশ না হইলে স্বামীজীর নিকট তিরস্কৃত হইতেন। ইহা ছাড়া ছাপাখানার কাহারও ব্যায়রাম হইলে তাহার চিকিৎসা ও পথ্যের আয়োজন তাঁহাকেই করিতে হইত। নানাদিকে এই সব কঠোর পরিশ্রমেও তাঁহার মুখে হাসি লাগিয়া থাকিত - ক্লান্তির কোনো কালিমা দেখা যাইত না। বেশীর ভাগ কম্পোজিটর ও প্রেসম্যান বস্তীতে বাস করিত। তিনি বিনা সংকোচে বস্তীর মধ্যে যাইয়া তাহাদের খোঁজ করিতেন। কত দিন দেখিয়াছি—শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য ও ভক্ত স্বর্গীয় মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয়ের বাড়িতে অপরাহ্ণকালে তৃষ্ণার্ত হইয়া তিনি জলপান করিতেছেন এবং তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি তাঁহার তখনও স্নানাহার হয় নাই। মণীন্দ্রকৃষ্ণ মহাকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দৌহিত্র এবং তাঁহার দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকরের' সম্পাদনা তিনি নিজেই করিতেন। তাঁহাদের 'প্রভাকর প্রেস' নামক একটি প্রেস ছিল, সুতরাং সন্ধান লইতে সেখানে অনেক সময়ে তিনি যাইতেন। এদিকে পত্রিকায় কোন-প্রকার ভ্রম-প্রমাদ বা প্রুফ দেখিতে ভুল-ত্রুটি থাকিলে কিংবা অশুদ্ধ শব্দ বা ভাবের প্রয়োগ করিলে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে বিশেষভাবে তিরস্কার সহ্য করিতে হইত। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সেদিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। এক-দিন এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। অধ্যাপক মোক্ষমূলর ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীস্বামীজীর লিখিত একটি প্রবন্ধ তখন উদ্বোধনে সদ্য প্রকাশিত হইয়াছিল শ্রীরাম-কৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে স্বামী ত্রিগুণাতীত বেলুড় মঠে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দেখিয়াই উদ্বোধনে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের ভ্রম-প্রমাদের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার লাঞ্ছনার সীমা রাখিলেন না। স্বামী ত্রিগুণাতীত বলিলেন, 'কি রকম মুর্খ নিয়ে কাজ করতে হয় তা তো বুঝতে চাও না!' স্বামীজী বলিলেন, 'ও সব কথা রেখে দে। তোরা যখন কাজ হাতে নিয়েছিস তখন তাতে গলদ থাকবে কেন? তাদের মানুষ করবার কি চেষ্টা করেছিস? এদেশের লোকই কেবল দোষ ঢাকবার জন্য ওজরের উপর ওজর তোলে। ওদেশে কম্পোজিটররাও বিদ্বান নয়। যারা ম্যানেজার, যারা কাজের ভার গ্রহণ করে, তারা কাজটি নিখুঁত করবার চেষ্টা করে। যতক্ষণ নির্ভুল না হয় ততক্ষণ তারা নাছোড়বান্দা। এদেশে দেখি ছাপা হলেই হল, তাতে ভুল-ত্রুটি থাকে থাকুক। একটি শব্দের এদিক-ওদিক হলে লেখার ভাব বা অর্থ একেবারে উল্টে যায়। কত সাবধানে প্রুফ দেখতে হয়! তোরা কাগজে যদি ভুল-ভ্রান্তি ছাপবি, তবে উন্নতিটা কি হল বল্?' স্বামী ত্রিগুণাতীত নিরুত্তর রহিলেন। প্রেস পত্রিকা, ত্রুটির জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীতকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইতেছে- বিশেষ, কম্পোজিটর প্রভৃতির সন্ধানে তাঁহাকে বস্তীতে বস্তীতে ঘুরিতে হইতেছে শুনিয়া স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দকে প্রেসটি বিক্রয় করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ও জিদ্ করিলেন। অবশেষে প্রেস বিক্রয় করা হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

তখন পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মনোনিবেশ করিলেন। কখনও কখনও তিনি উদ্বোধনের জন্য বাগবাজার পল্লীর যুবকদের সাহায্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন।" ('উদ্বোধনের জয়যাত্রা'—উদ্বোধন সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৫৪)।

সামনে যাঁর লাঞ্ছনা করছেন, তাঁকে শ্রদ্ধা করছেন একই সঙ্গে, অন্তরালে প্রশংসা ঢেলে দিচ্ছেন—স্বামীজী এমনই করতেন। তিনি জানতেন, ত্রিগুণাতীত কী করছেন! মুগ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন—ঠাকুরের সন্তানের পক্ষেই এ জিনিস করা সম্ভব। জগদ্ধিতায় এঁদের দেহ-ধারণ।[১৩]

'উদ্বোধন' কী, সেই কথাটাই সবশেষে স্মরণ করতে চাই। উদ্বোধন কি পত্রিকা মাত্র? কদাপি নয়। উদ্বোধন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের, এবং ভারতীয় সংস্কৃতির বাণী-শরীর। তাই হোক—স্বামীজী অন্তত: তাই চেয়েছিলেন। স্বামীজীর ইচ্ছানুরূপ সাফল্য নিশ্চয় হয়নি। কিন্তু স্বামীজীর ইচ্ছা অমোঘ, এই বিশ্বাস আমরা রাখতে চাই। স্বামী সারদানন্দ উদ্বোধনের পঞ্চম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (১ মাঘ, ১৩০৯) উদ্বোধনের স্বরূপ নির্ণয় করেছিলেন : "শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবোধিত সত্য বা ব্রহ্মশক্তি বীরাগ্রণী শ্রীবিবেকানন্দ-হৃদয়নিহিত রজঃ বা ক্ষত্রশক্তির সহিত মিলিত হইয়া পরম কল্যাণের নিমিত্ত ইহাকে জাগরিত করিয়াছে। সেইজন্য আপাত শিশু হইলেও ইহা প্রবীণ, স্বল্পবয়স্ক হইলেও অমিতবলশালী, এবং ক্ষুদ্র হইলেও ভারতের একাংশের এবং কালে সমগ্র ভারতের কল্যাণসাধনে বদ্ধপরিকর।"

অবিশ্বাস্য বৃহৎ আশা। কিন্তু সে আশা অন্য কারো নয়, স্বামী সারদানন্দের তপস্যা-সংস্কৃত চিত্তের। স্বামী বিবেকানন্দের আশা আরও বৃহৎ,—অন্ততঃ অতুলনীয় বৃহৎ ও গম্ভীর ভাষায় তাঁর আশা প্রকাশিত হয়েছিল—উদ্বোধনের প্রস্তাবনায় যা পেয়েছি। "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।"—সঘন কণ্ঠে স্বামীজী বলেছিলেন। সে ভারতবর্ষ শুধুই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হবে না, নূতনের উদ্বোধন-ভূমিও হবে। তার জন্য—"চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা ; চাই—সর্বদা-পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখপ্রসারিত দৃষ্টি ; আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।" আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ রজোগুণ চান—কি বিচিত্র বিপরীত আকাঙ্ক্ষা! বিবেকানন্দ হাহাকার করে উঠলেন, সত্ত্বগুণ—সত্ত্বগুণ কোথায়?—"দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণ-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল! যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে ; যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজ অকর্মণ্যতার উপর

১৩ জগতের হিতকর্মে স্বামী ত্রিগুণাতীতের ক্লান্তি ছিল না। পত্রিকার দ্বারা ভাবপ্রচারের ভাবটি তাঁর মাথায় গেঁথে ছিল। আমেরিকায় প্রচারকার্যে গিয়ে তিনি কেবল সানফ্রানসিসকোর হিন্দুমন্দিরই স্থাপন করেননি, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে *Voice of Freedom* নামে একটি মাসিক পত্রিকাও বের করেছিলেন। *The Disciples of Ramakrishna* গ্রন্থে পত্রিকাটির বিষয়ে পাই :

"The magazine ever and always held constant to the high ideals of truths of the Vedanta philosophy and the varieties of materials published soon attracted a wide circle of readers. Soon the *Voice of Freedom* was an established success with a growing list of interested friends and subscribers. The magazine continued for seven years, after which period it was stopped to the disappointment of many Vedanta friends."

নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তোলে; যেথায় নিজ সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ; বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিত-চর্বণে, এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে—সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই ?"

"অতএব, সত্ত্বগুণ এখনও বহুদূর";—স্বামীজী বললেন,—তমোগুণকে বিতাড়িত করতে প্রয়োজন রজোগুণের, ভারতে যার একান্ত অভাব। পাশ্চাত্যে অপরপক্ষে রজোগুণের পূর্ণ প্রকোপ। ভারত যদি রজোগুণের দ্বারা উদ্দীপিত করতে পারে নিজেকে, তাহলে তমোগুণ পরিপ্লুত হয়ে সত্ত্বগুণ নির্মল আলোকে পুনঃপ্রকাশিত হবে। সেই সত্ত্বকে রজোগুণী পাশ্চাত্যের বড় প্রয়োজন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে গুণের বিনিময় না হলে পৃথিবীর কল্যাণ নেই। "এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধনে'র জীবনোদ্দেশ্য।"

ভারতের জন্য উদ্বোধন বিশেষভাবে কি করবে? স্বামীজী বললেন, ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখবে, যাতে সকলে পিতৃধন দেখতে ও জানতে পারে। তারপর? বিবেকানন্দ তারপর যা লিখেছিলেন, সে রচনা একমাত্র তাঁরই, যাকে প্রাণবাণী না করলে কোনো 'উদ্বোধন'ই সম্ভব নয়:

"নির্ভীক হইয়া সর্ব দ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্যকিরণ। যাহা দুর্বল, দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল, তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান, বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর; তাহার নাশ কে করে?"

(ক্রমশঃ)

'মাকে ভালবাসতে হলে'

সেখ সদরউদ্দীন

মাকে ভালো বাসতে হলে
ভাইকে ভালো বাসরে ভাই,
ভাইকে ভালো বাসলে তবে
মায়ের কোলে পাবি ঠাঁই।
ভাইকে যদি করিস ঘৃণা
বসাস ছুরি বক্ষে তার,
ভাবিস কি তুই তাতে ওরে
তুষ্ট হবে মনটি মার?
ভায়ের বুকের আঘাতখানি
মায়ের বুকে দ্বিগুণ বাজে,
মায়ের চরণ শরণ করে
মাগবি কৃপা কোন্ সে লাজে?

মায়ের পূজা করার আগে
ভাইকে রে তুই বক্ষে টান,
দ্বন্দ্ব-ভেদের বিন্ধ্যাচলে
ভাঙতে রে তুই আঘাত হান!
ভায়ের কণ্ঠে সুর মিলিয়ে
মৈত্রী প্রেমের গানটি ধর—
দেখবি তবে মা-জননী
আলো করে আছেন ঘর!

উপনিষদে 'শক্তিবাদ'

ডক্টর রমা চৌধুরী

"শক্তিবাদ" ভারতীয় দর্শনের একটী মূলীভূত তত্ত্ব। ভারতীয় দর্শনের কেন্দ্রীভূত সত্য হলেন পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর, অথবা পরমদেবতা। তাঁকে চারটী বিভিন্ন দিক্ থেকে দেখা যায়—সাংসারিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক। এরূপে, সাংসারিক দিক্ থেকে, তিনি হলেন এই বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি লয়কর্তা। উচ্চতর নৈতিক দিক্ থেকে, তিনি কেবল এই দৃশ্যমান জড়-জগতের কারণ নন, সেই সঙ্গে ন্যায়-নীতি-স্থাপক, এবং উচ্চতর বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, স্বাধীনেচ্ছা-শক্তিমান জীবগণের পথপ্রদর্শক ও সহায়ক। পুনরায়, আরো উচ্চতর আধ্যাত্মিক দিক্ থেকে তিনি কেবল কঠোর ন্যায়পরায়ণ বিচারকমাত্রই নন, সেই সঙ্গে সকলের পরমপ্রিয়, চিরোপাস্য দেবতা। পরিশেষে, উচ্চতম দার্শনিক দিক্ থেকে তিনি সকলের আত্মা, স্বরূপ। অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই পরমেশ্বর ও জীবজগতের মধ্যে ভেদ আছে। যেমন, প্রথম ক্ষেত্রে, স্রষ্টা কারণ ও সৃষ্ট কার্য সম্পূর্ণরূপে এক ও অভিন্ন হতে পারে না। দ্বিতীয়, তৃতীয় ক্ষেত্রেও, যথাক্রমে শাসক ও শাসিত, উপাস্য ও উপাসক নিশ্চয় পরস্পর ভিন্ন। কেবল চতুর্থ ক্ষেত্রে,—ব্রহ্ম ও জীব সম্পূর্ণরূপেই এক ও অভিন্ন, আত্মার দিক্ থেকে।

এরূপে, প্রথম তিনটী মতবাদ হল ভারতের সুবিখ্যাত "একেশ্বরবাদ ও ত্রিতত্ত্ববাদ", যে মতানুসারে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নিশ্চয়ই একজনই কেবল, কিন্তু তত্ত্ব একটীমাত্র নয়, তিনটী—ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, জীব ও জগৎ। শেষ মতবাদটী ভারতের সুপ্রসিদ্ধ একাত্মবাদ বা এক-তত্ত্ববাদ, যে মতানুসারে, ব্রহ্ম কেবল এক ব্রহ্ম নন, এক তত্ত্বও সমভাবে।

একতত্ত্ববাদ ও ত্রিতত্ত্ববাদের মধ্যে প্রধান প্রভেদ হল শক্তিবাদ-সম্বন্ধীয়। একতত্ত্ববাদ মতে, এক তত্ত্ব ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়—তাঁর কেবলমাত্র স্বরূপই আছে, গুণ ও শক্তি কিছুই নেই। ত্রিতত্ত্ববাদ মতে, ত্রিতত্ত্বের অন্যতম তত্ত্ব ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সগুণ ও সক্রিয়, এবং সেজন্য অনন্ত অচিন্ত্য গুণশক্তি-বিমণ্ডিত।

উপনিষদেও এইভাবে দুটী স্বতন্ত্র দার্শনিক ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত—একতত্ত্ববাদ ও একেশ্বরবাদ বা ত্রিতত্ত্ববাদ। এবং একেশ্বরবাদ বা ত্রিতত্ত্ববাদের দিক্ থেকেই শক্তিবাদ প্রপঞ্চিত হয়েছে। ব্রাহ্মণসমূহে "শক্তিকে" গ্রহণ করা হয়েছে প্রধানতঃ আচারানুষ্ঠানিক ও জৈবিক দিক্ থেকে—যেমন "বাক্"কে গ্রহণ করা হয়েছে স্রষ্টা প্রজাপতির পত্নীরূপে, যাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি দেবদেবী ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। এরূপ, স্থূলতর অর্থে সৃষ্টির কথা অবশ্য উপনিষদেও কয়েকটী স্থানে আছে, যদিও ব্রাহ্মণসমূহের ন্যায় সেরূপ উগ্রভাবে নয়। যথা—

"আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম কুর্বীয়েত্যেতাবান্ বৈ কামো নেচ্ছংশ্চ-নাতো ভূয়ো বিন্দেৎ" ইত্যাদি।

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ১।৪।১৭)

"অগ্রে এই জগৎ এক আত্মারূপেই বর্তমান ছিল। তিনি কামনা করলেন—'আমার জায়া হোক্, তদনন্তর আমি সন্তান উৎপাদন

করি; এবং আমার বিত্ত হোক্, তদনন্তর আমি যজ্ঞাদি কর্ম করি।' এই পর্যন্ত সমুদায় কামনা। এর চেয়ে অধিক ইচ্ছা করলেও কেহ প্রাপ্ত হয় না। সেজন্য এখনও যে ব্যক্তি একাকী থাকে, সে কামনা করে: আমার জায়া হোক্, তদনন্তর আমি সন্তান উৎপন্ন করি; এবং আমার বিত্ত হোক্, তদনন্তর আমি যজ্ঞাদি কর্ম করি। যে পর্যন্ত মানুষ এই সমুদায়ের একটীও না প্রাপ্ত হয়, সে পর্যন্ত সে আপনাকে অপূর্ণই মনে করে। এরূপে তার পূর্ণতা হয়—'মনই' তার আত্মা বা পতি, 'বাক্' তার জায়া, 'প্রাণ' তার সন্তান।"

"ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুতেতি মনো বাচং প্রাণম্।"

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ১।৫।৩)

"তিনি নিজের জন্য মন, বাক্ ও প্রাণ সৃষ্টি করেছিলেন—এঁরাই হলেন পিতা, মাতা ও সন্তান।"

"নৈবেহ কিংচনাগ্র" (বৃহদারণ্যক ১।২।১)

"সোঽকাময়ত দ্বিতীয়া মে আত্মা জায়েতেতি
স মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ।"

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ১।২।৪)

"তিনি কামনা করলেন—'আমার দ্বিতীয় দেহ উৎপন্ন হোক্। তিনি তখন মনদ্বারা বাক্যের সঙ্গে মিলিত হলেন।"

"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ।—স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ ।…স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্।"

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ১।৪।১,৩)

"পূর্বে এই আত্মা পুরুষরূপ ছিলেন। কিন্তু তিনি একাকী আনন্দলাভ করলেন না। সেজন্য কেহ একাকী আনন্দলাভ করেন না। তিনি দ্বিতীয় একজনকে ইচ্ছা করলেন। তিনি নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন, এবং এরূপে পতি ও পত্নীর উদ্ভব হল।"

এরপরে সাধারণ সৃষ্টির দিক্ থেকেই যেন বলা হয়েছে, একজন হলেন বৃষ, অন্যজন হলেন গো, এবং তাদের মিলন থেকে গো-জাতির উদ্ভব হল। একই ভাবে, একজন হলেন অশ্ব, অন্যজন অশ্বী; একজন গর্দভ, অন্যজন গর্দভী; একজন অজ, অন্যজন অজা; একজন মেষ, অন্যজন মেষী; এই ভাবে, পিপীলিকা পর্যন্ত প্রাণী জগতে সৃষ্ট হল।

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ১।৪।৪)

ব্রাহ্মণ-সমূহের ন্যায় এরূপ জৈবিক-সৃষ্টিতত্ত্ব কিন্তু উপনিষদে অন্যান্য বহু স্থলে উচ্চতর, আধ্যাত্মিক সৃষ্টিতত্ত্বে রূপান্তরিত হয়েছে অতি সুন্দর ভাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তৃতীয় অধ্যায়ের "অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ" নামে খ্যাত সপ্তম ব্রাহ্মণটীর উল্লেখ করা যেতে পারে। এস্থলে, বারংবার বিশেষ জোরের সঙ্গে এবং স্পষ্টতম ভাবে বলা হয়েছে যে, সেই পরমাত্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তরস্থ আত্মা; এবং এই ভাবেই তাঁর সৃষ্টি।

"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যাঃ অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।"

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩।৭।৩)

"যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত অথচ পৃথিবী থেকে পৃথক্; পৃথিবী যাঁকে জানে না, অথচ পৃথিবী যাঁর শরীর এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে থেকে যিনি পৃথিবীকে নিয়মিত করছেন—ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত।"

একই ভাবে বলা হয়েছে—জল, অগ্নি, অন্তরিক্ষ, বায়ু, দ্যুলোক, আদিত্য, দিক্‌সমূহ, চন্দ্র, তারকা, আকাশ, অন্ধকার, তেজ, সর্বভূত, প্রাণ, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, ত্বক্, বিজ্ঞান ও জীববীজের বিষয়ে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শরীরা

বা আত্মারূপে সেই বস্তুটীর ভেতরে প্রবেশ করেছেন স্বয়ং অমৃতস্বরূপ অন্তর্যামী পরমেশ্বর।

এই তো হল পরিপূর্ণ "পরিণামবাদ"—যে কোনো রকমেই হোক্, এই মতানুসারে, স্বয়ং ব্রহ্ম, বা ঈশ্বরও এইভাবে সৃষ্টি করে চলেছেন, কেবল স্বীয় শক্তি দিয়ে নয়, স্বীয় অনন্ত-অখণ্ড স্বরূপই প্রকটিত করে সানন্দে। ভারতীয় শক্তিবাদ, তথা পরিণামবাদ, এই মধুরমোহন সরস-সুশোভন, ললিতলোভন সত্যেরই প্রতীক—"শক্তিবাদ" এস্থলে আছে, সত্য; কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী আছে "স্বরূপবাদ"। কারণ, স্বীয় প্রতিটী শক্তিতেই তিনি তাঁর অখণ্ড স্বরূপসহই রয়েছেন বিদ্যমান, সেজন্য "স্বরূপ" ও "শক্তিতে" কোনোরূপ ভেদ নেই। বিশেষ করে, উপনিষদের "শক্তিবাদ" ওতপ্রোতভাবে "আত্মবাদ", যেহেতু উপনিষদ্ আত্মবাদের মূর্ত প্রতিচ্ছবি।

অবশ্য, সেস্থলে স্বাভাবিক প্রশ্ন হতে পারে, এই যে, তাহলে "স্বরূপ" ও "শক্তির" মধ্যে এরূপ প্রভেদ করা কেন হয়েছে? তার উত্তর হল এই যে, সূর্য ও কিরণ, সমুদ্র ও তরঙ্গ প্রভৃতির মধ্যে যে ভেদ, "স্বরূপ" ও "গুণ-শক্তির" মধ্যে ঠিক সেই একই ভেদ। একই সূর্যকে নানাদিকে, নানাভাবে প্রকাশিত করে নানা কিরণ; একই সমুদ্রকে নানাদিকে নানাভাবে উচ্ছলিত করে তরঙ্গ। একই ভাবে, একই "স্বরূপকে" নানাদিকে নানাভাবে প্রকাশিত, উচ্ছলিত করে "গুণ-শক্তি"। অবশ্য, অদ্বৈত-বাদিগণের মতে, এরূপ "গুণ-শক্তি" আপাত-দৃষ্টিতে সেই এক ও অখণ্ড স্বরূপের মধ্যে "স্বগত-ভেদের" সৃষ্টি করে বলে; পরিশেষে তারা "ঔপাধিক" ও "মিথ্যা" পারমা দিক্ থেকে, ব্যবহারিক দিক্ থেকে তাদের প্রয়োজনীয়তা যতই থাকুক না কেন। কিন্তু ভেদাভেদবাদিগণের মতে, "স্বরূপের" এই যে "গুণ-শক্তিজ" ভেদ, তা সত্য ও শাশ্বত, যেহেতু "গুণ-শক্তি" "স্বরূপের" প্রকাশ এবং সেই দিক্ থেকে "স্বরূপ" থেকে অভিন্ন হলেও শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক "গুণ-শক্তিরই" স্বীয়, অতি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যা তাকে "স্বরূপ" থেকে ভিন্ন করেই রাখে।

এই নিয়ে ভারতের বৈদান্তিকগণের মধ্যে বহু মতভেদ ও বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছে। সেসব বাদ দিলেও, ভারতীয় দর্শনের এই "শক্তিবাদের" অন্তর্নিহিত মহিমা, গরিমা ও মধুরিমা আমাদের মুগ্ধ না করে পারে না। তা হল, সেই কূটস্থ নিত্যের, সেই একের বহুরূপে প্রকাশ। সত্যই, "এক" "বহু" হতে পারেন কি না, "ব্রহ্ম" "ব্রহ্মাণ্ডে" পরিণত হতে পারেন কি না, "শিব" "জীব"-রূপ ধারণ করতে পারেন কি না, দর্শনশাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্রের যুক্তি-বিচারের দিক্ থেকে সে সম্বন্ধে বহু আলোচনা-প্রপঞ্চনার উদ্ভব হতে পারে, নিঃসন্দেহ। কিন্তু তা' সত্ত্বেও "এক" যে "বহু" হচ্ছেন, "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬।২।৩)—"তিনি সংকল্প করলেন—আমি বহু হই, আমি জন্মগ্রহণ করি"—এই মন্ত্রানুসারে, তাঁর নিঃসঙ্গ একাকিত্ব, "এক-মেবাদ্বিতীয়ত্ব" ত্যাগ করে, প্রকাশিত হচ্ছেন এই জীবজগতে, বিকশিত করছেন তাঁর অনন্ত সৌন্দর্য-মাধুর্য-ঐশ্বর্য, তাঁর অসীম আলোক-আনন্দ-অমৃত ধরণীর প্রতি ধূলি-কণায়, তাই কি আমাদের পক্ষে যথেষ্ট আশা ও আনন্দের সংবাদ নয়? পণ্ডিতেরা তর্ক করুন এই প্রকাশের প্রকৃত স্বরূপ ও তথ্য সম্বন্ধে। কিন্তু আমরা সাধারণ জনেরা এই আশ্বাস নিয়েই সন্তুষ্ট থাকব যে, তিনি সত্যই আছেন আমাদের সকলের মধ্যেই, আমাদের অতি নিকট জন,

নিজ জন, প্রিয়জনরূপেই।—কারণ, স্বয়ং উপনিষদেই কি তিনি নিজেই বলেননি—

"সৃষ্টিরস্ম্যহং হীদং সর্বমসৃক্ষীতি ততঃ সৃষ্টিরভবৎ।"
(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ১।৪।৫)

"'আমিই এই সৃষ্টি, কারণ আমিই এই সমুদায় সৃষ্টি করেছি।' সুতরাং তিনিই স্বয়ং সৃষ্টিরূপে পরিণত হয়েছেন।"

"তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥
ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং
কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥
নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ॥"
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৪।২-৪)

"তিনিই অগ্নি, তিনিই সূর্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্র, তিনিই নক্ষত্র, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই জল, তিনিই প্রজাপতি।

"তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী, তুমিই দণ্ডধারী জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, তুমিই বিশ্বব্যাপী।

"তুমিই নীল পতঙ্গ, তুমিই লোহিতচক্ষু শুক, তুমিই মেঘ-ঋতু-সাগরসমূহ। অনাদি-স্বরূপ তুমি ব্যাপকরূপে বিদ্যমান—যাঁর থেকে সমুদায় বিশ্ব উৎপন্ন হয়েছে॥"

নিবেদিতা

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

কতবার মনে ভাবি একটু তোমার কথা বলি।
কোনরূপে দেখিয়া তোমায়, এনে দেবো আমার অঞ্জলি।
কখনো তো দেখিনি তোমারে।
দেখিনি তো কাহারেই যুগান্তের পার হতে যারা উঁকি মারে।
দেখিনি তো সীতা সতী শকুন্তলা মদালসা সাবিত্রী কাহারে!
তবু মনে মনে এঁকে নিয়েছি তো তাঁহাদের রূপচিত্রগুলি!
অকস্মাৎ মনে আসে তোমাকেও এঁকে নেবো দিয়ে সেই তুলি—
না না, কোন নারী নয়, মানবী মুরতি নয়—রূপবতী রাজকন্যা নয়!
শ্বেতপদ্ম একখানি শত বা সহস্রদল হোক সে যা হয়।
যে পদ্ম প্রেমের মতো, যে পদ্ম ত্যাগের মতো, যে পদ্মটি পবিত্র, নির্মল!
কি আর তুলনা তব, পদ্ম ছাড়া, অমলিন ত্যাগে অবিচল!
চারিদিকে মানুষের মলিন পরশ ঢালা, পদ্মনীচে যেন পঙ্কভূমি,
মাঝে তার টল টল শ্বেতপদ্ম সম মহা মহিমায় দাঁড়ায়েছ তুমি।
সৃজিলে নতুন রূপে নারীর নতুন জাতি, ত্যাগ আর প্রেমের ভুবন,
আপন অঙ্গন-সীমা অতিক্রমি মেলে যদি নারী তার তৃতীয় নয়ন!
পরিজন পতিপুত্র স্থানকাল অতিক্রমি ক্ষুদ্র স্বার্থসীমা
জাগালে সম্মুখে তার প্রেম ত্যাগ আদর্শের কি মহান বিদেহ মহিমা!
আপন আদর্শ দিয়ে রচিয়াছ তেজ-ত্যাগ-আদর্শের নব নারী-গীতা
গুরু ও পরমগুরু পদে নিবেদিত শ্বেত পদ্ম তুমি ওগো নিবেদিতা!

স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম

মৌলভী রেজাউল করীম

পৃথিবীর ইতিহাসে মাঝে মাঝে এমন সব মহামানবের আবির্ভাব ঘটে যাঁরা নানাভাবে দেশ ও সমাজকে প্রভাবিত করেন। তাঁরা দেশের মানুষকে তার করণীয় কর্তব্যের নির্দেশ দেন। তাঁরা বিবিধ আদর্শ প্রচার করে গোটা দেশের রূপান্তর ঘটিয়ে দেন। তাঁরা হলেন যুগ-প্রবর্তক মহামানব। এইসব মহামানব সম্বন্ধে কারলাইল বলেছেন, "Our comfort is that Great Men, take up in any way, are profitable company. We cannot look, however imperfectly, upon a great man, without gaining something by him." অর্থাৎ আমাদের এই একটি সান্ত্বনা যে, যেভাবেই দেখিনা কেন, মহাপুরুষদের সান্নিধ্যলাভ ফলপ্রদ। মহাপুরুষের সংস্পর্শে এলে কিছু না কিছু উপকার পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে কারলাইল আরও বলেছেন যে, মহামানবগণ আলোর উৎস। তাঁরা সেই আলো যা জগতের অন্ধকারকে দূর করে। এ 'আলো কেব জ্বালিয়ে দেওয়া প্রদীপ নয়। বরং এক স্বাভাবিক দীপ্তি যা ঈশ্বরের দানস্বরূপ, স সময় উজ্জ্বল হয়ে থাকে। এ আলো চিরপ্রবহমান উৎস। রামকৃষ্ণ পরমহংস সেইরূপ একটি আলোর উৎস, যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূ'ত হয়ে সে যুগের জড়বাদী জীবন-দর্শনের সামনে একটা আধ্যাত্মিক জীবনচর্যার আদর্শ স্থাপন করলেন। তিনি তাঁর অপার প্রতিভার প্রভাবে পশ্চিমী জড়বাদী ভাবধারার দুর্বার স্রোতকে রুদ্ধ করতে সক্ষম হলেন। সন্দেহ, অবিশ্বাস ও নিরীশ্বরতার স্থানে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন বিশ্বাস, স্থিরতা ও ঈশ্বরপ্রীতি। তাঁর কণ্ঠ থেকে হতাশ মানুষ শুনলো আশার বাণী। ভেদাভেদ দ্বারা ছিন্নভিন্ন মানুষ শুনলো সর্বধর্মসমন্বয়ের মহাবাণী। সেই মহাপুরুষের স্পর্শলাভ করে ঘোর সন্দেহবাদী নরেন্দ্রনাথ দত্তের আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। পরমহংস-দেবের কৃপায় তিনি হলেন জগৎবরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ। ঠাকুরের আদর্শকে বাস্তব রূপ দিবার ভার নিয়ে তিনি অদম্য তেজে ভারতবাসীর সামনে উপস্থিত হলেন। আজকার এই প্রবন্ধে সেই স্বামীজীর দেশপ্রেমের আদর্শ সম্বন্ধে দুচারটি কথা বলব।

প্রচলিত অর্থে যাকে আমরা দেশপ্রেম বলি, স্বামীজীর আদর্শ তার চেয়ে আরও মহান ও উচ্চভাবোদ্দীপক। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, "Patriotism is not enough."—অর্থাৎ দেশপ্রেম যথেষ্ট নয়। একটা গোটা মানুষ তৈরি করতে গেলে দেশপ্রেম ব্যতীত আরও অনেক গুণের দরকার। দেশপ্রেম সেইসব মহৎ গুণের অন্যতম। কোনমতেই তা একমাত্র গুণ নয়। কিন্তু কেউ যদি মনে করে যে, তার দেশপ্রেম থাকলেই যথেষ্ট হ'ল, তার অন্য কোন গুণের চর্চার ততটা দরকার নাই, তবে বলব যে, পূর্ণ জীবনের ধারণা সম্বন্ধে সে সচেতন নয়। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় আমরা জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের আদর্শের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিতাম। সেই সঙ্গে অন্যান্য গুণেরও যে দরকার সে কথার উপর বিশেষ

গুরুত্ব দেওয়া হ'ত না। আজ তার কুফল আমরা প্রতিপদেই উপলব্ধি করছি। আজ দেশে বিভিন্ন পার্টি বা দলের উদ্ভব হয়েছে। এইসব দলের সমর্থকগণ দলের আদর্শকে এত বড় করে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছে যে, তারা সত্যিকারের দেশপ্রেমের আদর্শেরই ক্ষতিসাধন করছে। ইংলণ্ডের বিখ্যাত মনীষী মহামতি বার্কের সম্বন্ধে একজন লেখক যা বলেছেন এদেশের দলপতিদের সম্বন্ধেও সেই কথাটা বলা চলে, "He gave to the party what was meant for humanity." অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতিকে দেবার মত অনেক তাঁর ছিল কিন্তু তিনি তাঁর পার্টিকেই সব দিয়ে দিলেন। প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের মনে রাখা দরকার যে, সে যেমন একটা দেশের নাগরিক, সেইরূপ সেই একই ব্যক্তি একই সঙ্গে বিশ্ব-নাগরিকও বটে। সত্যিকার দেশপ্রেমের সহিত বিশ্বপ্রেমের বিশেষ একটা বিরোধ নাই। স্বামী বিবেকানন্দ অদ্ভুতভাবে এই দুই আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। সেইজন্য বলব যে, তাঁর দেশপ্রেমের আদর্শ প্রচলিত আদর্শ থেকে বহু উচ্চস্তরের বস্তু। তিনি কেবল স্বদেশপ্রেমের কথা বলেই ক্ষান্ত থাকেননি। স্বদেশপ্রেমকে বিশ্বপ্রেমের প্রান্ত-সীমায় নিয়ে যেতে হবে। তাঁর মতে প্রীতি-ভালবাসা ও জনকল্যাণের সীমাকে স্বদেশের মধ্যেই আবদ্ধ করে রাখলে চলবে না। এ-সবকে সঞ্চারিত করতে হবে সারা বিশ্বে। বিশ্বের সব মানুষকে ভালবাসতে হবে। তাদের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। তিনি আমেরিকার চিকাগো ধর্মসভায় শাশ্বত হিন্দু-ধর্মের যে আদর্শ তুলে ধরেন তা ছিল সেই হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা যা সর্বব্যাপী উদারতা ও মানবতায় বিশ্বাসী। সে ধর্মে সঙ্কীর্ণতার কোন স্থান নাই। সে ধর্ম সারা বিশ্বকে আপনজন বলে আলিঙ্গন করতে সঙ্কুচিত হয় না। বস্তুতঃ স্বামীজীর জাতীয়তা ও দেশপ্রেম কোন গণ্ডিবদ্ধ দেশের মধ্যে সীমিত নয়।

আজ থেকে কিঞ্চিদধিক একশ বছর পূর্বে স্বামীজী আমাদের এই বঙ্গদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই একশ বছরের মধ্যে ধীরে ধীরে তাঁর অপার প্রভাব সর্বত্র অনুভূত হচ্ছে। আজ দেশে যে অভূতপূর্ব গণ-জাগরণ দেখতে পাচ্ছি তাতে তাঁর দান অপরিসীম। দেশের তরুণদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। দেশের তরুণগণ যদি তাঁর আদর্শ অনুসারে চলত, যদি তারা ধর্মের আদর্শকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকত, যদি বিদেশের দোষগুলি বর্জন করে গুণগুলি গ্রহণ করত, যদি ভারতের ঐতিহ্যের ভিত্তিতে নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলত, তবে সেইসব তরুণদের দ্বারা কি বিরাট ও মহৎ কাজই না সম্পন্ন হ'ত! পাছে ভারতবাসী সত্যপথ বর্জন করে বিপথে যায়, সেইজন্য স্বামীজী আমাদের বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন, বহু সাবধান বাণী শুনিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন যে, ঠিক পথ ধরে না চললে দেশের সমূহ ক্ষতি হবে। আজ তাঁর সেইসব অমূল্য উপদেশগুলির যথার্থ তাৎপর্য আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করছি। তাঁর শিক্ষাগুলিকে নূতন যুগের পটভূমিতে নূতন করে স্মরণ ও অনুধাবন করা দরকার।

স্বামীজী মূলতঃ ছিলেন সংসারত্যাগী ব্রহ্ম-চারী সন্ন্যাসী। কিন্তু অপরাপর সন্ন্যাসীর মত তিনি কেবল পরমার্থবিষয় নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন একদিকে সন্ন্যাসী ও অপরদিকে কঠোর কর্মযোগী। পরমার্থ-বিষয়ের সহিতই জাতির ঐহিক, বৈষয়িক ও সাংসারিক কল্যাণের কথাও তিনি চিন্তা

করতেন। কর্মের আদর্শ, গার্হস্থ্যজীবনের দায়দায়িত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-নীতি, শিক্ষানীতি, এসব বিষয়ও তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উত্থান-পতনের ইতিহাস তিনি গভীর-ভাবে পাঠ করেছেন। কিসে দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হবে, এই অধঃপতিত জাতি কেমন করে আবার জেগে উঠবে, কেমন করে সামগ্রিক-ভাবে দেশবাসীর চরিত্র সংগঠিত হবে যাতে তারা জগৎ-সভায় সম্মানের সহিত মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে—এসব বিষয়ও তিনি গভীর-ভাবে আলোচনা করেছেন। বহু পড়াশুনা, বহু জ্ঞান অর্জন করেছেন। তাঁরই প্রভাবে সে যুগের বহু তরুণ যুবকের প্রাণে স্বদেশ-প্রেমের উৎসাহ জাগ্রত হয়েছিল। তাঁর প্রভাবে ও অনুপ্রেরণায় এইসব তরুণ সম্প্রদায় নূতন আগ্রহে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। স্বামীজীর আদর্শকে অবলম্বন করেই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কর্মজীবন আরম্ভ হয়েছিল। জনসেবা, জনকল্যাণমূলক কাজ, দৈহিক শক্তিচর্চা, সর্বোপরি ধর্মভাব—এইসব আদর্শ দ্বারা দেশের হাজার হাজার তরুণ যুবক অনু-প্রাণিত হয়ে উঠলো। স্বামীজীর অনুপ্রেরণা না পেলে সে যুগের তরুণ সম্প্রদায় এভাবে জেগে উঠত না। তিনি সক্রিয়ভাবে কোন রাজনীতি করেননি। কিন্তু এদেশের রাজ-নীতির গোড়াতে যে গঠনমূলক কাজ, যে সেবার আদর্শ, যে ত্যাগের স্পিরিট—তা তিনি তরুণদের মধ্যে উদ্দীপিত করেছিলেন আজন্ম বিপ্লবী স্বামীজীর আবির্ভাব সে যুগের একটা ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। জাতি তখন আপনাকে ভুলতে বসেছিল, তার অতীতের মহান ঐতিহ্য, গৌরবময় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাহিনী সম্বন্ধে তার মনে কোন রেখাপাত হয়নি। সে যুগে যাঁরা রাজনীতি করতেন তাঁরাও দেশের আসল সমস্যার কথা ঠিক ধরতে পারেননি। তাঁরা হয়তো মনে করতেন যে, রাজনৈতিক ক্ষমতার অভাবেই বুঝি দেশের এপ্রকার দুর্গতি। তাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক অধিকার ও ক্ষমতা আদায়ের দিকে। এই সময় স্বামীজী তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব, তাঁর সাধনা, ত্যাগ, তপস্যা ও বৈপ্লবিক চিন্তা নিয়ে জাতির সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি আমেরিকাতে ভারতের বাণী প্রচার করে বিজয়ীর বেশে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি ভারতে পদার্পণ করেই স্বদেশবাসীকে আকুল কণ্ঠে আহ্বান করলেন, "ওঠ, জাগ্রত হও।" দেশবাসী উপলব্ধি করল তাঁর এই আহ্বান কোন রাজনৈতিক নেতার শূন্যগর্ভ আহ্বান নয়। এ আহ্বান এমন একজন সর্বত্যাগী মহাযোগীর উদাত্ত আহ্বান যা অন্তরে শিহরণ জাগিয়ে দেয়। তাঁর এ আহ্বান জাতির হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত দিল। তরুণদের প্রতি ধমনীতে স্পন্দন সৃষ্টি করল। তিনি কোন কিছুর জন্য সরকারের নিকট আবেদন করলেন না। তিনি সোজাসুজি জাতির হৃদয়ের নিকট আবেদন করলেন। তিনি জাতিকে বুঝালেন: "দোষত্রুটি তোমার নিজের মধ্যে আছে। সেটাকে দূর করে ফেল, সব ঠিক হয়ে যাবে।" তিনি বললেন, "দুর্বলতা ত্যাগ কর, কারণ বলহীন ব্যক্তি কিছুই করতে পারে না। সবল হও, পেশীর চর্চা কর। বলহীন জাতি অপরের দয়ার দানের উপর নির্ভর করে দাঁড়াতে পারে না।" এইভাবে স্বামীজী আত্মবিস্মৃত জাতির মনে নূতন উদ্দীপনা সৃষ্টি করলেন। তিনি তাদের বুঝালেন যে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে নতুবা জাতীয় জাগরণ

হবে না। সে যুগের বহু রাজনৈতিক নেতা লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিতেন। কিন্তু জাতির ঘুমন্ত প্রাণকে এমনভাবে জাগাতে পারেননি। তাঁরা দেশের নাড়ীর খবর রাখতেন না। স্বামীজী তাঁদের পথে গেলেন না। স্বচক্ষে ভারতের অবস্থা দেখবার জন্য সারা ভারত ভ্রমণ করে বেড়ালেন। তিনি যেমন গেলেন রাজার প্রাসাদে, তেমনি স্বচক্ষে দেখলেন দীনের পর্ণকুটির।—গেলেন সন্ন্যাসীর আশ্রমে, মঠে মন্দিরে পথে প্রান্তরে হাটে বাজারে দোকানে সরাইখানাতে—সবস্থান ঘুরে ঘুরে নিজের দুটি চোখ দিয়ে দেখলেন দেশের অবস্থা। কি চাই দেশের লোকের, কি তাদের অভাব, কেন তাদের এই দারিদ্র্য ও দুর্গতি, কিভাবে দূর হবে তাদের এই দুর্দশা, কি তাদের প্রয়োজন—এই সব কথা তিনি চিন্তা করলেন। এই ভারত-পরিক্রমার সময় দেশের যুগযুগসঞ্চিত দারিদ্র্য তাঁর নিকট অত্যন্ত কঠিনভাবে প্রকট হয়ে উঠলো। তিনি বুঝলেন দেশে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার নাই, শিক্ষাটা কেবল মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোকের মধ্যে আবদ্ধ, অশিক্ষা জড়তা ও কুসংস্কারে দেশ ছেয়ে গেছে। কেবল বক্তৃতা দিয়ে প্রস্তাব পাশ করলেই এদেশের কোন উন্নতি হবে না, অভাবও দূর হবে না। এদের মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগাতে হবে। সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার দ্বারা এদের দৈন্য দুর্দশা দূর করতে হবে। দারিদ্র্য, অভাব, অনটন—এসব যতদিন থাকবে ততদিন কিছুই হবে না। ভিখারীর জাতির কোন ভবিষ্যৎ নাই। তাই তিনি জোর দিলেন দৈহিক, ঐহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের উপর। এ সব করতে হবে, তবেই দেশের উন্নতি হবে—এ সবের একটাকেও বাদ দিলে চলবে না। "ভীরুতা বর্জন কর, পরিশ্রম কর, সর্ব বিষয়ে আন্তরিক হও"—এই হ'ল তাঁর অন্যতম বাণী।

এ কথা সত্য যে, স্বামীজী প্রত্যক্ষভাবে কোন রাজনীতিতে যোগদান করেননি। কিন্তু রাজনীতির মূলতত্ত্ব তাঁর সবিশেষ জানা ছিল। দেশের সত্যিকারের প্রয়োজন কি, কি কি বস্তুর আশু প্রয়োজন—এ বিষয়ে তাঁর সম্যক্ ধারণা ছিল। তিনি গভীরভাবে ভারতের অতীত ইতিহাস পড়েছিলেন, তার থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ভারতের পরাধীনতার ও অধঃপতনের মূল কারণ কি, মূল রোগ কোথায় আছে। বস্তুতঃ তিনি সঠিক ভাবে রোগ নির্ণয় করেছিলেন। তিনি বললেন, "ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ জনসাধারণকে অবহেলা করা। এই অবহেলা হচ্ছে একটা জাতীয় মহাপাপ—a great national sin." সে যুগের স্বদেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী নেতাদের বুঝালেন যে, যতদিন দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হবে, যতদিন তারা ভালভাবে খেতে পরতে না পাবে, যতদিন তাদের যত্ন না লওয়া হবে, ততদিন রাজনীতি করে কোন ফল হবে না। সকলের আগে চাই এইসব, অন্য সব পরে। কিন্তু কেবল চাই বললেই হবে না। সেজন্য অক্লান্তভাবে সাধনা করে যেতে হবে। সভাতল কাঁপানো বক্তৃতা দিয়ে এসব কাজ হবে না। স্বামীজী দেশের শোচনীয় অবস্থার কথা গভীরভাবে চিন্তা করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সর্বাগ্রে চাই শিক্ষা। শিক্ষা চাই, নতুবা সব ব্যর্থ। তিনি আরও উপলব্ধি করলেন যে, দেশের গোটা শিক্ষাটা মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোকের হাতে ন্যস্ত। জনশিক্ষা সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নাই

এবং ইচ্ছাও নাই। অধিকাংশ স্কুল বিদ্যালয় সরকারী-সাহায্যপুষ্ট ও সরকারী নির্দেশে সেগুলি পরিচালিত হয়। কারিকুলাম বা পাঠ্যব্যবস্থাও সরকারই ঠিক করে দেন। এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা দেশের সামগ্রিক উপকার বা লাভ হবে না। তাই তিনি ঘোষণা করলেন, যদি আমাদের আবার উঠতে হয়, তবে প্রথম কাজ হবে শিক্ষাকে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক করে দেওয়া ; আর, তাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে নূতনভাবে শিক্ষার কারিকুলাম রচনা করতে হবে। এই কারিকুলামে যেমন থাকবে ভারতের ঐতিহ্যের কথা, ধর্মবোধ জাগ্রত করার প্রয়াস, তেমনি থাকবে চরিত্রগঠন ও শরীরগঠনের ব্যবস্থা। কারণ জনসাধারণই সমস্ত শক্তির উৎস, তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী থেকে তাদের বঞ্চিত করলে পরে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। বস্তুতঃ অর্থশালী কোটিপতির উপর স্বামীজীর কোনই আস্থা ছিল না, তিনি সে যুগেও বুঝেছিলেন যে, ভারতের কোটি কোটি জনসাধারণের উন্নয়নের উপর নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যৎ। সর্বপ্রযত্নে তাদের অবস্থা ভাল করতে হবে। তাই তিনি দেশের শিক্ষিত লোকদের বারবার অনুরোধ করেছেন : ভারতের এই দুঃখ-দুর্দশার পাহাড়ের উপর আগুন লাগাও। যুগ যুগ ধরে যেসব জঞ্জাল স্তূপীকৃত হয়ে আছে তার সেই স্তূপের উপর আগুন লাগিয়ে সবকে পুড়িয়ে দাও। গায়ের জোরে নয়। এসব করতে হবে ব্যাপক শিক্ষা-বিস্তার দ্বারা। শিক্ষাই জীবনদায়িনী শক্তি, মানুষ তৈরির যন্ত্র। আজ স্বামীজীর এইসব বক্তৃতা ও রচনাবলী পাঠ করলে মনে হবে যেন কোন আধুনিক বৈপ্লবিক জননেতার কণ্ঠধ্বনি শুনছি। স্বামীজীর হৃদয়ে ছিল অসীম দেশপ্রেম। তাঁর সেই দেশপ্রেম ছিল সামগ্রিকভাবে ভারতের সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি ভালবাসা থেকে উৎসারিত।

স্বামীজী কেবলমাত্র কতকগুলি উন্নয়নমূলক প্রোগ্রাম দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি। তাঁর বিপ্লবী মন তাতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তিনি চেয়েছিলেন, দেশের উপর যুগ যুগ ধরে যে অভাব দুঃখকষ্ট স্থায়ী হয়ে চেপে বসে আছে তাকে সমূলে উৎপাটন করতে। ভারতের সমাজের মধ্যে জগদ্দল পাথরের মত যে রক্ষণশীলতা বিরাজমান আছে তাকে তিনি দূর করতে চাইলেন। সমস্ত বিষয়কে পুনর্বিবেচনা করে আমূল পরিবর্তন করতে চাইলেন। ধনিক সম্প্রদায় যে কেবলমাত্র দরিদ্র জনসাধারণের ঘাড়ের উপর বসে থাকবে তা হ'তে দেওয়া চলে না। তিনি জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি চাইলেন এই দিক দিয়ে বলতে পারি যে, স্বামীজী ছিলেন একজন প্রথমশ্রেণীর সোস্যালিস্ট। এই যে দরিদ্র জনসাধারণকে বিশেষ করে নীচজাতিদের দূরে রাখা হয়েছে, অস্পৃশ্য করে রাখা হয়েছে, তাকে তিনি অপরাধ বলে মনে করতেন। বলতে পারি যে, তিনি মহাত্মা গান্ধীর পূর্বগামী। গান্ধীজীর বহু পূর্বেই তিনি অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। জাতীয়তাবাদী বলতে যদি দেশের কল্যাণকামী হওয়া বুঝায় তাহলে স্বামীজী ছিলেন প্রথমশ্রেণীর জাতীয়তাবাদী। কিন্তু তাঁর জাতীয়তাবাদ কোনওরূপ সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তাঁর মনে বিশ্বপ্রেম তথা মানবপ্রেমের স্পিরিট সদাজাগ্রত ছিল। তাঁর মতে সত্যিকারের জাতীয়তাবাদের সহিত বিশ্বমানবতার কোন বিরোধ ছিল না। তবে যে-দেশ অনুন্নত, পরাধীন, দরিদ্র ও অশিক্ষার পঙ্কে নিমজ্জিত, সে দেশের কথা একটু

বেশী করে চিন্তা করতে হবে বইকি। তাই তিনি তাঁর জন্মভূমি ভারতবর্ষকে পাশ্চাত্যের উন্নততর দেশের মত উন্নত করতে চেয়েছিলেন। তিনি অপরাপর জাতীয়তাবাদীদের মত হইচই করেননি। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এটাও বুঝেছিলেন যে, সব বিষয়ের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করলে চলবে না। আমাদের নিজেদের ভিতর থেকে শক্তি অর্জন করতে হবে। দেশকে নিজেদের আদর্শ অনুসারে গড়ে তুলতে হবে। পশ্চিমদেশের সহিত শত্রুতা চাই না, বরং তাদের সহযোগিতা চাই। তাদের নিকট থেকে আমাদের অনেক কিছু শিখতে হবে। তবে সেই সঙ্গে তিনি সাবধান করে দিয়েছেন যে, পশ্চিম-দেশকে সকল বিষয়ে অনুকরণ করা চলবে না। সেখান থেকে শিক্ষার উপাদান সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু তা ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বর্জন করে নয়, বিস্মৃত হয়েও নয়। আমরা যা কিছু করব, ভারতের ঐতিহ্য ধর্ম ও জীবনের মূল থেকে তা রস সংগ্রহ করবে। সামাজিক সংস্কার চাই, শক্তিচর্চা চাই, শিক্ষাসংস্কার চাই, নানা দিক দিয়ে বৈপ্লবিক মন নিয়ে কাজ করতে হবে। কিন্তু ভারতের মূল আদর্শ ও লক্ষ্যকে ভুলে গেলে চলবে না। স্বামীজী নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, পশ্চিম দেশের রাজনীতি এদেশে আমদানী করলে বা তাদের অনুকরণ করলে দেশে দলাদলি ভেদা-ভেদ বেড়ে যাবে। তাতে যত হইচই হবে, প্রকৃত কাজ তত হবে না। তিনি পুনঃ পুনঃ দেশবাসীকে এসব বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন—কিছুতেই পাশ্চাত্যের অনুকরণ করো না। ভারতবাসী যেন সামান্য সামান্য বিষয় নিয়ে পরস্পরের সহিত ঝগড়া-বিবাদ না করে, এ সম্পর্কে তিনি বহুভাবে সমাধান করে দিয়েছিলেন। সত্ত্বগুণ, উচ্চাশা, শুদ্ধমন, শুভ্র চরিত্র, আত্মপ্রত্যয়—এই সব ব্যতীত কোন দেশ বড় হতে পারে না। তিনি উপলব্ধি করে-ছিলেন যে, ভারতের সংহতি রক্ষা করতে হ'লে সর্বপ্রকার প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, গণ্ডি-বদ্ধতা, ভেদাভেদ-জ্ঞান—এসব চিরতরে বর্জন করতে হবে। এইসব পাপের প্রভাবে সমগ্র দেশ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। বস্তুতঃ তাঁর সমগ্র চিন্তাধারার মধ্যে ছিল উদার ভারতপ্রেম। ভেদাভেদ দলাদলি ইত্যাদি হচ্ছে ভারতের সংহতির প্রধান শত্রু। ভারতীয় জীবন থেকে এই সব পাপ দূর না হ'লে ভারতের কোন ভবিষ্যৎ নাই।

একদিকে স্বামীজী ছিলেন বীর সন্ন্যাসী, সিংহের মত ছিল তাঁর শক্তি ও তেজ। আবার অপর দিকে তিনি ছিলেন মমতা, প্রীতি, প্রেম ও স্নেহের অমৃতময় উৎস। দেশের অগণিত জনসাধারণের প্রতি কী গভীর ভালবাসাই না ছিল তাঁর বিশাল হৃদয়ে! এ সম্পর্কে তাঁর একটি উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: "I do not believe in a god or religion, which cannot wipe out the widow's tears or bring a piece of bread to the orphan's mouth." অর্থাৎ সে ঈশ্বর বা ধর্মে আমার বিশ্বাস নাই, যা বিধবার অশ্রু মুছাতে পারে না অথবা পিতৃমাতৃ-হীন অনাথ-আতুরের মুখে একটুকরা রুটি দিতে পারে না। একথার অর্থ কি তিনি নাস্তিক? না, তা মোটেই নয়। এর আসল অর্থ এই—দুঃখীর দুঃখ দূর করতে হবে, অভাবীর অভাব মোচন করতে হবে। এসব দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কেউ যদি আচার-অনুষ্ঠানকেই ধর্ম বলে মনে করে তবে তা নিতান্ত ভুল ধারণা। ঐ উক্তির মধ্যে আমরা শুনছি বিপ্লবী

স্বদেশপ্রেমিক তথা মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দের বজ্রগম্ভীর ঘোষণা। জনকল্যাণ ব্যতীত দেশ-সেবার কোন অর্থ হয় না। স্বামীজী বলতেন, যদি জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা দূর করতে না পারি তবে ধ্বংস অনিবার্য। এই প্রসঙ্গে তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করতে বলি, "হে ভারত, ভুলিও না," ইত্যাদি। সীমাহীন দেশপ্রেম দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি দেশবাসীর নিকট এই প্রকার সম্মোহনী বাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, স্বামীজী ছিলেন আদর্শ দেশপ্রেমিক। তিনি প্রকৃত দেশপ্রেমের আদর্শের উৎস। যারা দেশপ্রেমিক হ'তে চায় তাদের তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা কি তোমাদের অস্থির ও নিদ্রাহীন করে তুলছে? তা যদি না করে থাকে তবে কেবল বক্তৃতা দিয়ে কোন্ ধরনের দেশপ্রেমের পরিচয় দাও? জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য বাস্তব সমাধানের পথ অনুসন্ধান করতে হবে। এ পথে আছে বহু অসুবিধা। সমস্ত অসুবিধা দূর করবার জন্য অদম্য ইচ্ছাশক্তি চাই। যদি সমগ্র জগৎ তলোয়ার নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবুও যা তোমরা ঠিক মনে কর তা করবার জন্য প্রস্তুত হও। ইহাই আসল দেশপ্রেম। দেশসেবা বলতে তিনি জনসাধারণের সর্ববিধ স্বাধীনতার কথা বুঝতেন—রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মনৈতিক। স্বামীজী বারবার বলতেন যে, ভারতের সেবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে জনগণের সেবা, দারিদ্র্যক্লিষ্ট অশিক্ষিত লোকের সেবা।' কারণ তাঁর মতে তারাই তো ভারতবর্ষ। তাদের নিয়েই সমাজ। আমি তুমি যারা বড়লোক, যারা সুখী, তারা নয়। এই মহান স্বামীজী একটি সু-উজ্জ্বল গৌরবান্বিত ভারতের আগমনের ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন। তাঁর কণ্ঠ থেকে যখন মহাবাণী নির্গত হল: ওঠ, জাগো, দেখ তোমার ভারত উন্নত সিংহাসনে উপবিষ্ট অধিক-তর ভাবে পুনর্জাগরিত গৌরবান্বিত—ইহাই তোমার মাতৃভূমি ভারতবর্ষ। তাঁর এইসব অগ্নিগর্ভ বাণী ভারতের যুবকগণকে উৎসাহিত করেছে। তাদের প্রাণে এনেছে নবযৌবন। তাদের জীবনকে দেশ ও জাতির সেবায় করেছে নিয়োজিত। আজকের এই নবজাগ্রত ভারতে স্বামীজীর দানের কথা জাতি কখনও ভুলতে পারবে না। জয়তু স্বামীজী!

তুমি

শ্রীশান্তশীল দাশ

তুমিই আঁধার দাও, তুমি দাও আলো,
তুমি দূরে ফেলে দাও, তুমি বাস ভালো,
হাসাও তুমিই সেই, তুমিই কাঁদাও,
গড়ো তুমি আবার সে-গড়া ভেঙে দাও;
খেয়ালী, তোমার খেলা কিছু সে বুঝি না,
শুধু দেখি সেই খেলা, অর্থ খুঁজি না;
হাসাও যখন, হাসি, কাঁদি কাঁদালেই;
চলি থামি বারবার আলো আঁধারেই!

একদিন এই খেলা শেষ হবে জানি,
সেদিন তুমি কি মোরে কাছে নেবে টানি'?

ডাক

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

ধরণীর মাঝে কিমাশ্চর্য আছে বা অতঃপর—
গিরিদরী থেকে বাহিরায় ধ্বনি 'আক্‌বর' 'আক্‌বর'।
দুরধিগম্য মরুপর্বত একান্ত জনহীন—
রাখাল বালক সেই শব্দেতে চমকিত কতদিন।
রটিল বারতা, যত নরনারী দূর গ্রাম নগরীর
জমায় নিত্য গুহার মুখেতে একটা মেলার ভিড়।
বুঝিতে পারে না কিন্তু কিছুই, পায়নাকো সন্ধান—
পাথরের মুখে হেন বাণী দিল কোন্ সে শক্তিমান?

২

পল্লী হইতে সংবাদ গেল দিল্লীর দরবারে—
হোমরা চোম্‌রা, আমীর ওম্‌রা হাসিয়া উড়ালো তারে।
বাদশাহ এই জবর খবর শুনিয়া কহেন হাসি,'
বান্দার ডাক কেন যে পড়িল চলো গিয়ে দেখে আসি।
সুন্দরের সে অদ্ভুত ডাক, পশিতেছে যেন কানে,
রওনা হলেন বাদশাহ যেই কৌতুকা আহ্বানে।
দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্রেতে আবু পাহাড়ের গায়ে—
শ্রান্ত, ক্লান্ত, দাঁড়ালেন এক 'ফণিমনসার' ছায়ে।

৩

উঠিতেছে ধ্বনি কর্কশ ক্ষীণ শ্রুতিকটু অতিশয়
একি প্রহেলিকা, নরের কণ্ঠ শুনি যেন মনে হয়।
পাথরে আঘাত করিয়া বাদশা দাঁড়ান গুহার আগে—
বলেন হুজুর কি লাগি তলব নফর আদেশ মাগে।
পশ্চাৎ হতে সন্ন্যাসী আসি চাহিছেন মুখপানে—
কহেন ডাকের মূল্য বুঝেছ, বুঝিতে পেরেছ মানে।
'ডাকে ভগবান আসে বলেছিনু' করনিকো বিশ্বাস—
মনে পড়ে তব অহমিকাভরা সে কুটিল পরিহাস।

৪

উপেক্ষার এই ডাকে যদি আসে নিজে দিল্লীশ্বর—
কাতর ব্যাকুল ডাকে আসিবে না কেন জগদীশ্বর ?
জেনো মানুষের জ্ঞানের বাহিরে এমন জিনিস আছে,
যাহার প্রবল আকর্ষণেতে ভগবান আসে কাছে।
প্রবল-প্রতাপ বাদশাহ তুমি, কতই অহঙ্কার,—
তবু এই ডাকে এখানে আসিয়া ঠেলিছ পাষাণদ্বার।
আসে ভগবান, নিশ্চয় আসে, নিশ্চয় আসে ডাকে,
যে বলে এ কথা, সত্যই বলে, বিশ্বাস করো তাকে।

দারিদ্র্য

শ্রীকালিদাস রায়

তোমারে চিনিল শুক, সনক, অক্রুর,
সর্বস্বে কিনিল বলি, জিনিল জনক।
সেবিয়া হইল ধন্য নারদ বিদুর,
ভক্ত তব রঘুনাথ, কবীর নানক।
দাও তব নৈমিষের হরীতকী দু'টি
তোমার 'কান্যক'-ব্যথা চিরকাম্য-প্রিয়,
তব বদরিকাছায়ে চিরদিন জুটি'
তোমার 'দণ্ডক'-দণ্ড চিরদিন দিও।
তোমার সন্তোষ-ক্ষেত্র ভারতের বুকে,
তোমার বৈশালী-মন্ত্র নিশিদিন স্মরি,
তব বোধিদ্রুমতলে যেন রহি সুখে
তব বৃন্দাবনে যেন করি মাধুকরী।
যদি দিগম্বরে পাই জীবন-সন্ধ্যায়,
চিরদিন র'ব তব মণি-কর্ণিকায়।

দিনের শেষে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

এই তো এসেছি জীবনের আজ শেষ কিনারায় ;
কেমনে এলাম ভাবিতে অবাক লাগে !
বেঁধেছিনু আমি এ মাটির বুকে কুঞ্জছায়ায়
ছোট্ট বাসাটি, সে কথা স্মরণে জাগে।
আজিকে পিছনে যতদূর পারি চেয়ে দেখি ফিরে
অসীম ভুবন ! যেন এর শেষ নাই !
গীতগুঞ্জন নীরব হ'য়েছে ঝংকারি ধীরে
সুরের পরশ বুকে আর নাহি পাই !

কোথায় হারালো হৃদয়দোলানো ভোলানো সে গান ?
দেহতটে আর নাচে না কামনাঢেউ ;
সহসা কেন যে প্রশান্ত আজ অশান্ত প্রাণ !
কোথায় সে মন ? চুরি কি ক'রেছে কেউ ?
লুকালো কোথায় উচ্ছল ধারা চঞ্চলতার—
সমুখে নেমেছে কেন এ কৃষ্ণ ছায়া ?
পারেনি তবু সে রুধিতে আমার কল্পনাদ্বার,
সেখানে এখনো খেলিছে স্বপনমায়া !

ওগো কালো ছায়া ! আবরিলে কেন স্বচ্ছ আকাশ ?
ঢাকিলে আলোর দীপ্ত মুকুরখানি।
তুমি কি মৃত্যু ? বিশ্ববাসীর একান্ত ত্রাস
শিয়রে দাঁড়ালে রাজার আদেশ আনি ?
এসো মহাকাল ! স্বাগত তোমার এই আগমন,
তোমার হিসাব চুকায়ে রেখেছি আমি ;
যা কিছু কুকাজ সকলি হে আমি রেখেছি স্মরণ,
ত্রুটি বিচ্যুতি জাগে মনে দিবা যামি !

করো নির্দেশ—কোন দেশ স্থির—ফিরিয়া যাবার ?
যেতে চাই সেঁথা ধুয়ে সব অপরাধ !
এই মাটিতেই নূতন জনম যাচি হে আবার—
পূর্ণ করিতে অপূর্ণ যত সাধ।
ক্ষমাহীন কোনো গুরু অপরাধ যদি করে থাকি,
দণ্ড লইবো নতশিরে প্রভু আজ,
শুনিয়াছি যার অনুশোচনায় ঝরে দুটি আঁখি,
তারে তুমি নাও কোলে তুলে মহারাজ !

অধরা

বনফুল

তোমারে যায় না ধরা, হে সুদূরচারিণী অধরা,
তবু তব বন্দনায় এ ধরণী চির-কলস্বরা,
নিত্য নব নব রূপে কবিত্বের কল্পনা-অপ্সরা
তব লাগি অর্ঘ্য রচে সাজাইয়া সৌন্দর্য-পসরা,
কিন্তু তুমি তবুও অধরা।

মনের নিভৃত দেশে মাঝে মাঝে অনুভব করি
অনাদি-অনন্ত-পারে আপনারে প্রসারিয়া, মরি,
অতীন্দ্রিয় স্বপ্নলোকে মুক্ত তুমি, ওগো নিরম্বরী ;
তাহাই কি ব্রহ্মলোক ? ব্রহ্মর্ষিরা যেথায় উত্তরি,
বিরাজেন জ্যোতির্মূর্তি ধরি ?

আলো যেথা নিঃশেষ নিঃশব্দ ঘন অন্ধকারে
ভাষা যেথা নির্বাক হে অধরা, তারও পরপারে
আছ তুমি, হে অসীমা রূপাতীত যে মহা-আধারে
সে আধারও সীমাহীন, সে আধারও লুপ্ত নিরাধারে,
তোমারে ধরিতে কেবা পারে ?

প্রথম দেখা হিমালয়

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

মায়াবতী এসেছি কয়েকদিন হ'ল। যে ঘরটিতে আছি, তার বারান্দায় এসে দাঁড়ালে 'উত্তরস্যাং দিশি' হিমালয়-দর্শনের কথা। সমতল বাংলার মানুষ। পাহাড় দেখলেই অবশ্য অবাক হই না। তবু হিমালয় সম্বন্ধে কতো দিনের কতো স্বপ্ন, ধ্যান, স্মৃতি, দেখবো বলে কতো দিনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রস্তুতি। লক্ষ্ণৌ থেকে পিলিভিত হয়ে আসতে আসতে কতবার ভেবেছি পথের মোড়ে যে-কোনো বাঁকেই খুলে যাবে সেই অফুরন্ত বিস্ময়ের স্তরে স্তরে আকাশস্পর্শী অভিযান। অরণ্য, পর্বত, নদী, গ্রামের পর আবার গ্রাম, শেষটায় এলো লোহাঘাট। আজকের দিনে মিলিটারীর কল্যাণে প্রায়-শহর এই লোহাঘাটের বাজারে আধুনিকতম কেনা-কাটারও অসুবিধে নেই। তবু লোহাঘাটের পথের দুধারে পাইন আর দেবদারুর সারি, মাথার উপরে ঘন হয়ে আসা মেঘ, দূর আকাশের কোণে একটি আধটি পাহাড়চূড়োর আভাস, শেষ বৈশাখের বাতাসেও শীতল বরফ-ছোঁওয়া —মুহূর্তে মনকে তৈরী করছিল এর পরবর্তী অভিযানের জন্য।

টাট্টু ঘোড়া নিয়ে দু'জন পাহাড়ী তৈয়ার, জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠতে যাবে, এমন সময় সবার পরিচিত ধনসিং এগিয়ে এসে নমস্কার জানালেন। একদা মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের ছোট্ট পোস্ট অফিসটির রানার, এখন আপন উদ্যোগে এ অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। আশ্রমের তীর্থ-যাত্রীদের কাছে ইনি একান্ত আপনজন। ধনসিংহের ভ্যান গাড়ীটি খালি আছে—আমরা আশ্রমযাত্রীরা অনায়াসে যেতে পারি।

প্রথম দফা চড়াই-উৎরাই অক্লেশে উত্তীর্ণ হয়ে আশ্রমে এসে পৌঁছলাম আধ ঘণ্টার মধ্যে। পাহাড়ী পথ মসৃণ হয়েছে যুক্তপ্রদেশের সরকারী বদান্যতায়। কিন্তু পথের সঙ্গে সঙ্গে জনতার হানা সম্ভব হয়নি। আশ্রমটি যে পাহাড়ের উপর, তার চারদিকের সীমানায় জনবসতি নিষিদ্ধ। আর এই নীরব নিষেধের পরপারে মায়াবতীর নগ্ন তপস্যার নির্জনতা।

যে ঘরটিতে রয়েছি, তার পাশ দিয়ে পাহাড়ী পথ উঠে গেছে উঁচু-নিচু অরণ্য-অন্ধকারে। সামনের একফালি জমিতে ন্যাসপাতিগাছে উঠছে নামছে কাঠবিড়ালি। আর অগণিত তরুশাখার ফাঁকে দূরে বিস্তারিত অধিত্যকা উপত্যকা পেরিয়ে চোখে পড়ে দিগন্তের সঞ্চিত মেঘমালা। আশ্রম-অধ্যক্ষ স্বামীজী বললেন, 'এখন দেখতে পাচ্ছেন না, যে-কোন মুহূর্তে ওই মেঘ সরে যাবে, আর হিমালয় দেখা দেবেন সমস্ত উত্তর দিকটা জুড়ে। একেই বলে মায়া। মায়া সরে গেলেই তাঁর দর্শন।'

প্রতিদিনের উদয়াস্ত-প্রত্যাশা বিমুখ মেঘের আড়ালে রেখে প্রথম পাঁচটি দিন কেটে গেছে। কাল ষষ্ঠ দিনের প্রভাত। এই মুহূর্তে অন্ধকার মায়াবতীর পাথুরে মাটিতে ধ্বনিত বৃষ্টির শব্দ, আর জানালার কাঁচের ওপরে একটি দুটি পতঙ্গের ঘোরাঘুরি ঘরের আলো লক্ষ্য ক'রে। আশ্রমের রান্নাঘর থেকে একটু আলোর রেখা ছাড়া বাইরের অন্ধকারে সূচী বিঁধবারও

জায়গা নেই। মাঝে মাঝে একটি দুটি বৃষ্টি-ধারায় আলোর চমক, আর তার পরেই বেহালার ছড়টানা মল্লারের মতো বৃষ্টির একতান। শুনতে শুনতে একসময় মনে হলো, কী জানি এই মেঘ যদি আর সরে না যায়। হিমালয়ের বুকে এসেও হয়তো হিমালয়ের চূড়া এমনি মেঘের আড়ালেই থেকে যেতে পারে। শুধু মেঘ, বৃষ্টি, রৌদ্র, ছায়া, অরণ্য, অন্ধকার, পতঙ্গ-ধ্বনিত নৈঃশব্দ্য—হয়তো এ যাত্রায় আমার এটুকুই লাভ!

তাই হোক, তবে তাই হোক।

কিন্তু—না—না—তাও কি হয়? আমি তো শুধু শখের ভ্রমণকারী হিসাবে এক চক্কর ঘুরে গিয়ে দেখা এবং না-দেখা হিমালয়ের কল্পিত উপন্যাস বানাতে আসিনি। ভারতের প্রাণের সত্য, ধ্যানের সত্য, উপলব্ধির সত্য এই হিমালয়। সেই তিন সত্যকে বুকের মধ্যে এক অখণ্ডরূপে গ্রহণ করবো বলেই হিমালয়ে আসা। নইলে এত কাছের দার্জিলিং-কালিম্পঙ ছেড়ে মায়াবতী আসা কেন?

অনেকদিন আগে কালিম্পঙে যাওয়ার ইচ্ছে জেগেছিল এক তরুণ বন্ধুর আহ্বানে। মনের কথা যাই থাক, বাদ সাধল অসুস্থ দেহ। তারপর প্রায় কুড়িটি বছর কেটে গেছে। কর্ম-চক্রের আবর্তনে হিমালয়ের ভৌগোলিক মাতামহী চেরাপুঞ্জী অবধি যাওয়া হয়েছে, তবু হিমালয়ের তুষারমৌলি স্বরূপ দেখার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু জোর করে তো পাওয়ার জিনিস এ নয়। আমি তো কেবল বহিরঙ্গ শোভাটুকু চাইনি, আমার হিমালয় ধ্যানের সত্তা নিয়ে অন্তরের মধ্যে জেগে উঠবে—এই চেয়েছিলুম।

বাইরের বৃষ্টির কান্নায় কান পেতে মনে হচ্ছিল, হয়তো এখনও সময় হয়নি। হয়তো তপস্যার বাকি অনেক। যাকে চোখে দেখতে চাই, তাকে খালি সময় আর সুযোগের মিলনেই ধরা যায়। যাকে ধ্যানে ধরতে চাই, সে নিজে ধরা না দিলে তো পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। যদি হিমালয়ে বেড়াতে আসতুম কেবল—তাহলে নিজের ভাগ্যকে দোষ দেওয়া যেতো। আমি যা দেখতে চাই, তা তো ভাগ্যের খেলা নয়, মানবজন্মের তা সহজাত অধিকার। হিমালয়-দর্শন তো আমার মতো ভারতবাসীর কাছে আত্মদর্শনেরই প্রতীক। সে আত্মিক সত্যের শিখরচূড়ার মেঘ হয়তো মিথ্যা নয়, তেমনি সত্যও নয়। সত্য সেই হিমালয়!

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'সমুদ্র আর হিমালয় না দেখলে অনন্তের ধারণা হয় না।' হয়তো সে-কথা ভেবেই একদা মনে জেগেছিল—

সমুদ্র দেখেছি আমি,
হিমালয় দেখিনি কখনো।
জানি এই তরঙ্গিত জীবন-জিজ্ঞাসা,
আনন্দের ফেনরাশি,
সংশয়ের নিত্য-আন্দোলন!
বহুদূর চক্রবালে
বহু দিন চেয়ে চেয়ে
অবিশ্রাম তটরেখা খুঁজেছি অন্তরে।
প্রীতির প্রবাল দিয়ে
তিলে তিলে গড়ে-ওঠা
কত প্রাণদ্বীপ
আশ্রয়-আশ্বাস দিয়ে ভরেছে হৃদয়!
নোঙর ফেলেছি যেই
দেখেছি অমনি,
সেই সব দ্বীপ ঘিরে তরঙ্গ ফেনিল
ক্রন্দন-কল্লোল-গীতে
ঘুরে ফিরে মরে।
তীরপ্রান্ত হ'তে চাই
দিক্‌প্রান্ত পানে;
হে অসীম

মেলেনি উত্তর !
তাই আজ চাই হিমালয় !
চাই আজ প্রত্যহের সমতল হ'তে
বিপুল বিস্ময় ভরা
মহা-আবির্ভাব,
অনন্ত প্রশ্নের লাগি
উত্তুঙ্গ উত্তর !
হে হিমাদ্রি,
মন্ত্র দাও, মৌন তব সংগোপন বাণী,
এ জীবন ধ্যান হোক,
হোক ওঁকার।

কখন ঘন-অন্ধকারে ঘরের আলো লুপ্ত হয়ে দু'চোখ ভরে ঘুম নেমে এসেছে। আমি সেই ঘুমের অতলে তলিয়ে যাবার আগে শুধু হিমালয়ের কথাই ভেবেছি।

ভোরের অন্ধকার তখনো পর্দার আড়ালে থমকে আছে। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের সকালবেলায় মাঙ্গলিক ধ্বনিত হ'লো পাখির গলায়। কান পেতে শুনলুম বৃষ্টি নেই। যখন ঘর ছেড়ে বাইরে এলুম চারদিকে ঝিলমিল রোদ। কেবল অভ্যাসবশে ন্যাসপাতি গাছটির তলায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চাইলুম। একরাশ শাদা মেঘের স্তূপ স্তরে স্তরে চলে গেছে পূব থেকে পশ্চিমে। মেঘ ? না—না—আর কিছু ;—আর কিছু নয়, এই তো হিমালয় ! একসঙ্গে একমুহূর্তে কতো না তুষারচূড়া নির্মল রৌদ্রের শুভ্রতায় অবিচল আনন্দঘন রূপে আকাশ জুড়ে দেখা দিয়েছে ! দ্রুতপদে এসে দাঁড়ালুম সেই ওকগাছটির তলায়—যেখানে পূজ্যপাদ হরিমহারাজের পুণ্যস্মৃতি আজও জড়ানো। না, কোনো ভুল নেই, এই তো হিমালয় !

আমার ঘরের বারান্দার দিকে কে ছুটে চলেছেন ? চেয়ে দেখি আশ্রমের অধ্যক্ষ মহারাজ। আমায় না দেখতে পেয়ে এদিকেই মুখ ফেরালেন, দূর থেকে হাত তুলে বললেন, 'আজ দেখতে পেয়েছেন।' আমার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ তাঁর দীপ্ত চোখেমুখে। সেই মুহূর্তে 'মধু বাতা ঋতায়তে। মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।'

আজ আমার প্রথম দেখা হিমালয়। আর প্রথম দিনটিতেই এমন দিগন্তজোড়া আবির্ভাব ! শুধু কেদার-বদরীর দিকে একটু মেঘের ছায়া। আর সমস্ত উপত্যকা জুড়ে এক মেঘের সমুদ্র, যেন তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে হিমালয়ের পাদমূল ঢেকে দিতে চাইছে। সেই মেঘসমুদ্র পার হয়ে ধবল তুষারশ্রেণী আত্মস্থ আনন্দে শুভ্র-জ্যোতি-বিকীর্ণ-মহিমায় মুহূর্তে যুগ-যুগান্তরের ধ্যান অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দিল।

আশ্রম-অধ্যক্ষ মহারাজ দূরবীণটি পাঠিয়ে দিয়েছেন। 'আপি নাম্বা' শিখর থেকে 'পঞ্চচুল্লি' পার হয়ে 'নন্দাদেবী'র দ্বৈতশিখরে চোখ রাখলুম। নন্দাদেবীর হিমশুভ্র বিস্তারের একপাশে একটু ছায়া হয়তো কাছাকাছি কোনো পাহাড়ের আংশিক বাধায় সূর্যালোক সেখানে পড়েনি। কেন জানি না, ওই ছায়াটুকুর জন্যই চারপাশের শুভ্রতা আরো মায়াময় হয়ে উঠেছে।

নন্দাঘুন্টি, ত্রিশূল, তারপর আবছা আভাসে কেদার-বদরী একটু উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল। এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্ত অবধি এত অবাধ দর্শন শুনেছি অন্যত্র একেবারেই দুর্লভ। আমেরিকান পরিভাষায় যা 'million dollar sight' (দশ লাখ টাকার দৃশ্য), আমাদের পরিভাষায় তা 'যোগমূর্তি গিরিশ'। অথবা এই শুভ্র তুষারপুঞ্জে স্তব্ধীকৃত ত্র্যম্বকের অট্টহাস !

আর এক দৃষ্টিতে, সমুদ্রমন্থনজাত অমৃতফেনার তরঙ্গায়িত প্রকাশ !

দূর থেকে যাকে মনোহর মনে হয়, কাছে এলে তাকে যদি আত্মার আত্মীয়রূপে চেনা যায়, তার চেয়ে আনন্দের বা সার্থকতার আর কিছু আছে কি ? দূরবীণের যোগে হিমালয়ের সঙ্গে এই মুহূর্তে যে সখ্যবন্ধন স্থাপিত হ'লো, তার অনাদি অনন্ত বিস্তার যেন আজকের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে।

আমার মাথার উপর ওকগাছের একটি দুটি পাতা ঝিরঝির করে ঝরে পড়ছে। দূরবীণের সামনে ছোট্ট প্রজাপতি মস্ত হয়ে উড়ে গেল। দূরে দূরে পাইন আর দেবদারুর চূড়া মাথা নেড়ে আমন্ত্রণ জানালো। আমি আর তো দূরের অতিথি নই, ওদেরই অন্তরের একজন ! আমি যে হিমালয়ের বরাভয় পেয়েছি !

অধ্যক্ষ মহারাজ বললেন, ধরমগড় ঘুরে আসুন। সেখান থেকে আরো ভালো দর্শন হবে। দু'জন তরুণ ব্রহ্মচারী বন্ধুর সঙ্গে ধরমগড় চললুম পাহাড়ী পথের মধ্য দিয়ে। গমের ক্ষেত পার হয়ে পথ চলে গেছে অরণ্যের অন্তরালে। তারপর বেশ কিছুটা সমতল ফাঁকা। স্বামীজী নাকি এইখানে একটি সাধন-ভজনের কুঠিয়া বানাতে চেয়েছিলেন—উপযুক্ত স্থানই বটে! একটু এগিয়ে এক সীমান্তে বেঞ্চ পাতা আছে। এখানে উৎসুক দর্শকেরা আসেন যেদিন হিমালয়ের মেঘাবরণ সরে যায়। আজও তেমনি দিন। কিন্তু এইটুকু পথ আসতে আসতেই মেঘেরা আবার আচ্ছন্ন করেছে উত্তরের আকাশ। আভাসে দেখা যাচ্ছে হিমালয়ের রূপরেখা। দূরবীণে ধরা পড়ছে নন্দাদেবীর দ্বৈতশিখর। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রথম দর্শনের নাট্যাঙ্কে যবনিকা নামতে শুরু করেছে।

ধরমগড়ের উপর থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে—বহুদূর পরিব্যাপ্ত যাতায়াতের পথ। অনেক দূরে মাঝে মাঝে লোকালয়ের আভাস। গল্প শুনলাম সেইসব অজানা পথিকদের, যাঁরা হিমালয়ের আকর্ষণে পথ হারিয়ে সারারাত উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয়ে ঘুরে ফিরেছেন, অথবা গাছের উপরে সশঙ্ক চিত্তে রাত কাটিয়ে দিয়েছেন! চারদিকে তরঙ্গিত পর্বতমালার মাঝখানে এই কুমায়ুন, আর এইখানে জীবনের প্রথম হিমালয়-দর্শন !

আশ্রমে যখন ফিরে এলাম, তখন সম্পূর্ণ মেঘে ঢেকে গেছে দিগন্তের হিমালয়। কিন্তু আমি তো আজ জেনেছি, ওই মেঘ সরে যায়। হিমালয় চিরন্তন।

নিবেদিতার চোখে ভারতবর্ষ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের আগুনের পরশ-মণির ছোঁয়ায় বিবেকানন্দে রূপান্তরিত হোলেন। মার্গারেট নোবল্ বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে এসে রূপান্তরিত হোলেন নিবেদিতায়। সাধু ফ্রান্সিসের যেমন সেণ্ট্ ক্ল্যারা, বিবেকানন্দের তেমনি ভগিনী নিবেদিতা। অদ্ভুত প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন এই ইংরেজ-দুহিতা মার্গারেট্ নোব্ল্। তাঁর সমস্ত লেখায় ও বক্তৃতায় বুদ্ধির কী উজ্জ্বল ছাপ! হৃদয়ের কোমলতায় নারীর স্বাতন্ত্র্য সহজেই প্রকাশ পায়। নিবেদিতার চরিত্রে এই কোমলতার কোন অভাব ছিলো না। কিন্তু নিবেদিতার জীবনে ও বাণীতে যেটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় সেটা হোলো তাঁর লেখায় ও বলায় যুক্তির অদ্ভুত বাঁধুনি। শাণিত তরবারির মতো ঝক্‌ঝক্ করছে তাঁর প্রজ্ঞার ঔজ্জ্বল্য! পড়তে পড়তে কেবলই মনে হয় এথেন্সের সক্রেটিসের কথা। চিন্তার মধ্যে ধোঁয়াটে কিছু নেই। নিবেদিতা যা-কিছু লিখেছেন, যা-কিছু বলেছেন তার মধ্যে একটা বলিষ্ঠ মনের পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির অকুণ্ঠ প্রকাশ দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই!

ইংরেজের (আইরিশ) ঘরে জন্মালেন, ইংরেজ মেয়ে যে শিক্ষা-দীক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষ হয়ে ওঠে, নিবেদিতাও সেই শিক্ষা-দীক্ষার মধ্য দিয়েই মানুষ হ'য়ে উঠলেন। জীবনের আঠারোটি বৎসর এই ভাবে কেটে গেল। আঠারো পেরিয়ে উনিশে পড়লেন। এখন থেকে নিবেদিতার ধর্ম-জীবনে শুরু হোলো একটি নূতন অধ্যায়। সংশয়ের ঝড় এসে তাঁর ধর্ম-বিশ্বাসে হানলো প্রচণ্ড আঘাত। খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বিগণের মতবাদ কি সত্যে প্রতিষ্ঠিত? বিচারের কষ্টিপাথরে বিচার ক'রে নিবেদিতা দেখতে পাচ্ছেন, বাইবেলে লিখিত অনেক কথাই যুক্তিসহ নয়। How and why I adopted the Hindu Religion ভাষণটীতে খ্রীষ্টীয় মতবাদগুলি সম্পর্কে তাঁর চিত্তে সন্দেহের যে-তরঙ্গ উঠেছিল তার কথা নিম্নলিখিত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন:

> "Many of them began to seem to me false and incompatible with truth. These doubts grew stronger and stronger and at the same time my Christianity tottered more and more."

> "আমার মনে হোলো তাদের অনেক-গুলিই মিথ্যে এবং সত্যের সঙ্গে তাদের কোনো সঙ্গতি নেই। এই সংশয়গুলি ক্রমে জোরালো হতে আরও জোরালো হতে লাগলো এবং একই সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মে আমার বিশ্বাস উত্তরোত্তর নড়্‌বড়ে হ'য়ে উঠলো।"

নিবেদিতার মনে একটুও শান্তি নেই। কিন্তু সত্যকে জানবার জন্য তাঁর মনে কি অদম্য পিপাসা। গীর্জায় যাওয়া বন্ধ ক'রে দিলেন। কিন্তু সংশয়াকুল চিত্ত দিগন্তে একটা আশ্রয় চায়! মনের শান্তি খুঁজতে নিবেদিতা তাই মাঝে মাঝে ছুটে যান গীর্জায়, ঈশ্বরের কাছে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা করেন। "But alas! no rest was there for my troubled soul all eager to know the truth." কিন্তু হায়!

নিবেদিতার অশান্ত আত্মা সত্যকে জানবার জন্য মরিয়া। সত্যকে জানার মধ্যেই তো আত্মার মুক্তি আর মুক্তির মধ্যেই তো আমাদের সব দুঃখের অবসান। সেই মুক্তি কতদূর? কতদূর?

সত্যের সন্ধানে ব্রতী হয়ে নিবেদিতা বিজ্ঞানের বই পড়তে শুরু করলেন। বিজ্ঞান প'ড়ে খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে যে অসঙ্গতি আছে তা নিবেদিতার কাছে আরও প্রকট হ'য়ে উঠলো। সত্যানুসন্ধিৎসার দুর্বার প্রেরণায় নিবেদিতা বুদ্ধের জীবন-কাহিনী পড়তে শুরু করলেন। পড়ে মনে হোলো, খ্রীষ্টজন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্বে বুদ্ধের জন্ম, কিন্তু ত্যাগের দিক থেকে বুদ্ধের ত্যাগ কি খ্রীষ্টের ত্যাগের চেয়ে অণুমাত্র কম? গৌতম বুদ্ধের অদ্ভুত জীবন-কাহিনীর ও বাণীর মধ্যে নিবেদিতা ডুবে রইলেন তিন বৎসর কাল। বুদ্ধ তাঁর দিনের চিন্তায় এবং রাত্রির ধ্যানে! এই সময়ের কথা লিখতে গিয়ে নিবেদিতার লেখনী থেকে বেরিয়েছে: "এই বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হ'য়ে উঠলো, বুদ্ধ যে-মুক্তির কথা বলেছেন তা খ্রীষ্টধর্মের মুক্তির তুলনায় নিঃসংশয়ে গভীরতর সত্যে প্রতিষ্ঠিত।"

সাত বৎসর ধরে নিবেদিতার এই আধ্যাত্মিক অভিযান চললো সত্যের সন্ধানে। সত্যের উপলব্ধিতে তিনি প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেননি এখনও। দ্বন্দ্বের এখনও শেষ হয়নি। কবে নিবেদিতা সমস্ত সংশয়ের পারে গিয়ে অবিচলিত কণ্ঠে বলতে পারবেন:

"পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ,
নাই তার কাছে জীবন মরণ,
নাই নাই আর কিছু।"

সত্যকে জানবার জন্য নিবেদিতার মনে যখন এই ব্যাকুলতা—দেখা দিলেন এক গৈরিক-পরিহিত সন্ন্যাসী সেই ইংরেজ-দুহিতার অদ্ভুত জীবনের দিক্‌চক্রবালে। ভারতের বড়লাট লর্ড রিপনের এক আত্মীয় নিবেদিতাকে নিমন্ত্রণ করলেন চায়ের আসরে। সেখানে নিবেদিতাকে তিনি পরিচিত করে দেবেন ভারতবর্ষীয় এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে। এই সন্ন্যাসী তাঁর সংশয়ের অন্ধকারের উপরে হয়তো সত্যের আলোকপাত করতে পারেন। অবশেষে এলো সেই ঐতিহাসিক মহালগ্ন যখন লণ্ডনের এক চায়ের আসরে নিবেদিতা প্রথম আসলেন স্বামীজীর সান্নিধ্যে। স্বামীজীর উপদেশাবলীর অরুণ-কিরণপাতে নিবেদিতার মনে যে-সকল সংশয়ের কুয়াসা ছিলো তা অপসারিত হোলো। কিন্তু নিবেদিতার সংশয়জাল ছিন্ন হতে সময় লেগেছিলো। নিবেদিতার মন সক্রেটিসের ধাঁচে গড়া। অকাট্য যুক্তির হাত ধরে চলতে সেই মন অভ্যস্ত। নিবেদিতার নিজের উক্তিতে আছে: "স্বামীজীর সান্নিধ্যে একবার বা দু'বার এসে আমার সংশয়গুলি দূর হয়নি। না, না, তাঁর সঙ্গে আমার অনেক আলোচনা হ'য়েছে। সেই আলোচনাগুলির মধ্যে উত্তাপ যে না থাকতো, এমন নয়। তাঁর উপদেশগুলি নিয়ে আমি মনের মধ্যে বিস্তর নাড়াচাড়া করেছি। ভাবতে ভাবতে বছর কেটে গিয়েছে। কিন্তু কোথায় যেন সন্দেহের একটা ভগ্নাবশেষ থেকে যায়। তখন স্বামীজী আমাকে বললেন ভারতবর্ষে গিয়ে যোগীদের দর্শন করতে, হিন্দু-ধর্মের যেখানে জন্ম সেখানে গিয়ে হিন্দুশাস্ত্র পড়তে। অবশেষে আমি এমন এক বিশ্বাসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি যার উপরে ভর দিয়ে মুক্তির আনন্দলোকে আত্মা উত্তীর্ণ হতে পারে।" এই প্রসঙ্গে স্বতই মনে জাগে স্বামীজীর কথা; গুরুর কাছে নিঃশেষে আত্ম-সমর্পণ করতে তাঁর ছয় বছর লেগেছিল

মার্গারেট নোবল্ কেন স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, কেনই বা তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম পরিত্যাগ করে হিন্দু হয়েছিলেন, তার কাহিনী পড়তে পড়তে আমার মনে বার বার উদয় হয়েছে টলস্টয়ের কথা। টলস্টয়ের My Confession পড়লে জানা যায় তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের অভিযানও নিবেদিতার অভিযানের মতোই ছিলো সংশয়ের তুষার-ঝঞ্ঝায় বিঘ্নিত। আধ্যাত্মিক জগতে মানুষের জন্মান্তর সংশয়ের দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে কি সম্ভব?

'The Master As I Saw Him' গ্রন্থে নিবেদিতা আরও পরিষ্কার করে লিখেছেন, কেন তিনি হিন্দুধর্মকে মনে করতেন "the highest and best of all religions." নিবেদিতার সত্যানুসন্ধিৎসু চিত্ত হিন্দুধর্মের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলো সত্যে অবিচলিত নিষ্ঠা। হিন্দুধর্মই জোরের সঙ্গে পৃথিবীতে ঘোষণা করেছে, ধর্ম হচ্ছে একটা জীবন্ত অভিজ্ঞতার ব্যাপার। ঈশ্বরের বাণী ব'লে শাস্ত্রে যা লিপিবদ্ধ আছে তাকে নির্বিচারে revealed truth হিসাবে গ্রহণ করা ধর্মের পর্যায়ে পড়ে না। দর্শনশাস্ত্রে যে-দিব্যানুভূতির কথা আছে তা ঋষিদের অভিজ্ঞতা থেকেই উচ্চারিত হয়েছে—এই বিশ্বাসের এবং শ্রদ্ধার মূল্য আছে নিশ্চয়ই। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্—ঋষির এই ঈশ্বরীয় উপলব্ধির কথাকে আজগুবি ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যুক্তির মুখোসপরা গোঁড়ামি ছাড়া আর কি? ঐ উপলব্ধিতে সকলেরই অধিকার আছে। কিন্তু ধর্মকে ঠিক ধর্মের পর্যায়ভুক্ত হ'তে হ'লে ঈশ্বরীয় উপলব্ধির মধ্যে যে-সত্য রয়েছে তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়ীভূত হওয়া চাই। হিন্দুধর্মের এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গিমার মধ্যে নিবেদিতার যুক্তিবাদী সত্যান্বেষী মন তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছিলো।

বিদেশিনী হলেও নিবেদিতা প্রজ্ঞার শুভ্র আলোয় ভারতীয় সংস্কৃতির যথার্থ রূপটি অবলোকন করেছিলেন আর ভারতবর্ষের প্রাণ-পুরুষকে তিনি এমন ক'রেই চিনেছিলেন যে, সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত আত্মা দিয়ে, সমস্ত চিত্ত দিয়ে এ দেশকে তিনি ভালোবেসেছিলেন। ভারত তার গীতা এবং উপনিষদ্, রামায়ণ এবং মহাভারত, বুদ্ধ এবং রামকৃষ্ণ, হিমালয় এবং গঙ্গা, দোল এবং দুর্গোৎসব, শ্রাদ্ধ এবং বিবাহ, আচার-অনুষ্ঠানের সমস্ত খুঁটিনাটি, সর্বোপরি তার শান্ত-নম্র সেবাপরায়ণা নারীজাতির চারিত্রিক মহিমা—সমস্ত কিছু নিয়ে নিবেদিতার চোখে অনুপম হয়ে দেখা দিয়েছিলো।

নিবেদিতা তাঁর গুরুদেবের মতোই বিশ্বাস করতেন, ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে এমন কিছু আছে যা ভারতের একেবারে নিজস্ব। এই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে তার ধর্মে, তার নৈতিক আদর্শগুলির মহিমায়। ভারতের দুই মহাকাব্যে এই মহিমময় নৈতিক আদর্শগুলিরই জয়গান। ভারতবর্ষ যদি তার নিজস্ব সংস্কৃতিতে বিশ্বাস হারিয়ে পশ্চিমের জীবনযাত্রা-প্রণালীর অনুকরণ করে তবে সেই আত্মঘাতী পরানুকরণ তার শিরে সর্বনাশ ডেকে আনবে,—এই সত্যে নিবেদিতার বিশ্বাস ছিলো অটুট। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি তাঁর বহু লেখায়, বহু ভাষণে ভারতীয় সাহিত্যে যে একটি মহিমময় আদর্শবাদ আছে তার বিপুল মূল্য সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছেন আমাদের। আমাদের গৃহজীবনের মধ্যে যে একটি সারল্য এবং শান্তি আছে, আমাদের সমস্ত পূজা-পার্বণ-আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সর্বভূতে প্রেমের এবং উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যের যে একটি ছন্দোময় অভিব্যক্তি রয়েছে—তা আমাদের দৃষ্টির সামনে নব গৌরবে প্রতিভাত হয়েছে নিবেদিতার লেখনী-

প্রসূত প্রবন্ধগুলির এবং কণ্ঠনিঃসৃত ভাষণগুলির কল্যাণে। তিনি সত্যই লোকমাতা ছিলেন। মা যেমন ছেলের চোখের পিচুটি ধুইয়ে দেন, নিবেদিতাও তেমনি তাঁর মাতৃহস্তে আত্মবিস্মৃত এই দুর্ভাগা জাতির চোখের পিচুটি যেন ধুয়ে দিয়েছেন। আমাদের ঐতিহ্যে, আমাদের আচার-অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিলাম আমরা। নিজেদের পূর্বপুরুষদের কীর্তিকলাপে অশ্রদ্ধা, স্বদেশের অতীত ইতিহাসের উপরে কটাক্ষপাত, স্বজাতির আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে বর্বরতার নিদর্শন মনে করা—আমাদের আত্মার পক্ষে এর চেয়ে তামসী রাত্রি আর কি হ'তে পারে?

তাই নিবেদিতা বিবেকানন্দের উপরে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন: "এদেশে অর্থ-নৈতিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা—অনেক সমস্যা আছে। এদের গুরুত্বকেও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সব-চেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ যে-সমস্যা তা হচ্ছে 'How India should remain India'।" ভারতবর্ষ কেমন ক'রে ভারতবর্ষ থাকবে—এইটাই হোলো বড়ো সমস্যা। ভারতবর্ষ যাতে আপনার জাতিগত সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে ইতিহাসের নাট্যলীলায় আপন ভূমিকাটি সগৌরবে অভিনয় ক'রে যেতে পারে তার জন্য নিবেদিতা এদেশের মাতৃজাতিকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "এই সুন্দরী ভারতভূমির কন্যা তোমরা প্রত্যেকে। তোমাদের সকলের প্রতি আমার ভালোবাসা গভীর। প্রাচ্যের মহৎ সাহিত্যগুলি তোমরা পাঠ করো, তোমাদের কাছে এই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ। পাশ্চাত্যের সাহিত্যগুলি এখন নাই বা পড়লে। তোমাদের সাহিত্য তোমাদের উন্নত করবে এই সাহিত্যকে তোমরা আঁকড়ে থাকো। তোমাদের গৃহজীবনের সরলতা ও সংযমকে আঁকড়ে থাকো তোমরা। অতীতে তোমাদের গার্হস্থ্যজীবনে যে একটি শুচিতা ছিলো তা এখনো রয়েছে তোমাদের গৃহজীবনের একটি সারল্যের মধ্যে। এই শুচিতাকে তোমরা অক্ষুণ্ণ রাখো।"

ভারতীয় জীবন-নাট্যের অনুপম সুষমার কথা বলতে গিয়ে এক জায়গায় নিবেদিতা নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী পরিবেষণ করেছেন। কলিকাতার একটি দরিদ্র পল্লীতে নিবেদিতা তখন বাস করেন। পয়সা বাঁচানোর জন্য চলা-ফেরা করেন ট্রামে, নয় ঘোড়ার গাড়ীতে। এই সময়ে রাত্রিকালেও অনেক সময়ে নিবেদিতাকে গলির রাস্তায় যাতায়াত করতে হোতো একাকিনী। সাহেব-পাড়ায় মাতাল ইংরেজ তাঁর মনে উদ্বেগের সঞ্চার করতো। ইংরেজসন্তান রাস্তায় মাতলামি করছে—এ দৃশ্যে নিবেদিতা খুবই ব্যথা পেতেন। খ্রীষ্টানপল্লী থেকে হিন্দুপল্লীতে এসে নিবেদিতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন। আটমাস নিবেদিতা লেনে কলিকাতার একটি হিন্দুপল্লীতে শিক্ষয়িত্রীর জীবন কাটাবার পরও সেই আট মাসের মধ্যে মাতলামির একটি দৃশ্যও নিবেদিতার চক্ষুকে পীড়িত এবং চিত্তকে উদ্বিগ্ন করেনি। "In eight months of living in the poorest quarter of Hindu Calcutta, such a sight had been impossible." হিন্দুপল্লীর এই স্বাতন্ত্র্য নিবেদিতার মনে গভীর রেখাপাত করেছিলো। নিবেদিতা আরও বলেছেন: "কোন হিন্দু—তিনি সমাজের যে শ্রেণীর অথবা সম্প্রদায়ের অথবা দলের হোন না—আমার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করেননি। আমার কোন অসুবিধার কথা তাঁদের কানে এলেই

নারী পুরুষ সবাই সেই অসুবিধা দূর করতে সচেষ্ট হ'তেন। গলির সব বাড়ীরই আমি যেন অতিথি ছিলাম। তাঁদের কাছ থেকে আহার্য রোজই আসতো। তাঁদের বাড়ীর ফলমূলের ভাগ আমি নিত্যই পেতাম। আমার বাড়ীতে অতিথি এলে তাঁরাই করতেন অতিথি-পরিচর্যার ব্যবস্থা। প্রেমের বশে এই যে আহার্য তাঁরা পাঠাতেন এর জন্য আমার মনে গর্ব্ববোধ আছে, কৃতজ্ঞতার অনুভূতিও আছে। এই যে প্রেমের দান—এ যে কী মিষ্টি!"

এই যে আতিথেয়তা—এর মধ্যে নিবেদিতা দেখেছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকাশ। নিবেদিতা দেখেছিলেন ভারতবর্ষের জীবন-ধারার অণু-পরমাণুতে অনুস্যূত হ'য়ে আছে এমন এক সংস্কৃতি যা অতি প্রাচীন। ভারত-বাসীদের নৈতিক চরিত্রের এই বিকাশসাধনে, তাদের মধ্যে রুচিবোধের এই উন্মেষ ও বিস্তারে সকলের চেয়ে সাহায্য করেছে কিসের প্রভাব? অকুণ্ঠ ভাষায় নিবেদিতা এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন, "জাতীয় মহা-কাব্য দুখানির অধ্যয়ন।" নিবেদিতা বলেছেন: "এই দুইখানি মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত। আমাদের কাছে যেমন সেকস্‌পীয়ার, হিন্দু-দের কাছে তেমনি রামায়ণ-মহাভারত। সেকস্‌পীয়ারের সঙ্গে প্রত্যেক ইংরেজের পরিচয় না-ও থাকতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক হিন্দুই রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী জানে। রামায়ণ-মহাভারত একাধারে সেকস্‌পীয়ারের কাব্যরসে ভরা এবং বাইবেলের ধর্মভাবের পবিত্রতায় পরিপূর্ণ।"

ভারত আমাদের জন্মভূমি হ'লেও এদেশের অন্তরাত্মার সঙ্গে আমাদের কয়জনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে? উপনিষদ্ আমরা কয়জন পাঠ করেছি? আমরা কবির কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি বটে "মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এসিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।" কিন্তু কেন ভারতবর্ষ মহিমার জন্মভূমি, তা জানবার জন্য প্রজ্ঞার যে আলো দরকার সে আলো কোথায়? নিবেদিতা প্রজ্ঞার মহাসম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী ছিলেন। বিদেশিনী হয়েও ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মের মধ্যে তিনি প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থরাজির এবং ভাষণগুলির মুকুরে, সর্বোপরি তাঁর মহাজীবনের নির্মল দর্পণে আমরা ভারতবর্ষের যে-রূপটীকে প্রতিফলিত দেখেছি, অনির্বচনীয় তার মহিমা। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন জন্মভূমিকে ভালোবাসতে।

বর্তমান গণশিক্ষায় প্রাচীন শৈলী

অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

শিক্ষার ওপরই নির্ভর করে সভ্যতার অগ্রগতি। উন্নতিকামী দেশগুলিতে সর্বাংগীণ সমুন্নতির জন্য শিক্ষাব্যবস্থার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়। দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ-প্রাচুর্যের উৎপাদন এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থাপনা কল্যাণ-রাষ্ট্রের আজকাল সর্বজনস্বীকৃত কর্তব্য। বিশেষতঃ, যে গণতান্ত্রিক ভারতের সরকার মনীষী লিঙ্কনের ভাষায়—"Government of the people, by the people, for the people", সে দেশে গণশিক্ষার সার্থক রূপ একান্ত অপেক্ষিত।

ভারতীয় সভ্যতায় জ্ঞানসাধনার নিত্য প্রয়োজনীয়তা সনাতন কাল থেকেই স্বীকৃত। প্রতিটি গৃহীর দৈনন্দিন অবশ্যকরণীয় পঞ্চ-মহাযজ্ঞের মধ্যে একটি হ'ল ব্রহ্মযজ্ঞ তথা বেদপাঠ তথা নিত্য শাস্ত্রপাঠের মাধ্যমে জ্ঞানের কিছুটা অনুশীলন। জ্ঞানদীপ্ত এবং সমুন্নত-চরিত্র নাগরিকই রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। শিক্ষা ব'লতে ভারতবর্ষ কোনো গ্রন্থপাঠের দ্বারা অর্থোপার্জনের বিশেষ কৌশলকে আয়ত্ত করা কখনো বোঝায়নি। বর্তমানে শিক্ষা হচ্ছে "জীবিকা কেন্দ্রিক", "জীবন-কেন্দ্রিক" নয়। এখন শিক্ষাগ্রহণ ভালো ক'রে পাশ করার জন্য। ভালো ক'রে পাশ করা ভালো চাকরী পাবার জন্য। ভালো চাকরী ক'রে প্রভূত অর্থ উপার্জন ক'রে জীবন-ধারণের মান উন্নত করাই আমাদের লক্ষ্য। ভালো খাওয়া, ভালো পরা এবং ভালো ঘরে থাকাই আমাদের উন্নত জীবনের লক্ষণ। মোটামুটি, উদর এবং চর্মকে পরিতৃপ্ত করাই হ'ল আমাদের আধুনিক শিক্ষা-সাধনার লক্ষ্য। উন্নত মনুষ্যত্ব অর্জন নয়, উন্নত জীবন-মান তথা high standard of lifeই হচ্ছে আমাদের বর্তমান শিক্ষার লক্ষ্য। গীতার কথায় বলা চলে—

"আশাপাশ-শতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥"

এই তো আমরা ক'রে চলেছি। দেশে আজ চতুর্দিকে অসংখ্য স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-সমাজ-শিক্ষাকেন্দ্র লক্ষ লক্ষ অর্থের ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। প্রতি বৎসর জ্যামিতিক গতিতে পাশ করা লোকের হার বেড়ে চলেছে। অথচ, দেশে মনুষ্যত্বের এমন সার্বিক অভাবে আমরা আবার দুশ্চিন্তিত কেন, ভাববার বিষয়।

তা'হলে দেখছি, প্রচলিত শিক্ষা আমাদের অভাব মেটাতে পারেনি। **প্রথমতঃ,** এই শিক্ষা বৃত্তিমুখীন, মনুষ্যত্বমুখীন নয়। **দ্বিতীয়তঃ,** এই শিক্ষা বৈতনিক এবং আড়ম্বর- ও জটিলতা-পূর্ণ ব'লে দেশের আপামর জনসাধারণ এই শিক্ষার সুযোগ নিতে পারেন না। বেতন দিয়ে পড়ার সামর্থ্য এই দেশে অধিকাংশ লোকের নেই। তদুপরি, বিদ্যালয়গুলি বিশেষ স্থানে এবং বিশেষ সময়ে চালু থাকায় উদয়াস্ত কর্মরত সাধারণ জনগণ তার সুযোগ নিতে পারেন না। আজকাল কোথাও জনগণকে শিক্ষিত ক'রে তুলতে হ'লে সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা। বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন একটি নিজস্ব জমি, তার ওপর একটি বাড়ি, তাতে অনেকগুলি কক্ষ, কিছু

চেয়ার-টেবিল বেঞ্চি প্রভৃতি আসবাব, কয়েকজন শিক্ষক, অন্য কয়েকজন সহায়ক কর্মী, তাঁদের নিয়মিত দক্ষিণার ব্যবস্থা, আবার একটি সংরক্ষিত ধনভাণ্ডার (reserve fund)। এই সবের জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তাই, ছাত্রদের কাছ হ'তে বেতন এবং সরকারী অনুদানের ওপর নির্ভর ক'রে এই সব কেন্দ্রগুলি চলে। অভিভাবক এবং সরকারেরও আর্থিক দুর্গতির জন্য বিদ্যালয়গুলির ব্যয়ানুকূল আয় হয় না। ফলে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের কী দুরবস্থা তা শিক্ষক এবং পরিচালকবর্গ মর্মান্তিক-ভাবেই জানেন। ছাত্রেরা বেতন দিতে গিয়ে অভাবে পড়ে, তাই তারা ক্ষুব্ধ। শিক্ষকগণ নিয়মিতভাবে বাঞ্ছিত দক্ষিণা যথাযথ পান না। তাই, তাঁরা অসন্তুষ্ট। একে তো অর্থের এবং সময়ের অভাবে জনগণের বৃহত্তম অংশ বিদ্যালয়ের সুযোগ নিতে পারেন না। আর, যে সৌভাগ্য-বান ক্ষুদ্রতম অংশটি পারেন, তাঁরাও পূর্ণ প্রাপ্য পেয়ে ওঠেন না। আবার, যেটুকু পান, তাতে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হয় না, হয় বিত্তোপার্জনের নৈপুণ্যশিক্ষামাত্র। এই সমস্যাগুলির সমাধানে প্রাচীন ভারতের শিক্ষণশৈলী কতটা সমর্থ, আলোচনা ক'রে দেখা যেতে পারে।

আমাদের দেশে চিরকালই শিক্ষা ছিল জীবন-মুখী, জীবিকা-মুখী নয়। আমাদের কথা—"**সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে**"—যা মানুষের মনের মুক্তি ঘটাতে পারবে, সকল সংকীর্ণতা এবং মোহ থেকে মুক্ত ক'রে মনুষ্যত্বের মহত্ত্বে ভাস্বর ক'রে তুলবে, সেইটিই তো বিদ্যা। এই মহতী বাণীটি যদিও পশ্চিম-বঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের seal-এর ভিতর অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত র'য়েছে, তার যাথার্থ্য শিক্ষাসংস্কারকালে কতটুকু রক্ষিত হয়, ভাববার বিষয়। প্রসঙ্গতঃ, উপনিষদের সেই অনবদ্য সমাবর্তন-ভাষণটি বিশেষ ক'রে স্মরণীয়। নবভারতের প্রাণপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ তাই শিক্ষা সম্বন্ধে ব'লতে গিয়ে ব'লেছিলেন—"Education is the manifestation of the perfection already in man." – মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা প্রসুপ্ত হ'য়ে আছে, তাকে জাগ্রত করাই হ'চ্ছে শিক্ষা। আগে মানুষ হোক, তারপর সে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, অধ্যাপক, ব্যবসায়ী যাই হ'তে চায়, তাই হবে। কিন্তু, এখন আমরা প্রায় গোড়া থেকেই বিশেষীকরণ বা স্পেশালাইজেশন্ ঠিক ক'রে নিয়ে যে বৃত্তিতে সে যাবে, তাই তাকে করবার ব্যবস্থা করি। মানুষ করার কথা ভাবি না। তাই, ভালো ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষ চিকিৎসক, পণ্ডিত অধ্যাপক প্রভৃতি যথেষ্ট আজকাল সমাজে মেলে। মেলে না শুধু ভালো মানুষ। আমাদের শিক্ষা এক-সঙ্গেই ছিল formative ও informative। এখন তো শুধু informative। অত্যধিক ভোগাসক্তিতে শিক্ষার ঐ গোড়ার কথাটি ভুলে যাবার জন্যে আজ সারা সমাজে মনুষ্যত্বের এমন অত্যন্তাভাব উৎকটভাবে প্রকটিত হ'য়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়তঃ, সর্বজনীনভাবে গণশিক্ষার যে একটি অপূর্ব ব্যবস্থা ভারতে ছিল, জগতে কোথাও এমনটি দেখা যায়নি। এখন আমরা বাড়ী ক'রতে plan তথা পরিকল্পনা করি, দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য পরিকল্পনা করি, পথঘাটের জন্য পরিকল্পনা করি। আধুনিক যুগে দ্রুত সুফল পাবার জন্য planned way তে অর্থাৎ পরিকল্পিত ভাবেই অগ্রসর হওয়া রীতি। তাইতো এতো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ঘটা। প্রতীচ্য থেকে এই পরিকল্পনার রীতি আমরা শিখেছি,

স্বাধীনোত্তর ভারতে progress তথা প্রাগ্রসরতার জন্য প্রয়োগ ক'রছি। আমাদের ঋষিপিতামহেরা কিন্তু এই পরিকল্পনা শুরু ক'রতেন একেবারে জীবনকে নিয়েই। পরিকল্পিত সমাজের জন্য **চাতুর্বর্ণ্য** এবং পরিকল্পিত জীবনের জন্য তাঁরা গ্রহণ ক'রেছিলেন **চতুরাশ্রম**। বর্তমানে সমাজ এবং ব্যক্তিজীবনের কোন পরিকল্পনা নেই, পরিকল্পনা আছে তার ভোগের উপকরণের। কিন্তু, সনাতন ভারতের প্ল্যানিং আরম্ভ হ'য়েছিল সমাজ এবং ব্যক্তিকে নিয়েই। তার ফলে বহু আঘাতেও এতকাল ধ'রে ভারতীয় সমাজব্যবস্থা এবং ব্যক্তিজীবন এখনো পুরো ভেঙে পড়েনি। এই যে চতুরাশ্রম, তার প্রথমটি হ'চ্ছে ব্রহ্মচর্য। জীবনের এই প্রথম দিকটায় সবাইকে গুরুগৃহে গিয়ে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে বাস ক'রতে হ'ত। ফলে সুগঠিত দেহ, জ্ঞানোন্নত মন এবং পরিশীলিত চরিত্রের অধিকারী হ'য়ে সবাই সংসারে কর্মজীবনে প্রবেশ ক'রত। আজো শিক্ষার শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা হ'চ্ছে অবৈতনিক এবং আবাসিক। প্রাচীন ভারতীয় ঋষি-শাসিত সমাজে সুচিন্তিত এবং পরিকল্পিত ব্যবস্থার মাধ্যমে সবাই এই অবৈতনিক এবং আবাসিক শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ ক'রতে পারতো। সংস্কৃত টোল-চতুষ্পাঠীতে সেই পদ্ধতিটিই এখনো অনুসৃত হ'য়ে চ'লেছে। অনাড়ম্বর এবং অবৈতনিক হওয়ার জন্যে টোলে পড়বার সুযোগ **সবাই** গ্রহণ ক'রতে পারে। আর, টোলের প্রতিষ্ঠার জন্য বিপুল অর্থেরও কোন প্রয়োজন নেই। যদিও এই চতুষ্পাঠীলব্ধ শিক্ষার দ্বারা বর্তমানে অর্থোপার্জনের বিশেষ কোন কৌশল আয়ত্ত করা যায় না, তবুও দুর্লভ **মনুষ্যত্ব** সহজেই লাভ করা যায়। স্বাধীনোত্তর ভারতে এই নিয়ে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ঘটনা বিবৃতি করা হ'চ্ছে।

১৯৪৭-এ দেশবিভাগের অনিবার্য পরিণতিতে রংপুরের একজন টোলের পণ্ডিত সনকেশ্বর স্মৃতিতীর্থ কোচবিহারের নাদিরহাটে গিয়ে বাড়ী করেন। প্রতিবেশী সব স্থানীয় কোচ্ উপজাতির লোক। তাঁরা কৃষিজীবী। স্কুল-কলেজের পাট ওখানে নেই। শিক্ষার আলো থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত। নৈতিক মানও খুব উন্নত নয়। নতুন ক'রে স্কুলে গিয়ে পড়বার মতো অর্থ, সময় এবং ইচ্ছা কোনটাই তাঁদের নেই। টোলের পণ্ডিত মশাই এই পরিবেশে মনকে মানিয়ে নিতে পারছেন না। অথচ অন্যত্র গিয়ে বাড়ী করার মতো আর্থিক সামর্থ্যও তাঁর নেই। তাই ভাবলেন, এই অজ্ঞলোকগুলোকেই শিক্ষিত ক'রে তোলা যায় কিনা চেষ্টা ক'রে দেখা যাক্। তিনি স্থানীয় কোচ্ অধিবাসিগণকে বোঝালেন যে, তাঁরা আসলে ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়েরা সদাচারসম্পন্ন ও সুশিক্ষিতই ছিলেন পূর্বে। বর্তমানে নিজেদের ঐতিহ্য ভুলে অশিক্ষার অন্ধকারে থেকে সদাচার বর্জন ক'রে শোচনীয় জীবন যাপন ক'রছেন। তাঁদের আত্মচেতনা জাগ্রত ক'রতে চেষ্টা ক'রলেন তিনি। সাড়াও পেলেন কিছুটা। জাগলো তাঁদের মধ্যে লেখাপড়ার আগ্রহ, শাস্ত্রজ্ঞানের জিজ্ঞাসা। কিন্তু পড়ার স্কুল নেই; স্কুল ক'রে দিলেও বেতন দেবার সামর্থ্য নেই এবং সময়ও নেই। মাঠে চাষ ক'রবেন, না ১১টা হ'তে ৪টা পর্যন্ত স্কুলে কাটাবেন। এই রীতিতে অনভ্যাসে ইচ্ছাও তাই নেই।

এই অবস্থায় পণ্ডিত মশাই টোলের শৈলী নিয়ে নিরীক্ষায় নামলেন। টোলে মাইনে দিতে হয় না। সময়েরও বাঁধাবাঁধি নেই।

মাঠের মাঝখানে নগ্নগাত্র নগ্নপদ পণ্ডিত মশায় হাতে সংস্কৃত পুঁথি নিয়ে ব'সে থাকতেন। চার পাশের মাঠে চাষে-রত চাষীরা একবার ক'রে তাঁর কাছে এসে একটি ক'রে সূত্র শুনে নিয়ে আবৃত্তি ক'রতে ক'রতে হাল-গোরু নিয়ে একবার মাঠ ঘুরে আসছেন। আবার, আর একটি সূত্র আবৃত্তি ক'রতে ক'রতে আবার একবার মাঠ ঘুরে আসছেন। এমনি ক'রে চ'ললো তাঁদের অধ্যয়ন। এইভাবে অনাড়ম্বর ভাবে পণ্ডিত মশায়ের অনলস পরিশ্রমে এবং নীরব সাধনায় সেখানে **ক্ষাত্রচতুষ্পাঠীর** নামে বহু কৃষিজীবী কোচ্ টোলের বিভিন্ন পরীক্ষায় পাশ ক'রেছেন; কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, স্মৃতির রাজ্যে তাঁরা প্রবেশ ক'রেছেন। শাস্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে মনে তাঁদের জেগেছে ধর্মজিজ্ঞাসা। একশটি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে একশ হরিসভা। সপ্তাহান্তে তাঁরা সেখানে মিলিত হ'য়ে নিজেদের ধর্ম, আচার, ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা করেন। হরিসভা-গুলির কেন্দ্রীয় সংগঠন "ধর্মপ্রচারিণী সভা" প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে তপ্সীতলায়। চার দিন ধ'রে অনুষ্ঠিত হয় তার বার্ষিক বিরাট উৎসব। বহু সহস্র নরনারী দুদিনের পথ পর্যন্ত হেঁটে এসে সেখানে যোগদান করেন। চালের মুষ্টি-ভিক্ষায় নির্বাহিত হয় সব ব্যয়। ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, ভারতবিখ্যাত চিকিৎসক, বরেণ্য মনীষী ডঃ নলিনীরঞ্জন সেন-গুপ্তের আনুকূল্যে বর্তমান লেখকের সৌভাগ্য হ'য়েছিল গত ফাল্গুন মাসে সেখানে আহূত হ'য়ে সংস্কৃতে ও বাংলায় ভাষণ দেবার। ভারতের জাতীয় সংহতি, সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা, ভারতের জাতীয় ঐতিহ্য, হিন্দুধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থা প্রভৃতি ছিল ভাষণের বিষয়। বিকেল চারটা হ'তে রাত দশটা পর্যন্ত সভাস্থলে প্রশান্তভাবে উপস্থিত কয়েক সহস্র শ্রদ্ধালু নরনারীকে উপস্থিত থাকতে দেখতাম। কেবল বৃদ্ধ নয়, তরুণ, প্রৌঢ় এবং নারীরাও আছেন যথেষ্ট সংখ্যায়। ছয় ঘণ্টা ধ'রে চ'লেছে এমন সভায় একটু গুঞ্জন কখনো শুনিনি। নারীরা সেখানে পর্দানশীন নন। তাঁরা সেখানে স্বাধীনভাবে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করেন। তিন দিন সেখানে বাস ক'রেছি। কিন্তু কোনো নারীকণ্ঠস্বর শুনেছি ব'লে মনে হয় না। তরুণদেরো কোনো উচ্চ কণ্ঠ এবং অপশব্দ শুনিনি, দেখিনি কোনো অশালীন ব্যবহার। এমন পরিশীলিত জীবনের চিত্র জীবনে বড় আর দেখিনি। শ্রদ্ধা এবং আন্তরিকতার তো কথাই নেই। চুরি, ডাকাতি, মারামারি সেখানে নেই। কোচ্ চাষীরা তাঁদের এক এক জনের বাড়ী নিয়ে যেতেন এবং আপনা-থেকেই বলতেন যে সংস্কৃত-নির্ভর, পরিশীলিত, ধর্মনিষ্ঠ জীবন-যাপনের ফলে তাঁদের জাগতিক অভ্যুদয়ও বেশ হ'য়েছে। যাঁদের ছিল আগে খড়ের চাল, এখন ক্রমশঃ তাঁদের টিনের চাল হ'য়েছে। ছাব্বিশ বছর বয়স্ক অন্ধ যুবক সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মুখস্থ ব'লছে। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্" দেখলাম মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। সংস্কৃতজ্ঞান মূলে থাকায় বাংলা ভাষায় এই কৃষিজীবী কোচ্দের যে অধিকার দেখেছি, আমাদের বাংলায় এম্-এ পাশ করা অনেকেরই তা নেই। আর, সদাচার ও নীতিজ্ঞানের দুর্লভ অস্তিত্ব তাঁদের ক'রেছে মহনীয়। Dictum of the 7th Earl of Shaftburyর কথায়—

> "Education without instruction in religion and morals would merely create a race of clever devils."—
> ধর্ম- এবং নীতিবর্জিত শিক্ষা কেবল কতগুলি চতুর দুর্বৃত্তকেই সৃষ্টি করে।

স্বাধীনতার পর দেশের মানুষকে শিক্ষিত ক'রে তোলার জন্য কত স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-সমাজশিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই দরিদ্র-দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা তাতে ব্যয় করা হচ্ছে ধর্ম এবং নীতিকে সযত্নে পরিহার ক'রে আর সর্ববিধ বিষয়ে সাড়ম্বরে সেখানে শিক্ষা দেওয়া হ'চ্ছে। অথচ, সেখানে যাঁরা শিক্ষিত হ'য়ে এসেছেন এবং যাঁরা হ'চ্ছেন, তাঁদের একটা বিরাট অংশের কর্মের দ্বারা সমাজের শান্তি আজ ব্যাহত। সরস্বতীর কমল বন আজ কিছু কিছু রাজনৈতিক মত্ত হস্তীর শুণ্ডোৎক্ষেপে বিপর্যস্ত। ছুতোনাতায় বিক্ষোভ এবং ধর্মঘট করাই অনেক ছাত্রগোষ্ঠীর আজ মর্যাদালাভের একমাত্র উপায়ে পর্যবসিত হ'য়েছে। প্রতিটি বিক্ষোভের (যার অনেকগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিদ্যাকেন্দ্রের দূরতম সম্পর্কও নেই) সময় দেশের এই শিক্ষিতগোষ্ঠী যেভাবে দরজা-জানালা এবং আসবাবপত্র ভাঙেন, ল্যাবরেটারীর ক্ষতিসাধন করেন এবং সেখানকার প্রধানের ওপর মানসিক এবং কোথাও কোথাও দীর্ঘ সময় ধ'রে ঘেরাও ক'রে রেখে দৈহিক উৎপীড়ন এবং বাচিক নির্যাতন করেন, তা বাইরের অন্য কেউ যদি করতো সে দুর্বৃত্ত ব'লে পরিগণিত হ'ত এবং আইন অনুসারে দণ্ডিত হ'ত। অশালীন বিক্ষোভের অশোভন প্রকাশে অনেক বিদ্যাকেন্দ্র আজ শান্তিকামী সজ্জনের দুষ্প্রবেশ্য হ'য়ে প'ড়েছে। এই ছিন্নমস্তার ভূমিকার অভিনয়ে কোন্ ইষ্ট তাঁরা লাভ ক'রবেন, সেটা তাঁরা তখন ভেবে দেখেন না। দলবৃদ্ধির উন্মাদনায় উল্লসিত কোন কোন ব্যক্তি এই মতিচ্ছন্নতাকে নেতৃত্ব দিয়ে এবং কেউ কেউ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় নিষ্ক্রিয়ভাবে অভিনয় ক'রে তরুণ সম্প্রদায়ের এবং দেশের চূড়ান্ত ক্ষতিসাধন ক'রে চলেছেন। তারুণ্যের এই অপচয়ে দেশের মহতী বিনষ্টি। এই দরিদ্র দেশের বহু অর্থ ব্যয় হয় এই সুশিক্ষিত দেশদরদীদের কৃতকর্মের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যা-কেন্দ্রগুলির ভগ্নকক্ষ, আসবাবপত্র এবং যন্ত্র-রাজির পুনর্নির্মাণে, যার ভগ্নাংশ দিয়ে বহু দরিদ্র ছাত্রের নিঃশুল্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। হালের এক একটি ছাত্র-আন্দোলনের ফলে ছাত্রদের নিজেদের এবং সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি কত হয়, তার পরিসংখ্যান প্রকাশিত হ'লে শিউরে উঠতে হবে। যাহোক্, এইভাবে ধর্ম- এবং নীতিবর্জিত শিক্ষার সুফল (?) আমরা নিত্যই ভোগ ক'রছি। স্বাধীনতার পর বাইশ বছর ধ'রে বহু অর্থের বিনিময়ে এই বৈতনিক, জাঁকজমকপূর্ণ, সযত্নে ধর্ম- এবং নীতিবর্জিত অথচ অন্য সর্ববিধ বিষয়যুক্ত শিক্ষার ফলে যাঁরা পূর্বে সৎ ছিলেন, তাঁরাও আজ পরিবর্তিত হ'তে চ'লেছেন।

আর বিপরীত চিত্র দেখে এলাম কোচ-বিহারের পল্লীতে। বাইশ বছর পূর্বে যারা ছিল অসৎ, ধর্ম- ও নীতিনির্ভর, শুধুমাত্র অনাড়ম্বর টোলের সংস্কৃত শিক্ষার দ্বারা তারা আজ মনুষ্যত্বের দুর্লভ মহিমায় ভাস্বর। "এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন"—এ তো আমার চোখে দেখা বর্তমানের ঘটনা। গীতোক্ত শ্রদ্ধা, তৎ-পরতা ও ইন্দ্রিয়সংযমের সহায়ে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবার দ্বারা তাঁরা অর্জন করেছেন সত্যিকারের জ্ঞান। টোলের সংস্কৃতশিক্ষা-শৈলী সত্যিকারের গণশিক্ষার ক্ষেত্রে আজও কত ফলপ্রসূ, এ তো তারি নিদর্শন।

শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কৃতের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ক্রান্তদর্শী শিক্ষানেতা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি অনুধাবনীয়।—

"ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত, সেটার

আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব। তাকে অন্তরে গ্রহণ করব, শিক্ষার এই লক্ষ্য আমার মনে দৃঢ় ছিল।...সংস্কৃত ভাষায় একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে, তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী, বিশ্ব-প্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিত্তকে মর্যাদা দিয়ে থাকে।"

(আশ্রমের রূপ ও বিকাশ)

"শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ" প্রবন্ধে টোলের অনাড়ম্বর শিক্ষাশৈলীর প্রশংসায় তিনি বলছেন—

"আন্তরিক সত্যের দিকে যা বড়ো, বাহ্য-রূপের দিকে তার আয়োজন আমাদের বিচারে না-হলেও চলে অন্তত: এতকাল সেই রকমই আমাদের মনের ভাব ছিল।...অত্যন্ত সত্য, নিতান্ত স্বাভাবিক, অথচ মস্ত ক'রে চোখে পড়ে না এদেশের সনাতন সংস্কৃতির মূল উৎস সেইখানেই।...সেখানে বিদ্যাদানের চিরন্তন ব্রত দেশের অন্তরের মধ্যে অলিখিত অনুশাসনে লেখা। বিদ্যাদানের পদ্ধতি, তার নি:স্বার্থ নিষ্ঠা, তার সৌজন্য, তার সরলতা, গুরুশিষ্যের মধ্যে অকৃত্রিম হৃদ্যতার সম্বন্ধ সর্ব-প্রকার আড়ম্বরকে উপেক্ষা ক'রে এসেছে, কেননা সত্যই তার পরিচয়।

যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষার ক্ষেত্রে বারবার সংস্কৃত এবং তদাশ্রিত আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনের কথা ঘোষণা ক'রে গেছেন।—

"সংস্কৃত শিক্ষায় সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণ-মাত্রেই জাতির মধ্যে একটি গৌরব, একটি শক্তির ভাব জাগিবে।...আমি **ধর্মকে** শিক্ষার ভিতরকার সার জিনিস বলিয়া মনে করি।"

(শিক্ষাপ্রসঙ্গ)

তাই, এই প্রগতিবাদী সন্ন্যাসী শিক্ষানেতাদের জানিয়েছেন উদাত্ত আহ্বান—

"Before flooding India with socialistic and political ideas, first deluge the land with spiritual ideas. The first work that demands our attention is that the most wonderful truths confined in our Upanishads, in our scriptures, in our Puranas, must be brought out."

সংস্কৃতকে অবজ্ঞা ক'রে ধর্ম- ও নীতিহীন শিক্ষা প্রবর্তিত ক'রে আমরা প্রগতির পথে কতটুকু অগ্রসর হ'য়েছি তা আজীবন শিক্ষাব্রতী, বাংলার নব জাগৃতির অন্যতম নায়ক, ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীদের অন্যতম মুখ্য পুরুষ, ব্রাহ্ম মনীষী রাজনারায়ণ বসুর সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যপ্রকাশক কথাগুলি আজ কি আরো বেশী ক'রে মনে পড়ে না!-

"যখন আমরা শারীরিক বলবীর্য হারাই-তেছি, **যখন দেশীয় সুমহৎ সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রের চর্চা হ্রাস পাইতেছে,** যখন দেশীয় সাহিত্য ইংরেজী অনুকরণে পরিপূর্ণ, যখন দেশের শিক্ষাপ্রণালী এত অপকৃষ্ট যে, তদ্দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ না হইয়া কেবল স্মৃতিশক্তির বিকাশ হইতেছে; **যখন বিদ্যালয়ে নীতি-শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে না, যখন চতুর্দিকে পানদোষ, অসরলতা, স্বার্থপরতা ও সুখ-প্রিয়তা প্রবল,** যখন আমাদের রাজ্যসম্বন্ধীয় অবস্থা শোচনীয়, বিশেষত: **যখন ধর্মের অবস্থা অত্যন্ত হীন, তখন গড়ে আমাদের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে, তাহা মহাশয়েরা বিবেচনা করুন।"**

(আত্মপরিচয়—রাজনারায়ণ বসু, পৃ:-১৩২)

কেবল বিত্তার্জনের যে শিক্ষা আমরা প্রবর্তিত ক'রেছি, তাতে "বিত্তের" ভাণ্ডার পূর্ণ হ'লেও রিক্ত থেকে যাচ্ছে "চিত্তের" ভাণ্ডার। উপ-নিষদের বাণী "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্য:,"— আজ ঠেকে হ'লেও আমাদের শেখা প্রয়োজন। মৈত্রেয়ীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আজ আমাদের আবার বলার দিন এসেছে—"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

প্রায় ৩০ বৎসর আগে একটি সভায় যোগ দেবার জন্য আহূত হয়ে আমি সস্ত্রীক এলাহাবাদ গিয়েছিলাম। ওখানকার ভাইস চ্যান্সেলার (Vice-Chancellor) শ্রীঅমিয়চন্দ্র ব্যানার্জীর বাড়ীতে ছিলাম। তাঁর বৃদ্ধ পিতা শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ব্যানার্জী—অবসরপ্রাপ্ত সেসন্স-জজ—ঐ বাড়ীতেই থাকতেন। আমি সারা দুপুরই প্রায় বাইরে থাকতাম।

একদিন বিকালে বাড়ী ফিরে দেখি, আমার স্ত্রী খুব বিষণ্ণভাবে বসে আছেন। তাঁর মুখে সমস্ত ব্যাপারটা শুনে আমিও খুব আশ্চর্য বোধ করলাম। ব্যাপারটা যা ঘটেছিল সংক্ষেপে বলছি।

আমার স্ত্রীর সঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী প্রভৃতি কয়েকখানি বই ছিল। দুপুরে ঐ বইগুলি বারান্দায় একটি টেবিলের উপর রেখে তিনি একখানা বই পড়ছিলেন। হঠাৎ বৃদ্ধ জ্ঞানবাবু এসে দুই-একখানা বই উল্টে দেখে বললেন, 'আপনি এই সব বই পড়েন? এর মধ্যে তো অনেক ভুল ভ্রান্তি আছে।' আমার স্ত্রী বেলুড়ে দীক্ষা নিয়েছিলেন; সুতরাং তিনি খুব দুঃখিত হয়ে বললেন, 'আপনি ঠাকুর ও স্বামীজীর সম্বন্ধে এই রকম কথা বললেন!' জ্ঞানবাবু বললেন, 'স্বামীজী তো বিলেতে ম্যাক্সমূলারের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের সম্বন্ধ নিয়ে অনেক কথা বলেছেন যা ঠিক নয়। তাছাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে ঠাকুর সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার অধিকাংশই কাল্পনিক। আমি বই লিখে এসব প্রমাণ করেছি,' ইত্যাদি।

ব্যাপারটি শুনে আমি জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে বললাম, 'দেখুন, আপনার কথায় আমার স্ত্রীর মনে খুব আঘাত লেগেছে, কারণ তিনি ঠাকুর ও স্বামীজীর ভক্ত। আপনি আর এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কোন আলোচনা করবেন না—এটি আমার বিশেষ অনুরোধ।' জ্ঞানেন্দ্র বাবু বললেন, 'আপনি ঐতিহাসিক, সুতরাং যা সত্য তা যতই বেদনাদায়ক হোক তা অবশ্য স্বীকার করবেন।' আমি বললাম যে, আমি ইতিহাসের চর্চা করি, কিন্তু আমার স্ত্রী ঐতিহাসিক নন, তিনি ভক্ত, সুতরাং তাঁকে তাঁর ধর্মবিশ্বাস ও ভক্তি নিয়ে থাকতে দিন—এ সকল অপ্রিয় আলোচনা হলে তাঁর পক্ষে এ বাড়ীতে থাকার অসুবিধা হবে।

পরদিন সকালে জ্ঞানেন্দ্র বাবু কয়েকখানা বই এনে আমার হাতে দিলেন। এর মধ্যে একখানা বই তাঁরই লেখা—Keshab Chandra and Ramkrishna। আমাকে ঐ বইটি বিশেষ করে পড়তে বললেন। চারি শত পৃষ্ঠার এই বইখানির প্রতিপাদ্য বিষয়: (১) কেশবচন্দ্র সেন শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বারা কোনরকমে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন—এই প্রচলিত ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, (২) স্বামী বিবেকানন্দ ইচ্ছে করেই ম্যাক্সমূলারকে এমন সংবাদ দিয়েছিলেন যাতে ঠাকুরের ও তাঁর সম্প্রদায়ের মহিমা বৃদ্ধি পায়, (৩) শ্রীরামকৃষ্ণকে কেউ চিনত না—কেশবচন্দ্রই তাঁকে প্রথমে জনসমাজে পরিচিত করেন—ইত্যাদি ইত্যাদি। অত বড় বই আমার পক্ষে পড়া তখন সম্ভব ছিল না—বিশেষতঃ উল্টে পাল্টে যেটুকু দেখলাম তাতে তাঁর মন্তব্যগুলি

ও তাঁর ভাষা দেখে আমার খুবই খারাপ লাগল এবং পড়বার বিশেষ ইচ্ছাও রইল না।

সন্ধ্যাবেলায় জ্ঞানবাবু তাঁর বই সম্বন্ধে আমার মতামত জানতে চাইলেন। আমি বললাম যে, অত বড় বই আমার পক্ষে পড়ে শেষ করা সম্ভব হয়নি। তিনি বললেন, 'আচ্ছা, ও বইখানি আপনি নিয়ে যান—ভাল করে পড়ে আপনার মতামত লিখবেন।'

আমি বললাম, 'তাই করব। কিন্তু সত্যের অনুরোধে আপনাকে একটা কথা বলে রাখি। আমার বাবা যৌবনে কেশবচন্দ্র সেনের ভক্ত ছিলেন। আমার বাল্যকালে তাঁর কাছে শুনেছি যে, যখন কেশব সেন শেষ বয়সে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে কালীপূজা করতে আরম্ভ করলেন, তখন তিনি এবং আরও অনেকে বিরক্ত হয়ে তাঁর দল ছেড়ে দিলেন।'

এইটুকু বলে আমি বললাম যে, যদিও তখন আমার বয়স খুবই কম তবু বাবার সে কথাটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। অবশ্য বাবার ধারণা ঠিক ছিল কিনা এবং কেশবচন্দ্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, কিন্তু ছেলেবেলায় শোনা আমার বাবার কথা থেকে এটুকু বোঝা যায় যে, কেশবচন্দ্র সেন জীবিত থাকতেই অনেকের একটা ধারণা জন্মেছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে কেশবচন্দ্রের ধর্মমতের বিশেষ পরিবর্তন হয়েছিল। এবং মনে রাখতে হবে, বাবা যে সময়কার কথা বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ তার অনেক বছর পরে ম্যাক্সমূলারের কাছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিবরণ দিয়েছিলেন।

জ্ঞানবাবু আমার কথায় খুব খুশী হলেন না, তবে বললেন, 'আচ্ছা, আপনি আমার বইখানি ভাল করে পড়ে দেখবেন। আশা করি আপনার মত বদলাবে।' আমি তাঁর বইখানি গ্রহণ করলাম এবং কথা দিলাম যে অবসরমত ভাল করে পড়ে দেখব।

তারপর অনেক বছর চলে গেছে। কারো কারো খুব ইচ্ছা ছিল আমি এ বিষয়ে কিছু লিখি। কিন্তু এ সম্বন্ধে নানা বই পড়ে জ্ঞানেন্দ্রবাবুর বই বা তাঁর মতামত সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হয়েছিল তা লিখলে জ্ঞানেন্দ্রবাবুর পক্ষে প্রীতিকর হ'ত না—বিশেষতঃ তাঁর পুত্র আমার বন্ধু অমিয়বাবুও হয়তো মনে কষ্ট পাবেন, এই ভেবে কিছু লিখিনি। যাঁদের নিয়ে সেদিন এই ঘটনার আবর্ত, তাঁরা সবাই আজ পরলোকে, তাই কর্তব্যবোধে সংক্ষেপে কিছু লিখছি।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু তাঁর বইতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বহু ব্রাহ্ম ও কেশবচন্দ্রের ভক্তের লেখা থেকে অনেক অংশ উদ্ধৃত করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, তাঁরা প্রায় সকলেই ঠাকুরের প্রতি যথেষ্ট সম্ভ্রম ও ভক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বলেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র উভয়েই উভয়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র ঠাকুরকে যে কী গভীরভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন তা তাঁদের লেখার মধ্যে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। জ্ঞানেন্দ্রবাবু তাঁর মতের সমর্থক হিসাবে তাঁর বইতে তাঁদের যে-সমুদয় উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, তার থেকে কিছু কিছু অনুবাদ করছি :

রেভারেণ্ড ভাই গিরিশচন্দ্র সেন লিখেছেন : "ভগবানকে মাতৃরূপে আরাধনা ও মা বলে সম্বোধন করা—এই অভিনব ভক্তির ভাব আমাদের আচার্য বিশেষ করে পরমহংসদেবের কাছ থেকে পেয়েছিলেন।...কেশবচন্দ্র অনুগত শিষ্য ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের পাশে বসে তাঁর কথাগুলি নম্রভাবে, বিনয় ও

শ্রদ্ধার সহিত শুনতেন এবং কখনও তাঁর সঙ্গে বাদানুবাদ করতেন না (২১৩—২১৬ পৃষ্ঠা)।"

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল লিখেছেন :

"কেশবচন্দ্রের শেষ বয়সে ভগবানের মাতৃরূপে আরাধনা এবং খুব সহজ ও অল্প চলতি ভাষায় ভগবানের স্বরূপ-বর্ণনা—কেবল এইটুকুই শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় মহাপুরুষের সংসর্গের ফল বলা যেতে পারে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী তো অনেকেই শুনেছেন—তার মধ্যে কয়জন কেশবচন্দ্রের ন্যায় তা উপলব্ধি করেছেন ? অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ শুনে অল্প-বিস্তর উন্নতি করেছেন, কিন্তু কেশবের মত এত উন্নতি আর কারুরই হয়নি (২২৩ পৃষ্ঠা)।"

বিখ্যাত সাংবাদিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত স্টীম বোটে কেশবচন্দ্র ও ঠাকুরের একসঙ্গে যাত্রার যে বিবরণ দিয়েছেন তাতেও ঠাকুরের প্রতি কেশবচন্দ্রের অদ্ভুত শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় দিয়েছেন। নগেন্দ্রনাথ সম্ভবত: কোন ধর্মসম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। সুতরাং তাঁর মত একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মূল্য খুবই বেশী। এটি Modern Review-তে ছাপা হয়েছিল,[১] সুতরাং এর কোন অংশ উদ্ধৃত করলাম না। (জ্ঞানেন্দ্রবাবুর গ্রন্থ, ২৭১-২৭৬ পৃ:)।

কেশবচন্দ্র সেনের একজন প্রধান শিষ্য ও সহযোগী ছিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। ইনিও স্বামী বিবেকানন্দের মতো শিকাগো ধর্মসভায় যোগদান করেছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ খুব প্রীতির ছিল না। প্রতাপচন্দ্র কেশবচন্দ্র-প্রবর্তিত নববিধান ধর্মসম্প্রদায়ের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন এবং এর প্রতিনিধি হয়েই শিকাগো ধর্মসভায় যোগদান করেছিলেন। এই সম্প্রদায়ের অনেকের মতে শিকাগো ধর্মসভায় যোগদানকারী ভারতীয়দের মধ্যে প্রতাপচন্দ্রই সর্বাপেক্ষা বেশী খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রবাবুও তাঁর বইতে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের নাম শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর আলোচ্য গ্রন্থখানি ১৯৩১ সালে ছাপা হয়। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রণীত 'The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen' তার বহু পূর্বে ১৮৮৭ সনে অর্থাৎ কেশবচন্দ্র ও ঠাকুরের দেহাবসানের অল্পকাল পরেই প্রকাশিত হয়। জ্ঞানেন্দ্রবাবু এই বইয়ের উল্লেখ ও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, কিন্তু কেশব ও ঠাকুরের সম্বন্ধ বিষয়ে প্রতাপচন্দ্রের মতামত উল্লেখ করেননি। অথচ এই গ্রন্থে প্রকাশিত এঁর মতামত যে খুবই মূল্যবান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ তিনি স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন যে, মাতৃরূপে ভগবানের সাধনা এবং সর্বধর্মের সমন্বয়—নববিধানের যে দুইটি বৈশিষ্ট্য কেশবচন্দ্রের শেষ জীবনে প্রকটিত হয়েছিল, সে দুইটিই ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত সংস্পর্শের ফলে কেশবচন্দ্রের মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিষয়টির গুরুত্ব বিধায় আমি মূল গ্রন্থের ইংরেজী থেকে কয়েকটি লাইন পাদটীকায় উদ্ধৃত করছি।[২] আমার ছেলে-

(১) Modern Review, 1927, Vol. I, pp. 537-9; 1928, Vol I, pp. 527, 851

(২) P. C. Mazoomdar, *The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen.*

Third Edition 1931 (Originally published in 1887). Attention may be drawn to the following passages in this work.

Pp, 228-9.

"Keshub's own trials and sorrows about the time of Cooch Behar marriage had spontaneously suggested to him the necessity of regarding God as Mother. And now the sympathy, friendship, and example of the *Paramhansa* converted the Motherhood of

বেলায় বাবার কাছে যা শুনেছিলাম প্রতাপ-চন্দ্রের উক্তি তা সমর্থন করে এবং জ্ঞানেন্দ্র বাবু সাধারণের যে ধারণাকে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করার জন্য ৪০০ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ লিখেছিলেন, সেই ধারণার সপক্ষে এর চেয়ে বড় প্রমাণ আমি কল্পনা করতে পারি না।

জ্ঞানেন্দ্রবাবুর গ্রন্থে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে যে অসংখ্য মন্তব্য আছে, তার আলোচনা করা আমি প্রয়োজন মনে করি না। শ্রীরামকৃষ্ণের উপর কেশবচন্দ্রের প্রভাব সম্বন্ধে যেসব কথা আছে, তা আমার নিকট অত্যুক্তি বলেই মনে হয়, কিন্তু তার আলোচনা এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়।

God into a subject of special culture with him. The greater part of the year 1879 witnessed this development. It became altogether a *new feature* of the *Revival*, which Keshub was specially bringing about. However much European taste might dislike such a development, Keshub's religion perceptibly gained in popularity with Hindu Society by this means."

(A few lines above the passage quoted the author referred to the Mother as the 'goddess Kali' and refers to the traditional devotion of the Hindu saints to this deity.)

Pp. 241-2

"We have already said how the association of *Paramhansa* Ram Krishna developed the conception of the Motherhood of God which had often enough occurred in Keshub's mind before......He (Ram Krishna) worshipped *Shiva*, worshipped *Kali*, *Rama*, *Krishna*, he was a confirmed advocate of *Vedantic doctrines*. He was a believer in idolatry, and yet a faithful and most devoted meditator of the Great Formless One Whom he called অখণ্ড সচ্চিদানন্দ (the undivided truth, wisdom, and joy). This strange eclecticism suggested to Keshub's appreciative mind the thought of broadening the spiritual structure of his own movement."

(অধোরেখাগুলি মূলে নাই—উহা আমি যোগ করিয়াছি)

"কর্ম করতে গেলে কিছু না কিছু পাপ আসবেই। এলোই বা। উপবাসের চেয়ে আধপেটা ভাল নয়? কিছু না করার চেয়ে, জড়ের চেয়ে, ভালমন্দ মিশ্রিত কর্ম করা ভাল নয়! গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, দেয়ালে চুরি করে না, তবুও তারা গরু থাকে আর দেয়ালই থাকে। মানুষে চুরি করে, মিথ্যা কথা কয়, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

মনের অসুখ ও চিকিৎসা

ডক্টর মুরলীমোহন বিশ্বাস

স্বাস্থ্য বলতে সাধারণত দৈহিক স্বাস্থ্য মনে আসে। কিন্তু মনেরও স্বাস্থ্য রয়েছে। এমন কি জীবনকে উপভোগ করতে হলেও মন সুস্থ না থাকলে ষোল আনা ভোগ করা যায় না। দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষারও প্রয়োজন। কায়িক শক্তিতে শক্তিমান যেমন অনেক বস্তুভার বহন করতে পারে, মানসিক শক্তিতে তেজস্বী তেমনি মানসজগতের অনেক ভার সইতে পারে। মানসিক শক্তি দেহেও শক্তির যোগান দেয়। সুতরাং দেহের খোরাকের সঙ্গে সঙ্গে মনের খোরাকেরও প্রয়োজন। নইলে মন কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে অসুস্থ হয়।

অসুখের উৎপত্তিস্থল দুটি। একটি দেহ, আরেকটি মন। যে-সব অসুখ দেহের কোনো অরগানের বিকৃতি হতে হয়, তা অরগানিক। যেমন টি. বি.। ডাক্তার ক্লিনিক্যাল বা ল্যাবরেটরি-টেস্ট্ করে অরগানিক অসুখ ধরে ফেলে। অরগানিক অসুখের প্রারম্ভিক কারণ দেহ হলেও মনও অসুস্থ হয়,—বলার দরকার করে না। যে-সব অসুখ মানসিক কারণ থেকে হয়, সে-সব মানসিক। যেমন বেশ সুস্থ লোক, শরীরে কোথাও কিছু নাই, অথচ রক্ত দেখলেই মূর্ছা যায়। মানসিক অসুখে অনেক সময় ডাক্তার রোগীর দেহ পরীক্ষা করে হিমসিম খেয়ে যায়, অথচ দেহের মধ্যে কোনো অরগানের বৈকল্য খুঁজে পায় না। মন প্রারম্ভিক কারণ হলেও এসব অনেক ক্ষেত্রে পরিণামে দেহের কোনো অরগানের বিকৃতি হতে পারে

অরগানিক অসুখ বিভিন্ন কারণে হয়। যেমন বসন্ত হাম মাম্‌স ইনফ্লুএনজা প্রভৃতি ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত হয়। অনেক হয় আবার ব্যাকটিরিআ থেকে, যেমন টি. বি. টাইফএড ডিসেনট্রি কলেরা ম্যানেনজাইটিস। হারনিআ গলস্টোন ইত্যাদি অসুখও অরগানিক। আঘাত লেগেও অরগানের অসুখ হতে পারে। উপযুক্ত খাবারের অভাবেও হতে পারে। অনেক অরগানিক ব্যাধি আবার বংশগত বা জন্মগত।

মানসিক অসুখ মনের চাপ থেকে হয়। দেহের সহিত মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ফিজিওলজি ও এক্‌স্‌পেরিমেনট্যাল সাইকোলজিতে গবেষণার ফলে মনের সহিত দেহের সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গেছে। মন স্থূল দেহের নার্‌ভ ও হর্‌মোনের মাধ্যমে কাজ করে। নার্‌ভাস সিসটেম চোখ কান নাক জিব ত্বক—ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মনের সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ করায়। যা শুনছি, দেখছি; অনুভব করছি, কি যে-গন্ধ পাচ্ছি বা যে-স্বাদ পাচ্ছি তা এক রকম ইমপাল্‌স্ হয়ে সেনসরি নারভ নামে নারভের মাধ্যমে ব্রেনে সেরিব্রেল করটেক্‌স্-এ যায় ও অনুভূতির সৃষ্টি করে। তখন মনের আদেশ মোটর নারভের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংগে বাহিত হয় ও আদেশমতো কাজ হয়। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন কারণে মানসিক যন্ত্রণায় কষ্ট পায়। যোগ্যতার চেয়ে বেশী আশা, ও আশা না-মেটায় গভীর হতাশার সৃষ্টি হয়। সংসারে, চাকরিস্থলে, ব্যবসাক্ষেত্রে ও সমাজের মানুষের সঙ্গে মতের

মিল হয় না। নিত্য ঝগড়া ও মনকষাকষি হয়। ফলে প্রায়ই মন বিগড়ে থাকে। ছেলে-মেয়ে মানুষ করার দায়িত্ব মনকে ঘিরে থাকে। নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুতে আঘাত লাগে—তা বেশী হয় যখন সে মৃত্যুতে ভবিষ্যতের চিন্তা এসে জুটে। কারো কিছু দেখে—না ভেবে চিন্তে বা নিজের দরকার না থাকলেও বা নিজের শক্তিতে না কুলালেও—তা পাবার চেষ্টা করে। বিফল হলে ভীষণ নৈরাশ্য আসে। সমাজে নামধাম ও প্রতিপত্তির চেষ্টা করে। সফল না হলে মনের অবস্থা শোচনীয় হয়। তাছাড়া আরো কত রকমের চিন্তা ভয় হিংসা ক্রোধের ইমপাল্‌স্‌ নারভের মাধ্যমে ব্রেনে জমা হয়। খুব বাস্তব কথা যে, প্রায় প্রতি মানুষের কোনো-না-কোনো রকমের উদ্বেগ রয়েছে। মনের এ-ভার দূর করার জন্য নারভ নানা রকম উপায় অবলম্বন করে। যদি না-করতো, তবে সাংঘাতিক অবস্থা হতো। কেউ রেগে গেলে অনেক সময় তার মুখ দিয়ে আপনি অকথা বেকথা বের হয়ে যায়। তবেই যেন গায়ের ঝাল মেটে। নারভ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। শোকে অনেকের আপনি চোখ দিয়ে জল আসে। বা খানিকটা জোরগলায় কান্না-কাটি করলে মন শান্ত হয়। লেখক বা কবির কোনো আবেগে নারভ উত্তেজিত হয়। মনের ভাব কিছু-একটায় লিখে ফেললেই নারভ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। শিশুকে আদর করতে করতে উপরে ছুঁড়ে দিলে সে ভয়ে চোখ মুজে ফেলে ও আঙ্গুল মুঠো করে। অর্থাৎ মনের ভয় হতে রিলিফ পাবার জন্য বিশেষ অংগভংগি করে। ভয় ক্রোধ ইত্যাদি চেপে রাখা ও সংযম করা এক কথা নয়। বিক্ষোভ চেপে রাখলে কাজকর্মে বা কথা-বার্তায় তা প্রকাশ পায় না বটে ; কিন্তু ব্রেনের মধ্যে তার ইমপালস্‌ কোনো প্রকারে কোড হয়ে দেহের মধ্যেই থেকে যায়। সংযমে কোন বিক্ষোভ বাইরেও প্রকাশ পায় না, আর দেহের মধ্যে ব্রেনেও গুপ্ত থাকে না। মনের বিক্ষোভ চেপে রাখা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর। এতে মনের উদ্বেগ কমে না ; বরং বেড়ে যায়। অহরহ মন দগ্ধ হয়। যখন দারুণ বিক্ষোভ মনে চাপা থাকে অর্থাৎ যখন সে উদ্বেগকে কোনোভাবে বাইরে প্রকাশ ক'রে বা জীবন-দর্শন দিয়ে সরিয়ে দিয়ে মনের ভার লাঘব করা হয় না, তখন দেহমনের এমনি মেকানিসম্‌ যে, মনের চাপের জন্য দেহে নানারকম ব্যাধির সৃষ্টি হয়। মনের কষ্ট দেহের কষ্টে বদল হয়। এ রূপান্তর হয় দুভাবে। একটির নাম নিউরোসিস, অন্যটির নাম সাইকোসিস।

নিউরোসিস হলো এমন এক অবস্থা যখন মনের উদ্বেগ রূপান্তরিত হয় অংগের কোনো অস্বাভাবিক লক্ষণে ও আচরণের কোনো অসামঞ্জস্যে। এ-বদল বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে হয়। এতে প্রথম প্রথম কোনো দেহযন্ত্রের বিকার হয় না। যেমন কোনো ছাত্রকে ক্লাসে দশ পনেরো মিনিট বক্তৃতা করতে বললে সে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে কাঁপে। তার মুখ ও গলা শুকিয়ে যায়, ও পেটের যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। অথচ সে দৈহিক কোনো আঘাত পায়নি। যন্ত্রণা কিন্তু বাস্তব। সে-যন্ত্রণা কয়েক ঘণ্টাও থাকতে পারে। এ হলো নিউরোটিক ব্যবহার। নিউরোটিক ব্যবহার পরিণামে দৈহিক অসুখেও দাঁড়াতে পারে। এরূপে সাইকোসোমাটিক অসুখ—পেপটিক আলসার হয়। হাইপোথেলামাস ও সেরিব্রেল করটেক্‌স্‌ ভীষণ ভয় ও ক্রোধ দ্বারা আলোড়িত হলে স্টোমাকের মাস্‌ল্‌ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তখন অ্যাসিড (ডাইজেসটিভ জুস)

স্টোমাকের উপর ক্রিয়া করে। মনের মধ্যে ভয় ও ক্রোধ একবার হলে দেহে পরপর এরকম কতকগুলি ফিজিওলজিক্যাল প্রসেস ঘটে। ভয় ও ক্রোধ প্রায়ই হতে থাকলে পরিণামে স্টোমাক-আলসারে দাঁড়ায়। যে-ব্যক্তি সদাসর্বদা অসন্তোষ ও দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটায় তার প্রায় স্টোমাকের যন্ত্রণা হয়। অনেক ছাত্র দুশ্চিন্তায় পরীক্ষার পূর্বে ডাইরিয়াতে ভোগে। মিউকস কোলাইটিস-ও মানসিক চাঞ্চল্য থেকে হয়। অনেক হার্টের অসুখে ঠিক এরকম ব্যাপার ঘটে। ধীর স্থির অবস্থায় একজন মানুষের হার্ট আর্টারি দিয়ে প্রতি মিনিটে সাড়ে তিন কোআর্ট রক্ত পাম্প করে। যখন সে ভয়- বা ক্রোধরূপ ভীষণ মানসিক উত্তেজনায় পড়ে তখন এ সংকট অবস্থা হতে রেহাই পাবার জন্য হার্ট পাঁচ থেকে ছয় কোআর্ট রক্ত পাম্প করে আর্টারিতে দেয়। যে-কারণে ভয় ও ক্রোধ হয় তা যদি জীবনে লেগেই থাকে, তবে মনের প্রবল উত্তেজনাও লেগে থাকবে এবং হার্টকেও এতো পাম্প করতে হবে। শেষে দাঁড়াবে হার্টের অসুখ। আবার কারো দৈহিক অসুখ থাকলে মনের বিক্ষোভে তা বেড়ে যায়। অর্থাৎ কোনো অরগানের একটু প্যাথোলজিক্যাল অবস্থা হলে মনের উদ্বেগ কমাবার জন্য সে-অরগানের উপরই চাপ পড়ে। যেমন কারো চোখের ডিফেক্ট থাকলে তার মন উদ্বেগ হতে রিলিফ পাবার হদিস পায় এ চোখের অসুখকেই বাড়িয়ে। তখন চোখের অবস্থা খুব খারাপ হয়। কারো একটু হার্টের অসুখ থাকলে হয়তো তার সে অংগই জখম হয় বেশি করে। এরকম অনেক সময় কোনো দেহযন্ত্রের বিকার ও মনের পীড়ন একযোগে কাজ করে। মনের যন্ত্রণা হতে পরিত্রাণ পাবার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ব্যায়রাম জোটে। হাই ব্লাডপ্রেসারও এভাবে হয়। অনেকের ঠোঁট বা হাত কাঁপে। কারো সব অংগই কাঁপে। কখনো-বা নিজেরই অজান্তে হাত পা প্যারালাইস্‌ড হয়ে যাওয়ার ভাণ করে। এ কিছু ইচ্ছাকৃত নয়। দেহ ও মনের এমনি মেকানিজম। এ অবস্থা বহুদিন বোপে থাকলে এ অংগের টিসু নষ্ট হয়ে যায়। পরিণামে অংগ একবারে পংগু হয়

তোতলামিও কোনোরকম উৎকণ্ঠা থেকে রিলিফ পাবার কৌশল। পিঠে ব্যথা, কোমরে ব্যথা ইত্যাদিও অনেক সময় মানসিক কারণে হয়। হিসটিরিয়া, ফোবিয়া-ও তাই। এমন কি অনেকের খাদ্যেও ভয় হয় বা খেলে দেহে নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—যাকে অ্যালার্জি বলে। অনেকে বিনা প্রয়োজনে বহুবার হাত পা ধোয় বা বাথরুমে ঢুকলে যেন আর বের হতে চায় না; এ সবই নিউরোসিস, কোনো-না-কোনা মানসিক উদ্বেগ চেপে রাখার অন্যরূপ প্রকাশ। গায়ের চামড়া মানসিক অবস্থার সূক্ষ্ম মাপকাঠি। বেশী বয়স না হলেও মুখ ফ্যাকাসে হওয়া মানসিক দুঃস্থতার লক্ষণ। ত্বকের অনেক রকম ব্যায়রাম দেহমনের অস্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন। জীবন-ধারার পরিবর্তনে অনেক মহিলা মানসিক চাপে কষ্ট পেয়ে এক ধরনের বাতে ভুগে। এ-বাত দেহমনের সমষ্টিগত যাতনা।

মনের বিক্ষোভ সাংঘাতিক অবস্থায় পৌঁছলে সাইকোসিস অর্থাৎ মস্তিষ্ক-বিকৃতিতে দাঁড়ায়। সাইকোটিকদের কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহার স্বাভাবিক হতে একবারে ভিন্ন ও অসংগত। মস্তিষ্ক-বিকৃতির বিভিন্ন ভাগ রয়েছে, যেমন সিজোফ্রেনিআ, প্যারানোআ, ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস, ইনভোলিউশন্যাল ম্যালানকোলিআ। আবার একই ধরনের

মস্তিষ্ক-বিকৃতি হতে পারে নারভাস সিসটেম ও ব্রেনের অরগানিক ডিফেক্‌ট্‌ থেকে। এ-ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক কারণ দেহযন্ত্র, মন নয়।

অরগানিক অসুখ ডাক্তারী চিকিৎসায় যত সহজে ও তাড়াতাড়ি সারানো সম্ভব, মানসিক অসুখ সারানো তত সহজ নয়। নিউরোসিস ও সাইকোসিস দ্বারা যে-অরগান বিকল হয় তার চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে মনের চিকিৎসা করাও প্রয়োজন। মনের চিকিৎসা অতো সহজ নয়। আজকাল 'সাইকোথেরাপি' দ্বারা মনের অসুখ সারানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এর মধ্যে হিপনোসিস ও সাইকোঅ্যানালিসিস উল্লেখযোগ্য। তবে জীবনদর্শনের যে মতবাদের উপর হিপনোসিস ও সাইকোঅ্যানালিসিসের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে সে-সম্বন্ধে অনেক আপত্তি উঠেছে। তা ভারতীয় জীবন-দর্শন হতে সম্পূর্ণ পৃথক। যাই হোক, হিপনোসিস ও সাইকোঅ্যানালিসিস দ্বারা কিছু রোগী উপকার পাচ্ছে। সাইকোলজিস্‌ট্‌ নানা কৌশলে বহুদিন ধরে রোগীর সঙ্গে কথা বলে বলে তার মনের কোণে কি ক্ষত চাপা রয়েছে, কোন্ কারণে হয়েছে তা তলিয়ে দেখে ও সে-কারণকে মন থেকে মুছে দিয়ে মনকে অন্য প্যাটার্নে ঢেলে সাজিয়ে দিতে চেষ্টা করে। এ হলো সাইকোথেরাপি। মনস্তাত্ত্বিকদের মতে, পূজা-অর্চনা ও মানসিক করে যে অনেক অসুখ সেরে যায়—এও এক ধরনের সাইকোথেরাপি; প্রার্থনা ও মানত দ্বারা গভীর বিশ্বাসে মনের ভার দেবতার কাছে লাঘব করে দেওয়া -অতি সাধারণ ব্যক্তিও মানসিক শক্তিতে তেজস্বী না-হয়ে নিমেষে মনটা হালকা করে দেয় যেন কারও ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে—মনটা এ-হালকা করার সঙ্গে সঙ্গে নারভের মাধ্যমে দেহের সহিত মনের হরিহর সম্পর্ক থাকায় দেহ হালকা হয়ে যায়, রোগ সেরে যায়। যাদের বিশ্বাস কম, প্রার্থনাদি করে, তবু যেন একটু সন্দেহ থেকে যায় এবং নিজের মনে একটু দায়িত্ব নেয় কি জানি কি হয় ভেবে, বিশেষ করে যারা টেবলেট, ক্যাপসুল, নানারকম ইনজেকশন, এক্সরে, রেডিঅম্ প্রভৃতির গুণ জানে—তারা মনে মনে একটু দায়িত্ব নেওয়ায় আপসে নারভের স্ট্রেন হয় ও দেহ দায়ী হয়। অসুখ যেন সেরেও সারে না। এ হলো মনের নিষ্ঠার অভাব। আলসার ও হাঁপানি মানত ও প্রার্থনা করে সেরে গেছে—এরকম বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায় বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। বিশ্বাস মনকে দায়মুক্ত করার মস্ত বড়ো উপায়। মরফিআ, অ্যালকোহল, আফিঙ প্রভৃতি সিডেটিভ খুব তাড়াতাড়ি নারভের স্ট্রেনকে হালকা করে দেয় ও মনকে কিছু সময়ের জন্য আচ্ছন্ন করে রাখে অস্বাভাবিক অবস্থায়। কিন্তু ঘোর কাটলেই আবার সে-অশান্তি ফিরে আসে। মাদক দ্রব্য মন হতে অশান্তিকে একবারে মুছে দিতে পারে না।

চিকিৎসা দুরকম—কিউরেটিভ ও প্রিভেনটিভ। অসুখ হলে যে চিকিৎসা তা কিউরেটিভ, আর যাতে না হয় তার ব্যবস্থা প্রিভেনটিভ। মানসিক কারণ হতে জাত অসুখ শুধু ডাক্তারী চিকিৎসায় সারে না। সারলেও তা স্থায়ী হয় না। হয়তো খুব সংকট অবস্থায় ওষুধ দ্বারা কিছু উপশম করানো যায়, যেমন হাই ব্লাডপ্রেসারে কি অনেক হার্টের অসুখে। মস্তিষ্কবিকৃত রোগী ইনজেকশন, ইলেকট্রিক শক ইত্যাদি দ্বারা ভালো হয়। কিন্তু অনেক সময় কয়েক বছর পর পুনরায় সে-লক্ষণ দেখা দেয়। যে-কারণে এসব অসুখ হয় তা খুঁজে বের করতে হয়। সে কোনো রকম মানসিক অশান্তি। অনেক

সময় মানসিক কারণ খুঁজে বের করলেও মন থেকে সে কারণ দূর করা খুব মুশকিল। মন একটা প্যাটার্নে গড়া হয়ে স্থায়ী হয়ে গেলে তাকে অন্য ছাঁচে ঢেলে সাজাতে বহু সাধ্য-সাধনার প্রয়োজন। সেজন্য কিউরেটিভ ব্যবস্থার চাইতে প্রিভেনটিভ ব্যবস্থা প্রয়োজন। যেমন কায়িক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একটু সর্দি-কাসি কাটা-ছড়া প্রভৃতিতে সবসময় ওষুধ ব্যবহার করা হয় তাড়াতাড়ি সেরে যাওয়ার জন্য বা বাড়াবাড়ি কিছু না-হওয়ার জন্য, সে-রকম মনের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মন ক্ষত হলেই সঙ্গে সঙ্গে জীবনদর্শন দিয়ে সারিয়ে ফেলা দরকার, ক্ষত পুষে রাখা উচিত নয়। যার দেহের যে-রকম ধাত সে-বুঝে সে সাবধানে থাকে অসুখ না-হওয়ার জন্য। এরকম যার জীবনে যে-রকম সমস্যা তা বুঝে চলতে হয় অশান্তি না-হওয়ার জন্য। তবে জীবনের বাস্তব সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া নয়, সমাধান করা—মানসিক শক্তিকে আশ্রয় করে। প্রিভেনটিভ হিসেবে যেমন পুষ্টিকর খাদ্য খায় ও ঠিক সময়ে কলেরা বসন্ত ইত্যাদি দৈহিক অসুখের ওষুধ ব্যবহার করে প্রিভেনটিভ হিসাবে, তেমনি মনকেও জীবন-দর্শন দিয়ে শক্তি দিতে হয় মানস জগতের বীজাণু নষ্ট করার জন্য। দৈহিক ব্যায়াম যেমন প্রয়োজন, মানসিক ব্যায়ামও তেমন প্রয়োজন। মানসিক ব্যায়াম হলো জীবনদর্শন-প্রতিপালন। জীবনকে পূর্ণ করতে হলে দেহ ও মন দুই-ই পুষ্ট করতে হবে।

আশ্বিন সপ্তমী

ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত

'আবার এলো তো উমা'—গান গায় একটি বৈরাগী
বাজায়ে খঞ্জনী হাতে, সুমধুর কণ্ঠের রাগিণী
বাংলার বুকের থেকে যেন এলো পোহালে যামিনী,
মনে হয়, এ-শরতে সুর হ'লো আলো-অনুরাগী।
উমার মায়েকে বলে পুরবাসী এসে সবে ডাকি'
'হারা তারা এলো তোর, এলো তোর নয়নের মণি' ;
কই উমা উমা ব'লে ছুটে এলো মেনকা জননী,
স্নেহের জ্যোৎস্নাপক্ষ বুকে তাঁর উঠেছে তো জাগি'।

উমা তো বাংলার মেয়ে,—বাৎসল্যের রূপ-কল্পনাতে
জননার দেবীরূপ দেখা দিল, স্নেহের সরণী
সৃষ্টি হ'লো, সময়ের বসুধারা বেয়ে প্রার্থনাতে ;
রাত্রির শরীর থেকে দেখা দিল প্রভাতের প্রশান্তির মণি।
বৈরাগীর গানে, বুঝি আলোকের পদ্ম নিয়ে হাতে,
বাঙলার দুয়ারে এলো আজ এই আশ্বিন সপ্তমী।

মহামায়ার মাহাত্ম্য

স্বামী জীবানন্দ

মহামায়ার মাহাত্ম্য যত স্মরণ করা যায় ততই আনন্দ। জীবনে একটানা সুখ খুবই কম। সুখের পশ্চাতে দুঃখ, দুঃখের পিছনে সুখ যেন আলো-আঁধারের খেলা! একথা সব সময় মনে থাকে না। সুখ এলে মন উল্লসিত হয়, দুঃখ এলে মুষড়ে পড়ে। কি সাধারণ মানুষ, কি অসাধারণ মানুষ—ধনী মানী গুণী ব্যক্তি—সকলেরই জীবনে যখন দুঃখ আসে তখন তাঁরা সেই দুঃখ থেকে পরিত্রাণলাভের উপায় খোঁজেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেখি রাজচক্রবর্তী নৃপতি সুরথ দৈববশে অশেষ দুঃখ পাচ্ছেন। তিনি প্রজারঞ্জক, শক্তিশালী এবং বহুবিধগুণসম্পন্ন। তিনিও শত্রুদের দ্বারা পরাজিত, আত্মীয় ও অমাত্যদের দ্বারা লাঞ্ছিত! এই অবস্থায় তিনি একা ঘোড়ায় চ'ড়ে গহন বনে প্রবেশ করলেন। 'একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্।' সেই নিবিড় অরণ্যে তিনি দেখতে পেলেন একটি আশ্রম—যেন শান্তির নিলয়! সেখানে মহাতাপস মেধা মুনি সশিষ্য অবস্থান করেন। আশ্রমের পরিবেশ কী সুন্দর! হিংস্র পশুরাও সেখানে শান্ত হয়ে থাকে! আশ্রমে এদিক ওদিক বেড়াতে বেড়াতে একজনের সঙ্গে রাজার দেখা হ'ল। তিনি হলেন সমাধি বৈশ্য। তাঁরও অবস্থা মহারাজ সুরথেরই অনুরূপ। তিনি স্বজনদের দ্বারা অপমানিত ও বিতাড়িত। যারা কষ্ট দিয়েছে, অপমানের চূড়ান্ত ক'রে ছেড়েছে তাদের জন্যই যে এখনও চিন্তা! বনে এসেও ঘরের চিন্তা! দুষ্ট স্বজনদের প্রতিই চিত্ত স্নেহাসক্ত! উভয়ের একই অবস্থা।

মহারাজ সুরথ ও সমাধি বৈশ্য এর রহস্য জানার জন্য মেধা মুনির কাছে গেলেন। শরণাগত অতিথিদের জিজ্ঞাস্য বিষয় অবগত হয়ে মুনিবর বললেন, মহামায়ারই প্রভাবে জগতের সকল জীব মোহাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

'জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥'

দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানীদের চিত্তকেও বলপূর্বক আকর্ষণ ক'রে মোহাবৃত করেন। সেই মহামায়া এই সমগ্র বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেন। তিনি প্রসন্না হ'লে মানুষকে মুক্তি-লাভের জন্য অভীষ্ট বর প্রদান করেন। তাঁর হাতেই মুক্তির চাবি, তিনি মুক্তির দরজা খুলে দেবেন।

'তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥'

তিনি সংসারমুক্তির হেতুভূতা পরমা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী ও সনাতনী। তিনিই সংসার-বন্ধনের কারণ এবং সকল নিয়ন্তার নিয়ন্ত্রী।

'সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥'

মহারাজ সুরথ বললেন, 'ভগবন্! যাঁকে আপনি মহামায়া বলছেন, সেই দেবী কে? তিনি কিরূপে উৎপন্না হন? তাঁর কার্যই বা কি? হে ব্রহ্মবিদ্বর! সেই মহামায়ার যেরূপ স্বভাব, যা তাঁর স্বরূপ, যেজন্য তিনি আবির্ভূত হন—সব আপনার কাছ থেকে শুনতে ইচ্ছা করি।'

মেধা মুনি বললেন:

'নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥'

সেই মহামায়া নিত্যা, জন্মমৃত্যুরহিতা. আবার এই জগৎপ্রপঞ্চই তাঁর বিরাট মূর্তি। তিনি সর্বব্যাপী এবং সনাতনী হলেও তাঁর বহুপ্রকার আবির্ভাবের কথা আমার কাছে শ্রবণ কর।

'দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥'

যখন দেবগণের কার্যসিদ্ধির জন্য তাঁর আবির্ভাব হয়, স্বরূপতঃ নিত্যা হলেও তখন তিনি জগতে আবির্ভূ'তা ব'লে অভিহিতা হয়ে থাকেন।

এরপর মুনিপ্রবর মেধা মহারাজ সুরথ ও সমাধি-বৈশ্যকে মহামায়ার তিনটি চরিত্র বর্ণন ক'রে শোনান। এই তিনটি চরিত্রে যথাক্রমে 'মহাকালী', 'মহালক্ষ্মী' ও 'মহাসরস্বতী'র আবির্ভাব ঘটেছে এবং 'মধুকৈটভবধ', মহিষাসুরবধ' ও 'শুম্ভনিশুম্ভবধ' কীর্তিত হয়েছে।

মহামায়া জগজ্জননীর অতুল মাহাত্ম্য কীর্তন ক'রে মেধা ঋষি বললেন:

'এতৎ তে কথিতং ভূপ দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
এবংপ্রভাবা সা দেবী যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥'

হে নৃপ সুরথ! তোমাকে এই সর্বার্থসাধক দেবীমাহাত্ম্য বললাম। সেই দেবী এইরূপ মহিমান্বিতা। তিনি নিখিল বিশ্বকে ধারণ করেন।

'বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্‌বিষ্ণুমায়য়া।
তয়া ত্বমেষ বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যে বিবেকিনঃ॥
মোহ্যন্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেষ্যন্তি চাপরে।
তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্॥
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা॥'

সেই ভগবতী বিষ্ণুমায়াই আবার তত্ত্বজ্ঞান দেন। তিনিই তোমাকে, এই বৈশ্যকে এবং অপর বিবেকাভিমানীদিগকে পূর্বে মোহাচ্ছন্ন করেছেন, অন্য অবিবেকীদের এখন মোহগ্রস্ত করছেন এবং এর পরেও অনেকে তাঁর প্রভাবে মোহগ্রস্ত হবে। হে মহারাজ! সেই পরমেশ্বরীরই শরণাগত হও ঐকান্তিকতা সহকারে তাঁর আরাধনা কর। তাঁকে ভক্তিপূর্বক আরাধনা করলে তিনি ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে স্বর্গসুখ ও মুক্তি প্রদান করবেন।

মহামায়ার মাহাত্ম্য শ্রবণের পর রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য কঠোরব্রতনিষ্ঠ মহাপ্রাণ ঋষিকে প্রণাম ক'রে দেবীর আরাধনার জন্য নদীতটে গমন করলেন। জগন্মাতাকে দর্শনের জন্য তাঁদের চিত্ত ব্যাকুল হ'ল। মন বৈরাগ্যের রঙে রঞ্জিত হল। মা! মা!! মা!!! অনুক্ষণ মাতৃচিন্তা, দেবীসূক্তপাঠ ও তার ভাবার্থ-অনুধ্যান! তাঁরা দুর্গাদেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ ক'রে অত্যন্ত ভক্তিভরে পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি দ্বারা দেবীর পূজা করলেন; কখনো নিরাহার, কখনো স্বল্পাহারী হয়ে জননীর অর্চনারত হলেন। সমাহিত হয়ে তদ্গতচিত্তে স্ব-দেহ-রক্তসিক্ত বলি মাতৃচরণে নিবেদন করলেন।

তিন বৎসর এইভাবে অত্যন্ত সংযতচিত্তে দেবীর আরাধনার ফলে জগদম্বা শ্রীশ্রীচণ্ডিকা তাঁদের প্রতি প্রসন্না হলেন এবং তাঁদের সামনে প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভূ'তা হয়ে বললেন:

'যৎ প্রার্থ্যতে ত্বয়া ভূপ ত্বয়া চ কুলনন্দন।
মত্তস্তৎ প্রাপ্যতাং সর্বং পরিতুষ্টা দদামি তৎ॥'

হে রাজন্! হে বৈশ্যকুলনন্দন! তোমরা দুজনে আমার কাছে যা যা প্রার্থনা করছ, সবই পাবে। আমি সন্তুষ্ট হয়ে তোমাদের বর দেব।

অনন্তর মহারাজ সুরথ জন্মান্তরে সাবর্ণি মনুরূপে বিচ্যুতিহীন স্থায়ী সাম্রাজ্য এবং এ জন্মে

নিষ্কণ্টক হৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধিমান্ ও বৈরাগ্যবান্ সমাধি-বৈশ্য প্রার্থনা করলেন সংসারাসক্তিনাশক শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞান, যার মধ্যে অহংতা ও মমতার লেশ নেই।

অন্তর্যামিণী মহাদেবী বললেন, "হে নৃপ! অতি অল্পদিনেই তুমি শত্রুদের বিনাশ ক'রে নিজের রাজ্য পুনরায় লাভ করবে। তোমার সেই রাজ্যের আর বিচ্যুতি ঘটবে না। মৃত্যুর পর আবার জন্মগ্রহণ ক'রে পৃথিবীতে সাবর্ণি নামে অষ্টম মনু হবে।"

জগজ্জননী সমাধি-বৈশ্যকে বললেন, "হে বৈশ্যশ্রেষ্ঠ, তুমি আমার কাছে যে বর চেয়েছ, তা তোমাকে দিলাম। তোমার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে।"

জগন্মাতা উভয়কে বরদান ক'রে এবং তাঁদের দ্বারা ভক্তিপূর্বক বন্দিতা হয়ে অন্তর্হিতা হলেন।

মহারাজ সুরথ ও সমাধি-বৈশ্য যথাভিলষিত বর লাভ ক'রে কৃতকৃত্য হলেন।

এখনও মাতৃচরণে শরণাগত সন্তানগণ মনপ্রাণ দিয়ে ভক্তিভরে মাতৃপূজা ক'রে সুখ-দুঃখের পারে যান এবং পরমানন্দ-লাভে সমর্থ হন।

'ওঁ শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥'

তুলনাতীত

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

অতঃপর সে রূপের তুলনা মেলে না। অবিচল
চেয়ে থাকি। যত ভালো—তারো বেশি ভালো মনে হয়।
যখন সামনে আর পিছনে ও চারিধারে জল।
তীরভূমি বড় থেকে ক্রমে যেন সুদূর স্বপনে
তিল হয়। চোখের চেতনা দিয়ে যায় নাক' গোনা:
কত পণ্য পড়ে ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বন্দরে,
শূন্যপাত্র পূর্ণ হয় সোমনাথ সাগর-চত্বরে!
ক্ষুদ্রতার হয় শেষ।—
বিবেক-সমুদ্রে জ্বলে সোনা।

দশকুমারচরিতে সমাজচিত্র

ডক্টর অনিলচন্দ্র বসু

আচার্য দণ্ডী-বিরচিত দশমকুমারচরিতে তৎকালীন সমাজের একটি নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। এ চিত্র ভাল কি মন্দ; রুচিসম্মত কি রুচিবিগর্হিত—এ প্রশ্ন এখানে অবান্তর। কেননা, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নীতির আদর্শেরও পরিবর্তন ঘটছে। এ যুগের নীতির মানদণ্ডে যা গর্হিত, নিন্দনীয় ও রুচিবর্জিত বলে বিবেচিত, তা' হয়তো সে যুগে ছিল অন্যরূপ। সুতরাং এ যুগের নীতি ও রুচির মাপকাঠিতে প্রায় ১৩শ' বছর পূর্বের সমাজ-জীবনের মূল্যায়ন করতে যাওয়া অযৌক্তিক। তাছাড়া, কবি লিখেছেন কাব্য। কাব্যহিসেবে 'দশকুমারচরিত' রসোত্তীর্ণ হয়েছে কিনা সেটাই সহৃদয় পাঠকের বিচার্য। কবি কাব্যের মাধ্যমে কতটুকু নীতি-শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়েছেন, কি না হয়েছেন, সেটা পাঠকের বিচার করার কথা নয়। কবির রচিত কাব্যে কাব্যরস আস্বাদন করেও যদি আমরা তার মধ্যে কবির সমসাময়িক সমাজের কিছু কিছু তথ্যের সন্ধান পেয়ে থাকি, সেটা আমাদের উপরি পাওনা।

কবি সামাজিক মানুষ। কবি সমাজের বুকে বসে কাব্য লিখবেন অথচ এতে সমাজের কোন প্রতিবিম্ব থাকবে না, তা কি করে সম্ভব? কবির জ্ঞাতসারেই হোক্ বা অজ্ঞাতসারেই হোক্, সমসায়িক সমাজের ছায়াপাত তাঁর কাব্যে থাকবে, এটা তো অনস্বীকার্য। আচার্য দণ্ডী-রচিত দশকুমারচরিতেও এর ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। মহাকবি দণ্ডী রাজবাহন প্রভৃতি দশজন কুমারের জীবন এবং বিজয়-অভিযান বর্ণনা করতে গিয়ে প্রয়োজনবোধে কাহিনীর সার্থক রূপায়ণের জন্য যেসব ঘটনা ও বৃত্তান্তের বিবরণ দিয়েছেন, সেগুলির মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে অনেক সামাজিক তথ্য। এসব তথ্যের সঙ্কলন করে তৎকালীন সমাজের একটি সুস্পষ্ট ধারণা করার জন্যই এ প্রবন্ধের অবতারণা। দশকুমারচরিতে বর্ণিত সমাজ ছিল জীবনরসে উচ্ছল; উৎসাহ, উদ্দীপনা, কূটবুদ্ধি, সাহস, হটকারিতা ও পুরুষকারের বিজয়গৌরবে ভাস্বর। তৎকালীন সমাজে জাতিভেদপ্রথার প্রচলন ছিল। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল সর্বোচ্চে; তাঁরা ছিলেন সমধিক শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁরা "ভূসুর" "ধরণীসুর" ইত্যাদি বিশেষ সম্মানসূচক বিশেষণে ভূষিত হতেন। ঐ শ্রদ্ধার লোভে জাতিতে ব্রাহ্মণ না হয়েও অনেকে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিত। আবার ব্রাহ্মণোচিত আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়াকলাপ না করলে তাঁরা "ব্রাহ্মণব্রুব" বলে পরিচিত হতেন। ব্রাহ্মণেরা অব্রাহ্মণের গৃহে আহার করতে দ্বিধা করতেন না। রাজবাহন ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হয়েও বণিক পুষ্পোদ্ভবের গৃহে বাস ও আহার করেছিলেন।

সমাজে 'অনুলোম' ও 'প্রতিলোম' বিবাহের প্রচলন ছিল। বিবাহ-ব্যাপারে উচ্চ-নীচ জাতির পরস্পরের সংমিশ্রণে কোন বাধা ছিল না। রত্নোদ্ভব ও অপহারবর্মা যথাক্রমে বণিককন্যা ও গণিকার পাণিগ্রহণ করেছিলেন আর সত্য-বর্মা পাণিপীড়ন করেছিলেন দু'জন ব্রাহ্মণতনয়ার। বহু-বিবাহেরও প্রচলন ছিল। বিত্তবহুল ব্যক্তি একাধিক পত্নী গ্রহণ করতেন। সপত্নীবিদ্বেষও যে ছিল না তা নয়, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়। 'গোমিনী'

সপত্নীবিদ্বেষ পোষণ করতেন না। কিন্তু সত্যবর্মার পুত্র সোমদত্ত বিমাতা কর্তৃক ঈর্ষাবশতঃ নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। বাল্য-বিবাহ বা অপরিণত বয়সে বিবাহের বড় একটা প্রচলন ছিল না। যুবক-যুবতীরা নিজ নিজ পতিপত্নী-মনোনয়নের সুযোগ পেত, এমন কি গুরুজনদের মনোনীত পাত্র-পাত্রী প্রত্যাখ্যানও করতে পারত। শক্তিকুমার গুরুজনদের মনোনীত পাত্রী পছন্দ হবে না আশঙ্কা করে স্বয়ং যোগ্য পাত্রীর সন্ধানে বের হয়েছিল। কুবের দত্তের কন্যা কুলপালিকা ধনমিত্রের বাগ্‌দত্তা ছিল। কিন্তু ধনমিত্র তাঁর অপরিমিত দানশীলতার জন্য নিঃস্ব হয়ে পড়লে, কুবের দত্ত অর্থপতি নামে অপর বিত্তশালী ব্যক্তিকে কন্যাদানে সম্মত হলেন। কিন্তু কুলপালিকা তাঁকে প্রত্যাখান করে গোপনে অপহারবর্মার সহায়তায় ধনমিত্রকে পতিত্বে বরণ করল।

রাজপুত্র, অমাত্যপুত্র ইত্যাদির শিক্ষাব্যবস্থা ছিল নিপুণ। ষড়ঙ্গবেদ, কাব্য, নাটক, ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, যুদ্ধবিদ্যা, মণিমন্ত্র, ওষধিবিদ্যা, ইন্দ্রজাল, প্রভৃতিতে তাঁদের বিশেষ জ্ঞান লাভ করতে হত। নারীরাও শিক্ষিতা ছিলেন এবং সমাজে শ্রদ্ধার পাত্রী বলে বিবেচিত হতেন। সংগীত, নৃত্য এবং চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি বিবিধ সুকুমার কলার ব্যাপক অনুশীলন হত। নারীরা এসব কলাবিদ্যার নিয়ত অনুশীলনের দ্বারা পারদর্শিতাও লাভ করেছিলেন। নিম্ববতীর কন্দুকনৃত্যের বর্ণনাবসরে 'চূর্ণপাদ', 'গীতমার্গ', 'পঞ্চবিন্দুপ্রসৃত', 'গোমূত্রিকাপ্রচার' ইত্যাদি নৃত্যের বিবিধ মুদ্রার উল্লেখ রয়েছে। চিত্র-বিদ্যার উল্লেখও রয়েছে নিম্ববতীর আখ্যানে।

দেবদেবীর উদ্দেশ্যে মঠ-মন্দির নির্মাণ করা হত। বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরের উল্লেখ রয়েছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মই ছিল প্রধান, যদিও বৌদ্ধ- ও জৈন-ধর্মাবলম্বী লোকও বিরল ছিল না। বৌদ্ধ-বিহারও ছিল। বসুপালিত বৌদ্ধসন্ন্যাসী হয়েছিলেন। দূরদেশে ধর্মস্থানে তীর্থযাত্রার কথাও উল্লিখিত হয়েছে। সত্যবর্মা সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণাবশতঃ প্রবাসে তীর্থযাত্রা করেছিলেন। কাপালিকও ছিলেন, তাঁরা শ্মশানে বাস করতেন। স্বপ্ন, ইন্দ্রজাল, ভূতপ্রেতের আক্রমণ ইত্যাদি অতিপ্রাকৃতে লোকের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস ও সরলতার সুযোগ নিয়ে দুষ্ট-ব্যক্তিরা লোককে প্রবঞ্চনা করত। পুষ্পোদ্ভব ঐন্দ্রজালিকের রূপ নিয়ে রাজবাহন ও অবন্তীসুন্দরীর মধ্যে কৌশলে পরিণয় সংঘটন করিয়েছিল।

একনায়কতন্ত্র ছিল তৎকালীন প্রশাসনের রূপ। রাজা বড় একটা স্বেচ্ছাচারী হতেন না, বরং তিনি পরোপকারী এবং দানশীল হতেন। রাজকার্যের সৌকর্যার্থে সচিব-নিয়োগ করা হত কুলক্রমাগত প্রথায়। প্রত্যেক বিভাগে বিভাগীয় প্রধান ও কর্মচারী নিয়োগ করা হত। রাজার চতুরঙ্গ সেনা-বাহিনী থাকত, আর থাকত আরক্ষবাহিনী ও গুপ্তচর। আরক্ষবাহিনী ও গ্রাম-প্রধান নগর ও গ্রামের শান্তি শৃঙ্খলা- ও নিরাপত্তা বিধানের ভার নিতেন। নগররক্ষীরা রাত্রিতে অসি ও লগুড়হস্তে নগরের রাস্তায় রাস্তায় পাহারা দিত। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যে বৃহৎ বৃহৎ নগরের চারদিকে পরিখা ও প্রাচীরের সুব্যবস্থা করা হত। প্রতিবেশী নৃপতিগণ পরস্পরের মধ্যে শত্রুতায় লিপ্ত থাকতেন।

তৎকালে ব্যবসাবাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি

হয়েছিল। স্থলপথে ও জলপথে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। স্থলপথে উটের সাহায্যে ও জলপথে নৌযানের সাহায্যে পণ্য-দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী করা হত। রত্নোদ্ভব বাণিজ্যোপলক্ষে নিয়তই সমুদ্রযাত্রা করতেন এবং তিনি নৌব্যসনে প্রাণ হারিয়ে-ছিলেন। জলদস্যুর ইঙ্গিতও এ গ্রন্থে রয়েছে।

ব্যসন বলে গণ্য হলেও দ্যূতক্রীড়ার ব্যাপক প্রচলন ছিল। প্রায় সকল শ্রেণীর লোকেরাই এতে অংশগ্রহণ করত। ব্যাপক প্রচলন ও অনুশীলন থেকে দ্যূতক্রীড়া একটি বিশেষ কলাবিদ্যা হিসাবে সমাজে গণ্য হতে লাগল। এর জন্য বিধিনিষেধ, আইনকানুন প্রভৃতির সৃষ্টি হল। দ্যূতক্রীড়ার জন্য রাজার নিকট থেকে 'সনদ'-গ্রহণের নিয়ম ছিল। দ্যূতসভা ছিল এবং দ্যূতসভার অধ্যক্ষও ছিলেন! 'পঞ্চবিংশতি' দ্যূতক্রীড়ার কৌশল ও পাশকনিক্ষেপের হস্ত-কৌশলের উল্লেখ রয়েছে এ গ্রন্থে। অনেক সময় দ্যূতক্রীড়াতে কপট আচরণ করা হত। একে অন্যের প্রতিনিধি হয়ে এতে অংশ গ্রহণ করতে পারত। কেবল উপকার করার প্রবল ইচ্ছা থেকেই অপহারবর্মা বিমর্দকের প্রতিনিধি হয়ে দ্যূতক্রীড়ায় অংশ গ্রহণ করেছিল।

দস্যুতস্করের উপদ্রব মোটেই কম ছিল না। এমনকি দ্যূতক্রীড়ার ন্যায় 'চৌর্য'ও একটি বিশেষ কলাবিদ্যা হিসেবে গণ্য হত। "কর্ণী-সুত" প্রবর্তিত চৌর্যের বিবিধ নিয়মকানুন ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হত। চোরেরা বিশ্বস্ত চরের মাধ্যমে নগরে কার কত ধনরত্ন আছে, কার স্বভাব কিরূপ, কে কি কাজ করে প্রভৃতি আগে জেনে নিয়ে চুরি করত। অনেক সময় ধনের অস্থিরত্ব দেখিয়ে নগরবাসী লোককে প্রকৃতিস্থ করে চুরির আশ্রয় নিত। সব সময় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে চুরি করা হত না। অনেক সময় পরোপকারের জন্য চুরি করা হত। অপহারবর্মা অপরিমিত দানশীলতার জন্য নির্ধন ধনমিত্রকে সাহায্য করার জন্যে কুবেরদত্তের গৃহে চুরি করেছিল। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাও নিজেকে 'চোর' বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করত না। দস্যুবৃত্তিরও প্রচলন ছিল। ধনীর ধন লুণ্ঠন করে দরিদ্রের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য দিবালোকে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করতে লোকে দ্বিধা করত না। প্রবঞ্চনারও কোন সীমা ছিল না। অপহারবর্মা "চর্মময়পাত্র" দিয়ে একাধিক লোককে বঞ্চিত করে তাদের অর্থ হস্তগত করে সে অর্থ প্রাপককে দিয়েছিল।

আবার চুরির অপরাধে প্রাণদণ্ডেরও ব্যবস্থা ছিল এবং বিবিধ বিচিত্র উপায়ে সে দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হত। কখনো শূলে বিদ্ধ করে, কখন হস্তীর পদতলে পিষ্ট করে অপরাধীকে মারা হত। প্রবঞ্চনার জন্যও শাস্তির বিধান ছিল। প্রবঞ্চনা করে ধরা পড়লে তাকে তার সর্বস্ব হরণ করে রাজ্য থেকে নির্বাসন দেওয়া হত। রাজসিংহাসনলাভের জন্য রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে কূটচক্রান্তের অবধি ছিল না, সিংহাসন-লিপ্সু রাজপুরুষেরা পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধ, গুপ্তহত্যা ইত্যাদিতে লিপ্ত হতেন।

সবকিছু মিলে তৎকালীন সমাজ ছিল অদ্ভুত ও বিচিত্র।

চাঁদের দেশে

[পূর্বানুবৃত্তি]

শিবদাস

৪

২১শে জুলাই রাত্রি ১-৪৭ মিনিট সময়ে চন্দ্রযান ঈগল মহাকাশচারী আর্মস্ট্রং ও অ্যালড্রিনকে নিয়ে চাঁদের ওপর নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে (০'৭° উঃ, ২৩'৬° পূঃ) অবতরণ করেছিল (৪নং চিত্র)। নেমেছিল ৭৮' ফুট ব্যাসের একটা গভীর গর্তের কিনারায়। মানুষ নিয়ে পৃথিবীর যান এই প্রথম চাঁদে নামলেও এর আগে যাত্রীহীন ২৩টি যান যন্ত্রপাতিসহ চাঁদের মাটি ছুঁয়েছে। সে-গুলির ভেতর কিছু ভেঙ্গে গেছে, কিছু নিরাপদে নেমেছে। যেখানে অ্যাপোলো ১১ নামল, তার কাছাকাছিই এরূপ দুটি যান নেমেছিল। সেগুলি চাঁদের খুব কাছ থেকে ছবি তুলে পাঠিয়েছিল। যেগুলি ভেঙ্গেছে, সেগুলিও ভাঙ্গার ২।৩ সেকেণ্ড আগে পর্যন্ত ছবি তুলেছে। এ-অভিযানে নামার স্থান নির্বাচন ইত্যাদিতে খুবই কাজে লেগেছে সেসব ছবিগুলি। চাঁদের ভূ-পিঠেরই মানচিত্র তৈরী হয়েছে তা দিয়ে।

চাঁদের মাটিতে যান নামার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু যাত্রী দুজন নীচে নেমে পড়লেন না। আগের ব্যবস্থামত ভেতরে থেকেই পর্যবেক্ষণ করে ও ছবি তুলে লম্বা ঘুম লাগালেন। বাকী রাতটুকু এবং সকালেও অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে তারা শান্ত দেহমন নিয়ে জাগলেন। ২১শে জুলাই সকাল সওয়া-আটটার পর আর্মস্টং বিশেষ পোশাক পরে তৈরী হলেন। যানের দরজা খুলে চন্দ্রযানের পায়ার সঙ্গে লাগানো মই বেয়ে নামতে লাগলেন। মই-এর শেষ ধাপে এক পা এবং যানের পায়ার নীচে লাগানো গোল চাকতিতে আর এক পা রেখে যানের একটা ঢাকনা খুলে একটা চলচ্চিত্র তোলার ক্যামেরার মুখ অনাবৃত করলেন। ক্যামেরাটি তখনি ছবি তোলা শুরু করল, বেতারে পৃথিবীতে তা পাঠাতেও লাগল আর একটি যন্ত্র। তখন, ঠিক সকাল ৮টা ২৬ মিনিটের সময় (২১শে জুলাই) আর্মস্ট্রং চাঁদের মাটিতে পদার্পণ করলেন। এই ব্যবস্থায় সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষ চাঁদে মানুষের প্রথম পদার্পণ টেলিভিসনে দেখতে পেল।

আর্মস্ট্রং নেমেই সর্বাগ্রে কাছ থেকে খানিকটা চাঁদের মাটি তুলে থলিতে পুরে যানের ভেতর রাখলেন। বলা তো যায় না, অজানা পরিবেশে কোন অজানা কারণে যদি তখনি বা একটু পরে যানে ফিরতে বাধ্য হতে হয়, তা হলেও চাঁদের খানিকটা মাটি অন্ততঃ সঙ্গে ফিরবে। অ্যালড্রিন যান থেকে নামলেন এর ২০ মিনিট পর।

দুজনেই চাঁদের মাটিতে বেড়িয়ে বেড়ালেন কিছুক্ষণ চাঁদের অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য দেখলেন, বললেন "খুবই মনোরম।" তবে কেবল মনোরমই নয়, পরিবেশ ভীষণও—"এ দৃশ্য জীবনে আর দেখিনি—আলো-অন্ধকারময় এমন নিষ্ঠুর অপরিচিত প্রকৃতির সম্মুখীন আর কখনো হইনি।"

চাঁদের টান (অভিকর্ষ) পৃথিবীর টানের ছ'ভাগের একভাগ মাত্র। কাজেই সে অনভ্যস্ত পরিবেশে চলাফেরা করা, কাজ করা খুবই

● চন্দ্রপৃষ্ঠে যাত্রীহীন যান

স্পর্শ-স্থান :	যান :
(দৃশ্যমান পৃষ্ঠে—বামে)	
[৩০° উ, ১° পূ]	লুনা-২
১	লুনা-১৩
২	" -৮
৩	" -৯
৪	" -৭
৫	অর্বিটার-৫
৬	সার্ভেয়ার-১
৭	লুনা-৫
৮	সার্ভেয়ার-৩
৯	রেঞ্জার-৭
১০	সার্ভেয়ার-২
১১	" -৩
১২	" -৪
১৩●	রেঞ্জার-৯
১৪	" -৬
১৫	" -৮
১৬	সার্ভেয়ার-৫
১৮	" -৭
১৯	লুনা-১৫
(অদৃষ্ট পৃষ্ঠে—ডাইনে)	
১৯	অর্বিটার-২
২০	" -৩
[৬° উ, ১৬০° পূ]	" -১
[১৪° দ, ১৩০° প]	রেঞ্জার-৪

চাঁদের মানচিত্র

৪নং চিত্র

আজ পর্যন্ত মোট ২৫টি যান চন্দ্রপৃষ্ঠ স্পর্শ করেছে, (৭টি রাশিয়ার ও ১৮টি আমেরিকার), ২৪টি যাত্রীহীন, ১টি যাত্রীসহ (অ্যাপোলো-১১); এগুলির মধ্যে কিছু আছড়ে পড়ে ভেঙে গেছে, কিছু নিরাপদে নেমেছে। রাশিয়ার লুনা-২ প্রথম চন্দ্রপৃষ্ঠ স্পর্শ ক'রে ভেঙে যায় (১৩. ৯. ১৯৫৯)। চাঁদে প্রথম নিরাপদে নামে রাশিয়ার লুনা-৯ (৩. ২. ৬৬); আমেরিকার সার্ভেয়ার-১ (২. ৬. ৬৬)। চাঁদের অদৃশ্য দিকের ছবি প্রথম তুলে পাঠায় রাশিয়ার লুনা-৩ (৭. ১০. ৫৯)। পরে আমেরিকার ৫টি অর্বিটার চাঁদের শতকরা ৯৯½ ভাগেরই ছবি তুলে পাঠিয়েছে। চাঁদে নামা ২৫টি যানের ২১টির অবতরণ-স্থল উপরের মানচিত্রে দেখানো আছে, ৩টির স্থান-নির্দেশ দেওয়া হল, একটির (অর্বিটার-৪) অবতরণ-স্থল জানা নেই।

অসুবিধে। যতটা ভাবা গিয়েছিল ততটা অসুবিধে কিন্তু হয়নি; আর্মস্ট্রং বলেছেন, "বহু বিশেষজ্ঞ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, অনেক অসুবিধে ও বাধাবিঘ্ন আসবে, কিন্তু তা হয়নি; চাঁদে নামার পর চাঁদের অভিকর্ষের আওতায় এসে আমরা বেশ আরাম বোধ করেছিলাম। ভারশূন্য অবস্থায় বা পৃথিবীর অভিকর্ষের মধ্যে থাকার তুলনায় সে অবস্থা আমাদের কাছে অধিকতর আনন্দপ্রদ মনে হয়েছিল।" তবে অসুবিধের অন্য কারণ ছিল—তাঁদের পোশাক। মহাজাগতিক রশ্মি, চাঁদের অত্যধিক গরম ও ঠাণ্ডা প্রভৃতি অনেক কিছু থেকে যাত্রীদের রক্ষা করার জন্য পোশাকটি বহুস্তরযুক্ত ও বেশ ভারী করে করতে হয়েছিল; আবার খুব শক্ত করেও, কারণ চলতে গিয়ে অনভ্যাসে যদি যাত্রীরা টলে পড়ে যান, চাঁদের সূঁচল পাথরে লেগে ফুটো যেন না হয় কোথাও। তাছাড়া চাঁদে হাওয়া নেই বলে নিঃশ্বাস নেবার অক্সিজেনের থলেও পোশাকের সঙ্গে পিঠে বইতে হচ্ছে, বেতার প্রেরক- ও গ্রাহক-যন্ত্র প্রভৃতিও। অক্সিজেন থলি থেকে বেরিয়ে পোশাক ও যাত্রীদের গায়ের মাঝখানের সব জায়গা দিয়েই বইছিল, কেবল নাকের কাছে নয়। এইসব মিলিয়ে পোশাকের ওজন তিন মণ। তবে চাঁদে তার ওজন মাত্র আধ মণ, এই যা রক্ষে।

চাঁদে নেমে খুবই আনন্দ হচ্ছিল যাত্রীদের, আবার অনেক কাজও করতে হবে অল্প সময়ে—আর্মস্ট্রং তাই বলেছেন, "তখন আমাদের অবস্থা মিষ্টির দোকানের সামনে পাঁচ বছরের শিশুর মতো—কোন্‌টা আগে খাব?" সব নিয়ে ঘণ্টা তিনেকের বেশী নীচে থাকা নিষেধ ছিল, কারণ মাত্র চার ঘণ্টার মত অক্সিজেন আছে। যান থেকে বেশী দূরে যেতেও নিষেধ করা ছিল, হঠাৎ বিপদ এলে তাড়াতাড়ি যাতে যানে ফিরে আসা যায়। চাঁদে নেমে অনেক কাজ করেছিলেন তাঁরা। প্রথমে চন্দ্রযানের পায়ায় মইয়ের সঙ্গে যে ফলকটি লাগানো ছিল, সেটি অনাবৃত করেন; তাতে লেখা ছিল, "পৃথিবী গ্রহ থেকে মানুষ ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রথম চাঁদের এই স্থানটিতে পদার্পণ করেছিল। আমরা সমগ্র মানবজাতির শান্তির জন্য এখানে এসেছিলাম।" স্বাক্ষর ছিল আর্মস্ট্রং, অ্যালড্রিন, কলিন্স ও প্রেসিডেণ্ট নিক্সনের। এটি চাঁদেই থেকে যাবে, কারণ চন্দ্রযানের নীচের অংশের সবটাই চাঁদে থাকবে। তারপর কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একটা চলচ্চিত্র-তোলা ক্যামেরা যানের দিকে মুখ করে বসালেন; এটিও ছবি তুলে পৃথিবীতে পাঠাচ্ছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা চাঁদের মাটিতে পুঁতলেন। তারপর চাঁদের ধূলো ও পাথর তুলে থলি ভর্তি করা চললো। ৪৫ পাউণ্ড চাঁদের মাটি তাঁরা সঙ্গে নিয়ে ফিরেছেন। তাঁরা দেখলেন চন্দ্রপৃষ্ঠ কঠিন, ওপরে একটা মিহি ধূলোর স্তর, পিচ্ছিল; রং ঘন পাংশুটে; তাঁদের জুতোর দাগ ⅛ ইঞ্চির বেশী গভীর হচ্ছিল না। চাঁদের ওপর তিনটে যন্ত্র বসালেন তাঁরা। একটা প্রতিফলক—যা পৃথিবী থেকে পাঠানো 'লেসার' রশ্মিকে প্রতিফলিত করে ফেরত পাঠাবে। আর একটি ভূমিকম্প মাপার ও তার খবর পৃথিবীতে পাঠাবার যন্ত্র। আর একটা যন্ত্র যা সূর্য থেকে চাঁদে কী কী কণা আসে, কী হারে আসে, এই সব জেনে নেবে। এ যন্ত্রটি সুইজারল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীরা দিয়েছিলেন; যাত্রীরা চাঁদ থেকে ফেরার সময় এটিও ফিরিয়ে এনেছেন; যাঁরা দিয়েছিলেন যন্ত্রটি তাঁদের কাছে ফলাফল পরীক্ষার জন্য ফেরতও দেওয়া হয়েছে। আগের

যন্ত্র দুটি চাঁদে রয়ে গেছে সক্রিয় অবস্থাতেই।

কাজ সেরে আর্মস্ট্রং ও অ্যালড্রিন কিছু আগে-পরে যানে ফিরে এলেন ১১টা ২১ মিনিটের মধ্যেই, নামার প্রায় তিন ঘণ্টা পরে। আর্মস্ট্রং চাঁদের মাটিতে ছিলেন ২ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট, অ্যালড্রিন ২ ঘণ্টা ২৩ মিনিট। তারপর খেয়ে দেয়ে আবার ঘুম, রাত্রি ৯-৩০ মিঃ পর্যন্ত। ঘুম থেকে উঠে ফেরার তোড়জোড় করতে লাগলেন। যে যানটি চাঁদে নেমেছে, ফেরার সময় তার সবটা ওপরে উঠবে না, নীচের অংশটি চাঁদেই থেকে যাবে, উৎক্ষেপণ-মঞ্চের কাজ করবে সেটি। রাত্রি ১১টা ১৪ মিনিটের সময় (২১শে) নীচের অংশ আর ওপরের অংশের জোড় খুলে দেওয়া হল; যানটির ইঞ্জিন চালু করা হল তার দশ মিনিট পরে। চার মিনিটের মধ্যেই যানটি ৩২,০০০′ ওপরে উঠে গেল, ৭ মিনিটে ৫০,০০০′ ফুট।

কলিন্স কম্যাণ্ড-মডিউলে বসে চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭০ মাইল ওপর দিয়ে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করেই চলেছিলেন, বন্ধুদের ফেরার পথ চেয়ে। আর্মস্ট্রং ও অ্যালড্রিন রাত্রি ৩টা ১ মিনিটের সময় (২২শে জুলাই) তাঁর কাছে পৌঁছে চন্দ্রযানকে কম্যাণ্ড মডিউলের সঙ্গে সংযুক্ত করলেন। দুটি যানের সংযোগস্থলের দরজা খুলে ১৮″ ইঞ্চি লম্বা, ৩২″ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত যে সুরঙ্গপথ দিয়ে তাঁরা চন্দ্রযানে এসেছিলেন, সেই পথ দিয়েই চন্দ্রযান থেকে কম্যাণ্ড মডিউলে ঢুকলেন। তারপর পথটি বন্ধ করে দিয়ে কিছুক্ষণ পর চন্দ্রযানটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল; চন্দ্রযানটি ছুটে গেল সূর্যের দিকে।

তারপর ঘরে ফেরার পালা। ২২শে জুলাই রাত্রি ১০টা ১৭ মিনিটের সময় কলিন্স অ্যাপোলোর গতিবেগ বাড়িয়ে চাঁদের অভিকর্ষ কাটিয়ে পৃথিবীর দিকে সোজা ছুটে চললেন। ১৯শে জুলাই চন্দ্রপ্রদক্ষিণ আরম্ভ করার পর পৃথিবীর দিকে যাত্রা করার সময় পর্যন্ত কলিন্স ৫৯ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে চাঁদকে ৩০ বার প্রদক্ষিণ করেছেন।

পৃথিবী থেকে পাঠানো ৩৬৪′ ফুট উঁচু যানটির মাত্র ৪৪′ তখন ফিরছিল (কম্যাণ্ড মডিউল ১১′, সার্ভিস মডিউল ২৩′ ফুট); পৃথিবীর আবহমণ্ডলে প্রবেশের আগে সার্ভিস মডিউলটিকেও খসিয়ে দিয়ে কেবল ১৩′ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট, ১১′ ফুট উঁচু কম্যাণ্ড মডিউলটি হাউই দ্বীপ থেকে ৯৫০ মাইল দূরে (১০° উঃ, ১৭০° পঃ) প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পথের বহু বাধা-বিপদ কাটিয়ে চাঁদের দেশে গিয়ে আবার নির্বিঘ্নে ফিরে এলেন তিনজন বিজয়ী চন্দ্রাভিযাত্রী।

৫

চাঁদ সম্বন্ধে বহু তথ্য মানুষ জেনেছে আগেই, বহু বিজ্ঞানীর বহু শতাব্দীর সাধনায়। অ্যাপোলো-১১ অভিযানে যেসব তথ্য এসেছে, তা থেকে বিজ্ঞানীরা নতুন তথ্যও কিছু পেয়েছেন। সেগুলি 'মৃদু বিস্ময়কর'; আবার 'সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত'ও কিছু আছে। চাঁদ সম্বন্ধে পুরনো ও নতুন তথ্য কিছু দেওয়া হল:

১। চাঁদ নিজের চারদিকে এবং পৃথিবীর চারদিকেও ঘোরে মাসে একবার করে। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর সঙ্গে সে সূর্যকেও প্রদক্ষিণ করছে বছরে একবার। সূর্য যে ছায়াপথের দশহাজারকোটি তারকার মধ্যে মাঝারি আকারের একটি তারকা মাত্র, তার সঙ্গে তার কেন্দ্রের চারপাশে সূর্য আবার নিজ গ্রহ-উপগ্রহের পরিবার নিয়ে ঘুরছে সাড়ে বাইশ কোটি বছরে একবার করে।

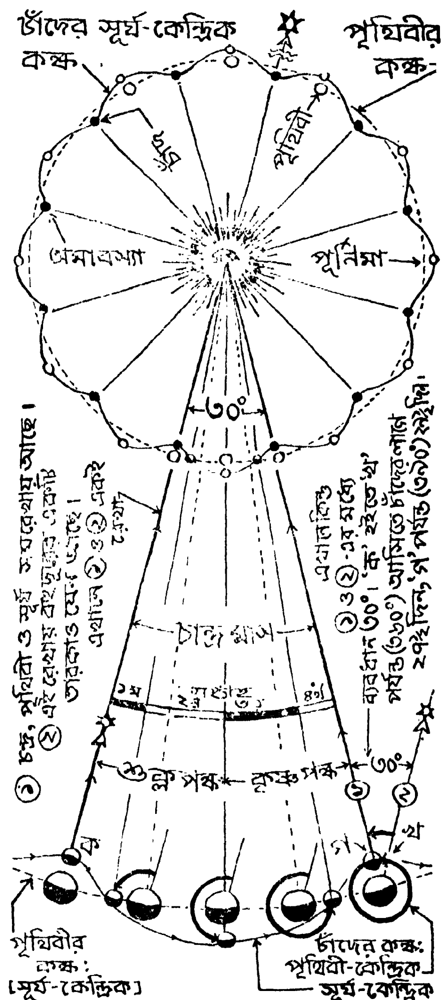
পৃথিবীর চারপাশে একবার ঘুরতে চাঁদের লাগে ২৭⅓ দিন; কিন্তু পৃথিবী চাঁদকে নিয়ে

সূর্যের চারদিকে ঘোরে ব'লে এই সময়ের মধ্যেই তার অবস্থান ৩০° ঘুরে যায়। তাই চাঁদ বৃত্ত পূর্ণ করার পর আরো ৩০° বেশী ঘুরে এলে (মোট ৩৯০°) আমাদের চোখে তার একপাক ঘোরা পূর্ণ হয়। এই জন্য আরো দুদিন পরে, ২৯½ দিনে, এক চান্দ্র মাসে এই আপেক্ষিক পরিবেশে তার পৃথিবী-প্রদক্ষিণ পূর্ণ হয় (৫নং চিত্র)।

পৃথিবী থেকে আমরা দেখি চাঁদ ও সূর্য পৃথিবীকে বৃত্তাকার পথে নিত্য প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু সৌর জগতের বাইরে দাঁড়িয়ে যদি দেখতে পারি, তাহলে আমরা দেখবো পৃথিবী সূর্যের চারদিকে একটানা রেখায় ঘুরছে, আর চাঁদ যেন লাফিয়ে লাফিয়ে সূর্য প্রদক্ষিণ করছে ; সূর্যের চারদিকে সে যেন বছরে একটি করে দ্বাদশদল পদ্ম এঁকে চলেছে (৫নং চিত্র); দেখবো, চান্দ্র মাসের ১ম ও ৪র্থ সপ্তাহে, অমবস্যার ঠিক আগের ও পরের সপ্তাহে চাঁদের এই চলার বেগ কম, ৩য় ও ৪র্থ সপ্তাহে বেশী।

২। চাঁদের যে দিকটা আমরা দেখতে পাই, তার চেয়ে যে দিকটা দেখতে পাই না সেদিকে গর্ত অনেক বেশী।

৩। চাঁদের জন্ম নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক অনুমান করেছেন। অতি হালকাভাবে ছড়ানো কণার এক বিপুল-বিস্তৃত মেঘ ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশঃ জমে সৌরজগৎ সৃষ্টি করেছে, মনে করা হয় ; সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী প্রভৃতি সবই সেই মেঘেরই এক একটা অংশ। এ পর্যন্ত সকলেই একমত। কিন্তু কেউ বলেন, সম্পর্কে (ক) চাঁদ পৃথিবীর বোন—আদি মেঘের একটা টুকরো পৃথিবী, আর একটা পৃথক টুকরো চাঁদ ; সেই অবস্থা থেকেই পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর মতোই ক্রমে ক্রমে জমে কঠিন হয়েছে। কেউ বলেন, (খ) চাঁদ পৃথিবীর কন্যা—পৃথি বায়বীয় অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে ঘন হতে হতে এক সময় এত জোরে ঘুরেছিল যে তার একদিক ফেঁপে উঠে শেষে আলাদা হয়ে গিয়েছিল ; সেইটাই চাঁদ। আবার কেউ বলেন, (গ) চাঁদ



৫নং চিত্র

পৃথিবীর সাথী—পৃথিবীর মতোই চাঁদ পৃথক একটি গ্রহ, একা একাই সূর্য প্রদক্ষিণ করতো, একদা পৃথিবীর কাছ দিয়ে যাবার সময় তার

টানে আটকে গেছে ; তখন থেকে একসঙ্গে চলা শুরু হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা আশা করেছিলেন, চাঁদের মাটি পরীক্ষা করে এ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যাবে ; তা যায়নি। তবে নিশ্চিতভাবে না হলেও শেষ অনুমানটিই, (গ), বেশী সমর্থিত হয়েছে। অ্যাপোলো ১১ অভিযানে যে চাঁদের পাথর এসেছে, বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে তার বয়স ধরেছেন ৪৫০ কোটি বছর ; এখন পর্যন্ত পাওয়া পৃথিবীর প্রাচীনতম পাথরের বয়স ৩৩০ কোটি বছর ; কাজেই চাঁদ পৃথিবীর আগে জন্মেছে, সে একটি পৃথক গ্রহ—এখন পর্যন্ত এই-ই বলতে হয়।

৪। অ্যাপোলো ১১ অভিযানের ফলে নিশ্চিত জানা গেল চাঁদ জীবতত্ত্বের দিক থেকে মৃত—চাঁদে কোন জীবাণু নেই, কোন জীবের থাকার মতো পরিবেশ নেই। ভূতত্ত্বের দিক থেকেও চাঁদ পৃথিবীর মতো নয় ; বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন, তার সবটাই কঠিন এবং ভেতরটা ফাটল ধরা ; অগ্ন্যুৎপাতে উৎক্ষিপ্ত তরল পদার্থ জমে চাঁদের 'সাগর'গুলি হয়েছে বহু আগে। চাঁদে রেখে আসা যন্ত্র থেকে পাঠানো ভূকম্পনের তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিকগণ এই অনুমান করছেন।

৫। চাঁদে রেখে আসা প্রতিফলককে গত ১লা আগস্ট লেসার রশ্মি পাঠিয়ে ও ফেরত পেয়ে কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ঐ দিন চাঁদের দূরত্ব জানিয়েছেন ২,২৬,৯৭০'৯ মাইল। এতে ভুল যদি থাকে, ১৫০´ফুটের বেশী নয় ; আগে যেভাবে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব মাপা হত, তাতে ১ মাইল পর্যন্ত ভুল থাকার সম্ভাবনা ছিল।

৬। চাঁদ থেকে আনা ধুলো পরীক্ষা করে দেখা গেছে তার অর্ধেকই হল হীরকের মত উজ্জ্বল লম্বা বা গোলাকার কণা, কাঁচ। এই কণাগুলির জন্যই চাঁদের জমি পিচ্ছিল মনে হয়েছিল।

৭। রাসায়নিক বিশ্লেষণে চাঁদের মাটিতে 'হিলিয়াম' পাওয়া গেছে, যা পৃথিবীতে আছে ; 'আরগণ' 'ইরিয়ণ' প্রভৃতি গ্যাসও পাওয়া গেছে।

৮। চাঁদের মাটি বা ধূলি জীবনের পক্ষে হানিকর নয়।

৯। চাঁদ তাঁর নিজের চারদিকে ঘুরতে যে সময় নেয় পৃথিবীর চারদিকেও ঘোরে ঠিক সেই সময়ে, ২৯½ দিনে। সেজন্য সব সময় চাঁদের একটা দিকই আমরা দেখতে পাই ; তবে তার অপর দিকের সামান্য একটু অংশও আমাদের কাছে অনাবৃত হয় (৪নং চিত্র)।

চাঁদ সম্বন্ধে পরে আরো কত কি জানবো আমরা। সে সব তথ্য থেকে শুধু চাঁদেরই নয়, সৌরজগতেরও বহু অজানা রহস্য উদ্ঘাটিত হবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। সে রহস্যো-দ্ঘাটনের এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্কে যাওয়ার বিপুল সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে মানুষ অ্যাপোলো ১১-তে চড়ে মহাকাশে পাড়ি দিয়ে চাঁদের দেশে গিয়ে এবং নির্বিঘ্নে ফিরে এসে।

আবেদন

উত্তরবঙ্গ ও আসামে রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যাত্রাণকার্য

উত্তরবঙ্গের মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এবং আসামের কাছাড় জেলায় ইদানীং বন্যার যে তাণ্ডবলীলা হয়ে গিয়েছে তাতে লক্ষ লক্ষ বিঘে চাষের জমি প্লাবিত হয়েছে, সহস্র সহস্র লোক হয়েছেন গৃহহীন ও নিরাশ্রয়; এইসব দুর্গত ও অসহায় নরনারীর জীবন রক্ষার জন্য অবিলম্বে সাহায্য প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণ মিশন ইতিমধ্যেই বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলগুলিতে ত্রাণকার্যে নেমেছেন। মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার, ইংলিশ বাজারের এবং মুর্শিদাবাদ জেলার জংগীপুর মহকুমার বন্যাকবলিত অঞ্চলগুলিতে প্রাথমিক সাহায্য হিসেবে চিঁড়ে, গুড় প্রভৃতি বিতরণ করা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সাহায্যের ভূমিকা হিসেবে তদারকের কাজ শেষ করে নিয়মিত খাদ্যশস্য-বিতরণও আরম্ভ হয়েছে।

আসামের কাছাড় জেলার অন্তর্ভুক্ত হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ মহকুমার বন্যাবিধ্বস্ত কয়েকটি অঞ্চলেও মিশন ত্রাণকার্য আরম্ভ করেছেন। কিন্তু বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধির সংগে সংগে এখন আরও বিস্তীর্ণ এলাকায় কাজের ক্ষেত্র প্রসারিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

এই অগণিত বন্যাক্লিষ্ট নরনারায়ণের সেবায় রামকৃষ্ণ মিশনকে মুক্ত হস্তে সাহায্য করার জন্য সহৃদয় দেশবাসীর কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি। দান—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতে পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। চেক—"রামকৃষ্ণ মিশন" এই নামে কাটতে হবে এবং সাহায্য পাঠাবার সময় 'রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যা তহবিলের জন্য' এই কথার উল্লেখ প্রয়োজন।

১। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া
২। অদ্বৈত আশ্রম, ৫নং ডিহী এণ্টালী রোড, কলিকাতা ১৪
৩। উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার কলিকাতা ৩
৪। রামকৃষ্ণ মিশন ইন্স্টিটিউট অব্ কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা ২৯

বেলুড় মঠ,
১লা সেপ্টেম্বর,
১৯৬৯

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন

শিলং-এ গুরুপূর্ণিমা উৎসব

শিলং রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমপ্রাঙ্গণে স্থানীয় ভক্তগণের উদ্যোগে গত ২৯শে জুলাই গুরু-পূর্ণিমা উৎসব শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা, পাঠ, প্রসাদবিতরণ ও বিকালে ভক্তসম্মেলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে প্রেরিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর এই পত্রখানি সম্মেলনে পঠিত হয়:

"শুনে খুব খুশী হলাম, শিলং-এর ভক্তেরা আগে যেমন কেবল গুরুভাইদের নিয়ে নিজ নিজ গুরুর জন্মদিন পৃথকভাবে অনুষ্ঠান করত, এবারে তা না করে সকলে একত্রে গুরুপূর্ণিমার দিনটিই পালন করতে মনস্থ করেছে। আগে যা করা হোত, তাতে 'আমার গুরু, আমার গুরু' ব'লে বিভিন্ন ভক্তদের নিয়ে একটা দল বাঁধার প্রবণতা ছিল—যার কোন মানে হয় না। নিজ নিজ গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি থাকা তো খুবই ভাল, তার প্রয়োজনও রয়েছে; কিন্তু নিজ গুরুকে কেন্দ্র করে দল সৃষ্টি করা খুবই খারাপ। এই মনোভাব যাতে গজিয়ে না উঠতে পারে সেজন্য বেলুড় মঠ থেকে মঠের সব কেন্দ্রেই শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদগণ ছাড়া, তাঁরা দীক্ষাগুরু হন বা না হন, আর সকলেরই জন্মতিথি পালন করা নিষিদ্ধ আছে। আমাদের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুরই গুরু, ইষ্ট সব; তিনিই আমাদের 'গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।' এই কথাই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের মুখে শুনেছি, এই কথাই আপনাদেরও বলি; 'গুরুদেব' সম্বোধন তাঁরা কেউ-ই সইতে পারতেন না। আগে আমাদের সঙ্ঘে 'গুরুদেব' কথাটি অজানাই ছিল; আজকালকার ভক্তেরা কথাটিকে চালু করেছেন।

"আমাদের স্মরণ রাখতেই হবে যে, দীক্ষিত হোক বা নাই হোক, ঠাকুরের সব ভক্তই আমাদের অতি আপনজন। ভারত জুড়ে ঠাকুরের এমন বহু ভক্ত রয়েছেন যাঁরা দীক্ষিত না হয়েও বহু দীক্ষিত ভক্তের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে নানাভাবে তাঁর এবং তাঁর আদর্শের সেবা করে যাচ্ছেন। আশা করছি, আপনারা আপনাদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য সব ভক্তদেরই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যাঁরা 'আমার গুরু', 'আমার গুরুভাই', 'আমার গুরুভগ্নী' ইত্যাদি ব'লে বেড়ান, তাঁরা যেন ছোট ডোবার মাছের মতো, সে-ক্ষুদ্রগণ্ডির ভেতরে থেকেই তৃপ্ত; তাঁরা জানেন না বা জানতে চানও না যে, সেখান থেকে গঙ্গায়—শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগোষ্ঠীরূপ প্রধান স্রোতে না পড়লে সমুদ্রে, লক্ষ্যে পৌঁছবার সম্ভাবনা খুবই কম।

"আমাদের সকলের আসল গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজাদির মাধ্যমে গুরুপূর্ণিমা পালনে আপনাদের এই প্রচেষ্টায় আমি পুনরায় আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ঐ দিন সন্ধ্যায় যে ভক্তসম্মেলন হবে, তাতে যেন শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজী এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য পার্ষদ-গণের কথাই আলোচিত হয়, আর কারো নয়। ব্যক্তিগত গুরুর মহত্ত্ব সম্বন্ধে কাউকে কোন আলোচনা করতে দেবেন না; সেটা নিজস্ব ব্যাপার থাকুক। আমাদের গুরুবাদের একটা বিশেষত্ব আছে; দেখবেন, এই ধরনের হালকা আলোচনা করতে দিয়ে সে বিশেষত্বকে যেন সাধারণ স্তরে টেনে নামিয়ে আনা না হয়। একে গুরুভক্তি বলে না; নিজ গুরুর নির্দেশমতো নীরব সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ নিজ জীবনে ফুটিয়ে তোলাই হল যথার্থ গুরুভক্তি।

"শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আমার আন্তরিক প্রার্থনা, এই শুভদিনে সব ভক্তের শিরেই যেন তাঁর আশীর্বাদ বর্ষিত হয়। ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ!"

সমালোচনা

বিবেকানন্দ শিলা স্মারক গ্রন্থঃ সম্পাদক—অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার ও অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ। বিবেকানন্দ শিলা স্মারক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ, ৬০।২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। ১৩৭৬। মূল্য তিন টাকা।

পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় জনগণের দুঃখমোচনের উপায় অন্বেষণের চিন্তায় বহু বিনিদ্র রজনী কাটাইবার পর কন্যাকুমারিকায় 'ভারতের শেষ শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া' ধ্যাননেত্রে ভারতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ছবি সুস্পষ্টভাবে দর্শনান্তে নিশ্চিত পথের সন্ধান পান। সে পথে প্রথম পদক্ষেপ তাঁহার চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান এবং সেখানে বিশ্বসভায় ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্মকে উচ্চাসনে বসানো—যাহার ফলে ভারতীয় জাতির আত্মবিশ্বাস উদ্বুদ্ধ হয় এবং পরে স্বদেশ-প্রত্যাগত তাঁহারই সিংহনাদে পূর্ণ জাগ্রত হইয়া জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে শুরু করে। স্বামীজীর জীবনেতিহাসে এবং ভারতীয় জাতির নবজাগরণে তাই কন্যাকুমারিকার শিলাখণ্ডটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, বর্তমানে সেই শিলাখণ্ডের উপরে নির্মীয়মাণ মন্দিরটি সেই তাৎপর্যেরই প্রতীকস্বরূপ। যাঁহাদের অক্লান্ত উদ্যমে এই সর্বমানবের তীর্থমন্দির রূপায়িত হইতেছে, তাঁহারা সমগ্র জাতির অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলির যোগ্য। সুখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিবেকানন্দ শিলা স্মারক সমিতির উদ্যোগে অর্থসংগ্রহের অভিযান সুসমাপ্ত। এক্ষণে আলোচ্য স্মারকগ্রন্থখানির মাধ্যমে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের পূর্ণতা।

প্রচ্ছদপটে বিবেকানন্দ শিলা ও ভাবী মন্দিরের ছবি দুইটি নয়নাভিরাম সুষমায় পাঠকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থের প্রকাশক শিলা সমিতির সংগঠন-সম্পাদক শ্রীপ্রদীপ ঘোষের বিবেকানন্দ শিলা ও শিলা-স্মারক প্রবন্ধটির মাধ্যমে এ মন্দির নির্মাণের ইতিহাস সুচারুরূপে বিধৃত। সম্পাদকীয় নিবেদনে সম্পাদকদ্বয় আশা প্রকাশ করিয়াছেন, 'কন্যাকুমারিকার নির্মীয়মাণ মন্দিরটি বিবেকানন্দ-জীবনের শিখা থেকে আরও লক্ষ লক্ষ তরুণ-বিবেক-চিত্তে অগ্নি-সঞ্চারের আদিপ্রেরণা হোক'—সে প্রার্থনা আলোচ্য স্মারকগ্রন্থটি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

গ্রন্থটি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর আশীর্বাণীপূত।

স্বামী সারদানন্দজীর 'স্বামী বিবেকানন্দ' সংগীতটি গ্রন্থের শুভ সূচনা। স্বামী নিরাময়ানন্দজীর 'কন্যাকুমারীতে স্বামীজীর ধ্যান'-শীর্ষক ভাবগম্ভীর নিবন্ধটি এবং শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে' নামে কাব্যময় রচনাটি আলোচ্য স্মারকগ্রন্থের ভাবসত্যের সার্থক প্রকাশ। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, শ্রীমণি মিত্র, অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত প্রভৃতির কয়েকটি মননশীল নিবন্ধ পাঠকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিবে—'বেদান্তমূর্তি স্বামী বিবেকানন্দ', 'আচার্যবরিষ্ঠ', 'পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও স্বামী বিবেকানন্দ', 'ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক বিচারে স্বামী বিবেকানন্দ', 'হে ভারত, ভুলিও না', 'Swami Vivekananda and Modern India', 'The Relevance of Vivekananda to the Present-day India', 'Vivekananda's World Mission as the Wave of the Future', 'Vivekananda—Lord of Language'.

ইংরেজী অংশ অপেক্ষা এ গ্রন্থের বাংলা অংশটি বিষয়-বৈচিত্র্য ও রচনাসৌকর্যে অধিকতর সার্থক। শ্রীআলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'হে মহাজীবন হে মহামরণ' কাব্য-নাট্যটি ভাব-ভাষা-ব্যঞ্জনা সর্ব দিক হইতেই বিশিষ্ট সৃষ্টি। শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষের 'বিবেকানন্দ-মন্দির' নামে সনেটটি বিবেকানন্দ-মন্দিরের সার্থক বাণীরূপ। সমগ্র গ্রন্থটির পরিকল্পনায় নিষ্ঠা, শুচিতা, শিল্পবোধ ও আদর্শপরায়ণতা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। ব্যক্তিগত সংগ্রহে ও সাধারণ গ্রন্থাগারে এ স্মারকগ্রন্থ সযত্নে রক্ষিত হইবার যোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবা: (ক) মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বন্যার্ত-সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। গত ২২শে আগস্ট, ১৯৬৯ মালদহ জেলার ২নং ব্লকের (পঞ্চানন্দপুর) ৭টি গ্রামের ৩৪০টি পরিবারকে ১০০ কেজি চিড়া, ৮৫ কেজি ছোলা, ৪০ কেজি ছাতু, ২৭ কেজি গুড়, ১০০ কেজি লবণ এবং ১ টিন বিস্কুট বিতরণ করা হইয়াছে। অন্য একটি ব্লকের (ইংরেজবাজার) ১২টি গ্রামের ৭১২ জনকে ৪০০ কেজি চাল দেওয়া হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরে এবং মালদহের উপরি-উক্ত এলাকায় বন্যাক্লিষ্টদের নিয়মিতভাবে 'ডোল' দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

(খ) **জলপাইগুড়ি** শহরে এবং শহরের বাহিরে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা-সরঞ্জাম বিতরণ করা হইতেছে। দুঃস্থদের বসবাসের জন্য কুটিরনির্মাণকার্য এখনও চলিতেছে।

কাছাড়ে বন্যার্তসেবা: শিলচর ও করিমগঞ্জ আশ্রমদ্বয়ের সক্রিয় সহযোগিতায় কাছাড়ে বন্যার্তদের জন্য সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে। ১,০০০ কেজি আটা, ৪০০ কেজি চিড়া এবং ১,৫০০ কেজি চাল বিতরিত হইয়াছে।

অন্ধ্রে ঘূর্ণিবাত্যা-বিপর্যস্তদের সেবা: গুণ্টুর জেলার চিরালায় দুর্গতদের পুনর্বাসনের জন্য পাথরের দেওয়াল এবং মাঙ্গালোর টালির ছাদ বিশিষ্ট ১০০টি গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক কার্যাদি শুরু হইয়া গিয়াছে।

গুজরাটে বন্যার্তসেবা: বন্যায় বিপর্যস্ত জনগণের সেবাকল্পে দ্বিতীয় পর্যায়ে পুনর্বাসন-কার্য পরিকল্পিত হইতেছে।

চেরাপুঞ্জি বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণী সভা

গত ২২শে আগস্ট চেরাপুঞ্জি উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কারবিতরণী সভা মনোজ্ঞভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আয়োজিত সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন আসাম সরকারের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজয়ভদ্র হাগজীর।

চিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটির নূতন আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন

গত ২৬. ৭. ৬৯ তারিখে আমেরিকার মিশিগান স্টেটের গাঞ্জেস টাউনশিপে ৮০ একর উদ্যানভূমিতে চিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত

সোসাইটির পল্লীনিবাস ও আশ্রমের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে উক্ত ভূমিতে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর চিত্র শোভিত মনোরম মণ্ডপে একটি সভা আয়োজিত হয়। সভার প্রারম্ভে চিকাগো কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ভাষ্যানন্দ সমাগত সকলকে স্বাগত জানাইবার পর চিকাগো কেন্দ্রের সাধু-ব্রহ্মচারিগণ বেদমন্ত্র পাঠ এবং শ্রীমতী কলা কৃপালিনী ভজনগান করেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করিবার পর আরাত্রিক সঙ্গীত গীত হয়। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ, অধ্যাপক স্যামুয়েল ক্লার্ক ও মিঃ গ্লেন ওভারটন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বেদান্ত সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। পরে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ পরিকল্পিত মঠ-বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করেন; চিকাগোর নর্থ ডিয়ার-বোর্ন স্ট্রীটের হেল-পরিবারের যে বাড়ীটিতে স্বামী বিবেকানন্দ দারুণ দুর্দিনে অতিথিরূপে পরমাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন এবং বহুবার বাস করিয়াছিলেন, এই ভিত্তিপ্রস্তরটি সেই বাড়ীরই ভগ্ন অংশ হইতে সংগৃহীত (হেল-পরিবারের বাড়ীটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে)।

উৎসবান্তে ভোজে ভারতীয় খাদ্য পরিবেশিত হয়। অপরাহ্ণে শ্রীমতী বীণা শুক্লা, ডক্টর মনোমোহন মজুমদার, শ্রীমতী সুমন নাদকার্ণী, মিস করিন স্কোমার ও মিসেস হেমা সেণ্ডে যন্ত্র- ও কণ্ঠ-সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

আঁটপুর রামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রমে

গত ২৯শে জুলাই শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা-হোম-পাঠাদির মাধ্যমে গুরুপূর্ণিমা উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি লইয়া ভজন সহ নগর-পরিক্রমার পর আশ্রমে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হয়। সভায় সভাপতি মহারাজ ও শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য ভাষণ দেন। পরে রাত্রি ৮৷৷টা পর্যন্ত ভজন-সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

প্রাচীন মানবাস্থি আবিষ্কার

তুরস্কের আসলানটেপ জেলার বাঢ়েবাসী গ্রামে একটি অতি প্রাচীন নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। ইটালীর একদল প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ ভূগর্ভ হইতে এটি আবিষ্কার করিয়াছেন। কঙ্কালটি ৫,০০০ বছরের প্রাচীন বলিয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

চিকাগো বক্তৃতার ৭৬তম স্মারক উৎসব

গত ১১ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি হলে স্বামীজীর চিকাগো বক্তৃতার ৭৬তম স্মারক উৎসব সভা 'বিশ্বধর্মসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ' প্লাটিনাম জয়ন্তী কমিটি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সভায় সভার উদ্বোধক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন বলেন, 'চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামীজীর ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্বের সম্মুখে ভারতের সুমহান ঐতিহ্যকে বিস্ময়কর-ভাবে তুলে ধরেছে।' সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্র ভারতীর উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী বলেন, 'বর্তমান অনিশ্চয়তা থেকে সারা দেশকে মুক্তির পথে আনতে হলে স্বামীজীর আদর্শ ও বাণীকে সমগ্র জাতির হৃদয়ে সঞ্জীবিত করে দিতে হবে।' শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু বলেন, 'স্বামীজীর চিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা-গুলি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত—দেশের তরুণসমাজকে তা চরিত্র-গঠনে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করবে।' শ্রীনবকুমার শীল বলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণীই দেশের বর্তমান সঙ্কট হইতে মুক্তির একমাত্র পথ।'

এই সংখ্যার লেখকগণ

১। স্বামী বীরেশ্বরানন্দ :
অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, বেলুড়

২। স্বামী বীতশোকানন্দ :
রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড়

স্বামী আদিনাথানন্দ :
রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি, জামসেদপুর

৪। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ :
বেদান্ত সোসাইটি, স্যানফ্রান্সিস্কো, ক্যালিফর্নিয়া, আমেরিকা

৫। শ্রীদিলীপকুমার রায় : পুণা

৬। স্বামী চণ্ডিকানন্দ : বেলুড় মঠ

৭। ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার : কলিকাতা

৮। শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু :
অধ্যাপক (বাংলা), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৯। সেখ সদরউদ্দীন :
প্রধান শিক্ষক, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যাপীঠ, পানিহাটী (২৪ পরগণা)

১০। ডক্টর রমা চৌধুরী :
উপাধ্যক্ষা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

১১। শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী : কলিকাতা

১২। মৌলভী রেজাউল করীম : বহরমপুর

১৩ শ্রীশান্তশীল দাশ :
পানিহাটী, (২৪ পরগণা)

১৪ শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক :
কোগ্রাম (বর্ধমান)

১৫। শ্রীকালিদাস রায় : কলিকাতা

১৬। শ্রীনরেন্দ্র দেব : কলিকাতা

১৭। বনফুল : কলিকাতা

১৮। শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ :
অধ্যাপক (বাংলা), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯ শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় :
বড় আন্দুলিয়া (নদীয়া)

২০। শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী :
অধ্যাপক (সংস্কৃত), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

২১। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার : কলিকাতা

২২। ডক্টর মুরলীমোহন বিশ্বাস :
অধ্যাপক, টেকনিকাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটুট, কলিকাতা

২৩। স্বামী জীবানন্দ :
উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

২৪। শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায় : কলিকাতা

২৫। ডক্টর অনিলচন্দ্র বসু : অধ্যক্ষ, রানাঘাট কলেজ

২৬। ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত : অধ্যাপক
শ্যামসুন্দর কলেজ, বর্ধমান



দিব্য বাণী

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ ৫৫
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ৫৬
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৭
যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৮

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২য় অধ্যায়

(মনেরও অতীত দেশে স্বরূপ যে সবাকার,
অফুরন্ত আনন্দের সাগর ভিতরে!
মনেরে আপনা ভেবে ভুলেছি যে কথা তার,
বাহিরের পানে তাই ছুটি সুখ তরে।)
যেই জন এ স্বরূপে, এ-আনন্দপারাবারে
শুধু আপনারে লয়ে সদা তুষ্ট রয়,
(আনন্দের তরে যারে বাহিরে বিষয়-দ্বারে
কাঙালের বেশে আর ছুটিতে না হয়),
ত্যজে যবে মনোগত কামনারে সর্ববিধ
(মনাতীতে গেলে যাহা স্বতঃ যায় চ'লে),
দুঃখে যে উদ্বিগ্ন নয়, সুখে যার স্পৃহা নাই,
ক্রোধ-ভয়াসক্তি নাই, স্থিতপ্রজ্ঞ তাহাকেই বলে।

কোন কিছুতেই আর মন নাহি টানে যার,
সে-সবের সংযোগের ফলে
শুভ ঘটিলেও তবু আনন্দে বিহ্বল কভু
নাহি হয়, অশুভ আসিলে
তাহাতেও স্থির রয়—দূরে যেতে নাহি চায়,
স্থিতপ্রজ্ঞ তাহারেই বলে।
কূর্ম যথা পেলে ভয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি লয়
আপনার দেহেতে গুটায়ে
সেরূপ বিষয় হতে গুটাইয়া সযত্নেতে
আনে যেই ইন্দ্রিয়নিচয়ে—
(বিষয়ে ইন্দ্রিয়দ্বারে পরশনও করিবারে
মন যার সদাই বিরত,)
মহানন্দ-নিকেতনে, আপন স্বরূপজ্ঞানে
সেই জন সদা প্রতিষ্ঠিত।

কথাপ্রসঙ্গে

মা-কালী ও তাঁর খেলা

"তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।" তাহা হইলে তিনি আবার মা হইলেন কেমন করিয়া? মা তো আমাদের জন্মদাত্রী, অসীম স্নেহময়ী পালয়িত্রী; তিনি কি তাঁহার সন্তানকে বা তাহার আবাসকে বিনষ্ট করিতে পারেন কখনো?

পারেন যে তাহা তো নিত্যই দেখিতেছি; অবশ্য চোখ খুলিয়া দেখিলে। এ জগতে আমাদের দৃষ্টি যতদূর যায়, আমরা দেখিতে পাই যে-শক্তি সৃষ্টি এবং পালন করে, বিনাশও করে সেই একই শক্তি, দ্বিতীয় কোন শক্তি নহে। তিনি যদি জগজ্জননী হন, তাহা হইলে তিনি ছাড়া আর কে "মৃত্যু"রূপে জনে জনে "রোগমহামারী বিষকুম্ভ ভরি" বিতরণ করিবেন?

যাঁহাদের চোখ খুলিয়াছে, যাঁহারা মা ও তাঁর সন্তানের আসল রূপ দেখিতে পান, তাঁহারা দেখেন, মায়ের মতো তাঁহার সন্তানেরও আসলে বিনাশ বলিয়া কিছু নাই,—যাহাকে মৃত্যু বলি আমরা তাহা একটা খেলাঘর হইতে ছেলেদের সরাইয়া আনিয়া, পুরানো পোষাক খুলিয়া নূতন পোষাক পরাইয়া নূতন খেলার জন্য পাঠানো মাত্র। আবার, সত্যের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত যাঁহাদের দৃষ্টি অবারিত, তাঁহারা দেখেন মা ও ছেলে বলিয়া আলাদা কিছু নাই, একজনই দুই সাজিয়াছেন।

ছেলেদের খেলা দেখিবার জন্য মা যেন তাহাদের নিজের ভিতর হইতেই বাহির করেন, কোলে বসাইয়া রাখেন কিছুক্ষণ, তাহার পর নানারকম পোষাক পরাইয়া, নানা রকম খেলাঘর তৈয়ারী করিয়া সেখানে খেলিতে

পাঠান। এই খেলাঘরগুলিই এক-একটি জগৎ, স্থূল ও সূক্ষ্ম অসংখ্য জগৎ। আর পোষাকগুলিও অসংখ্য ধরনের—একটি ঠিক অপরটির মতো নয়, কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকটিরই আছে। তবে মোটামুটি এগুলি তিন শ্রেণীর। সব চেয়ে সূক্ষ্ম পোষাকটি মা পরাইয়া দেন, ছেলেদের যখন কোলে লইয়া ঘুম পাড়ান, তখন। এ পোষাকটির নাম কারণ-শরীর। ইহার উপর আর একটি আর একটু স্থূল পোষাক পরাইয়া মা আমাদের স্বর্গাদি সূক্ষ্ম খেলাঘরে খেলিতে পাঠান; এটির নাম সূক্ষ্ম-শরীর। ইহারও উপর সব চেয়ে স্থূল পোষাক, স্থূল-শরীর পরাইয়া মা আমাদের খেলিতে পাঠান স্থূল-জগতে। এ পোষাকটি একটানা বেশীদিন থাকে না, সহজে জীর্ণ ও নষ্ট হইয়া যায়, সহজে নষ্ট করাও যায়; মা তখন সেটি খুলিয়া লইয়া হয় ভিতরকার সূক্ষ্ম-পোষাক পরা অবস্থাতেই সূক্ষ্ম জগতে খেলিতে পাঠান, আর না হয় আর একটি স্থূল-পোষাক পরাইয়া দেন। এই পোষাক পাল্‌টানোকেই আমরা জন্ম-মৃত্যু মনে করি।

মনে করি, কারণ অসংখ্যবার এভাবে খেলিতে খেলিতে আমাদের মাথায় পাকা-পাকিভাবে বসিয়া গিয়াছে যে এই খেলাঘর-গুলিই আমাদের আবাস, আর পোষাক-পরা অবস্থাই আমাদের আসল রূপ—পোষাকগুলিই আমি। তাই পোষাক খুলিবার বা পাল্‌টাইবার সময় ভয় পাই—আমিই বুঝি বিনষ্ট হইলাম ভাবিয়া। তাই মা যখন পোষাক খুলিয়া দিতে আসেন, খেলাঘর ভাঙিয়া দিতে আসেন, তখন আমরা ভয়ে আঁতকাইয়া উঠি, তখন তাঁহাকে ভয়ঙ্করী বলিয়াই ভাবি, করুণাময়ী মা বলিয়া চিনিতেই পারি না।

কিন্তু খেলিতে খেলিতে যাঁহাদের খেলার মাঝেই হঠাৎ নিজের আসল রূপের কথা, মায়ের কথা মনে পড়িয়া যায়, যাঁহারা জীবনকে খেলা বলিয়া এবং দেহকে, পোষাককে পোষাক বলিয়াই বুঝিতে পারেন, খেলা আর তাঁহাদের ভাল লাগে না; মা খেলা ভাঙিয়া ও পোষাক খুলিয়া দিতে আসিলে তাঁহারা আনন্দে আত্ম-হারা হন। তাঁহারাই নিজের চেষ্টায় সব পোষাক খুলিতে যখন অপারগ হন, তখন খড়্গধারিণী মাকালীর কাছে সব পোষাক ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া, সব জগৎ ভাঙিয়া দিয়া আসল আবাসে, পরমধামে ফিরাইয়া লইবার জন্য প্রার্থনা করেন, "দুয়ার খুলিয়া দাও মাতঃ! হেরি পথ আলোকচ্ছটায়!"

মা যখন এরকম দু'চার জন ছেলের পোষাক খুলিয়া তাহাদের সব জগৎ সব খেলাঘর ভাঙিয়া ঘরে ফিরাইয়া নেন, তখন অপর ছেলেদের খেলা কিন্তু চলিতে থাকে। একদিন কিন্তু মা নিজেই সব ছেলেকে কোলে পাইতে চান; তখন নিজেই সব খেলাঘর, সব জগৎ ভাঙিয়া দেন, সব ছেলেরই স্থূল ও সূক্ষ্ম দুটি পোষাকই খুলিয়া দেন—তৃণ, কীট, পশু, মানব, দেবতা, এমনকি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রভৃতি তাঁহার সব সন্তানেরই। ইহার নাম প্রলয়। ছেলেদের সবচেয়ে সূক্ষ্ম পোষাকটি, কারণ-শরীরটি কিন্তু মা তখনো খোলেন না—সেটি পরিয়াই সকলে তাঁহার কোলে ঘুমাইয়া থাকে। কিছুকাল পরে, কল্পান্তে মায়ের আবার সাধ হয়, ছেলেদের খেলা দেখিবেন; তখন আগের মতোই আবার সব খেলাঘর গড়িয়া, পোষাক পরাইয়া ছেলেদের খেলিতে পাঠান। আবার ভাঙেন, আবার গড়েন। মা এই-ই করিতেছেন। এই ভাঙা-গড়াই তাঁহার খেলা, লীলা।

ছেলেদের সব চেয়ে সূক্ষ্ম পোষাকটি কি

তিনি কখনো খোলেন না? খোলেন বৈ কি। যদি কোন ছেলে চায়, তখনই প্রসন্না হইয়া খুলিয়া দেন, খেলা হইতে একেবারে ছুটি দিয়া তাহাকে পরমধামে পাঠাইয়া দেন; কল্পান্তেও আর খেলিতে আসিতে হয় না তাহাকে—"স্বর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।" সেখানে কিন্তু মা ও ছেলে বলিয়া আলাদা কিছু থাকে না—মা নিজেও যে একটি পোষাক পরিয়া মা হন! সে পোষাকটি খুলিয়া ফেলিয়া তখন ছেলের সঙ্গে একই নামরূপহীন আনন্দময় সত্তায় মিশিয়া যান। মায়ের ছিন্নমস্তা রূপ, যে রূপে মা নিজের মুণ্ড নিজেই কাটিতেছেন, বোধ হয় এই সত্যেরই প্রতীক।

খেলা আর যখন ভাল লাগে না, তখন খেলা হইতে আমাদের মন যত উঠিতে থাকে, যতই মায়ের কাছে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রবল হয়, মা ততই আমাদের পোষাকের বাঁধন আলগা করিয়া দিতে থাকেন, আমাদের কাছে স্থূল সূক্ষ্ম খেলাঘরগুলির অস্তিত্ব ততই অবাস্তব বলিয়া বোধ করাইতে থাকেন। মা কখনো কখনো কোন কোন ছেলের সব-পোষাক-পরা অবস্থাতেই সব পোষাকের বাঁধন একেবারে আলগা করিয়া, তাহার সব জগৎকেই তাহার নিকট অবাস্তব বলিয়া অথবা তিনিই বলিয়া প্রত্যক্ষ করাইয়া থাকেন। সে-সব সন্তান দেহ থাকিতেই খেলা হইতে ছুটি পাইয়া যান। তাঁহারা জীবন্মুক্ত।

বা, অন্য ভাষায়, আমাদের মন যতই স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের দৃষ্টাদৃষ্ট সর্ববিধ ভোগ্য বস্তু হইতে সরিয়া আসিতে থাকে, আমরা যতই বাসনাশূন্য হইতে থাকি, ততই আমাদের মন ক্রমে শুদ্ধ ও সূক্ষ্ম হইতে থাকে, পূর্বানুভূত জগৎ লুপ্ত হইয়া মনের সে-সব অবস্থার স্পন্দনানুরূপ জগৎ প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। সব শেষে স্বরূপানুভূতি হয়।

অপর ভাষায় এই পোষাক ও খেলাঘর হইতে মুক্তিলাভের নাম প্রকৃতি হইতে, ক্ষেত্র হইতে, অচেতন বস্তু হইতে নিজেকে, ক্ষেত্রজ্ঞকে, চেতন সত্তাকে পৃথক রূপে প্রত্যক্ষ করা।

অথবা তন্ত্রের ভাষায়, মা-কালীই কুল-কুণ্ডলিনীরূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া, সুপ্ত হইয়া আছেন আমাদের মেরুরজ্জুর অভ্যন্তরস্থ ফাঁকা পথটির বা সুষুম্নার সর্বনিম্ন প্রদেশে। মায়ের কাছে ফিরিবার চেষ্টার, সাধনার ফলে মা, কুণ্ডলিনী শক্তি সেখান হইতে যখন ক্রমে উপরের দিকে উঠেন, তখন তাঁহার 'নখরে অরুণ ছোটে, পদচিহ্নে পদ্ম ফোটে'—মনের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থাগুলি ক্রমবিকশিত হয়, উচ্চ হইতে উচ্চতর সত্যের উদ্ভাস হৃদয় আলো করিয়া দেয়। আর পিছনে ফেলিয়া আসা মনের প্রত্যেকটি অবস্থার অনুরূপ জগৎও, খেলাঘরগুলিও বিনষ্ট হইয়া চলে—"তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।" শেষে সহস্রারে উঠিয়া মা সর্বোচ্চ সত্য প্রত্যক্ষ করান।

মহাত্মা গান্ধী—

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবালোকে

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন: আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য জননী জন্মভূমি তোমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা হোন, অন্য সব অকেজো দেবতাকে এই কয় বৎসর ভুলিলেও ক্ষতি নাই।

পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইয়া গেলেও কথাটি আমরা আজও ব্যবহার করি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আংশিক অর্থে। দেশসেবা বা সীমিত অর্থে রাজনীতিকেই প্রাধান্য দিই, কিন্তু দেশকে, দেশের জনগণকে দেবতা ভাবিবার

কোন প্রয়োজনই বোধ করি না, মানুষকে ভগবান ভাবিয়া দেশসেবাকে ভগবদুপাসনায় রূপায়িত করাই যে স্বামীজীর এই উক্তিটির লক্ষ্য, তাহা না বুঝিয়া ভাবি স্বামীজী ভগবদারাধনা ছাড়িয়া, ধর্ম ছাড়িয়া কেবল রাজনীতি করিবার কথাই বলিয়াছিলেন। অথচ স্বামীজী বারংবার বলিয়াছেন, ধর্মই ভারতীয় জাতির প্রাণধারা, তাহার দেহের রক্তস্বরূপ ; ধর্মের ভিতর দিয়া জাতিকে উন্নত করার পথই ভারতে স্বল্পতম বাধার পথ। বলিয়াছেন, "এটি বেশ স্মরণ রাখিবে, তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ না যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে।" কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ধর্ম আমাদের জাগতিক কর্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া গিয়া কেবল মন্দিরে, গুহায় বা অরণ্যে সীমিত হইয়া ছিল ; সেই ধর্মকে জীবনের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে বিস্তৃত করিবার কথাই, প্রতিটি কর্মকে আরাধনায় রূপায়িত করিবার, প্রতিটি কর্মক্ষেত্রকেই ভগবানের পূজা-মন্দিরে রূপায়িত করিবার কথাই বহুভাবে বলিয়াছেন তিনি। এসব কথা ভুলিয়া গেলে ভারতীয় জাতির উন্নতিকল্পে স্বামীজীর প্রদত্ত কোন কথারই অর্থ যথাযথ-ভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। পূর্বোক্ত কথা-টিরও লক্ষ্য তাহাই, শুধু এ কয় বৎসর প্রধান কর্মক্ষেত্র করিতে বলিয়াছিলেন দেশসেবাকে।

আমরা অনেকে ভুল করিলেও একদল দেশপ্রেমিক কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে স্বামীজীর এই ভাবকে যথাযথ অর্থেই জীবনে রূপায়িত করিয়াছিলেন, প্রায় এই পঞ্চাশ বছর ধরিয়াই ; মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক কর্তৃক সন্ন্যাসী গুরু রামদাস-প্রদত্ত গৈরিকপতাকাবাহী শিবাজীর আদর্শে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য সংগ্রামকে ধর্মাচরণ বলিয়া প্রচার হইতেই ইহার সূত্রপাত বলা যায়। তাঁহাদের প্রেরণার উৎস স্বামীজীর বাণী কি না, তাহা আমাদের বিচার্য নহে ; আমাদের বক্তব্য, স্বামীজীর এই আদর্শই তাঁহাদের জীবনে ফুটিয়া উঠিয়া-ছিল দেখিতেছি : তাঁহারা সকলেই ধর্মকে আঁকড়াইয়া থাকিয়াই রাজনীতি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্পষ্টাক্ষরে ইহা বলিয়াছেনও যে দেশসেবাই তাঁহাদের ভগবানলাভের সাধনা, ভগবদুপাসনা। সংযম ও জপধ্যানাদির মাধ্যমে শ্রীভগবানে মনের একাগ্রতা-অভ্যাসকে তাঁহারা বাদ তো দেন-ই নাই বরং ইহাকেই দেশসেবার শক্তি ও প্রেরণার উৎসরূপে, ভাব বজায় রাখার জন্য অবশ্যকরণীয় রূপে জানিয়া ইহার উপর জীবনের ভিত্তি রচনা করিয়াছিলেন। অগ্নি যুগের পূজারিগণ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং তাঁহাদের অনুগামী বহুজনের জীবনেই ইহা সুপরিস্ফুট। প্রাত্যহিক জীবনের চরম সঙ্কটের মুহূর্তগুলি, জেলখানা, ফাঁসীর আদেশ, কোন কিছুই পূজা, জপ, ধ্যান, স্বাধ্যায়, প্রার্থনাদির অভ্যাস হইতে তাঁহাদের বিরত করিতে পারে নাই। আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, যাহা স্বামীজীর পূর্বোক্ত উক্তির ঠিক পঞ্চাশ বছর পরেই আসিয়াছিল, বহু দেশপ্রেমিকের প্রচেষ্টার সংযুক্ত ফল রূপে লব্ধ হইলেও তাহাতে ইঁহাদের অবদানই যে সর্বাধিক, এই পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। কর্মক্ষেত্রে ইঁহাদের নীতি ভিন্ন, কোথাও কোথাও পরস্পর-বিরোধীও, কিন্তু সকলেরই জীবনের ভিত্তি, শক্তি ও প্রেরণার উৎস একই—তাঁহাদের সকলেরই জীবন ধর্ম- বা আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক ; তাঁহাদের সকলেরই কর্ম নিছক কর্মমাত্র নয়,

ভগবদুপাসনাও। ইঁহাদের অনেকের কর্ম-প্রচেষ্টায় বহু আপাত বা যথার্থ সাময়িক ব্যর্থতা এবং কর্মপদ্ধতি বা নীতির দিক হইতে ভুলভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও ইঁহারাই যথার্থ 'ভারতীয় নেতা'; ভারতীয়তা বজায় রাখিয়া ভারতের জনচিত্তকে বিপুলভাবে নাড়া দিতে পারিয়াছিলেন ইঁহারাই।

এই দৃষ্টিকোণ হইতে মহাত্মা গান্ধীর জীবনে দেখিতে পাই, ধর্মই তাহার ভিত্তি। সত্য-, সংযম- ও তিতিক্ষা-পূত সে জীবন, নিয়মিত ভজন-প্রার্থনাদির মাধ্যমে সে-জীবনের প্রতিটি কর্মসাধনাই ভগবদুপাসনার ভাবে বিধৃত। সংযম ও নিয়মিত একাগ্রতার অভ্যাসই যে মানুষের অন্তর্নিহিত বিপুল শক্তির ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের উপায়, ইহা ভারতীয় চিন্তার সহিত পরিচিত সকলেই জানেন। মহাত্মাজীর আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক জীবনে যে বিপুল ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়াছিল, তাহাই জাতির চিত্তের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করিয়া সেখানে জাতীয়তাবোধকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাঁহার রাজনীতি নহে। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সর্বজনচিত্তে প্রভাববিস্তারকারী ব্যক্তিত্বের বিকাশের মূল কথাও তাহাই। এদিক দিয়া দেখিলে ভারতের রাজনৈতিক গগনে আধুনিক জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে নেতাজী ও মহাত্মাজী অনন্যসাধারণ ভাস্বরতা লইয়া বিরাজমান।

স্বামীজী আদর্শ জনসেবকের যে লক্ষণগুলি বলিয়াছিলেন, মহাত্মাজীর জীবনে সেগুলি সুস্পষ্ট আকারে দেখিতে পাওয়া যায়: প্রথমত:, দেশবাসীর দুঃখকষ্ট মনেপ্রাণে অনুভব করা চাই, দ্বিতীয়ত:, সে দুঃখকষ্ট দূর করিবার জন্য একটি উপায় আবিষ্কার করা চাই এবং তৃতীয়ত:, সে উপায়কে কার্যকর করার জন্য নিজের বলিতে যাহাকিছু তাহা সবই উৎসর্গ করা চাই।

অপরের দুঃখে সমব্যথী হওয়ার কথা, সকলের সহিত নিজেকে এক করার কথা, সাম্যের কথা আমার বহু শুনি, কিন্তু তাহা জীবনে রূপায়িত দেখিতে পাই অতি অল্প কয়েকজনের মধ্যেই। মহাত্মাজী সেই স্বল্প-সংখ্যক ব্যক্তিদের অন্যতম। দক্ষিণ আফ্রিকায় অপমানিত ভারতীয়দের উপর অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদকল্পে সত্যাগ্রহ আরম্ভের প্রাক্কালে তাহাদের সহিত, এবং ভারতে ফিরিয়া ভারতের দরিদ্র জনগণের সহিত একাত্মতা-বোধ দৃঢ় করার জন্য তিনি খাওয়া-পরা যতটা সম্ভব তাহাদেরই মত করিতেন; ইহা সাময়িক হৃদয়োচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ মাত্র নহে, আমরণ তিনি নিষ্ঠার সহিত ইহা করিয়াছিলেন। "আমি আবার জন্মাইতে চাই না; কিন্তু যদি জন্মাইতে হয়, তবে যেন আমি অস্পৃশ্য হইয়া জন্মাই, যাহাতে তাহাদের দুঃখবেদনা ও অপমানের অংশীদার হইতে পারি"—অপমানিত অস্পৃশ্যদের প্রতি তাঁহার গভীর সমবেদনা শুধু এই কথাতেই নহে, তাঁহার আচরণেও সুপরিস্ফুট—তাহাদের পল্লীতে তিনি বাসও করিয়া-ছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের ও ভারতে জনগণের দুর্দশা দূর করিবার একটি নিজস্ব উপায়ও, পথও তিনি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। উহা প্রেমের পথ, সত্যের পথ, সর্বধর্মমিলনের পথ, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতি-বাদের, সত্যাগ্রহের পথ। এই পথে চলার ও জাতিকে চালিত করার প্রচেষ্টার ইতিহাসই মহাত্মাজীর জীবনেতিহাস। সর্বসাধারণকে

এ পথে চলিবার যোগ্য করিয়া তোলা যায় কি না, এ পথে চলা সর্বক্ষেত্রে সার্থক হইয়াছে কি না, এমন কি আমাদের বহু বর্তমান দুঃখদুর্দশার মূল এ পথেরই কোন কোন স্থান হইতে প্রসারিত কি না, তাহা লইয়া তাঁহার জীবনকালেই এবং পরে বহু মনীষীর মনে বহু প্রশ্ন জাগিয়াছে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বেরও উদ্ভব হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও এই পথে তাঁহার নেতৃত্ব অনুসরণে চলার ইতিহাসই হইল আমাদের মুক্তিসংগ্রামের একটি বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

জাতির দুর্দশা নিবারণের এই উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাহার বাস্তব রূপায়ণের জন্য গান্ধীজী নিজের মন, প্রাণ, সর্বস্ব তাহাতে নিয়োজিতও করিয়াছিলেন, এ পথ ধরিয়াই চলিয়াছিলেন আমরণ।

স্বামীজীর ভাবের বাহক বলিতে আমরা আজকাল প্রায়ই মস্ত একটি ভুল করি—স্বামীজীর বহুবিধ ভাব ও আদর্শকে একটিমাত্র জীবনে বা প্রতিষ্ঠানে মূর্ত দেখিতে চাই। মনের এই অসম্ভব ও অবাস্তব চাহিদা হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই দেখিতে পাইব, ভারতের সর্বাঙ্গীণ অভ্যুদয়ের জন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-রূপ যে মহাশক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা-রূপে তাহার পথপ্রদর্শন করিয়াছে, রাজনীতির ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী সেই ভাবানুরূপ একটি পথই প্রস্তুত করিয়াছিলেন, স্বামীজীরই বহুবিধ ভাবের একটি ভাবকে রূপায়িত করিয়াছিলেন।

ভারতকে জাগিতে হইবে তাহার নিজস্বতা, আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক জীবন লইয়া শুধু নিজের কল্যাণের জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতিরই কল্যাণের জন্য। কারণ, যে এক-পৃথিবী গঠন আজ আমাদের একান্ত কাম্য, সকলে শান্তিতে বাস করিবার জন্য তো বটেই, তাহা অপেক্ষাও বড় কথা মানবসভ্যতাকে বাঁচাইবার জন্য, তাহা বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারে ভারত। একমাত্র ভারতই অধ্যাত্মিকতা ও জাগতিক উন্নতির মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাইয়া জগতের সম্মুখে উদাহরণ স্থাপন করিতে পারে, যাহা না দেখিলে কেবল কথায় কোন দেশই সে আদর্শ গ্রহণ করিবে না। আর, জীবনে ধর্মের রূপায়ণ ছাড়া 'মানবপ্রেম' 'বিশ্বপ্রেম' প্রভৃতি কথাগুলি যে শব্দমাত্রই থাকিয়া যায়, চিরদিনই থাকিবে, এক-পৃথিবী কোন দিনই গড়িতে পারিবে না—আজিকার পৃথিবীই তাহার সাক্ষ্য। এখানে ধর্ম বলিতে পৃথিবীর কয়েকটি স্থানে আধুনিক যুগেও যে ধর্মোন্মত্ততার ধ্বংসলীলা ঘটিয়া গেল বা ঘটিতেছে, তাহার কথা বলা হইতেছে না, ধর্মের মূল কথাই, আধ্যাত্মিকতাই আমাদের লক্ষ্য—যাহা সর্ব ধর্মমতেই বিদ্যমান, যাহা উচ্চতর সত্যের পথে জীবনের অভ্যুদয় ঘটায়, যাহা সব ধর্মকে, সব ধর্মমতাবলম্বীকে সমভাবে ভালবাসিতে পারে। এই ধর্মই এবং তাহা হইতে উদ্ভূত যথার্থ মানবপ্রেমই আজ মানবজাতিকে তথা মানবসভ্যতাকে পরস্পরসংঘর্ষজনিত আশঙ্কিত মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইতে পারে, এক-পৃথিবী গড়িতে পারে;—বিভিন্ন রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বাহ্য বিভেদগুলি ভাঙিয়া মানুষকে এক করার ব্যর্থ প্রচেষ্টার মাধ্যমে নহে, সে-সবের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের মাধ্যমে। রাজনীতি যুগে যুগে পরিবর্তনশীল। বর্তমান যুগে সাম্যবাদের ভিত্তিতে সর্বক্ষেত্রেই আমূল পরিবর্তন দ্রুতপদসঞ্চারে সারা পৃথিবীর দিকে অগ্রসর, সর্বত্রই তাহা পৌঁছিবে অদূর ভবিষ্যতে। এটি একটি শুভ- এবং সঙ্কট-মুহূর্তও সারা

পৃথিবীর পক্ষেই, বিশেষ করিয়া ভারতের পক্ষে। কারণ এই পরিবর্তনের মুখে ভারতও অপরের দেখাদেখি ইহার জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় বোধে তাহার শক্তির মূল উৎস ধর্মকে এবং উহার ভিত্তি সত্য ও পবিত্রতাকে বিসর্জন দিতে উদ্যত হইয়াছে। যদি তাহা ঘটে, নিজস্বতা হারাইয়া ভারত যদি মৃত হয়, তাহা হইলে, স্বামীজীর ভাষায়, "জগৎ হইতে সমুদয় আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হইবে; চরিত্রের মহান আদর্শগুলি বিলুপ্ত হইবে, সমগ্র ধর্মের প্রতি মধুর সহানুভূতির ভাব বিলুপ্ত হইবে; তাহার স্থলে দেবদেবীরূপে কাম ও বিলাসিতা যুগ্ম রাজত্ব চালাইবে; অর্থ সে পূজার পুরোহিত, পাশব বল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহার পূজাপদ্ধতি, আর মানবাত্মা তাহার বলি।" তবে তাহা হইবার নহে—"এ অবস্থা কখনও হইতে পারে না।" ইহার প্রতিরোধকল্পে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব, ইহার প্রতিরোধ-কল্পেই স্বামীজীর বাণী—দেশে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ভাবপ্রচারের আগে দেশকে উপনিষদের ভাবের প্লাবনে প্লাবিত কর। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জীবনের অত্যুজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাসিত এই পথেই মহাত্মাজী চলিয়াছিলেন;—স্বধর্মে পূর্ণভাবে নিরত থাকিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বধর্মকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়া জাতীয় জীবনকে সর্বাবস্থায় ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চাহিয়াছিলেন।

অপর দিকে, আমাদের জানা নেই, জনগণের বস্ত্রাভাব ও অন্নাভাবেব জন্য নিজেও স্বল্প অন্ন-বস্ত্রে সন্তুষ্ট, অভিজাত-শ্রেণীর ঘৃণাস্পদ অস্পৃশ্য জনগণকে বুকে টানিয়া লইবার জন্য তাহাদের পল্লীবাসী সেই 'অর্ধনগ্ন ফকিরে'র মত,—যিনি ইংলণ্ডে রাজার সহিত দেখা করিবার সময়ও এই সব নিপীড়িত, অত্যাচারিত দুঃস্থ জনগণের একজন বলিয়াই নিজেকে পরিচিত করিতে চাহিয়াছিলেন, "কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া" জগৎসমক্ষে যেন সদর্পে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন,—"দরিদ্র ভারতবাসী আমার ভাই", তাহাদের অপেক্ষা নিজেকে এতটুকুও বড় বলিয়া ভাবিতে চান নাই,—তাঁহার মত সাম্যবাদীর সংখ্যা জগতে কয়জন? অথচ তিনি ধর্মকেও, সত্য সংযম এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসকেও জীবনের সর্বস্ব করিয়া রাখিয়াছিলেন।

আজ ভারতে এবং সারা জগতে এরূপ জীবনাদর্শের প্রয়োজন, যদি আমরা মানব-সভ্যতাকে, মানবজাতিকে বাঁচাইতে চাই। দেশে ভোগ- ও অধিকার-সাম্য আমাদের আনিতেই হইবে, কিন্তু জীবনের উচ্চতর সত্যকে বিসর্জন দিয়া এবং যন্ত্রে পরিণত হইয়া নহে, দেবভাবাপন্ন ও স্বাধীনচিন্তা-সম্পন্ন মানুষ হইয়া,—সত্যকে, সংযমকে, ঈশ্বর-বিশ্বাসকে ভগবদুপাসনার নিয়মিত অভ্যাসকে অটুট রাখিয়াই! হাতে হাতে ইহা করিয়া দেখানো একমাত্র ভারতের পক্ষেই সম্ভব এবং ভারতকে তাহা নিজে করিয়া দেখাইতে এবং উহারই মাধ্যমে জগতে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতেই হইবে। নতুবা, সাম্যবাদই হউক বা গণতন্ত্রই হউক, বা যে-কোন বাদই হউক, একক বা সংযুক্ত-ভাবে সারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেও সেগুলির বাহ্য চাকচিক্যের অন্তরালে লুক্কায়িত অর্থরূপী পুরোহিতের এবং পাশববল- ও প্রতিদ্বন্দ্বিতারূপ পূজাপদ্ধতির মনুষ্যাত্বমেধ যজ্ঞের বলি হওয়া হইতে বিশ্বমানবাত্মাকে রক্ষা করা যাইবে না।

মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক আদর্শ নয় (তিনি নিজেই বলিয়াছেন, রাজনৈতিক আদর্শ চিরপরিবর্তনশীল), রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার জীবনই তাই শুধু ভারতের কেন সারা জগতেরই জীবনপথপ্রদর্শক একটি আলোকস্তম্ভ।

শ্রীরামকৃষ্ণ

[গান : সুর - কাফি-যৎ]

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

ভবতারিণীর মাঝে নিজেরে পূজিলে।
মা'র সাথে এক হয়ে লীলা ধরাতলে ॥
মায়েরি মাঝারে তুমি হের আপনাকে
আপনার মাঝে দেখ লীলাময়ী মাকে
'আমি মা, মা-ই আমি' আচরি শিখালে।

বর্গভীমা*

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

অদূরে প্রণামরত রূপনারায়ণ,
সমুখে মানবস্রোত নিত্য বহমান,
বিশ্বজননীর যত সন্তান আপন
হেরে মাতৃচেতনায় স্পন্দিত পাষাণ।
উদয়-উষার লগ্নে ফোটে রক্তজবা,
শাণিত খড়্গের দীপ্তি জ্বলে মধ্যদিন,
ছিন্নশির দিনান্তের সুলোহিত শোভা
অনন্ত তমিস্রাবক্ষে হতে চায় লীন।

লোলজিহ্বা বরাভয়া ভ্রুকুটি-ভীষণা,
আনন্দ-তাণ্ডবে মত্তা মৃত্যুরূপা কালী,
কালরাত্রে একা জাগে উগ্রা শবাসনা,
শ্মশান-আলোকে দীপ্ত ভীমা মুণ্ডমালী।
পদতলে পড়ে থাকে স্তব্ধ একাকার,
জন্ম মৃত্যু লয় সৃষ্টি কালের পাহাড়।

* তমলুকে বর্গভীমা-মন্দির-দর্শনে

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে—মহাত্মা গান্ধী

রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনকথা বাস্তবরূপায়িত ধর্মেরই কাহিনী। ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করতে তাঁর জীবন আমাদের সামর্থ্য জোগায়। তাঁর জীবনকথা পড়লে ভগবানই যে একমাত্র সত্য এবং আর সবই যে অলীক, এ দৃঢ় প্রত্যয় মনে জাগবেই, এর অন্যথা হতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ঈশ্বরত্বের জীবন্ত বিগ্রহ। তাঁর বাণীগুলি কোন পণ্ডিতের কথামাত্র নয়, সেগুলি জীবন-গ্রন্থের পৃষ্ঠা। তিনি নিজে যা উপলব্ধি করেছেন, তাঁর কথাগুলি সেই উপলব্ধিরই বিবৃতি। এইজন্যই সে বাণীর প্রভাব অপ্রতিরোধ্য—পাঠকের মনের ওপর তা গভীর ছাপ রেখে যাবেই। এই অবিশ্বাসের যুগে রামকৃষ্ণ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন জ্বলন্ত জীবন্ত বিশ্বাসকে, যা হাজার হাজার নরনারীকে সান্ত্বনা দিয়েছে; এ না হলে আধ্যাত্মিকতার আলোক থেকেই বঞ্চিত থাকতে হত তাদের। রামকৃষ্ণের জীবন অহিংসার জীবন্ত উদাহরণ। তাঁর ভালবাসার কোন সীমা ছিল না—ভৌগোলিক বা অন্য কোন সীমাই না।…

সবরমতী
মার্গশীর্ষ, কৃষ্ণ ১
বিক্রম সম্বৎ ১৯৮১
[১২ই নভেম্বর, ১৯২৪]

এম. কে. গান্ধী

* অনুবাদ—'Life of Sri Ramakrishna' গ্রন্থের প্রাক্‌কথন—সং

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে—মহাত্মা গান্ধী

(১)

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত দেখা করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী একবার বেলুড় মঠে গিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিন (বা পরে কখনো) তাঁহার সহিত গান্ধীজীর সাক্ষাৎ হয় নাই। এই প্রসঙ্গে আত্মজীবনীতে গান্ধীজী লিখিয়াছেন,

"ব্রাহ্মসমাজে যথেষ্ট কিছু দেখার পরে, স্বামী বিবেকানন্দকে না দেখে সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব ছিল না। সুতরাং বিপুল উৎসাহের সঙ্গে বেলুড় মঠে গেলাম। অধিকাংশ পথ, কিংবা হয়তো গোটা পথটাই, পায়ে হেঁটে গিয়েছিলাম। লোকালয় থেকে দূরে মঠের নিভৃত পরিবেশটি আমার বিশেষ ভাল লেগেছিল। কিন্তু খুবই আশাহত ও দুঃখিত হলাম, যখন শুনলাম স্বামীজীর দর্শন পাওয়া যাবে না, কারণ অসুস্থ অবস্থায় তিনি তাঁর কলকাতার আবাসে রয়েছেন।"[১]

(২)

"১৯২১ সালে স্বামীজীর উৎসবের দিন সস্ত্রীক মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মহম্মদ আলি এবং আরও কতিপয় সহকর্মীকে সঙ্গে করিয়া বেলুড় মঠ দর্শন করিতে আসেন। মহাপুরুষজী তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ঠাকুর ও স্বামীজীর ঘর প্রভৃতি দর্শন করাইয়াছিলেন। মহাত্মাজী ঠাকুরের ব্যবহৃত জিনিসপত্র এবং তাঁহার হাতের লেখা (যাহা বেলুড় মঠে সযত্নে রক্ষিত আছে) বিশেষ আগ্রহ সহকারে দেখেন।···বিপুল জনতার বিশেষ আগ্রহে তিনি স্বামীজীর ঘরের সংলগ্ন দ্বিতলের বারান্দা হইতে নিম্নে গঙ্গাতীরে সমবেত জনগণকে হিন্দীভাষায় সময়োপযোগী একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণও দিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি এখানে অসহযোগ আন্দোলন বা চরখা প্রচার করতে আসিনি। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন-অনুষ্ঠানে তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা ও নমস্কার জ্ঞাপন করার জন্যই আজ এখানে এসেছি। আমি স্বামীজীর পুস্তকাবলী ভাল করে পড়েছি—তার ফলে পূর্বে দেশের প্রতি আমার যে ভালবাসা ছিল তা আরও অনেক বেড়েছে। যুবকদের কাছে আমার এই অনুরোধ—স্বামী বিবেকানন্দ যেখানে বাস করতেন এবং যেখানে দেহত্যাগ করেছেন, সেস্থানের ভাবধারা অন্ততঃ কিছুটা গ্রহণ না করে শূন্যহাতে আজ ফিরে যেও না।' "[২]

---

১ 'An Autobiography' by M. K. Gandhi, pp, 178

২ 'মহাপুরুষ শিবানন্দ', (দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃঃ ১৮৫

ঈশ্বর ও বিশ্বাস*

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

একটা রহস্যময় শক্তি সবকিছুতেই ওতপ্রোত, ভাষায় যে শক্তির বর্ণনা দেওয়া যায় না। সে শক্তিকে আমি দেখতে পাই না বটে, কিন্তু তার অস্তিত্ব অনুভব করি। ইন্দ্রিয়সহায়ে আমি যা কিছু উপলব্ধি করি, সে-সব থেকে এ অদৃশ্য শক্তি অন্য ধরনের; এ শক্তি তাই উপলব্ধ হয় কিন্তু সর্ববিধ প্রমাণকে অগ্রাহ্য করে। এ শক্তি অতীন্দ্রিয়; তবু বিচারের দ্বারা একটা সীমা পর্যন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব।

আমরা তো দেখতে পাই, সাধারণ ব্যাপারেও লোকে জানে না কে তাদের শাসন করছে, কেন করছে, কিভাবে করছে; তবু এ কথা জানে যে, শক্তি একটা রয়েছে এবং নিশ্চয় সেই শক্তিই নিয়ন্ত্রণ করছে।

গত বছর মহীশূর ভ্রমণকালে বহু দরিদ্র পল্লীবাসীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়; তাদের জিজ্ঞেস করে বুঝলাম যে, মহীশূরের শাসক কে তা তারা জানে না। শুধু বললে, 'কোন দেবতা এর শাসক হবেন।' নিজেদের রাজা সম্বন্ধে দরিদ্র লোকগুলির ধারণা যদি এত সীমিত হয়, তাহলে রাজার রাজা ভগবানের অস্তিত্ব আমি যদি উপলব্ধি করতে না পারি, তাতে আমার আশ্চর্য হবার কিছু নেই; কারণ পল্লীবাসীরা তাদের রাজার তুলনায় যতখানি ক্ষুদ্র, ঈশ্বরের তুলনায় আমি তার অনন্তগুণ বেশী ক্ষুদ্র।

মহীশূর সম্বন্ধে দরিদ্র পল্লীবাসীদের যা ধারণা, বিশ্ব সম্বন্ধে আমার ধারণাও সেইরূপ—আমি গভীরভাবে অনুভব করি যে, বিশ্বে একটা সুনিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এক অমোঘ নিয়ম-দ্বারা সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে—যা-কিছুর অস্তিত্ব আছে, যা-কিছুর জীবন আছে তা সবই। এ নিয়ম অন্ধ নয়, কারণ অন্ধ নিয়ম চেতন প্রাণীর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। স্যর জগদীশ চন্দ্র বসুর অদ্ভুত গবেষণাকে ধন্যবাদ—এখন প্রমাণ করা যায় যে, জড়বস্তুরও জীবন আছে। কাজেই যে-নিয়ম সব জীবনকেই নিয়ন্ত্রিত করে তাই-ই ঈশ্বর—নিয়ম ও নিয়মস্রষ্টা এক।

নিয়ম ও নিয়মস্রষ্টাকে আমি অস্বীকার করতে পারি না, কারণ নিয়ম বা নিয়মস্রষ্টা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অতি সামান্য। যেমন কোন জাগতিক শক্তির অস্তিত্বে আমার অজ্ঞতায় বা অস্বীকারে আমার কোন লাভ নেই, তেমনি ঈশ্বর বা তাঁর বিধানকে অস্বীকার করলেও তার ক্রিয়ার হাত থেকে আমি রেহাই পাব না।

* 'কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানী' কর্তৃক রেকর্ড করা মূল ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ। ১৯৫৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'উদ্বোধনে'ও ইহার অনুবাদ "ঈশ্বর সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর ধারণা"—এই শিরোনামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর লণ্ডনে অবস্থানকালে 'কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানী'র জনৈক প্রতিনিধি তাঁহার কয়েকটি ভাষণ রেকর্ড করিবার জন্য রাজনীতি বিষয়ে কিছু বলিতে অনুরোধ করেন। গান্ধীজী উহাতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, প্রয়োজন হইলে তিনি একটি মাত্র রেকর্ড করিবার মতো কিছু বলিতে পারেন, তাহাও রাজনৈতিক বিষয়ে নহে, আধ্যাত্মিক বিষয়ে—যাহা সর্বকালে সব লোকে শুনিবে; বলেন, রাজনৈতিক ব্যাপারগুলি অস্থায়ী, আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি চিরস্থায়ী ও গভীর। ২০.১০.১৯৩১ তারিখে এই ভাষণটি রেকর্ড করা হয়।—সঃ

পক্ষান্তরে, কোন জাগতিক শাসন মেনে নিলে তার ভেতর জীবনযাত্রা যেমন সহজতর হয়, নম্রভাবে নীরবে ঈশ্বরের প্রভুত্ব মেনে নিলে তেমনি জীবনের পথও অধিকতর সুগম হয়।

আমার চারদিকের সবকিছুই চিরপরিবর্তনশীল, চিরমরণশীল হলেও, আমি অস্পষ্টভাবে অনুভব করি সে-সব পরিবর্তনের মূলে একটি জীবন্ত শক্তি রয়েছে যা অপরিবর্তনশীল, যা সবকিছুকে একত্র-সংহত করে রেখেছে, যা সৃষ্টি করে, বিনাশ করে, আবার নতুন করে সৃষ্টি করে। সেই সঞ্জীবক শক্তিই, জীবনীশক্তিই—আত্মাই—ঈশ্বর। সেই জীবন্ত শক্তি বা ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই, কেবল ইন্দ্রিয়সহায়ে যা কিছু অনুভব করি তার কোন কিছুই, চিরস্থায়ী হবে না বা হতে পারে না ; একমাত্র তিনিই নিত্য। এখন, তাঁকে দয়াময় বলব, না নির্দয় বলব ? আমি তো তাঁকে করুণাময়রূপেই দেখছি। কারণ দেখছি মৃত্যুর মাঝেও জীবন স্থায়ী, অসত্যের মাঝেও সত্য স্থায়ী, অন্ধকারের মধ্যেও আলোক স্থায়ী। এ থেকে আমার ধারণা, ঈশ্বরই জীবন, তিনিই সত্য, তিনিই আলোক। তিনি প্রেমস্বরূপ, তিনি পরম মঙ্গলস্বরূপ।

কিন্তু যিনি কেবল আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে চরিতার্থ করেন—অবশ্য যদি কখনো তা করেন—তিনি ঈশ্বরই নন। ঈশ্বর হতে হলে ঈশ্বরকে আমাদের হৃদয়ের রাজা হয়ে সেখানে পরিবর্তন ঘটাতেই হবে। তাঁর উপাসকের তুচ্ছতম কর্মের মধ্যেও তাঁকে প্রকাশিত হতে হবে। পঞ্চেন্দ্রিয় আমাদের যা উপলব্ধি করাতে পারে, তার চেয়ে অধিকতর বাস্তব, স্পষ্ট উপলব্ধির মাধ্যমেই তা সম্ভব। ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি আমাদের কাছে যত বাস্তব বলেই প্রতীত হোক না কেন, তা অসত্য ও বিভ্রান্তিজনক হতে পারে, আর প্রায়ই তাই হয়-ও। অতীন্দ্রিয় অনুভূতিই অভ্রান্ত। কোন বাহ্য প্রমাণ দ্বারা তা প্রমাণিত হয় না ; হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর রয়েছেন—এ যাঁরা উপলব্ধি করেছেন তাঁদের পরিবর্তিত আচরণ ও চরিত্রই তার প্রমাণ। সব দেশে সব যুগে যে-সব আচার্য ও মুনি-ঋষিগণ অবিচ্ছিন্ন ধারায় আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের অনুভূতির ভেতরই এর প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যাবে। এ প্রমাণ অগ্রাহ্য করা মানে আত্মবঞ্চনা করা।

অটল বিশ্বাস আসার পর এ উপলব্ধি আসে। ঈশ্বরের অস্তিত্বের বাস্তবতা যিনি নিজে যাচাই করে নিতে চান, তিনি জীবন্ত বিশ্বাস সহায়ে তা করতে পারেন ; আর বিশ্বাস নিজেই কোন বাহ্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় না বলে জগতের নৈতিক শাসনে এবং কাজেকাজেই নৈতিক নিয়মের, সত্য ও প্রেমের নিয়মের আধিপত্যে বিশ্বাসস্থাপন করাই হল সবচেয়ে নিরাপদ পথ। যা কিছু সত্য-ও প্রেম-বিরোধী তা সরাসরি ত্যাগ করার স্থির সংকল্পই বিশ্বাস অনুশীলনের সবচেয়ে নিরাপদ উপায়। আমি স্বীকার করছি, বিচারের মাধ্যমে প্রত্যয় উৎপাদন করার মতো কোন যুক্তি আমার নেই ; বিশ্বাস যুক্তি-বিচারের ঊর্ধ্বে। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, যা অসম্ভব তা সম্ভব করার জন্য চেষ্টা করতে নেই।

আমি কোন যুক্তিপূর্ণ উপায় দ্বারা অসতের অস্তিত্ব নির্ণয় করতে পারি না। তা করতে চাইলে ঈশ্বরের সমান হতে হয়। এজন্য অসৎকে আমি অসৎ বলেই নম্রভাবে গ্রহণ করি। আমি জানি যে ঈশ্বরে কোন অসৎ ভাব নেই ; তবু, যদি তা থেকে থাকে, তাহলে ঈশ্বরই তার স্রষ্টা, কিন্তু তা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

আমি আরও জানি যে, আমি যদি জীবন পণ করে অসতের সঙ্গে সংগ্রাম না করি এবং তার বিরুদ্ধে না চলি, তাহলে কখনো ঈশ্বরকে জানতে পারব না। আমার সামান্য ও সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা আমি এ বিশ্বাসে সুরক্ষিত। আমি যতই পবিত্র হতে চেষ্টা করি, ততই ঈশ্বরের অধিকতর নিকটবর্তী হচ্ছি বলে অনুভব করি। বর্তমানে আমার বিশ্বাস যেমন শুধু পক্ষসমর্থনমাত্র, তা না হয়ে এ বিশ্বাস যদি হিমালয় পর্বতের ন্যায় অটল এবং তার শীর্ষস্থ শুভ্র তুষারের মতো হত, তাহলে আমি ঈশ্বরের আরো কত বেশী কাছে চলে যেতাম!

"আমি যদি জানতাম, হিমালয়ের গুহায় গেলে ভগবানকে পাব তাহলে আমি তখনই সেখানে যেতাম। কিন্তু আমি জানি, এই দরিদ্র অসহায় ভারতবাসীদের সেবার ভিতর দিয়েই আমি তাঁকে খুঁজে পাব।"

"ভীরুতা ও অন্যান্য বদভ্যাস দূর করবার সবচেয়ে ভাল উপায় যে আন্তরিক প্রার্থনা—এর প্রমাণ আমার নিজের জীবন থেকে দিতে পারি।"

"পূর্ণ ব্রহ্মচর্যই শ্রেষ্ঠ আদর্শ।"

"প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে যে, তার গোপনতম চিন্তাও তাকে এবং অপরকেও প্রভাবান্বিত করে।"

"শাস্ত্রের বাণী কখনো যুক্তি ও সত্যকে অতিক্রম করতে পারে না। তাদের উদ্দেশ্যই হল বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করা ও সত্যকে উদ্ভাসিত করা।"

—মহাত্মা গান্ধী

নোয়াখালিতে গান্ধীজী

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু

গান্ধীজী নভেম্বর মাসের ৭ই (১৯৪৬) খ্রীঃ নোয়াখালি পৌঁছান। যাইবার পূর্বে তাঁহার নির্দেশ অনুসারে অনুসন্ধান করিয়া আমরা সন্ধান দিই যে, দাঙ্গার পূর্বে নোয়াখালির জনসংখ্যা শতকরা ১৮ হিন্দু ও ৮২ মুসলমান ছিল। হিন্দুদের অধিকারে জেলার বার আনা জমি এবং মুসলমানদের অধিকারে চার আনা।

যে-সকল গ্রামে দাঙ্গা হইয়াছিল, গান্ধীজী তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি পরিদর্শন করেন। নিপীড়িত হিন্দু পরিবার এবং মুসলমান সমাজের নেতৃস্থানীয় ও সাধারণ লোকের সঙ্গে দেখাশুনা করিয়া ঘটনার সত্যতা যথাসম্ভব বুঝিবার চেষ্টা করেন। সে সময়ে গভর্নমেণ্ট দাঙ্গাবিধ্বস্ত পরিবারগুলিকে অস্থায়িভাবে আশ্রয় দিয়া খাওয়া-দাওয়ার যাবতীয় বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। গান্ধীজী কিন্তু জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে পরামর্শ দেন যে, তিনি মানুষকে ভিক্ষান্ন না দিয়া যেন কাজের সুযোগ দেন। কেহ সুতা কাটিবে, কেহ রাস্তা বা নিজেদের ভাঙা বাড়ি মেরামতের কাজে যোগ দিবে, কেহ বা পুষ্করিণী পরিষ্কার করিবে। যাহার যেমন ক্ষমতা সে তদনুসারে ২ হইতে ৪ ঘণ্টা কাজ করিলে তাহাকে যেন যথাযোগ্য র‍্যাশন দেওয়া হয়। শরণার্থীরা ভিক্ষান্নে পালিত হউক, ইহা তিনি একেবারে চাহেন নাই।

একদিন এক চিকিৎসক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি ব্যবসায় ব্যপদেশে চাঁদপুর থাকিতেন, কিন্তু বাড়ি দাঙ্গাবিধ্বস্ত একটি গ্রামে। তাঁহাকে গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করিলেন. তাঁহার ডাক্তারি পড়ার খরচ কে বহন করিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত স্থির হইল যে, যে সকল চাষী তাঁহার পিতার অধীনে কাজ করিতেন, তাঁহারাই তাঁহার শিক্ষার সুযোগের জন্য দায়ী। তখন গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার চিকিৎসাবিদ্যার দ্বারা ইহারা কি ভাবে লাভবান হইতেছে? আপনার উচিত ইহাদের ঋণকে শোধ করা। আপনি গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া গ্রামবাসীকে শেখান, কেমন করিয়া রোগ নিবারণ করিতে হয়, সুষম খাদ্য আহরণ করিতে হয়, পানীয় জল পরিষ্কার করিতে হয়, আবর্জনা হইতে সার উৎপাদন করিতে হয়, ইত্যাদি। যদি নিজে না আসিতে পারেন, তবে কয়েক জন মিলিয়া বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ এক মাসের আয় সমবেত করিয়া গ্রামে কর্মী রাখিয়া এই প্রকারের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করুন। তবেই আপনাদের ঋণ কিয়ৎ পরিমাণে শোধ দেওয়া সম্ভব হইবে।

তাঁহার কিছুদিন পর হইতে গান্ধীজী প্রার্থনাসভায় এক বিচিত্র উপদেশ দান করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, আমাদের সকলের ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত, যিনি এই দাঙ্গার উপলক্ষ্যে সকল সঞ্চিত ধন কাড়িয়া লইয়া নূতনভাবে জীবন-যাত্রার এক দ্বার আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সেরূপ জীবনে ধনী নাই,

নির্ধন নাই, উচ্চনীচ-ভেদাভেদ নাই, সকলে শরীর-শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে।

আজিকার দুর্দিনে যদি আমাদের সকল কষ্ট, সকল দুর্ভোগের উর্দ্ধে উঠিয়া ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিয়া নবজীবনের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারি, তবে যাহা কিছু অকল্যাণ তাহা পরিপূর্ণভাবে কল্যাণের আকর হইয়া উঠিবে।

গান্ধীজীর এইরূপ বিপ্লবাত্মক চিন্তা হিন্দু অথবা মুসলমান, কাহারও হৃদয় অথবা বুদ্ধিকে স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তাঁহার আদর্শ কি ছিল, দারুণ বিপদের মধ্যেও তিনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস কি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পোষণ করিতেন, তাহা আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক।

"কর্মী হতে গেলে খাঁটী ও সৎ হওয়া চাই। অপরের দোষ দেখবে না, বরং নিজেরই দোষের দিকে দৃষ্টি রাখবে।" "মানুষ নিজের দুর্বলতা দেখতে পায় না, দেখতে চায়ও না। নিজের অন্যায় আচরণের সপক্ষে অনেক বৃথা যুক্তি প্রয়োগ করে।"

"আপনারা জাগতিক নানা আন্দোলন ও ঘটনাপ্রবাহের ওপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করেন কেন?…স্বাধীনতালাভ যদি হয়েই যায় তাহলে কি সব শান্তিপূর্ণ হয়ে যাবে? নিশ্চয়ই তা হবে না। বহির্জগতের সংগ্রাম আমাদের চিত্তচাঞ্চল্য আনয়ন করে না, পরন্তু জাগতিক বিষয়ের প্রতি আমাদের অত্যধিক আসক্তি এবং ঐগুলি পাবার জন্য যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তা থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে মানসিক চাঞ্চল্য। …আপনারা রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা বলছিলেন? তা মহাত্মা গান্ধীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন তো! তিনি তো সংগ্রামের মধ্যে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আপনি কি বলতে চান যে, এত বহুবিধ বাহ্যিক সংগ্রামের মধ্যে থেকেও তিনি মানসিক প্রশান্তি-লাভের সাধনা বা ভগবানের স্মরণ-মনন করেন না? প্রচণ্ড জীবন-সংগ্রামের ভেতরও মানসিক সাম্যরক্ষার সাধনা করুন। জগতে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের এ একমাত্র উপায়। গান্ধীজীর জীবনের এ ভাবটি সম্যক্‌রূপে বোঝা উচিত।"

"প্রকৃত শান্তিলাভ করতে হলে ত্যাগ চাই, আত্মসংশোধন চাই, এই হল সনাতন সত্য। তা আধ্যাত্মিক জীবনেই বলুন বা রাজনৈতিক জীবনেই বলুন—স্বার্থত্যাগের জন্য প্রস্তুত না থাকলে কোন কার্যেই সফলতা আশা করা সুদূরপরাহত। বাস্তবিকপক্ষে এই বিরাট জগৎ স্বার্থত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বিজ্ঞানভিক্ষু

সাধুজীবন

"মহাপুরুষের লক্ষণ হচ্ছে—তাঁদের কথা সত্য; যা তাঁদের মুখ থেকে বেরোয় তা নিশ্চয়ই ঘটবে। আর সাধুর চিহ্ন হচ্ছে এই যে, তাঁকে দশঘা মার, আর তা-ও তিনি যদি অম্লানবদনে সহ্য করেন, তাহলেই তিনি যথার্থ সাধুপুরুষ।" "সাধু হওয়া দাদা, বড়ই কঠিন। কায়-সংযম, বাক্য-সংযম, মনঃসংযম চাই। ধীর, স্থির, গম্ভীর হওয়া চাই।" "যে নিঃসঙ্গ হয়ে থাকে, সেই প্রকৃত সাধু।"

"সাধু তিনি, যিনি দেশ-কাল-নিমিত্তকে জেনে তার পারে গেছেন।···তবে এই 'জানা'টা বড় কঠিন ব্যাপার। জানা মানে অনুভূতি।"

"সমস্ত সংস্কারের পুঁটলি ফেলে দিয়ে যে কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের চরণে, শ্রীশ্রীমায়ের চরণে আত্মসমর্পণ করতে পারে, সেই তো সন্ন্যাসী। সব বাসনা-কামনা গিয়ে লীন হবে শ্রীভগবানে। যাকে ছাড়া আর কিছুই চাইনে, এমন ভাবটি হওয়া চাই।"

"সন্ন্যাসজীবন বড় কঠিন। বিশেষ করে যারা ঠাকুরের নামে সন্ন্যাসী হয়েছে তাদের জীবন সর্ববিষয়ে আদর্শস্থানীয় হওয়া চাই। কায়মনোবাক্যে কামকাঞ্চনত্যাগ সন্ন্যাস-জীবনের একমাত্র আদর্শ।···আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্যই তোমাদের জীবন।"

"সম্পূর্ণ অনাসক্ত না হলে যত ধ্যানই কর, যত জপই কর, যত কাজকর্মই কর বা যত পাণ্ডিত্যই অর্জন কর না কেন, কিছুতেই কিছু হবে না। ঠাকুর বলতেন—সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের পট পর্যন্ত দেখবে না। তা বলে স্ত্রীলোকদের ঘৃণা করতে হবে বা অবজ্ঞার চোখে দেখতে হবে, তা নয়। বরং তাদের খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখবে—মন্দিরে যে মা আছেন, ঠিক তেমনি মনে করতে হবে তাঁদের। তাঁরা মায়ের জাত, তাঁদের দূর থেকে প্রণাম করবে। তোমরা যে সন্ন্যাসী, তাই তো তোমাদের জীবনের আদর্শ এত মহান! মেয়েদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করবে না। অবশ্য তোমাদের পাঁচ রকম কর্মের ভিতর থাকতে হয়, তাতে মেয়েদের একেবারে বাদ দেওয়া বড়ই মুস্কিল। তবে কি জান? কাজ তো ঠাকুরেরই, আর সন্ন্যাসীর পক্ষে এই যে উপদেশ, তাও দিয়েছেন তিনি। এই দুইয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করে নিতে হবে।···কাজের সম্পর্কে মেলামেশা তা আর কতক্ষণই বা! কিন্তু সাবধান, তার অতিরিক্ত যেন না হয়।··· কাজকর্ম করবে চিত্তশুদ্ধির উপায় জ্ঞানে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজ জীবনাদর্শের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখতে হবে।···বসে বসে পশ্চিমে সাধুদের মতো গল্প-গুজব করে সময় নষ্ট করার চাইতে এসব সেবাদি কর্মে মনকে লিপ্ত রাখা সহস্রগুণে শ্রেয়।···স্বামীজীর সঙ্গে একদিন এবিষয়ে আমার অনেক কথাবার্তা হয়েছিল।"

"আত্মোপলব্ধির জন্য শরীরধারণ। ঐ দেহ-ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পেলেই সন্তুষ্ট থাকবে আর ভগবানের কাজ নিষ্কাম ভাবে করবে।"

"আমি তো সর্বদা সবার জন্য আর আমার জন্যও প্রাণ থেকে প্রার্থনা করছি—সকলের মঙ্গল হোক। এ প্রার্থনাটি খুব বড় জিনিস।... খুব নাম কর দাদা, কিছু ভয় নাই।"

"তোমাদের ভাবনা কি? সাক্ষাৎ ঠাকুরের কাছে রয়েছ।...খুব নাম করবে, প্রাণভরে। চব্বিশ ঘণ্টা—কাজের ভিতরে বাইরে সব সময়। বাইরে কাজ, ভিতরে নাম।...কোন সংশয় যেন এসে না যায় দেখো। তা তোমাদের কোন ভাবনা নেই।"

বিবিধ

"ভগবান হলেন সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ। তাঁর রূপ অনন্ত, নাম বহু।"

"লোকে বলে ঈশ্বরকে স্মরণ কর। বোঝে না, তিনি মনের অতীত; তাঁকে কি মন দিয়ে স্মরণ করা যায়? সসীম কখনো অসীমকে ধরতে পারে না; অংশ কি কখনো পূর্ণকে ধারণ করতে পারে? সসীম মন বোঝে না যে, তার যতটুকু গণ্ডী সে-গণ্ডীর বাইরে ঈশ্বর। মন তার গণ্ডীর ভিতর ঈশ্বরকে যতটা জানতে পারে, তাতেই তৃপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এ জানাতে কি ভগবানের সবটুকু জানা হল?"

"জগতে সব জিনিসই মিশ্র, কেবলমাত্র ঈশ্বরই অবিমিশ্র। বেদান্তে দেশকালনিমিত্তকে মায়া বলেছে। ইনিই 'মা', ইনিই শক্তি।"

"প্রত্যেক বস্তুরই তিনটি aspect (দিক বা ভাব) আছে—নাম, রূপ ও মূল সত্তা। যতক্ষণ না নামরূপের গণ্ডীর পারে যাব, ততক্ষণ আমরা সত্যের অন্তস্তলে বা মূল সত্তায় পৌঁছুতে পারব না। আর যখন সকল পদার্থের সত্তারূপ আত্মাতে পৌঁছব, তখনই লাভ করব প্রকৃত শান্তি।"

"এ জগতে বহুত্বের পিছনে ঈশ্বরের বিশুদ্ধ সত্তাকে যেন আমরা দেখতে পাই।"

"সব দেহের সঙ্গেই চৈতন্য রয়েছে। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ, বায়ু প্রভৃতি হতে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী পর্যন্ত সর্বত্রই চৈতন্য ওতপ্রোতভাবে বর্তমান। আর এই চৈতন্য আছে বলেই সব কিছু গতিশীল।" এই চৈতন্যই মূল সত্তা বা ব্রহ্ম।"

"ব্রহ্ম স্থিরসর্প-স্বরূপ; আর শক্তি হচ্ছেন চলন্ত সর্পের মতন। উহাই কুণ্ডলিনী শক্তি। এই আধ্যাত্মিক শক্তিস্রোত যখন উর্ধ্বগামী হয়, তখন মনেরও হয় উর্ধ্বগতি—আর ঐ শক্তিস্রোত নিম্নগামী হলে মনের অধোগতি হয় —মন তমসাচ্ছন্ন হয়ে যায়। দেখেছি যে স্ত্রীলোকদের ভিতর এই উর্ধ্বগামিনী শক্তির বিকাশ বেশী দেখতে পাওয়া যায়। মেয়েরা শক্তির অংশ কি না!... স্ত্রীলোক দেখলেই ঠাকুরের কুণ্ডলিনী শক্তি জেগে উঠত।"

"কল্পে কল্পে একই ভাবে সৃষ্টিপ্রবাহ চলেছে। যেমন কাদার তাল হতে একটা মূর্তি গড়া হল—আবার তা-ই ভাঙ্গা হল—আবার গড়া হল। এই লীলাখেলা চলছে—এতে নতুন কিছু হচ্ছে না, বারংবার পুনরাবৃত্তি মাত্র।"

"কারণ সবটাই কার্যরূপে প্রকাশিত হয় না, খানিকটা অব্যক্ত থাকে।"

"জীব অমর। সত্য সত্যই অমর! জীবের ভিতর যিনি রয়েছেন তিনি অনাদি, অনন্ত, জন্মমৃত্যুরহিত। তাঁর মৃত্যু বলে কিছু নেই।"

"ঈশ্বরদর্শনই মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ একমাত্র ইহাই আমাদিগকে ভূমানন্দ ও শাশ্বতী শান্তি দান করতে পারে।"

"অবিদ্যাপ্রসূত অহংকারই আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মহিমা ওতপ্রোতভাবে সর্বত্র বিরাজিত। অথচ আমরা তাঁকে দেখতে পাইনে। কারণ এই অবিদ্যার আবরণকে আমরা দূর করতে চাই না। (এই আবরণ) সরিয়ে ফেল, দেখবে তিনি সর্বত্র স্বপ্রকাশ হয়ে আছেন।"

"মৃত্যুকালে যে নাম নেবে বা যে ভাবে মন নিবিষ্ট থাকবে, মৃত্যুর পর তদনুরূপ গতিই লাভ হয়।"

"মানুষ মৃত্যুর সময়ে মুহ্যমান ও হতবুদ্ধি হয়ে যায়। সে সময় যদি একটিবারও ভগবানের নাম করতে পারে, তবেই হল।···আর কিছুই ভাবতে হয় না, শ্রীভগবান তার সব ভার গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল নিরন্তর অভ্যাস না থাকলে মৃত্যুযন্ত্রণায় সব গুলিয়ে দেয়—একটি বারের জন্যও শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করতে পারে না। তাই দরকার নিরন্তর তাঁর নামজপ, স্মরণ-মনন আর প্রার্থনা।"

"আমরা প্রায়ই দেখতে পাই যে, মনে পবিত্র চিন্তার ও ভগবচ্চিন্তার অভাববশতঃ মানুষ মৃত্যুকালে অতীব ভীত হয়।··· শ্রীভগবানের নামের প্রভাব এসব ভয়কে তো দূর করে দেয়ই, অধিকন্তু আমাদের চিরকালের জন্য মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করে।"

"আমার আবার মরা মানুষ দেখলে নিজে যে বেঁচে আছি তাই-ই ভ্রম হয়ে যায়। নেহাত জোর করে শরীরের ওপর মন এনে তবে বুঝতে পারি যে আমি বেঁচে আছি।"

"জগৎটাকে যদি কল্পনা বলে মনে করে নেওয়া যায়, তাহলে কত আনন্দ! আর যখনই এই পৃথিবীকে সত্য মনে করলে, অমনি কষ্ট!"

"অবতারপুরুষেরা নিজমুখে প্রচার করেছেন তাঁরা কে। তা না হলে লোকে তাঁদের বুঝতে পারে না।"

"গুরু ইষ্ট এক। তবে যতক্ষণ নামরূপের এলাকায় রয়েছ, ততক্ষণ নাম-রূপ-ভেদ রাখতে হবে। তারপর আসল জিনিস দেখতে পেলে দেখা যায় দুই-ই এক। দাদা, এটি ঠিক ঠিক জানতে হলে সাধন করতে হয়।" "যখন মনের ভিতর একটু আধটু ভগবানের ভাব আসে, গুরু-ইষ্ট-ভেদ, জাতিভেদ, বিভিন্ন আচার ব্যবহার—এসব মেনে চলতে হয় বৈ কি! নিষ্ঠা রাখতে হয়। তা না হলে সামান্য যা ভগবানের ভাব হয়েছে তা-ও গুলিয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। আর ভেতরে যখন ব্রহ্ম-জ্ঞানাগ্নি জ্বলতে থাকে, তখন···সব একাকার হয়ে যায়।"

"গুরু রয়েছেন হৃদয়ে, তাঁকে আর কোথাও খুঁজতে হবে না।"

"মহাপুরুষদের বাক্য শ্রদ্ধাসহকারে বিশ্বাস করবে। প্রকৃত মহাপুরুষরা conscious ও super-conscious stage-এ (মানস ও অতি-মানস অবস্থার সন্ধিস্থলে) থেকে বলেন যে, জীবের কল্যাণের জন্য তাঁরা হাজার হাজার জন্ম নিতেও প্রস্তুত। ঐ সন্ধিস্থলের উপরে গেলে এসব ভাব আর থাকে না

"ত্রিবেণীতে স্নান করার জন্য দেবতারা ও সাধু মহাপুরুষেরা আসেন।···তাঁরা না এলে সেস্থান আর তীর্থ বলে পরিগণিত হয় না।"

"বিশেষ বিশেষ পর্বদিনের তাৎপর্য এই যে, ঐ সকল দিনে কোন মহাপুরুষ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তিনি যতটা শক্তিলাভ করে-ছিলেন, ততটা পরিমাণ শক্তির বিকাশ সেই

সেই দিনে হতে থাকবে

কোন বিশেষ দিনে (যোগ প্রভৃতিতে) স্নান ব্রত উপবাসাদির সঙ্গে ধর্মের কি সম্বন্ধ—এই প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানানন্দজী বলেন, "দেখ যারা নিরন্তর ভগবৎ-ধ্যান-চিন্তনে মগ্ন থাকে, তাদের জন্য যতটা না হোক, সাধারণ লোকের পক্ষে এ সকলের বিশেষ উপকারিতা আছে বৈকি! তবু তো ঐ সব বিশেষ দিন স্মরণ করে মন ভগবন্মুখী হয়ে থাকে। তা ছাড়া মনের ওপর ঐসব সময়ে (অন্তর্মুখীতার) একটা প্রভাব পড়ে।...শাস্ত্র নিরর্থক কিছু ব্যবস্থা করেনি। তবে সেগুলির যথাযথ মর্ম জানা দরকার। স্থূলদৃষ্টিতে অনেক কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু মন শুদ্ধ হলে অনেক কিছু অনুভব করা যায়।"

"রথযাত্রা ও স্নানযাত্রার আধ্যাত্মিক অর্থ হল—এ শরীরটি রথ, এ দেহরূপ রথে যে ভগবানকে বসিয়ে আনন্দ করে, সে রথযাত্রার আনন্দ পায়।...স্নানযাত্রা—উচ্চ ও পবিত্র চিন্তায় অবগাহন করা।"

"আবরণ দেবতাদেরও আধ্যাত্মিক অর্থ আছে। আবরণ দেবতা কি জান? প্রচ্ছায়িক বা উপচ্ছায়িক বা প্রতিফলিত জ্যোতি। যেমন একটি আলো। তার দুরকম ছায়া পড়ে—umbra ও penumbra (প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া)। তেমনি ভগবান বিষ্ণু লক্ষ্মীসহ জ্যোতির্ময় দেবতা; আর ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ও নারদাদি ভক্তগণ umbric ও penumbric deity (আবরণ দেবতা; সেই দেবতার জ্যোতিঃ তাঁহাদের মধ্যে স্বল্প ও স্বল্পতর রূপে প্রকাশিত।)"

"বিল্বপত্রের তিনটি পাতা—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের জ্ঞাপক, আর সমগ্র বিল্বপত্রটি ভগবানের মাতৃভাবের জ্ঞাপক।"

"কোন দর্শন সত্য কিনা, তা জানবার উপায় হচ্ছে যে, ঠিক ঠিক দর্শন হলে সে ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে আর আনন্দ ও জ্ঞান হবে।"

"সূর্য উঠলে বলে দিতে হয় না এই সূর্য। কারণ তিনি নিজের আলোতেই প্রকাশমান।"

"মায়ের সন্তান আমরা, আমাদের ভয় কি? সত্য পথে দাঁড়াও আর তাঁকে ডাক, তিনি মঙ্গল করবেনই।"

"এই সকল নামরূপের পারে সেই বিভু পরম শান্তিময় আত্মা স্বর্ণ অপেক্ষাও উজ্জ্বলরূপে বিরাজমান। আপনারা সকলে সম্বোধি লাভ করুন, সেই পরম সত্য দর্শন করে শাশ্বতী শান্তি লাভ করুন, শ্রীভগবানের নিকট আমার এই আন্তরিক প্রার্থনা।"

"ভাল থাক। প্রাণ থেকে আশীর্বাদ করছি তোমাদের কল্যাণ হোক।" "প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি।"

স্বামীজীর ধৈর্য ও সহনশীলতা

ব্রহ্মচারী শশাঙ্ক

স্বামীজী তখন নরেন্দ্রনাথ। পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে সাংসারিক বিপর্যয়ে এবং আত্মীয়গণের প্রতারণায় তিনি একান্ত অসহায় হয়ে পড়েছেন। এদিকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের পূত সঙ্গলাভের ফলে হৃদয়ে ঈশ্বরলাভের তীব্র ব্যাকুলতা। এই অবস্থায় সংসারে স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী মানুষদের হৃদয়হীনতায় তিনি অভিমানে নীরব থাকতেন, বরং সমর্থনই জানাতেন যখন তাঁকে নাস্তিক, স্বেচ্ছাচারী ও অধঃপতিত বলে প্রচার করা হত। ফলে নরেন্দ্রনাথের নিন্দায় ও অপবাদে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে তাঁর যত বন্ধু-বান্ধব আর আত্মীয়-স্বজন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিনি চির-বিশ্বস্ত "নরেন্দ্র"। নরেন্দ্রনাথের কুৎসাকারিগণকে ধিক্কার দিয়ে তিনি বলেছিলেন, "চুপ কর্ শালারা, মা বলিয়াছেন সে কখনও ঐরূপ হইতে পারে না; আর কখন আমাকে ঐসব কথা বলিলে তোদের মুখ দেখিতে পারিব না।"[১] এই সময়ের কথা উল্লেখ করে নরেন্দ্রনাথ বলতেন, "একা ঠাকুরই আমাকে প্রথম দেখা হইতে সকল সময় সমভাবে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, আর কেহই নহে—নিজের মা-ভাইরাও নহে। তাঁহার ঐরূপ বিশ্বাস-ভালবাসাই আমাকে চিরকালের মত বাঁধিয়া ফেলিয়াছে! একা তিনিই ভালবাসিতে জানিতেন ও পারিতেন—সংসারে অন্য সকলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবাসার ভান মাত্র করিয়া থাকে।"[২]

শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভাবী বিবেকানন্দরূপী বিশাল বটবৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম করে গেছেন, বরাহনগর মঠে তা পল্লবিত হতে শুরু হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ গুরুভাইদের ঘরে ঘরে গিয়ে ডেকে আনতে লাগলেন তাঁর এই নতুন সাধন-পীঠে।

নরেন্দ্রনাথের আহ্বানে সকলে একে একে সেখানে এসে জুটলেন। ভূতুড়ে বাড়ী সত্যিই জমজমাট হয়ে উঠল। তবে তা ভূত-প্রেতের নৃত্য-গীতে নয়—অদ্ভুত গুরুর অদ্ভুত শিষ্যদের আধ্যাত্মিকতার ভাব-প্লাবনে!

সে-সময় ভারতে বিভিন্ন ধর্মভাবের সংমিশ্রণে যে অদ্ভুত মানসিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তার কেন্দ্রস্থল ছিল—কলকাতা। পরবর্তীকালে এই সময়ের এক মনোরম বর্ণনা আমরা স্বামী অদ্ভুতানন্দের (স্বামীজীর গুরুভাই) মুখ থেকে শুনতে পাই— "...ঢাক পিটে কি ধর্মপ্রচার হয়? ধর্ম কি বাইরের জিনিস যে একজন বলতে থাকলেই আর একজন তা নিতে পারবে?... এই দেখুন না! দশ-পনের কি বিশ বছর আগে এই কলকাতা শহরে কেমন ধর্মের ঢেউ উঠেছিল, জানেন তো! রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাদ্রীর দল (Salvation Army) লেকচার দিতো। সমাজে ব্রাহ্মরা সব বক্তৃতা দিতো। পাড়ায় পাড়ায় হরিসভায় কীর্তন হোত। তখনকার কথা মনে করুন। একদিন কোম্পানীর (বিডন) বাগানে কেশববাবু (কেশবচন্দ্র সেন) বক্তৃতা দিলেন তো তার পরের দিন সেই বাগানে খ্রীষ্টান কালী (Rev. Kali Charan Banerjee) লেকচার দিলেন। লোকে তাঁদের কথা শুনলো। আবার একদিন কৃষ্ণানন্দ স্বামী এলেন,

১, ২. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পৃঃ ২৩৯। ২৪৯

তিনিও বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। লোকে তাও শুনলো। একদল বক্তা হিন্দুধর্মকে গালাগালি দিল, আর একদল সেই ধর্মের সুখ্যাতি করলো।…এত জবরভাবে ধর্মের প্রচার হতে লাগল…।"[৩]

এ-হেন পরিস্থিতির মধ্যে এই নবীন সন্ন্যাসিদলের উদ্ভব। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই—নিধিরাম সর্দার! কী ব্যাপার! শিক্ষিত ছেলেরা ঘর ছেড়ে, অর্থের নেশা ছেড়ে ভুতুড়ে বাড়ীতে ভূতের মতোই রহস্যজনকভাবে দিন যাপন করছেন।

অবাক লাগে বৈ কি! আরও আশ্চর্য লাগে ঐ ছেলেটিকে নরেন্দ্র! স্বামী অদ্ভুতানন্দ বলতেন—লিডার! যত বাধা-ঝক্কি আর ঝড়-ঝাপটা এই লিডারকেই সামলাতে হয়। হাসিমুখে সহ্য করেন নিজ আত্মীয়দের আর এইসব গুরুভাইদের পিতামাতার বিদ্রূপ! এ কী মতিভ্রম! সুদর্শন, বুদ্ধিমান, তেজীয়ান যুবক নিজের বংশমর্যাদা ভুলে, পাণ্ডিত্য ভুলে গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছে! গাছতলা বৈ কি—এই কি মনুষ্যযোগ্য বাসস্থান! গুরুভাইদের পিতা-মাতা নরেন্দ্রনাথকে দোষারোপ করেন আর নিজ নিজ অপত্যস্নেহে অধীর হয়ে চোখের জলে ভাসেন।…"এখানে কর্তা কে? এই নরেন্দ্রই যত নষ্টের গোড়া! ওরা ত বেশ বাড়ীতে ফিরে গিছিল। পড়াশুনা আবার কচ্ছিল।"[৪]

এই সময় সর্ববিধ উপেক্ষা ও অবজ্ঞার মধ্যে তাঁরা সঙ্কল্পে কি রকম অটুট ছিলেন তার একটু পরিচয় আমরা পাই স্বামীজীর কথাতেই—"আমাদের বন্ধুবান্ধব বিশেষ কেহ ছিল না।…একবার ভাবিয়া দেখুন, বারোটি বালক মানুষের কাছে বড় বড় আদর্শের কথা বলিতেছে, সেই আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। সকলেই হাসিত। হাসি হইতে ক্রমে গুরুতর বিষয়ে পরিণতি ঘটিল। রীতিমত অত্যাচার আরম্ভ হইল।…বালকের কল্পনার প্রতি কে সহানুভূতি দেখাইবে? যে-কল্পনার ফলে অপরকে (অর্থাৎ আত্মীয়-বর্গকে) এত কষ্ট পাইতে হয়, সেই কল্পনার প্রতিই বা কে সহানুভূতি জানাইবে?…"[৫]

আদর্শবান পুরুষের বাধা যত প্রবল হয়, আদর্শের উপর তাঁর নিষ্ঠা ততই প্রবলতর হয়। পরবর্তীকালে এই আদর্শ-নিষ্ঠার কথায় স্বামীজী বলেছেন, "কি জানিস্ বাবা, সংসার সবই ছুনিয়াদারি! ঠিক সৎসাহসী ও জ্ঞানী কি এসব ছুনিয়াদারিতে ভোলে রে বাপ! জগৎ যা ইচ্ছে বলুক, আমার কর্তব্য কার্য করে চলে যাব—এই জানবি বীরের কাজ। নতুবা এ কি বলছে, ও কি লিখছে, ওসব নিয়ে দিনরাত থাকলে জগতে কোনও মহৎ কার্য করা যায় না। এই শ্লোকটা জানিস্ না?—

'নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেচ্ছম্।
অদ্যৈব মরণমস্তু শতাব্দান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥'

—লোকে তোর স্তুতিই করুক বা নিন্দাই করুক, তোর প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা হোক বা না হোক, আজ বা যুগান্তে তোর দেহপাত হোক, যেন ন্যায় পথ থেকে ভ্রষ্ট হোস্‌নি। কত বড় তুফান এড়িয়ে গেলে তবে শান্তির রাজ্যে পৌঁছান যায়! যে যত বড় হয়েছে, তার উপর তত কঠিন পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষার কষ্টিপাথরে তার জীবন

৩ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ৩৬৪
৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (২য় ভাগ) পরিশিষ্ট, পৃঃ ৩২৭
৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—পৃঃ ১০।১৬৪-৬৫

ঘসেমেজে দেখে তবে তাকে জগৎ বড় বলে স্বীকার করেছে।"[৬]

পরিব্রাজক জীবনেও তাঁকে এই ধৈর্যরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু সর্বাবস্থায়, সর্ববিধ দ্বন্দ্বে তিনি অবিচলিত ছিলেন গীতোক্ত যোগীর মতো :

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥

স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবন তাঁর এই মানসিক স্থৈর্যেরই নিদর্শন: "পথে বহুবার তাঁকে অনাহারের ও সমূহ জীবন-সংশয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু তাতে তাঁর শান্ত, স্থির মানস-সায়রে চাঞ্চল্যের তরঙ্গ কখনো ওঠেনি। মরুভূমিতে ও অরণ্যপথে তিনি একাকী ভ্রমণ করেছেন, ধর্মোন্মাদ তান্ত্রিকদের কবলে পরে অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন, কোথাও কখনো বা অনাহারে প্রায় মরণের দ্বারে গিয়ে পৌঁছেছেন, কত হৃদয়হীন অপরিচিতের বিদ্রূপ এবং নিন্দাবাদও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। তবু দুঃসাহসিক পরিব্রাজক-জীবনের এই বিপদসঙ্কুল পথের উপর দিয়ে তিনি সব বাধা পায়ে দলে নির্ভয়ে এগিয়ে গেছেন। ধনী ব্যক্তিদের গৃহে তিনি যখন অতিথিরূপে বাস করেছেন, তখন তাঁদের সহৃদয়তায় কখনো আনন্দ-উদ্বেল হয়ে ওঠেন-নি, গুণমুগ্ধ অভ্যাগতদের শ্রদ্ধায় ত্যাগের কঠোর পথ থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিতও হননি। দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র-ধারী, মুণ্ডিতমস্তক, গৈরিক-বসন এই সন্ন্যাসী সামন্ত রাজাদের আতিথেয়তা যতখানি প্রসন্নতা ও পরিতৃপ্তি নিয়ে গ্রহণ করেছেন, দীন পারিয়ার আতিথ্যও গ্রহণ করেছেন ঠিক ততখানি তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে। আবার যাঁরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁদের দ্বার থেকেও ফিরে এসেছেন সমপরিমাণ মানসিক স্থৈর্য নিয়েই।"[৭]

যে বিশাল ব্যক্তিত্ব নিয়ে তিনি সারা ভারত ঘুরে বেড়াছিলেন, যা এতদিন আগ্নেয়গিরির মতোই সুপ্তাবস্থায় ছিল, তার যথার্থ স্ফুরণ হয়েছিল পাশ্চাত্যদেশে, বিশেষতঃ আমেরিকায়। সেই বিরাট মনীষার কাছে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণও স্তব্ধবাক হয়ে গিয়েছিলেন, হঠাৎ ঝঞ্ঝার মতো এসেই তা তাঁদের হৃদয়কে তোলপাড় করেছিল।

কিন্তু তাঁর এই বিজয়-পথ কুসুমাকীর্ণ ছিল না। একদিকে খ্রীষ্টান মিশনারিগণের অপপ্রচার আর একদিকে তাঁর স্বদেশবাসী ও বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিদের ঈর্ষা-দ্বেষের শাণিত শর। "...যাহা হউক আমি আমেরিকায় যাইলাম। টাকা আমার নিকট অতি অল্প ছিল—আর ধর্মমহাসভা বসিবার পূর্বেই সমুদয় খরচ হইয়া গেল। এদিকে শীত আসিল। আমার কেবল পাতলা গ্রীষ্মোপযোগী বস্ত্র ছিল। একদিন আমার হাত হিমে আড়ষ্ট হইয়া গেল। এই ঘোরতর শীতপ্রধান দেশে আমি যে কি করিব, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। কারণ যদি আমি রাস্তায় বাহির হই, তাহার ফল এই হইবে যে, আমাকে জেলে পাঠাইয়া দিবে। তখন আমার নিকট শেষ সম্বল কয়েকটি ডলার মাত্র ছিল। আমি মাদ্রাজস্থ কয়েকটি বন্ধুর নিকট তার করিলাম। থিওজফিস্টরা এই ব্যাপারটি জানিতে পারিলেন; তাঁহাদের মধ্যে একজন লিখিয়াছিলেন, 'শয়তানটা শীঘ্র মরিবে—ঈশ্বরেচ্ছায় বাঁচা গেল।'...আমি এখন এসব কথা বলিতাম না, কিন্তু হে আমার স্বদেশ-

৬ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ (পূর্বকাণ্ড), পৃঃ ১৪১

৭ স্বামী নির্বেদানন্দের Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance হ'তে অনূদিত (উদ্বোধন, শ্রাবণ, ১৩৭৫)।

বাসিগণ, আপনারা জোর করিয়া ইহা বাহির করিলেন। আমি তিন বৎসর এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করি নাই। নীরবতাই আমার মূল-মন্ত্র ছিল…"

"তাহার পর তাঁহারা অপর বিরুদ্ধ পক্ষ খ্রীষ্টান মিশনারিদের সহিত যোগদান করিলেন। এই শেষোক্তেরা আমার বিরুদ্ধে এরূপ ভয়ানক মিথ্যা সংবাদ রটাইয়াছিল, যাহা কল্পনায়ও আনিতে পারা যায় না। তাহারা আমাকে প্রত্যেক বাড়ী হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং যে কেহ আমার বন্ধু হইল, তাহাকেই আমার শত্রু করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা আমেরিকাবাসী সকলকে আমাকে লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিতে এবং অনশনে মারিয়া ফেলিতে বলিতে লাগিল; আর আমার বলিতে লজ্জাবোধ হইতেছে যে, আমার একজন স্বদেশবাসী ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন—আর তিনি ভারতের সংস্কারকদলের একজন নেতা।…আমি ইঁহাকে অতি বাল্যকাল হইতেই জানিতাম, তিনি আমার একজন পরম বন্ধু ছিলেন। অনেক বর্ষ যাবৎ আমার সহিত আমার স্বদেশবাসীর সাক্ষাৎ হয় নাই, সুতরাং তাঁহাকে দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল, আমি যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম! যেদিন ধর্ম-মহাসভায় আমি প্রশংসা পাইলাম, যেদিন চিকাগোয় আমি লোকপ্রিয় হইলাম, সেইদিন হইতে তাঁহার সুর বদলাইয়া গেল এবং তিনি প্রকাশ্যেই আমার অনিষ্টাচরণ করিতে, আমাকে অনশনে মারিয়া ফেলিতে, আমেরিকা হইতে লাথি মারিয়া তাড়াইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।"[৮]

পাশ্চাত্যদেশে যারা স্বামীজীর অপাপবিদ্ধ চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করতে উঠে-পড়ে লেগেছিল, সেইসব চক্রান্তকারী ও কুৎসা-কারীর বিরুদ্ধে তিনি কোন দিন একটিও অভিশাপ-বাক উচ্চারণ করেননি এবং অন্য কাউকেও এসবের প্রতিবিধান করতে বলেননি। নীরবে তিনি সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেছিলেন। এই সময় স্বামীজী যে সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার অনেক বিবরণ মেরী লুই বার্ক-প্রণীত 'Swami Vivekananda in America : New Discoveries' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। লেখিকা স্বামীজীর তিতিক্ষা ও ও পবিত্রতারূপ চরিত্র-মাধুর্যে অভিভূত হয়ে গভীর বিস্ময়ে লিখেছেন, "Thus, during a period of outward trial and tribulation, Swamiji's inner mind and heart were filled only with spiritual joy and love. Inscrutable indeed are the ways of God and God-men!" (p. 413).

স্বামীজী চরিত্রের এই যে আর একটি রূপ, যা ধৈর্য, সহনশীলতা ও পবিত্রতার সৌরভে সুরভিত, তা আলোচনা করিতে গিয়ে স্বতই আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠে—এর মূল কোথায়? কোন্ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তিনি সব রকম সংঘাতকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন? স্বামীজী নিজেই এর স্পষ্ট উত্তর দিয়েছিলেন একটি চিঠিতে—" মানুষের কথা আমি কি গ্রাহ্য করি? সেই প্রেমাস্পদ প্রভু আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন, যেমন আমেরিকায়, যেমন ইংলণ্ডে, যেমন যখন ভারতের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতুম—কেউ আমায় চিনত না—তখন সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। লোকেরা কি বলে না বলে তাতে আমার কি এসে যায়—ওরা ত খোকা! ওরা আর এর চেয়ে বেশী বুঝবে কি করে? কি! আমি পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করেছি, সমুদয় পার্থিব বস্তু যে অসার তা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেছি—আমি সামান্য বালকদের কথায় আমার নির্দিষ্ট পথ থেকে চ্যুত হব?…"[৯]

৮ ভারতে বিবেকানন্দ (উদ্বোধন-প্রকাশিত), পৃঃ ১৭৯

৯ পত্রাবলী, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৪৪-৪৭

এসো মা-জননী, আনন্দময়ী

সেখ সদরউদ্দীন

দুর্গা এসো মা, দুর্গতি নাশো
অনাচার দূর করো,
দশভুজা মাগো, দশটি হাতেতে
ধরো গো কৃপাণ ধরো।
দনুজের দলে ছেয়ে গেছে আজ
সারাটা বিশ্বভূমি,
এসো মা চণ্ডী, এসো ভৈরবী,
দনুজ-দলনী তুমি

এসো পার্বতী, শংকরী মাগো,
সন্তান কাঁদে দুখে,
অন্নপূর্ণা দাও মা অন্ন
ক্ষুধিত জনের মুখে।
এসো মা সারদা জগজ্জননী
জগৎ করো মা আলো,
জগদ্ধাত্রী-আগমনে আজ
ধুয়ে মুছে যাক কালো।

এসো মা-জননী আনন্দময়ী,
আনন্দ নাহি ধরে,
মহোৎসবের বাজনা বেজেছে
বাংলার ঘরে ঘরে।

মহাত্মা গান্ধী ও দরিদ্রনারায়ণ*

স্বামী অমলানন্দ

দরিদ্রের জন্য যাঁর হৃদয় কাঁদে, যিনি হৃদয়ের প্রতি রক্তবিন্দু ক্ষয় করেন দরিদ্রের দুঃখমোচনে, আমরা তাঁকেই বলি মহাত্মা। কথাগুলি স্বামী বিবেকানন্দের। মহাত্মা নামের এই সংজ্ঞা আক্ষরিক ভাবে সত্য হয়েছিল গান্ধীজীর জীবনে। দরিদ্র, মূর্খ, চণ্ডাল ভারতবাসী ছিল তাঁর একান্ত আপনার জন। তাই ভারতবাসীর কাছে মহাত্মা গান্ধী একটি পুণ্য নাম। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত উদ্বেলিত হয়েছিল এই নামের প্রভাবে। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক অদ্বিতীয় চরিত্র। রোঁমা রোঁলার কথায়, "ইনি সেই মানুষ, যিনি তিরিশ কোটি মানুষকে কর্ম-প্রেরণায় জাগিয়ে তুলেছেন, সারা বৃটিশ সাম্রাজ্যকে করেছেন কম্পমান, যিনি মানুষের রাজনীতির মধ্যে প্রবর্তন করেছেন দু'হাজার বছরের সব থেকে শক্তিমান এক নীতির আন্দোলন।" সত্য ও অহিংসার পূজারী এই প্রচণ্ড শক্তিশালী রাষ্ট্রনেতার শক্তির উৎস ছিল তাঁর কুসুম-কোমল হৃদয়, যে-হৃদয় দীন দরিদ্র অবহেলিত অবজ্ঞাতের জন্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রক্তমোক্ষণ করে চলেছিল।

কী জ্বালা অবহেলিত মানবত্বের, কী দুঃখ দরিদ্র মানুষের, তার পরিচয় গান্ধীজী পেলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। ধনী ব্যবসায়ীর কাজকর্ম দেখবার জন্যই তিনি গিয়েছিলেন সেখানে। কিন্তু বিধাতাপুরুষ তাঁকে নিয়োগ করলেন দীন দুঃখী গিরিমিটিয়াদের দুঃখমোচনে। বলা বাহুল্য, তখনকার দিনে গিরিমিটিয়া বলতে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকদের বোঝাত। ডারবানে তিনি যখন পৌঁচেছেন, তখন লক্ষাধিক ভারতীয় সেখানে বাস করছে। অল্পকিছু ধনী ব্যবসায়ী ছাড়া তার বেশীর ভাগই হল দরিদ্র শ্রমিক যারা রুজি-রোজগারের জন্য ভিটেমাটি ছেড়ে সমুদ্র পার হয়ে বিদেশ বিভূঁইতে হাজির হয়েছে। অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকার প্রয়োজনেই তাদের যেতে হয়েছিল সেখানে; ইংরেজরা তখন সেখানে উপনিবেশ গড়ে তুলেছেন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ভারতীয়েরা তাদের সম্পদ সৃষ্টি করলেন। তাঁদেরই পরিশ্রমে শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যভূমিতে গড়ে উঠেছে লোকালয়। কিন্তু তার বিনিময়ে ভারতীয়রা পেয়েছে অকথ্য অত্যাচার আর লাঞ্ছনা; পেয়েছে গিরিমিটিয়া ও কুলি নামের অপমানকর আখ্যা।

মোহনদাসকেও কুলি-ব্যারিস্টাররূপে সেই অপমান এবং দৈহিক লাঞ্ছনার ভাগ নিতে হয়েছিল। দীন দুঃখীর দুঃখ, অপমানিতের ব্যথা বুঝবার জন্য বোধহয় এরও প্রয়োজন ছিল। মহাত্মা হওয়ার প্রথম পাঠ তিনি পেয়েছিলেন এর ভিতর দিয়ে। অবশ্য গুজরাটি একটি সঙ্গীত পূর্বেই তাঁর মানসভূমি প্রস্তুত করে রেখেছিল :

> বৈষ্ণব জন তো তেনে কহিয়ে,
> গে পীড় পরাই জানেরে।
> পরদুঃখে উপকার করে তোয়ে
> মন অভিমান ন আনেরে॥

তাঁকেই সত্যিকারের বৈষ্ণব বলি যিনি পরের

* আকাশবাণী (কলিকাতা)-র সৌজন্যে

দুঃখ বোঝেন, পরের উপকার করেন এবং তা করে যাঁর মনে অভিমান জাগে না। পরের উপকার করে আমরা যেন ভাবতে পারি আমরাই কৃতার্থ হলাম। যাকে দয়া করলাম সে নয়। গান্ধীজীর জীবনচর্যায় এই কথাই স্পষ্ট দেখতে পাই। পরোপকার করে তিনি নিজে কৃতার্থ হচ্ছেন, কেন না দরিদ্রের মধ্যেই তিনি নারায়ণকে দেখেছিলেন। সেই দরিদ্রনারায়ণের সেবাই ছিল তাঁর পূজা, তাঁর জীবনব্রত।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয়—গান্ধীজী যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় গিরিমিটিয়াদের জন্য প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলছেন—নাটাল কংগ্রেস স্থাপন করছেন, তখন পৃথিবীর আর এক প্রান্ত থেকে আর এক মহাপুরুষ বলছেন—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥"

পৃথিবীর দুই প্রান্তে একই তত্ত্বের, একই জীবন-দর্শনের বাতাবরন সৃষ্টি হচ্ছে এবং যার অন্তরের কথাই দরিদ্রনারায়ণের সেবা।

উনবিংশ শতক বিদায় নিল; নূতন শতকের নবীন চেতনা নিয়ে সূর্য উঠল পূবের আকাশে। ভারতের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছেন গা ১৯১৬ সালে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাসভায় তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বললেন—"যখন ভারতের কোন এক প্রান্তে একখানি বিরাট অট্টালিকা দেখি, তখন মনে হয় উহা দরিদ্র কৃষকের রক্ত দিয়ে তৈরী।" ধনী ও নির্ধনের বৈষম্য এবং বিশাল জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। দেশবাসীর সামনে রাখলেন চরখা ও গ্রামোদ্যোগ পরিকল্পনা। চরখা ও কুটিরশিল্প দিয়ে ভারতবর্ষের আর্থিক সমস্যার সমাধান হবে কিনা সে বিষয়ে হয়ত বিতর্কের অবকাশ আছে; কিন্তু যেখানে শতকরা ৮০ ভাগ লোক বাস করে গ্রামে, সেখানে গ্রামের উন্নয়ন সকলের আগে। সম্পদ উৎ-পাদনের সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র গ্রামবাসীদের মধ্যে সেই সম্পদের সুষম বণ্টন হোক—এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি বলতেন, ভূমি গোপালকী, জমি ভগবানের। জমির ফসলে মালিকের যেমন অধিকার, শ্রমিকেরও তেমনি অধিকার। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন:

"ভারতের কোটি কোটি লোকের এক বেলার বেশী আহার জোটে না। এই অগণিত লোকের খাওয়া পরার পরে যা বাঁচবে তাতেই আমাদের অধিকার, তার বেশীতে নয়।"

ভারতের জাতীয় সংগ্রামের সর্বময় নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়েছিলেন গান্ধীজী। তখন জাতীয় কংগ্রেসে এল যুগান্তর। কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতের যেন এক জন্মান্তর ঘটে গেল। বিশাল এই দেশের বিপুল জনতার সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে উঠলেন।

চম্পারণের একদিনের ঘটনা। নীলকর অত্যাচারের বিরুদ্ধে গান্ধীজী আন্দোলন পরি-চালনা করছেন; একদিন তিনি দেখলেন মেয়েরা বড় নোংরা কাপড় পরে থাকে। তিনি কস্তুরবাকে বললেন মেয়েদের যেন একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে উপদেশ দেয়। কস্তুরবা মেয়েদের ডেকে বুঝিয়ে বললেন। তখন একটি মেয়ে সাহসে ভর করে কস্তুরবাকে বললেন, "তুমি তো মা আমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে বলছ—কার না সাধ হয় পরিষ্কার কাপড় পরতে। কিন্তু তা করি কি

করে? আমাদের যে দ্বিতীয় বস্ত্র নেই।" গান্ধীজী একথা শুনলেন। সেইদিন থেকে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন দুখানির বেশী তিনখানি কাপড় তিনি ব্যবহার করবেন না। দেশের লক্ষ লক্ষ গরীব ভাইদের মত তিনি হাঁটুর উপরে কাপড় পরতে লাগলেন। বহু-প্রত্যাশিত ভারতের জনগণের অধিনায়ককে ভারতবাসীরা খুঁজে পেল কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে।

কিন্তু তিনি নিজেকে নেতা না মনে করে জনগণের একজন বলে মনে করতেন। তিনি বলেছিলেন:

"অগণিত জনতার আমি একজন। তাদের আমি জানি, এই দাবী আমি রাখি। অষ্টপ্রহর আমি তাদের সঙ্গে। তারাই আমার দিবস-রজনীর একমাত্র ভাবনা। কারণ মূক জনের হৃদয়নিবাসী ভগবান ব্যতীত আমি ভগবান মানি না। ভগবানের সান্নিধ্য তারা অনুভব করে না, আমি করি। আর এই অগণিত জনতার সেবার মাধ্যমেই আমি ভগবানরূপী সত্যের বা সত্যরূপী ভগবানের আরাধনা করি।"

জনগণের কথাই তিনি অষ্টপ্রহর ভেবেছেন। তাদের ভিতর আবার যারা অস্পৃশ্য—যাদের তিনি 'হরিজন' আখ্যা দিয়েছিলেন তাদের জন্যও তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না। তাই তিনি বলেছিলেন:

"আমি পুনরায় জন্মাতে চাই না। যদি পুনরায় জন্মাতে হয় তবে আমি যেন অস্পৃশ্যদের মধ্যেই জন্মি। তাহলে তাদের দুঃখ, বেদনা, তাদের জীবনাধিকারের শরিক হতে পারব।"

বলা বাহুল্য শুধু হরিজনদের জন্য নয়, সাধারণভাবে সকল অবহেলিত, সকল দরিদ্রের জন্য তাঁর এই আকুতি। দরিদ্রনারায়ণের সেবায় তিনি এই জীবনের সব কিছু দিয়েছিলেন —জন্মান্তরের জন্যও তিনি রেখে গেলেন তাঁর ব্যাকুল প্রার্থনা।

মহাত্মা গান্ধী কালজয়ী মহাপুরুষ। একটি যুগের বিশেষ প্রয়োজন পূর্ণ করেই তাঁর জীবনের অবদান শেষ হয়ে যায়নি। দেশ ও কালকে অতিক্রম করে মহাকালের দৃশ্যপটে এই মহা-জীবনের যে শাশ্বত ও জ্যোতির্ময় ছবি ফুটে উঠেছে তার প্রয়োজন ও প্রেরণা সকল যুগের সকল মানুষের জন্য। মহামানবের সেই কালজয়ী ভাবমূর্তিকে আমরা যেন "চিত্ত ভরিয়া নিত্য স্মরণ করি।"

"মানুষ হতে হলে প্রথমেই চাই বিনয় অর্থাৎ একটু নত হওয়ার মনোভাব, আর নিজের সত্যতা সম্বন্ধে একটু সন্দেহ, আর চাই অন্যের কাছ থেকে শেখবার, নেবার ইচ্ছা।"

"যে সেবার মধ্যে বিনয় নেই, সেই সেবা স্বার্থপরতা ও স্বাভিমানের সমান।"

—মহাত্মা গান্ধী

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সাময়িক পত্রিকা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

চার

পরিশিষ্ট : উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বসুমতী ও স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত পত্রিকা-প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'সাপ্তাহিক বসুমতী' সম্বন্ধে কিছু সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। 'দৈনিক বসুমতী সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থে' (১৩৭১) আমি 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন ও বসুমতীর উপেন্দ্রনাথ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। প্রধানতঃ তা থেকেই তথ্য-সংগ্রহ করে দিচ্ছি। কিছু সংবাদ ঐ স্মারক গ্রন্থের অন্যান্য রচনা থেকেও নিয়েছি।

উক্ত প্রবন্ধ-সূচনায় লিখেছিলাম :

"বসুমতী সংবাদপত্রগোষ্ঠী ও বসুমতী সাহিত্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলা দেশের সংস্কৃতি-জীবনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নাম। দুঃখের বিষয় বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ইতিহাসে এই শ্রেষ্ঠ কর্মী মানুষটির যোগ্য স্থান এখনো নির্ধারিত হয়নি। বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে একদা বসুমতী তাদের 'নিজস্ব' সংবাদ-পত্র ;......বসুমতী সাহিত্যমন্দিরের সুলভ প্রকাশনগুলি দীর্ঘদিন ধরে সর্বসাধারণের কাছে শ্রেষ্ঠ ও নাতিশ্রেষ্ঠ রসসাহিত্য, ধর্মসাহিত্য, বিদেশী ক্ল্যাসিকের অনুবাদ পৌঁছে দিয়ে এসেছে।...

"বাংলার লোকশিক্ষার এই সংগঠক মানুষটি তাঁর সমস্ত প্রেরণার উৎসরূপে পেয়েছিলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে এবং গুরুভ্রাতা ও বাল্যবন্ধু স্বামী বিবেকানন্দকে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের সঙ্গে উপেন্দ্রনাথের সংযোগ প্রথমাবধি। অবশ্য সূচনাপর্বে তাঁর ভূমিকা খুব বড় নয়। পরবর্তীকালেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েননি। তিনি গৃহী ও ব্যবসায়ী থেকে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ভক্ত গৃহী এবং পুস্তকই তাঁর ব্যবসায়-সামগ্রী। অধিকন্তু তিনি সংবাদপত্রের পরিচালক। সুতরাং আমরা দেখতে পাই ভক্ত উপেন্দ্রনাথ তাঁর পত্রিকা এবং প্রকাশনের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচার করে যাচ্ছেন প্রবল উৎসাহে। সাধারণ বাঙালীর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে উপেন্দ্রনাথের বসুমতীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।"

উপেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের বিখ্যাত আধ্যাত্মিক শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন না, একথা স্বীকার্য। শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে উপেন্দ্রনাথের উল্লেখ মাত্র একবার পাওয়া গিয়েছে। শোনা যায় কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শেষ অসুখের সময়ে যখন 'আত্মপ্রকাশে ভক্তদের অভয়দান' করেছিলেন (যা এখন শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু-ভাব নামে সুপরিচিত) তখন সেখানে উপেন্দ্র-নাথ উপস্থিত ছিলেন। উপেন্দ্রনাথ-পত্নীর স্মৃতিকথায় (শ্রীমতী রানী চন্দ-সংগৃহীত) উপেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের স্নেহের কথা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে তাঁকে দাহ করতে যাঁরা নিয়ে যান, তাঁদের মধ্যে উপেন্দ্র-নাথ ছিলেন এবং ফেরার পথে বিষাক্তসর্পদষ্ট হয়েও আশ্চর্যভাবে পরিত্রাণ পান।

ভাবাদর্শে উপেন্দ্রনাথ কিন্তু সম্পূর্ণ বিবেকা-

নন্দ-সমর্থক ছিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে তাঁর দেহাস্থি সংরক্ষণের ব্যাপারে, এবং তাঁর জীবন ও বাণী প্রচারের পদ্ধতি সম্বন্ধে ভক্তদের মধ্যে মতবিরোধ হয়। এক দিকের নেতা ছিলেন বৈষ্ণবপন্থী গৃহী ডাঃ রাম দত্ত, অন্য পক্ষে অদ্বৈতপন্থী সন্ন্যাসী নরেন্দ্রনাথ দত্ত। রাম দত্ত চেয়েছিলেন, কাঁকুড়গাছিতে তাঁর বাগানে দেহাস্থি সংরক্ষণ করা হোক; সন্ন্যাসী শিষ্যদের অভিপ্রায় ছিল গঙ্গাতীরে কোনো স্থানে তাকে স্থাপনা করবেন। রাম দত্তের ইচ্ছাই তখন কার্যকরী হয়েছিল, কারণ গৃহত্যাগী নিঃসম্বল সন্ন্যাসী যুবকদের ইচ্ছানুরূপ সামর্থ্য ছিল না। উপেন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে রাম দত্তেরই সমর্থক, 'ভক্ত মনোমোহন' গ্রন্থ থেকে তা পাই।

এ-ব্যাপারেই শুধু নয়, রাম দত্ত যখন শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব প্রচার আরম্ভ করেন প্রকাশ্য বক্তৃতায় ও কীর্তনাদির দ্বারা (১৮৮৭-১৮৯৩) তখনো উপেন্দ্রনাথ আরও কয়েকজনের সঙ্গে রাম দত্তের সহায়তা করেন প্রবল উৎসাহে, একথা পেয়েছি তত্ত্বমঞ্জরী পত্রিকায় এবং 'ভক্ত মনোমোহন' গ্রন্থে।

এই সব তথ্য থেকে বুঝতে পারি, স্বামীজীর পক্ষে উপেন্দ্রনাথকে নিজ ভাবপ্রচারে শ্রেষ্ঠ সহায়ক মনে করা সম্ভব ছিল না। ১৮৯৬ াব্দের ২৫শে অগস্ট সাপ্তাহিক বসুমতী ভূমিষ্ঠ হয়েছিল—তা সত্ত্বেও স্বামীজী সংঘ-ভাববাহন একটি বাংলা পত্রিকার জন্য ব্যস্ত ছিলেন সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রথম সংখ্যায় যে 'আত্মনিবেদন' বেরিয়েছিল, তার মধ্যেও লেখা ছিল না শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবপ্রচারের জন্যই এই পত্রিকার জন্ম; সাধারণ একটি সংবাদপত্ররূপেই বসুমতীর আবির্ভাব, এই রকমই ঘোষিত হয়েছিল।[১]

আমাদের বিশ্বাস তার ফল ভালই হয়েছিল, কারণ সংঘ-মুখপত্র নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে প্রচারিত বলে ধরে নেওয়া হয়, সেজন্য পাঠকের অধিক আকর্ষণ ও অধিক বিকর্ষণ দুই-ই তা পায়; কিন্তু দলীয় মুখপত্ররূপে চিহ্নিত নয়, এমন পত্রিকার প্রচারণা স্বচ্ছন্দে পাঠকচিত্তে প্রবেশ করে যায়।

যাইহোক, শোনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—"আমাদের নরেন আর উপেন প্রচারের কাজ করবে। নরেন লেকচার দেবে, উপেন ছাপাখানা করবে।"[২] আরও শোনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ উপেন্দ্রের বটতলার ছোট বইয়ের দোকানে গিয়েছিলেন। দোকানের দরজা ছোট, নীচু। বিব্রত উপেন্দ্রনাথকে সান্ত্বনা দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'যা, তোর দরজা বড় হবে।'[৩]

বটতলায় একখানি 'ছোট কেতাবের দোকান' করে উপেন্দ্রনাথের যাত্রারম্ভ। ১৮৮০ (১৮৮১?) খ্রীষ্টাব্দে ঐ দোকানের পত্তন। উপেন্দ্রনাথ অতীব সাহসের সঙ্গে সৎসাহিত্য প্রচারের পরিকল্পনা করেন, যা ভবিষ্যতে বাংলার সংস্কৃতিজীবনে তাঁর ভূমিকাকে গৌরবান্বিত করবে। তিনি অত্যন্ত অল্প মূল্যে বাংলা,

১ 'আত্মনিবেদনে'র অংশ: "সংবাদপত্রের আলোচ্য বিষয় রাজনীতিও ইহাতে :থাকিবে, দেশের অভাব-অভিযোগাদির কথাও থাকিবে। তদ্ভিন্ন ইতিহাস, দেশ-নগরাদির বিবরণ, চাষবাসের কথা, ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা, হিন্দুর পুরাতন মহিমার কথা, ধর্মশাস্ত্রাদির কথা, উপন্যাস, রঙ্গরহস্য প্রভৃতি সুখপাঠ্য বিষয় থাকিবে। অন্নপ্রাণ বাঙালী অবসন্ন প্রাণে যাহাতে দুটো সুখের কথা, দুটো অর্থের কথা, দুটো উপায়ের কথা, দুটো আশার কথা, দুটো হাসির কথা, পড়িতে পায়, বসুমতীতে প্রধানতঃ তাহারই চেষ্টা করা যাইবে।"

(বসুমতী স্মারক গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 'বসুমতীর ইতিকথা')

২ প্রাণতোষ ঘটক-লিখিত 'জয়তু দৈনিক বসুমতী' রচনা। (বসুমতী স্মারক গ্রন্থ)

৩ *Seven Gates of Wisdom*—দিলীপ দাশগুপ্তের প্রবন্ধ। (ঐ)

সংস্কৃত ও বিদেশী সাহিত্যের (অনুবাদে) প্রচারের ব্যবস্থা করেন।[৪]

উপেন্দ্রনাথ এতেই সন্তুষ্ট থাকেননি। পত্রপত্রিকা প্রকাশে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। প্রথম পর্যায়ে তাঁর এই বিষয়ে প্রচেষ্টা সম্বন্ধে 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি জানিয়েছেন, 'সাহিত্য' পত্রিকার প্রবর্তন উপেন্দ্রনাথই করেন। "উপেন্দ্রবাবুর সহিত 'সাহিত্যে'র ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ১২৯৬ (১৮৮৯) সালে উপেন্দ্রনাথ ৩নং বিডন স্কোয়ার হইতে 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' নামে একখানি মাসিকপত্রের প্রচার করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় 'সাহিত্য কল্পদ্রুমের' সম্পাদক ছিলেন। ১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসে 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' প্রকাশিত হয়। শিবপ্রসন্নবাবু চারি পাঁচ মাস 'সাহিত্য কল্পদ্রুমের' সম্পাদক ছিলেন। তাহার পর তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন। বোধ হয়, অগ্রহায়ণ মাসে 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' আমার চোখে পড়ে এবং আমি উপেন্দ্রবাবুর সাহিত্যে পরিচিত হই। উপেন্দ্রবাবুর অনুরোধে পাটনা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল, আমার অগ্রজ-তুল্য সুহৃৎ মথুরানাথ সিংহের প্রেরণায়, আমি 'সাহিত্য কল্পদ্রুমে'র সম্পাদকের পদ গ্রহণ করি। আমার সহিত 'কল্পদ্রুমের' কোনও আর্থিক সম্বন্ধ ছিল না।...চৈত্র মাসে প্রথম খণ্ড শেষ করিয়া আমি বৈশাখ হইতে বর্ষ গণনার ও নাম পরিবর্তনের ব্যবস্থা করি এবং 'কল্পদ্রুম' বর্জন করিয়া 'সাহিত্য' নাম রাখি। কিন্তু ডাকঘরে 'সাহিত্য কল্পদ্রুমে'র নামে স্ট্যাম্পের টাকা জমা ছিল। এই জমা (জমার জন্য) প্রথম তিন মাস 'সাহিত্যে'র মলাটে 'সাহিত্য কল্পদ্রুমে'র নামও রাখিতে হইয়াছিল। ১২৯৭ সালেও উপেন্দ্রবাবু 'সাহিত্যে'র স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ১২৯৭ সালের শেষভাগে উপেন্দ্রবাবু 'সাহিত্যে'র স্বত্ব ও স্বামিত্ব ত্যাগ করেন। আমি ১২৯৮ সাল হইতে 'সাহিত্যে'র স্বত্বাধিকারী হই। আমাকে 'সাহিত্য' দিবার পর বোধ হয় ১২৯৮ সালে উপেন্দ্রবাবু আবার 'সাহিত্য কল্পদ্রুমে'র প্রচার করিয়াছিলেন। সে পর্যায়ে সাহিত্য পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক ব্যোমকেশ মুস্তফী 'সাহিত্য কল্পদ্রুমে'র সম্পাদক হইয়াছিলেন। অল্পকাল পরে উপেন্দ্রবাবু 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' বন্ধ করিয়া দেন।" সমাজপতি জানিয়েছেন, জীবনের শেষ পর্যন্ত উপেন্দ্রনাথ 'সাহিত্যে'র প্রতি প্রীতি বজায় রেখেছিলেন, এবং তার বিপদের দিনে সাহায্য করেছেন।

'সাহিত্য কল্পদ্রুম' ও 'সাহিত্যের' প্রবর্তন হয়েছিল বিশেষ সামাজিক প্রয়োজনে। বাংলা দেশে এইকালে প্রধান সাময়িক পত্রিকাগুলি

---

৪ এ সম্বন্ধে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন—"তিনি যখন সাহিত্যপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন বাংলায় এত পুস্তক প্রচারিত হয় নাই। তখন মধুসূদন 'মহীর পদে মহানিদ্রাগত', বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা তখন মধ্যগগনে জ্যোতিঃ বিস্তার করিতেছে, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র বঙ্গদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় কেবল অরুণবিকাশ সূচনা। তখনও 'বটতলা' বাংলার পুরাতন সাহিত্যের দ্বারপাল; পরিষদের কল্পনা তখনও বিকশিত হয় নাই। সেই সময়ে উপেন্দ্রনাথ সাহিত্যপ্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন। তাহার পরিণতি বসুমতী সাহিত্যমন্দিরে। এই সাহিত্যমন্দির হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থগুলি নামমাত্র মূল্যে বাঙালীর গৃহে গৃহে বিরাজিত হইয়াছে। সেই মন্দির হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, টেকচাঁদের গ্রন্থাবলী, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের গ্রন্থসমূহ, সঞ্জীবচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রভৃতি প্রচারিত হইয়াছে। এই সাহিত্য-প্রচারই বোধহয় তাঁহার নিয়তিনির্দিষ্ট কার্য ছিল।...... পরমহংস রামকৃষ্ণের শিষ্যদিগের মধ্যে এক এক জন এক এক দিকে দিক্‌পাল। এক এক জন এক এক দিকে কাজ করিয়া গিয়াছেন। বিবেকানন্দের মত উপেন্দ্রনাথও এক বিভাগে কার্যের ভার লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।"

সংস্কারবাদী ও ব্রাহ্মদের করায়ত্ত। তার ফলে হিন্দু ঐতিহ্যবাদীরা যথেষ্ট পরিমাণে নিজ বক্তব্য তুলে ধরতে পারতেন না। সেই অসুবিধা দূর করার জন্য প্রথমে উপেন্দ্রনাথ, পরে সমাজপতি এগিয়ে এসেছিলেন। এ বিষয়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৭ চৈত্র, ১৩২৫ সালে দৈনিক বসুমতীতে লিখেছিলেন : "যে 'সাহিত্য' আজ সমাজপতির সম্পাদকত্বে সর্বত্র সমাদৃত, উপেন্দ্রনাথ তাহার প্রবর্তক। তখন বাংলায় উৎকৃষ্ট মাসিকপত্রের অভাব ছিল—বিশেষ সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাহেতু তখনকার মাসিকপত্রগুলি সম্প্রদায়বিশেষরই রচনায় সমৃদ্ধ হইত—নূতন লেখকদিগের প্রতিভা সাহিত্যে প্রযুক্ত হইবার অবসর পাইত না। সেই অভাব দূর করিবার জন্য 'সাহিত্যে'র প্রচার—উপেন্দ্রনাথ তাহার প্রবর্তক, সমাজপতি তাহার সম্পাদক।" সংবাদপত্র-জগতে উপেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব সম্বন্ধে চূড়ান্ত কথা হেমেন্দ্রপ্রসাদ অতঃপর লিখেছেন : "একসময়ে 'বঙ্গবাসী'র যোগেন্দ্র, 'হিতবাদী'র কাব্য-বিশারদ ও 'বসুমতী'র উপেন্দ্রনাথ বাংলার শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রত্রয়ের পরিচালক ছিলেন,—উপেন্দ্রনাথ তাঁহাদের শেষ।"

আগেই বলা হয়েছে, নরেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথের মধ্যে বাল্যাবধি পরিচয়। সে পরিচয়ের অল্প হলেও অন্তরঙ্গ ছবি দিয়েছেন উপেন্দ্রনাথ-পত্নী তাঁর স্মৃতিকথনে (রাণী চন্দের 'পূর্ণকুম্ভ' গ্রন্থে)। মামার বাড়িতে মানুষ দরিদ্র বালক উপেনের প্রতি কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের নয়, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকেরই গভীর স্নেহ-সহানুভূতি ছিল। এবিষয়ে মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন :

"উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামে জনৈক ব্রাহ্মণকুমার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইতেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট 'আমার অর্থ হউক' এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কাশীপুর বাগানের শেষ সময় বা শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের দেহত্যাগের পর যোগেন মহারাজ (স্বামী যোগানন্দ) চৌদ্দ টাকা দিয়া একটি পুরাতন হ্যাণ্ড প্রেস (যাহার কাঠ মাত্র অবশেষ ছিল) কিনিয়া উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে দেন। তারপর তিনি চিৎপুর রোডে বটতলায় একখানি ছোট দোকান করেন।[৫] যোগেন মহারাজ সেই দোকানের সামনে দিয়া যাইলে উপেন মুখোপাধ্যায় আসিয়া প্রণাম করিতেন ও বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি দেখাইতেন। ১৮৯০ সালে উপেন মুখোপাধ্যায় বিডন উদ্যানের পূর্বদিকের রাস্তাটির দক্ষিণ কোণে একখানি বাড়ি ভাড়া লইয়া একটি ছাপাখানা স্থাপন করিলেন, এবং

৫ দোকানটি বোধহয় কিছু আগেই হয়েছিল, সম্ভবতঃ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে। মাসিক বসুমতী স্মারক গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্য যদি সত্য হয়, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ দোকানে গিয়েছিলেন—নিশ্চয়ই তিনি শেষ অসুখের আগেই গেছেন। আগে বটতলায় দোকান, তারপরে সেখানে প্রেস—এমন হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ উপেন্দ্রনাথের দোকানে সত্যই গিয়েছিলেন কিনা সন্দেহের বিষয়। বসুমতী স্মারক গ্রন্থে দিলীপ দাশগুপ্ত লিখেছেন, তিনি গিয়েছিলেন, কিন্তু ঐ গ্রন্থের মূল সম্পাদকীয়ের ('লহ প্রণাম') বিবরণ অন্য-প্রকার: "দৈনিক বসুমতী তখনও প্রকাশিত হয়নি। সাপ্তাহিকও না। উপেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বসুমতী সাহিত্য-মন্দির তখন রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি ক্লাসিক্যাল ধর্মগ্রন্থ থেকে শুরু করে প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনাবলী সুলভে প্রকাশ করে সুধীসমাজে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।... বিরাট চাহিদা মেটাতে হিমসিম খান উপেন্দ্রনাথ। ছোট্ট প্রেস, সময়মত বই ছেপে বার করার ভীষণ সমস্যা। ছোট্ট বাড়ি, ছাপা বই রাখবার স্থান সঙ্কুলান হয় না।... দৈনিক বিক্রি হাজার-বারশো টাকার মত, সে যুগে এক অকল্পনীয় ঘটনা। কিন্তু ঋণও অনেক।... হাতে প্রয়োজনমত টাকা জমে না। বড় বাড়ি, বড় প্রেস স্বপ্নেই থেকে যায়। শেষে একদিন কথায় কথায় এই সমস্যার কথা নিবেদন করলেন উপেন্দ্রনাথ গুরুদেব রামকৃষ্ণের কাছে। সব শুনে সস্নেহে ঠাকুর বললেন—"উপীন, যা তোর দরজা বড় হবে।"

সময় পাইলেই নরেন্দ্রনাথ ও যোগেন মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন ও সর্ব-বিষয়ে পরামর্শ লইতেন। তখন তিনি নরেন্দ্রনাথ ও যোগেন মহারাজের নিতান্ত অনুগত এবং রামতনু বসুর গলির বাড়িতে প্রায় সন্ধ্যার সময় আসিতেন। পুস্তক ছাপিবার বিষয় নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে উপাদান দিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথের উপদেশ অনুসারে তিনি 'রাজভাষা' নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন এবং তাঁহার বিশেষ অর্থাগম হয়।[6] নরেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে তাঁহার ছাপাখানার বাড়িতে যাইতেন।"[7] ('শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী', প্রথম খণ্ড)

১৮৮০-৮১ থেকে ১৮৯০-৯১ পর্যন্ত সময়ে নরেন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথের পুস্তকব্যবসায়ে কত-খানি সাহায্য করেছিলেন, তার পরিমাণ নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে সাহায্যের পরিমাণ যে সবিশেষ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এইকালে নরেন্দ্রনাথ ও যোগেন স্বামীর কাছে পরামর্শ নিতে উপেন্দ্রনাথ প্রায়ই আসতেন, এবং ঐ দুজনে উপেন্দ্রনাথের বিডন স্ট্রীটের দোকানে প্রায়ই যেতেন, এই প্রয়োজনীয় সংবাদ মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা থেকে পেয়েছি। নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব ছিল অবিসংবাদিত, তাঁর পরামর্শকে বন্ধুবান্ধবেরা মান্য করতেন; এবং বিস্ময়কর হলেও সত্য,—নরেন্দ্রনাথের বাস্তব বুদ্ধি ছিল অসাধারণ, বৈষয়িক পরামর্শ দিতে পারতেন, দিতেনও সহজ খুশিতে, অবশ্য নিজের জন্য সে বিষয়বুদ্ধি প্রয়োগ করা তাঁর হয়ে ওঠেনি, কারণ ঈশ্বর তাঁকে বিষয়াসক্তি দেননি। 'রাজভাষা' গ্রন্থের পরিকল্পনা নরেন্দ্রনাথেরই, মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন, এই বইটির আর্থিক সাফল্য, যতদূর শোনা যায়, উপেন্দ্রনাথকে বহুলাংশে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। উপেন্দ্রের ব্যবসার প্রয়োজনেই নরেন্দ্রনাথ হারবার্ট স্পেনসারের এডুকেশন বইটি অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। এ জাতীয় সাহায্য করতে নরেন্দ্রনাথ অভ্যস্ত ছিলেন। "কোনো দরিদ্র সঙ্গীতপুস্তক-প্রকাশককে তাঁহার পুস্তক বিক্রয়ের সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব সম্বন্ধে একটি প্রকাণ্ড মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছিলেন।"[8]

উপেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টার প্রতি নরেন্দ্রনাথের সহানুভূতির আর একটি প্রমাণ, উপেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত পূর্বোক্ত 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' পত্রিকার একেবারে প্রথম সংখ্যায় তিনি টমাস-আ-কেম্পিসের *Imitation of Christ* গ্রন্থটির অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন 'ঈশা-অনুসরণ' নাম দিয়ে। অনুবাদ-সূচনায় তিনি একটি ভূমিকাও নিজস্বভাবে যোগ করেছিলেন। অনুবাদটি অবশ্য শেষ হয়নি, পাঁচ সংখ্যা মাত্র বেরিয়েছিল, কারণ ঈশা ও ঈশ্বর অনুসরণে নরেন্দ্রনাথ অতঃপর বেরিয়ে পড়েছিলেন।

---

৬ বসুমতী স্মারক গ্রন্থে শ্রীসুধীর বেরা লিখেছেন: "বসুমতী-প্রকাশিত 'রাজভাষা' ইংরেজি শিক্ষার প্রামাণ্য বই হিসাবে স্বীকৃত। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই বইখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন।"

এই বইখানি 'উপেন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখযোগ্য কীর্তি।'

৭ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে (১৮৯০?) উপেন্দ্রনাথ বিডন স্ট্রীটের বাড়িটি কিনে যোগেন মহারাজকে খবর দিতে যান বলরাম বসুর বাড়িতে—সেখানে উপস্থিত মহেন্দ্রনাথ দত্ত সে বিষয়ে লিখেছেন। ঐ বাড়িটি ১৩,০০০ টাকায় কেনা হয়েছিল। "উপেন মুখুজ্জে যোগেন মহারাজকে গুরুর মত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন, তাই আহ্লাদ করিয়া খবরটি দিতে আসিয়াছেন।" ('ঘটনাবলী', ২য়)।

৮ বইটির নাম "সঙ্গীত কল্পতরু"। "শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি.এ. ও শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক সংগৃহীত।" প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র, ১২৯৪ সালে। বইটির ৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা নরেন্দ্রনাথের লেখা; বৈষ্ণবচরণ বসাক প্রথম সংস্করণে জানিয়েছিলেন, সঙ্গীত-সঙ্কলনের কাজ নরেন্দ্রনাথই প্রধানতঃ করেন।

পরিব্রাজক নরেন্দ্রনাথ এর পরে কয়েক বৎসরের মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে পড়বেন। স্বামী বিবেকানন্দ নামক হিন্দু-সন্ন্যাসী যে আসলে রামকৃষ্ণ-শিষ্য নরেন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ নন, একথা রামকৃষ্ণগোষ্ঠীতে ধরা পড়া মাত্র সকলে আনন্দবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন—উপেন্দ্রনাথও তার ভাগ নিয়েছিলেন তা না বললেও চলে। সমস্ত জাতির কৃতজ্ঞতা যখন আমেরিকাস্থ বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে উচ্ছ্বসিত, তখন কিছু ভিন্ন কণ্ঠও শোনা গিয়েছিল। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও তাঁর অনুবর্তীদের কার্যকলাপের কথা এখানে বাদ দিচ্ছি, বিস্ময়ের কথা বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও লেখক (এবং অধ্যাপক) নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (এন. এন. ঘোষ), যিনি অল্প কিছুদিন পরে বিবেকানন্দ-বন্দনায় উচ্চকণ্ঠ হবেন, তিনিও বিরূপ সমালোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। ইনি ছিলেন 'ইণ্ডিয়ান নেশন' নামক সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকার মালিক-সম্পাদক। স্বামীজী চিকাগো ধর্মমহাসভায় নবম দিবসে 'হিন্দুধর্ম' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, সেই প্রবন্ধটিকে এন. ঘোষের কাগজে ধারাবাহিকভাবে আক্রমণ করা হয়। 'হিন্দুধর্ম' রচনাটি, স্বামীজীর শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে পড়ে, একথা সেই সময়েই বহু জন বলেছিলেন। হিন্দু তত্ত্ববিদ্যার অন্যতম অথরিটি বালগঙ্গাধর তিলকের 'মারহাট্টা' পত্রিকায় ঐ রচনাটির প্রশংসা করে বলা হয়েছিল, স্বামীজী 'true principles of Hinduism'-কে যথার্থই প্রকাশ করেছেন; এই 'precious gem' সম্বন্ধে সাধুবাদ অন্যত্রও যথেষ্ট ছিল; ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর রচনা সম্বন্ধে সাধারণভাবে যা বলেছেন, এই লেখাটি সম্বন্ধে তা বিশেষভাবে সত্য: 'We have, what is, not only a gospel to the world at large, but also, to its own children the Charter of the Hindu faith.' এমন একটি লেখাকেই এন. এন. ঘোষ আক্রমণ করতে আরম্ভ করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, হিন্দুধর্মের মত জটিল ধর্মকে কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে কখনই প্রকাশ করা সম্ভব নয়, সুতরাং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য 'not merely inadequate, but is inaccurate, inconsistent, inconclusive.'

এন. ঘোষের লেখার যথেষ্ট প্রতিবাদ হলেও ক্ষতির দিক সম্পূর্ণ দূর হয়নি। হিন্দুধর্মের এই বরেণ্য আচার্যের দ্বারা প্রচারিত মত যে খাঁটি হিন্দুধর্ম নয়, একথা যখন জনৈক সুপরিচিত হিন্দুর দ্বারা লিখিত হল, তখন তার সুযোগ গ্রহণ করতে খ্রীস্টান মিশনারী ও ব্রাহ্মরা দেরী করেননি। তাঁদের বিবেকানন্দ-বিরোধী রচনাসমূহে বহুভাবে এন. ঘোষের রচনাংশ উদ্ধৃত হয়েছিল। এন. ঘোষ অল্প দিনের মধ্যেই বুঝেছিলেন, তিনি কী অন্যায় করেছেন। পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য, কিংবা হঠাৎ-বিখ্যাত ব্যক্তির জারিজুরি ভেঙে দেওয়ার জন্য, কিংবা অন্য কোনো সদভিপ্রায়ে তিনি ঐ লেখাগুলি লিখেছিলেন বলতে পারব না, রচনার কারণ যাই হোক, তিনি পরে দোষ স্বীকার করেছিলেন এবং অনুতপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, স্বামীজীকে বাঙালীরা চিনতে পারেনি—মাদ্রাজীরাই তাঁর প্রতিভার যথার্থ সমাদর করেছে: "We as a people, be it said to our eternal discredit, have never exhibited a faculty for appreciating our own great men."

স্বামীজীর বন্ধু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এন. ঘোষের অযথা আক্রমণের প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি ঠিক কি

লিখেছিলেন, কোথায় তা প্রকাশিত হয়েছিল, আমরা তা জানি না। কিন্তু উপেন্দ্রনাথের প্রতিবাদ এমন জোরালো হয় যে, এন. ঘোষ তার উত্তর দিতে বাধ্য হন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল ইণ্ডিয়ান নেশনে এন. ঘোষ উপেন্দ্রনাথের প্রতিবাদের উত্তরে যা লিখেছিলেন তার কয়েক লাইন উদ্ধৃত করছি :

"Our friend Babu Upendra Nath Mukerjee of Shampukur Street is charming in company but is apt to be fretful in controversy on paper. Our notice of Swami Vivekananda's paper on Hinduism has elicited from him a criticism which is quite needlessly snappish, and, we feel bound to say, is not nearly as acute and coherent as we might expect. He is angry for our calling the name 'Swami Vivekananda' a disguise; but we meant no offence. Every disguise is not dishonest, and a change of name is a disguise. We pass on to his arguments····."

এন. ঘোষ অতঃপর বিস্তৃতভাবে উপেন্দ্রনাথের আপত্তির উত্তর দিয়েছিলেন। উপেন্দ্রনাথের লেখার বিরুদ্ধে তিনি যেসব সমালোচনা করেছেন, সেগুলি ঠিক কি বেঠিক বলা সম্ভব নয়, কারণ উপেন্দ্রনাথের লেখা আমরা পাইনি, কিন্তু এন. ঘোষের লেখা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ঐ প্রতিবাদ তাঁকে যথেষ্ট বিচলিত করেছিল, যার ফলে উত্তর দেবার সময়ে তাঁকে অনেক 'যদি'র উপর নির্ভর করতে হয়।[৯]

অনুপস্থিত বন্ধুর পক্ষসমর্থনে দাঁড়িয়ে মাত্র উপেন্দ্রনাথ বন্ধুকৃত্য করেননি, তিনি বন্ধুর ইচ্ছাপূরণেও এগিয়ে এসেছিলেন। রামকৃষ্ণ-ভাবপ্রচারের জন্য পত্রপত্রিকার প্রকাশে স্বামীজী কতখানি উৎকণ্ঠিত ছিলেন আমরা আগে প্রচুরভাবে দেখে এসেছি। স্বামীজীর ভারতত্যাগের পূর্বে, উপেন্দ্রনাথ যখন বসুমতী সাহিত্যমন্দির স্থাপন করে ফেলেছেন, স্বামীজীর সঙ্গে তখন নিশ্চয় তাঁর পত্রপত্রিকা বিষয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে। স্বামীজী নিশ্চয় তাঁকে প্রচুর উৎসাহ দিয়েছেন। 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' দিয়ে উপেন্দ্রনাথের কার্যারম্ভ, তার প্রথম পরিণত রূপ সাপ্তাহিক বসুমতী। আগেই জানিয়েছি, পত্রিকাটি বেরিয়েছিল ১৮৯৬ সালের অগস্ট মাসে। স্বামীজী তখন কিন্তু বিদেশে। তিনি ভারতে ফেরেন ১৮৯৭ সালের গোড়ায়। অথচ ১৮৯৬ সালের অগস্ট মাসের সাপ্তাহিক বসুমতী প্রাণমন্ত্ররূপে স্বামীজীর প্রদত্ত 'নমো নারায়ণায়' বাণীকে শিরোধার্য করেছিলেন।[১০] দুভাবে তা হওয়া সম্ভবপর ; হয়, স্বামীজী ভারতত্যাগের আগেই মন্ত্রটি লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন, নয়, আমেরিকা থেকে পত্রযোগে বাণীটি পাঠিয়েছিলেন।[১১]

---

৯ এখানে আমরা ধরে নিয়েছি 'শ্যামপুকুরের উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়' বসুমতীর উপেন্দ্রনাথই।

এই সব রচনা গোটাগুটি পাওয়া যাবে প্রকাশিতব্য *Vivekananda in Indian Newspapers* গ্রন্থে।

১০ সাপ্তাহিক বসুমতীর এই কালের ফাইল পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ ঘটক শুধু তার প্রথম সংখ্যাটি পেয়েছিলেন, সেটি তিনি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেন, এবং তার উপর নির্ভর করে ব্রজেন্দ্রনাথ বসুমতী সুবর্ণজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধে কিন্তু স্বামীজী-প্রদত্ত 'নমো নারায়ণায়' বাণীর উল্লেখ নেই। সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রথম সংখ্যাটিও এখন প্রাপ্তব্য নয়, ব্রজেন্দ্রনাথের হঠাৎ মৃত্যুর ফলে তা অদৃশ্য। প্রাণতোষবাবু আমাকে জানিয়ে দেন, 'নমো নারায়ণায়' বাণী ঐ প্রথম সংখ্যাতে ছিল, তাঁর বেশ মনে আছে।

১১ তৃতীয় সম্ভাবনা, প্রাণতোষবাবুর স্মৃতি তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছে—সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রথম সংখ্যাতে ঐ মন্ত্রটি ছিল না ; স্বামীজী ভারতে ফেরার পরে ওটি দেন, এবং পরবর্তীকালে সাপ্তাহিক বসুমতী, ও তারও অনেক পরে দৈনিক বসুমতী সেটি গ্রহণ করে।

স্বামীজী 'নমো নারায়ণায়' মন্ত্রটি কেন দিয়েছিলেন—বসুমতীকে এবং তার পাঠকবৃন্দকে প্রচলিত হিন্দুধর্মমতে 'নারায়ণ'-উপাসক করবার জন্য ? মনে হয় না। স্বামীজীর

কিন্তু বসুমতী-প্রবর্তনে বিবেকানন্দেরই যে মূল প্রেরণা, একথা প্রায়-সমসাময়িক কালের সাংবাদিকশ্রেষ্ঠ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের রচনা থেকে পাই। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি হেমেন্দ্রপ্রসাদের রচনাংশ উদ্ধৃত করেছিলেন তাঁর লেখায় :

"যেদিন তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) দেহত্যাগ করেন, সেদিন উপেন্দ্রনাথ যেরূপে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, সে অতিপ্রাকৃত ঘটনা বটে। গুরু দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার শব জাহ্নবীপুলিনে শ্মশানে আনিয়াছিলেন—পথে উপেন্দ্রনাথ বিষধর-দশন-দষ্ট হইলেন। তিনি নীলবর্ণ হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। সে অবস্থায় কেহ জীবনলাভ করে না। কিন্তু একরূপ বিনা চিকিৎসাতেই উপেন্দ্রনাথ জীবনলাভ করিলেন। যে জীবনের কাজ তখন কেবল আরম্ভ হইয়াছে, সে কাজ সম্পন্ন না করিলে তিনি ত যাইতে পারেন না। ...সেই ভাববিকাশের অন্যতম উপায় 'বসুমতী'। **বিবেকানন্দ যখন তাঁহার গুরুভাই উপেন্দ্রনাথকে পুনঃ পুনঃ সংবাদপত্র প্রচারে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, তখন উপেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'সাহস হয় না'।** তিনি তখন সে কাজের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তিনি তখন বাংলা সাহিত্যের সাধনা করিতেছিলেন তদবধি তিনি একাধিক পত্র প্রচার করেন—নানা কারণে সে সকলের স্থায়িত্ব সম্ভব হয় নাই। তাহার পর বসুমতী প্রচার।"

১৮৯৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সাপ্তাহিক বসুমতী নিশ্চয় যথাসম্ভব রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের সংবাদ প্রকাশ করে গেছে, ধরে নেওয়া যায়। কিছু কিছু সংবাদ অন্য সংবাদপত্রে উদ্ধৃত হয়েছে দেখেছি। ইণ্ডিয়ান মিরারে ৩০ জানুয়ারী, ১৮৯৮ এবং ২৯ মার্চ, ১৮৯৮ তারিখে বসুমতী থেকে বিবেকানন্দ-সংবাদ গৃহীত হয়েছিল।

লাটু মহারাজের সঙ্গে উপেন্দ্রনাথের গভীর প্রীতির সম্পর্ক। উপেন্দ্রনাথ লাটু মহারাজের বহু সেবার ব্যবস্থা করেছিলেন, চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় সংকলিত লাটু মহারাজের স্মৃতি-কথার মধ্যে তার অনেক বিবরণ পাই। সেখান থেকে একটি মর্মস্পর্শী বর্ণনার উল্লেখ করছি, যাতে স্বামীজী, লাটু মহারাজ ও উপেন্দ্রনাথ জড়িত। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস, স্বামীজী পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণ সাঙ্গ করে হঠাৎ মঠে হাজির। কোনো খবর দিয়ে আসেননি। তাঁকে পেয়ে মঠে আনন্দের প্লাবন। লাটু মহারাজ গঙ্গাতীরে ধ্যান করছিলেন। এক ভক্ত ছুটে গিয়ে তাঁকে সংবাদ দিলেন। তাতেও লাটু মহারাজ অচঞ্চল, উল্টোপক্ষে ভক্তটিকে বললেন, 'আরে! বসো বসো! এখানে এখন রাতে একটু ধ্যান করো।'

আহারাদি শেষ করে স্বামীজী লাটু মহারাজের সঙ্গে দেখা করবার জন্য গঙ্গাতীরে এলেন। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরলেন পরম প্রেমে। রাত্রি জ্যোৎস্নাভরা—সুনীল সুন্দর। তার নীচে ভালবাসার পবিত্র দৃশ্য।

"স্বামীজী লাটু মহারাজকে বলিলেন—'হ্যাঁরে! আমি যে অনেকক্ষণ এসেছি। সবাই

নারায়ণ শুধু বৈকুণ্ঠে থাকতেন না, তিনি সর্বজীবের অন্তরশায়ী নারায়ণ। স্বামীজীর সেই অপূর্ব মানবতার বাণী স্মরণ করি : "নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে-ভগবান বিদ্যমান, একমাত্র যে-ভগবানে আমি বিশ্বাসী,—এই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বারবার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি; আর সর্বোপরি আমার উপাস্য পাপী নারায়ণ, তাপী-নারায়ণ, সর্বজাতির দরিদ্র-নারায়ণ।" 'নমো নারায়ণায়' বলে সন্ন্যাসীরা পরস্পরকে সম্বোধন করেন, নমস্কার করেন, তা করেন পরস্পরের অন্তরদেবতাকে লক্ষ্য করেই—এমনই নমস্কারমন্ত্র স্বামীজী বসুমতীকে দিয়েছিলেন।

দেখা করলে, তুই যে বড় এখানে বসে রইলি তোর কি অভিমান হয়েছে?'

"লাটু মহারাজ তাহাতে বলিলেন—'অভিমান আবার কিসের? এখানে হামার মন বসে থাকতে চাইলে, তাই গেলুম না।'

"স্বামীজী বলিলেন—'হাঁারে! শুনলুম তুই ত মঠে থাকতিসনি, এদিক ওদিক বিগড়ে বিগড়ে থাকতিস—তোর চলতো কিসে?'

"তাহার উত্তরে লাটু মহারাজ বলিলেন—'কেনো! ওপেন ঠাকুর (উপেন্দ্রনাথ) সাহায্য করতো। যেদিন কুছু জুটতো না, সেদিন তার দোকানের সামনে দাঁড়ালেই সে বুঝতে পারতো—সিকিটা, দুয়ানীটা দিয়ে দিতো।'

"এই কথা শুনিয়া স্বামীজী ঊর্ধ্বমুখ হইয়া বলিলেন—'ঠাকুর! উপেনের কল্যাণ করুন।'

শেষে একটি মূল্যবান তথ্য দিচ্ছি। ১৮৯৭ সালের গোড়ায় স্বামীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করার পরে বসুমতী-সম্পাদক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের কথোপকথন বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বসুমতীর ফাইল না পাওয়ায় কথোপকথনের সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু আমাদের জানা নেই। সুখের বিষয় নব্যভারত পত্রিকায় মধুসূদন সরকার একটি প্রবন্ধে ঐ কথোপকথন থেকে খানিক অংশ উদ্ধৃত করেছেন, সেইটুকু আমরা পাঠককে উপহার দিচ্ছি। পাঠকগণ লক্ষ্য করবেন, বসুমতী-সম্পাদকের সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে স্বামীজী সমাজ-সমস্যার কয়েকটি দিক সম্বন্ধে যে-সকল মন্তব্য করেছিলেন, তার মধ্যে কি ধরনের গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রগতিশীল মনোভাব ফুটে উঠেছিল। হিন্দুসমাজের বর্ণগত অসাম্যের বিরুদ্ধে, দেখা যাবে, স্বামীজীর মনোভাব কী দারুণ কঠোর! সংস্কারকশ্রেষ্ঠ রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্যে স্বামীজীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধানিবেদনও লক্ষণীয়। স্বামীজীর মতে, রামমোহনের অনুবর্তীরা তাঁর আদর্শ গ্রহণ করেননি। বাংলা দেশে মুসলমান-প্রাধান্যের কারণ স্বামীজী ঐ আলোচনায় তীক্ষ্ণ সত্যবাদিতার সঙ্গে খুলে ধরেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান চরিত্রচিত্রণের ব্যাপারে বাঙালী হিন্দু লেখকদের অনুচিত আচরণ সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্যও কৌতূহলের সৃষ্টি করবে, অন্তত: সেই যুগে করেছিল, এবং ব্রাহ্ম-মতানুবর্তী নব্যভারত পত্রিকায় বসুমতীতে প্রকাশিত ঐ কথোপকথনটির উপর নির্ভর করে সমাজ-সমস্যামূলক একটি প্রবন্ধ রচনা করতে উৎসাহিত হয়েছিলেন পূর্বোক্ত মধুসূদন সরকার। তাঁর প্রবন্ধে কথোপকথনটির উদ্ধৃত অংশ:

"প্রশ্ন। ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম এখনো আছে কেন?

উত্তর। দুই কারণে। খ্রীষ্টধর্ম যেরূপ প্রকৃতির উপযোগী, সেইরূপ সরল বিশ্বাসী অনেক মহাত্মা আছেন বলিয়া এবং উহা পৈতৃক ধর্ম বলিয়া। (যেমন) এখানে আজকালকার অশাস্ত্রীয় ছুঁই ছুঁই ধর্ম—শাস্ত্রীয় ধর্মবোধে, সরল বিশ্বাসে এক শ্রেণীর লোক তদনুরূপ অনুষ্ঠান করে। অপর শ্রেণী ইহা না মানিলেও পৈতৃক আচার বলিয়া রক্ষা করে মাত্র।

প্র। আগে কি এইরূপ ছুঁই ছুঁই ভাব ছিল না?

উ। না। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি আধুনিক পুরাণ পর্যন্ত পাঠ করিয়া দেখুন, শাস্ত্রে কুত্রাপি এমন পাইবেন না যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই ত্রিবর্ণের মধ্যে পরস্পরের স্পৃষ্ট অন্নাহার সম্বন্ধীয় কোনো বাধা ছিল।

শুদ্ধ তাহা নহে, পূর্বে দ্বিজবর্ণের পাচক শূদ্রই ছিল। এখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করেন না। আপনারা কি মনে করেন, বাঙ্গালার এত লোক মুসলমান হইয়াছিল কেবল তরবারির জোরে? বাঙালী, মুসলমান জাতিকে সকল নাটকের বদমাইসের স্থানীয় করিয়া মুসলমান-চিত্র বড়ই বিকৃত করিয়া আঁকিয়াছে। মুসলমানের সদ্বংশ বাঙালী আদৌ দেখিতে পায় না। মুসলমানধর্ম হিন্দু-ধর্মের ইতর শ্রেণীর পক্ষে জুড়াইবার আশ্রয়স্থান-স্বরূপ হইয়াছিল বলিয়া এত মুসলমান হইয়া-ছিল। আমি দেখিয়াছি, মাদ্রাজে ব্রাহ্মণ যে-পথে যান, চণ্ডাল সেই পথে যাইতে পায় না; কিন্তু চণ্ডাল খ্রীষ্টান হইলে অবাধে সেই পথে চলিতে পারে।

প্র। যে হিন্দুধর্মে অদ্বৈতবাদ রহিয়াছে, সে হিন্দুধর্মে এত ছুঁই-ছুঁই ভাব কেন?

উ। খ্রীষ্টধর্মের স্রোত আমাদের জাতীয়তা নাশ করিতেছিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সেই জাতীয়তা বজায় রাখিয়া তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই মহান উদ্দেশ্য সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জনকয়েক লোক পাশ্চাত্য মতপ্রচার দ্বারা আমাদিগকে জাতীয়তাশূন্য করিতে প্রয়াসী হইতেছিল; এখনো দুই-একজন করিতেছে। ইহারই বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া এখন চলিতেছে। এই ভাব নষ্ট করিবার জন্য কয়েক বর্ষ ধরিয়া এক বিপুল আন্দোলন-স্রোত চলিতেছে। তাহাতে শাস্ত্রীয় তত্ত্বপ্রচারের সঙ্গে স্থানীয় আচারপ্রসূত জাতিবিদ্বেষও প্রচারিত হইতেছে। তাই আপনি এ সময়ে এই ছুঁই-ছুঁই ভাবের এত প্রাধান্য দেখিতেছেন।[১২] এখনও ঠিক সাম্যাবস্থা হয় নাই। আমাদের পরেই যে বংশাবলী আসিতেছে, তাহারা ঠিক শাস্ত্রীয় পন্থার অনুসরণ করিবে। তখন আর ছুঁই-ছুঁই ভাব থাকিবে না, অথচ সকলে পূর্ণ হিন্দু-হৃদয় লাভ করিবে। এই প্রতিক্রিয়া না থাকিলে আমরা এতদিনে জাতীয়তা হারাইতাম।

প্র। সকল বর্ণের কি সন্ন্যাসে অধিকার আছে?

উ। আছে।"

এই কথোপকথন সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে মধুসূদন সরকার স্বামীজীর মুক্ত দৃষ্টির উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন: "এ দেশের সমস্ত হিন্দু জাতির অবস্থাজ্ঞান ও তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্যক জ্ঞান যে বক্তার হৃদয়কন্দরে লুক্কায়িত, তাহা অনুভূত হইতেছে। সার্বভৌম হিন্দুধর্ম-প্রচারকের ভিন্ন এরূপ সমুদয় অবস্থা-জ্ঞান আর কাহার নিকট আশা করা যাইতে পারে?" বঙ্গীয় মুসলমানদের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্যের জন্য তাঁকে সাধুবাদ দিয়ে লেখক বলেছেন "তাহা আরও তত্ত্বশালিনী ও হৃদয়গ্রাহিণী।" লেখক আরও অগ্রসর হয়ে প্রশ্ন করেছেন: "স্বামীজী কি এই সকল পৌরাণিক হিন্দুকে হিন্দুধর্মের ক্রোড়ে পুনরানীত করিবার জন্য বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজকে উৎসাহিত করিবেন?" কায়স্থ সমাজকে উৎসাহিত করাতে বলার কারণ "কায়স্থ জাতিই দীর্ঘকাল সমাজ-সংস্কারে অগ্রণী", এবং স্বামীজী "কায়স্থকুলের রত্ন"। স্বামীজীর মত,

১২ স্বামীজীর কথা ঠিকভাবে রিপোর্ট করা হয়েছিল কিনা সন্দেহ আছে। এখানে সে বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

উক্ত লেখকও, ধরে নেওয়া যায় কায়স্থকুলের সন্তান। সুতরাং সহজেই তিনি স্বামীজীকে জড়িয়ে কায়স্থ সমাজের গুণগান করেছেন: "স্বামীজী যে-বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন কর্মই তাহাদের ধর্ম।···সমাজসংস্কারের জন্য এই ক্ষত্র বা কায়স্থানুরূপ মধ্যবর্তী জাতিই প্রসিদ্ধ। পুরাণে যে-সকল অবতারের কল্পনা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে এক পরশুরাম ভিন্ন সকলেই বিবেকানন্দের বর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।··· নিম্নশ্রেণীকে উন্নত করিয়া, উচ্চশ্রেণীকে সংযত করিয়া, নিজে নম্র হইয়া, সমাজকে সাম্যাবস্থায় আনয়নপূর্বক নববলে বলীয়ান করার ভার বিধাতা কায়স্থাদি মধ্যবর্তী জাতির উপরই ন্যস্ত করিয়াছেন।···স্বামীজী স্বয়ং ইহার উদাহরণস্থল।" লেখক সবশেষে ভরসা করেছিলেন, বিবেকানন্দকে অবলম্বন করে জাতীয় জাগরণ ঘটবে: "তাঁহার হৃদয় যেমন প্রশস্ত, চিন্তা যেরূপ সর্বত্র-প্রসারিণী, যদি কার্যকারিণী শক্তি সেরূপ বিকশিত হয়, বা অন্যত্র হইতে আসিয়া জোটে, তবেই বঙ্গে প্রকৃত সমাজসংস্কারকের পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে

রামকৃষ্ণ-আন্দোলনে উপেন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর বন্ধু ও গুণগ্রাহী, সুবিখ্যাত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির রচনাংশ উদ্ধৃত করে এই প্রসঙ্গ শেষ করছি। এটি তিনি উপেন্দ্রনাথের দেহত্যাগের পরে ১৮ চৈত্র, ১৩২৫-এ দৈনিক বসুমতীর জন্য লিখেছিলেন:

"বাংলার বিখ্যাত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্ব-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত-অপরিচিতের ও বসুমতীর উপেন মুখুজ্জে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণাশ্রিত ও তদীয় ভক্তমণ্ডলীর চিরপ্রিয় উপেন,···ধর্মপ্রাণ, ধর্মনিষ্ঠ, রামকৃষ্ণ-চরণ-কমলের মধুমত্ত মত্ত ভৃঙ্গ উপেন অন্তিমে তাঁহারই নামকীর্তন শুনিতে শুনিতে সেই চিরবাঞ্ছিত পদারবিন্দে শান্তি ও নিবৃত্তি লাভ করিলেন।···

"কৈশোরে উপেন্দ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশ্রয়ে ধন্য হইয়াছিলেন। জ্ঞানে ও অজ্ঞানে সেই দেবতার পূজাই তাঁহার জাবনের বিশেষত্ব। 'তস্য প্রিয়কার্যসাধনম্' যদি 'তদুপাসনম্' হয়, তাহা হইলে ভক্ত গৃহী উপেন্দ্রনাথ চিরজীবন তাঁহারই উপাসনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বাংলায় অবতীর্ণ হইয়া বাঙালীকে যে মুক্তিমন্ত্র দান করিয়া গিয়াছেন, ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পাত্রে বিভিন্ন রূপে তাহা সপ্রকাশ। উপেন্দ্রনাথের ঐহিক কর্মেও সেই দেবতার আশীর্বাদ পরিস্ফুট হইয়াছিল। ধর্মজীবনের উপযোগী কর্মজীবন গঠন করিবার জন্য স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ গৌড়ভূমির উর্বর ক্ষেত্রে যে লোকশিক্ষার বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাঁহার ধর্মভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ ললাটের স্বেদে সেই বীজে জলসেচ করিয়াছেন। ইহাই ত 'তদুপাসনম্।'

"উপেন্দ্রনাথের কর্মসূচনা ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র। সাংসারিক প্রয়োজনে তাহার সৃষ্টি; ঐহিক ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার পুষ্টি; আপাতদৃষ্টিতে তাহা সংসারীর খেলাঘর বটে। কিন্তু এই ঐহিক কর্মের সিকতাবিস্তারের অন্তস্তলে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত যে প্রবাহিণী বহিয়া গিয়াছে, তাহা সেই রামকৃষ্ণ-ভক্তির মন্দাকিনী; বাংলা দেশে তাহা জ্ঞানের, ভাবের অমৃত বিতরণ করিয়াছে।

"উপেন্দ্রনাথ সংকল্প করিয়া, লক্ষ্য নির্ণয় করিয়া, নবভাবের নূতন উচ্ছ্বাস বাংলার

গ্রামে গ্রামে বিতরণ করিবার জন্য বটতলায় সেই ছোট কেতাবের দোকানখানির পত্তন করিয়াছিলেন, তাহার পর সেই ক্ষুদ্র সূচনা বসুমতীর বর্তমান সাফল্যে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল, প্রতিষ্ঠাতার গুরুমন্ত্রপ্রচারে সহায় হইয়াছিল…

"বসুমতীর একজন প্রিণ্টার ৺রাধিকাপ্রসাদ একদিন বলিয়াছিলেন, 'এটা বসুমতীর অফিস নয়, রামকৃষ্ণের সদাব্রত।' ইহা সত্য। উপেন্দ্রনাথ এই সদাব্রতের ভাণ্ডারী ছিলেন। এই সদাব্রত হইতে ভাঁড়ারী উপেন্দ্রনাথ লক্ষ লক্ষ পুঁথি প্রচার করিয়া বাঙালীকে মনের খোরাক জোগাইয়াছেন।…

"বসুমতীর প্রবর্তক হইতে নিম্নপর্যায়ের সেবক পর্যন্ত সকলেই রামকৃষ্ণভক্ত। এ সমবায় আপনি গড়িয়া উঠিয়াছে। উপেন্দ্রনাথ বাছিয়া বাছিয়া এ ভক্তমণ্ডলীর গঠন করেন নাই। তিনি গুরুর কৃপায় যাহার সূচনা করিয়াছিলেন, তাহাই রামকৃষ্ণ-পরিবারে পরিণত হইয়াছিল।"

হাউই

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

পৃথিবীর প্রাসাদে প্রাসাদে খুঁজে খুঁজে ফিরিলাম
নেতাদের নাম।
তারা কি অনেক জন চাঁদ তারা সূর্যের মতন
আলোকের দেহময় কখনো নেভে না,
সে আলো-কে তেল বাতি সলিতায় বাড়ানো যায় না,
কড়ি দিয়ে যায় নাকো কেনা,
সে আলোর সবখানে যাওয়া আসা আছে,
শিশুর হাসির মতো হাসে সব ঘরে,
ফুলের মতন ফোটে গাছে ?

হেরিলাম উঠিয়াছে ছুটিয়াছে জ্বলিতেছে নিভিতেছে
আকাশেতে অনেক হাউই।
তারপর হে পৃথিবী, তোমার মুখের 'পরে
নেমে আসে মুঠো মুঠো ছাই।
মুঠো মুঠো ছাই-ই শুধুই।

গান্ধীজী ঃ বেদান্তের ধ্যানমূর্তি

শ্রীমনকুমার সেন

বেদ-বেদান্তের সারাৎসার, মানুষের ধর্ম-কর্মের এক অভাবনীয় ভাবরূপ হচ্ছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। এই ভাবকে আশ্রয় করেই বিপ্লবী যৌবনের মূর্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ স্পর্শ করেছিলেন ভারতের অন্তরাত্মাকে, নাড়া দিয়েছিলেন গোটা জগৎকে। আনুষ্ঠানিক নানামুখী ধর্মের সংঘাতকে গভীর অধ্যাত্মবোধের অগ্নিতে শুদ্ধ করে, সাম্প্রদায়িক ধর্মকে সর্বজনীন অধ্যাত্মবাদে উন্নীত করে শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মজগতে যে নিঃশব্দ বিপ্লব এনেছেন, আজও বোধ করি তার ঠিক ঠিক মূল্যাঙ্কন করা হয়নি। হলে দেখা যাবে সব পথ এক রাজপথে এসে কী অপূর্বভাবে মিলে গেছে, মিশে গেছে! 'ধারণ' অর্থে যদি 'ধর্ম' হয়,—নিছক মঠ, মসজিদ, গির্জার অনুষ্ঠান না হয়,—তাহলে মানুষের স্মরণীয় ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধারক।

এই অনন্য, শ্রুতকীর্তি, আধ্যাত্মিকতার ভাবঘনমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য হচ্ছেন বিবেকানন্দ—মাত্র এই তথ্যটুকু মনে রাখলেই বোঝা যাবে স্বামীজী কী ধাতুতে গড়া ছিলেন। যদি এক বিবেকানন্দ জগতের চিন্তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে থাকেন, তাহলে এরকম সহস্র বিবেকানন্দের উৎসস্বরূপ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামীজীর সামাজিক অর্থনৈতিক আদর্শকে বা তাঁর সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাঁর নবজীবনের উৎসরূপ, এই বিপুল আধ্যাত্মিক পৃষ্ঠভূমির চিত্রটিকে সামনে রাখা। ঠিক এই কারণেই স্বামীজীর সমাজতন্ত্রের বা নতুনসমাজ-পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা,—আবার আধ্যাত্মিকতারও ব্যবহারিক প্রয়োগনীতি হল সেবা।

এই সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধ থেকেই আশা করি পরিষ্কার হবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা, বা বেদান্তের যে ধ্যান পুণ্যভূমি ভারতকে তথা নবজন্মের বেদনায় অস্থির আধুনিক জগৎকে এক নতুনদিগন্তমুখী করেছে, মহাত্মা গান্ধী সেই ধ্যানেরই এক বিস্ময়কর মূর্তি। বস্তুত: জনজাগরণ ও জননেতৃত্বের জন্য স্বামীজী স্বয়ং 'মহাত্মা'র কল্পনা ও গভীর প্রত্যাশা করেছিলেন,—দীনদরিদ্রের বেদনায় যাঁর হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠবে। আর বীর্যশীল শুদ্ধাত্মা পুরুষের কল্পনা কখনও মিথ্যা হয় না।

কথাটা একটু বেশী কাল্পনিক বা ভাবপ্রবণ শোনাতে পারে, কিন্তু গভীরে তলিয়ে দেখলে আমরা বুঝতে পারব আসলে কল্পনাই বিপ্লব বাস্তবে আমরা স্বভাবতঃই সীমাবদ্ধ, কল্পনায় আমরা অসীম। সত্যিকার বিপ্লবীর চিন্তা এই অসীমের সন্ধানে ও অসীমকে জুড়ে অগ্রসর হয়ে থাকে; অবশ্য 'ব্যবহারিক আদর্শবাদী' রূপে বিচরণের বা প্রত্যহ প্রয়োগের জন্য তাঁর পায়ের তলায় মাটি থাকা চাই: অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত থাকবে দিগন্তের অসীমে, কিন্তু কর্মে তাঁর প্রতিদিনের ছন্দ সঞ্চারিত হবে সীমাবদ্ধ, দৃশ্যমান ক্ষেত্রে।

বিশ্বপথিক বিবেকানন্দেরই একটি ভাবের এক অসামান্য ব্যবহারিক রূপ হচ্ছেন বিশ্বমানব গান্ধীজী। স্বামীজীর কল্পনার, দীন-দুঃখী, বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত মানুষের জন্য অহর্নিশ তাঁর মর্ম-

বেদনার হৃদয়স্পর্শী রূপ হচ্ছেন গান্ধীজী।

কোন বিপ্লবী ভাবনা স্থিতিশীল হতে পারে না, একস্থানে অনড় হয়ে থাকতে পারে না; ঠিক সেই কারণেই 'স্টেটাস্‌কো' বা সমাজের স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে সত্যিকার বিপ্লবীর সংগ্রাম অপরিহার্য। বিবেকানন্দকে যদি বিপ্লবী বলে না ভাবতে পারি তাহলে অন্য কোন বিবেকানন্দের তেমন কোন ভূমিকার কথা আমি ভাবতে পারি না। আধ্যাত্মিকতাকেই যদি বাছাই করতে হয় তাহলে মহীরুহকেই ধরব, মহাসাগরেই অবগাহন করব—যিনি হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, এই আধ্যাত্মিকতারই ব্যবহারিক বিপ্লবী ধ্যান হলেন স্বামী বিবেকানন্দ,—আর স্বামীজীর একটি ধ্যানেরই মূর্তি হলেন মহাত্মা গান্ধী। এই গতিশীলতাই বিপ্লবী চিন্তার পরিচয়পত্র; এবং আমার সংশয়াতীত সিদ্ধান্ত, বেদান্তের এই বৈপ্লবিক ও ব্যবহারিক সম্ভাবনাকে একটি দিকে সত্য করে তুলবার জন্যই গান্ধীজীর আবির্ভাব। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব আবিষ্কারসমূহ আজ যে গতির সৃষ্টি করেছে, তাতে কোন ব্যক্তি বা কোন চিন্তা যদি স্থাণুবৎ একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে চায়, এগিয়ে যেতে না চায়, তাহলে সেই ব্যক্তি বা সেই চিন্তা দাঁড়িয়েও থাকতে পারবে না, পিছিয়ে পড়বে। বিজ্ঞান ও আত্মজ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত স্বামীজী সম্বন্ধে একথা কত বেশী সত্য!

আবার, ঠিক এই সমন্বয়ের দৃষ্টিতেই গান্ধীজী হচ্ছেন স্বামীজীর উত্তরসাধক। ঈশ্বর, সত্য, নীতিধর্ম প্রভৃতি মূল প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে তাঁর আপসহীন দৃঢ়তা,—এ হচ্ছে আত্মজ্ঞানীর পরিচয়; আর এই আত্মজ্ঞানকে ব্যক্তির সীমা ছাড়িয়ে নবজীবনের কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত করবার যে ব্যাকুলতা, সেটি হচ্ছে বিজ্ঞানীর পরিচয়। আত্মজ্ঞান-ভিত্তিক বিজ্ঞানসম্মত নতুন সমাজ রচনার যে-স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বামীজী এবং যার জন্য মাত্র ৩৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালের মধ্যেই দেহ-মন-প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন, গান্ধীজীর জীবন ও সংগ্রামের মধ্যে সেই স্বপ্নই বহুলাংশে সত্য হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রেও সেই মৌলিক কথাটি মনে রাখা দরকার: কোন আদর্শ আদর্শবাদীর জীবদ্দশায় মাত্র আংশিকভাবেই সত্য হয়ে উঠতে পারে; কেননা, আদর্শ যদি ষোলআনা সত্য হয়ে যায় তাহলে তা আর আদর্শ থাকে না: বাস্তবে আমরা তাকে ধরে যত এগুবো, আদর্শ তত দূরে চলে যাবে। এইজন্যই বাস্তবের চেয়েও কল্পনার মাহাত্ম্য বেশী, আবার বাস্তবকে বাদ দিয়ে কল্পনা মাত্র কবি-কল্পনাই হতে পারে, তাতে সমাজ-বিপ্লবের স্পন্দন থাকা অসম্ভব

গান্ধীজী নিজেকে বলতেন 'ব্যবহারিক আদর্শবাদী'। স্বামীজী বলতেন, জীবনে একটি আদর্শকে বেছে নাও এবং দরকার হলে তার জন্য মৃত্যুবরণ কর। এই মন্ত্র গান্ধীজীর জীবনে প্রচণ্ডরূপে সত্য।

এবং যে আদর্শের জন্য তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, তাও গণ্ডীকে অতিক্রম করে। ধর্ম, সম্প্রদায়, সমাজ, এমন কি দেশকেও ছাড়িয়ে তাঁর জীবনাদর্শ বিশ্বাদর্শে পরিণত হয়েছিল। কল্পনায় তিনি যে এক-পৃথিবী ও এক-মানবজাতির রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল একথা ঘোষণা করতে যে, ভারতে যদি এমন কোন স্বাধীনতা আসে যে-স্বাধীনতা বিশ্বশান্তির পরিপন্থী, তিনি তেমন স্বাধীনতা চান না। তাঁর আদর্শ-সমাজ ছিল বিশ্বসমাজ আর তাঁর ব্যবহারিক-সমাজ ছিল ভারত-সমাজ।

স্বামীজী বলছেন—

ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু
সর্বভূতে সেই প্রেমময়।

জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

অবিকল এই বিশ্বানুভূতিরই এক জীবন্ত ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী, যিনি বলছেন, 'মানুষের সেবার মধ্যে দিয়েই আমি ঈশ্বরকে দেখবার চেষ্টা করছি, কারণ আমি জানি ঈশ্বর স্বর্গেও নেই, পাতালেও নেই ; ঈশ্বর আছেন প্রত্যেকের হৃদয়ে।' জীব-সেবা ও দরিদ্রনারায়ণের যে-মন্দির রচনা করেছিলেন স্বামীজী, গান্ধীজী সেই মন্দিরেই এক অনন্য-সাধারণ উপাসক।

স্বামী বিবেকানন্দ একাধিকবার বলেছেন, 'ভুলিও না, আমি শুধু ভারতের নই, সারা বিশ্বের।' এই বিশ্বানুভূতি সত্ত্বেও বিশ্বের কল্যাণের জন্যই স্বামীজীর সেবার আশু প্রয়োগের ক্ষেত্র হয়েছিল স্বদেশ ভারতভূমি। স্বামীজী দৃপ্ত ও আবেগকম্পিত কণ্ঠে ডাক দিয়ে বলেছিলেন, "আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই।" গান্ধীজীর বিশ্বানুভূতি সত্ত্বেও তাঁর আশু সংগ্রাম ও প্রাত্যহিক প্রয়োগের ক্ষেত্রও হচ্ছে এই ভারতবর্ষ। কী নিকুণ্ঠ ও নিঃস্বার্থ তেজবীর্য নিয়ে গান্ধীজী স্বদেশ- ও বিদেশাত্মার সেবা করেছেন, তার ইতিহাস কে না জানে?

গান্ধীজী অসংখ্য বার একথা বলেছেন, যদি হিমালয়ে গেলে আমার মোক্ষলাভ হবে আমি জানতাম তাহলে আমি হিমালয়েই যেতাম। তা হয় না। আমার মোক্ষ আমার প্রতিবেশ ও আমার স্বদেশের সেবার মধ্যেই। এবং সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, "আমি জানি স্বদেশের সম্যক্ সেবার মধ্য দিয়েই আমি সর্বদেশের সার্থক সেবা করতে পারি।" এই হচ্ছে ব্যবহারিক আদর্শবাদীর একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গী। জীবাত্মা ও পরমাত্মার দুই বিন্দুতে যে জীবন চলাচল করে, সেই জীবনই মহাজীবন। এই মহাজীবনের অধিকারী বলেই গান্ধীজীকে রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দিত করে বলেছেন 'মহাত্মা' আর এই মহাজীবনের অতুলনীয় দেশাত্মবোধ ও জননায়কের অনন্য ভূমিকায় অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে সম্বোধন করেছেন 'জাতির জনক' বলে।

সত্য ও অভয়ের ব্যক্তিরূপ হচ্ছেন স্বামীজী, তার সামাজিক রূপকার হলেন গান্ধীজী। 'অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, অন্যায় সহ্য করো না'—এই হচ্ছে স্বামীজীর দেওয়া মন্ত্র। গান্ধীজীর সমগ্র জীবন এই মন্ত্রশক্তিকে ধারণ করেই অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী রূপ ধারণ করেছে।

কিন্তু কোন্ উপায়ে বা কোন্ পথে এই সংগ্রাম করতে হবে? লক্ষ্যে পৌঁছুবার পন্থা কী হবে? উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায় কী হবে? স্বামীজী বলছেন, প্রেমই শ্রেষ্ঠ শক্তি, সর্বোত্তম সমাধান। বেদান্তের সোজা ভাষায় বলছেন, সারা বিশ্ব আবৃত করে আছেন সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষপ্রধান ; বলছেন সর্বভূতে এক আত্মা বিরাজমান। কাজেই আঘাত করবে কাকে, কোথায়? অন্যকে আঘাত করা মানেই নিজের আত্মাকে আঘাত করা,—ধর্মচ্যুত ও আত্মদ্রোহী হওয়া।

উপায়ের এই শুদ্ধতা ও সর্বজনীন চরিত্রই গান্ধীকে করেছে মহাত্মা গান্ধী। সত্য ছিল

তাঁর লক্ষ্য, অহিংসা বা প্রেম ছিল তাঁর পন্থা। আসলে দুটিকে পৃথক করে ভাবাও যায় না; কেন না অহিংসার পূর্ণরূপই হচ্ছে পূর্ণসত্য—অর্থাৎ ঈশ্বর। এই অহিংসা বা প্রেম হচ্ছে গান্ধীজীর দৃষ্টিতেও সার্বভৌম নীতি; আর সব নীতি হবে এই সর্বোচ্চ নীতির অনুগত।

এই নীতি দুর্বল বা ভীরুর জন্য নয়, এ হচ্ছে বীর্যবানের জন্য। অন্যকে আঘাত করা, হত্যা করা কাপুরুষের কাজ; অন্যকে ভালবাসা, আপন করা, অন্যকে রক্ষা করা হচ্ছে বীরের কাজ। তা যদি না হত, তাহলে স্বামীজী শোনাতেন না 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—এই আত্মাকে বলহীন পেতে পারে না। অহিংসা বা প্রেম হচ্ছে আত্মস্থ, আত্মমুখী, বীর্যবানের চলার মন্ত্র। বাংলাদেশে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত অন্যায় অবিচার পাপাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সর্বজনীন প্রেমে, সবার পিছে সবার নীচে যারা তাদের প্রতি বিগলিত করুণায়, যে নবসংস্কৃতির ধারা চলে এসেছে,—যা হচ্ছে ব্যবহারিক বেদান্তেরই ধারা,—গান্ধীজীর মধ্যে সেই ধারাই প্রবাহিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস হচ্ছেন ধর্মের ব্যবহারিক রূপ। তাঁর জীবন থেকে আমরা ঈশ্বরকে মুখোমুখি দেখতে পারি।' স্বামীজী-প্রসঙ্গে গান্ধীজীর উক্তি: 'স্বামীজীর বাণী আমার স্বদেশপ্রেমকে শতগুণ বর্ধিত করেছে।' ব্যবহারিক ধর্ম বা অধ্যাত্ম-এবং দেশাত্মবোধ—এই দুইয়ের সমন্বয়ে গড়া মহাত্মা গান্ধী সামাজিক অর্থনৈতিক রাষ্ট্রিক জীবনে প্রয়োগবাদী বেদান্তের এক অভ্রান্ত নিশানা।

"আমাদের ধারণা কি জান? ঠাকুর-স্বামীজীর এক একটি ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁরা (গান্ধীজী প্রভৃতি) এই সব কাজ করছেন। আর মহাত্মাজী যে বাস্তবিক শক্তিমান পুরুষ তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই আদ্যাশক্তি জগন্মাতার একটা বিশেষ বিকাশ যে তাঁর মধ্যে হয়েছে, তা-ও ঠিক।···শ্রীশ্রীঠাকুর জগন্মাতার যে শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, সেই শক্তিই আধার-বিশেষকে অবলম্বন করে নানাভাবে কাজ করছে। স্বামীজী বহু স্থানে ভারতের কিভাবে বাস্তব কল্যাণ হবে, তা বলে গেছেন। আজ প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বে দেশের কল্যাণের জন্য তিনি যেসকল কথা বলেছিলেন,—এই ছুঁৎমার্গ-পরিহার, অনুন্নত জাতিদের উন্নয়ন, দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, ইত্যাদি ইত্যাদি—সে-সব ভাবই তো মহাত্মা গান্ধী এখন প্রচার করছেন। এতে দেশের বাস্তব কল্যাণ হবে নিশ্চয়। ···মহাত্মা গান্ধী রাজনীতিক ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে ঐ সব কাজ করছেন।" ('শিবানন্দ-বাণী', ১ম ভাগ, ৩য় সং, পৃঃ ১৫)।

"স্বামীজীর দেশপ্রীতিটা গান্ধীজীকে ভর করেছে। গান্ধীজীর চরিত্র সকলেরই অনুকরণীয়। দেশে দেশে ঐ রকম লোক জন্মালে তবে শান্তির একটা ব্যবস্থা হবে।" ('মহাপুরুষ শিবানন্দ', ২য় সং, পৃঃ ১৮৫)।

—স্বামী শিবানন্দ

শিল্প ও আধ্যাত্মিক সাধনা*

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু

[অনুবাদ : স্বামী চেতনানন্দ]

আর্ট বা শিল্প হল আনন্দের অভিব্যক্তি। সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে সেই আনন্দের ধারা। উপনিষদ্ বলছেন : আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। (তৈ: উপ: ৩।৬) অর্থাৎ এই জগৎ আনন্দ থেকে বেরিয়ে এসেছে; আনন্দের মধ্যেই বেড়ে চলেছে; আর শেষে সেই আনন্দের মধ্যেই মিশে যাচ্ছে। শিল্পীর সৃষ্টির মধ্যেও সেই আনন্দ ফুটে বেরুচ্ছে। প্রকৃত শিল্পের কষ্টিপাথর হচ্ছে মনুষ্য-হৃদয়কে আনন্দোল্লাসে ভরিয়ে তোলা। এই আনন্দের পরশ একবারও যদি জীবনে লাগে তবে আর মরণ নেই। যদি অজন্তা-ইলোরার সেই অত্যাশ্চর্য শিল্পকলা ধ্বংস হয়ে যায় এবং কোন শিল্পীর ভাগ্যে একবারও যদি তার চকিত দর্শন ঘটে থাকে—তাহলে ঐ শিল্প-সুষমা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না। ঐ শিল্পীর ভাবজগতে হৃদয়ের মণিকোঠায় তা বেঁচে থাকবে এবং তাকে অনুপ্রাণিত করবে ঐগুলির নবরূপ প্রদানে। মৃত অতীতের হবে পুনর্জন্ম। অকৃত্রিম শিল্প মরণজয়ী। এর সত্তা জৈবপ্রায়। দীর্ঘ বংশপরম্পরায় তার পুনর্জন্মগুলি খুবই স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী।

অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিশ কয়েক বছর আগে শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে এসেছিলেন। শিল্প যে কালজয়ী একথা তিনিও মনে করতেন। সে সময় আমরা প্রাচীরচিত্র (Fresco) আঁকবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু তখন আমাদের অভাব ছিল বিভিন্ন উপাদানের; আর কলাকৌশল জানা না থাকায় প্রকল্পটা ছেড়ে দিতে হয় আমাদের নিরুৎসাহ দেখে অধ্যাপক মর্মাহত হয়ে বললেন : 'তোমরা থামছ কেন? তোমরা যদি একখণ্ড কাঠকয়লা দিয়ে কাজটা কর এবং একজন দর্শকও যদি তোমাদের অঙ্কন দেখে তারিফ করে—তাহলে তা তোমাদের সব পুরস্কারকে ছাপিয়ে যাবে। যদিও প্রাচীরগাত্রে তোমাদের শিল্পকলার পরমায়ু হবে একদিন, কিন্তু ঐ দর্শকের হৃদয়ে তা অঙ্কিত থাকবে চিরদিন। যদি তোমরা কাজ না কর, তবে তোমাদের চিন্তা, তোমাদের ভাব নষ্ট হয়ে যাবে—তোমাদের মানসপটে জন্মের পূর্বেই তা মরে যাবে। না—এ জগতের কেউ তাতে উপকৃত হবে না, এমন কি তুমি নিজেও না।'

ভাস্কর্য, চিত্র, কবিতা, সঙ্গীত, নৃত্য—সমস্ত শিল্পকলার রয়েছে একমুখী চেষ্টা। প্রত্যেকেরই রয়েছে স্বকীয় ছন্দ। ঐ ছন্দ নানা ভাবে, নানা ভঙ্গিতে রূপায়িত করছে আনন্দকে—আর ঐ আনন্দই সৃষ্টির উৎস। এদিক থেকে যোগ বা আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে শিল্পসাধনার কোন ভেদ নেই। আধ্যাত্মিক সাধনার লক্ষ্য—পরিদৃশ্যমান বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধান, যাঁকে জানলে সব জানা যায়। শিল্পীর লক্ষ্যও তাই। জনৈক চৈনিক শিল্পী বলেছেন : 'শিল্পীর কাছে ঈশ্বরের প্রতিকৃতি ও একটি সবুজ দূর্বাপত্র একই; কারণ তা তার মনে ফুটিয়ে তোলে একই আনন্দের

* ১৯৪২ সালের ১৮ই জুন মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে 'আর্ট ও আধ্যাত্মিক সাধনা' প্রসঙ্গে শ্রীনন্দলাল বসুর কথোপকথন হতে গৃহীত এবং ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাসের 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা থেকে অনূদিত।

অভিব্যক্তি এ কিন্তু দেবমূর্তির অবমাননা নয়, পরন্তু সবুজ দূর্বাপত্রের মর্যাদাদান।

শিল্পী থাকবে নির্লিপ্ত। জীব বা সমাজের সভ্যরূপে তার ব্যক্তিগত আবেগ বা ভাবপ্রবণতা থাকতে পারে, কিন্তু শিল্পীকে সৃষ্টিকালে সব কিছুর ঊর্ধ্বে যেতে হবে। কোন বিষয়ে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ শিল্পীর কে ঢেকে দেয়, গতিকে করে রুদ্ধ; আর নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তিকে ব্যক্তিগত ভাব করে লাঞ্ছিত। শিল্প-সৃষ্টিতে শিল্পীকে দৈনন্দিন ক্ষুধা-তৃষ্ণা, যৌনবোধ ইত্যাদি অতিক্রম করে যেতে হবে। তাকে যেতে হবে সেখানে, যেখানে সে নিজের ভাবকে মিশিয়ে দেবে অনন্ত নৈর্ব্যক্তিক রসসাগরে—আনন্দময় সত্তায়।

শিল্পী তার বিষয়বস্তু—হৃদয়বিদারী বা মনোরম—যেটা খুশি বেছে নিতে পারে। তার কোন পক্ষপাতিত্ব নেই, কারণ সে অনাসক্ত ও নির্দিষ্ট ভাবাবেগ থেকে মুক্ত। সে চায় সীমার গণ্ডী পেরিয়ে আনন্দরসে ডুবে যেতে এবং তা দিয়ে রূপ দিতে চায় তার শিল্পের কাঠামোটাকে। আনন্দ যদি শিল্পীর লক্ষ্য না হয় এবং শিল্পে যদি তার স্ফুরণ না হয় তবে ঐ সৃষ্টি আকর্ষণ বা বিদ্বেষ, সুখ বা দুঃখরূপ দ্বৈতভাবাবেগের দ্বারা হয় বিকারগ্রস্ত। সুতরাং সাধকের মত শিল্পীও লাভ করতে চায় সেই পবিত্র, নিরপেক্ষ, সার্বিক আনন্দকে। সে জপ, ধ্যান বা কৃচ্ছ্রতাসাধন না করতে পারে—তবুও তাঁর কর্মই উপাসনা।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, নটরাজ বা কালীর কল্পনা। যে ব্যক্তি তার চেতনাতে ঐ সত্তার প্রথম আবির্ভাব দর্শন করেছিল—সে সাধক হতে পারে, আবার শিল্পীও বটে। যে মানুষ ঐ ভাবের স্থূল রূপ দিয়েছিল, তার শিল্পী সত্তা থাকা সত্ত্বেও সে সাধক। সাধক-শিল্পী একটা অনুপম রসের মধ্যে প্রবেশ ক'রে, ছন্দ-গতি-রূপ-রং ও অন্যান্য কল্পিত বস্তু দিয়ে, চিন্তা করেছিল একটা সামগ্রিক সত্তাকে।

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে নৈতিক মূল্য বিচারিত হয়—শিল্পক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নাও হতে পারে। যে বস্তুটি সমাজে অবহেলিত, তা হয়ত বা কখন শিল্পীকে একটা সুন্দর সৃষ্টির অনুপ্রেরণা দেয় এবং পরবর্তীকালে তা বহুলোককে অনুপ্রাণিত ও উন্নত করে। সাধারণ মানুষ অনৈতিক বলে কোন বস্তুকে ঘৃণা করতে পারে, কিন্তু কোন গুণী শিল্পীর তুলিকার যাদুস্পর্শে তা থেকে উদ্ভাসিত হয় একটা অপূর্ব সৃষ্টি; যে সৃষ্টি লুকিয়ে ছিল সেখানে, অথবা শিল্পীর অন্তর থেকে কিছু ধার নিয়ে, সে রূপ নিল। ঘৃণিত বস্তু রূপান্তরিত হল সুন্দরে—মহিমায়। এর সব কিছু নির্ভর করছে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গির উপর—ভাল-মন্দ, নৈতিক-অনৈতিক বা কোন উচ্চরাজ্যে তার শিল্পের বিষয়বস্তু অবস্থান করছে কিনা তার উপর। উপনিষদ্ বলছেন: 'যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্। এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে ॥' (কঠ, ২।১।৩) অর্থাৎ যে জ্ঞানস্বরূপ আত্মার দ্বারা মানুষ রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ও মিলনসুখ অবগত হয়, সেই আত্মার নিকট এই জগতে কোন্ বস্তু অবিজ্ঞেয়রূপে অবশিষ্ট থাকতে পারে?

সুতরাং ভাল-মন্দ গুণ বিষয়বস্তুতে থাকে না। সৃষ্টিকর্তা যেমন নিজে সৃষ্টি করে তার মধ্যেই আনন্দে মগ্ন হন, তেমনি শিল্পীও যদি পবিত্র আনন্দ ও রসের সন্ধান পায় এবং তা সৃষ্টি করে, তাহলে গরল অমৃতে, পার্থিব স্বর্গীয়ে রূপান্তরিত হয়ে উঠে। বস্তুত বিপদ তখনই ঘনিয়ে আসে যখন ভাবাবেগ বা বস্তুর উপরই

জোর পড়ে, আর মন পায় না রসের মধ্যে অবাধ স্বাধীনতা। যদি রোগের পরিবর্তে রোগীর দিকেই শুধু ডাক্তার নজর দেয় তবে রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

কেউ যদি বলে যে সমাজের দৃষ্টিতে যেটা অনৈতিক বস্তু তার রূপ দেওয়া কি সমাজের ক্ষতি নয়? এটা কি করে সম্ভব? কোন প্রকৃত শিল্প[১] যদি ভাল বা মন্দ ভাব প্রকাশে অসমর্থও হয় তবুও তা রস ও ছন্দের মধ্যেই থাকে। ঐ রস ও ছন্দ শিল্পীকে বা কোন শিল্প-প্রেমিককে দৈনন্দিন জীবনের সীমিত গণ্ডী, বিধিবদ্ধ অভ্যাস ও সামাজিক কুসংস্কারের উর্ধ্বে নিয়ে যায়। মানবজীবনে শিল্পের এই সামান্যতম অবদান সমাজে মঙ্গল বৈ অমঙ্গল আনবে না। অবশ্য দুর্বল স্নায়বিক রোগগ্রস্ত মন জীবনের এই অপূর্ব রসাস্বাদে অক্ষম। যাহোক এ সব দুর্বলমনারা তুলা-পশমের আবরণে লুকিয়ে থাকুন, আর বৃদ্ধ-শিশুরা কাঁচ-ঘেরা শো-কেসে নিজেদের আবদ্ধ করে রাখুন। নিরাপদে অক্ষত থাকুন তাঁরা। এতে কিছুই আসে যায় না। আর্ট নিজেকে নীচু করে হীন ঘৃণিত স্তরে কখনও নিয়ে যাবে না। শিল্পীরাই শিল্পকে বহন করে নিয়ে যাবে একটা স্বাস্থ্যকর পরিবেশে, প্রাচুর্যের মধ্যে। বিজ্ঞ ও সবলেরই আর্টে অধিকার।

কয়েক বছর আগে পুরী ও কোণারকের মন্দিরগাত্রে ক্ষোদিত কামকলাপূর্ণ মূর্তিগুলি ধ্বংস করবার আন্দোলন উঠেছিল। কী অসঙ্গত ভ্রান্ত প্রস্তাব! যদি এটা ঘটত—তবে তা হত এক চরম বর্বরতা, আর বিলুপ্ত হত আমাদের বহু শিল্পগৌরব। আমি জানি না কি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে তারা ওটা করতে যাচ্ছিল। বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েই থাকে। আমি এটুকু বলতে পারি যে, ঐসব মন্দিরগাত্রে নবরসের মধ্যে একটি রসের রূপ দেওয়া হয়েছে—যে-রসটি আদিম এবং জীবনের সমগ্র গতির সঙ্গে যুক্ত। শিল্পরূপে ঐগুলি মহান অনন্য শিল্পের নিদর্শন।

শিল্পী তাঁর জীবনের বিভিন্ন কালের বিভিন্ন ভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়। কখনও সে দেবভাবমণ্ডিত বস্তুর রূপ দেয় এবং স্পর্শ করে—চৈনিক শিল্পীর ভাষায়—'অনন্তের আঙিনাকে'। কখনও বা তাঁর সৃষ্টি অত উঁচু ধাপে উঠে না। কি আসে যায় তাতে? একই শিল্পীর মানসিক অবস্থার বিভিন্নতা, বিভিন্ন পরিবেশ তাকে প্রকাশ করে বিভিন্ন ব্যক্তিসত্তা রূপে। যে মুহূর্তে সে রসমাধুর্য অনুভব করে এবং ছন্দের রহস্য ধরতে পারে—তখনই সে উচ্চ তত্ত্বে প্রবেশাধিকার পায়। কিন্তু এ মাহেন্দ্রক্ষণ দুর্লভ। দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত শিল্পীর স্মৃতিকে করে অবলুপ্ত, পথকে করে নিষ্প্রভ। অচঞ্চল আনন্দ-প্রবাহের সঙ্গে সমতালে চলাই তার জীবনের লক্ষ্য—যা সে তখনও লাভ করতে পারেনি।

সাধককেও চলতে হয় ধাপে ধাপে—জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অদ্বৈতের পথে। শিল্পীর চলার পথও তেমনি। সাধকের মনে হতে পারে যে, শিল্পী ক্ষণিক মায়াময় অনিত্য বস্তুতে আবদ্ধ। কিন্তু কেন? এর উত্তরে শিল্পী বলছে: এই বিশ্বসৃষ্টি ও শিল্প—উভয়েরই অধিষ্ঠান মায়া। সৃষ্টিকর্তা কখনও নিজের মায়াশক্তির দ্বারা প্রতারিত হন না। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—সাপের বিষ সাপকে ধ্বংস করতে পারে না। শিল্পীও সেই

[১ যা উজ্জ্বল তাই সোনা নয়। এখানকার আলোচ্য বিষয় প্রকৃত শিল্প। অবশ্য অনেক শিল্পে ভ্রান্তভাবে নীচু প্রবৃত্তির চরিতার্থতা দেখান হয়; ওসব হাটের পণ্যের মত। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার মত প্রকৃত শিল্প সমস্ত নৈতিক মানের উর্ধ্বে।]

বিশ্বশিল্পী সৃষ্টিকর্তার শিষ্য। শিল্পীও তার জ্ঞান ও কলাকৌশলের দ্বারা মায়ার উপর প্রভুত্ব লাভ করে। তখন তার কাছে মায়া হয় লীলাখেলা। শিল্পের বিষয়বস্তু তুচ্ছ বা মহান, ক্ষণিক বা শাশ্বত—যা কিছু হোক না কেন, শিল্পীর লক্ষ্য থাকবে তার সৃষ্টির সঙ্গে একত্বের সংযোগ-স্থাপন। আর ঐ একত্বই বিশ্বের নানা রূপ ও লীলাচঞ্চল গতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। কেবলমাত্র বিষয়-তন্ময়তা তো পতন। ও তো মায়ার বন্ধন। প্রকৃত শিল্পীর চোখে মায়া হচ্ছে একত্বের মধ্যে একটা সহজ স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতি ও ছন্দ।

সার্বিক-একত্বের বোধহীন শিল্পী বেছে নেয় কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা ভাব। তাই অচিরেই তার অনুপ্রেরণা যায় শুকিয়ে। শাশ্বত আনন্দের উৎস তার কাছে থাকে অজ্ঞাত।

আমি একজন হিন্দু এবং হিন্দুভাবধারায় পুষ্ট। সুতরাং আমি যে বহু দেবদেবীর ছবি এঁকেছি—এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এখন আমি দেবদেবীর সঙ্গে নৈসর্গিক দৃশ্য ও সাধারণ মনুষ্যজীবনের চিত্রও আঁকি; এবং উভয়ের মধ্য থেকে একই আনন্দ ও তৃপ্তি পেতে চেষ্টা করি। আগে ভাবতুম যে, দেবদেবীর ধারণা দৈনন্দিন মনুষ্য-জীবন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় থেকে বহুগুণে উন্নত; কিন্তু মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এখন কোন একটা নির্দিষ্ট রূপ বা দৃশ্যের উপর জোর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না।

দৃশ্যনিচয় অলক্ষিত ছন্দের উপর দিয়ে ভেসে ওঠে আবার চলে যায়; আর ঐ ক্ষণিক স্থিতির মধ্যে রূপ দিয়ে যায় সেই অদ্বিতীয় সত্তাকে। উপনিষদ্ বলছেন: 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।' (কঠ ২।৩।২) অর্থাৎ এই চরাচর সমস্ত বস্তু সেই পরব্রহ্মের সত্তা থেকে বেরিয়ে স্পন্দিত হচ্ছে। চৈনিক শিল্পীর ভাষায়—এই সত্তা হচ্ছে জীবনের গতি ও ছন্দ। আমি সামান্যভাবে ঐ সত্তাকে বুঝতে ও রূপ দিতে চেষ্টা করেছি। ফলে আমি উচ্চ-নীচ, তুচ্ছ-বিরাট প্রভৃতির মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য লক্ষ্য করিনি। পূর্বে আমি দেবতাদের মধ্যেই কেবল দৈবী সত্তা দেখতে অভ্যস্ত ছিলুম। এখন আমি আকাশ, জল, পর্বত, বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী, মানুষ প্রভৃতির মধ্যে ঐ দৈবী সত্তাকে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করি।

সর্বদেশে সর্বকালে উৎকৃষ্ট শিল্প বেরিয়েছে মহান ভাবরাশি থেকে। খ্রীষ্টধর্ম-প্রভাবে মধ্যযুগীয় ইউরোপের শিল্পকলা, কৃষ্ণ ও বুদ্ধের দ্বারা প্রাচীন ভারতের শিল্প ও তাও-এর দ্বারা চৈনিক-শিল্প হয়েছে সমৃদ্ধ। যখনই কোন মহামানবের ব্যক্তিত্ব আদর্শের প্রতীকরূপে পূজিত হয়, তখন অতি শীঘ্রই ঐ আদর্শ ব্যক্তিত্বের দ্বারা আচ্ছাদিত ও অস্পষ্ট হয়ে যায়। প্রকৃতি ও জীবন হয় অবহেলিত। প্রেম ও জ্ঞানের আলোর হয় ক্ষীণতম স্ফুরণ। ভারতবর্ষে এই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। আমি বিশ্বাস করি, সাধকের হৃদয়ে যে কালী- বা শিব-মূর্তি প্রথম প্রতিভাত হয়েছিল—তা প্রকৃতি থেকে। আর আমাদের বর্তমান শিল্প-চেতনায় প্রকৃতির আকর্ষণ ও উৎসাহ খুবই অল্প। ঈশ উপনিষদ্ আমাদের প্রথম পর্যায়েই শিক্ষা দিচ্ছেন: ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।' অর্থাৎ এ পৃথিবীতে যা কিছু স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বস্তু আছে—সব কিছুতেই ঈশ্বরের সত্তা বিরাজমান। ভারতকে তার চিন্তাজগতের পরতে পরতে এই উপলব্ধি লাভ করতে হবে। আর এ ভাবেই ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্প সন্দর্শন লাভ করবে এক নবোদ্ভাসিত জগৎ এবং প্রকাশ করবে 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'-কে।

ঠাঁই দিও মা রাঙা পায়ে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

নীল নটিনী ধায় তটিনী মনমোহিনা এঁকে বেঁকে
পদে পদে ডিঙিয়ে বাধার বাঁধ অগাধ অধীর আবেগে।
নিশানা তার জানে না সে,
জানে শুধু—ভালোবাসে
রঙিন নেশায় অকূল আশে
গভীর তৃষায় কার—জানে কে?
আকাশ হাসে: "কেউ কি জানে—কার টানে ধায় আনন্দে কে?

তেমনি ছোটে আকুল হৃদয়ে অদেখা তার মায়ের পানে
নাম শুনে সে-সুদূরিকায় বরণ ক'রে গানে গানে।
পদে পদে ভুল করে সে,
তবু চলে কেঁদে হেসে
আবেগ-উধাও নিরুদ্দেশে—
দুরন্তকে রুখবে সে কে?
ভক্ত হাসে: "কেউ কি জানে—পায় পাথেয় কোন্ পথে কে?"

মুক্তি অমল, দুঃখহরা, অভয়, অটল ঘোর বিপদে,
সাধনজাগা জ্ঞানের আলোয় চলে কেটে পথ বিপথে।
গম্ভীর সে—শান্ত, প্রবীণ,
ধোঁয়ায় ধুলায় রয় অমলিন,
নেই শোক, নয় কারো অধীন—
চলে ধ্যানের জ্ঞানের রথে:
সবার মাঝে থেকেও ধরা দেয় না কারেও এ-জগতে।

না না—দিয়ো ভক্তি আমায়, ক্ষীণ যদি হয় শক্তি মাগো,
অবসাদও আনবে প্রসাদ—তুমি যদি প্রাণে জাগো।
যদি ধুলা লাগে গায়ে,
ঠাঁই দিও মা রাঙা পায়ে
স্নেহের স্নানে অসহায়ে
দীক্ষা দিও শরণব্রতে।
গানের ফসল ফলিয়ে কোরো আমায় কোমল প্রেমদরদে॥

সমালোচনা

স্বামীজীর আহ্বান (প্রথম সংস্করণ, মহালয়া, ১৩৭৬) প্রকাশক : উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ৭৬+১২ ; মূল্য পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

নূতন যুগের ইতিহাস-রচনা-কল্পে যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষভাবে তরুণ সমাজকেই আহ্বান করিয়াছিলেন, শত শত তরুণচিত্ত সেই প্রাণস্পর্শী আকুল আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল, তাহারই ফলে জাগ্রত ভারত মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। ভারতের পরাধীনতা-শৃঙ্খল ভাঙিয়াছে সত্য, কিন্তু শুভশক্তির উদ্বোধনের জন্য আজও প্রয়োজন প্রকৃত জাগরণ ; সেই জাগরণেই আসিবে উপযুক্ত বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। তাহারই উদ্দেশ্যে 'স্বামীজীর আহ্বান'—"ওঠ, জাগো, নিজে জেগে অপরকে জাগাও।"

বর্তমান প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এই 'সংকলন-গ্রন্থে' স্বামীজীর সঞ্জীবনী বাণী হইতে বিষয়বস্তু নির্বাচিত হইয়াছে : 'আত্মবিশ্বাস', 'হে ভারত, ভুলিও না', 'নূতন ভারত', 'বাঙলা ও বাঙালী', 'শিক্ষা', 'জীবই শিব', 'নারীশক্তি', 'শূদ্র-জাগরণ', 'সমাজ-চেতনা', 'ভবিষ্যতের ইঙ্গিত', 'মা, আমায় মানুষ কর।'

গ্রন্থারম্ভে 'জাগরণের অগ্রদূত' নামক পরিচ্ছেদে, ভারতাত্মা স্বামীজীর জীবন পরিক্রমা করা হইয়াছে এবং তাঁহার অমূল্য জীবনের ঘটনাপঞ্জী দেওয়া হইয়াছে। প্রচ্ছদপটে ভারত-জননীর বাণীমূর্তি বিবেকানন্দ আবির্ভূত হইয়া আপামর সকলকে উদ্বুদ্ধ হইতে আহ্বান করিতেছেন—এই ভাবটি সুপরিস্ফুট।

আমরা আশা করি, বাঙলার ঘরে ঘরে, স্কুলকলেজের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর হাতে এই গ্রন্থ বিরাজ করিবে, স্বামীজীর আহ্বানে যুবসমাজ স্বদেশ ও বিশ্বের কল্যাণব্রতে নির্ভীক হৃদয়ে আত্মনিয়োগ করিবে।

Krishna in History and Legend: বিমানবিহারী মজুমদার। প্রকাশক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; পৃষ্ঠা ৩০৭ ; মূল্য ২০ টাকা।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার গবেষণার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট ও বিদগ্ধ নাম। তাঁর গবেষণার পরিধি বহুবিস্তৃত এবং বিষয়বস্তু বহুমুখ। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবাধ ও সফল বিচরণ। ইংরেজী ও বাংলা বহু গ্রন্থের তিনি সার্থক রচয়িতা। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ব্যবস্থাপনায় তিনি যে ছয়টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহারই মুদ্রিত রূপ এই আলোচ্য গ্রন্থখানি।

শ্রীকৃষ্ণ ভারতমানসের চিরন্তন উপাস্য ভগবান। ব্রহ্মপুত্র থেকে সিন্ধুতট পর্যন্ত সমগ্র জনপদ আজও শ্রীকৃষ্ণ নামে মুখরিত। নিরবধি কাল এই পুণ্য নামের জয় ঘোষণা করছে। সত্যসন্ধানী নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টি অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণজীবন ও -চরিত্রের আলোচনা এবং ভারত-সংস্কৃতিতে তাঁর অবদানের মূল্যাঙ্কন করা এক অতি দুশ্চর কর্ম। ডঃ মজুমদার এই দুরূহ কার্য সম্পাদনে যে সাহস, তথ্যনিষ্ঠা ও আনুগত্য দেখিয়েছেন এবং যার পরিচয় বইটির প্রতি পৃষ্ঠায় সুপ্রকট তা নিঃসংশয়ে প্রশংসনীয়। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের আবেদন সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত। তাই ভারতবর্ষের প্রতিটি ভাষাও তাঁকে অবলম্বন করে সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগেও শ্রীকৃষ্ণ-জীবন ভারতবর্ষের

বিদ্বৎসমাজের মননের বিষয়বস্তু হয়ে আছে। ইংরেজী, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় বিস্তীর্ণ এই বিরাট সাহিত্য-ভাণ্ডার থেকে বিপুল উপকরণ গ্রন্থকার অশেষ শ্রম স্বীকার করে সংগ্রহ করেছেন-ই, এতদ্‌-তিরিক্ত স্থাপত্য, শিলালেখ প্রভৃতি ও অন্যান্য প্রমাণ প্রয়োগে তিনি সমভাবে দক্ষতা দেখিয়েছেন। গ্রন্থকার একদিকে যেমন ঐতি-হাসিক, অন্যদিকে তেমনি তিনি একনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত। কিন্তু তিনি গ্রন্থে কোথাও তাঁর ভক্ত সত্তাকে উপস্থাপিত করেননি। ঐতিহাসিক সত্তাকে তিনি বরাবর অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। সেই জন্য ডঃ মজুমদার ঐতিহাসিক হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের দেবভাব যথাসম্ভব বর্জন করে তাঁর মনুষ্যকৃতির বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ডঃ মজুমদার যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, মুখবন্ধে সেই প্রসঙ্গে বলেছেন— তিনি আকর-উপাদানগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণের দ্বারা সিদ্ধান্তপ্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। আর 'পাথুরে প্রমাণ' ছাড়া ঐতিহাসিক সত্য স্বীকার্য নয়— এই মতে তিনি বিশ্বাসী নন। আলোচনার আরম্ভ তিনি করেছেন ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে নিয়ে।

গ্রন্থের ছয়টি অধ্যায়ের আলোচনার বিষয় হচ্ছে—(১) শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও আবির্ভাব সম্বন্ধে সঠিক কাল নির্ধারণে বিভ্রান্তি; (২) সাহিত্যে ও স্থাপত্যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবন; (৩) মহাভারত ও ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ; (৪) দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ; (৫) শ্রীরাধা এবং (৬) বর্তমান ভারত-বর্ষে শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের মূল্যাঙ্কন। এ ছাড়া ৪টি পরিশিষ্টে আছে—(১) ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ; (২) তীর্থপ্রসঙ্গ ইত্যাদি; (৩) মধ্যযুগের সাহিত্যে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ; (৪) শ্রীকৃষ্ণ আর্য অথবা অনার্য?

তৃতীয় অধ্যায়ে ভাগবতের কালনির্ণয় সম্বন্ধে ডঃ মজুমদারের আলোচনা অবশ্যই প্রণিধান-যোগ্য। এই প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্কর অথবা আচার্য রামানুজের কোন গ্রন্থে ভাগবতের অনুল্লেখ সম্বন্ধে তিনি কিছু আলোকপাত করতে পারতেন। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে বিষ্ণু-পুরাণের দুটি তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোকের প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই:

তস্মাদ্ দুর্গং করিষ্যামি যদূনামরিদুর্জয়ম্।
স্ত্রিয়োঽপি যত্র যুধ্যেয়ুঃ কিং পুনর্বৃষ্ণিপুঙ্গবাঃ॥
ময়ি মত্তে প্রমত্তে বা সুপ্তে প্রবসিতেঽপি বা।
যাদবাভিভবং দুষ্টা মা কুর্বন্ত্বারয়োঽধিকাঃ॥
(৫. ২৩. ১১-১২)

গ্রন্থকার বিষ্ণুপুরাণ থেকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন "শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী ও জাম্ববতী অপেক্ষা সত্য-ভামার প্রতি অধিক প্রণয়াসক্ত ছিলেন" (পৃ. ১৫৫-৫৬)। কিন্তু ঐ পুরাণের ১.৯.১৪৪ শ্লোকে বলা হচ্ছে যে, রুক্মিণীই ছিলেন তাঁর মূলা শক্তি। রাধা সম্বন্ধে ডঃ মজুমদারের অনেক তথ্য আধুনিক কালের পল্লবগ্রাহী ডিগ্রী-লিপ্সুদের সুবিধা করে দেবে। ১৬৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় গাথা-সপ্তশতীর কালনির্ণয়-প্রসঙ্গে ডঃ রাধা-গোবিন্দ বসাকের মতো একজন প্রবীণ ঐতি-হাসিকের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করলে ভাল হোত। ডঃ বসাকের মতে গাথা-সপ্তশতীর রচনাকাল খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দী। মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্যের অধ্যায়ে মীরাবাই-এর মতো মরমিয়া গীতিকারের অনুপস্থিতিতে আমাদের প্রত্যাশা কিছুটা অপূর্ণ রয়ে গেল।

অন্তিম বা ষষ্ঠ অধ্যায়ে আধুনিক যুগে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে যে-সব আলোচনা ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলা দেশে হয়েছে তার একটি বিশদ বর্ণনা গ্রন্থকার দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রকে এই অধ্যায়ে স্বভাবতই লেখক

প্রাধান্য দিয়েছেন। নবভারত-নির্মাতাদের অনেকেরই উক্তি তিনি উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের নিম্নলিখিত মন্তব্যটি অপ্রাসঙ্গিক হোত না : "যে দিকে চাইবি, দেখবি শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র perfect। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ—তিনি যেন সকলেরই মূর্তিমান বিগ্রহ! শ্রীকৃষ্ণের এই ভাবটিরই আজকাল বিশেষভাবে আলোচনা চাই।" (স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৬)। আধুনিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণজীবনের বিচার কতটা হাস্যাস্পদ ও পাশ্চাত্ত্য মনোভাবের অনুকরণপ্রসূত তা গ্রন্থকার পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ খাঁটী আর্য ছিলেন—গ্রন্থকারের এই ধ্রুব সিদ্ধান্ত পণ্ডিত-মহলের প্রচলিত চিন্তাধারায় নাড়া দেবে বলে মনে হয়।

গ্রন্থকারের অন্যতম সারস্বত প্রচেষ্টাকে আমরা হার্দিক অভিনন্দন জানাই।

—স্বামী বীতশোকানন্দ

কর্মযোগ (২৪শ সংস্করণ)—স্বামী বিবেকানন্দ। প্রকাশক : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ২২৩। মূল্য ২.৮০।

যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের সুপ্রসিদ্ধ 'কর্মযোগ' গ্রন্থের পরিচয়প্রদান অনাবশ্যক হইলেও বর্তমান সংস্করণের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইহা শুধু পুনর্মুদ্রণ নয়, কর্মযোগ বিষয়ক স্বামীজীর ছয়টি বক্তৃতা এই সংস্করণে সম্পূর্ণ নূতন সংযোজন : কর্ম ও তাহার রহস্য, কর্মযোগ-প্রসঙ্গে, কর্মই উপাসনা, স্বার্থরহিত কর্ম, জ্ঞান ও কর্ম, কর্মবিধান ও মুক্তি।

'কর্ম ও তাহার রহস্য' বক্তৃতাটি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জানুআরি লস এঞ্জেলেসে, 'স্বার্থরহিত কর্ম' ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ২০শে মার্চ বাগবাজার বলরাম-মন্দিরে এবং 'জ্ঞান ও কর্ম' ভাষণটি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৩শে নভেম্বর লণ্ডনে প্রদত্ত হইয়াছিল। গ্রন্থশেষে 'নির্দেশিকা'টি নূতন সংযোজন।

গীতাতত্ত্ব—গ্রন্থকার ও প্রকাশক শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার, পোঃ জগাছা, হাওড়া। পৃষ্ঠা ২৪; মূল্য ৩০ পয়সা।

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ, সার্বভৌম ও অতি জনপ্রিয় গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আলোচনা যত হয় ততই মঙ্গল। গীতাতত্ত্ব পুস্তকখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে লিপিবদ্ধ গীতা সম্বন্ধে আলোচনা-রীতি প্রশংসনীয়। সংক্ষেপে গীতার সারকথা, শিক্ষা, তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য পরিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিলে গীতানুশীলনের আগ্রহ হইবে।

দাস গোস্বামী—সঙ্কলক রামকিঙ্কর দাস, তারাস মন্দির (শ্রীকুণ্ড), পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)। পৃষ্ঠা ৬৪৪ + ৫২। মূল্যের উল্লেখ নাই।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ লীলাপার্ষদ ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী। তাঁহার জীবন তীব্রবৈরাগ্যমণ্ডিত এবং অপূর্ব ভজনশীলতায় মহিমান্বিত। তিনি সুদীর্ঘকাল শ্রীচৈতন্যদেবের পুণ্যসঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। এই ভক্তপ্রবরের জীবন ভক্তগণের আদর্শস্থানীয় এবং আধ্যাত্মিকতার পথে অতীব প্রেরণাদায়ী। আলোচ্য গ্রন্থখানি রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি যোগ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি। গ্রন্থের উপাদান প্রধানতঃ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত এবং অন্যান্য গৌরলীলাবিষয়ক পুস্তকাবলী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কীর্তনের বহু পদ- ও উদ্ধৃতি-সমন্বিত এবং অনেকগুলি মনোজ্ঞ চিত্রসংবলিত এই সঙ্কলন-গ্রন্থখানি ভক্তসমাজে শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইয়া উপযুক্ত সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমরা আশা করি। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই অতি সুন্দর। সঙ্কলন-কার্যও প্রশংসনীয়।

অর্ধরাত্রবেধ-বাদ—ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত শ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়াবাবা। প্রকাশক : শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা। পৃষ্ঠা ১২৭ + ৩৯। মূল্য ২.৫০।

এই গ্রন্থে একাদশীর উপবাস সম্পর্কে নিম্বার্কসম্প্রদায়ে প্রচলিত অর্ধরাত্রবেধ-বর্জনের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং এই বিষয়ে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের অভিমত ও ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিলে একাদশীব্রত সম্বন্ধে যথাযথ নির্দেশ পাওয়া যাইবে। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের ভক্তগণের নিকট এই পুস্তক বিশেষ সমাদর লাভ করিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবা : গত সেপ্টেম্বর মাসে (ক) **মালদহে** ইংরেজবাজার, কালিয়াচক ও মানিকচক ব্লকের ১১৬টি গ্রামে বন্যাপীড়িতদিগকে ২২,০১৬ কেজি চাল বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ১৩,৭১৮। (খ) **মুর্শিদাবাদে** বরসিমুল ইউনিয়নের ১৬টি গ্রামে ৫,২৫৪ জনের মধ্যে ৪,৬৪৯ কেজি চাল, ২৭৩ কেজি ডাল, ২১০ কেজি চিড়া, ৬২ কেজি গুড়, ১৪৪ খানি পাঁউরুটি বিতরিত হইয়াছে। (গ) **জলপাইগুড়িতে** বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা-সরঞ্জাম দেওয়া চলিতেছে।

কাছাড়ে বন্যার্তসেবা : গত সেপ্টেম্বর মাসে **করিমগঞ্জ** হইতে ২৭টি গ্রামের ৮,৯৮১ ব্যক্তিকে ৬,৫৫০ কেজি চাল, ২৯৪ খানি ধুতি. ২৮৭টি কম্বল, ২০ মিটার খাকি কাপড়, ২২ মিটার সার্টের কাপড় দেওয়া হইয়াছে।

শিলচর হইতে বন্যার্তসেবায় ১২টি গ্রামের ১,৮৮৩ জন অধিবাসীকে ১,৯৬০ কেজি আটা ও ৪০০ কেজি চিড়া বিতরণ করা হয়। ১২ জনকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। ৪০টি পরিবারকে কৃষিকার্যের জন্য ধানের চারা দিয়া সাহায্য করা হয়। ২টি পরিবারের বাড়ী তৈরী করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অন্ধ্রে ঘূর্ণিবাত্যা-বিপর্যস্তদের সেবা : চিরালায় দুর্গতদের পুনর্বাসনের জন্য গভর্ণমেন্ট কর্তৃক সম্প্রতি অধিকৃত জমিতে গত ২৬শে সেপ্টেম্বর স্বামী গম্ভীরানন্দজী একটি ব্লকের গৃহনির্মাণের জন্য ভিত্তি স্থাপন করেন।

গুজরাটে বন্যার্তসেবাকার্য : বন্যায় বিপর্যস্ত জনগণের সেবাকল্পে কম্যুনিটি-হল প্রভৃতি নির্মাণ-কার্য ভালভাবেই অগ্রসর হইতেছে।

কার্যবিবরণী

রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ—(পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া) : এই কেন্দ্রের ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

সারদাপীঠ কর্তৃক নিম্নলিখিত বিভাগগুলি পরিচালিত হয় : (১) বিদ্যামন্দির, (২) শিক্ষণমন্দির, (৩) শিল্পমন্দির. (৪) শিল্পায়তন, (৫) শিল্পবিদ্যালয়, (৬) জনশিক্ষামন্দির, (৭) তত্ত্বমন্দির।

বিদ্যামন্দির : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত এই আবাসিক ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রী কলেজে ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দের ছাত্রসংখ্যা ২১৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাফল সন্তোষজনক। ছাত্রগণের শরীর ও মনের সুষম বিকাশসাধনের যথোপযুক্ত যত্ন লওয়া হয়।

শিক্ষণমন্দির : এই আবাসিক মহাবিদ্যালয়ে বি. টি. পড়িবার ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষের ছাত্রসংখ্যা ১৩৪। ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে ১৩১ জন বি. টি. পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১২৯ জন ডিগ্রী লাভ করেন, তন্মধ্যে ৪ জন ফার্স্ট ক্লাস পাইয়াছিলেন।

শিল্পমন্দির : সরকার-অনুমোদিত এই পলিটেকনিকে সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ তিন বৎসরের ডিপ্লোমাকোর্সে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন বিভাগের মোট ছাত্রসংখ্যা ৪৩৯। শিল্পমন্দির ছাত্রাবাসে ৯০ জন ছাত্র ছিল। শিল্পমন্দিরের ডিপ্লোমা-কোর্সের ফল সন্তোষজনক।

শিল্পায়তন : ১৪ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক বালকদের জন্য এই জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুলে ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে ১৩৪ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে।

শিল্পবিদ্যালয় : এখানে বিদ্যুতের কাজ, অটোমেকানিক, টার্নিং, ফিটিং, কার্পেন্টি ও তাঁতের কাজ শিখানো হয়। আলোচ্য বর্ষে ৬২ জন শিক্ষালাভ করে; ৫৫ জন ফাইন্যাল পরীক্ষা দেয় ও ৪২ জন উত্তীর্ণ হয়।

জনশিক্ষামন্দির : এই বিভাগ দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও নানা-প্রকার সেবার কাজ হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে ৯টি নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ৭০ জন বয়স্ককে সাক্ষর করা হইয়াছে। মোবাইল অডিও-ভিসুয়াল ইউনিট কর্তৃক ৮৮টি শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক ফিল্ম দেখানো হয়, মোট ৫৮,০০০ ব্যক্তি যোগদান করেন। প্রধান গ্রন্থাগার, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ও অন্যান্য ইউনিটের মাধ্যমে বিনা-চাঁদায় জন-সাধারণকে ১৮,৩২৬ খানি বই পড়িতে দেওয়া হয়। ২০০ জন শিশুকে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা হইয়াছিল। জনশিক্ষা-মন্দিরের অন্যান্য সেবামূলক কর্মের মধ্যে যুবকগণের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। শিশুগণকে এবং রুগ্ণ জননীদিগকে নিয়মিতভাবে দুগ্ধ বিতরণ করা হয়; ৪৬টি কেন্দ্রের মাধ্যমে এই কার্য পরিচালিত হইয়াছে।

তত্ত্বমন্দির : এখানে সাধু-ব্রহ্মচারীদের জন্য নিয়মিত শাস্ত্রক্লাস এবং জনসাধারণের জন্য সাপ্তাহিক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচ্য বর্ষে সারদাপীঠের অন্যান্য কার্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

জলপাইগুড়ি বন্যার্তসেবাকার্যে সারদাপীঠ অংশ গ্রহণ করে এবং বন্যাবিপর্যস্ত অঞ্চলের দুঃস্থ ছাত্রগণকে ৩,৬৪০·৫৮ টাকা মূল্যের পুস্তক দান করে।

সারদাপীঠে প্রতিমায় শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীদেবীর অর্চনা মনোজ্ঞভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

সারদাপীঠের বিভিন্ন বিভাগে ছাত্রগণকর্তৃক শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা সুন্দরভাবে ও উদ্দীপনা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়।

পাটনা : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের (রামকৃষ্ণ এভিনিউ, পাটনা ৪) এপ্রিল ১৯৬৮ হইতে মার্চ ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

পাটনায় এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ইহা রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে আশ্রমটির ৪৭তম বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে।

এই কেন্দ্রের কার্যাবলী প্রধানতঃ ত্রিধারায় পরিচালিত : শিক্ষা ও সংস্কৃতি, চিকিৎসা, ধর্ম।

আলোচ্য বর্ষশেষে আশ্রমের ছাত্রাবাসে (কেবল মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য) ২৩ জন বিদ্যার্থী ছিল, তন্মধ্যে ১২ জন বিনা-খরচে এবং ৩ জন আংশিক খরচে থাকিবার সুযোগ লাভ করে।

আশ্রম-ছাত্রাবাসের যে-সকল ছাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা দিয়াছিল সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজন ছাত্র পি-এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করিয়াছে এবং আর একজন ছাত্র এম.এসসি-তে ফার্স্টক্লাস পাইয়াছে।

আশ্রমের স্বামী তুরীয়ানন্দ গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। গ্রন্থাগারে ৮,১৮৭ খানি পুস্তক আছে, তন্মধ্যে ১১৫ খানি পুস্তক নূতন

সংযোজিত। পাঠাগারে ৮টি দৈনিক ও ৬৫টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। আলোচ্য বর্ষে পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তক সংখ্যা ১৫,২২৩; গড়ে দৈনিক পাঠকসংখ্যা ৬০।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমে বিভিন্ন বিষয়ে ১২টি বিশেষ বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

আশ্রম-কর্তৃক হোমিওপ্যাথিক ও অ্যালোপ্যাথিক উভয়বিধ চিকিৎসা-ব্যবস্থাই করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১৬,৭৯০ (নূতন ৭,৮৭৫) জন রোগী চিকিৎসা লাভ করিয়াছে।

অ্যালোপ্যাথিক বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৮৯,৬৩৬; তন্মধ্যে নূতন রোগী ১১,৩৪৪।

আশ্রমে এবং আশ্রমের বাহিরে নিয়মিত ধর্মক্লাস অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে মোট ২৩৯টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

সপ্তাহে দুইদিন পাণিনি-ব্যাকরণের ক্লাস, এবং প্রতি রবিবার সকালে শিশুদের জন্য গল্প বলার ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। একদশীতে শ্রীশ্রীরামনামসংকীর্তনে বহু ভক্ত যোগদান করেন।

প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে পাটনা অন্ধ স্কুলের ছাত্রগণকে এবং আশ্রম-পরিচালিত ডিস্পেনসারীর রোগীদিগকে ফল বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীরামনবমী, শ্রীবুদ্ধপূর্ণিমা, শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, খৃষ্টজন্মদিন, আচার্য শঙ্করের জন্মতিথি প্রভৃতি উদযাপিত হয়।

সভানুষ্ঠান

বেলঘরিয়া: রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী আশ্রমে গত ২০শে সেপ্টেম্বর স্বামী নির্বেদানন্দ স্মৃতিবক্তৃতা ও আশ্রমের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় সভায় পৌরোহিত্য করেন। আশ্রমের কর্মসচিব স্বামী ধ্যানাত্মানন্দের বিবৃতিপাঠের পর প্রধান অতিথি অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু 'রাজনীতিতে ধর্মের স্থান' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি রাজনীতিতে পূর্বে এবং বর্তমান সময়েও ধর্মোন্মত্ততা, রাজনীতির সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক ধর্মের মূলভাবের সমন্বয় প্রভৃতি আলোচনা করিয়া উপসংহার করেন: রাজনীতিতে ধর্মের মূল ভাব না থাকিলে, রাজনীতিকদের জীবনে ধর্মের মূল ভাবগুলির বিকাশ না ঘটিলে আদর্শকে রক্ষা করিয়া চলা সম্ভব নহে। স্বামী অমলানন্দ ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

জামসেদপুর: রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুলে গত ৪ঠা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর শতবর্ষজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্কুলের মনোরম পরিবেশে ছোট একটি প্রদর্শনী, গান্ধীজীর জীবন ও বাণী বিষয়ে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা, আলোচনা ও আবৃত্তি এবং শ্রীবি. এন. সাক্সেনার সভাপতিত্বে একটি আলোচনা ও পুরস্কারবিতরণী সভা আয়োজিত হয়; সভাপতি ও স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ গান্ধীজীর জীবন আলোচনা করেন, এবং স্কুলের ছাত্রীগণ প্রবন্ধ পাঠ ও আবৃত্তি করেন। পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী প্রভা সাক্সেনা। ভজনসঙ্গীত পরিচালনা করেন বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

ইছাপুর-ময়াল (আরামবাগ, হুগলী) গ্রামে গত ১০ই আগস্ট স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজাদি হয়; মধ্যাহ্নে প্রায় নয়শত ব্যক্তি প্রসাদ গ্রহণ করেন। এইদিন আরামবাগ শহরেও তাঁহার জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

গ্রামটিতে যাইবার ভাল রাস্তা ও যানবাহনের একান্ত অভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণ উহার সুব্যবস্থা এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর জন্মস্থানের উপর একটি চালাঘর তুলিয়া সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পটপ্রতিষ্ঠা ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

পরলোকে অমিয়াবালা বসু

গত ৪ঠা ভাদ্র ১৩৭৬ শ্রীমতী অমিয়াবালা বসু তাঁহার টালিগঞ্জস্থ বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭২ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের চরণে তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

পরলোকে ফণীশচন্দ্র সেনগুপ্ত

গত ৫ই সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ডাক্তার ফণীশচন্দ্র সেনগুপ্ত ৭৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন; হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া সহসা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ১৩০২ সালে তিনি মৈমনসিং জেলার সহদেবপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

দিনাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের তিনি একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; তিনিই দিনাজপুরস্থ নিজ ভবনের একটি গৃহে ইহার সূত্রপাত করেন। শেষ বয়সে তিনি কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমেই থাকিয়া সেখানকার ডিসপেনসারীতে সেবাকার্যে নিরত ছিলেন। এদুটি আশ্রমে ছাড়া ব্রহ্মদেশাগত উদ্বাস্তুগণের শিবিরেও তিনি সেবা করিয়াছিলেন। দিনাজপুরের সারদেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।

শ্রীরামকৃষ্ণচরণে তাঁহার আত্মা চিরশান্তিলাভ করুক।

এই সংখ্যার লেখকগণ

১। স্বামী চণ্ডিকানন্দ : বেলুড় মঠ
২। শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ
অধ্যাপক (বাংলা), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৩। শ্রীনির্মলকুমার বসু : কমিশনার, অনুন্নত সম্প্রদায়, নিউ দিল্লী
৪। ব্রহ্মচারী শশাঙ্ক : বেলুড় মঠ
৫। সেখ সদরউদ্দীন :
প্রধান শিক্ষক, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যাপীঠ, পানিহাটী (২৪ পরগণা)
৬। স্বামী অমলানন্দ :
রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, বেলঘরিয়া
৭। শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু :
অধ্যাপক (বাংলা), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৮। শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী : কলিকাতা
৯। শ্রীমনকুমার সেন : বেলঘরিয়া
১০। স্বামী চেতনানন্দ : অদ্বৈত আশ্রম, কলিকাতা

উদ্বোধন, ৭২তম বর্ষ, ১৩৭৬-৭৭

নিবেদন

বর্তমান বৎসরের পৌষ মাসে 'উদ্বোধন' পত্রিকার ৭১তম বর্ষ শেষ হইবে। আগামী মাঘ (১৩৭৬) মাস হইতে পত্রিকা ৭২তম বর্ষে পদার্পণ করিবে। পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে জানানো যাইতেছে, তাঁহারা যেন আগামী ২৫শে পৌষের (১০ই জানুআরির) মধ্যে তাঁহাদের **পুরা নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-সংখ্যা সহ** বার্ষিক চাঁদা ৭৲ টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দেন। তৎপূর্বে সংলগ্ন কার্ডখানি পূরণ করিয়া জানাইবেন মনিঅর্ডার-যোগে বা লোক মারফত টাকা পাঠাইতে চান অথবা মাঘ মাসের পত্রিকা ভি. পি. পি.-তে **গ্রহণ** করিতে চান; কার্ডটিতে ১০ পয়সার ডাকটিকিট আঁটিয়া পোস্ট **করিবেন।** (ভি. পি. পি.-তে লইলে ৭.৯০ টাকা লাগে। ৭৲ পত্রিকার চাঁদা এবং ৯০ পয়সা ভি. পি. পি. খরচ।)

অনিবার্য কারণে কাহারও পক্ষে আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকা সম্ভব না হইলে তাহা উক্ত কার্ডেই জানাইয়া দিবেন।

উক্ত তারিখের মধ্যে কোন গ্রাহক-গ্রাহিকার বার্ষিক চাঁদা ৭৲ টাকা না আসিলে অথবা তাঁহাদের নিকট হইতে সম্মতি- বা অসম্মতি-সূচক পত্র না পাইলে আমরা মাঘ মাসের পত্রিকা ভি. পি. পি.-তে পাঠাইব। **ভি. পি. পি. ফেরত দিলে আমাদের অযথা ক্ষতি হয়।**

সুদীর্ঘ ৭১ বৎসর ধরিয়া উদ্বোধন-পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারের কাজে আপনাদের সহায়তা আমরা পাইয়া আসিতেছি। আশা করি উহা অব্যাহত থাকিবে।

অফিসে চাঁদা জমা দিবার সময়: সকাল ৭টা— ১০-৩০ মিঃ
বিকাল ২-৩০ মিঃ — ৫টা

(রবিবার কেবল বিকাল ৩টা হইতে ৫টা)

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩



দিব্য বাণী

আত্মা জেয়ঃ সদা রাজ্ঞা ততো জেয়াশ্চ শত্রবঃ। ৬৭-৪
রাজ্ঞা হি পূজিতো ধর্মস্ততঃ সর্বত্র পূজ্যতে।
যদ্ যদাচরতে রাজা তৎ প্রজানাং স্ম রোচতে॥ ৭৩-৪

যো ন কামাদ্ভয়াল্লোভাৎ ক্রোধাদ্বা ধর্মমুৎসৃজেৎ।
দক্ষঃ পর্যাপ্তবচনঃ স তে স্যাৎ প্রত্যনন্তরঃ॥ ৭৮-২৭

—মহাভারতম্, শান্তিপর্ব

রাজা যিনি তাঁর করা চাই আগে
নিজ রিপুচয়ে, মনেরে জয়;
তারপরে তিনি জিনিতে যাবেন
বাহিরের যত শত্রুচয়॥
রাজা যদি করে ধর্মাচরণ
প্রজারও ধর্মে মতি যে থাকে,
রাজা যা করেন প্রজাদেরও তাই
করার ইচ্ছা সদাই জাগে॥

কীর্তিমান যে, সদাচারে রত,
কর্মকুশল ব্যক্তির 'পরে যার
নাই বিদ্বেষ, অকারণ কোন
অনর্থপাত করে যেই পরিহার,
দক্ষ যে জন, সদা মিতভাষী,
যে কভু ক্রোধে বা লোভে ভয়ে কামবশে
ধর্ম না ত্যজে, যোগ্য সে শুধু
মন্ত্রী হইয়া বসিতে রাজার পাশে॥

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং শুভানুধ্যায়ী ও অনুরাগী সকলকেই আমরা ৺ বিজয়ার শুভেচ্ছা ও প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইতেছি।

নেতৃত্ব ও ত্যাগ

বিপুল মানসিক শক্তি, ভালবাসা এবং ভিতরের একটি সুদৃঢ় অবলম্বন না থাকিলে যথার্থ ত্যাগ আসে না। এই শক্তির বিকাশও একদিনে হয় না, অবলম্বনও সহজলভ্য নয়—ইহার জন্য প্রয়োজন বহুদিনের সাধনা, জীবনব্যাপী অনুশীলন।

মানুষ অপরের জন্য স্বার্থত্যাগ করিবে কেন? নিয়মের চাপে বাধ্য হইয়া করিতে পারে, সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য বা আত্ম-প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার জন্য ভয়ে বা সঙ্কোচে করিতে পারে। কিন্তু এগুলি কোনটিই যথার্থ ত্যাগ নহে। পূর্বোক্ত বাধা অপসৃত হইলেই এসব ক্ষেত্রে স্বার্থ আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহার বিকট দ্রংষ্ট্রা লইয়া অপরকে দংশন করিতে উদ্যত হয় এবং সুযোগ পাইলে করেও।

বর্তমান অবস্থা

বর্তমান পৃথিবীতে এই সত্যটি আজ সর্ব-সমক্ষে অনাবৃত; বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে। দেশের জনগণের দুঃখে যাঁহাদের ঘুম হইতেছে না বলিয়া মনে হইত, দেশের জন-গণের দুঃখ নিবারণকল্পে যাঁহারা স্বার্থকে বলি দিয়াছেন বলিয়া মনে হইত, আজ ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁহাদের অনেকেই, প্রায় সকলেই, দেশের ও জনগণের স্বার্থকে অবহেলা করিতেছেন। শুধু অবহেলা নয়, নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহারা জনগণের স্বার্থকে অম্লানবদনে বলিও দিতেছেন। দেশসেবার, জনসেবার, দেশমাতৃকার পূজার বহুবিধ পদ্ধতি লইয়া দলে দলে বিভক্ত জনগণের সেবকেরা, পূজকেরা আজ বিভিন্ন পতাকাহস্তে পূজাবেদী-তলে সমবেত; কিন্তু সেবার, পূজার মনোভাবই কাহারো মধ্যে আছে বলিয়া মনে করা কঠিন হইতেছে; ব্যক্তিগত, দলগত বা মতবাদগত স্বার্থের উপর সর্বত্রই যেন সেবার একটি চাকচিক্যময় ক্ষীণ আবরণ এতদিন জড়ানো ছিল, যাহা আজ ক্ষীণতর, লুপ্তপ্রায় হইয়া সর্বজনসমক্ষে আসল স্বরূপটি উদ্ঘাটিত করিতেছে।

চলার পথে জনগণ আজ একযোগে নিশ্চিন্ত মনে নির্ভর করিবে কাহাদের নেতৃত্বের উপর? সে নেতারা কোথায়? এ প্রশ্ন আজ ব্যাপকভাবে জনচিত্তে জাগিতেছে।

ত্যাগ ও সেবার ভাবানলে পরিশুদ্ধচিত্ত, সর্বজনচিত্তে অমোঘ প্রভাব বিস্তারকারী সেই অনাগত নেতারা জন্মলাভ করিবেন তরুণ-চিত্তে; যদিও বর্তমান যুবসম্প্রদায়ের দিকে তাকাইলে তাহা কষ্টকল্পনা বলিয়াই মনে হয়। তবে সেখানে যে উচ্ছৃঙ্খলতা আজ আমরা দেখিতেছি তাহা সর্ববিষয়ে স্বাধীনতালাভের নবজাগ্রত প্রবল ইচ্ছাসম্ভূত, এবং শৃঙ্খলানুগামী না হইলে স্বাধীনতা যে অর্থহীন—এই বোধের অভাব হইতেই উদ্ভূত। কল্যাণপথের একটু

সহানুভূতিময় দিঙ্‌নির্দেশ পাইলেই এবং উচ্ছৃঙ্খলতা যে স্বাধীনতা নয় এ বোধ জাগিলেই শিক্ষিত চিন্তাশীল যুবকগণের মধ্য হইতে উহা অপসৃত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। জাতির উন্নতির পরিকল্পনায় সর্বাধিক মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন তাই এই বিষয়ে।

যুগ-প্রবণতা

তাছাড়া, আজ শুধু ভারতে নয়, সারা জগতেই মানুষের মন সবকিছুর সত্যতা নিজে যাচাইয়া দেখিতে চাহিতেছে; যাহা কিছু উজ্জ্বল, তাহাকেই স্বর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিতে সে আজ নারাজ। অপরদিকে ইহারই ফলে সমগ্র মানবজাতির সংস্কার পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে—ব্যক্তিগত ও জাতিগত মনের অবচেতন স্তরে শুভাশুভ যাহা কিছু সংস্কার, এবং মনের চেতন স্তরেও যাহা কিছু অশুভবৃত্তি এতকাল রাষ্ট্র ও সমাজের ভয়ে দমিত হইয়া আত্মগোপন করিয়াছিল, সবই আজ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। যুবসমস্যা, জাতীয় সমস্যা, আন্তর্জাতিক সমস্যা—আজিকার পৃথিবীর সবকিছু সমস্যার মূলে এই সংস্কার-মুক্তির প্রবণতাই একটি প্রধান ক্রিয়াশীল শক্তি।

সমগ্র মানবজাতির সমকালে সমভাবে এই জীবনবিপ্লবসাধনের প্রচেষ্টা এই বোধ হয় মানবজাতির ইতিহাসে প্রথম। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে বিকশিত এই আত্মবিশ্বাস, এই সবকিছুকে নিজে যাচাইয়া দেখিয়া লইবার ইচ্ছা—এই শুভাশুভ সব সংস্কারের নির্ভীক বিকাশ একদিকে তাহাকে বর্তমানে বহুক্ষেত্রে অশুভ সংস্কারকে মূল্যবান ভাবাইয়া বিপথে চালিত করিয়া বহু অনর্থের সৃষ্টি করিলেও অদূর ভবিষ্যতে ইহার কুফল তাহাকে অন্তরে অন্তরে অনুভব করাইবেই; কারণ মানুষের মন ও জীবন সম্বন্ধে মূল সত্যগুলি জড়প্রকৃতির নিয়মের মতোই অপরিবর্তনীয়, কয়েক হাজার বছর আগেও তাহা যেরূপ ছিল আজও সেরূপ আছে, যুগে যুগে যে পরিবর্তন আসে তাহা সেগুলির বহিঃপ্রকাশে, মূল সত্যে নহে। তখন বিশ্বমানবচিত্ত জীবনের অবলম্বনরূপে পাইবার জন্য মানবজাতির যুগ যুগ ধরিয়া সঞ্চিত ভাণ্ডার একবার অনুসন্ধান করিবে এবং তখন তাহার দৃষ্টি সেখানকার অমূল্য সম্পদের দিকে আকৃষ্ট হইবে। কিন্তু যদি আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা তাহাদের দৃষ্টি অচিরে সেদিকে ফিরাইতে না পারি, হয়তো তাহা ঘটিবে একটি প্রচণ্ড আঘাত পাইবার পর।

এই নবজাগ্রত বিশ্বচিত্ত জীবনের গভীরতর সত্যের সন্ধান পাইবার পর যে নবযুগের অভ্যুদয় হইবে, তাহা হইবে বিশ্ব জুড়িয়া, সমগ্র মানবজাতিকে একসূত্রে বাঁধিয়া, এক লক্ষ্যাভিমুখী করিয়া। আর তাহার নেতৃত্ব-শক্তির বিকাশ হইবে তরুণচিত্ত হইতেই।

নিজ বিচার-বিবেকবশে চলাই প্রগতি, পরানুকরণ নহে

কোন প্রচণ্ড আঘাতের পর সজাগ হইবার জন্য, অথবা কে কবে সজাগ করিতে আসিবে তাহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া এখনই সজাগ হইয়া উঠিতে আমরা তাই আবেদন জানাইতেছি তরুণ চিত্তের কাছেই। কোনও মতবাদ বা প্রচলিত সংস্কারকে মানিয়া লইয়া তাহার যন্ত্রের মতো চলিতে হইবে না, কোনও রাষ্ট্র-, সমাজ- বা ধর্ম-নেতার কথা তাহাদের নির্বিচারে মানিয়া লইয়া চলিতে হইবে না—বিচারের, যুক্তির, বাস্তব অভিজ্ঞতার কোন বাতায়নই রুদ্ধ

রাখিতে হইবে না,—নিজের সর্বশক্তিকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া তুলিয়া কোন কিছুকে গ্রহণ করিবার আগে স্বাধীন সবল নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া নিজে তাহা ভালভাবে যাচাই করিয়া লইলেই হইবে। কিন্তু স্বাধীন চিন্তার নাম করিয়া কাহারো কথামত একটিকে ছাড়িয়া আর একটিকে যেন অন্ধভাবে গ্রহণ করা না হয়, সংস্কারমুক্তির নামে যেন একটি সংস্কার ছাড়িয়া অপর একটি সংস্কারকে, বিশেষ করিয়া কুসংস্কারকে না গ্রহণ করা হয়। নিজের বিচার-বুদ্ধিকে সর্বাগ্রে জাগ্রত ও তীক্ষ্ণ করিয়া তাহারই সহায়ে নিজে যাচাইয়া দেখিয়া তারপর যাহা সত্য বলিয়া, নিজের পক্ষে, জাতির পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া মনে হইবে তাহা গ্রহণ করিয়া এবং দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া থাকিয়া জীবনগঠনে, রাষ্ট্রসেবায় অগ্রসর হইতে হইবে। চোখ বুজিয়া না চলিয়া চোখ খুলিয়া এবং দৃষ্টিকে কিঞ্চিৎ পশ্চাতে ও সম্মুখে প্রসারিত করিয়া ভালভাবে সব দেখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ইহা যুগধর্মানুসারে প্রগতির পথেই চলা নিজের যুক্তি ও অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে ভালভাবে আগে যাচাই করিয়া দেখিয়া তবে কিছু গ্রহণ করা—কেবল কাহারো কথা শুনিয়া নহে। অভিজ্ঞ লোকের কথা শুনিতে হইবে নিশ্চয়ই, কিন্তু পরীক্ষার জন্য। সোনা বলিয়া কেহ কিছু দেওয়া মাত্র তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া আধুনিক মুক্ত মনের পরিচায়ক নহে, কষ্টিপাথরে যাচাইয়া তাহা যদি অন্যরূপ দেখা যায়, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে। আবার, ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট হইতে আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহাও যেন এই কষ্টিপাথরে একবার যাচাইয়া লই এবং এভাবে দেখিয়া উহার মধ্যে নিখাদ স্বর্ণরূপে যাহা পাইব, অপর কাহারো কথায়, তিনি যত বড় লোকই হউন, তাহা প্রাচীন বলিয়াই যেন ফেলিয়া না দিই। যদি এরূপ না করিতে পারি, তাহা হইলে সত্তর বৎসর পূর্বের ভারতবাসীর যে পুরানুকরণপ্রিয় দুর্বল মানসিক অবস্থার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "ভালমন্দ-নির্ণয় এখন আর নিজের বিচার-বিবেক দ্বারা হয় না, পাশ্চাত্যবাসীরা যাহা ভাল বলে তাহাই ভাল বলিয়া এবং যাহা মন্দ বলে তাহাই মন্দ বলিয়া বিবেচিত হয়"—সে অবস্থা হইতে প্রগতির পথে আমরা আগাইয়া আসিয়াছি বলা চলিবে কি? আজ প্রগতির যুগে আমাদের যেমন অন্ধভাবে কোন কুসংস্কার আঁকড়াইয়া থাকা চলে না, তেমনি চলে না অন্ধ অনুকরণও; প্রয়োজন, নিজের বিচার-বিবেক দ্বারাই নিজ জীবনের ও জাতির ভালমন্দ নির্ণয় করা।

অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জননেতাদের কথা আমাদের প্রথমে শুনিতেই হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুনিবার পর নিজের বিচার-বিবেক দ্বারা তাহা যাচাইয়া দেখিয়া এবং যেখানে সম্ভব নিজে কিছুটা পরীক্ষা করিয়া তবে তাঁহাদের কথামত স্রোতে গা-ভাসানোই ভাল। নতুবা সময় ও ঘটনার স্রোতের টানে পড়িয়া প্রপাতের মুখে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবার প্রাক্কালে সজাগ হইলে কোন লাভই নাই।

মানিয়া লওয়া নয়, যাচাইয়া লওয়া

জীবনের পক্ষে কোন্‌টি কল্যাণকর, কোন্‌টি অকল্যাণকর তাহা আন্তরিক চেষ্টা করিলে আমরা সকলেই নিজে দেখিয়া বুঝিয়া লইতে পারি। খুব সাধারণভাবে বলা যায়, যাহা কিছু দেহ মনকে সবল করে, তাহাই জীবনের পক্ষে কল্যাণকর, তাহার বিপরীত যাহা—যাহা প্রথম হইতেই দেহমনে দুর্বলতার সঞ্চার করে,

অথবা প্রথমে হাউই-এর মত উদ্ভাসিত হইয়া, সাময়িক শক্তির বিকাশ ঘটাইয়া পরে মনকে শূন্যগর্ভপ্রায় করিয়া তোলে, অবসাদ আনে, দুর্বলতা আনে, তাহাই অকল্যাণকর। যেমন একটি উদাহরণ দিতেছি। আজকাল সংস্কার-মুক্তির নামে আমরা ভারতীয় জীবনপরিকল্পনায় অনুপ্রবিষ্ট কিছু অশুভ সংস্কারের সঙ্গে সংযম ও একাগ্রতার অভ্যাস প্রভৃতি সে পরিকল্পনার ভিত্তিস্বরূপ কয়েকটি শুভসংস্কারেরও উচ্ছেদ সাধনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি, এবং উহাকেই প্রগতির পথ বলিয়া, বুদ্ধিমত্তার, নির্ভীকতার পরিচায়ক বলিয়া ভাবিতেছি। কিন্তু কখনও নিজে অভ্যাস করিয়া মনের অনুভূতির কষ্টি-পাথরে যাচাই করিয়া দেখিয়াছি কি—এগুলির অভ্যাস দেহমনকে, ইচ্ছাশক্তিকে, পৌরুষকে অধিকতর বিকশিত করে কি না, জাতির সেবার জন্য একান্ত প্রয়োজন স্বার্থত্যাগের শক্তি আনে কি না? জীবনের কত সময় তো কত বৃথা কাজে আমরা ব্যয়িত করি; জীবনকে লইয়া নিজেই ছিনিমিনি খেলিবার বা অপরকে খেলিতে দেওয়ার আগে অল্প কিছুদিন এগুলি অভ্যাস করিয়া নিজে দেখিয়া লইতে ক্ষতি কি? জড়বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যগুলি যতখানি সত্য, সংযম ও একাগ্রতার অভ্যাস যে দেহমনকে সবলতর করে ইহাও ততখানি সত্য। মাত্র কয়েকদিনের আন্তরিক অভ্যাসেই ইহার সত্যতা অনুভূত হইবে; প্রতিটি দিনের অভ্যাস অধিকতর শক্তির দ্বার খুলিয়া দিবেই। কোন পাত্রে রক্ষিত জল সর্বদা নড়িলে যেমন তাহাতে সূর্যের যথাযথ প্রতিবিম্ব পড়ে না, জলটি যত স্থির হয় প্রতিবিম্ব তত পরিষ্কার হয়, তেমনি সদাচঞ্চল মনও, বিক্ষিপ্ত একাগ্রতাহীন মনও কখনো সত্যকে যথাযথরূপে ধরিতে পারে না।

আজ মনকে ভোগলোলুপ ও চঞ্চল করাই-বার আয়োজন প্রচুর। উহাতে প্রলুব্ধ হইলে মন স্বতই সত্যকে চিনিবার শক্তি হারায়। এরূপ দুর্বল মনকে ভুলাইয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগানো সহজ; তাহার উপর যদি একটা আদর্শের সমর্থন তাহাতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে তো কথাই নাই। তারপর? তারপর আমার তো কার্যসিদ্ধি হইল তোমরা তোমাদের মেরুদণ্ডহীন স্বাধীনচিন্তাহীন ভবিষ্যৎ জীবন বরণ কর, আমাদের আরো সুবিধা হইবে; আর যদি বা তখন সত্যের সন্ধান করিতে চাও কেহ, তাহার পথে এমন বাধা সৃষ্টি করিব যে আমাদের কথা মানিয়া লওয়া ছাড়া তোমার আর গত্যন্তর থাকিবে না।

নেতৃত্ব ও ত্যাগ

অপরের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করা, ইহা অপেক্ষা বড় আদর্শ, জীবনের স্বার্থকতা আর কিছুই নাই, ইহা অতি সত্য; কিন্তু যদি তাহা সত্যই উৎসর্গ হয়, যদি তাহা নিরুপায় হইয়া করা না হয়, যদি তাহাতে স্বার্থসিদ্ধিরও কোন গন্ধ না থাকে। নিজ স্বার্থরক্ষার্থে সমষ্টির জন্য যেটুকু স্বার্থ আমাদের বলি দিতেই হয়, না দিলে চলে না, বা দিতে বাধ্য হইতে হয়, উহা ত্যাগ নহে, স্বার্থহীনতা নহে, উহা সর্বসাধারণের কর্তব্য; যেমন রাষ্ট্র বা সমাজ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম মানিয়া চলা। উহা করিতে না পারিলে মনুষ্যসমাজে বাস করিবার অধিকারও তো থাকে না কিন্তু স্বার্থ-ত্যাগ আরো বড় জিনিস। সেখানে নিজের জন্য কিছু চাওয়া, কোন দাবী থাকে না, অপরের—রাষ্ট্রের, সমাজের কল্যাণই থাকে পূজাপীঠে, আর নিজের সব কিছু, এমন কি প্রয়োজন হইলে নিজের মতও অর্ঘ্যরূপে বিসর্জিত হয় সে পূজাপীঠতলে। সেখানে কোন 'আমি' দেহমন-

বুদ্ধির কোন দাবী লইয়া থাকে না। স্বামীজীর ভাষায়, "আমিটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে" তবে যথার্থ দেশসেবা বা সমাজসেবা করা চলে। যদি অন্যায়-অবিচারও করে দেশবাসী সে সেবকের প্রতি, তথাপি 'আমি তোমাদের জন্য এত করিলাম, আমার কি এই প্রাপ্য?'—এ দাবী লইয়াও কোন 'আমি' মাথা তোলে না সেখানে। গুরু গোবিন্দের উদাহরণ দিয়াছেন স্বামীজী—দেশের কল্যাণের জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিলেন তিনি; তাঁকেই দেশবাসীরা দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল, কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাহারও উপর কোন দোষারোপ করিলেন না তিনি—নীরবে দাক্ষিণাত্যে প্রাণত্যাগ করিলেন।

দেশের, সমাজের কোটি কোটি লোকের ভবিষ্যৎ যাঁহাদের হাতে, তাঁহাদের এরূপই হইতে হইবে। সম্পূর্ণরূপে স্বার্থত্যাগী, সত্যকে চিনিবার মতো দৃষ্টিসম্পন্ন, অচঞ্চল ও প্রবল মানসিক শক্তিসম্পন্ন। সংযম ও একাগ্রতার সাধনাই নেতাকে এরূপ গুণভূষিত করিতে পারে। আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস এরূপ বহু দেশসেবকের নাম স্বর্ণাক্ষরে বুকে আঁকিয়া রাখিয়াছে—দেশের কল্যাণে নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প, বজ্রদৃঢ় মানসিক শক্তিসম্পন্ন যাঁহারা। মানুষটি যদি খাঁটি হয়, দেশের জনগণের কল্যাণই যদি তাহার একমাত্র লক্ষ্য হয়, তাহার স্বার্থ যদি সে-কল্যাণসাধনের পথে কোথাও বাধারূপে না দাঁড়ায়, তাহা হইলে মতবাদে খুব বেশী কিছু আসে যায় না; যদি তাহাতে কিছু ভুলও থাকে, পরে নজরে আসা মাত্র তাহা সংশোধিত হইয়া যাইবেই।

তরুণদের নিকট আবেদন

এই খাঁটি মানুষই এখন প্রয়োজন নেতৃত্বের জন্য। আমরা তাহার জন্য উৎসুক হইয়া চাহিয়া আছি তরুণচিত্তের দিকে, তাহার সাময়িক বহু ত্রুটি সত্ত্বেও। দোষ ত্রুটি প্রায় সকলেরই থাকে, কম-বেশী; তাছাড়া এমন কোন দোষ নাই যাহা মানুষের উন্নতিপথ চিররুদ্ধ করিতে পারে। প্রয়োজন শুধু দোষটি নজরে আসামাত্র তাহা সংশোধনের চেষ্টা, মন যত নীচেই নামিয়া আসুক তাহা লইয়া মনকে ভারাক্রান্ত না করিয়া উপরের দিকে দৃষ্টি যাওয়ামাত্র মুক্ত বিহঙ্গের মতো ঊর্ধ্বগামী হওয়া—"Spit out your actions, good or bad, never think of them again.…be *azad*." দেশে খাঁটি মনের অভাব, একথা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু প্রয়োজনের সময় নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিলে তাহার থাকা না-থাকা সমান। তরুণগণকে তাই আজ আমরা আকুল আবেদন জানাই- নিজেদের বিচারবুদ্ধি যতদূর সম্ভব গভীর কর, বিস্তৃত কর, কিন্তু আংশিকভাবে নহে, দেশবিশেষের জ্ঞানভাণ্ডারমাত্র হইতে নহে, 'ম্যনবজাতির' জ্ঞানভাণ্ডার হইতে—কেবল বহির্জগতের নহে, ভারতের জ্ঞানভাণ্ডার হইতেও জ্ঞান আহরণ করিয়া। জীবনকে দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, গরিষ্ঠ করিবার জন্য তোমার স্বদেশের মহামানবগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাও সত্য কি না নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখ, এবং উহা সত্য বলিয়া অনুভব করিলে সে উপায়ে, বা অন্য যে উপায় তুমি সত্য বলিয়া অনুভব করিবে, সে উপায়ে নিজের দেহমনকে বলিষ্ঠ করিয়া তোল; অপরের কল্যাণের জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিবার মতো শক্তি সঞ্চয় কর। ভারতকে মহীয়সীর আসনে তুলিতে হইবে তোমাকেই। কৌশলে ইহা হইবার নহে, "চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য সাধিত হয় না",—ইহার জন্য প্রয়োজন বিপুল আত্মত্যাগ; কেবল নেতাদের নহে, কোটি কোটি

জনগণেরও ; কিন্তু ভুলিও না, স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা বাধ্য হইয়া ত্যাগ নহে—উহা ত্যাগ পদ-বাচ্যই নয়—স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আত্মনিবেদন। চিরকালই অপরের কল্যাণ সাধনের একমাত্র উপায় এই ত্যাগ বা আত্মবিসর্জন—"আত্ম-বিসর্জনই ছিল অতীতের ধারা—হায়, যুগ যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে। পৃথিবীতে যাঁরা বীরোত্তম ও সর্বোত্তম, তাঁদের আত্মোৎসর্গ করতে হবে 'বহুজনহিতায়' 'বহুজন-সুখায়'।"

এ ত্যাগ তোমাকে বঞ্চিত করিবে না—আনন্দের অমৃতত্বের উৎসদ্বার খুলিয়া দিবে তোমার অন্তরে—যাহার অতি সামান্য অংশ-মাত্রই ভোগে পাওয়া যায়। আর যদি পার, দেশকে মানুষকে এক পরমসত্তার, তোমার নিজেরই সত্তার বিকাশমাত্র ভাবিয়া সেই সত্তার, 'ঈশ্বরের' পূজার্ঘ্যরূপে ত্যাগ করিতে শিখিও। তরুণচিত্তই শিক্ষার উপযুক্ত ভূমি। তোমাদের উপরই তাই স্বামীজী ভরসা করিয়াছিলেন সর্বাধিক ;—"এই-ই সময় তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন-গতি স্থির করিবার—যতদিন যৌবনের তেজ রহিয়াছে, যতদিন না তোমরা কর্মশ্রান্ত হইতেছ, যতদিন তোমাদের ভিতর যৌবনের নবীনতা ও সতেজ ভাব রহিয়াছে ; কাজে লাগ, এই-ই সময়। কারণ, নব-প্রস্ফুটিত, অস্পৃষ্ট, অনাঘ্রাত পুষ্পই কেবল প্রভুর পাদপদ্মে অর্পণের যোগ্য—তিনি উহা গ্রহণ করেন।" সেই মানুষরূপী ভগবানের চরণে "তোমাদের জাতির কল্যাণের জন্য, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য আত্মবলি-দানই শ্রেষ্ঠ কর্ম।" আত্মবলিদানেরই অপর নাম স্বার্থত্যাগ।

"শ্রেষ্ঠ নেতা তিনিই যিনি 'শিশুর মতো নেতৃত্ব করেন।' শিশুকে আপাততঃ অন্যের উপর নির্ভরশীল মনে হলেও, সেই-ই বাড়ীর রাজা। অন্ততঃ আমার ধারণায় এখানেই নেতৃত্বের রহস্য।"

"এস, মানুষ হও।···তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? তোমরা কি দেশকে ভালবাস? তাহলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য, উন্নত হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

"শক্তিপূজার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়।...মানুষ সর্বকালে যতটুকু শ্রদ্ধাভক্তির সহিত যে কোনও শক্তির যে পরিমাণে উপাসনা করিয়াছে, সেই পরিমাণে ফলও হাতে হাতে পাইয়াছে।... তবে অঙ্গহীন হইলে বা বিধি- ও শ্রদ্ধা-বিরহিত হইলে পূজার সম্পূর্ণ ফললাভ অসম্ভব এবং সময়ে সময়ে বিপরীত ফলও ঘটিয়া থাকে। যে-পূজায় যে-যে উপকরণ আবশ্যক, তাহা আয়াস-সাধ্য হইলেও একত্র করিতে হইবে; যে কারণসমূহের সংযোগে যে বিশেষ ফলের উৎপত্তি, সে সমূহের একত্র সংযোগ চাই। এ কথাটি যেমন বড়ই সোজা, তেমনি বার বার মানুষ ভুলিয়াও যায়। এদেশে আমরা এ কথাটি আজকাল কতই না ভুলিয়াছি ফলও তদ্রূপ পাইতেছি। সমগ্র দেশ আজ শক্তিপূজার আড়ম্বরে ব্যস্ত থাকিয়াও নির্বীর্য, ধর্মহীন, বিদ্যাহীন, ধনহীন, অন্নহীন, শ্রীহীন। দোষ— পূজাবিধির ব্যতিক্রম। রসায়ন-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তিলাভ করিবে বলিয়া যদি কেহ ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন-ভোজন ও নির্জনে বীজমন্ত্র জপ করিতে থাকে, তাহার ফল-প্রত্যাশা কোথায়? ...মহামারীর প্রতিবিধান-উদ্দেশ্যে যদি কেহ বাহ্যশৌচের বিধানসকল সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া, খাদ্য-পানীয়ের বিচার না রাখিয়া কেবলমাত্র কয়েকঘণ্টা উচ্চরোলে হরিসংকীর্তন করে, তবে তাহার চেষ্টা বাতুলতা ভিন্ন আর কি বলা যাইবে?...স্বদেশের কল্যাণ-সাধনের জন্য যিনি অহরহঃ বক্তৃতাদানেই ব্যস্ত, কিন্তু একবিন্দু স্বার্থত্যাগে সর্বদাই পশ্চাৎপদ, তাঁহার উপাসনাই বা কি ফল প্রদান করিবে? কথায় বলে, 'যে বিবাহের যে মন্ত্র' তাহার উচ্চারণ চাই। এরূপ শ্রদ্ধাহীন, বিধিহীন, মন্ত্রহীন, অদক্ষিণ পূজা করিয়া বলিব, 'পূজার ফল তো পাইলাম না।' হায় মানব, তোমার সহজ বুদ্ধির কি একান্ত অভাবই হইয়াছে!" ('ভারতে শক্তিপূজা')

—স্বামী সারদানন্দ

সাম্যবাদ ও স্বামীজী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার

সাম্যবাদ বলতে বর্তমানে আমরা ধন-বৈষম্যের বিরোধী ভাবকে বুঝে থাকি। ধনসাম্যই ইহার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু ভারতে প্রাচীনকাল হতে যে সাম্য ও মৈত্রীর বাণী জগতের বিভিন্ন অংশে প্রচারিত হয়ে আসছে, তার মূল কথা ধনসাম্যই শুধু নয়। বলপ্রয়োগের দ্বারা ধনসাম্য প্রতিষ্ঠিত করলেও তা থেকে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। মৈত্রী থাকে বহু দূরে। মৈত্রীই হল ভারতের বাণী।

বর্তমান সমাজে শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত আছে। পূর্বেও ইহা ছিল। এই জাতি-বিভাগের সহিত ধনবৈষম্যের কোন সংস্রব ছিল না। কোন কোন পণ্ডিতের মতে—আর্যজাতির ভারতে আগমনের পূর্ব হতেই তাদের মধ্যে জাতিবিভাগ বর্তমান ছিল, কোন-না-কোন আকারে।

শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন—"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ?" এখানে একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, শ্রীভগবান "চতুর্বর্ণ" শব্দটি ব্যবহার করেননি। তিনি বলেছেন—"চাতুর্বর্ণ্যং", অর্থাৎ শব্দটি গুণবাচক বিশেষ্য পদ। উক্ত গুণগুলি ও কর্মসকলের পরিমাণ ও অনুপাতের ক্রম অনুসারেই আমাদের মধ্যে জাতিবিভাগ এসেছিল, কালক্রমে এই অতি প্রয়োজনীয় প্রথাটি, যার উপরে ভিত্তি ক'রে সমাজ গঠিত হয়েছিল—হয়ে পড়ে দূষণীয় এবং অপরিবর্তনীয়। বংশানুক্রমণই বৃহৎ আকারে দেখা দেয় এবং গুণ ও কর্মের বিচার ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়।

তাই পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"হিন্দুগণ! তোমাদিগকে ইহাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, এই মহান জাতীয় অর্ণবপোত শত শতাব্দী যাবৎ হিন্দুজাতিকে পারাপার করিতেছে। সম্ভবতঃ আজকাল উহাতে কয়েকটি ছিদ্র হইয়াছে, হয়তো উহা কিঞ্চিৎ জীর্ণও হইয়া পড়িয়াছে—যদি তাহাই হইয়া থাকে তবে আমাদের ভারতমাতার সকল সন্তানেরই এই ছিদ্রগুলি বন্ধ করিয়া পোতের জীর্ণতা সংস্কার করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত।" দেখা যায় শ্রীমৎ স্বামীজী, জাতিভেদ যা বর্তমানে প্রচলিত আছে তার বিরোধী ছিলেন, তবে 'গুণকর্মবিভাগশঃ' যে জাতিবিভাগ স্বামীজী তা উচ্ছেদ করতে প্রয়াসী নন; স্বামীজী সংস্কার করতে ইচ্ছুক তবে সংস্কারের পন্থা হিসাবে তাঁর পূর্ববর্তী সংস্কারকগণ যে উপায় অবলম্বন করেছেন, স্বামীজী তার বিরোধী ছিলেন। স্বামীজীর মতে শুধু নিন্দাবাদ ও গালিবর্ষণের দ্বারা সংস্কার সম্ভব নয়।

স্বামীজী বলেছেন—"এই শতবর্ষব্যাপী সমাজসংস্কার আন্দোলনের ফলে সমগ্র দেশে কোন স্থায়ী শুভফল হয় নাই। বক্তৃতামঞ্চ হইতে সহস্র সহস্র বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে—হিন্দু জাতি ও হিন্দু সভ্যতার মস্তকে অজস্র নিন্দাবাদ ও অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি সমাজের বাস্তবিক কোন উপকার হয় নাই।" কেন হয় নাই? ইহার উত্তরে স্বামীজী বলছেন, "প্রথমতঃ আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য

রক্ষা করিতে হইবে—কিন্তু দেখা যায়, আমাদের অধিকাংশ আধুনিক সংস্কারই পাশ্চাত্য কার্যপ্রণালীর বিচারশূন্য অনুকরণ মাত্র। ভারতে ইহার দ্বারা কাজ হইবে না। দ্বিতীয়ত: কাহারও কল্যাণ সাধন করিতে হইলে নিন্দা ও গালিবর্ষণের দ্বারা কোন ফল হয় না।”

সুতরাং এ থেকে প্রতিপাদন করা যায় যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক শ্রেণী-বিভাগকে নষ্ট বা ধ্বংস করলেই যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে—একথা বলা যায় না। স্বামীজীর প্রকল্পিত সাম্যের ভিত্তি ছিল মৈত্রীর উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাই স্বামীজী কখনও বিনাশ বা ধ্বংস চাইতেন না, তিনি চাইতেন সংস্কার বা adjustment.

ভারতীয় আদর্শ শ্রেণীবিভাগের শীর্ষস্থানে ছিলেন ব্রাহ্মণ। স্বামীজী বলছেন—“ব্রাহ্মণই আমাদের পূর্বপুরুষগণের আদর্শ ছিলেন। ‘ব্রাহ্মণ আদর্শ’ বলিতে আমি কি অর্থ বুঝিতেছি? —যাহাতে সাংসারিকতা একেবারে নাই, এবং প্রকৃত জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে বর্তমান, তাহাই আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব। ইহাই হিন্দুজাতির আদর্শ।”

ব্রাহ্মণ বলিতে এমন এক ব্যক্তিকে বুঝায়, “যিনি স্বার্থপরতা একেবারে বিসর্জন দিয়াছেন। যাঁহার জীবন জ্ঞান-প্রেম লাভ করিতে ও উহা বিস্তার করিতেই নিযুক্ত, তাঁহাকে কাহারও শাসন করিবার কি প্রয়োজন? তাঁহার কোন প্রকার শাসনতন্ত্রের অধীনে বাস করিবারই বা কি প্রয়োজন?”

স্বামীজী বলছেন—“সত্যযুগে একমাত্র এই ব্রাহ্মণজাতিই ছিলেন। আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই—প্রথমে পৃথিবীর সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। ক্রমে তাঁহাদের যতই অবনতি হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। আবার যখন যুগচক্র ঘুরিয়া সত্য-যুগের অভ্যুদয় হইবে, তখন আবার সকলেই ব্রাহ্মণ হইবেন।” সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, উচ্চবর্ণকে টেনে নীচে নামালে, আহারবিহারে যথেচ্ছাচারিতা দেখালে বা নিজ নিজ বর্ণের মর্যাদা লঙ্ঘন করলেই জাতিভেদ-সমস্যার মীমাংসা হবে না। পরন্তু আমরা প্রত্যেকেই যদি ধার্মিক হবার চেষ্টা করি, প্রত্যেকেই যদি আদর্শ ব্রাহ্মণ হই, তবেই এই জাতিভেদ-সমস্যার সমাধান হবে। নতুবা নয়। শুধু ভারতেই নয়, সমস্ত পৃথিবীতে এই আদর্শ প্রচার করতে হবে। আমাদের জাতিভেদের অর্থ হল এই। এইভাবে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে তখন আর ধনবৈষম্য ও ধনকৌলীন্য বলপ্রয়োগে নষ্ট করতে হবে না।

আমরা যারা ইউরোপের ইতিহাস আলোচনা করেছি, তারা বলি যে, বিগত ফরাসী বিপ্লবেই প্রথমে আমরা শুনলাম গণতন্ত্রের বাণী এবং সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী

বলছেন—আমাদের বেদান্তের বাণীই হচ্ছে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী। আত্মার স্বাধীনতা, আত্মার একত্বের উপলব্ধিই হল বেদান্তধর্মের মূলকথা।

স্বামীজী ছিলেন বাস্তববাদী। তিনি প্রচার করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত practical religion। তাই তিনি বলতেন—যে ভগবান ইহলোকে তোর জন্য দুটি ডাল-ভাতের ব্যবস্থাও করতে পারেন না, সে ভগবান দেবেন তোকে পরকালে মুক্তি—একথা আমি বিশ্বাস করি না।

বলতেন—আমি সর্বদা বলি “দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব।” দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞান, ইহারাই আমাদের দেবতা হোক—এই তিনি বলতেন।

তিনি বলতেন ব্রাহ্মণযুগ অতীত হয়ে গেছে। ক্ষত্রিয়যুগেরও অবসান হয়েছে। বৈশ্যযুগ অবসিতপ্রায়। এখন শূদ্রযুগ আসছে। অর্থাৎ শ্রমিক ও কৃষকের যুগ এসে যাচ্ছে। এরাই করবে এখন শাসন। কিন্তু স্বামীজী প্রাচীন জাতিবিভাগ-তত্ত্বের সারবত্তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেও তথাকথিত অর্থহীন কঠোর ও নিষ্ঠুর জাতিবিভাগ এবং উচ্চবর্ণীয়দের নিম্নশ্রেণীর উপরে নিপীড়ন সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ লক্ষণীয়।

তিনি বলছেন, "তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্চ, দশ হাজার বচ্ছরের মমি!! যাদের 'চলমান শ্মশান' ব'লে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই (নিম্ন-বর্ণীয়দের) মধ্যে। আর চলমান শ্মশান হচ্চ তোমরা। তোমাদের বাড়ী-ঘর-দুয়ার মিউজিয়ম, তোমাদের আচার-ব্যবহার, চালচলন দেখলে বোধ হয় যেন ঠানদিদির মুখে গল্প শুনছি!...এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা—তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা। তোমরা ভূতকাল—লুঙ্‌ লঙ্‌ লিট্‌ সব একসঙ্গে।... ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য; তোমরা ইৎ—লোপ লুপ্‌।...ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংসহীন কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না?...তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনী-শক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে, আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না। এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচারবল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ ক'রে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।"

স্বামীজী উক্ত কথাগুলি বলেছেন ১৮৯৯ সালে, যখন তিনি দ্বিতীয় বার পাশ্চাত্য দেশে যাত্রা করেন। আর আজ বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ। আজ উচ্চবর্ণেরা ক্রমশঃ বিলীন হয়ে যাচ্ছে, এবং মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে শ্রমিক-ও কৃষকশ্রেণী। শাসনতন্ত্রও নিয়ন্ত্রণ করতে যাচ্ছে এই তথাকথিত নিম্নশ্রেণী। এখানে আমরা দেখতে পাই স্বামীজী যা বলেছিলেন, তাই হতে চলেছে। তবে তাঁর সাম্যবাদ ধ্বংসাত্মক নয়। সে সাম্যবাদ কালানুযায়ী ঘটনা-পরম্পরার সংঘাতজনিত, ইতিহাসের অমোঘ ফলস্বরূপ, গঠনাত্মক সাম্যবাদ, ধর্ম-ভিত্তিক।

আমাদের শাস্ত্রে আছে 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব'। কিন্তু স্বামীজীই শুধু বলছেন "দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব।" অর্থাৎ দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞান, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে।

আরও তিনি বলেছেন—"যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না,

এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি।" এর চেয়ে দরদের কথা বা সাম্য ও মৈত্রীর কথা আর কি হতে পারে, তা আমাদের জানা নেই।

স্বামীজী বলছেন: জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন-গঠনের পন্থা। যদি পর্বত মহম্মদের নিকট না আসে, তবে মহম্মদকেই পর্বতের নিকটে যাইতে হইবে।" দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার নিকট পৌঁছিতে না পারে তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙ্গলের কাছে, মজুরের কারখানায় পৌঁছিতে হইবে। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে তাদের উন্নত করতে হবে।

"ঘৃণাশক্তি হইতে প্রেমশক্তি অনন্তগুণে অধিক শক্তিমান"—এই উক্তিটির যাথার্থ্য বিচার করলেই বুঝতে পারা যাবে যে, স্বামীজী যে সাম্যবাদের কথা বলেছেন, তার মূল শক্তি নিহিত কোথায়, বর্তমানে প্রবর্তিত সাম্যবাদ ও স্বামীজীর উক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতে তফাত কোথায়।

অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন কোন এক জড়বাদী প্রতিভাধর ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে সাম্যবাদে ধর্মের কোন স্থান থাকতে পারে না বা তিনি হয়তো বলতে পারেন যে, religion is the opium of the people; কিন্তু তাঁর এই উক্তি এখানে বিচার্য বিষয় নয়। উক্তিটি কেন তিনি করলেন, তা জানতে হলে আমাদের এগুতে হবে জড়বাদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, অধ্যাত্মবাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে তা অর্থহীন। অধিকন্তু সেই দেশের, সেই কালের অবস্থা, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার কথা ভাবতে হবে, যখন ধর্ম অধিকাংশ স্থলে শুধু স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত, আসল ধর্মের রূপ যখন চোখেই পড়ত না। উক্তিটির সার্থকতা সেখানে। কিন্তু স্বামীজীর সাম্যবাদ দেশ-ও কাল-বিচারের ঊর্ধ্বে। তিনি যখন যা বলেছেন, তা বলেছেন সর্বজনীনতার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁর উক্তিসমূহ সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য এবং এগুলি সর্বজনীন বা বিশ্বজনীন সত্য।

স্বামীজী স্বদেশে ভারতবাসীকে, তাঁর স্বদেশবাসীকে উদ্দেশ করে বলছেন, "হে ভারত, ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শংকর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়-সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে;··· ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই!··· বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই,; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ" ইত্যাদি।—এর চেয়ে উঁচু ধর্মাদর্শ, সাম্যবাদ ও দেশপ্রেমের কথা আর কি থাকতে পারে, তা আমাদের জানা নাই। স্বামীজী এখানে তাঁর স্বদেশবাসিগণের উদ্দেশে যদিও বলেছেন কথাগুলি, তবুও তাঁর এই বাণীসমূহ বিশ্বজনীন এবং দেশ-কালের ঊর্ধ্বে—বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং বিশ্বপ্রেমের প্রতীক ও প্রতিধ্বনি। স্বামীজী ব্রাহ্মণদের অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত জনগণের উদ্দেশে, তাঁদের শিক্ষা সম্বন্ধে যা বলেছেন—তাও এখানে প্রণিধানযোগ্য। সাম্যবাদের ভিত্তিতেই তাঁর এই উক্তি। তিনি

বলছেন—"হে ব্রাহ্মণগণ, তোমাদের সন্তানগণের জন্য, যারা স্বভাবতই তীক্ষ্ণধী, যদি প্রয়োজন হয় একজন শিক্ষকের, তাহলে শূদ্রের সন্তানগণ—যারা স্বাভাবিকভাবেই অনগ্রসর, তাদের জন্য প্রয়োজন হবে চারজন শিক্ষকের।" যখন অন্ত্যজ বা শূদ্রদের শোষণ ক'রে তুমি আজ সম্ভ্রান্তপদবাচ্য ও বিত্তশালী, তখন তাদের প্রতিও তোমার কর্তব্য আছে। অর্থাৎ তাদের জন্য তোমাকেই চারজন শিক্ষকের ব্যয়ভার বহন করতে হবে। অন্যথা তুমি হবে প্রত্যবায়ভাগী। দলিত ও চির-অনাদৃত ও নিষ্পেষিতদের জন্য তাঁর হৃদয় মথিত ক'রে এই বাণী তাঁর শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল। তাই বলা যায়, স্বামীজীর বাণীসমূহে যে-সাম্যবাদের কথা সেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে শুনতে পাই, তা অতীব অনন্যসাধারণ ও বিস্ময়কর।

তাই মনে হয়, আমাদের অগ্রগতির পথে স্বামীজীর বাণী সর্বদা স্মরণে রেখে এগুলে জাতির যথার্থ উন্নতি হবে, উন্নতির পথ সমধিক বাধামুক্ত হবে।

মৈত্রেয়ী

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

যুগান্তের পার হতে ভেসে আসে শ্রবণে শ্রবণে চিরকাল
হে মৈত্রেয়ী লোকাতীত তোমার কাহিনী।
যে নহেক শুধু মাতা শুধু জায়া জননী গৃহিণী।
নয় শুধু মাতৃমূর্তি পূজনীয়া বিশ্বের বন্দিতা।
যশোদা দুলাল কোলে, খৃষ্ট কোলে মাতা মেরী,
হিমক্রোড়ে হৈমবতী পর্বতদুহিতা!
মহাভাগা জীবধাত্রী যারা সর্বকাল।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিশ্বে ধরিয়া রেখেছে ক্রোড়ে
প্রাণ আর জীবনের বিশ্বরূপ। বিশ্বের দুলাল!

* *

অথবা সাবিত্রী সীতা পার্বতী ও সতী,
শকুন্তলা, কাব্যকাহিনীর সেই কন্যা রূপবতী।—
রূপে মোহে প্রেমে যাহাদের যুগে যুগে হল পুরুষ উন্মাদ
জগতে ছড়ায়ে দিল দুঃখ শোক প্রমাদ বিষাদ।
যাদের দেখেছি মোরা কবির স্বপনে চিরকাল
নানা নামে নানা রূপে বুকে ধরে আছে মহাকাল!

* *

সেথা নহে। আর এক যবনিকাপারে মহাদূরে,
আলো অন্ধকারে মেশা অতীতের মহা মূক পুরে,
হে মৈত্রেয়ী জ্বলিতেছে অনির্বাণ দীপ সম তোমার কাহিনী
ছিলে নাকো শুধু জায়া শুধুমাত্র দুহিতা ভগিনী।
দেখিলাম প্রৌঢ়া জায়া সেবারত, তপঃক্লান্ত পতি।
দেখিনু প্রৌঢ়ত্বপারে শান্ত এক পবিত্র মূরতি।
দেখিলাম চারিদিকে কর্মস্রোত গৃহ পরিজন
কর্মব্যস্ত নারীলোক-দেবকার্য-যজ্ঞশালা-শিষ্য ও স্বজন।
পত্নীদ্বয়ে বলিলেন ডাকি মুনি বানপ্রস্থগামী
হে প্রেয়সী বাঁটি লও দোঁহে ধনধান্য সব—বনে যাই আমি।
থমকি' দাঁড়াল নারী। হাতে দর্বী করেন রন্ধন।
ক্ষুধাতুর গৃহজন। গোশালায় ডাকিছে গোধন।
গৃহপ্রান্তে দাঁড়াইয়া স্বামী।

* *

দুইখানি কর্মব্যস্ত হাত তাঁর, থামে অকস্মাৎ।
পাশে কর্ম তরঙ্গে তরঙ্গে ডেকে করে যাতায়াত।
শোনে না শ্রবণ।
মিলালো আঁখির আগে গৃহ বিত্ত আর পরিজন।
যেন কে ভাঙালো ঘুম।—কহিলেন সতী,
প্রভু, এ সম্পদরাশি—একি শ্রেয় ? একি প্রভু সত্য চিরন্তন ?
এই ধনে লভিব কি সেই মহাধন,
যার লাগি তুমি ত্যজি যাও গৃহ ঘর,
—সেই সম্পদ অমর ?

দাক্ষিণাত্যে তীর্থদর্শন

স্বামী দীপ্ত্যানন্দ

ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ দেশ। দেশব্যাপী অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির। যদিও এদেশে বহু শিবমন্দির আছে এবং সেখানে ভক্তগণ তাঁহাদের অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন ক'রে থাকেন অকুণ্ঠচিত্তে, তথাপি নিম্নলিখিত দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ প্রত্যেক সনাতনধর্মাবলম্বীর চিত্ত অধিকতর আকর্ষণ ক'রে থাকে। উক্ত বিগ্রহগুলি স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ বলে সমগ্র ভারতে খ্যাত। শিবপুরাণ মতে এই দ্বাদশটি জ্যোতির্লিঙ্গ :

১। শ্রীসোমনাথ—ইহা গুজরাটরাজ্যের (সৌরাষ্ট্র) অন্তর্গত বীরবলের (Veerabal) সন্নিকটবর্তী প্রভাস পাটান নামক স্থানে সমুদ্রতীরে অবস্থিত।

২। শ্রীমল্লিকার্জুনস্বামী—ইহা অন্ধ্ররাজ্যের কুর্নোল জিলার শ্রীশৈলম্ নামক পর্বতমালার উপর অবস্থিত। অন্ধ্ররাজ্যের রাজধানী হায়দ্রাবাদ হ'তে একশত ত্রিশ মাইল দূরে।

৩। শ্রীমহাকালেশ্বর—মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত উজ্জয়িনী নামক স্থানে অবস্থিত।

৪। শ্রীওঁকারেশ্বর বা শ্রীওঁকারনাথ—মধ্যপ্রদেশের খাণ্ড্ওয়া (Khandwa) জিলার মোরটাকা নামক রেলওয়ে স্টেশন হ'তে সাত মাইল দূরে নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত। ইন্দোর হ'তেও ওখানে যাওয়া যায়। এই জ্যোতির্লিঙ্গটি শ্রীঅমরেশ্বর বা শ্রীঅমলেশ্বর বলেও কথিত হয়ে থাকে।

৫। শ্রীকেদারনাথ—হিমালয়ে অবস্থিত

৬। শ্রীউমাশংকর—এই জ্যোতির্লিঙ্গটির অবস্থান নিয়ে দ্বিমত আছে : এক মতে উহা মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত বোম্বে-পুণা রেল-লাইনের 'নেরল' নামক রেলস্টেশনের নিকটবর্তী। অপর মতে উহা আসাম-রাজ্যস্থিত গৌহাটির নিকটবর্তী ব্রহ্মাপুর নামক পাহাড়ে অবস্থিত।

৭। কাশীর শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ

৮। শ্রীত্র্যম্বকেশ্বর—উহা মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত নাসিক শহরের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত।

৯। শ্রীবৈদ্যনাথ—এই জ্যোতির্লিঙ্গটি সম্বন্ধেও দ্বিমত আছে : এক মতে উহা অন্ধ্ররাজ্যের রাজধানী হায়দ্রাবাদ শহরের নিকটবর্তী পারলী নামক স্থানে অবস্থিত। অপর মতে উহা বিহাররাজ্যস্থিত সাঁওতাল পরগণার দেওঘর নামক স্থানে অবস্থিত।

১০। শ্রীনাগেশ্বর—এই জ্যোতির্লিঙ্গটির অবস্থান সম্বন্ধেও দ্বিমত আছে : এক মতে উহা গুজরাটরাজ্যের দ্বারকা ও বেট দ্বারকার মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত। অপর মতে উহা অন্ধ্ররাজ্যের রাজধানী হায়দ্রাবাদের নিকটবর্তী পূর্ণাজংশনের অনতিদূরে আউধা-গ্রামে অবস্থিত।

১১। শ্রীরামেশ্বরম্ — তামিলনাডের সেতুবন্ধে অবস্থিত.

১২। শ্রীঘুমেশ্বর — মহারাষ্ট্ররাজ্যস্থিত ঔরঙ্গাবাদ জিলার ইলোরা গুহার নিকটবর্তী ঔরঙ্গাবাদ শহর হ'তে tourist bus-এ ইলোরা অজন্তা যাওয়ার সময় এই মন্দিরটিও দেখানো হয়ে থাকে।

কথিত আছে দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত

পাঁচটি শিবলিঙ্গ পঞ্চভূতের প্রতীক। যথা :

১। কাঞ্চীপুরস্থিত শ্রীএকাম্রেশ্বর শিবলিঙ্গ পৃথ্বীর প্রতীক।

২। ত্রিচিনপল্লীস্থিত শ্রীজম্বুকেশ্বর শিবলিঙ্গ অপের।

৩। মহীশূররাজ্যস্থিত তিরুভান্নামালাই শহরে অবস্থিত শ্রীঅরুণাচলম্ শিবলিঙ্গ তেজের প্রতীক।

৪। তামিলনাডের চিদাম্বরম্স্থিত শ্রীনটরাজ শিব আকাশের।

৫। তিরুপতির নিকটবর্তী কালাহস্তীস্থিত শ্রীকালাহস্তীশ্বর শিবলিঙ্গ বায়ুর প্রতীক।

দাক্ষিণাত্যে তীর্থভ্রমণকারী প্রায় সকলেই শ্রীশৈলম্ পর্বতমালার উপরে অবস্থিত শ্রীমল্লিকার্জুনস্বামী শিবমন্দির দর্শন করে থাকেন। মন্দিরটি অতি প্রাচীন। এই তীর্থদর্শনের যোগাযোগ হওয়ায় অনুসন্ধান করে শ্রীশৈলম্পর্বতস্থিত শ্রীমল্লিকার্জুনস্বামী মন্দিরে পৌঁছানোর দুটি রাস্তা জানা গেল। একটি হল বাঙ্গালোর হ'তে সোজা হায়দ্রাবাদগামী ট্রেনে গিয়ে কুর্নোল নামক স্থানে এবং সেখান হতে সরকারী বাসে একশ মাইল গিয়ে শ্রীশৈলম্ পৌঁছানো যায়; অথবা বাঙ্গালোর হতে সোজা সরকারী বাসে কুর্নোল গিয়ে সেখান হতে আবার বাসে শ্রীশৈলম্। কুর্নোল হতে সরকারী বাস শ্রীশৈলম্ পর্বতের মন্দির পর্যন্ত যাতায়াত করে। অপরটি হ'ল, হায়দ্রাবাদ শহর হতে সরকারী বাসে সোজা শ্রীশৈলম্—দূরত্ব একশত ছত্রিশ মাইল। এই রাস্তায় একটি বড় বাধা হল পার্বত্য নদী কৃষ্ণা বা পাতালগঙ্গা। কৃষ্ণা নদীর অপর পারে শ্রীমল্লিকার্জুন মন্দির। কুর্নোল হ'তে এলে এ বাধা থাকে না, কারণ কুর্নোল নদীর ওপারে। হায়দ্রাবাদ হতে সরকারী বাস শ্রীশৈলম্ পর্বতের নদীর নিকটবর্তী Eagle Point নামক স্থান পর্যন্ত যায়। তার পরই গভীর খাদ—মধ্যে পার্বত্য নদী কৃষ্ণা গর্জন করতে করতে খরস্রোতে পর্বত অতিক্রম করে সমুদ্রাভিমুখে ছুটে চলেছে। অপর তীরে উচ্চ পর্বতের উপর মন্দির। Eagle Point হতে মন্দিরের দূরত্ব সোজা দুই-তিন মাইল, কিন্তু বাস যায় পার্বত্য আঁকাবাঁকা রাস্তায় ষোল মাইল অতিক্রম করে। এই Eagle Point হতেই অন্ধ্র সরকারের উনষাট কোটি টাকার Power-Project Scheme-এর কাজ শুরু হয়েছে। আটশ ফিট উঁচু একটি dam তৈরী হবে এই কৃষ্ণা নদীকে বাঁধবার জন্য। এই dam থেকে hydro-electric plant চালু করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে এবং তা সমগ্র অন্ধ্ররাজ্যে বিতরিত হবে। অর্থাভাবে কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে না। সম্পূর্ণ schemeটি শেষ করতে দশ বৎসর লাগবে। Dam-site-এ দিনরাত কাজ চলছে। এখন মাত্র ভিত্তিস্থাপনের কাজ হচ্ছে। নদীর অপর পারে বিস্তীর্ণ পার্বত্য এলাকা জুড়ে শহর তৈরী হয়েছে সরকারী কর্মচারীদের বসবাসের জন্যে এবং অফিসাদির জন্যে। Eagle Point-এও অনেক বাড়ী তৈরী হয়েছে কর্মীদের থাকবার জন্যে। সুতরাং উভয়তীরেই মালপত্রাদি ও লোকজন বহন করার জন্যে অনবরত সরকারী জীপ্ বা লরী চলাচল করছে। হায়দ্রাবাদ হতে যাত্রীবাহী বাস এই Eagle Point-এ এসে থেমে যায়। যাত্রীদের তখন সুবিধামত উক্ত সরকারী জিপ বা লরীতে করে Dam-site পর্যন্ত গিয়ে পায়ে হেঁটে নদীর ধারে ধারে পাতালগঙ্গা-ঘাট পর্যন্ত যেতে হয়। তারপর ওখান থেকে আবার চড়াই করে প্রায়

সহস্রাধিক সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরের পাদদেশে পৌঁছুতে হয়। কিন্তু বিশেষ বিশেষ উৎসবের সময় দর্শনার্থী যাত্রীদের সুবিধার জন্য শ্রীমল্লিকার্জুনস্বামী-দেবস্থানম্‌-এর কর্তৃপক্ষ Eagle Point ও মন্দির—এই দুইটির মধ্যে নিজস্ব বাস চলাচলের ব্যবস্থা করেন। ফেব্রুয়ারী মাস হতে এপ্রিল পর্যন্ত মন্দিরে উৎসবাদি থাকে। শিবরাত্রিতে শিবের উৎসব ; তখন সেখানে লক্ষাধিক যাত্রীর সমাগম হয়ে থাকে। তাই বাসের ব্যবস্থা হয়। ভাড়া যাতায়াত চার টাকা। দূরত্ব ষোল মাইল।

সৌভাগ্যবশতঃ শিবরাত্রি থাকাতে আমি Eagle Point-এ পৌঁছে দেবস্থানম্‌-এর বাস পেয়েছিলাম। শিবরাত্রি অতি নিকটে—বাসের ব্যবস্থা থাকবে জেনেই হায়দ্রাবাদ থেকে সোজা শ্রীশৈলম্‌ যাই। সেখানকার কটেজগুলিতে থাকার ব্যবস্থাও হয়েছিল।

অতি প্রত্যূষে বাসে উঠলাম। তখন ঘোর অন্ধকার ! বাসে যাত্রী ভরতি। ঠিক সাড়ে পাঁচটায় ছাড়ল। শহর ছাড়িয়ে ক্রমশঃ উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে ছুটে চলল। এক্‌স্প্রেস্‌ বাস—চলে খুব জোরে, থামবার স্টেশনও অল্পসংখ্যক। বাসে বসবার ব্যবস্থাদিও আরামপ্রদ। যাত্রাপথ দীর্ঘ বলে নির্দিষ্টসংখ্যক যাত্রী নেওয়া হয়েছে। তখনও অন্ধকার—রাস্তার দুধারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না—কেবল দূরে গ্রামে একটা-দুটো আলো মিটমিট করছিল। প্রায় আটটার সময় চা-পানের জন্য বাসটি একটি নির্দিষ্ট স্টেশনে রেঁস্তোরার সামনে এসে দাঁড়াল। যাত্রীরা নেমে চা-পানাদি সমাপন করলেন। আধ ঘণ্টার পর আবার যাত্রা শুরু হল। এতক্ষণে সূর্যালোকে চতুর্দিক উদ্ভাসিত দেখাল। বহু দূরে উজ্জ্বল আকাশের গায়ে নীলাভ পাহাড়শ্রেণী দেখা যাচ্ছিল। রাস্তার দু'পাশে বসতি নেই—কেবল জংগলাকীর্ণ ভূমিখণ্ড। এভাবে ছয় ঘণ্টা যাত্রার পর বেলা সাড়ে এগারটায় এসে Eagle Point-এ গাড়ী থামল। যাত্রীরা নেমে পড়লেন। সেখান থেকে অদূরে পাহাড়ের উপরে মন্দিরের গোপুরম্‌গুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। দেবস্থানমের বাসে করে এক ঘণ্টার মধ্যেই মন্দিরের পাদদেশে পৌঁছুলাম।

অন্ধ্ররাজ্যে মন্দিরাদির পরিচালনাভার সরকার গ্রহণ করেছেন। শিবরাত্রি উপলক্ষে লক্ষাধিক যাত্রীসমাগম হবে। তখনও দুদিন বাকি। তাই সরকারের পক্ষ হতে যাত্রীদের থাকা, দর্শনাদির ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি। পূর্বব্যবস্থানুযায়ী একটি কটেজে স্থান পেলাম। দুটি কক্ষ, স্নানাগারাদি সহ কটেজটি বেশ আরামপ্রদই ছিল। খাওয়া canteen-এ। শিবরাত্রির মেলা উপলক্ষ্য করে অনেক canteen, দোকান ইত্যাদি খোলা হয়েছে। স্নানাদি শেষ করে খেতে খেতে প্রায় দেড়টা বাজল।

দুপুরে মন্দির বন্ধ ছিল। অপরাহ্ণ ছয়টায় মন্দির খুলল। প্রধান ফটকে দাক্ষিণাত্যের প্রথানুযায়ী পদধৌত করে মন্দিরের সীমানায় প্রবেশ করবার জন্যে ভূমিতে সংলগ্ন নল হতে জলপ্রবাহ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছিল। এই ফটকের উপরই একটি গোপুরম্‌—রামেশ্বরম্‌, মীনাক্ষী, তিরুভান্নামালাইর মন্দিরের মত এত উঁচু নয়, কিন্তু সুচারুরূপে আলোকমালায় সুসজ্জিত। শিবরাত্রির দুদিন বাকি বলে মন্দিরে দর্শনার্থীর ভিড় তত ছিল না। মূল মন্দিরে প্রবেশ করার পূর্বে একটি টাকা দিয়ে টিকিট করতে হল। টিকিট করে মন্দির অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছি—প্রথম ফটক, দ্বিতীয় ফটক পার হয়ে গর্ভমন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হলাম। গর্ভমন্দিরটি স্বল্পপরিসর, দর্শন-

স্পর্শনের জন্যে অতি অল্পসংখ্যক যাত্রীই সেখানে একত্র হতে পারে। তাই গর্ভ-মন্দিরের বাহির হতেই দর্শনার্থীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়। গর্ভ-মন্দিরে প্রবেশ ও বহির্নির্গমন যাতে খুব সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয় তজ্জন্য সরকারপক্ষ হইতে পুলিশ, হোমগার্ড, স্বেচ্ছাসেবক প্রভৃতি নিয়োজিত হয়েছে। গর্ভমন্দিরটি আলোকিত করার জন্য একদিন বিজলীবাতির ব্যবস্থা; বৎসরের অন্যান্য সময়ে প্রাচীন প্রথানুযায়ী তৈলপ্রদীপ দ্বারাই ক্ষীণভাবে আলোকিত হয়। মন্দির খোলবার সঙ্গে সঙ্গে সুললিত স্বরে 'নাদস্বরম্' বাজতে আরম্ভ হল। আমরা ধীরপদক্ষেপে সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হ'য়ে গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করলাম। স্বয়ম্ভুলিঙ্গের দর্শন ও স্পর্শন লাভ হল। বহু-আকাঙ্ক্ষিত বিগ্রহের দর্শনে মন স্বভাবতই পুলকিত। পরদিন আবার 'সুপ্রভাতম্' দেখার জন্য ভোর সাড়ে চারটায় মন্দিরে উপস্থিত হলাম।

শ্রীমল্লিকার্জুনস্বামী মন্দিরটি পূর্বাভিমুখী এবং উচ্চ-প্রাচীর-বেষ্টিত সীমানার মধ্যস্থলে অবস্থিত। পশ্চিমদিকে মাতৃমন্দির; পূর্বদিকের মুখ্য দ্বারের একটু উত্তরে—ভিতরে আর একটি ছোট শিবমন্দির। এই মন্দিরটিই পুরাতন শ্রীমল্লিকার্জুনস্বামী মন্দির বলে কথিত হয়। তার আর একটু উত্তরে সহস্রলিঙ্গ শিব। একটি বৃহদাকার কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের শিবলিঙ্গের গায়ে অতি নিপুণ ও সূক্ষ্মভাবে খোদিত সহস্র শিবলিঙ্গ। এই সহস্রলিঙ্গ শিব তিনমস্তক-বিশিষ্ট নাগরাজ দ্বারা পরিবেষ্টিত ও সূক্ষ্মকারুকার্যপূর্ণ প্রস্তরখণ্ডের উপর সংস্থাপিত।

স্থানীয় প্রবাদ আছে যে, প্রাচীন কালে চন্দ্রাবতী নামে এক সুন্দরী রাজকন্যা ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন কৃষ্ণা নদীর তীরে অবস্থিত চন্দ্রগুপ্তপুরম্ নামক নগরীর শাসনকর্তা। বিশেষ কারণে পিতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে চন্দ্রাবতী পিতৃগৃহ ত্যাগ ক'রে শ্রীশৈলম্ পর্বতে এসে উপস্থিত হন। অল্প পরেই তাঁর পিতা দৈব দুর্ঘটনায় কৃষ্ণানদীতে বা পাতালগঙ্গায় ডুবে মারা যান। চন্দ্রাবতী শ্রীশৈলম্ পর্বতে বসবাস করতে লাগলেন। সেখানে তিনি কয়েকটি গাভী পালন করতেন। তাঁর পালিত গাভীগুলির মধ্যে একটি দুধ দিচ্ছে না দেখে অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে, গাভীটি স্বেচ্ছায় ও গোপনে তার দুধ একটি শিবলিঙ্গের মাথায় রোজ ঢেলে আসে। একদিন রাজকুমারী স্বপ্নাবিষ্টা হয়ে দেখলেন যে, স্বয়ং শিবঠাকুর ঐ শিবলিঙ্গের রূপ ধারণ করে তথায় আবির্ভূত হয়েছেন। চন্দ্রাবতী সেই শিবলিঙ্গের উপরে একটি মন্দির নির্মাণ করে প্রতিদিন ভক্তিভরে শিবকে মল্লিকা ফুল দিয়ে পূজা করতে লাগলেন। সেই অবধি এই মন্দির শ্রীমল্লিকার্জুনস্বামী শিবমন্দির নামে অভিহিত হয়ে আসছে। প্রবাদটি এই মন্দিরের বহিঃপ্রাচীরের প্রস্তরখণ্ডে খোদিত আছে।

আর একটি প্রবাদে আছে যে, চেঞ্চু নামক পার্বত্য জাতির এক সুন্দরী কন্যা এই শ্রীশৈলম্-এ ব্যাধরূপে শিবের দর্শন ও তাঁকে পতিরূপে লাভ করেন। চেঞ্চু নামক পার্বত্য জাতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় এই শ্রীমল্লিকার্জুন 'চেঞ্চু মাল্লায়া' নামেও অভিহিত হয়ে থাকেন।

লম্বায় ছয়শত ফুট, প্রস্থে পাঁচশত ফুট একটি ভূখণ্ডের উপর এই মন্দিরটি স্থাপিত এবং উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। মন্দিরের উত্তর দক্ষিণ ও পূর্বে দ্বার আছে। পশ্চিমদিকে দ্বারের পরিবর্তে মাতৃমন্দির অবস্থিত। এ অঞ্চলে এই দেবী মাধবী, ভ্রমরাম্বা অথবা আম্মান নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। দেবী

শ্রীশ্রীকালীর প্রতিমূর্তি। এখানে পশুবলি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই ভ্রমরাম্বিকা দেবী অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত; স্থানটি শক্তিপীঠগুলির অন্যতম বলে খ্যাত। এই মন্দিরে শিব ও শক্তি উভয়েরই উৎসব হয়ে থাকে। শিবের উৎসব শিবরাত্রির সময় আরম্ভ হয় এবং কিছু-দিন চলে। তারপর আরম্ভ হয় শক্তির উৎসব। সাধারণতঃ শিবের উৎসবের চেয়ে শক্তির উৎসবই অধিকতর জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হয় ও দীর্ঘদিন ধরে চলে।

মহাভারতের বনপর্বে বর্ণিত আছে, শিব পার্বতীকে নিয়ে এই শ্রীশৈলম্ পর্বতে বা শ্রীপর্বতে অবস্থান করেন। লিঙ্গপুরাণেও এখানকার জ্যোতির্লিঙ্গের কথা উল্লিখিত আছে। শিবের আটটি প্রধান নিবাসের মধ্যে শ্রীশৈলম্ পর্বত অন্যতম।

ষষ্ঠ শতাব্দীর কদম্ববংশীয় জনৈক নৃপতি এই শ্রীশৈলম্ পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তার করে-ছিলেন। এখানকার পাতালগঙ্গা বা কৃষ্ণা নদী হ'তে শিবলিঙ্গের জন্য প্রস্তরখণ্ড সংগৃহীত হত। এমন কি এখনও লিঙ্গাইত সম্প্রদায়ের লোকেরা শরীরে ধারণ করার জন্য শিবলিঙ্গের উপযোগী প্রস্তরখণ্ড এই শ্রীশৈলম্ পর্বতস্থিত পাতালগঙ্গা হতেই সংগ্রহ করে থাকেন। পাতালগঙ্গা হতে পর্বতোপরি শ্রীমল্লিকার্জুন মন্দির পর্যন্ত যে সহস্রাধিক সিঁড়ি উঠেছে তা রেড্ডীবংশীয় নৃপতি শ্রীভীমা রেড্ডী চতুর্দশ শতাব্দীতে নির্মাণ করেছিলেন। তদীয় পুত্র শ্রীঅন্নভীমা রেড্ডী বীরদের উদ্দেশ্যে এখানে একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

লিঙ্গাইত ব্রাহ্মণদের এই শ্রীশৈলম্ পর্বতে পাঁচটি বড় বড় মঠ আছে—তন্মধ্যে প্রধান মঠের নাম হচ্ছে বীর-শৈবসিদ্ধ-ভিক্ষাবৃত্তি মঠ। বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হুয়েন সাং এই শ্রীশৈলম্ পর্বতের সঙ্গে নাগার্জুনের সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁদের বিবরণীতে উল্লেখ করেছিলেন।

লিঙ্গাইত ব্রাহ্মণেরা শ্রীমল্লিকার্জুনের একনিষ্ঠ উপাসক হলেও এই মন্দিরের পরিচালন-ব্যবস্থাদি পুষ্পগিরির ব্রাহ্মণেরাই এতদিন ক'রে আসছিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত লিঙ্গাইতদের প্রাধান্য ছিল।

ভগবান শ্রীশংকরাচার্য তাঁর 'ব্রহ্মাম্বাষ্টকম্' স্তবে বলেছেন:

"গায়ত্রীং গরুড়ধ্বজাং গগনগাং
　　গান্ধর্বগানপ্রিয়াং,
গম্ভীরাং গজগামিনীং গিরিসুতাং
　　গন্ধাক্ষতালংকৃতাম্।
গঙ্গাগৌতমগর্গসংনুতপদাং
　　তাং গৌতমীং গোমতীং,
শ্রীশৈলস্থলবাসিনীং ভগবতীং
　　শ্রীমাতরং ভাবয়॥"

শ্রীশৈলস্থলবাসিনী ভগবতী শ্রীশ্রীমাতৃ-দেবীর অনুধ্যান কর। তিনি গায়ত্রী, গরুড়-ধ্বজাসমন্বিতা, আকাশচারিণী, গান্ধর্বগান-প্রিয়া, গন্ধ ও অক্ষত দ্বারা অলংকৃতা, গঙ্গা, গৌতম ও গর্গ কর্তৃক পূজিতা।

গৈরিকমীড়ে

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

যা গীঃ সাধ্বী পুরাণী সুষমকুশলদা মা গৃধঃ কস্যচিচ্চ
ভুঞ্জীথাস্ত্যক্তকামো নিজপরসমদৃক্ সর্বমীশেতি বাস্যম্ ।
ইত্থং জ্ঞানেন শুভ্রং স্বহৃদি সকলহৃদ্‌ভাবরাগেণ পীতং
প্রাণৌজোবীর্যরক্তং ত্রিতয়সুবলিতং গৈরিকং বর্ণমীড়ে ॥
(কেতনং গৈরিকাভম্ ॥)

'ওঁ ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্‌ধনম্ ॥'—
এই যে পুরাণী প্রজ্ঞানবাণী,
সাধু সনাতনী,
সর্বজীবে সুষমকুশলবিধায়িনী ।
আত্মপর-সমদৃষ্টি হ'য়ে, ত্যজ স্বার্থকাম,
জান'—পরধনে শ্যেনদৃষ্টি আত্মবিঘাতিনী ।
এ কি মহানের মহামহিমায়, রেণু কি বিরাট,
ওতপ্রোত সারাবিশ্ব, সবকিছু চালক, চালিত ।
এই অববোধে শুদ্ধবোধ, ধবলছটায়,
সকল অন্তর অন্ধকক্ষ করুক দীপিত ॥
আপন হৃদয় স্পন্দিত সবাকার,
হৃদয়স্পন্দনে,
এই ভাবরাগে, প্রেমে হও পীতরাগ ।
আর, কর্মোদ্বেল প্রাণের প্রাচুর্য, ওজোবীর্যরাগে,
জীবন রাঙিয়া দিক নিত্যনব বসন্তের ফাগ ॥
এই তিন রঙ—শুভ্র, পীত, রক্ত,
জ্ঞান, ভাব, বীর্য,
ত্রিতয়ের সুষমমিলনে যে রাগ গৈরিক ।
তারে, সেই দীপ্ত গৈরিক কেতনে আজি,
করি আবাহন,
ঐহিকেরে তুড়ি দিয়ে তুচ্ছ করা 'সন্ন্যাসের' সে তো নয়
নিঝুম নিরালা প্রতীক ॥

স্যার জেম্‌স্‌ জীন্‌স্‌ ও আচার্য শঙ্কর*

ব্রহ্মচারী অমিতাভ

গত ষাট বছরের বৈজ্ঞানিক তথ্যাদিকে আমরা আধুনিক বিজ্ঞান বলে অভিহিত করতে পারি। প্রাচীন বিজ্ঞানের ধারণাগুলি একে একে পাল্‌টাতে পাল্‌টাতে আজ বিজ্ঞান এক সম্পূর্ণ নতুন স্তরে এসে পৌঁছিয়েছে। আইনস্টাইন, বোর, হাইজেনবার্গ, এডিংটন, হোয়াইটহেড, জীন্‌স্‌ প্রভৃতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টায় বিজ্ঞানের দৃষ্টি আজ সুদূরপ্রসারিত। ব্রিটিশ পদার্থতত্ত্ববিদ স্যার জেম্‌স্‌ জীন্‌স্‌ বিকিরণ (Radiation) ও মহাজাগতিক বলবিদ্যাকে (Steller Dynamics) উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান, যা মূলতঃ রেডিও-অ্যাক্‌টিভিটি, কোয়াণ্টা, থিওরি অব্‌ রিলেটিভিটি ও ইনডিটারমিনেন্সী থিওরির উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে, প্রাচীন বিজ্ঞান থেকে অনেকখানিই সরে এসেছে।

স্যার জেম্‌স্‌ জীন্‌স্‌ জগৎটাকে পুরোপুরি সত্য বলে গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে—"জগৎটা রামধনুর মতো" (The New Background of Science, page 2)। রামধনুর দৃশ্যত্ব কেবল এই সাদাচোখেই সম্ভব। আপনার আমার মতো রামধনুর কোন বিশেষ সত্তা নেই; সূর্যরশ্মি মেঘের জলবিন্দু দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে আমাদের কাছে ধরা দিচ্ছে রামধনুরূপে, যা প্রত্যেকের কাছে বিভিন্ন। অর্থাৎ, আপনার দৃশ্য রামধনু থেকে আমারটি আলাদা। এইভাবে রামধনুর মতো জগৎটিও একটি objective truth; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ভ্রান্তিমাত্র। অবশ্য 'ভ্রান্তি' শব্দটির দ্বারা জগৎটাকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে 'নেহী হ্যায়' বলা জীন্‌সের উদ্দেশ্য নয়। তিনি বলছেন—"এর অর্থ নয় যে, আমি বলছি জগৎটা একেবারেই নেই; আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, আপাতত এর সত্তার ধারণা আমাদের জ্ঞানের বাইরে। আমাদের নিজের সৃষ্ট রঙীন কাঁচের সাহায্যে রাঙিয়ে আমরা এই জগৎটাকে দেখতে পাই" (Ibid, page 4) জগৎ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্যের মতও অনেকটা স্যার জীন্‌সের মতো। তিনি লিখেছেন—"এই জগতের চরম সত্তা শ্রুতি (বেদ) স্বীকার করেন না; এটি অবিদ্যাকল্পিত নামরূপবান ব্যবহারসিদ্ধ বস্তু" (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ২ : ১ : ৩১)। যেখানে স্যার জীন্‌স্‌ জগৎটাকে তুলনা করেছেন রামধনুর সঙ্গে, সেখানে আচার্য শঙ্কর দিয়েছেন মরীচিকার উপমা। এই যে ভ্রান্ত ধারণা, একেই তিনি বলেছেন 'অধ্যাস'।

এই জগতের স্রষ্টা কে? স্যার জীন্‌স্‌ লিখছেন—"শুদ্ধ চেতনা (Pure Intelligence) থেকেই এই জগতের সৃষ্টি" (Mysterious Universe, page 114)। তাঁর মতে, এই শুদ্ধ চেতনা একজন শ্রেষ্ঠ গণিততত্ত্ববিদ্‌, যিনি এই জগতের কেবল স্রষ্টাই নন, পালনকর্তাও।

* চরম সত্য সম্বন্ধে মনবুদ্ধিরও অতীতপ্রদেশচারী সত্যদ্রষ্টাগণের কথাই চরম প্রমাণ; অবশ্য আমরা সকলেই নিজে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি, সামর্থ্য অর্জন করিয়া। এখানে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সঙ্গে আচার্য শঙ্করের কথার যে সামঞ্জস্য দেখাইবার প্রচেষ্টা, তাহা আচার্যের কথার প্রমাণ হিসাবে নহে, আচার্যোক্ত সত্যকে বৈজ্ঞানিক-চিন্তাসম্পন্ন মনে ধারণা করার সুবিধার জন্য।—সঃ

বিশ্বের এই বিভিন্ন ঘটনাবলীর সামঞ্জস্য দেখতে পেয়ে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, চেতন-নির্দিষ্ট হয়েই সর্বব্যবহার নিষ্পন্ন হচ্ছে। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্র. সূ. ১:১:২) সূত্রটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মকেই জগৎ-কারণ বলে গ্রহণ করলেন। ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে "চেতনং ব্রহ্ম" (ব্র. সূ.-ভাষ্য, ১:১:৬)। "চৈতন্যমাত্ররূপো···পরমাত্মা" (শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্‌ভাষ্য : উপোদ্‌ঘাত) শব্দগুলি ব্যবহার করে ব্রহ্মকে শুদ্ধচেতন বলে নির্দেশ করলেন, জগৎটা যে একজনের নির্দেশে সুশৃঙ্খলভাবে চলছে তার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি লিখলেন—"তাঁর শাসনে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি নিয়মানুসারে চলছে" (কঠ উপ ভাষ্য ২:৩:২)। স্যার জীন্‌সের মতেও "সুনির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যেই জগৎ আবর্তিত হচ্ছে" (The New Background of Science, page 49)। Mysterious Universe বইয়ে তিনি লিখছেন—"The Universe begins to look more like a great thought than like a great machine Mind no longer appears as an accidental intruder into the realm of matter ; we are beginning to suspect that we ought rather hail it as the creator and governor of the realm of matter, not of course our individual minds, but the mind in which the atoms, out of which our individual minds have grown, exist as thoughts." (Page 137)। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে। স্যার জীন্‌স্ এখানে বিশ্ব-মনকে (Cosmic Mind) স্রষ্টা ও পালয়িতা বলে ব্যক্তি-মনকে (individual mind) তার অংশ হিসাবে বর্ণনা করছেন। আচার্য শঙ্করেরও একই মত—"আগুন ও তার স্ফুলিঙ্গের মত ঈশ্বর ও জীবের অংশ-অংশী সম্পর্ক।···ব্যক্তি-মন বিশ্বমনের একটি অংশ" (ব্র. সূ. ভাষ্য ২:৩:৪৩)। তিনি ঘোষণা করলেন যে, চরম সত্তাই সমস্ত আপেক্ষিকতার কারণ। "ব্রহ্মই সেই কারণ যা থেকে এই নাম-রূপ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হচ্ছে, যা এই বিভিন্নতা থেকে আলাদা নয়, কর্ম ও কর্মফলের আলম্ব এবং নিয়মিত দেশ-কাল-নিমিত্তে আবদ্ধ" (ব্র. সূ. ভাষ্য ১:১:২)। স্রষ্টা কর্তৃক জগৎপালন সম্বন্ধে কঠোপনিষদ্‌-ভাষ্যে শঙ্করাচার্য যা বলেছেন, তার পুনরুক্তি তিনি বৃহদারণ্যক উপনিষদেও করেছেন—"এই পরম সত্তার শাসনে চন্দ্র-সূর্য সৃষ্ট, বিধৃত ও চালিত।··· তাঁর শাসনে মহাকাল ও পৃথিবী নিয়মিতভাবে কাজ করছে। এই অখণ্ড সবকিছুর বিভিন্নতাকে রূপদান করেছেন" (ভাষ্য ৩:৮:৯)।

জগতের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে স্যার জীন্‌স্ বলছেন যে, এই বিশ্ব একটি বুদ্‌বুদের মতো (Mysterious Universe, page 101)। "যদি একটানা সোজাপথে চলতে পারি"—তিনি লিখছেন, "তাহলে আমরা আবার যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে সেখানেই ফিরে আসবো" (Stars in their Courses, page 141)। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা সকলেই ব্রহ্মাণ্ডকে একটা গোল বলের মত মনে করছেন। বেদান্তের এ ধারণা হাজার বছর আগেই ছিল। বেদান্ত অবশ্য 'ব্রহ্মাণ্ড' শব্দটির দ্বারা গোলাকারের চেয়ে ডিম্বাকৃতি দিকটার প্রতিই বেশি নজর দিয়েছিল মনে হয়, যাতে আজ রিন্‌ম্যান্ জ্যামিতির সাহায্যে বিজ্ঞানের সমর্থন পাওয়া যায়।

আকাশ কি? 'আকাশ মানে শূন্য'—বিজ্ঞানের এই চলতি ধারণাটিকে আজকাল

পরিত্যাগ করা হয়েছে। "ইথার বলে কিছু থাকুক, আর নাই থাকুক"—আইনস্টাইনের মতে—"এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, আকাশও একটি পদার্থ (Substance)।" স্যার জীন্‌স্ বলছেন—"সময়ের মতো আকাশেরও একটি সসীম সত্তা (finite extent) আছে" (Mysterious Universe, page 132)। তাহলে দেখতে পাছি, আকাশ একটি পদার্থ ও সসীম। হাজার বছর আগে শঙ্করাচার্যেরও একই মত ছিল—"এটা অযৌক্তিক কথাই হবে যে, আকাশের কোন সত্তা নেই, কারণ অন্যান্য বস্তুর মতো এরও নাম-রূপ ধ্বংস হয়। বেদের প্রামাণ্যবলে 'ব্রহ্ম থেকে আকাশের উৎপত্তি হল' (তৈত্তিরীয় উপ ২:১) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আকাশের পদার্থত্ব প্রমাণিত" (ব্র. সূ. ভাষ্য, ২:২:২৪)। আমাদের রোজকার চলতি আকাশ ও কালকে তিনি যথাক্রমে স্থূল আকাশ ও স্থূল কাল বলে অভিহিত করেছেন।

এখন স্যার জীন্‌সের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে দেখা যাক। তিনি বললেন—"সময়ের স্রোত ধরে আমরা যদি অতীতের দিকে ফিরে যেতে পারি, তবে এমন এক অবস্থায় আসব যখন এই ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব ছিল না—এই তথ্যের পেছনে অনেক প্রমাণ রয়েছে" (Mysterious Universe, page 132)। ব্রহ্মাণ্ডের শেষাবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলছেন—"নক্ষত্রগুলি উত্তাপ ছড়াতে ছড়াতে বিকিরণের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে,·· ব্রহ্মাণ্ডের মাল-মশলা ক্রমেই কমে আসছে, কিন্তু যেটুকু রয়ে গেল তা ছড়িয়ে পড়ছে। ব্রহ্মাণ্ডের সকল নক্ষত্রপুঞ্জের একই অবস্থা। তারপর এ জগৎ বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে গেল; সিনেমা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো এ সৃষ্টি একটা কবি-গাথার মতো কোথায় হারিয়ে গেল" (Stars in their Courses, page 152-3)। তাপবলবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রানুযায়ী স্যার জীন্‌সের এই চিত্র প্রায় নিখুঁত। এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও লয় শুধু যে বৈজ্ঞানিকদের দ্বারাই সমর্থিত হয়েছে তা নয়, আচার্য শঙ্করও একই মত পোষণ করে গেছেন। অবশ্য তিনি কখনোই এই সৃষ্টি-ব্যাপারটাকে একটা accident বলে মনে করেননি। Big Bang, Steady State এবং Oscillating—এই তিনটি cosmological view-ই আজকাল বিশেষ সমর্থিত, যদিও বৈজ্ঞানিকেরা কোন সর্বজনসমর্থিত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুতে পারেননি। তবে তাঁদের মোটামুটি এই ধারণা যে, আজ থেকে দশ বিলিয়ন বছর আগে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি শুরু হয়েছিল এবং আজ থেকে সত্তর বিলিয়ন বছর পরে এ ধ্বংস পাবে বা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। সেখান থেকে আবার নতুন সৃষ্টি হবে এবং এইভাবে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের মধ্যে দিয়ে অনন্ত শৃঙ্খল চলবে। আচার্য শঙ্করও ঠিক একই মত পোষণ করেছেন, যদিও বছরের হিসেব নিয়ে তিনি বিশেষ মাথা ঘামাননি।

আগেই বলেছি যে, স্যার জীন্‌স্ জগৎটাকে বাহ্যিক ভাবেই (in secondary sense) গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, সেই শুদ্ধ চেতনার মনের প্রতিফলনই এই বিশ্ব। বহু-আলোচিত 'Wave of Probability' জীন্‌সের মতে চিন্তা-তরঙ্গ মাত্র। "দেশ ও কাল সসীম··এই তথ্য আমাদের ভাবতে বাধ্য করেছে যে, জগৎটা কোন চিন্তারই ফলবিশেষ"—তিনি লিখছেন, "দেশ-কাল ও এই বিশ্ব মনেরই একটি সৃষ্টি; আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি বেশ ভাল করেই বুঝিয়েছে যে, একজন চিত্রকরের মতোই সৃষ্টিকর্তা দেশ-কালের বাইরে থেকে এসব

কিছু সৃষ্টি করেছেন।...The act of creation (is) the materialisation of the thought" (Mysterious Universe, page 134)। তাই জীন্‌সের মতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটাই সেই শুদ্ধ চেতনার মনের একটি প্রতিচ্ছবিমাত্র। এবিষয় সম্পর্কে আচার্য শঙ্কর বলছেন—"সেই মহান পুরুষ ইচ্ছার সাহায্যে সৃষ্টি করলেন" (প্রশ্ন উপ. ভাষ্য, ৬ : ৪)। ঐতরেয় উপনিষদের ১ : ১ : ২ শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—"একজন স্থপতি যেমন বাড়ি তৈরি করার আগে চিন্তা করে তারপর বাড়িটি তৈরি করেন, সেই মহান পুরুষও তেমনি চিন্তা করেই এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন।"

"ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"—আচার্য শঙ্করের এই বেদান্ত-দুন্দুভির অনুরণন স্যার জীন্‌স্‌কেও ভাবিয়ে তুলেছে। স্যার জেম্‌স্ জীন্‌স্ তাঁর Physics and Philosophy বইয়ের ৩৯৫ পাতায় বলছেন—"দেশ-কালের ভেতর থেকে দেখলে আমাদের ব্যক্তি-চেতনা নিশ্চিতরূপেই আলাদা, কিন্তু এই দেশ-কালকে অতিক্রম করে গেলে এই-সমস্ত খণ্ড ব্যক্তি-চেতনাসমূহ একটি অখণ্ড চেতনার মধ্যে হয়তো প্রবেশ করবে।" আর একটু এগিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, দেশ-কালের দরুনই এই বিভিন্নতার সৃষ্টি এবং একে অতিক্রম করে গিয়ে উচ্চতর সত্যে (Deeper Reality) উপনীত হলে বোঝা যাবে—একই সত্য। হাজার বছর আগে শঙ্করাচার্য যে-মত প্রচার করেছিলেন, জীন্‌সের মত তারই প্রতিধ্বনি। তাঁর মতে ব্যবহারিক জগতের ব্যক্তিচেতনাসমূহ, যাকে 'জীব' বলা হয়, পরমার্থতঃ বিভিন্ন নয়, তারা এক। জীন্‌সের শুদ্ধ চেতনাই দেশ-কালের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিচেতনারূপে প্রকাশিত হচ্ছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের Wave of Probability জীন্‌সের মতে একটি অলীক কল্পনামাত্র। তিনি লিখছেন—"এই তরঙ্গ যে একেবারেই নেই তা নয়, এ তরঙ্গ আমাদেরই মনের সৃষ্টিমাত্র। কিন্তু আমাদের মনের বাইরেও একটা কিছু (Something) নিশ্চয়ই আছে, যা আমাদের মনে বিভিন্ন ধারণার জন্ম দেয়। এই 'একটি কিছুকেই' আমরা 'সত্য' (Reality) বলতে পারি" (Mysterious Universe, page 70)। এই বইয়েরই ১২৭ পাতায় তিনি বলেছেন—"বিভিন্ন বস্তু আমাদের মনেই আছে, কি অন্য কোন মনে আছে—সেটা কোন কথা নয়, আসল কথা—এই বাহ্যিক জগতের উৎপত্তি কোন একটি চিরন্তন সত্তা (Eternal Spirit) থেকে।" আচার্য শঙ্করের মতও এবিষয়ে জীন্‌সের মতোই—"এ সবকিছুই চেতনার তরঙ্গমাত্র" (মাণ্ডুক্য উপনিষদ—গৌড়পাদ-কারিকা ৪ : ৭২)।

এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হল, তাতে দেখা গেল—জীন্‌সের মতে এ জগৎ একটি তরঙ্গ মাত্র, যার অস্তিত্ব কেবল ব্যবহারিক তলেই (relative plane) সীমাবদ্ধ কিন্তু দেশ-কাল অতিক্রম করে উচ্চতর সত্যে পৌঁছুলে এর অস্তিত্ব থাকে না। তিনি কিন্তু এই তরঙ্গকে 'অলীক' (fictitious) বলেই ছেড়ে দিচ্ছেন। শঙ্করাচার্য এই তরঙ্গকেই বলেছেন 'মায়া', যার স্বরূপ 'অনির্বচনীয়'। কিন্তু জীন্‌স্ যেখানে কেবল দেশ-কালকেই ব্যবহারিক জগতের ভিত্তি বলে নির্দেশ করলেন, আচার্য শঙ্কর সেখানে আর একটু এগিয়ে দেশ ও কালের সঙ্গে 'নিমিত্ত' (causation) শব্দটিকেও যোগ করে দিলেন। হাইজেনবার্গের 'অনির্দেশ্যবাদ' (Theory of Indeterminancy) আবিষ্কারের পর শঙ্করাচার্যের মতকে বৈজ্ঞানিকেরা সম্পূর্ণ-

রূপে গ্রহণ করে নিয়েছেন। বিকিরণের দ্বৈতস্বভাব আবিষ্কারের পর বোঝা গেলো subject এবং object সম্পূর্ণ ভিন্ন নয়; এ দুটির বিভিন্নতা সরিয়ে দিলেই আমরা আসল রূপটিতে গিয়ে পৌঁছুবো—জীন্স্ একথা বললেন। হাইজেনবার্গ দেখালেন যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন একটি ইলেকট্রনের গতি ও স্থিতি (velocity and position) একই সঙ্গে মাপা যাবে না। এর ফলে প্রমাণিত হল—এ জগতের আরো বিভিন্ন মাত্রা (dimension) থাকতে পারে যা এখনো আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। আইনস্টাইনও এই মতটির প্রতি তাঁর স্বীকৃতি জানালেন। এইভাবে দেখতে পাওয়া গেল যে, জগতের স্বরূপটি চিরকালই অনির্বচনীয় হয়ে থাকবে। ভাববেন না যেন উন্নততর যন্ত্র আবিষ্কার করে এ ত্রুটি দূর করা যাবে; বৈজ্ঞানিকেরা দেখলেন, প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি মায়ার গণ্ডী (margin of error) আছে, যার মধ্যে সবরকম সূক্ষ্ম মাপজোখ ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই জীন্সের রামধনু উপমাটি বেশ সার্থক হয়েছে। আচার্য শঙ্করকে 'মায়াবাদী' বলে যে-সমস্ত আক্রমণ করা হয়েছে, তা নিতান্তই তাঁকে ভুল বোঝার জন্য। তিনি কখনোই জগৎকে 'নেহী হায়' বলে উড়িয়ে দেননি। তাঁর মতে, জগতের অস্তিত্ব ভ্রান্তি থেকে এবং ভ্রান্তিটিকেই 'মায়া' বলে অভিহিত করেছেন, যার কেবল ব্যবহারিক সত্তাই আছে, চরম সত্তা নেই। স্বামী বিবেকানন্দের মতে—"ঘটনা-পরম্পরার বিবৃতিই মায়া" (Maya is the statement of facts)।

স্যার জেম্স্ জীন্স্ ও আচার্য শঙ্কর যে-সমস্ত ক্ষুরধার যুক্তির সাহায্যে তাঁদের মত প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সে-সমস্ত না দিয়ে কেবল তাঁদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীটুকুই এখানে আলোচনা করা হল। জীন্স্ যেখানে Absolute এবং Pure Intelligenceকে এক করে দিয়েছেন, সেখানে শঙ্করাচার্য ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের মধ্যে সামান্য পার্থক্য বজায় রেখেছেন ব্যাখ্যা করার জন্য। তাঁর মত সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক ও ন্যায়সঙ্গত; বিজ্ঞান এখনো তার শেষ কথা উচ্চারণ করেনি। সে শুধু এইটুকুই বলছে যে, একটি অখণ্ড সত্তা না থাকলে এই খণ্ডসমূহের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তাছাড়া আমাদের মনের সাহায্যে চরম সত্তার ধারণা সম্ভব নয়—জীন্সের এই কথা শুধু শঙ্করাচার্য নন, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও সমর্থন করছেন। খুব সুন্দর প্রশ্ন তুলেছেন আইনস্টাইন তাঁর The World as I see It বইয়ে—"Why we bother on such topic? Let us think why we think ourselves free". বর্তমান মনস্তত্ত্ব এ বিষয় নিয়ে প্রচুর আলোচনা করছেন। ইয়ূং তাঁর In Search of a Soul বইয়ে যে-সমস্ত তথ্য পরিবেশন করেছেন, সেগুলিকে আরো এগিয়ে নিয়ে এসেছেন রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারা-সাইকোলজির প্রধান অধ্যাপক শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমান জগতের মানুষের কাছে তাদের মনই (mind) সর্বপ্রধান হাতিয়ার (apparatus)। ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি লেবোরেটরিতে কাজ শুরু করার আগে প্রধান কাজ ভোল্টমিটার, এ্যমমিটার বা ব্যুরেট, গুজ ক্রুসিবল্ ইত্যাদি ঠিক আছে কিনা দেখে নেওয়া, কারণ যন্ত্রে ত্রুটি থাকলে এক্সপেরিমেণ্ট ভুল হতে বাধ্য। বিজ্ঞানের এই মতটি শঙ্করাচার্যও অনুসরণ করেছেন। মনই আমাদের জ্ঞানার্জনের প্রধান হাতিয়ার বলে তাঁর নির্দেশ—প্রথমেই এটিকে ত্রুটিহীন করে

নেওয়া। সাইকোলজিস্টদের মতে একজন মানুষ তার মনের পূর্ণশক্তির মাত্র ১০-১৫% কাজে লাগাতে পারে, বাকি ৮৫-৯০%-ই থেকে যায় অব্যবহৃত। তাই আচার্য শঙ্কর বলছেন, মনের শক্তি বাড়িয়ে তার পুরোটাই ব্যবহার করতে হবে এবং পূর্ণশক্তির অধিকারী মনের দ্বারাই চরম সত্তা ব্রহ্মের সন্ধান করা যেতে পারে। স্যার জীন্‌স্‌ যেখানে চরম সত্তার আভাস দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন, সেখানে আচার্য শঙ্কর সরাসরি তাঁর ঠিকানা বলে দিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ

(গান)

স্বামী জীবানন্দ

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ
করুণার অবতার,
ধরণীর ঘন তমসা নাশিতে
এস তুমি বার বার।
মহিমা তব অপার!
জ্ঞানের দীপ জ্বেলে নিয়ে হাতে
মানুষের হুঁশ ফিরায়ে আনিতে,
ধ্রুব লক্ষ্যের পথ দেখাইতে,
খুলিতে মনের দ্বার
নেমে এস বার বার।
রাম ও কৃষ্ণ তুমি একাধারে,
সব ভাব আছে তোমার ভিতরে,
তোমারে স্মরিলে দুখ যায় দূরে
আনন্দ-পারাবার!
করুণার অবতার!
'যত মত তত পথ' মহামন্ত্র
স্থাপিল জগতে নবীন তন্ত্র,
ঘোচাল ভেদের সকল রন্ধ্র,
করিল সবারে উদার
তুলি সমন্বয়-ঝংকার।

কথামৃতের সহজ বাণীতে
অমিয় সিঞ্চিলে মানবের চিতে,
কে পারে তোমারে চিনিতে বুঝিতে,
তুমি হে যুগাবতার!
করুণার অবতার!
তুমি নবীন যুগের স্রষ্টা,
ভূতভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা,
তুমি কল্পতরু মুক্তিদাতা
অশেষ করুণাধার,
করুণার অবতার!
জ্ঞানভক্তির তব অমৃতবাণী
অদ্ভুত সুধানির্ঝর-ধ্বনি!
মরমে পশিয়া দুঃখ ভোলায়
পাপী তাপী সবাকার।
করুণার অবতার!
ঐক্য সাম্য তব মহাভাবে,
বিশ্ববাসী সব এক হবে,
আনন্দ মৈত্রী শান্তি লভিবে,
মহাধ্যানে মানবতার।
করুণার অবতার!

ভগিনী নিবেদিতা ও জাতীয়তা

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতের প্রায় সর্বত্র বিশেষ করে বাংলাদেশে যাঁরা ভগিনী নিবেদিতা কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিবিদ্, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বিপ্লবী প্রভৃতি দেশ ও সমাজের সর্বস্তরের নেতৃস্থানীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ। কিন্তু বাংলাদেশে বিশেষতঃ কলকাতা শহরে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্যতীত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরেও তাঁর বিশেষ প্রভাব ছিল। নিবেদিতার আকাঙ্ক্ষা ছিল দেশের জনসাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগস্থাপন, যাদের তিনি অভিহিত করতেন 'Our people' বলে। ভাষাগত ব্যবধানের ফলে তা সম্ভব হয়নি, যদিও বুদ্ধি ও হৃদয়ের দিক থেকে তাদের সঙ্গে একাত্মবোধ তাঁর সম্পূর্ণভাবেই ঘটেছিল। আর যে বাগবাজার পল্লীতে তিনি কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করেছিলেন, সেখানকার স্ত্রী-পুরুষ, ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের সঙ্গেই তাঁর বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল এই সম্পর্কে তাঁর ইংরেজ বন্ধু স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক র‍্যাটক্লিফ লিখেছেন, "পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে তিনি আশ্চর্যভাবে মিশে গিয়েছেলেন। হিন্দু প্রতিবেশিগণ তাঁকে একান্ত আত্মীয় জ্ঞান করত। বাজারে, পথে, গঙ্গাতীরে প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, এবং পথ দিয়ে চলবার সময় সকলেই তাঁকে যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে অভিবাদন করত, তা সত্যই সুন্দর ও হৃদয়স্পর্শী।"

বক্তৃতা তাঁকে ইংরেজিতেই দিতে হোত এবং সে বক্তৃতার মর্ম অনুধাবন কেবল ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব ছিল। তাঁর বক্তৃতাগুলি ছিল প্রাণস্পর্শী, কারণ হৃদয়ের আবেগের সঙ্গে বিদ্যমান ছিল তাঁর অনন্য-সাধারণ চরিত্র। কলকাতার শিক্ষিত সমাজ অল্পকালের মধ্যেই জেনেছিল, ভারতের নবজাগরণের স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা সিস্টার নিবেদিতা এ দেশকে ভালবেসেছেন এবং তার সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন।

এই শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষতঃ ছাত্র-যুব-সম্প্রদায়ের উপর নিবেদিতার প্রথমাবধি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি জানতেন, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এবং তার নবরূপ-সংগঠনে এরাই হবে প্রধান সহায়। ভারতের জাতীয় জীবনে নিবেদিতার দান কতখানি তার মাত্রা নিরূপণ করা কঠিন। সাধারণতঃ তিনি বিপ্লবিরূপে পরিচিত, ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের অন্যতম যোদ্ধারূপে অভিহিত। যে কোন উপায়ে বিদেশী শাসনের অবসান ছিল তাঁর একান্ত কাম্য। কিন্তু তিনি কেবল রাজনীতিক স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেননি। স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত নবীন ভারতের স্বপ্নও দেখেছিলেন। "ভাবী ভারত তার প্রাচীন গৌরবময় অতীতকে অতিক্রম করবে"—স্বামী বিবেকানন্দের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী নিবেদিতা মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্বসভায় ভারতের স্থান সর্বোচ্চে এবং পৃথিবীর নরনারীকে উচ্চতম জীবনের সন্ধান দিতে পারে ভারত—এ বিষয়ে তাঁর ধারণা অতিশয় দৃঢ় ছিল।

এক প্রবন্ধে নিবেদিতা লিখেছেন, গুরু যে আদর্শে অনুপ্রাণিত, সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হোয়ে

যিনি জীবন উৎসর্গ করতে পারেন, তিনিই প্রকৃত শিষ্য। যদিও সেই আদর্শের রূপদান করতে হবে শিষ্যকে সম্পূর্ণ নিজের ভাবে। নিবেদিতা নিজেই ছিলেন সেই প্রকৃত শিষ্য। "আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখছি, আমাদের সেই প্রাচীনা মাতা আবার জাগরিতা হয়েছেন, পূর্বাপেক্ষা অধিক মহিমান্বিতা ও পুনর্বার নবযৌবনশালিনী হোয়ে তাঁর সিংহাসনে আরোহণ করেছেন; শান্তি ও আশীর্বাণী প্রয়োগ সহকারে তাঁর নাম সমগ্র জগতে ঘোষণা কর।" ভারত সম্বন্ধে এই দিব্যদর্শনের ফলেই অদ্বৈতবাদী ও মানবপ্রেমিক স্বামীজী ভারতের সেবায় জীবন সমর্পণ করেছিলেন। তাঁর কাছে ভারতের কল্যাণের অর্থ সমগ্র জগতের কল্যাণ; কারণ ভারতই সমগ্র জগৎকে আধ্যাত্মিক ভাবরাজি প্রদান করতে সমর্থ, আর তার দ্বারাই মানব-জীবন-সমস্যার প্রকৃষ্ট সমাধান সম্ভব! ভারত সম্বন্ধে গুরুর এই দিব্যদর্শনই নিবেদিতাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি লিখেছেন, স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টির সামনে ছিল এক বিরাট ভারতীয় জাতীয়তা—যে জাতীয়তা নবীন, অশেষ-শক্তিসম্পন্ন, পৃথিবীর অন্যান্য যে-কোন দেশের জাতীয়তার সমকক্ষ। তাঁর (স্বামীজীর) মতে নিজ শক্তি সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত এই জাতীয়তা বৌদ্ধিক, জাগতিক, সামাজিক প্রভৃতি জীবনের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠালাভের উদ্দেশ্যে অসঙ্কোচে এগিয়ে চলেছে। জাতীয় ধর্মের (national righteousness) সদৃঢ় প্রতিষ্ঠাই হোল জাতীয়তা। নিবেদিতা আরো লিখেছেন, স্বামীজীকে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁদের আন্তরিক বিশ্বাস, এই জাতীয় ধর্ম-সংস্থাপনের জন্যই স্বামীজীর দেহ-পরিগ্রহণ।

স্বামী বিবেকানন্দ 'জাতীয়তা' শব্দটি বিশেষ ব্যবহার করেননি। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত। উহাই পরে জাতীয় আন্দোলনে (national movement) পরিণত হয় এবং তখন থেকেই 'জাতীয়তা' শব্দের বহুল প্রচলন। নিবেদিতার নিকট জাতীয়তা শব্দটি ছিল বিশেষ প্রিয়, তার অর্থও ছিল গভীর ও ব্যাপক। "আমি বিশ্বাস করি, বেদ ও উপনিষদের বাণীতে, ধর্ম ও সাম্রাজ্যসমূহের সংগঠনে, মনীষি-বৃন্দের বিদ্যাচর্চায় ও মহাপুরুষগণের ধ্যানেতে যে শক্তি প্রকাশ পেয়েছিল, তাই আর একবার আমাদের মধ্যে উদ্ভূত হয়েছে, আর আজকের দিনে তারই নাম জাতীয়তা।" এই জাতীয়তার মন্ত্রেই তিনি ছাত্র-যুবসম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন, জাতীয়তার আদর্শ সৃষ্টি করাই বর্তমান ভারতের প্রধান সমস্যা। তাঁর মতে ভারতীয় ঐক্যের মধ্যেই এই জাতীয়তাবাদ নিহিত। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। বৈচিত্র্যই ঐক্যের প্রাণ। এই ঐক্য যান্ত্রিক নয়, জীবনধর্মী।

ভারত সম্বন্ধে গুরুর দিব্যদর্শন নিবেদিতার সমগ্র মনপ্রাণ অধিকার করেছিল। তাই একদিকে যেমন স্বাধীনতার জন্য সর্বপ্রকার সংগ্রামে ছিল তাঁর সহানুভূতি, সমর্থন ও সহযোগিতা, অপরদিকে তেমনি ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্ব বিষয়ে ভারতের অগ্রগতির জন্য ছিল আন্তরিক প্রচেষ্টা। বস্তুত: গভীরভাবে চিন্তা করলে নিবেদিতার বহুবিধ কার্যকলাপের এই মূল সূত্রটি আবিষ্কার করা যায়। তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতের মুক্তিসাধন ও পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে জগৎ সমক্ষে তার প্রতিষ্ঠা। দেশের রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের যাঁরা সাধক, তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল যে-কোন উপায়ে

দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন। আবার কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী প্রভৃতি মনীষিগণ ছিলেন নিজ নিজ সাধনায় তন্ময়, যদিও ভারতের পরাধীনতা তাঁদের বিচলিত করেছিল এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁদের অবদানও কম নয়। কিন্তু যে সত্যের আভাস তাঁদের অন্তরলোক উদ্ভাসিত করেছিল, তারই পরিপূর্ণ উপলব্ধির সাধনায় তাঁরা প্রয়োগ করেছিলেন সর্বশক্তি। বলা বাহুল্য, তাঁদের সাধনলব্ধ ফল নিঃসন্দেহে ভারতমাতার মুখ উজ্জ্বল করে বিশ্বসভায় মর্যাদা দান করেছে। ভগিনী নিবেদিতা এই দুই সাধনার সংযোগ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন বললে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। একই সঙ্গে তিনি দেশের মুক্তি-সাধন ও নবদেশ-সংগঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। প্রথমাবধি যাঁরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন তাঁদের অধিকাংশের মধ্যেই এই অখণ্ড স্বপ্নের স্থান ছিল না। স্বাধীনতালাভের পর তার সংরক্ষণ ও নব সংগঠনের মূলেও সেই স্বপ্নের অভাব।

স্বামী বিবেকানন্দের দিব্যদৃষ্টিতে ভারতের যে মহিমময় রূপ উদ্ভাসিত হয়েছিল তার বাস্তব রূপায়ণ করবে কারা? উদীয়মান তরুণসম্প্রদায়—যারা উৎসাহে মত্ত, প্রাণের আবেগে পূর্ণ; যারা নিরন্তর পথ খুঁজছে আত্মপ্রকাশের। কিন্তু আত্মপ্রকাশের পথ কি ধ্বংসে? নব নব সৃজনের মধ্যেই কি মানুষ তার জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায় না? সৃষ্টির পথ রুদ্ধ হোলেই সৃজনী শক্তির অপচয় ঘটে ধ্বংসে। সৃষ্টির পূর্বে পিতামহ ব্রহ্মা ছিলেন তপস্যায় মগ্ন। তাঁর মানস-আকাশেই সৃষ্টির রূপটি প্রথম উজ্জ্বল হোয়ে ফুটে ওঠে। সুদক্ষ কারিগর যে মূর্তির রূপ প্রদান করে, তার পূর্বে তাকে সেই রূপের আরাধনায় তন্ময় হতে হয়। কে এই তরুণদের ভারতের মহিমময় মূর্তির ধ্যানে তন্ময় হতে শেখাবে? আর সেই ধ্যানের মূর্তিকে রূপ প্রদানের কাজেই বা সাহায্য করবে কে? যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করবার জন্য প্রয়োজন অসীম ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ হৃদয়বত্তা। নিবেদিতা এই দুই সম্পদেরই অধিকারিণী ছিলেন। তিনি নিজে ভারতকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন, মহিমময় ভাবী ভারতের স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন, তার সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাই তাঁর কণ্ঠে ভারতের জাতীয়তার রাগিণী শতধারে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠতো। তাঁর অগ্নিময় বাণী সকলকে উদ্দীপিত করতো। তাঁর আত্মোৎসর্গ সকলকে দেশসেবায় জীবন-উৎসর্গে অনুপ্রাণিত করত।

১৯০২ খৃষ্টাব্দ থেকে নিবেদিতা কলকাতায় গীতা সোসাইটি, বিবেকানন্দ সোসাইটি, ডন সোসাইটি, ইয়ংমেনস হিন্দু য়ুনিয়ন কমিটি, অনুশীলন সমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে তিনি নিয়মিত যাতায়াত করতেন, তরুণ-সম্প্রদায়ের নিকট ধর্মোপদেশ দিতেন, গীতার ব্যাখ্যা করতেন, স্বামীজীর আদর্শ ও বাণী জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করতেন। কলকাতার বাইরে বাংলাদেশের অন্যত্র অথবা বিভিন্ন প্রদেশে যখন যেখানে গেছেন, সেখানেই তরুণ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগস্থাপন ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তাঁর প্রত্যেকটি সুচিন্তিত ভাষণে প্রকাশ পেয়েছে ভারত-জীবন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, অকপট অনুরাগ ও শ্রদ্ধা। বার বার তিনি বলতেন, 'My task is to awake the nation'—সমগ্র জাতির মধ্যে জাগরণ আনয়ন হোল আমার কাজ। এক অখণ্ড জাতীয়তাবোধ-সঞ্চার

দ্বারাই তা সম্ভব। ভাবের সঙ্গে তিনি যখন ভারতের মহিমা ব্যাখ্যা করতেন, ধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজীর উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও গভীর স্বদেশপ্রেম বর্ণনা করতেন তখন শ্রোতৃবর্গের চিত্ত অভিভূত হোত। সিংহীর ন্যায় তেজোদৃপ্ত-কণ্ঠে তিনি যখন দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য সকলকে জীবনপণে আহ্বান করতেন, সকলে হৃদয়ে প্রবল অনুপ্রেরণা বোধ করত। অনুরাগের সঙ্গে তিনি যখন সর্ববিধ কল্যাণকর কার্যে অগ্রসর হোতে বলতেন তখন হৃদয়ে উৎসাহের সঞ্চার হোত।

স্বামীজীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগস্ট কলকাতায় বিবেকানন্দ সোসাইটি স্থাপিত হয়। নিবেদিতা ছিলেন ঐ সোসাইটি-স্থাপনের উদ্যোক্তা। স্বামীজীর জীবনাদর্শের প্রচার ও অনুধ্যান ছিল সমিতির লক্ষ্য। নিবেদিতা বহুবার ঐ সমিতির সদস্যগণের নিকট বক্তৃতা দিয়েছেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি মাদ্রাজ গমন করেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের তত্ত্বাবধানে মাদ্রাজের দূরবর্তী অঞ্চলে কয়েকটি বিবেকানন্দ সোসাইট প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐসকল সোসাইটির কাজ ছিল সাময়িক বক্তৃতা ও ক্লাসের সঙ্গে পূজা, ভজন ও দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহায্যদান নিবেদিতার আকাঙ্ক্ষা ছিল ভারতের সর্বত্র ঐরূপ বিবেকানন্দ সোসাইটি স্থাপিত হয়। ঐসকল সমিতির মাধ্যমেই ভারতের যুবশক্তি উদ্বুদ্ধ হবে জাতীয়তার মন্ত্রে—এই আশা তিনি অন্তরে পোষণ করতেন। ''বর্তমানে প্রকৃত কাজ হচ্ছে সর্বপ্রকার তাৎপর্য ও অর্থবোধের সঙ্গে ভারতের সর্বত্র 'জাতীয়তা' শব্দটি প্রচার করা। এই বিরাট চেতনা সর্বদা ভারতকে পূর্ণরূপে অধিকার করে থাকা চাই। এই জাতীয়তা দ্বারাই হিন্দু ও মুসলমান দেশের প্রতি এক গভীর অনুরাগে একত্র হবে। এর অর্থ—ইতিহাস ও প্রচলিত রীতিনীতিকে এক নূতন চোখে দেখা; ধর্মের মধ্যে সমগ্র রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দরূপ ভাবনার সমাবেশ—সর্বধর্ম-সমন্বয়। বুঝতে হবে যে, রাজনীতিক প্রণালী ও আর্থনীতিক দুর্বিপাক গৌণমাত্র। পরন্তু ভারতবাসী কর্তৃক ভারতের জাতীয়তা উপলব্ধিই প্রকৃত কাজ।''

নিবেদিতা একদিকে যেমন ভারতের ধর্ম, ইতিহাস, সংস্কৃতি, শিল্প প্রভৃতি অনুশীলনের মধ্যে তার আধ্যাত্মিক রূপটি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, তার পারিবারিক ও সামাজিক দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, পাল-পার্বণ, উৎসবাদি গভীর মনোনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে তার মর্ম অনুধাবন করেছিলেন, অপরদিকে তার জাতীয় জীবনের জটিল সমস্যাগুলির প্রত্যেকটির বিশ্লেষণ, চিন্তা ও আলোচনা দ্বারা সমাধানের ইঙ্গিতও দিয়ে গিয়েছেন। প্রকৃত-পক্ষে তিনি যতখানি অধীর ছিলেন ভারতের রাজনীতিক মুক্তিলাভের জন্য, ততখানি ব্যগ্র ছিলেন তার সর্ববিধ উন্নতির জন্য স্বভাবতই ছাত্রসম্প্রদায়ের বিশেষতঃ বিবেকানন্দ সোসাইটির সদস্যগণের জন্য নির্দিষ্ট কার্যসূচীর কথাও তিনি চিন্তা করেছিলেন। 'ভারতীয় বিবেকানন্দ সমিতিগুলির জন্য কার্যের ইঙ্গিত' নামক প্রবন্ধে তার বিবরণ পাওয়া যায়।[১] আপাতদৃষ্টিতে সমাজকল্যাণকর কার্যে ব্রতী হওয়াই ছাত্রগণের পক্ষে সঙ্গত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু নিবেদিতা জানতেন, অধিকাংশ ছাত্র দরিদ্র মধ্যবিত্ত-পরিবারভুক্ত। তাদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য একাগ্রচিত্তে বিশ্ব-

১ Hints on National Education in India, p. 65.

বিদ্যালয় কর্তৃক নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নপূর্বক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ; কারণ শীঘ্রই তাদের সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে পরিবারের দায়িত্ব বহন করতে হবে। তাছাড়া তখন পর্যন্ত সমাজ-কল্যাণকর কার্যগুলি অধিকাংশ গৃহস্থ অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। অতএব অধ্যয়নরূপ তপস্যার সঙ্গে স্বামীজীর আদর্শানুযায়ী চরিত্রগঠন করা ও জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়াই ছাত্রগণের একান্ত কর্তব্য। প্রয়োজন—ব্যায়ামাদি দ্বারা শরীরচর্চা ও নানারকম পুস্তকাদি পাঠের দ্বারা মনের উৎকর্ষসাধন, বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন। জাতীয়তা-বোধের সঞ্চার তখনই সম্ভব যখন দেশমাতৃকার অখণ্ডরূপটি আমাদের মানসনেত্রে প্রতিভাত হয়। ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত পর্যটন করে স্বামীজী দেশমাতৃকার এই অখণ্ড রূপ দর্শন করেছিলেন, তাই তিনি মহা-জাতীয়তার উদ্বোধক। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁকে সাহায্য করেছিল স্বদেশের কল্যাণকর কার্যের অনুষ্ঠানে। তাই ছাত্রবৃন্দের অন্যতম কর্তব্য হবে অবকাশ-সময়ে তীর্থপর্যটন। সুদূর হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী, কামাখ্যা থেকে দ্বারকা, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অন্তর্গত সকল তীর্থস্থানই জনসাধারণের মিলনভূমি। কেদার-বদরী মহাতীর্থে নিবেদিতা এ সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে একদল ছাত্রকে সুদূর হিমালয়ে তীর্থপর্যটনে প্রেরণ করেন। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ঐ দলের অন্যতম যাত্রী। দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের পক্ষে এই ব্যয়ভার-বহন অধিকাংশ স্থলেই অসম্ভব। অর্থাভাবে প্রতি বৎসর ছাত্রদলকে তীর্থপর্যটনে প্রেরণের পরিকল্পনা তাঁকে বাধ্য হয়ে পরিত্যাগ করতে হয়। স্বদেশের ইতিহাস এবং মহামানবগণের চরিত্র-অধ্যয়ন জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করবার অন্যতম সহায়। ভারতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল মহত্তম চরিত্রের আবির্ভাব হয়েছে, সেইসব চরিত্রের অধ্যয়ন ও অনুশীলন হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার করবে মহৎ জীবনযাপনে। কেবল স্বদেশের নয়, বিদেশের ইতিহাস-অধ্যয়নও প্রয়োজন। বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে মানব-সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস জাগাবে আত্মপ্রত্যয়। একদিকে স্বাধীনতারক্ষার জন্য প্রাণবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা, অপরদিকে বিশ্বমানব-কল্যাণে মনীষিগণের অনলস সাধনায় আত্মোৎসর্গ! তারপর চিন্তা করতে হবে গভীরভাবে দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে। সুগভীর চিন্তার মধ্যেই নিহিত থাকে সমাধানের ইঙ্গিত। সর্বোপরি, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অনুধ্যান। তিনি লিখেছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন যেন বর্তমানে আমি বিশেষভাবে অনুধাবন করছি। আমি দেখতে চাই, আমাদের জনসাধারণ ভারতের সবত্র দলে দলে সমবেত হয়েছেন, এবং তাঁদের উদ্দেশ্য কর্ম নয়, কেবল প্রার্থনা আর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-অনুধ্যান। এই দুই মহাজীবনের মধ্যেই সমগ্র ভারতের ঐক্য নিহিত। ভারতবর্ষ এই দুই মহাপুরুষকে হৃদয়ে ধারণ করবে, এইটিই সবচেয়ে প্রয়োজন।"

তদানীন্তন যুবক-সম্প্রদায়ের হৃদয়ে নিবেদিতার বাণী কীভাবে অনুরণিত হয়েছিল, তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় শ্রীযুক্ত বিনয় সরকারের কথায়, "···সেই চিত্ত আর ব্যক্তিত্ব তিনি (নিবেদিতা) ঢেলে দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মারফত ভারতীয় জনসাধারণ আর ভারতীয় সংস্কৃতির পায়ে। ভারতীয়

নরনারীর অতীত ব্যাখ্যা করা, বর্তমান বিশ্লেষণ করা আর ভবিষ্যৎ বাৎলানো তাঁর পক্ষে মুড়ি-মুড়কী খাওয়ার মত সোজা কাজ ছিল। ঠিক যেন আদর্শনিষ্ঠ ও ভাবুক ভারতীয় স্বদেশ-সেবকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিবেদিতা সমগ্র ভারতের বিকাশধারা দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন।"

দেশের সর্বত্র জাতীয়তাবোধ-সঞ্চারের চিন্তা সর্বক্ষণ নিবেদিতার মনপ্রাণ অধিকার করে থাকত। "পত্রিকাই এই জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করবার শ্রেষ্ঠ উপায়।" সুতরাং একসময়ে তিনি একখানি পত্রিকা বার করবার জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অসংখ্য প্রতিবন্ধক ও প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অল্প অর্থ-সাহায্যে তা সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে তদানীন্তন জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলিতে লিখেই মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে হয়েছিল।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কাশী কংগ্রেস অধিবেশনের পরে 'ভারতের জাতীয় মহাসভা' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "কংগ্রেসের কাজ রাজনীতিক অথবা দলীয় আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করা নয়; কংগ্রেস হচ্ছে জাতীয় আন্দোলনের রাজনীতিক দিকমাত্র।...বর্তমানে কংগ্রেসের যথার্থ কাজ শিক্ষাসংস্কাররূপে সমগ্র দেশের মধ্যে জাতীয়তাবোধ সঞ্চার করা। যাতে জাতীয়তাবোধের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়, সেজন্য কংগ্রেসের সদস্যগণকে নূতনভাবে, নূতন চিন্তায় অভ্যস্ত করতে হবে।" নিবেদিতার এই উক্তির মূল্য কতখানি তা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

ভারতীয় শিল্পের পুনরভ্যুদয়ে তাঁর অসামান্য দানের কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অসিত হালদার প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণের অকুণ্ঠ ভাষণে তার স্বীকৃতি রয়েছে। তিনি বলতেন, "শিল্পের পুনরভ্যুদয়ের ওপরেই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ আশা নিহিত। অবশ্য ঐ শিল্প জাতীয় চেতনা ও জাতীয় ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।"

নিবেদিতার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। জাতীয় জীবনগঠনের সমস্ত পরিকল্পনা অসমাপ্ত রেখে অসময়ে তাঁকে যাত্রা সমাপ্ত করতে হয়েছিল। যত সাধ ছিল তত সময় ছিল না। অশেষ মূল্য দিয়ে আমরা আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করেছি, যদিও ভারতমাতার অখণ্ডরূপ আর নেই। ভারত আজ নানাবাদভূমিতে পরিণত। প্রতিদিন বিরাট প্রাণশক্তির অপচয় ঘটছে নানাভাবে। মনে হয়, নিবেদিতা যদি এই সঙ্কটমুহূর্তে এসে দাঁড়াতেন! জাতীয় জীবনের এক সঙ্কটকালেই তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল।

নিবেদিতা চলে গেছেন, কিন্তু রেখে গেছেন অমূল্য চিন্তারাজি, যার মধ্যে রয়েছে জীবনগঠনের সন্ধান, সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত। নিবেদিতার উৎসবানুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে যেমন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা আমাদের কর্তব্য, তেমনি তাঁর গ্রন্থরাজির অধ্যয়ন ও তাঁর মহৎ জীবনের অনুধ্যানও প্রয়োজন, যা আমাদের অন্তরে প্রেরণা সঞ্চার করবে আদর্শ জীবনযাপনে।

মহাপ্রভুর ভাবধারা ও বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামী

ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত

শ্রীচৈতন্যদেব বাঙালী। বাঙলাদেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ ক'রে এবং বাঙলার অন্তরলোকের স্নেহ-কোমলতার বৈশিষ্ট্যের এক মূর্ত বিগ্রহরূপে তিনি কেবল বাঙলাদেশকেই মাতিয়ে তোলেননি, সমগ্র ভারতবর্ষের অন্তরলোকেও তাঁর লোকোত্তর ভাবধারাকে তরঙ্গায়িত করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম বাঙালী যিনি সমগ্র ভারতবর্ষকে একটি প্রেমমন্ত্রে দীক্ষা দিতে পেরেছিলেন। তাঁর লোকোত্তর জীবনকে কেন্দ্র ক'রে যে-ভাবমণ্ডলটি সর্বপ্রথম বাঙলাদেশে গ'ড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে প্রধান সুর জুগিয়েছিল প্রেম। প্রেম-বিহ্বলতার এক অপরূপ প্রকাশ যেমন ঘটেছিল তাঁর সর্বাঙ্গে, তেমনি কণ্ঠেও উচ্চারিত হয়েছিল প্রেমেরই সুমধুর গান, যে-প্রেম সকলকে কাছে টেনে আনে, কাউকেই সরিয়ে দেয় না বরং তার মধ্যে স্বতোৎসারিত করে ভক্তির অশ্রু-নির্ঝরকে। নম্রতায়-শুচিতায়, নিরভিমান সত্তার অকুণ্ঠ প্রকাশে এবং মহিমময় তেজবীর্যের দীপ্তিতে চৈতন্যদেবের ব্যক্তিচরিত্র যে-ভাবে উদ্ভাসিত হয়েছিল, সমগ্র মানব-ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। যেখানে যেটুকু প্রয়োজন তার চেয়েও অনেক বেশি যেন তিনি দান করেছেন। সমগ্র ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির মূল ধারাটিকেই যেন তাঁর অলৌকিক প্রেম-প্রকাশের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। প্রাক্‌চৈতন্য যুগে বাঙলাদেশে দু'টি ধারা উদ্ভূত হয়েছিল,—একটি নানুরের চণ্ডীদাস, অপরটি মিথিলার বিদ্যাপতির প্রেমময় গীতধারা। এই দু'টি ধারারই উৎসমূল জয়দেবের গীতগোবিন্দ। বাঙলার প্রেমমধুর প্রাণ-চেতনার ধারাটিকেই বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বাঙ্ময় ক'রে তুলেছিলেন। এই যুগ্মধারার সম্মিলিত গীতিবিগ্রহ হচ্ছেন শ্রীচৈতন্যদেব।[১] ষোড়শ শতকের প্রথমাংশের বাঙালীরা এই প্রেমসুন্দর গীতি-বিগ্রহকে সমস্ত অন্তর দিয়ে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন এবং সমগ্র ভারতের বুকে এই গীতি-বিগ্রহের প্রেমরসকে সকলের হৃদয়ের পাত্রে ঢেলে দেওয়ার ব্যবস্থাও করেছিলেন। সেদিনকার বাঙালীর মনে এই যে প্রাণ-চেতনা জেগেছিল, তার মূলে ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং। তিনি বাঙালীর প্রাণের কানে পরম সুরটিকে তুলে' ধরেছিলেন এবং সেই সুরই বিভিন্ন পদাবলী ও বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের মাধ্যমে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত গুঞ্জরিত হ'য়ে উঠেছিল।

এই প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে কয়েকজন মনীষাসম্পন্ন বাঙালী বৃন্দাবনে গিয়ে বসবাস করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে লোকনাথ, ভূগর্ভ, সনাতন এবং রূপ প্রধান। লোকনাথ এবং ভূগর্ভ বরং নিজেদের বেশ কিছুটা নেপথ্যে রেখে দিয়েছিলেন, আর বিপুল পাণ্ডিত্য এবং রস-মাধুর্যের অধিকারী রূপ এবং সনাতন চৈতন্য-মন্ত্রের পাদপীঠের উজ্জ্বল আলোকে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সেখানে তাঁদের যে রূপ দেখি, সে-রূপ অনন্যসাধারণ ; পাণ্ডিত্যে, প্রেমে, ভক্তিতে, রসশাস্ত্রের ব্যাখ্যায়, অপরিসীম ত্যাগে এবং সমগ্র চৈতন্যভক্তের জীবনচর্যার দিক-নির্দেশে এই দুই ভাই সকলের একটি নমস্যস্থান

১ সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

অধিকার ক'রে আছেন। তাঁদেরই মন্ত্রদীক্ষিত ছিলেন তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী। রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ ভট্ট তাঁদেরই আকর্ষণে যেন বৃন্দাবনের রসলোকে ছুটে এসেছিলেন; এবং এই ছুটে আসার পিছনে শ্রীচৈতন্যদেবেরই প্রত্যক্ষ অনুমোদন ছিল। রঘুনাথ দাস বাঙালী, রঘুনাথ ভট্টও বাঙালী। একমাত্র গোপাল ভট্টই দাক্ষিণাত্য থেকে শ্রীবৃন্দাবনে এসেছিলেন। রঘুনাথ দাস যখন বৃন্দাবনে এসেছিলেন তখন শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধান ঘটেছে, এবং সমগ্র ভারতব্যাপী চৈতন্য-বিভূতি ছড়িয়ে পড়েছে। সনাতন এবং রূপ তাঁকে একান্ত অনুরোধ জানিয়ে জীবিত রেখেছিলেন, আর মনে প্রাণে চৈতন্যধ্যানী দাসগোস্বামীকে 'গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু' রচনার উপযোগী স্নিগ্ধসুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে দিয়েছিলেন। দাসগোস্বামীর পুণ্যশ্লোক নামটিকে উল্লেখ করতে গিয়েই স্বরূপ দামোদরের কথা অনিবার্যভাবে আলোচ্য হয়ে পড়ে; কারণ তাঁর প্রভাব রঘুনাথ দাসগোস্বামীর জীবনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হয়েছিল। চৈতন্যপরিকরদের মধ্যে যে-কয়জন বাঙালী ভক্ত বাঙলাদেশ থেকে পুরীতে গিয়েছিলেন, তাঁরা শ্রীগৌরাঙ্গকে কেন্দ্র ক'রে গৌরপারম্যবাদের একটি শুচিসুন্দর ভাবমণ্ডল রচনা করেছিলেন। কিন্তু বাঙলা ত্যাগ ক'রে যে দুই-একজন বাঙালী মহাপ্রভুর সঙ্গলোভে পুরীধামে গিয়ে বাস করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছেন স্বরূপ দামোদর। তিনি বৃন্দাবনের গোস্বামীদিগের অন্তর্ভুক্ত না হ'য়েও তাঁদের সকলেরই প্রণম্য। কারণ শ্রীগৌরাঙ্গ-জীবনের তত্ত্বমাধুর্য তিনিই বিশেষভাবে সকলের কাছে প্রকট করেন। মহাপ্রভুর তত্ত্বনির্ণয়ে এই স্বরূপ দামোদরের অবদান একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়। স্বরূপ দামোদরের কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিরূপে যা' প্রকাশিত হয়েছে, তা' হ'লো এই,—শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কেমন, তিনি আমার যে মাধুর্য আস্বাদন করেন সে-মাধুর্য কি প্রকার, আর আমার এই মাধুর্য আস্বাদন ক'রে শ্রীরাধার যে অপরিমেয় আনন্দ সেই আনন্দই বা কিরূপ,—ব্রজভূমিতে অনাস্বাদিত এই তিন ভাবের আস্বাদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতরণ। এই দৃষ্টি ঋষিদৃষ্টি, এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী অভিনব। ছয় গোস্বামীর মধ্যে যদিও এঁর নাম অনুল্লিখিত আছে, তথাপি ছয় গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ গোস্বামী যে এঁরই ভাবরূপের অন্যতম প্রকাশ, সে-বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। সুতরাং ছয় গোস্বামীকে জানতে হ'লে এই স্বরূপ দামোদরের ঋণ সর্বাগ্রে স্বীকার ক'রে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। তাঁর সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিজের উক্তি:

কৃষ্ণরস তত্ত্ববেত্তা দেহ প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥
সংগীতে গন্ধর্ব সম বৃদ্ধো বৃহস্পতি।
দামোদর সম কেহ নাহি মহামতি ॥

* * *

আর দিনে আইলা স্বরূপ দামোদর।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম রসের সাগর ॥

[চৈ: চ: মধ্যলীলা—১০ম পরি:]

আমাদের মনে হয়, চৈতন্যচরিতামৃতের এই স্বল্পায়তন উক্তিতেই স্বরূপ দামোদরের যথার্থ রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজের গ্রন্থে স্বরূপ দামোদরের তত্ত্ব ও তথ্য কিরূপে গ্রহণ করেছেন, তাঁর প্রকাশ দিয়েছেন এইভাবে—

চৈতন্যলীলা রত্ন সার স্বরূপের ভাণ্ডার
তিহোঁ থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।

তাহাঁ কিছু সে শুনিল   তাহা ইহাঁ বিবরিল
ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥
[চৈঃ চঃ মধ্যলীলা—২য় পরিঃ]

স্বরূপ দামোদরের মতবাদই দাস গোস্বামীর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে এবং সমগ্র শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থখানি এই স্বরূপ দামোদরের মতেরই প্রতিধ্বনি।

এখন আমাদের বিচার ক'রে দেখতে হবে, বাঙলা দেশের শ্রীচৈতন্য-পরিকরগণ এবং বৃন্দাবনের চৈতন্যভক্তগণ কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শ্রীচৈতন্যের জীবনতত্ত্বকে গ্রহণ করেছেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের রূপ দান করেছেন। বাঙলা দেশের যে কয়েকজন শ্রীচৈতন্যের প্রেম-বিহ্বল রূপের প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তি এবং যাঁরা চৈতন্যের ধ্যানকে অন্তরের একমাত্র সম্পদ ক'রে বাঙলা দেশেই থেকে গিয়েছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, বংশীবদন প্রভৃতি। অদ্বৈত প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবৎকালেই তাঁকে ভগবানের অবতার ব'লে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এই প্রচারে চৈতন্যদেবের বিরক্তি সত্ত্বেও তিনি তা' গ্রাহ্য করেননি। তাঁদের কাছে শ্রীচৈতন্যই একমাত্র ভগবানের রূপ ধ'রে দেখা দিয়েছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের যে-স্নিগ্ধ সুন্দর অলৌকিক রূপ বহু শত দৃষ্টির তৃষ্ণা মেটাতো, তাঁদের দৃষ্টিতে সেই রূপ ভগবানের অলৌকিক রূপ হয়ে দেখা দিয়েছিল। নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ, লোচন দাস প্রভৃতি এই অসাধারণ নয়নভুলানো রূপকে ধ্যান ক'রেই নবদ্বীপে নাগরী ভাবের উপাসনার প্রবর্তন করেছিলেন। এই নাগরী-ভাবের প্রেমসাধনা কবিপ্রাণের উজ্জ্বল স্বাক্ষর নিয়ে জেগে আছে। মনে হয়, শিবানন্দ সেন, নরহরি সরকার, মুরারি প্রভৃতি একমাত্র গৌরমন্ত্রের দ্বারাই উদ্বোধিত হয়েছিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গকে রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপের বিগ্রহ-স্বরূপ মনে ক'রে একটি উপাসনার প্রবর্তন করেন এবং সেই উপাসনা যাতে সমগ্র বাঙলা-দেশে উপযুক্ত প্রসার লাভ করে সেজন্য সমস্ত প্রচেষ্টাও নিয়োজিত করেছিলেন। তা' ছাড়া, নরহরি সরকারই গৌরগদাধর-বিগ্রহ স্থাপনের আদি-উদ্যোক্তা। শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁরা পরম উপাস্য মনে করতেন বটে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব কেবল রাধাভাবের মাধুর্য আস্বাদন করবার জন্য এ পৃথিবীর মাটিতে অবতীর্ণ হয়েছেন, এ-কথা যেন তাঁরা স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না। বরং শ্রীগৌরাঙ্গই একমাত্র আরাধনার বস্তুরূপে তাঁদের কাছে দেখা দিয়েছিলেন। তাঁদের স্বরচিত বিভিন্ন পদের মধ্য দিয়েই চৈতন্যদেবের প্রতি প্রাণের ভক্তিময় আকুতি প্রকাশ পেয়েছে।[২] শুধু তাই নয়, এই প্রসঙ্গে আমাদের আর একটি দিকের প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে। বাঙলাদেশে থেকে মুরারি, বৃন্দাবন দাস, লোচন এবং জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যের জীবনকে উপজীব্য ক'রে যে-জীবনীকাব্য রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে ষড়গোস্বামীর নাম একবারও উল্লেখ করেননি।

২ ডঃ সুশীলকুমার দে তাঁদের এই চৈতন্যভক্তির বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষণ করেছেন এইভাবে—"in these padas, as in the lives of Caitanya which derive their inspiration from the Navadvipa circle, and to which they have natural affinity, no abstruse theology obscures the simple and passionate faith; to them Caitanya is not an image of their supreme deity, but the deity himself incarnated, not a means, but an end in itself" Early History of Vaisnava Faith and Movement in Bengal —Dr. Sushil Kumar Dey, P. 61.

অবশ্য রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট প্রভৃতি ষড়্‌গোস্বামীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন পরবর্তী যুগে। আনুমানিক ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে রচিত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় কবি কর্ণপুর আরও বহুব্যক্তির সঙ্গে চৈতন্যধর্মের সাধনার অন্তরঙ্গ-রূপে সনাতন, রূপ ও জীবগোস্বামীর নাম উল্লেখ করেছিলেন মাত্র। তাঁর 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটকে তো কাহিনীর ধারাবাহিকতা ও নাট্যরস সৃষ্টির জন্য রূপগোস্বামী প্রভৃতিকে আনতেই হয়েছিল। তা' ছাড়া, এই প্রসঙ্গে এই বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, মুরারি, বৃন্দাবন দাস, লোচন প্রভৃতির রচনায় শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচল-বাসের দীর্ঘ কয়েকটি বৎসরব্যাপী যে প্রেমবিহ্বল বিরহোন্মাদ অবস্থা তার কোনো বিস্তৃত বর্ণনা নেই কেবলমাত্র নবদ্বীপলীলারই জয়গান করেছেন তাঁরা। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারি যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে যে-একটি তত্ত্বের দিক আছে, এবং যে-তত্ত্ব বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত, সেই তত্ত্ব গৌড়দেশে রচিত পদে এবং আচরণে একেবারেই প্রশ্রয় পায়নি। কেবল নরহরি-ভণিতাযুক্ত একটি পদে রাধাপ্রেমের রসাস্বাদন জন্য চৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন ব'লে উল্লিখিত হয়েছে :–

অন্তরেতে শ্যামতনু বাহিরে গৌরাঙ্গ জনু
অদ্ভুত চৈতন্যের লীলা।
রাই সঙ্গে খেলাইতে কৃষ্ণরস বিলাইতে
অনুরাগে গৌরতনু হৈলা॥
কহিবার কথা নহে কহিলে কি জানি হ'য়ে
না কহিলে মনে বড় তাপ।
চিত্তে অনুমান করি গৌরাঙ্গ হৃদয়ে ধরি
নরহরি করয়ে বিলাপ॥

যদি এ-পদ নরহরি সরকারের হ'য়ে থাকে, তবে তা একমাত্র ব্যতিক্রম। কেউ কেউ নরহরি-লিখিত ব'লে এ-পদটিকে স্বীকারও করতে চান না। সে যাই হোক, শ্রীগৌরাঙ্গদেবই মূলতঃ বাঙলা দেশের চৈতন্যভক্তদের কাছে উপাসনার জগতে একমাত্র উপেয় (end in itself) হ'য়ে দেখা দিয়েছিলেন এবং তাঁদের ধ্যানজ্ঞানের কেন্দ্রমূলে তিনিই সর্বময় হ'য়ে থেকেছেন। বিগ্রহ-রচনায় ধ্যান-দৃষ্টিতেও এক চৈতন্যদেব ছাড়া সেদিন আর তাঁদের কাছে কেউ দেখা দিতে পারেননি।

আর যদি বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দিকে তাকাই, তাহলে দেখি, শ্রীচৈতন্যের প্রতি অপরিসীম ভক্তিকে হৃদয়ে ধারণ ক'রে তাঁরা একটি সুগভীর তত্ত্বদৃষ্টির অধিকারী হয়েছেন। সেই তত্ত্বদৃষ্টির কেন্দ্রভূমিতে শ্রীকৃষ্ণই পরম দৈবতরূপে দেখা দিয়েছেন এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য। তাঁদের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে নীলাচলবাসী চৈতন্যদেবেরই যোগিবেশ প্রতিভাত হয়েছে। নবদ্বীপের গৌরাঙ্গলীলা তাঁদের মনকে যেন আকৃষ্ট করতে পারেনি। এখানেই তাঁদের তত্ত্বদৃষ্টির মূল নিহিত রয়েছে ব'লে মনে হয়। বাঙলার সঙ্গে পুরী আর বৃন্দাবনের বৈষ্ণব-সাধকদের মধ্যে এইখানেই আদিপার্থক্য ব'লে মনে করি। বাঙলায় সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গকে কেউ গ্রহণ করতে চাননি। অন্যদিকে রায় রামানন্দ স্বরূপ দামোদরের পূর্বেই দাক্ষিণাত্যে মহাপ্রভুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই শ্রীরাধারূপিণী কাঞ্চন-পঞ্চালিকার লাবণ্যমণ্ডিত রূপকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু এ আমাদের স্বীকার করতেই হ'বে যে, শ্রীচৈতন্যের রাধাভাব নবদ্বীপলীলাতেই সর্বপ্রথম প্রকটিত হয়। মহাপ্রভুর আদি অনুরক্ত পরিকরগণ নবদ্বীপ-লীলায় ঐ রাধা ও কৃষ্ণভাবে অনুভাবিত দেখেই মহাপ্রভুকে অবতার ব'লে মনে করেছিলেন

এবং তা উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করতেও দ্বিধা করেননি। তাঁদের মনোভাবনার এই দিকটিকেই ডঃ সুশীল কুমার দে এইভাবে বর্ণনা করেছেন—"Unlike the Vrindāvana Gosvāmins, they accepted Caitanya as the centre of their thought and object of adoration of their faith. This has been characterised as the Goura-pāramya-vāda, which whatever may have been their personal attitude) the Vrndāvana Gosvāmins never discuss or set forth in their theological treatises."[৩] চৈতন্য-পরিকরদের মধ্যে কেউ কেউ নবদ্বীপ-লীলায় মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-আবিষ্ট রূপটি প্রত্যক্ষ ক'রে পদ রচনা করেছিলেন। পরিকরদের মধ্যে যিনি চৈতন্যদেবের চেয়েও বয়সে বড় সেই শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার একটি পদে লিখেছেন :

গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে।
ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে॥
সুরধুনী দেখি পহু যমুনার ভানে।
ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে॥
পূরব আবেশেতে ত্রিভঙ্গ হৈয়া রহে ;
পীত বসন আর সে মুরলী চাহে॥

৩ Vaisnava Faith and Movement in Bengal, Dr, S. K. Dey. P. 229.

শিবানন্দের একটি পদেও শ্রীচৈতন্যের এই রূপ অঙ্কিত হয়েছে,—

গোবিন্দের অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন গুণ শোনে মগন হইয়া॥
রাধা রাধা বলে পঁহু পড়ে মুরছিয়া।
শিবানন্দ কান্দে পহুঁর ভাব না বুঝিয়া॥

নরহরি সরকারের একটি পদে রাধাভাবে ভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গের ভাববিহ্বল রূপটিকে প্রত্যক্ষ করা যায়—

হেম দরপণি গৌরাঙ্গ-লাবণি
ধূলায় ধূসর কাঁতি।
অশন বসন তেজিয়া রোদন
ব্রজবিলাসিনী ভাঁতি॥
হরি হরি বলি প্রাণনাথ করি
ধরণী ধরিয়া উঠে।
কোথা না যাইব কাহারে কহিব
পরাণ ফাটিয়া উঠে॥

মুরারি গুপ্ত তাঁর একটি পদে রাধাভাবে আকুল গৌরাঙ্গমূর্তি এইভাবে চিত্রিত করেছেন—

খেণে হাসে খেণে কান্দে বাহ্য নাহি জানে।
রাধার ভাবে আকুল প্রাণ গোকুল পড়ে মনে॥
অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি।
কত কোটি চাঁদ কান্দে হেরি মুখখানি॥

চৈতন্য-সমসাময়িক পরমানন্দ গুপ্তেরও এরূপ ভাবের পদ পাওয়া যায়। [ক্রমশঃ]

রোমের মনস্বী সম্রাট্ মার্কাস অরেলিয়াস্

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্লেটো তাঁহার 'রিপাবলিক' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন—"যতদিন না নৃপতিগণ দার্শনিক হইবেন, রাজপুত্রেরা দার্শনিক তত্ত্বসমূহ ও উহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি উপলব্ধি করিতে পারিবেন, রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভার সহিত আত্মিক জ্ঞানের মিলন ঘটিবে, ততদিন কোন নগর হইতে অমঙ্গল সম্পূর্ণ দূরীভূত হইবে না, মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে না।" তিনি আরও বলিয়াছেন, যে-রাষ্ট্রের শাসনকর্তারা শাসনে একান্ত অনিচ্ছুক, সেই রাষ্ট্রই শান্তিপূর্ণভাবে সুশাসিত হয় এবং যে-রাষ্ট্রের শাসকেরা অতীব আগ্রহশীল, সেই রাজ্যের শাসনকার্যই নিকৃষ্ট হইয়া থাকে।"

এই সুচিন্তিত অভিমত বাস্তব জগতে কার্যকরী হইতে পারে কি না সে বিষয়ে প্লেটোর নিজেরই মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। পুরাণে এইরূপ কাহিনী কিছু কিছু শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা যায় এই অমৃতবাণী অন্ততঃ একবার কার্যে পরিণত হইয়াছিল। রোমক সম্রাট্ মার্কাস অরেলিয়াসের মধ্যে এই দুইটি বিষম গুণের সমাবেশ দেখা গিয়াছিল। তিনি একাধারে দার্শনিক ও নরপতি ছিলেন। রাজপ্রাসাদের কান্তি, দীপ্তি ও প্রমোদবিলাস অপেক্ষা নৈষ্ঠিক ছাত্রের ন্যায় অধ্যয়ন ও নির্জন বাস ভাল বাসিতেন। সৈনিক হিসাবেও তিনি যুদ্ধজয়ের গৌরব অপেক্ষা শান্তিলাভের কৌশলগুলিই বেশী পছন্দ করিতেন। তাঁহার জীবনকথার যতটুকু জানা যায়, আমরা এখানে তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

মার্কাস অরেলিয়াসের পিতা অ্যানিয়াস ভেরাস্ এবং মাতা ডোমিসিয়া ক্যালভিলা। রোমান সম্রাট্ এন্টোনিয়াস পায়াস্ অ্যানিয়াস ভেরাসের ভগিনীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের কোন সন্তানসন্ততি জন্মগ্রহণ না করায় তিনি শ্যালকপুত্র মার্কাস অরেলিয়াসকে দত্তক লইয়া পুত্ররূপে প্রতিপালন করেন।

মার্কাস অরেলিয়াস্ বিশেষ যত্নে ও আদরে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক সুপণ্ডিত এম্ কর্ণেলিয়াস ফ্রণ্টো ছিলেন তাঁহার গৃহশিক্ষক। তৎকালীন শিক্ষানীতি অনুসারে তাঁহাকে কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র রীতিমত শিখিতে হইয়াছিল; কিন্তু দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেই তিনি অধিক ভালবাসিতেন। এগার বৎসর বয়সেই তিনি দার্শনিকদিগের ন্যায় সাদাসিধা পোশাক পরিতে এবং সরল জীবন যাপন করিতে অভ্যাস করেন। বৈরাগ্যের প্রতি তাঁহার সহজ অনুরক্তি থাকায় তিনি তদানীন্তন স্টোয়িক সম্প্রদায়ের প্রতি আকৃষ্ট হন; তীব্র বৈরাগ্য এবং সাম্প্রদায়িক কঠোর শৃঙ্খলার বশবর্তী হইয়া পার্থিব সকল সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ধর্মাচরণেই ইঁহারা আত্মনিয়োগ করিতেন। একজন ভাবী সম্রাটের পক্ষে এইরূপ জীবনযাত্রার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া বিশেষ বিস্ময়ের বস্তু।

স্টোয়িকেরা যদিও নিজেদের সমগ্র পৃথিবীর নাগরিক বলিয়া পরিচয় দিতেন, এবং স্বদেশ-

প্রীতি অপেক্ষা মানবপ্রেমেরই অধিক জয়গান করিতেন, তথাপি বাস্তব রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহাদের শিক্ষাধারার বিশেষ কোন প্রভাব দেখা যাইত না। কারণ তাঁহাদের ব্যবহারিক জীবনের সহিত রাজনীতির কোন সম্পর্কই ছিল না। অথচ তাঁহারা বলিতেন যে, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিরই রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা উচিত। মার্কাস অরেলিয়াসের সময় রোমান সাম্রাজ্য ছিল পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ সাম্রাজ্য; সেই সাম্রাজ্যের যিনি একচ্ছত্র ভাবী সম্রাট্, তাঁহার উপযুক্ত শিক্ষা স্টোয়িক দার্শনিকেরা কিভাবে দিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আরও আশ্চর্য ব্যাপার—সেই শিক্ষার সম্পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করিয়া মার্কাস অরেলিয়াস আজীবন কিভাবে চলিয়াছিলেন

জুলিয়াস সীজার ও আগস্টাসের রাজত্বকালেই রোমান সাম্রাজ্য বেশী বিস্তার লাভ করে। আগস্টাসের মৃত্যুর পর দেখা যায়, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর হইতে পূর্বে আরমেনিয়ান পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত উহা বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণে আফ্রিকার মরুভূমি এবং উত্তরে ইংলিশ চ্যানেল, রাইন ও ডানিউব নদী, কৃষ্ণসাগর ও ককেসাস পর্বতই উহার প্রসারে বাধা ঘটায়। আগস্টাসের সেনাপতিগণ যখন রাইন নদীর মোহনার দিকে রাজ্যবিস্তার করিতে গিয়া অকৃতকার্য হন, তখন তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়া যান—তাঁহাদের সাম্রাজ্য রক্ষা করার চেষ্টাই করা উচিত, উহার বিস্তারের চেষ্টা আর না করাই ভাল। সুতরাং ১৪ হইতে ১৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমানেরা মাত্র দুইটি দেশ জয় করেন—একটি বৃটেন, অপরটি ওসিয়া। এই দেশ জয় করিয়া কিন্তু তাহাদের লাভ অপেক্ষা ক্ষতির পরিমাণই হইয়াছিল বেশী, এবং শেষ পর্যন্ত তাহাও আবার সাম্রাজ্যভুক্ত রাখা যায় নাই।

মার্কাস অরেলিয়াস স্বয়ং শান্তিকামী হইলেও শান্তিতে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। উত্তরে ড্যানিউব নদীর তীরে ও রাইন নদীর উৎপত্তিস্থানের দিকে যে-সকল দুর্ধর্ষ জার্মান জাতি বাস করিত, নৈসর্গিক বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা রোমরাজ্য আক্রমণ করিতে ছাড়িত না। পূর্বদিকস্থ ধৃষ্ট পার্থিয়ানেরাও সর্বদা নানা উপদ্রব করিত। দুইদিকের দুইরকম শত্রুর সহিত মার্কাস অরেলিয়াসকে সর্বদাই লড়িতে হইত। দুরাচার লুসিয়াস ভেরাসের সৈন্যদল সাময়িকভাবে পার্থিয়ানদিগকে দমন করিয়া রাখিলেও মার্কাসের শান্তি মিলে নাই। ড্যানিউব নদীর তীরে জার্মানদের বিরুদ্ধে তিনি নিজে সৈন্য পরিচালনা করিয়া বারংবার তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিলেও তাঁহার অদৃষ্টে সুখ ছিল না। তবে তাঁহার মনকে এরূপভাবে গঠিত করিয়াছিলেন যে, তুমুল যুদ্ধের মধ্যেও তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইত না। জয়লাভেও তিনি উল্লসিত হইতেন না। সুখ দুঃখ, জয় পরাজয় তাঁহার নিকট সমান হইয়া গিয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরেই প্রাচ্যদেশ হইতে মহামারী আসিয়া ইতালি বিধ্বস্ত করিয়াছিল। এই মহামারীতে লুসিয়াস ভেরাসের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার মৃত্যুতে রোমরাজ্য যেন দুষ্টগ্রহের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করে। সম্রাট্ এণ্টোনিয়াসের অভিলাসানুসারে রাজ্যশাসনব্যাপারে লুসিয়াসের সম্পর্ক ঘটে, এবং সেই সম্পর্কসূত্রে লুসিয়াস রাজ্যমধ্যে নানাবিধ অশান্তির সৃষ্টি করিত। শাসনকার্যে মার্কাসকে অকপটে সাহায্য করিলেও অসুবিধা অনেক

ক্ষের করাল ছায়াও রোমরাজ্যে অনেক বার পড়িয়াছিল। মার্কাস অরেলিয়াসের সংগঠনশীলতা ও বদান্যতার ফলে জনসাধারণ মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পায়। কিন্তু ইহার জন্যও তাঁহাকে অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এভিডিয়াস কেসিয়াস নামে মার্কাসের একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন। সিরিয়ায় তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সমগ্র রোমরাজ্য করায়ত্ত করিতে চেষ্টা করেন। এভিডিয়াস ভাবিয়াছিলেন বৈরাগ্যবান দার্শনিক সদাশয় সম্রাটকে বিপন্ন করা বিশেষ কঠিন হইবে না, বরং সহজেই তাহা সাধন করা যাইবে। মার্কাস অরেলিয়াস কিন্তু কঠোর হস্তে সে বিদ্রোহ দমন করেন। বিদ্রোহী নেতা নিজের কর্মচারীদিগের হস্তেই নিহত হন। তখন মার্কাস অরেলিয়াস দুঃখ করিয়া বলেন—"ক্ষমা করার আত্মপ্রসাদ হইতে আমি বঞ্চিত হইলাম।" মার্কাসের মানসিক গঠন এই উক্তিতে স্পষ্ট প্রতিফলিত। ইহার পরে সেই বিদ্রোহসংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্রও তিনি নষ্ট করিয়া ফেলেন, পাছে অন্য কেহ এই বিদ্রোহে জড়িত প্রমাণিত হইয়া শাস্তি পায়। মার্কাসের জীবনের সকল কাজেই এইরূপ উদার দার্শনিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

মার্কাস অরেলিয়াসের ক্ষমা ও উদারতার অনেক কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে খৃষ্টানদিগের প্রতি অত্যাচারের কথাও শুনা যায়। অত্যাচারিত খৃষ্টানদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন জাস্টিন মার্টার ও পলিকার্প। লয়েনস্ ও লিয়েনের গির্জাসমূহের অনেকেই নির্যাতিত হইয়াছিলেন। ধর্মবিদ্বেষ এই নির্যাতনের কারণ নহে, কারণ রাজনৈতিক। মার্কাস অরেলিয়াস খৃষ্টানধর্মের কিছুই জানিতেন না, জানিবার চেষ্টাও কোন দিন করেন নাই। কিন্তু খৃষ্টানেরা যখন দেখিলেন রোমের সম্রাটেরাও দেবতা বলিয়া পূজিত হন, তখন তাঁহারা রোমে প্রচলিত এই ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। যতগুলি ধর্মমত তখন রোমে প্রচলিত ছিল, সেগুলির মধ্যে 'এপিকিউরিয়নরাই' রোমের প্রাচীন ধর্মমত আত্মসাৎ করিয়া লইয়া উহার দেবতা বা বীরদিগের নাম প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়া বাহ্যরূপের সহিত আন্তর আলোকের সামঞ্জস্য ঘটাইয়াছিল। খৃষ্টানেরা কিন্তু সেরূপ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা রোমক দেবতাদিগের প্রতি শুধু অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, দেবীমূর্তি ভাঙ্গিয়া দিতেন, এবং ভক্তদিগের সম্মুখেই এইসকল দেবমূর্তির অবমাননা করিতেন। শুধু তাহাই নহে, স্থানে অস্থানে কারণে অকারণে রোমবাসীদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া গালি দিতেন। এইসকল কারণে রোমানরাও তাঁহাদিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত। আবার যখন জানা যাইত যে, খৃষ্টানেরা গোপনে কোথাও কিছু পরামর্শ করিতেছে তখন সেই সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইয়া উঠিত। খৃষ্টানেরা প্রকাশ্যে যে-সকল অপরাধ করিত তাহা রোমবাসীরা জানিতে পারিত, অধিকন্তু তাহারা কল্পনাও করিয়া লইত অনেক কিছু। এইসকল কারণেই বোধ হয় খৃষ্টানদিগের প্রতি সকল অত্যাচারই আইনানুগ প্রমাণিত হইত এবং মার্কাস অরেলিয়াস এইসকল ক্ষেত্রে ঔদার্য দেখাইতে পারিতেন না।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মার্কাস অরেলিয়াসকে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। ১৭৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশে আবার নূতন করিয়া যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধযাত্রার প্রাক্‌কালে মার্কাস অরেলিয়াসের বন্ধুবর্গের

মনে এই আশঙ্কার উদয় হইল যে, তাঁহাদের সহিত মার্কাসের বুঝি আর দেখা হইবে না। তাঁহারা অনুরোধ করিলেন, বিদায়-বেলায় মার্কাস যেন তাঁহাদের কিছু উপদেশ দিয়া যান। আশ্চর্যের বিষয় যুদ্ধের প্রস্তুতির মধ্যেই মার্কাস অরেলিয়াস তিন দিন ধরিয়া তাঁহাদিগের সহিত গভীর দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করিলেন। তাহার পর তিনি প্রধান সেনাপতির বেশেই বিদায় লইলেন। যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু রোমে আর ফিরিয়া আসেন নাই। ১৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ প্যানোলিয়া প্রদেশে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র রোমসাম্রাজ্য যেরূপ গভীরভাবে শোকাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, অন্য কোন সম্রাটের মৃত্যুতে অপর কোন দেশেই সেরূপ কখনও হয় নাই।

যে দর্শনতত্ত্ব আরত্ত করিয়া মার্কাস অরেলিয়াস নিজের জীবনকে অমৃতময় করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই মতবাদের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা এখানে বোধকরি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

খৃষ্টপূর্ব ২৯০ অব্দের সন্নিকটবর্তী কোন সময়ে মহামতি জিনো (Zeno) স্টোয়িক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময় সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল প্রমুখ গ্রীক দার্শনিকদিগের প্রবর্তিত আদর্শবাদ কালপ্রবাহে ক্রমশঃ জড়-বাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। যাঁহারা তখন নূতন কোন মতবাদের প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সক্রেটিসের আবির্ভাবের পূর্বে যে-সকল তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া সেই যুগের জড়বিজ্ঞানীরা বিশ্বরহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সেই-সকল তত্ত্বের মধ্য হইতেই একটি তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া তাহার উপরই নিজেদের মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেন। অধ্যাত্মতত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ আর জীবন গঠন করিতে চাহিল না, তাই তখনকার দর্শনশাস্ত্র মানুষকে শিক্ষা দিত ব্যবহারিক নীতিশাস্ত্র, আচার-অনুষ্ঠান-প্রণালী ও সামাজিক আদব-কায়দা। তদানীন্তন দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি জড়বিজ্ঞানের উপরই নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করিয়া মানুষকে শিক্ষা দিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহারা স্বয়ং কোনরূপ গবেষণা না করিয়া পূর্বসূরীদিগের গৃহীত নীতিই অবলম্বন করিলেন। এই যুদ্ধে রোমে দুইটি প্রধান দার্শনিক সম্প্রদায় দেখা দিল—'স্টোয়িক' ও 'এপিকিওরিয়ান।' এপিকিওরিয়ানেরা ডিমক্রিটাসের পরমাণুবাদের সাহায্যে বিশ্বরহস্য বুঝাইতে চেষ্টা করিল আর স্টোয়িকেরা হেরাক্লিটাসের নানারূপ-গ্রাহী শাশ্বত অগ্নিপ্রবাহকেই সৃষ্টির মূল ধরিয়া লইল।

স্টোয়িকদিগের মতে স্বর্গ ও মর্ত্য সৃষ্টির পূর্বে অগ্নিময় ব্যোমেরই (fiery ether) একমাত্র অস্তিত্ব ছিল। এই ব্যোমই পরিবর্তিত আকারে অন্যান্য মূল উপাদানে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা অগ্নির আদি প্রকৃতি ত্যাগ করিতে পারে নাই। অগ্নিময় ব্যোম প্রথমে বাষ্পপিণ্ড, পরে জলীয় তরল পদার্থে পরিণত হয়। ইহা হইতেই ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ (solid earth, water, destructive fire and atmospheric air) উৎপন্ন হয়। তবে এই তেজ পূর্বকথিত চিরন্তন অগ্নিময় ব্যোম হইতে স্বতন্ত্র। তেজ ও মরুৎ সক্রিয় উপাদান, ক্ষিতি ও অপ্ নিষ্ক্রিয়। পৃথিবী হইতেই সৃষ্টি আরম্ভ হয়। পৃথিবী শুষ্ক ও ভারী হওয়ায় উহা বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে। উহার চতুষ্পার্শ্বে জল সংগৃহীত হইতে থাকে। ইহাদের উপরদিকে

বায়ুমণ্ডল। অগ্নিময় ব্যোম সর্বদাই স্থির উপাদানচতুষ্টয়ের চারিদিকে ঘুরিতেছে। নক্ষত্রগুলি আগ্নেয় পদার্থ ও ব্যোমে সংবদ্ধ। পৃথিবী হইতে যে বাষ্পরাশি উদ্গত হইতেছে, নক্ষত্রগুলি তাহার দ্বারা পুষ্টিলাভ করে। কিন্তু উহারা জীবন্ত, কারণ উহারা প্রাণবান অগ্নি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে; উহারা নিকৃষ্ট হইলেও উহাদিগকে পরিদৃশ্যমান দেবতা বলা চলে। মার্কাস অরেলিয়াস বলেন,—সূর্য এবং আকাশস্থিত অন্যান্য দেবতাদিগের বিভিন্ন কর্ম নির্দিষ্ট আছে। সেই সকল কর্ম তাহারা নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকে।

স্টোয়িকেরা বলেন, সৃষ্টির মধ্যে কোন খুঁত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং স্রষ্টা যে একজন বিশেষ বুদ্ধিমান শিল্পী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জগতের প্রতি ক্ষেত্রে বিচার-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, সজাগ দৃষ্টির আভাস মেলে, ব্যক্তিগত প্রভাব দৃষ্ট হয়। তবুও স্টোয়িকেরা ব্যক্তিগত ঈশ্বরে (Personal God) বিশ্বাসী নন। অগ্নিময় ব্যোমই তাঁহাদের ঈশ্বর। ইহা সর্বব্যাপী, এবং সকল সৃষ্ট পদার্থের ধারক ও পোষক। ইহাই বিশ্বের আত্মা, সর্বময় দেবতা। ইহাও একপ্রকার একেশ্বরবাদ। মার্কাস অরেলিয়াস এইরূপ একেশ্বরবাদীই ছিলেন এবং ঈশ্বরের সর্বময়ত্ব ও সর্বশক্তিমত্তায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। স্টোয়িকেরা বিশ্বাস করিতেন—সকল জিনিসের মূলে আছে আকারহীন বস্তু (formless matter) এবং নিরাকার প্রাণবান ব্যোম। এই বস্তু বা 'ম্যাটার' ইহাদের মতে চিরস্থায়ী, কারণ উহার অন্তর্গত অগ্নির কোনদিনই বিনাশ নাই। কিন্তু সকল জিনিসই ক্রমশঃ দগ্ধীভূত হইতেছে, এবং একটি নির্দিষ্ট কালের পরে জগদ্‌ব্যাপী দাহনকার্য আরম্ভ হইবে, তখন সকল সৃষ্ট পদার্থই দেবতার মধ্যে লীন হইয়া যাইবে। আবার নূতন যুগ আসিবে, আবার নূতন করিয়া জগৎ সৃষ্ট হইবে। সেই জগতে চিরপুরাতনেরই আবির্ভাব ঘটিবে। যেমন আবার একজন সক্রেটিস আসিবেন, আর একজন জ্যান্‌থিপিকে তাঁহার বিবাহ করিতে হইবে, তাঁহার হস্তে সক্রেটিসকে নিপীড়িতও হইতে হইবে, অবশেষে এপিটাস ও মিলিটাসের দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া সেই সক্রেটিস অপূর্ব গৌরবের সহিত আত্ম-সমর্পণ করিবেন, এবং বিলাপরত শিষ্যদিগের সম্মুখে সেই জ্ঞানতপস্বী বিষপানে প্রাণত্যাগও করিবেন।

স্টোয়িকেরা পরলোকে বিশ্বাস করিতেন কি না, তাহা ঠিক বলা যায় না, কারণ এপি-কিউরিয়ানদিগের মত তাঁহারা ইহা তারস্বরে অস্বীকার করিতেন না। তাঁহাদের ধারণা ছিল প্রলয়ই কেবল মৃত্যুভয় দূর করিতে পারে। জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত এক সময় মিলিত হইবে ইহা সুনিশ্চিত, কিন্তু কবে কখন হইবে, প্রলয়কালে বা অন্য সময়, সে-বিষয়ে স্টোয়িক-দের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল। যে-দেবতার (Deity) নিকট হইতে আত্মার (Soul) উৎপত্তি, সে দেবতাতেই আত্মা লীন হইয়া যাইবে, একথা স্টোয়িকদিগের সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করিতেন। দেবতার সহিত মানুষের এই সম্পর্ক স্টোয়িক ধর্মের মূলকথা। মানুষের প্রকৃত কল্যাণ দেবতার সহিত জড়িত। কিন্তু তাঁহাদের মতে ঈশ্বর এবং যুক্তি বা বুদ্ধি সমানার্থক। যুক্তিপূর্ণ জীবনই আত্মার আশ্রয়। আবার এইরূপ জীবন ধর্মসাধনসাপেক্ষ। সুতরাং স্টোয়িকদের মতে যুক্তিপূর্ণ জীবন যাপনেই মানুষের চরম মঙ্গল এবং ধর্মই পরম সুখ।

এইরূপে স্টোয়িকেরা তাঁহাদের প্রধান তত্ত্বে

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধর্মই একমাত্র আশ্রয়স্থল, এবং উহাই কেবল প্রশংসার বিষয়। ধর্মের মধ্যেই সব নিহিত, কারণ উহা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। সৎ লোকের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পরিবেশের কোন সাহায্যেরই প্রয়োজন হয় না। রোগ বা দারিদ্র্য তাঁহার কোন ক্ষতিই করিতে পারে না। মানুষের মধ্যে তিনি একজন দেবতা। তথাকথিত মঙ্গলকার্যের মধ্যে যদি কোন আধ্যাত্ম কল্যাণ না থাকে, তবে তাহা মঙ্গলও নয়, অমঙ্গলও নয়, মাঝামাঝি কোন একটি জিনিস। ধর্মের এরূপ নিরপেক্ষ রূপ ইওরোপের কোন সম্প্রদায়কেই ইতঃপূর্বে দিতে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এরিস্টটল বলিতেন, সৎ-চিন্তাপূর্ণ ধর্মজীবন যাপন করিতে মানুষের সুবিধাজনক পরিবেশের প্রয়োজন হইতে পারে। স্টোয়িকেরা কিন্তু এরূপ আপস মনোভাবের প্রশ্রয় দিতেন না। কেবলমাত্র ধর্মই তাঁহাদের কাম্য ছিল। কোন ধার্মিক ব্যক্তি ক্রীতদাস হইতে পারে, রোগগ্রস্ত হইতে পারে, দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট হইতে পারে, সকল প্রিয়বস্তু হইতে সে বঞ্চিত হইতে পারে, তবুও সে সম্পূর্ণ সুখী। যে ধার্মিক নয় সে পাপী। মধ্যপন্থা কিছুই নাই। স্টোয়িকদের এই মতবাদ বাস্তব বলিয়া মনে করা যায় না, কারণ পৃথিবীর সকল লোককে কেবল পাপী ও পুণ্যবান এই দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সৎ ও অসৎ দুই প্রকার বৃত্তিই দেখা যায়। মানুষ সাধুতাই কামনা করে এবং সে যখন কোন অন্যায় কার্য করিয়া বসে, তখন সে উহা চারিত্রিক দুর্বলতার জন্যই করে, সাধুতার প্রতি বিরাগবশতঃ করে না। স্টোয়িকেরা যে নিছক ধর্মের কথাই বলিয়া থাকেন এবং বাহ্য জগৎকে অগ্রাহ্য করেন, তাহার ফলে তাঁহারা বলিতে বাধ্য হন পৃথিবীতে জ্ঞানী ব্যক্তির সংখ্যা নগণ্য; বোকার সংখ্যাই বেশী। জ্ঞানী ব্যক্তি-দিগের নাম করিতে হইলে তাঁহারা মাত্র কয়েক জনের নাম করেন—হারকিউলিস্, অডিসিউস্, সক্রেটিস্, এনিউথিনিস্, ডায়োজিনিস্ এবং কনিষ্ঠ কেটো।

স্টোয়িসিজমের প্রাথমিক অবস্থায় যে-সকল অযৌক্তিক তথ্য ও নীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল, সেগুলি প্রায়ই নিন্দার্হ এবং আধুনিক জগতে অচল। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহাদের মধ্যে সহজবুদ্ধির স্ফুরণ হওয়ায়, অনেক সংশোধন করিয়া লইয়াছিলেন আবার অনেক কিছু স্বীকার করিয়াও লইয়াছিলেন। জ্ঞানী লোকের অবাস্তব সংজ্ঞা তাঁহারা সিনিসিজম (cynicism) হইতে আহরণ করিয়াছিলেন। ডাইয়োজিনিস যে একটি টবের (tub) মধ্যে বসিয়া থাকিয়া মহাবীর আলেকজান্দারকে বলিয়াছিলেন—"একটু সরিয়া দাঁড়াও, রৌদ্র আটকাইবে না। তোমার নিকট হইতে আমি আর কিছুই চাহি না।" এ উক্তি বিস্ময়ও উদ্রেক করিতে পারে, কিন্তু সমগ্র সমাজ যদি ডাইয়োজিনিসের ন্যায় সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া টবের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোনও ধারই না ধারে, তাহা হইলে সভ্য জগতের কাজকর্ম চলে কিরূপে? সৌভাগ্যের বিষয়, খৃষ্টীয় জগৎ যেরূপ সেন্ট সাইমিয়ন স্টাইলাইটিসের (St. Simeon Stylites) উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া কয়েকজন সাধু সজ্জনের পবিত্র জীবনযাত্রাপ্রণালী অনুসরণ করিয়া বাঁচিয়া গিয়াছিল, স্টোয়িকদিগেরও সেইরূপ অত্যুচ্চ আদর্শ ত্যাগ করিয়া বাস্তব জগতে নামিয়া আসিতে হইয়াছিল।

প্রথমেই কেবল সৎ (absolute good) ও কেবল অসৎ (absolute evil)—এই মত-বাদের সংস্কার করিতে হইয়াছিল। ধর্মই

একমাত্র প্রকৃত সৎ বস্তু, পাপই একমাত্র অসৎ-বস্তু—এই ধারণা থাকা সত্ত্বেও স্টোয়িকেরা স্বীকার করিয়াছিলেন যে, এই দুইটি ব্যতীত পৃথিবীতে আরও কয়েকটি বস্তু আছে যাহাকে শ্রেয়ঃ মনে করিয়া গ্রহণ করা যায়, যেমন সুন্দর স্বাস্থ্য, সুনাম এবং আরও কয়েকটি জিনিস যাহা তাঁহারা অপ্রয়োজনীয় বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আরও স্বীকার করিলেন যে, অপ্রাকৃত আদর্শ পুরুষ ব্যতীত আরও কিছু কিছু নিষ্পাপজীবন ও উচ্চাভিলাষী মানুষ সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তাহাদিগকে ভালোবাসাও চলে। এমন কতকগুলি জিনিস আছে শুধু সেইগুলিই ত্যাগ করা দরকার। পৃথিবীসুদ্ধ জিনিস ত্যাগ করার প্রয়োজন নাই। এইভাবে স্টোয়িকদের মতবাদ ক্রমে সহজ ও সরল হইয়া আসিল।

রোমকদিগের সংস্পর্শে আসিয়াই স্টোয়িকদের এইরূপ বাস্তব পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ হয়। রোমকেরা ছিল বিশেষ বাস্তববাদী। তাহারা বীর ও আইনজ্ঞের জাতি হইতে গ্রীক জাতির সংস্কৃতি নিজেদের প্রয়োজনমত করিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা করে নাই। কয়েকজন উদারচিত্ত রোমক দুই-এক বৎসর গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে থাকিয়া গ্রীক দর্শনও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অন্যেরা গ্রীসের প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগকে রোমে গিয়া তাঁহাদের মতবাদ প্রচার করিতে প্ররোচিত করেন। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে এইভাবে গ্রীসের সকল দার্শনিক মতবাদ এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি রোমে উপস্থিত হইল।

যে-সকল গ্রীক মতবাদ রোমে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে স্টোয়িক মতবাদই বেশীর ভাগ লোক গ্রহণ করে। প্রজাতন্ত্র বিনষ্ট হইয়া রোমে যখন রাজতন্ত্র প্রবেশ করিতে উদ্যত, এবং জনসাধারণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা লোপ পাইবার উপক্রম, তখন স্টোয়িকদিগের সরলতা, সহজ জীবনযাপন-প্রণালী, সংসারে বৈরাগ্য এবং সকল প্রকার বিপদের মধ্যে ধীর স্থির থাকিবার শিক্ষা মানুষের মন আকৃষ্ট করিল। যখন কোন প্রকারে আর বিপদের সম্মুখে টিকিয়া থাকা যায় না, দুঃখ সহ্য করিতে করিতে ধৈর্যের শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়, যখন আত্মহত্যাই আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়, তখন আত্মহত্যা শুধু শাস্ত্রবিহিত নয়, উহা প্রশংসার্হ, স্টোয়িকদিগের এই অভিমত রোমকদিগের প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করিল। তাহারা ভাবিল, যে-অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবে না আত্মহত্যা করিয়া সে-অত্যাচার হইতে তাহারা নিষ্কৃতি লাভ করিবে। প্রজাতন্ত্র সমূলে লুপ্ত হইলে কেটো আত্মহত্যা করিল বটে, ফিলিপ্পি (Philippi) যুদ্ধের পর ব্রুটাস ও কোসিয়াসকে কিন্তু বাঁচিয়া থাকার প্রেরণা দিল এই স্টোয়িক শিক্ষাই।

রোম সাম্রাজ্যের প্রথমাবস্থায় যখন উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্নীতি চরম সীমায় উপস্থিত হয় তখন দার্শনিকদিগের প্রতি, বিশেষতঃ স্টোয়িকদিগের প্রতি গভীর ঘৃণা প্রকাশিত হইতে থাকে। সর্বসমক্ষে এইসকল পাপাচারণের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্টোয়িকেরা বিশেষ অপ্রিয় হইয়া উঠেন। অনেক স্থলে তাঁহারা দেশ হইতে নির্বাসিতও হন। এই দুঃসময়ে খঞ্জ ক্রীতদাস স্টোয়িক এপিক্টেটাস নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করেন—"শ্রীভগবানকে সাক্ষ্য রাখিয়া বলিতে পারি—আমার সহিত তোমরা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পার, কিন্তু মনে রাখিও তোমাদের মন ও আমার মন একই উপাদানে গঠিত ; আমি তোমাদেরই একজন ;

তোমাদের সন্তুষ্ট করিতে আমি সকল কর্মই করিতে পারি ; যেখানে ইচ্ছা আমাকে লইয়া যাও, যেভাবে ইচ্ছা আমাকে সাজাও, তোমাদের ইচ্ছা হইলে আমি বিচারকের কাজও করিতে পারি, সাধারণ লোকের মত জীবনযাপনও করিতে পারি, নির্বাসিত হইয়া অপর দেশেও যাইতে পারি বা এদেশেও থাকিতে পারি, দরিদ্রও হইতে পারি, আবার ধনীও হইতে পারি, সকল অবস্থাতেই কিন্তু আমি নির্লিপ্ত নির্বিকার থাকিয়া মানবতার গুণ গাহিয়া যাইব।" ইহা কেবল তাঁহার মুখের কথা ছিল না। তিনি নিজ জীবনে ইহা আচরণ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছিলেন। স্টোয়িকেরা এইভাবে ধর্মাচরণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। দার্শনিক সম্রাট্ মার্কাস অরেলিয়াস এইসকল চিন্তাধারাই আরও সুস্পষ্ট ও সুগম করিয়া তাঁহার 'মেডিটেশনে' (Meditation) লিখিয়া গিয়াছেন। যাহারা অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী নহে, মার্কাসের 'মেডিটেশন' তাহাদিগের নিকট বেদবাক্যের ন্যায় শাশ্বত সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারিবে।

এই চিন্তাসূত্রগুলি এককালে এবং একত্র লিখিত হয় নাই। সম্ভবতঃ ইহা প্রকাশ করিবারও কোন দিন তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। একখানি সাধারণ খাতায় সম্রাট্ তাঁহার চিন্তাসূত্রগুলি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে লিখিয়া রাখিতেন। এইরূপে তিনি নিজের মনের সহিত পরিচিত হইয়া উহাকে ধীর ও শান্ত রাখিতে প্রয়াস পাইতেন। মার্কাস বৈরাগ্যবান হইলেও স্নেহ-ভালবাসার দাবি তিনি মানিয়া চলিতেন। পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব এবং শিক্ষকদিগের নিকট হইতে যেসকল সৎ শিক্ষা এবং সৎ আদর্শ তিনি জীবনে পাইয়াছিলেন, সেগুলি 'মেডিটেশনের' প্রথম ভাগে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহার জন্য তিনি অকুণ্ঠহৃদয়ে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। ঈদৃশ স্নেহপ্রবণতা হইতেই স্টোয়িক মতবাদে বিশ্বপ্রেম ও মানবভ্রাতৃত্বের উদ্ভব হইয়াছে। মার্কাস অরেলিয়াস প্রকৃতই মানবপ্রেমিক ছিলেন এবং নিজেকে মানবসমাজের একজন বলিয়াই মনে করিতেন।

মার্কাস অরেলিয়াসের নিম্নলিখিত চিন্তা-সূত্রগুলি তাঁহার মানসিক গঠনের পরিচয় দেয় : "মনুষ্যসমাজ একই আইন মানিয়া চলিবে এবং সেই কারণেই তাহাদের সকলকেই… একই রাষ্ট্রের অনুগত হইতে হইবে।" ইহা হইতেই বুঝা যায় সমগ্র জগৎ যেন একটি 'কমনওয়েল্থ' বা 'প্রজাতন্ত্ররাজ্য' (মেডিটেশন-৪র্থ ভাগ, ৪র্থ সূত্র)। "সমাজ-গঠনের জন্যই মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে" (ঐ ৭ম ভাগ, ৫৫ সূত্র)। এই মানবভ্রাতৃত্বই জন-সাধারণের উপকার করিতে প্ররোচিত করে এবং ইহা ব্যতীত অন্য কিছুই আমাদের হিতকর বলিয়াই মনে হয় না।

"যে জিনিস সমগ্র মৌমাছির ঝাঁকের স্বার্থে না লাগে, তাহা একটিমাত্র মৌমাছির কোন স্বার্থেই লাগে না (ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ, ৫৪ সূত্র)।" ইহা আমাদের শত্রুদিগকে ক্ষমা করিতে এবং উহাদিগের প্রতি করুণা প্রকাশ করিতে শিক্ষা দেয়।

"সৎকার্যের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও অসৎ-কার্যের কদর্যতা আমি বুঝিতে শিখিয়াছি, আমি স্থির জানি যে-ব্যক্তি আমার বিরক্তির কারণ ঘটাইতেছে সেও আমার আত্মীয়, যদিও আমরা এক রক্তমাংসে গঠিত নহি, তবুও আমাদের মন সম্পর্কবদ্ধ, কারণ দেবতা হইতেই তাহাদের

[শেষাংশ ৬৩৯ পৃষ্ঠায়]

স্বামীজীর বাণী

ব্রহ্মচারী শক্তিপ্রসাদ

ভারত-ইতিহাসের এক সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে পরানুকরণমোহাচ্ছন্ন, আত্মবিস্মৃত, বিবদমান জাতির ত্রাণকর্তারূপে স্বামী বিবেকানন্দ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাব মধ্যাহ্নসূর্যের মত সমগ্র জগতে কিরণ বর্ষণ করিয়াছে, তাঁহার তপঃসম্ভূত অমিত তেজো-দীপ্তি, তাঁহার সাধনালব্ধ জ্ঞান, নির্ভীক আত্মোৎসর্গ ভারতের এক গৌরবময় ভবিষ্যতের সূচনা করিয়াছে এবং শুধু ভারতে কেন, বিশ্বমানবের কল্যাণে, বিশ্বশান্তিপ্রচেষ্টায় তাঁহার সেই মহান আদর্শ আজিও শাশ্বত ও অম্লান রহিয়া গিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বত্যাগী শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ গুরুকৃপায় এবং কঠোর সাধনা-বলে যে সত্য শিব ও সুন্দরকে হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিলেন, ভারতের আধ্যাত্মিকতার মূল সূত্রটিকে যেভাবে তিনি পুনঃ পুনঃ বিচারের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি গুরুর আদেশে বিশ্বমানবের হিতের জন্য অকুতোভয়ে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুধর্ম কি, তাহার উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও পরিণতি কোথায়, বৈদান্তিক দৃষ্টিতে তাহার যথাযথ ব্যাখ্যা তিনি জগৎসমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এই ভারতভূমি হইতেই দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবতরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া বারবার জগৎ প্লাবিত করিয়াছে। ধীর-প্রকৃতি হিন্দুর কাছে, হিন্দুধর্মের কাছে জগতের ঋণ অপরিসীম—এই যুক্তির সমর্থনে ভারতের অপূর্ব জীবনব্রত—"ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"—স্বামীজী জগতের নিকট দৃপ্ত কণ্ঠে প্রচার করেন।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়াছে। সাধনার দ্বারা ঐশ্বরিক শক্তিতে বলীয়ান হইয়া তাঁহারা ভ্রান্ত পথে চালিত মানবকে যে-সকল শাশ্বত সত্যবাণী শুনাইয়াছেন, তাহা তাঁহাদের তিরোধানের বহুযুগ পরেও একইভাবে মানবের কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। ঋষিমুখনিঃসৃত সেই-সকল বাণী যুগ যুগ ধরিয়া মানবসমাজের, রাষ্ট্রের, ধর্মের উন্নতির সহায়ক হইয়া রহিয়াছে এবং চিরকাল তাহা জগতের সুখ-শান্তি-প্রতিষ্ঠায় হিতকর হইবে সন্দেহ নাই।

ঈশ্বরোপলব্ধি ব্যতীত জগদ্গুরু হওয়া যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের অসীম কৃপায় ঈশ্বরদর্শনে সক্ষম হইয়াছিলেন। কঠোর সাধনা, দেশবিদেশের ধর্ম ও দর্শন অধ্যয়ন, ব্যাপক দেশভ্রমণের দ্বারা যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জীবনের প্রত্যেকটি শাখাই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং জগতের সর্বজাতির সর্বশ্রেণীর মানুষের সমস্যা তাঁহাকে আকুল করিয়াছে। দুঃস্থ জনগণের জন্য এই সর্বত্যাগীর চোখের জল পড়িয়াছে। নিরক্ষর নিরন্নের গগনভেদী আর্তরবে তাঁহার হৃদয় করুণায় বিগলিত হইয়াছে। কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিবার প্রয়াস হইতে আরম্ভ করিয়া দেশবাসীর শিক্ষা-দীক্ষা, চরিত্রগঠন, নৈতিক উন্নতি, সমাজসেবা

প্রভৃতি সমাজের সর্বশাখার উন্নতিবিধানের জন্য অতি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া তিনি পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন।

আবার, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি। দিব্যদৃষ্টি দ্বারা তিনি অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাই কেবল স্বদেশ ও বিশ্বের তৎকালীন সমস্যাই নয়, ভবিষ্যৎও তিনি ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং সম্ভাব্য সমস্যাসমূহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সেইগুলির সমাধানও দিয়া গিয়াছেন। তাই আজ বর্তমান বিশ্বসমস্যাসমূহের সমাধানের পথ তাঁহার অমর সর্বকালীন বাণীতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রনীতিতে, সমাজশিক্ষায়, ধর্মে, দেশহিতৈষণায় স্বামীজীর সুস্পষ্ট চিন্তাধারা এবং তাহার সুষ্ঠু রূপায়ণই সে সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে পারে। বিশ্বমৈত্রী ও শান্তির ক্ষেত্রে তাহা যুগান্তকারী পরিবর্তন আনিতে সমর্থ।

আজ বহুসমস্যাজর্জরিত আমাদের দেশ। সে সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য আমরা আজ যদি স্বামীজীর চিন্তাগুলির দিকে ফিরিয়া চাই, সেখানেই উহার জন্য প্রয়োজনীয় আলোক বিপুল পরিমাণে নিশ্চয়ই পাইব।

[৬৩৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

উৎপত্তি; আমি বুঝিয়াছি যে, কোন মানুষই আমার প্রকৃত ক্ষতি করিতে পারে না, কারণ কেহই আমার দ্বারা অসদ্ব্যবহার করাইতে পারে না, কিংবা আমার নিজের প্রকৃতি বা পরিবারের প্রতি ঘৃণা বা দ্বেষ হৃদয়ে পোষণ করিতে পারি না। পা ও হাত দুইটি, চোখের পাতা, এবং উপর ও নীচের পাটির দাঁত যেমন পরস্পরকে সাহায্য করে, আমরাও সেইরূপ পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছি। (ঐ ২য় ভাগের প্রথম সূত্র)।"

মার্কাস অরেলিয়াস সকল জিনিসের অনিত্যতা ও অর্থহীনতা বিষয়ে আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। তিনি তাঁহার 'মেডিটেশনে' বলিয়াছেন—"ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশ ব্রহ্মাণ্ডের একটি কোণ মাত্র, সমুদ্র জলবিন্দুমাত্র, এথস্ পর্বত বিশ্বের তুলনায় বালুকণামাত্র, বর্তমান মুহূর্ত অনন্তকালের নিকট একটি বিন্দুমাত্র। ইহারা সকলেই অতিক্ষুদ্র, পরিবর্তনশীল এবং নশ্বর।" (ঐ ৬ষ্ঠ ভাগ, ৩৬ সূত্র) (ক্রমশঃ)

সমালোচনা

Vivekananda : His Call to the Nation (সংকলন); প্রকাশক—অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহী ইণ্টালী রোড, কলিকাতা ১৪। দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১০২ + ১০ ; মূল্য ৪০ পয়সা।

বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে একটি বলিষ্ঠ, সুস্পষ্ট ও শ্রেয়স্কর জীবন-দর্শন আমাদের একান্ত প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দের উদার জীবন এবং অমৃতবাণী বিভিন্ন ভাবাদর্শের সংঘাত থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে সম্পূর্ণ সমর্থ। এই স্থির প্রত্যয়ের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রকাশক স্বামী বিবেকানন্দের বিপুল গ্রন্থরাজি থেকে স্বামীজীর বাণী চয়ন করে ৮টি অধ্যায়ে নিবদ্ধ করেছেন। ৮টি অধ্যায়ে আছে (১) শ্রদ্ধা ও বীর্য, (২) মনের শক্তি, (৩) মানুষ-ই তার নিজের ভাগ্যবিধাতা, ৪) শিক্ষা ও সমাজ, (৫) শিবজ্ঞানে জীবসেবা, (৬ ধর্ম ও নীতি, (৭) ভারতবর্ষ : আমাদের মাতৃভুমি, (৮) বিবিধ এতদতিরিক্ত বইটির প্রারম্ভে স্বামীজীর একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যানুগ জীবনী আছে। স্বামীজীর ইংরেজী রচনাবলীর যে-যে খণ্ড থেকে বাণীগুলি উদ্ধৃত, সেই-সেই খণ্ডের সংখ্যা ও পৃষ্ঠা দেওয়া আছে। ইহা অনুসন্ধিৎসু পাঠকের আগ্রহবৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি যুবসমাজের নিকট স্বামীজীর বাণী নিঃসন্দেহে সুলভ ও সুগম করবে। ছাপা ও প্রচ্ছদপট প্রকাশকের সুরুচির প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

পুস্তকটি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে; প্রথম সংস্করণ (পঁচিশ হাজার কপি) মাস তিনেকের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যায়।

—স্বামী বীতশোকানন্দ

কলিতীর্থ কামারপুকুর : শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য। প্রকাশক, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। পৃঃ ৩৬০ ; মূল্য দশ টাকা।

লেখকের ভাষা সাবলীল ও সুন্দর। ভক্ত পাঠক-পাঠিকাগণ এই পুস্তকপাঠে প্রভূত আনন্দ পাইবেন এবং তাঁহাদের শ্রদ্ধা দৃঢ়ীভূত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বইটি উপন্যাসের ধারায় লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী। একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের এই ভাবে লিখিত একটি বৃহৎ পুস্তক সুপরিচিত রহিয়াছে। আলোচ্য পুস্তকটি যে একজন ভক্ত কর্তৃক লিখিত, তাহার প্রমাণ প্রতি পৃষ্ঠাতেই পরিস্ফুট। সেজন্য আবেগ ও উচ্ছ্বাসের প্রকাশ হয়তো একটু বেশী হইয়াছে মনে হইল, যাহা মননশীল পাঠক নাও পছন্দ করিতে পারেন। বইখানির নাম 'কলিতীর্থ'-নামাঙ্কিত আর একটি বহুল-প্রচারিত বই-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

বইখানির বিষয়বস্তু কি, তাহা সম্যক বোঝা গেল না। যদি কামারপুকুর বিষয়বস্তু হয়, তাহা হইলে বইটির একতৃতীয়াংশ মাত্র কামারপুকুরে নিবদ্ধ, বাকী দুই তৃতীয়াংশ তো দক্ষিণেশ্বরের জীবন লইয়া। বিষয়বস্তু যদি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী হয়, তাহা হইলে তাহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তোতাপুরীর আবির্ভাবের ব্যাপারটি বলিয়া পুস্তক শেষ হইয়াছে; ইহা যে প্রথম ভাগ মাত্র, এরূপ কোন উল্লেখও দেখিলাম না। পুস্তকটির প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

—অধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণকর্ণামৃতম্—প্রণেতা: ওট্টুর উন্নিনম্পূতিরিপ্পাট্, Published by Ottur Unni Nambudiripad, 'Thulasivanam' Mayannur P. O. (via) Ottappalam, Kerala State. p. 57+6 ; price Rs. 1/25.

মূল সংস্কৃতে বিরচিত এবং দেবনাগরী লিপিতে মুদ্রিত 'শ্রীরামকৃষ্ণকর্ণামৃতম্' পুস্তক। ইহা পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। ১০টি সর্গে ২৮০টি সুললিত শ্লোকে পরিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি শ্লোক ছন্দে, ভাবে, ভাষায় অনবদ্য। গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্যের সহিত ভক্তির মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছে। নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধিনিমগ্ন চিত্র বর্ণিত:

সুখাসনস্থং মুকুলীকৃতাঞ্জলিং
　　নিমীলিতাক্ষং নিভৃতাসুবিক্রমম্।
সমাধিমগ্নং স্মিতশাংভিতাননং
　　গদাধরাখ্যং নিগমার্থমাশ্রয়ে॥

পুস্তকের নামটিরও সার্থকতা আছে লেখক বলিতেছেন:

'হে রামকৃষ্ণ! মধুরং তব সচ্চরিত্রং
ত্বৎপুণ্যনাম মধুরং, মধুরং ত্বদঙ্গম্।
সংভাষণং চ মধুরং, মধুরং চ গানং
তৎ কিং নু, যন্ন মধুরং ভবতি ত্বদীয়ম্॥' ১২

'কর্ণামৃত' পুস্তকখানি বাস্তবিক কর্ণের অমৃততুল্য, শ্রবণমঙ্গল, মধুবর্ষী। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার আশা করি।

ঈশোপনিষৎ: ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার কর্তৃক সম্পাদিত, ৩ নং অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা-৩। পৃষ্ঠা ৬৪; মূল্য ৫০ পয়সা।

অনাদি অপৌরুষেয় বেদের ব্রহ্মপ্রতিপাদক জ্ঞানপ্রধান অংশ উপনিষৎ নামে সুপ্রসিদ্ধ। উপনিষৎসমূহের মধ্যে প্রথমেই যে উপনিষৎখানির নাম উল্লেখ করা হয়, সেইটিই ঈশোপনিষৎ

আলোচ্য গ্রন্থখানি পকেটসাইজ। ইহাতে প্রথমে ঈশোপনিষদের মূল সংস্কৃত শ্লোক, তৎপরে প্রতি শ্লোকের বাংলা অর্থসহ অন্বয়, বাংলা অনুবাদ ও অনুধ্যান দেওয়া হইয়াছে। বিষয়বস্তু পরিস্ফুট করিবার জন্য 'অনুধ্যানে' মহাভারত, গীতা ও অন্যান্য উপনিষৎ হইতে উপযুক্ত উদ্ধৃতি স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভূমিকাটিও সুলিখিত। সর্বদা সঙ্গে রাখিবার উপযোগী ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি যোগ্য সমাদর লাভ করিয়া বহুল প্রচারিত হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা।

অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী: (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ) শ্রীঅমূলপদ চট্টোপাধ্যায়। ১০ এইচ গিরীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২৬০+৯৯; মূল্য ৪'২৫।

আলোচ্য গ্রন্থখানি জনপ্রিয়তালাভে সমর্থ হইয়াছে, তাহার প্রমাণ ইহার পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম সংস্করণের বিষয়বস্তু বর্তমান সংস্করণে স্থান পাইয়াছে, অধিকন্তু 'দেশ ও কাল', 'শক্তিতত্ত্ব', 'শব্দপ্রমাণ', 'বৃত্তিজ্ঞানের স্বরূপ ও উহার ফল' প্রভৃতি কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ দেওয়া হইয়াছে। এই সংস্করণটিও যোগ্য সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বৈষ্ণব-দর্পণ: শ্রীহরিপদ গোস্বামী, ৬ নং রাখালদাস মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১১২। মূল্যের উল্লেখ নাই।

'বৈষ্ণব-দর্পণ' পুস্তকখানিতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, হরিভক্তিবিলাস, গীতা, ভাগবত, ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের উপদেশাবলী ও ভক্তগণের বাণী সন্নিবেশিত হইয়াছে। দর্পণে যেমন জড় দেহের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তেমনি মানবের অপ্রাকৃত স্বরূপের কিভাবে উপলব্ধি হইতে পারে, সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া পুস্তকের নাম দেওয়া হইয়াছে 'বৈষ্ণব-দর্পণ'। পুস্তকখানি যে উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা আশা করি তাহা সফল হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে ভাবগম্ভীর পরিবেশে মহানন্দে মৃন্ময়ী প্রতিমায় জগজ্জননী শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজা যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আবহাওয়া ভাল থাকায় পূজার প্রত্যেক দিনই প্রচুর ভক্তসমাগম হইয়াছিল। মহাষ্টমীর দিন প্রায় ১৫,০০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

শাখাকেন্দ্রে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব

এই বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতে মৃন্ময়ী প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে: আসানসোল, করিমগঞ্জ, কাঁথি, গৌহাটী, জয়রামবাটী, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, ঢাকা, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বারাণসী (অদ্বৈত আশ্রম), বালিয়াটী, বোম্বাই, মালদহ, মেদিনীপুর, রহড়া, শিলং, শিলচর, শেলা (চেরাপুঞ্জী, খাসি হিল) ও শ্রীহট্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন

গত ২রা নভেম্বর বিকালে বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ৬০তম সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

বৈদিক মন্ত্রপাঠের পর সভার কার্য শুরু হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী পাঠ করেন মিশনের সহ-কর্মসচিব স্বামী ভূতেশানন্দ। সভার আনুষ্ঠানিক কাজ-গুলি সম্পন্ন হইবার পর স্বামী বন্দনানন্দ তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমেরিকার শ্রীরাম-কৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কেন্দ্রগুলির কার্য সম্বন্ধে ভাষণ দেন। তিনি বলেন যে, আমেরিকার কেন্দ্রগুলি ক্লাস, ব্যক্তিগত আলোচনা, প্রকাশন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর ভাব সুষ্ঠুভাবে প্রচার করিয়া চলিয়াছে। বহু ব্যক্তি এই কেন্দ্রগুলিতে আসিয়া নিয়মিতভাবে জপ-ধ্যানাদি করিয়া থাকেন। কোন কোন কেন্দ্রে শ্রীশ্রীকালীপূজা প্রভৃতি উৎসবে পাঁচ-ছয় শতাধিক জনসমাগম হয়। তাছাড়া বহু আমেরিকাবাসী ব্রহ্মচর্য- ও সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া মঠে বাস করেন। বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্যও কোন কোন কেন্দ্রে ব্যবস্থা রহিয়াছে।

সভাপতি স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে সকলকে শুভেচ্ছা জানাইয়া বলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর অধ্যাত্মভাবাদর্শই জগতে নূতন সভ্যতা গড়িয়া তুলিবে। এই ভাবধারাকে প্রবাহিত ও প্রসারিত করার কাজে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনকে বর্তমানে বহুবিধ বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইতেছে, ভবিষ্যতেও হইতে পারে; কিন্তু আমাদের সকলকেই দৃঢ়তার সহিত উহা অতিক্রম করিয়া চলিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে যে-সব সমালোচনা আজকাল হইয়া থাকে, আমাদের সকলকেই সেগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে এবং আমাদের যথার্থ ত্রুটি যদি কিছু থাকে তাহা সংশোধনে তৎপর হইতে হইবে। কিন্তু অনেকে রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে যথাযথ তথ্যাদি না জানার জন্য বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া থাকেন; সে ক্ষেত্রে মিশনের সভ্যগণ যেন এইজাতীয় সমালোচক-দের নিকট সঠিক তথ্যাদি পরিবেশনের জন্য সচেষ্ট হন। যেমন, তিনি বলেন, রামকৃষ্ণ

মিশনের সেবাকার্য সম্বন্ধে বহু লোকের সঠিক ধারণা নাই; খবরের কাগজে এসব সংবাদ বেশী প্রচারিত হয় না বলিয়া অনেকের ধারণা রামকৃষ্ণ মিশন এসব কাজ আর করে না। অথচ, আলোচ্য বর্ষের রিপোর্টেই দেখিবেন এ বাবদ মিশন ২২ লক্ষাধিক টাকার কাজ করিয়াছে; ইহা ছাড়া গুজরাট ও সুরাটে প্রায় ৪০ লক্ষাধিক টাকার কাজ চলিতেছে।

আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া তিনি ভাষণ শেষ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৬৮-৬৯ সালের কার্যবিবরণী

১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দ আগের বছরের মতোই বহুবিধ চাপের মধ্য দিয়াই কাটিয়াছে। সবচেয়ে বেশী অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে আর্থিক অবস্থার দিক দিয়া. যাহা প্রধানত: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধার উন্নতির জন্য চাপ হইতে এবং অবশ্যপ্রয়োজনীয়-দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমানতা হইতে উদ্ভূত। সরকারের কয়েকটি কার্য-ব্যবস্থার ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির উপর, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলির উপর কর্মপরিচালনার অনিশ্চয়তার অতিরিক্ত ভারও চাপিয়াছে। এখনো সেগুলি সমস্যামুক্ত হয় নাই, যদিও অদূর ভবিষ্যতে সেগুলির সন্তোষজনক সমাধানের আশাদীপ এখনো সমুজ্জ্বল; অবশ্য জোর করিয়া একথা বলা কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ দেশব্যাপী আলোড়নসৃষ্টিকারী বৃহত্তর সামাজিক, রাজ-নৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সহিত আমাদের ভবিষ্যৎ জড়িত।

বর্তমান সমাজচিন্তার একটি প্রধান প্রবণতা হইল অধিকতর দরিদ্র ব্যক্তিদের প্রতি এবং অপেক্ষাকৃত কম উন্নত এলাকাগুলির উপর কার্যকর ভাবে অধিক মনোযোগ দেওয়া। আমাদের মহান প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দও এই কথাই বহু পূর্বে বলিয়া গিয়াছেন। গভর্নিং বডি সবসময়ই এবিষয়ে পূর্ণ সজাগ; কিন্তু বিশেষভাবে এই কার্যের জন্য নির্দিষ্ট অর্থের স্বল্পতা, অন্যান্য কার্যের জন্য প্রতিশ্রুতি এবং প্রয়োজনানুরূপ সাধু-কর্মীর অভাবের জন্য স্বামীজীর এই ভাবকে কার্যে পরিণত করা বহুল পরিমাণে বিঘ্নিত হইয়াছে। তাই বলিয়া একথা ভাবিলে ভুল হইবে যে, চোখে পড়ার মতো কিছুই আমরা করি নাই। পরে যেসব পরিসংখ্যান দেওয়া হইল তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, আলোচ্য বর্ষে এ বিষয়ে যথেষ্ট কিছু করা হইয়াছে; মিশনের সভ্যগণ এবং জনসাধারণও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, মিশন গ্রামাঞ্চলের কাজ অধিকতর প্রসারিত করিয়াই চলিয়াছে, এবং সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রায় একটানা কোন-না-কোন প্রকার ত্রাণকার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। এ বছর সেপ্টেম্বর মাসে এই ত্রাণকার্য সুরাট, গুনটুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, কাছাড় প্রভৃতি পরস্পর হইতে বহুদূর বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলিতে বিস্তৃত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট অনুক্ষণ প্রার্থনা করি, তিনি যেন দরিদ্রনারায়ণসেবার যোগ্যতর যন্ত্ররূপে আমাদের গড়িয়া তোলেন। সেই সঙ্গে একথাও আমাদের ভোলা চলে না যে, আমাদের মিশনের প্রতিষ্ঠাতা আধ্যা-ত্মিকতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা. আন্তর্জাতিকতা-বোধ প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়েরও প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়াছিলেন। মিশনকে এইসব ক্ষেত্রেও কাজ করিতে হইবে। স্বামীজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারের মাধ্যমে সকলকে

ব্রাহ্মণত্বের স্তরে তুলিয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন, একই নিম্নতম স্তরে সকলকে টানিয়া নামাইতে চান নাই; বিভিন্ন শ্রেণীর ও জনসাধারণের জন্য কাজ করিবার সময় এই আদর্শকে আমাদের দৃষ্টিপথে সদা-ভাস্বর রাখিতে হইবে।

মিশনের সদস্য-সংখ্যা

১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ রামকৃষ্ণ মিশনে ৭০৯ জন সদস্য ছিলেন; ইঁহাদের মধ্যে ৩৪৬ জন গৃহস্থ এবং ৩৬৩ জন সন্ন্যাসী। গভীর দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে ৪ জন গৃহস্থ ও ৮ জন সন্ন্যাসী সভ্য দেহত্যাগ করিয়াছেন।

কর্মপ্রসার

আলোচ্য বর্ষে মিশনের দুইটি নূতন শাখাকেন্দ্র হইয়াছে, একটি গৌহাটীতে এবং অপরটি রায়পুরে। আরও একটি কর্মপ্রসার উল্লেখযোগ্য, রাঁচি আশ্রমে 'দিব্যায়ন' নামে একটি যুবশিক্ষণকেন্দ্র প্রধানত: আদিবাসীদের জন্য খোলা হইয়াছে। প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠের দাতব্য চিকিৎসালয়টির আরও ভালভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ফলে দৈনন্দিন রোগীর সংখ্যা ক্রমশ: বাড়িতেছে। বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় ৫০০ জন রোগী এখানে চিকিৎসালাভের জন্য সমাগত হয়। প্রধান কেন্দ্র কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত দরিদ্র ছাত্রগণের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে; শাখাকেন্দ্রগুলিতেও অনুরূপ সাহায্যদান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে নূতন নির্মিত ভবনাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য: কনখল সেবাশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দ সেনটিনারী মেমোরিয়াল ব্লক, সালেম কেন্দ্রে মন্দির ও প্রার্থনাগৃহ, রাঁচি টি. বি. স্যানাটোরিয়ামে অতিথি-ভবন, বারাণসী সেবাশ্রমে অপারেশন থিয়েটার ব্লক, মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজে বটানি ব্লক, মাদ্রাজে ত্যাগরায়নগর নর্থ ব্রাঞ্চ স্কুলে বিজ্ঞান-ভবন এবং দেওঘর বিদ্যাপীঠে গ্রন্থাগার-ভবন, সাধুদের থাকিবার জন্য গৃহ ও ভোজনালয়ের সম্প্রসারণ।

মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের ডিসপেন্সারী বিল্ডিংও সম্প্রসারিত হইয়াছে।

কেন্দ্রসমূহ ও কার্যধারা

১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রধান কেন্দ্র (বেলুড়) ছাড়া মিশনের ৭৩টি শাখাকেন্দ্র ছিল। তন্মধ্যে পূর্বপাকিস্তানে ছিল ৭টি এবং ব্রহ্ম, ফ্রান্স, ফিজি, সিঙ্গাপুর, সিংহল ও মরিশাসে একটি করিয়া; বাকি ৬০টি ভারতে। এই সংখ্যার মধ্যে ৬২টি মঠ-কেন্দ্র ধরা হয় নাই। মঠ-কেন্দ্রগুলির মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১০টি, পূর্ব পাকিস্তানে ৮টি, সুইজারল্যাণ্ড, ইংলণ্ড ও আরজেনটিনায় একটি করিয়া এবং বাকী ৪১টি ভারতে অবস্থিত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্তৃক কথিত ও তাঁহার জীবনে রূপায়িত বেদান্তের সত্যসমূহের ভিত্তিতে নি:স্বার্থ সেবাই মিশনের বিশিষ্ট আদর্শ। মিশনের এই আদর্শানুগ বিভিন্নমুখী কার্যধারার প্রধানত: ৫টি বিভাগ: (১) সেবাকার্য (relief), (২) চিকিৎসা, (৩) শিক্ষা, (৪) সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রসার, (৫) গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে জনকল্যাণকর কার্য।

মঠকেন্দ্রগুলির বিশেষ কার্য জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভাববৃদ্ধির সহায়তা করা; তাহা হইলেও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কেন্দ্রগুলি প্রভূত পরিমাণে কর্মরত। মঠ

ও মিশন উভয় কেন্দ্রগুলিরই রাজনীতির সহিত কোন সম্পর্ক নাই। তথাপি বিরুদ্ধ ভাবধারা ও পরিবেশের মধ্যে, এমনকি হিংসাত্মক পরিস্থিতির মধ্যেও কেন্দ্রসমূহকে কর্মরত থাকিতে হইয়াছে।

(১) **সেবাকার্য :** বিভিন্ন দুর্বিপাকে প্রপীড়িত দেশবাসীর মধ্যে সারা বৎসর ধরিয়াই মিশন কর্তৃক সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ওড়িশায় পট্টমুণ্ডাই-এ সাইক্লোন-রিলিফ ও ঢেনকানলে খরাত্রাণকার্য, পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর হুগলী ও জলপাইগুড়িতে, আসামে কামরূপ ও কাছার জেলায় এবং গুজরাটে সুরাট জেলায় বন্যার্তসেবা, মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায় কয়নাতে ভূমিকম্পবিধ্বস্তদের সেবা, আসামে কাছার জেলায় দুর্ভিক্ষত্রাণকার্য, পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে বস্ত্রাভাব-দূরীকরণে সেবাকার্য—প্রধানতঃ এই নয়টি রিলিফ-কার্যে মিশন কর্তৃক ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে জিনিসপত্রের মূল্যসমেত মোট ২২,৫৯,৬১৯·৩৫ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। এই টাকার মধ্যে মহারাষ্ট্রে ভূমিকম্পের জন্য ও গুজরাটে বন্যার জন্য সেবাকার্যে ব্যয়িত অর্থ ধরা হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মঠ-মিশনের স্থায়ী কেন্দ্রগুলি স্ব স্ব অঞ্চলে স্থানীয় জনসাধারণকে অর্থ ও দ্রব্যাদি দ্বারা নিয়মিতভাবে সাহায্য করিয়াছে। এইরূপ সেবাকার্যে প্রধান কেন্দ্রও প্রভূত অংশ গ্রহণ করিয়াছে। প্রধান কেন্দ্রের কার্য প্রধানতঃ শাখাকেন্দ্রগুলির নিয়ন্ত্রণ হইলেও, প্রধান কেন্দ্র হইতে দরিদ্র ছাত্রগণকে ও দুঃস্থ পরিবারবর্গকে সাহায্য করা হয়। প্রধান কেন্দ্র হইতে নিয়মিতভাবে ১৪৪টি দুঃস্থ পরিবারকে এবং ১৬৪ জন ছাত্রকে (সিন্ধু ছাত্রদের লইয়া) আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১টি স্কুল, ১৪০টি পরিবার এবং ১০ জন ছাত্র সাময়িকভাবে সাহায্য পাইয়াছে। এই সাহায্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৩৩,৩০৩·৭১ টাকা।

(২) **চিকিৎসা :** ভারত ও পাকিস্তানের অধিকাংশ কেন্দ্র কর্তৃক জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে পীড়িত জনসাধারণের সেবাকল্পে অনেকগুলি ইনডোর হাসপাতাল ও আউটডোর ডিসপেন্সারী পরিচালিত হয়। আলোচ্য বর্ষে মিশনের হাসপাতালগুলিতে অন্তর্বিভাগে মোট শয্যা-সংখ্যা ছিল ১,০০১ ; এইগুলিতে ২১,৬৬৩ জন রোগী চিকিৎসার জন্য ছিল। ৫৩টি আউটডোর ডিসপেনসারীতে পুরাতন রোগী সহ ২৬,৭৯,৪৬১ জন রোগী চিকিৎসিত হয়। ডুঙ্গরি, রাঁচি স্যানাটোরিয়াম এবং নিউ দিল্লীর ক্যারলবাগ হাসপাতাল কেবল যক্ষ্মারোগীদের জন্য। কলিকাতার সেবাপ্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার অন্যান্য বিভাগ ব্যতীত একটি নার্স ট্রেনিং স্কুল পরিচালিত হয় ; এই ট্রেনিং স্কুলের দুইটি বিভাগ : সিনিয়র ও জুনিয়র।

মঠকেন্দ্রগুলির ইনডোর হাসপাতাল-সমূহে পুরাতন রোগীসহ ৭,৯৭৫ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে ; আউটডোরে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৫,৪৬,০৩২। ত্রিবান্দ্রম হাসপাতালে মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য একটি বিভাগ এবং নার্স ট্রেনিং স্কুল আছে।

মঠ ও মিশন কেন্দ্রগুলিতে সাধারণতঃ অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা-ব্যবস্থা আছে ; কোন কোন কেন্দ্রে আয়ুর্বেদিক মতেও চিকিৎসা-ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

(৩) **শিক্ষা :** আলোচ্য বর্ষে মিশন কর্তৃক নিম্নলিখিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হইয়াছে :

৪টি মহাবিদ্যালয়, ২টি বি. টি. কলেজ,

১টি স্নাতকোত্তর বেসিক ট্রেনিং কলেজ, ১টি প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ৬টি জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং স্কুল ও কলেজ, ১টি শারীর-শিক্ষা কলেজ, ১টি উচ্চতর গ্রামীণ-শিক্ষা কলেজ, ১টি কৃষি-শিক্ষা কলেজ, ৪টি ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল (পলিটেকনিক), ১৩টি জুনিয়র টেকনিক্যাল ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল, ৭৫টি ছাত্রাবাস, অনাথাশ্রম প্রভৃতি, ২টি চতুষ্পাঠী, ৩৪টি বহুমুখী, উচ্চতর মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৩৭টি অন্যান্য বিদ্যালয়, ৬৫টি বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র অথবা কম্যুনিটি সেণ্টার, ১টি পরিষেবিকা-শিক্ষণ স্কুল, ১টি অন্ধ ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয়, ১টি দিবা-ছাত্রাবাস এবং ১টি বিভিন্ন ভাষা-শিক্ষার স্কুল।

মিশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬৪,৬৮৮, তন্মধ্যে ছাত্র ৪৮,৪৮৩ এবং ছাত্রী ১৬,২০৫।

মঠকেন্দ্রগুলি কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষায়তন-সমূহে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫,৪৩২, তন্মধ্যে ছাত্র ৩,৪৪৮ এবং ছাত্রী ১,৯৮৪।

(৪) **সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রসার:** উল্লেখযোগ্য যে, মিশনের এই কর্মবিভাগে বহুসংখ্যক গ্রন্থাগার, পাঠাগার, সাময়িক প্রদর্শনী উৎসবাদি, চলচ্চিত্র ও ম্যাজিক ল্যান্‌টার্ন প্রদর্শন, সেমিনার প্রভৃতির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ জনগণের মধ্যে বিস্তারলাভ করিতেছে। কয়েকটি কেন্দ্রে পুস্তকাদি প্রকাশনের মাধ্যমেও ইহা করা হইয়া থাকে। এই কার্যে কলিকাতা ইন্‌স্টিট্যুট অব কালচারের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও বিশিষ্ট।

সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রসারের ক্ষেত্রে মঠকেন্দ্রগুলি কর্তৃক যে বিপুল ও বিরাট কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হইতেছে এখানে তাহার উল্লেখ করা হইল না, কারণ সেগুলির নির্বাচিত কর্মক্ষেত্র প্রধানতঃ এই বিভাগেই। বহু পুস্তক-প্রকাশন বিভাগ ও মন্দির প্রভৃতি মঠকেন্দ্রগুলি দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে, তদুপরি বক্তৃতা-সফর, শাস্ত্রালোচনা, ক্লাস প্রভৃতির মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভাব ও আধ্যাত্মিক আদর্শ বিস্তার করা হয়।

(৫) **গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে জনকল্যাণকর কার্য:** রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলি সবই শহরাঞ্চলে স্থাপিত এবং সেগুলি কেবল উচ্চশ্রেণী ও মধ্যবিত্তদের জন্যই—সাধারণের মধ্যে এইরূপ একটি ধারণা জন্মিয়াছে। ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না। ইহার নিরসন হওয়া প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণ মিশনের অন্ততঃ ৯টি বড় কেন্দ্র গ্রামাঞ্চলেই অবস্থিত, আলোচ্য বর্ষে এই কেন্দ্রগুলি এবং ইহাদের পরিচালনাধীন বহু কেন্দ্র দরিদ্র জনসাধারণের সেবায় নিরত থাকিয়া ১৪৬টি বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়াছে; তন্মধ্যে ৭টি বহুমুখী বিদ্যালয়, ২টি মাধ্যমিক, ৩৯টি সিনিয়র বেসিক, জুনিয়র বেসিক ও মধ্য ইংরেজী, ৩৭টি প্রাথমিক এবং ৬১টি বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র। ১৩টি দাতব্য চিকিৎসালয়, ২টি ভ্রাম্যমাণ ইউনিট সহ ২২টি লাইব্রেরী, ১৩৯টি দুগ্ধ বিতরণকেন্দ্র, ৬টি অডিও-ভিসুয়াল ইউনিট, ৮টি কম্যুনিটি সেণ্টার, ৮টি বৃত্তি-শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শিলং কেন্দ্রের একটি ভ্রাম্যমাণ দাতব্য অ্যালোপ্যাথিক ডিসপেন্সারীর মাধ্যমে খাসি পাহাড় অঞ্চলে নিয়মিতভাবে ৩০টি গ্রাম জুড়িয়া আলোচ্য সময়ে ২১,৬৯২ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। কামারপুকুর মিশনকেন্দ্র কর্তৃক ১টি চতুষ্পাঠী পরিচালিত হইয়াছে। আসামে

নেকা কেন্দ্রে উৎসাহের সহিত শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে এবং এই কার্য গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের বিপুল সমাদর লাভ করিতেছে।

লক্ষণীয় যে, মিশনের শহরাঞ্চলের চিকিৎসা-কেন্দ্র ও বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নরনারী চিকিৎসার সুযোগলাভ করিতেছে এবং সহস্র সহস্র দরিদ্র ছাত্র অর্থ সাহায্য অথবা বিনা-ব্যয়ে থাকিবার ও শিক্ষালাভের সুযোগ পাইতেছে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মিশন কর্তৃক প্রায় প্রতি বৎসরই আর্তত্রাণ সেবাকার্য (relief) করা হয় এবং এই সেবাকার্যেও সহস্র সহস্র দুঃস্থ ও বিপন্ন ব্যক্তি সাহায্য লাভ করে।

বিদেশে কার্য

ব্রহ্ম, সিঙ্গাপুর, ফিজি, মরিশাস, সিংহল ফ্রান্সে যে কেন্দ্রগুলি অবস্থিত সেগুলি মিশনের কেন্দ্র ; ফ্রান্স ব্যতীত অন্যগুলিতে প্রধানতঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক কার্য অনুষ্ঠিত হয়। বিদেশে আমেরিকায় বা অন্যত্র অন্যান্য সমস্ত কেন্দ্রই মঠের শাখাকেন্দ্র। মঠকেন্দ্রগুলি বিদেশে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাবধারা প্রচারে নিরত। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, আমেরিকায় চিকাগো কেন্দ্র কর্তৃক '১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের যোগদানের ৭৫তম স্মৃতিবার্ষিক উৎসব' আয়োজিত হইয়াছিল। সেণ্ট লুই এবং পোর্টল্যাণ্ডে আলোচ্য বর্ষে নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মনে রাখিবেন, শাখাকেন্দ্রগুলিকে চালাইবার জন্য আমাদের মিশন বা মঠের কোন কেন্দ্রীয় তহবিল নাই। প্রত্যেক শাখাকেন্দ্রকে স্থানীয় সাহায্য সহায়ে নিজ ব্যয়ভার নিজেকেই বহন করিতে হয়। বিদেশের কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধেও একথা সমভাবে সত্য। আবার ইহাও সমভাবে সত্য যে, ভারতীয় কেন্দ্রগুলি বিদেশ হইতেও কোন অর্থ সাহায্য পায় না—কোথাও অতি সামান্য যাহা পায়, তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই নহে ; প্রায় সম্পূর্ণরূপেই মিশন ভারতীয় অর্থের উপর নির্ভরশীল।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে মীরাদেবী

শ্রীশ্রীসারদাদেবীর শিষ্যা, শ্রীসারদা আশ্রম, শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয় ও ছাত্রী-ভবনের অন্যতমা প্রতিষ্ঠাত্রী ও প্রাণস্বরূপা আশ্রমমাতা মাতৃগতপ্রাণা মীরাদেবী গত ২২শে অক্টোবর বুধবার রাত্রি ১২-৪৫ মিঃ-এ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে তাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীমাতৃ-অঙ্কে চির আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। তাঁহার জন্ম ১৫ই ভাদ্র, সন ১২৯৮ সালে। প্রয়াণকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৮ বৎসর। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনার্থে কয়েকজন সাধু ও অগণিত ভক্তজন হাসপাতালে, শ্রীসারদা আশ্রমে ও শেষকৃত্যের সময় কেওড়াতলা শ্মশানে সমবেত হইয়াছিলেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ২২ বৎসর বয়সে তিনি ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং তাহার পর হইতে সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর ঐ বিদ্যালয়ের কর্মে জীবন অতিবাহিত করেন। দেশের নারীশিক্ষার জন্যই তিনি আত্মোৎসর্গ করেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ঐ বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ পরিচালনার দায়িত্ব তিনি

নিজহস্তে গ্রহণ করেন এবং ঐ কাল হইতে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতমা শিষ্যা শ্রীযুক্তা বাণীদেবীর সহায়তায় পরিপূর্ণ দক্ষতার সহিত ঐ কার্য সম্পাদন করেন। সম্ভবতঃ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের রামনবমী তিথিতে মীরাদেবী শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভে ধন্যা হন। তিনি সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছায় স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের অনুসরণে স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি শেষ জীবনে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠে নিউ আলিপুরে ক্ষুদ্র একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়া ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী তাঁহার ঈপ্সিত শ্রীসারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দক্ষতার সহিত আশ্রম ও বিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আত্মা শ্রীশ্রীমাতৃ-অঙ্কে চিরশান্তি লাভ করুক এই প্রার্থনা।

দ্বিতীয়বার চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের জন্য যাত্রা

গত ১৪ই নভেম্বর ভারতীয় সময় রাত্রি ৯টা ৫২ মিনিটে আমেরিকার কেপ কেনেডি উৎক্ষেপণ-কেন্দ্র হইতে অ্যাপোলো-১২ চন্দ্রযানে চার্লস্ কনরাড, রিচার্ড এফ. গর্ডন এবং অ্যালান এল. বীন যাত্রা করিয়াছেন। যানটি পূর্ব অভিযানের মতই, যাত্রার পরিকল্পনাও প্রায় একই রূপ। কেবল এবারের বৈশিষ্ট্য হইল, মহাকাশ-চারিগণ একটু বিপদের ঝুঁকি লইয়া চাঁদের কাছে পৌঁছিবার যাত্রাপথের সামান্য পরিবর্তন করিবেন, এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে যাহাতে ঠিক পূর্ব-নির্ধারিত স্থানে নামিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিবেন। পূর্বের অভিযানে (অ্যাপোলো-১১) মহাকাশচারীদের নির্ধারিত স্থান হইতে কিছু দূরে নামিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।

এবারের অভিযানে অভিযাত্রিগণের নামিবার পরিকল্পনা চাঁদের ঝঞ্ঝাসাগরে। ঝঞ্ঝাসাগরে পূর্বে আমেরিকার যাত্রিহীন যান সার্ভেয়ার-৩ অবতরণ করিয়া বহু ছবি তুলিয়া পাঠাইয়াছে। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তারিখ সার্ভেয়ার-৩ চন্দ্রপৃষ্ঠের একটি গর্তের মধ্যে অবতরণ করিয়াছিল। সেই যানটির খুব কাছাকাছি এবার নামিবার ইচ্ছা—যাহাতে সার্ভেয়ার-৩ যানটি কি অবস্থায় আছে, এতদিন চাঁদে থাকিয়া তাহার যন্ত্রগুলির অবস্থা কি, ইত্যাদি স্বচক্ষে তাঁহারা দেখিয়া আসিতে পারেন এবং ফিরিবার সময় উহার কিছু অংশ সঙ্গে করিয়া লইয়াও আসিতে পারেন।



দিব্য বাণী

সা চ ব্রহ্মস্বরূপা চ নিত্যা সা চ সনাতনী।
যথাত্মা চ তথা শক্তির্যথাগ্নৌ দাহিকা স্থিতা॥ ১০
অত এব হি যোগীন্দ্রৈঃ স্ত্রীপুংভেদো ন মন্যতে।
সর্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মন্ শশ্বৎসদপি নারদ॥ ১১

শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতম্—৯।১

(পরমা প্রকৃতি যিনি বিশ্বের জননী)
ব্রহ্মরূপা তিনি, নিত্যা, তিনি সনাতনী।
অগ্নির দাহিকা, শক্তি অগ্নিসনে অভেদ যেমন
আত্মা ও তাহার শক্তি সেরূপ অভিন্ন সর্বক্ষণ॥

ব্রহ্মাপুত্র হে নারদ! শ্রেষ্ঠ যোগীদের চিত্তে তাই
'প্রকৃতি পুরুষ ভিন্ন'—এ চিন্তার কোন স্থান নাই।
সবই ব্রহ্মময় বলি সদা তাঁরা করেন দর্শন,
(শক্তি সৃষ্টি সর্বত্রই) সর্বদা দেখেন সেই
শাশ্বত সত্তারই প্রকাশন।

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একবার হৃদয়কে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, "ওরে হৃদে, একে (নিজ শরীর দেখাইয়া) তুই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিস বলে ওকে (শ্রীশ্রীমাকে) আর কখনো এমন কথা বলিসনি। এর ভেতর যে আছে, সে ফোঁস করলে হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে পারিস; কিন্তু ওর ভেতর যে আছে সে ফোঁস করলে তোকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবে না।" রামলালকে একবার বলিয়াছিলেন, "ও (শ্রীশ্রীমা) রাগ করলে এখানকার সব নষ্ট হয়ে যাবে।" সারদাপ্রসন্নকে (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) মন্ত্র-গ্রহণের জন্য শ্রীশ্রীমায়ের কাছে পাঠাইবার সময় বলিয়াছিলেন,

"অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়।
কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় রয়॥"

শ্রীরামকৃষ্ণের এসব কথার অর্থ কি, কি ভাব হইতে তিনি এসব বলিয়াছিলেন, তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নহে; তাঁহার ও তাঁহার সন্তানগণের কথা অবলম্বনে আমরা নিজের মতো অনুমান মাত্র করিতে পারি। মনে হয়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণের এই-সব কথাকেই অন্যভাবে প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন তাঁহার 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটকে, যেখানে মা-কালী সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "লীলা মার, আমি মাত্র লীলার আধার।"

ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমাকে মা-কালীরূপে 'সর্বদা সত্য সত্য' দেখিতেন, নিজেই বলিয়াছেন। শ্রীশ্রীমাও আবার শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতেন মা-কালীরূপেই; শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ-ত্যাগের পর তিনি একবারই কাঁদিয়া উঠিয়া-ছিলেন এবং তাহার ভাষা, 'মা-কালী গো! তুমি কি দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো!' তাই বলিয়া লীলায় তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি যে সম্পর্ক তাহা কখনও ব্যাহত হইত না, তাঁহাদের বাহ্যাচরণ নিখুঁতভাবে তাহারই অনুগামী হইত। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তান স্বামী শিবানন্দের 'মা' ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ; আবার তিনি ইহাও বলিয়াছেন, "বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই এই শ্রীরামকৃষ্ণ।" স্বামী সারদানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের প্রণামমন্ত্রে লিখিয়াছেন, "যথাগ্নের্দাহিকাশক্তিঃ রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা"—ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তির অভেদত্ব-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণেরই উপমা অবলম্বনে। স্বামী বিজ্ঞানানন্দও শ্রীরামকৃষ্ণকে ব্রহ্ম এবং শ্রীশ্রীমাকে তাঁহার শক্তি বলিয়াই বলিয়াছেন, "ঠাকুর চৈতন্য-স্বরূপ, মা চিন্তা-স্বরূপিণী।" চিন্তারূপেই ব্রহ্মে শক্তির প্রথম প্রকাশের কথা পাই উপনিষদে—"তদৈক্ষত বহু স্যাম্"।

এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বোক্ত কথাটির অর্থ কিছুটা অনুমান করা যায়। ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি অভেদ হইলেও লীলার সব কিছুই শক্তির এলাকাধীন। লীলা মায়েরই, বিকশিতশক্তিসমন্বিত চৈতন্যেরই; যে-অবস্থায় শক্তির বিকাশ নাই, ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি মিশিয়া এক, সে-অবস্থায় লীলা বলিয়া কিছুই নাই।

লীলাদেহেও অভেদ

আর একটি দৃষ্টিকোণ হইতেও দেখা যায়। ব্রহ্মে তাঁহার শক্তির প্রকাশ থাকুক বা না থাকুক, কোন অবস্থাতেই, নিত্য বা লীলায়, ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তির পৃথক অস্তিত্ব সম্ভবই নয়। স্বরূপতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা অভেদ —সে-স্বরূপের সহিত জীবও অভেদ, তাহা জীব-জগৎ-ঈশ্বর সকলেরই স্বরূপ। কিন্তু লীলায়? লীলাতেও ব্রহ্ম এবং তাঁহার শক্তির পৃথক অস্তিত্ব নাই—উভয়ই সদাসংযুক্ত। যাহা কিছু আমরা দেখি, শুনি, কল্পনা করি, অনুভব করি—নিজের সম্বন্ধে বা জগৎ সম্বন্ধে বা ভগবান সম্বন্ধে, তাহা চৈতন্যের সহিত সংযুক্ত শক্তিরই—মায়েরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। সত্যলাভের পর মায়ের ইচ্ছায় যাঁহারা নিত্য হইতে লীলার রাজ্যে ফিরিয়া আসেন, তাঁহারা নিজের মধ্যে, জগতের মধ্যে, ঈশ্বরের মধ্যে সর্বত্রই এই চৈতন্যকেই বা চৈতন্যের সহিত বিকশিত শক্তিকেই, ঈশ্বরকেই, মাকেই দেখিয়া থাকেন; 'সর্বভূতস্থমাত্মানম্' বা 'সর্বভূতস্থমীশ্বরম্'

শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বভূতে চৈতন্যকে এবং মা-কালীকে প্রত্যক্ষ করিতেন, আবার অদ্বয় স্বরূপেও চলিয়া যাইতেন। শ্রীশ্রীমাও বলিয়াছেন, "জ্ঞান হলে ঈশ্বর-টীশ্বর সব উড়ে যায়, কিছুই থাকে না।" আবার পরক্ষণেই বলিয়াছেন, "মা, মা, শেষে দেখে মা আমার জগৎ জুড়ে! এই তো সোজা কথাটা।"

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছায় দেখিয়াছিলেন: দেহ মা, প্রাণ মা, মন মা; স্থল মা, জল মা, অন্তরীক্ষ মা; স্থূল মা, সূক্ষ্ম মা, কারণ মা, আবার এসবের পারেও সেই নির্গুণা মা। অহঙ্কার-মন-বুদ্ধির ভিতর দিয়া আমাদের যাহা কিছুর অনুভূতি তাহা সবই মা—চৈতন্যের সহিত, ব্রহ্মের সহিত সদাসংযুক্ত তাহার শক্তির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র।

এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে স্বরূপে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা অভেদ, লীলাদেহেও তাই—উভয়েই ব্রহ্মশক্তি, ঈশ্বর, মা-কালী। অবতারলীলায় স্থূলদেহে যখন তাঁহারা ছিলেন, তখন লীলার জন্য পরস্পরের প্রতি বাহ্য ব্যবহার তাঁহারা যেরূপই করুন না কেন, এ অভেদবোধ তাঁহাদের থাকিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমাকে মা-কালীরূপে এবং মা-কালীর সঙ্গে নিজেকে অভেদ বলিয়া দেখিতেন। শ্রীশ্রীমা ভাব চাপিয়া আমাদের সকলেরই ধরা-ছোঁয়ার মতো অতি সাধারণ পল্লীবাসিনী মা হইয়াই প্রায় সর্বক্ষণ থাকিলেও স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ তাঁহার সত্যদ্রষ্টা সন্তানগণ ছাড়াও কোন কোন ভাগ্যবান কখনো কখনো তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপেই দেখিয়াছেন; শ্রীশ্রীমা নিজেও বলিয়াছেন, "যেই ঠাকুর সেই আমি।" যোগীন-মা একদিন দেখিয়াছিলেন, মা গভীর সমাধি ভঙ্গের পর ঠাকুর সে-অবস্থায় যেরূপ আচরণ করিতেন, ঠিক সেরূপ আচরণই করিতেছেন। জয়রামবাটীর ভানুপিসীকে মা একদিন গান গাহিয়া শুনাইতেছেন (ভানুপিসীর সহিত শ্রীশ্রীমায়ের আবাল্য হৃদ্যতা ছিল); ভানুপিসী লক্ষ্য করেন, মায়ের কণ্ঠস্বর সেদিন হুবহু শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের মতো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—লীলায় ভক্তও

তথাপি মা-কালীরূপে এ অভেদবোধের পাশাপাশি আর একটি বোধও থাকিত, যাহার কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্পষ্টই বলিয়াছেন, "এর ভেতর দুটি আছে—একটি মা-কালী, অপরটি

তাঁর ভক্ত"; এ ছাড়া বোধ হয় অবতার-লীলাই হয় না। এই শেষোক্ত ভাবাবলম্বনেই শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এই 'ভক্ত'-ভাবে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ মা-কালীর 'শ্রীরামকৃষ্ণে' বিন্দুমাত্র 'আমি'-বোধ নাই, সেখানকার দেহমন তো বটেই, 'আমি'ও মায়ের লীলার আধার মাত্র। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ 'শ্রীম'-কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন: আমার কি ইচ্ছা আছে বল দেখি? 'শ্রীম' বহুবার শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শুনিয়াছিলেন যে ভক্তি-ভক্ত লইয়া থাকিবার ইচ্ছা তাঁহার রহিয়াছে। সেই কথা তিনি বলিলে শ্রীরামকৃষ্ণ সংশোধন করিয়া দিলেন: না, আমার নয়, মায়ের ইচ্ছা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবারে 'শ্রীম'কে এই বিশেষ কার্যের জন্যই আনিয়াছিলেন; তাই 'শ্রীম' তাঁহার কথা ঠিকমত বুঝিলেন কিনা তাহা পরে প্রশ্ন করিয়া প্রয়োজনীয় স্থলে সংশোধন করিয়া দিতেছেন এরূপ দৃষ্টান্ত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে' আরো পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীমা—'আপন মা'

শ্রীশ্রীমায়ের আচরণে ও কথায় মা-কালীর সহিত অভেদভাব কদাচিৎ প্রকাশ পাইত—তাহাও অতি সাধারণভাবে: বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সকলেই আমার সন্তান, আমিই তো সব হয়ে রয়েছি; অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বোক্ত কথারই পুনরাবৃত্তিতে—"এর ভেতর যিনি আছেন, যদি একবার ফোঁস করেন তো ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কারো সাধ্য নাই যে তোদের রক্ষা করে।" এ প্রকাশ কদাচিৎ; প্রায় সর্ব-ক্ষণই জগজ্জননীর সহিত তাঁহার অভেদত্বের ভাব প্রকাশ পাইত অপার মাতৃস্নেহরূপে। আর এরূপ হইত বলিয়াই তাঁহাকে আমরা সকলেই অতি আপনার বলিয়া ভাবিতে পারি—সুখে-দুঃখে, পাপে-পুণ্যে, আধ্যাত্মমার্গের অতি উচ্চে এবং অতি নিম্নে দাঁড়াইয়া, সর্বাবস্থাতেই সকলেই তাঁহার কাছে 'মা' বলিয়া গিয়া দাঁড়াইতে পারি, এবং কোন অবস্থাতেই কাহাকেও 'মা বলিয়া আসিয়া দাঁড়াইলে' তিনি 'না' করিতে পারেন না। তাঁহার এই বিপুল-উচ্ছ্বসিত মাতৃস্নেহের প্লাবন ক্ষেত্র-বিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাকেও ঠেলিয়া প্রবাহিত হইয়াছে—এরূপ উদাহরণও বিরল নহে। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ সে-সব ক্ষেত্রে খুশীই হইয়াছেন, কারণ তখন তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে এই মাতৃত্বের উদ্বোধনই চাহিতেছিলেন যাহা তাঁহার লীলাবসানের পর জগৎকল্যাণসাধন-কার্যে তাঁহারই প্রতিনিধিত্ব করিবে। ছেলে যখন আকুল হইয়া 'মা' বলিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, মায়ের কাছে তখন ছেলেরই প্রাধান্য—নিজের নিয়ম নাকচ করিয়াও তিনি তখন ছেলের আন্তরিক ইচ্ছা পূর্ণ করেন। সন্তান-স্নেহ মা-বাপ উভয়েরই সমান ঠিকই, তবে বাপের শাসনটুকুও মায়ের স্নেহে নাই—"মাকে ডাকবে তাহলেই সব হয়ে যাবে। ঠাকুর কিন্তু বড় দুষ্টু। একেবারে ঠিক ঠিক না হলে তাঁর কৃপা হয় না" (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ)।

তবে তাঁকে অতি আপনার বলিয়া ভাবা চাই, আপন মা ভাবিয়া 'মা' বলিয়া তাঁহার কাছে গিয়া দাঁড়ানো চাই। এই একান্ত আপনার বলিয়া বোধটুকু আনা ভক্তির সর্ববিধ পথেরই সার কথা। জগজ্জননী শ্রীশ্রীমাকে অতি আপনার বলিয়া ভাবা সহজও, ইহাতে সহায়তা করে আমাদের পার্থিব মায়ের স্নেহের রূপ যাহা তাঁহারই স্নেহের আংশিক প্রকাশ; যাঁহারা তাঁহার স্থূলশরীরে থাকা-কালীন তাঁহার স্নেহের স্পর্শ সাক্ষাৎভাবে

পাইয়াছেন, তাঁহাদের তো কথাই নাই। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু ঘটনায় যাঁহার ইচ্ছাই চরম কথা, যাঁহার ইচ্ছাই—কঠিন বাস্তবের রূপ নেয়, এবং যাঁহার ইচ্ছামাত্রেই বাস্তব-রূপে প্রতিভাত স্বপ্ন নিমেষে ভাঙ্গিয়া যায়, তাঁহার প্রতি এই আপনার বোধটুকু আনিতে পারিলে আর কোন ভয় নাই। তিনিই সব করিয়া দিবেন বা শুদ্ধ বুদ্ধিরূপে, শক্তিরূপে অন্তরে প্রকাশিত হইয়া সব করাইয়া লইবেন—"ভাববে আমার একজন মা আছেন, তাহলেই হবে।"

শিখধর্ম ও গুরু নানক

১

শিখ শব্দের অর্থ শিষ্য, বাবা শব্দের অর্থ পিতা, গুরু। বাবা নানকের শিষ্যগণই শিখ নামে, এবং তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মই শিখধর্ম নামে পরিচিত।

মুসলমানধর্মের প্রভাব যখন উত্তর ভারতে প্রবল, সেই সময়, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশ এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমাংশ জুড়িয়া শিখধর্মের উৎপত্তি ও রূপলাভের ইতিহাস। একদিকে মুসলমানধর্মের একেশ্বর-বাদ, অপর দিকে হিন্দুদের নিগুর্ণ নিরাকার ব্রহ্ম ও বহু সম্প্রদায় কর্তৃক আরাধিত সাকার ঈশ্বরের বহু নাম-রূপ ; এসবের দ্বারা, বিশেষ করিয়া এ সবগুলির পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক অনুষ্ঠানপদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত তৎকালীন বিভ্রান্ত মানসে সামঞ্জস্যবিধানের উদ্দেশ্যেই, হিন্দুমুসলমানের মিলনের উদ্দেশ্যেই, শিখধর্মের উৎপত্তি। কবীর এই মিলনপ্রচেষ্টার অগ্রদূত হইলেও, কবীরের বহু গাথা শিখ ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থ-সাহেব'-এ স্থান পাইলেও, নানকই শিখধর্মের যথার্থ গুরু। বিভিন্ন ধর্মমতের, বিভিন্ন অনুষ্ঠান-পদ্ধতির উর্ধ্বে যে শাশ্বত ধর্ম, তাহাকেই নিজজীবনে রূপায়িত করিবার পর ধর্মের সেই মূল কথাগুলিকেই সর্বজনসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন তিনি।

যদিও শিখধর্ম হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়-গুলির ন্যায় বেদের উপর নির্ভরশীল নয়, তাহার পৃথক ধর্মগ্রন্থ আছে, তথাপি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, ভারতীয় চিত্তে মুসলমানধর্মের প্রভাবে উদ্ভূত বিভ্রান্তিকালে গুরু নানক মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন বেদান্তের মূল কথাগুলিরই উপর ; স্বামী বিবেকানন্দ যাহা করিয়াছেন আরো ব্যাপক, আরো গভীর ভাবে—খৃষ্টধর্মের প্রভাবে উদ্ভূত আরো অধিক মোহবিস্তারকারী বিভ্রান্তিক্ষণে। নিবেদিতার ভাষায়, "যুগপরিবর্তনকালে উদ্ভূত বিভ্রান্তিগুলির প্রত্যুত্তররূপে" স্বামী বিবেকানন্দ "অধ্যাত্ম হিন্দুধর্মের যে পতাকা তুলে ধরে-ছিলেন, যা আদর্শস্থানীয়, যা গতিশীল এবং যা জাতি- ও প্রথাগত সর্ববিধ বাহ্যানুষ্ঠানের উর্ধ্বে," "লিখিতই হোক আর অলিখিতই হোক, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সন্ত ও আচার্যগণের বাণীও ছিল তাই।" উত্তর-পশ্চিম ভারতে কবীর ও নানক ছাড়া প্রায় একই কালে একই কাজ করিয়াছেন পূর্বভারতে শ্রীচৈতন্য, দক্ষিণভারতে রামানন্দ ও বল্লভাচার্য।

ধর্ম যে শুধু মত ও বাহ্যানুষ্ঠানমাত্র নয়, ধর্ম যে অন্তরের জিনিস, উপলব্ধির জিনিস, সেই কথাই নানক প্রচার করিয়াছেন :

"ধর্ম তালিদেওয়া জামায় নাই, যোগীর পরিহিত বেশে নাই, অঙ্গে লিপ্ত ভস্মেও নাই ; কর্ণে পরিহিত কুণ্ডলে, মুণ্ডিত মস্তকে অথবা শৃঙ্গনিনাদের মধ্যেও ধর্ম নাই। জাগতিক অপবিত্রতার মধ্যে পবিত্র থাক, ধর্মলাভের পথ

খুঁজিয়া পাইবে। কেবল শব্দরাশি ধর্ম নয়—যিনি সব মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখেন, তিনিই ধার্মিক। সমাধিস্থানে বা শ্মশানে পর্যটন করাই ধর্ম নয়, ধ্যানের ভঙ্গিতে বসিয়া থাকাও নয়, বিদেশভ্রমণ বা তীর্থে অবগাহনও ধর্ম নয়—জাগতিক অপবিত্রতার ভিতর পবিত্র থাক, ধর্মের পথ খুঁজিয়া পাইবে।"

"দয়াকে তোমার মসজিদ কর, আন্তরিকতাকে প্রার্থনাকালে বিছাইবার বস্ত্র কর, যাহা ন্যায়- ও আইনসম্মত তাহাকে কোরান কর, শিষ্টাচারকে উপবাস কর—তাহা হইলেই তো তুমি মুসলমান! সম্যক ব্যবহারই তোমার কাবা, সত্যই তোমার আধ্যাত্মিক গুরু, সৎকর্মই তোমার প্রার্থনা। ভগবানের ইচ্ছাই তোমার জপমালা।"

নানক বলিয়াছেন, ভগবান সর্বধর্মের, সর্বশাস্ত্রের, সর্ববিধ সাধনপদ্ধতির উর্ধ্বে। তিনি এক। একমাত্র তিনিই আদিতে ছিলেন, জাতি-ধর্ম-স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলেরই অন্তরে একমাত্র তিনিই আছেন, তাঁহার দিকে অগ্রসর হওয়াই ধর্ম :

"...র আদিতে ভগবান ছাড়া আর কিছুই ছিল না ; স্বর্গ-মর্ত্য, দিন-রাত্রি, চন্দ্র-সূর্য ছিল না ; 'প্যারাডাইস' ও পাতালপ্রদেশ, মুসলমানদের স্বর্গ-নরক, হিন্দুদের স্বর্গ-নরক ও পুনর্জন্ম বা জন্ম-মৃত্যু—কিছুই ছিল না। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কেহই ছিলেন না। একমাত্র ভগবানই ছিলেন। তখন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি কোন জাতি ছিল না ; যজ্ঞ ছিল না, 'পবিত্র ভোজ' ছিল না, পবিত্র তীর্থসলিলে অবগাহনও ছিল না। বেদ স্মৃতি প্রভৃতিও ছিল না, মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থও ছিল না—কোন শাস্ত্রই ছিল না। তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন।"

"সেই ভগবানকে স্মরণে রাখিও, তাঁহাকে অবহেলা করার ভাব হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেল।"

নানক বলিয়াছেন—ভগবান সর্বব্যাপী, সগুণ নির্গুণ, সাকার নিরাকার সবই :

"নিজের অন্তর খুঁজিয়া দেখ, ভগবান সেইখানেই রহিয়াছেন।"

"নানকের বিনীত ঘোষণা—তিনি সমুদ্রে আছেন, স্থলে আছেন, উর্ধ্ব-অধঃ সর্বত্রই আছেন।"

"ভগবান! তোমার অনন্ত চক্ষু, আবার তুমি চক্ষুহীন ; তোমার সহস্র কর্ণেন্দ্রিয়, আবার কোন ইন্দ্রিয়ই তোমার নাই ; তোমার অনন্ত রূপ, আবার কোন রূপই নাই তোমার ; হে জ্যোতিঃস্বরূপ, বিশ্বের সব কিছুর জ্যোতিই তোমার—তোমার ভাতিতেই সব কিছু ভাতিমান হয়!"

২

পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোর শহর হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত তাল-ওয়ান্দি গ্রামে ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে নানক জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামটি এখনো আছে, তবে নানকের সম্মানার্থে উহা 'নানকানা সাহিব' নামে পরিচিত। হিন্দু ক্ষত্রিয় (ক্ষত্রী) পরিবারে তাঁহার জন্ম ; পিতার নাম কালু, মায়ের নাম তৃপ্তা। নানকের আট-নয় বছর বয়সের সময় উপনয়নের আয়োজন হইলে নানক উহাতে প্রতিবাদ করেন। এই বয়সেই তিনি বলিয়াছিলেন, বাহ্য উপবীত ধারণে কি প্রয়োজন? যথার্থ উপবীতের "করুণাই হইল তুলা, চিত্তপ্রসাদ সূত্র, ইন্দ্রিয়সংযম গ্রন্থি, আর সত্যই সূত্রের পাক।" কথাগুলি পরবর্তীকালে গাথারূপে

শিখধর্মগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বাল্যকালে তাঁহাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়, সেখানে তিনি যাইতেনও, তবে পাঠে তাঁহার মনোযোগ ছিল না। গ্রামের চারিদিকে অরণ্য, সেখানে মাঝে মাঝে বহু সাধুসন্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত; নানক সেখানেই ঘুরিতেন অধিকাংশ সময়, সাধুসন্তদের সঙ্গে মিশিতেন, তাঁহাদের কাছে অনেক কিছু শিখিতেনও। পাঠে তাঁহার এই অবহেলা দেখিয়া পিতা তাঁহাকে জেলার শাসনকর্তার কাছে কর্মে নিয়োগ করেন; শাসনকর্তাটি ছিলেন একজন শিক্ষিত মুসলমান। তাঁহার কাছ হইতেই নানক মুসলমানধর্মের সার তত্ত্বগুলি জানিতে পারেন।

১৪ বৎসর বয়সে সুলক্ষ্মীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পরে দুইটি পুত্রলাভও হইয়াছিল।

কিছুকাল পরে কর্ম ও সংসার ছাড়িয়া তিনি পরিব্রাজক-জীবন বরণ করেন এবং সাধনান্তে ঈশ্বরের দর্শন, এবং প্রচারের জন্য আদেশ লাভ করিয়া ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। তাঁহার পোষাকের বৈশিষ্ট্য ছিল—হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বেশই তিনি ধারণ করিতেন, বোধ হয় হিন্দু-মুসলমানের মিলনোদ্দেশ্যেই।

তাঁহার প্রচারে জাতি-ধর্ম বা স্ত্রী-পুরুষগত কোন ভেদেরই স্থান ছিল না, তিনি বলিতেন, "সকলেরই অন্তরে একই ভগবান প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, তাঁহারই আলোক প্রত্যেক হৃদয়ে। আমাদের বোধশক্তির, আমাদের জ্ঞানের, এমন কি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারও সৃষ্টিকর্তা তিনিই।"

তিনি প্রচার করিতে লাগিলেন, ভগবান-লাভের উপায় কোন জটিল পদ্ধতি নহে, উপায় সরলতা ও আন্তরিকতা। মানুষ বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য জীবন যাপন করুক; কিন্তু তাঁহার মন যেন সর্বক্ষণ ভগবানে থাকে—ভগবৎ-স্মরণ যেন সর্বদা থাকে। তাহা হইলেই ভগবান তাহাকে দুঃখকষ্ট ও পুনর্জন্মের কবল হইতে মুক্তি দিবেন।

ভগবানের নামজপের উপর খুব জোর দিতেন তিনি। বলিতেন, "সরল মনে আন্তরিকভাবে ভগবানের নাম জপ করিলেই ভগবানে মন স্থির হইবে।" নূতন মন্ত্র "ওয়া গুরু"। হিন্দুধর্মের যে কয়টি মূল বিষয় নানক শিখধর্মে রাখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তত্ত্ব হিসাবে সৃষ্টিতত্ত্ব ও কর্মবাদ বা পুনর্জন্মবাদ, এবং অনুষ্ঠান হিসাবে জপই প্রধান। সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বাতীত আনন্দময় অবস্থায় ওঠাই যে আমাদের লক্ষ্য, সে বিষয়েও দৃষ্টিকে সজাগ রাখিতে বলিতেন তিনি: "সকলেই সুখ চায়, কেহই দুঃখ চায় না। সুখের সঙ্গী হয়েই মহাদুঃখ আসে, কিন্তু বিকৃতবুদ্ধি আমরা তাহা বুঝি না। সুখ ও দুঃখকে যে সমদৃষ্টিতে দেখিতে পারে, সেই-ই আনন্দ পায়।"

বলিতেন, শুধু আলোচনায় হয় না, সংশয় কাটাইবার জন্য, ভগবানলাভের জন্য সাধনা প্রয়োজন, "ভগবানকে শুধু কথায় পাওয়া যায় না। সৎকার্যকে তোমার জমি কর, ভগবৎ-কথারূপ বীজ সেখানে বপন কর, সত্যরূপ বারি সিঞ্চন করিয়া চল সেখানে—তাহা হইলেই বিশ্বাস অঙ্কুরিত হইবে। তখন মূর্খেরও বোধগম্য হইবে স্বর্গ ও নরকে কি তফাত।"

নানককে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, "আপনি হিন্দু না মুসলমান?" তাহা হইলে উত্তরে তিনি বলিতেন, "আমি সেই এক ভগবানের উপাসক—যে ভগবানের কাছে হিন্দু বা মুসলমান বলিয়া কিছু নাই।"

পরিব্রাজক প্রচারকরূপেই তিনি বাকী

জীবন কাটাইয়াছেন। মাঝে মঝে গৃহে আসিয়া আত্মীয়গণের খোঁজখবর লইয়া যাইতেন। আত্মীয়গণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভারতে তিনি দক্ষিণে সিংহল পর্যন্ত, এবং কথিত আছে পশ্চিমে মক্কা পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহের সংকারের জন্য হিন্দু ও মুসলমান উভয়বিধ শিষ্যেরাই সমভাবে দাবী জানাইয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়।

৩

তাঁহার শিষ্য ও সেবক অঙ্গদকেই তিনি আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার প্রদান করিয়া যান। গুরু নানকের পর পঞ্চম গুরু অর্জন ও দশম গুরু গোবিন্দই সমধিক উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ (১৫৩৮-৫২) শিখদের পবিত্র ভাষা গুরুমুখীর বর্ণমালা উদ্ভাবন করেন। তৃতীয় গুরু অমর দাস (১৫৫২—৭৪) জাতি-প্রথা নির্মূল করিবার জন্য 'লঙ্গড়' বা সাধারণ পাকশালা প্রবর্তন করেন। চতুর্থ গুরু রামদাস (১৫৭৪-৮১) রামদাসপুর নগরী (পরে ইহাই অমৃতসর নামে খ্যাত) স্থাপন করিয়া সেখানকার স্বর্ণমন্দিরের কাজ আরম্ভ করেন। পঞ্চম গুরু অর্জন (১৫৮১-১৬০৬) শিখ-ধর্মপুস্তক 'গ্রন্থসাহেব'-এর মূল 'আদি গ্রন্থ'-সংকলন এবং শিখধর্মের বিস্তারসাধন করেন; তাঁহারই সময়ে শিখগণ সম্পদ, রাজনীতি ও শক্তিতে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। বলা যায়, তাঁহার সময় হইতেই শিখগুরু কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়ে নয়, লৌকিক বিষয়েরও (ফকিরি এবং আমিরি) গুরুরূপে গণ্য হন। ৬ষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ (১৬০৬-৪৫)। ৭ম গুরু হররাই (১৬৪৫-৬১), ৮ম গুরু হরকৃষণ (১৬৬১-৬৪), ৯ম গুরু তেগ বাহাদুর (১৬৬৪-৭৫)।

দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ (১৬৭৫-১৭০৪) শিখজাতিকে সংগ্রামের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন; 'খালসা' তন্ত্রের তিনিই প্রবর্তক। শিখদের কৃপাণ-দীক্ষা ও 'সিংহ' পদবী গ্রহণ করানোর প্রবর্তক তিনিই। তিনিই এতদিন পর্যন্ত প্রচলিত গুরুপরম্পরা তুলিয়া দিয়া তৎস্থলে 'গ্রন্থসাহেব' স্থাপন করেন।

গ্রন্থসাহেব প্রধানতঃ নানকের গাথা লইয়াই হইলেও অপর নয়জন গুরু প্রত্যেকেই ইহাতে কিছু না কিছু যোগ করিয়াছেন, হিন্দু ও মুসলমান সাধুসন্তের কিছু বাণীও ইহাতে বিধৃত।

স্বামী বিবেকানন্দ ও যুব-সম্প্রদায়

স্বামী আদিনাথানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত যুগ-ধর্মের মূল কথা 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। আমরা সর্বপ্রথম আত্মার মুক্তি চাই এবং বিশ্বাস করি জগতের সেবাই উহার প্রকৃষ্ট উপায়।

হিন্দু-সাধনার চরম অবদান জীব-ব্রহ্মের ঐক্যানুভূতি। বর্তমান যুগে স্বামীজীর উদাত্ত-কণ্ঠে এই মহতী বাণী আবার উচ্চারিত হইয়াছে। ইহা জীবনানন্দভূত সেই সর্বাত্মকত্বের অববোধ। তিনি শুনাইলেন:

"ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে
সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে,
এ সবার পায়।"

স্বামীজী এই বাণীর মূর্ত প্রতীক ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যদৃষ্টিতে ও বিবেকানন্দের জীবনে সেই আত্মোপনিষদের এক অভিনব মানব-ভাষ্য প্রণীত হইয়াছে। ইহা দ্বারা নব-যুগের নবধর্মের অন্তর্গত সেই পাশ্চাত্য humanism-কে (মানবতাকে) একটি অতি গভীর তত্ত্বের আলোকে উজ্জ্বল ও পরিশুদ্ধ করা হইয়াছে। সত্য ধর্মসাধনা ও মানব-প্রীতি এই দৃষ্টিভঙ্গীতে সমানার্থবোধক হইয়াছে। বিবেকানন্দ 'চরিত্র'কেই মানব-ধর্ম-সাধনার সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন। ধর্মের শিক্ষা অনুশীলনের উদ্দেশ্য চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধন। তিনি বলিতেন: "Education is the manifestation of perfection already in man". এবং "Religion is the manifestation of divinity already in man." (মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতা-প্রকাশই শিক্ষা এবং মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব-প্রকাশই ধর্ম)। অসীম আত্মপ্রত্যয়, অদম্য কর্মশক্তি ও তাহার সহিত 'ত্যাগ' বা পরার্থে আত্মবিসর্জন—ইহাই সুপ্ত মহামানবত্বকে উদ্বোধিত করিতে পারে।

ইহা ভুল ধারণা যে, ধর্ম মানুষকে পঙ্গু করিয়া দেয় অথবা ইহা মনুষ্য-সমাজের সর্ববিধ উন্নতির পরিপন্থী হয়। ধর্ম মানুষকে যথার্থ স্বার্থশূন্য করে, পরহিতব্রতী করে আর আত্ম-প্রত্যয় জাগাইয়া অসীম শক্তির অধিকারী করে। যেমন 'test of pudding is in eating' (পিষ্টকের আস্বাদ খাইলেই বোঝা যায়), তেমনই ধর্মসাধনা করিলেই স্বীয় জীবনে তাহার প্রত্যক্ষ ফল অনুভূত হইবে। যাহারা ধর্মের নিন্দা করে, বুঝিতে হইবে কোন অনুভূতি তাহাদের জীবনে আসে নাই। ধর্মের নিন্দাবাদ তাহাদের অন্তর্দৃষ্টির অভাবের পরিচায়ক। বাস্তব দৃষ্টিতে অনেকের কাছে আইনস্টাইনের Theory of Relativity-ও নিষ্প্রয়োজন মনে হয়। উচ্চস্তরে না উঠিলে বহু জিনিসের অপরিহার্যতা বুঝা যায় না। 'কবিসত্তার' প্রয়োজন বুঝিতে হইলে কবিত্ব-প্রতিভা ও অনুশীলন থাকা চাই। তেমনই ধর্মতত্ত্ব বুঝিতে হইলে 'ধর্মানুভূতি' থাকা চাই। তবেই উহার অপরিহার্যতা বুঝা যাইবে।

বিবেকানন্দের অন্য একটি সাধনমন্ত্র ছিল 'individuality' বা মানবাত্মার স্বাতন্ত্র্য-বোধ ও স্বশক্তির উদ্বোধন। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যবোধ ব্যক্তির ক্ষুদ্র আত্মাভিমান নহে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ পশ্চিম হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে। ইহার অর্থ আজকাল দাঁড়াইয়াছে আপনাকে স্বাধীন ও বড় করা, যাবতীয় নিয়ম-সংযমের আচারের নিষ্ঠার বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্তি দিয়া বড় করা। ইহা মানব-প্রকৃতির বিদ্রোহের ফল। উহা পাশ্চাত্য জগতে চলিতেছে, এদেশেও তাহারই অনুকরণে অনুশীলিত হইতেছে। কিন্তু হিন্দু-সাধনা একটি ভিন্ন রাস্তা দিয়া ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধন করিয়াছে। উহাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। স্বামীজী সর্বক্ষেত্রে বৈদান্তিক সাধনার মর্যাদা দিয়াছেন এবং ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সব সমস্যার সমাধান করিতে আহ্বান করিয়াছেন। পরানুকরণ তিনি ঘৃণা করিতেন। হিন্দুর জাতীয় বৈশিষ্ট্যে গৌরববোধ আমাদের জাতীয় জয়যাত্রার পথে দিঙ্‌নির্ণয় করুক, ইহাই তাঁহার কাম্য ছিল। তিনি বলিয়াছেন:

'I have never quoted anything but Upanishads and of the Upanishads it is that one idea—strength." (আমি উপনিষদ্ ব্যতীত অন্য কিছুই উল্লেখ করি নাই এবং উপনিষদেরও সেই এক কথা—শক্তি)। এই 'আত্মশক্তি' আমাদের জন্মগত অধিকার। ইহা জাগাইবার উপায় তিনিই বলিয়া দিয়াছেন।

"পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়
তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান,
নাচুক তাহাতে শ্যামা॥"

এই 'আত্মশক্তি'র উদ্বোধন-মন্ত্র গীতাকার শ্রীকৃষ্ণ দিয়াছিলেন—

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ
সংযতেন্দ্রিয়ঃ।"

চাই নিজের উপর বিশ্বাস, দৃঢ় সংকল্প, একাগ্রতা ও ইন্দ্রিয়সংযম।

স্বামীজী বলিতেন: 'মনের একাগ্রতা হইলেই সকল শক্তি স্ফুরিত হয়।' সুতরাং মনকে ধীরে ধীরে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে হয়। সুপ্ত অনন্ত শক্তি জাগাইবার উপায়—সত্যপালন, সংযম ও একাগ্রতা।

যেমন শারীরিক ব্যায়াম না করিলে পূর্ণ স্বাস্থ্যের প্রাণপ্রদ স্পর্শ অনুভূত হয় না, তেমনই স্বামীজীর নির্দেশিত পথে অভ্যাস না করিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইবে না, শুধু কথায়ই থাকিয়া যাইবে। এই আত্মোপলব্ধি বা নিজের আসল রূপের মহিমার দিব্যানুভূতি যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহারাই ব্যক্তিস্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডী পার হইয়াছেন। সেই অসীম আত্মস্ফূর্তির এমনই গুণ যে, সে-অবস্থায় আত্মা স্ববলে বিশ্বযজ্ঞে আপনাকে আহুতি দিয়া থাকে। বিবেকানন্দ আত্মার সেই পরিপূর্ণতা-প্রাপ্তিকেই প্রকৃত individuality বা স্বরূপ-মহিমা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আজ ধর্মকে মনুষ্যত্ব-বিকাশের পরিপন্থী বলিয়া যাঁহারা ঘোষণা করেন, তাঁহাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিই ইহার মূলে বর্তমান। ধর্ম আনিয়া দেয় সেই অখণ্ড মানবতার বোধ, যাহার ফলে আমরা বলিতে পারি, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

স্বামীজী যখন ঘোষণা করিলেন:

'The only God in Whom I believe is the sum-total of all souls and above all I believe in my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races.' তাঁহার এই আধ্যাত্মিকভাবসমৃদ্ধ বাণী হইতে আমরা বর্তমানকালোপযোগী উদার সাম্যবাদের পরিচয় পাই না কি? দরিদ্রের পতিতের জন্য

এত বড় দরদী প্রাণ আর কাহার আছে? এই আলোকস্তম্ভ বর্তমান থাকিতে আমরা সাম্যবাদ অন্য কোথা হইতে শিখিতে যাইব? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করা যেমন বুদ্ধির স্বল্পতার পরিচায়ক, এই মহান্ বৈদান্তিক সাম্যনীতির সন্ধান পাইয়া পাশ্চাত্যের ধার করা জিনিস লইয়া গৌরব বোধ করাও তাই।

Eternal vigilance is the price of liberty.—এই সঙ্গে কর্মজীবনে আমাদের মনে রাখিতে হইবে স্বামীজীর সতর্ক বাণী ও অমোঘ নির্দেশ। 'চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য সাধিত হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহা-বীর্যের দ্বারা মহৎ কাজ হইয়া থাকে।' স্বামীজীর এই বাণী দেশপ্রেমিক, দেশসেবায় নিয়োজিত যুবসম্প্রদায় যেন সর্বদা স্মরণ রাখেন। বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত যুগধর্ম যেন তাঁহাদের জীবনে মূর্ত হয়—ইহাই প্রার্থনা। এভাবেই সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করিতে আমরা সক্ষম হইব।

আজ শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য আবির্ভাবফলে জগতে ভারতীয় সংস্কৃতির জয়যাত্রা শুরু হইয়াছে; যদিও তাহা এখনো বিরাট রূপ পরিগ্রহ করে নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে করিবেই।

ভারতের যুবসম্প্রদায়! ভারতের যুগ-যুগ-সঞ্চিত অমূল্য সম্পদের উত্তরাধিকারী তোমরাই, অমৃতের পুত্র তোমরা। স্বামীজীর অমোঘ বাণী বিশ্বাস কর, ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লইবেই। তোমাদেরই ত্যাগ, তপস্যা, বীর্যবত্তা একদিন এই বিরাট সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিবে। দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করিয়া নিজের অন্তরের গভীরতার দিকে, তোমার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত—আজিও জগতের সর্বোচ্চ—চিন্তারাশির দিকে ফিরিয়া তাকাও এবং 'তোমার নিজের কল্যাণের জন্য, তোমার দেশের কল্যাণের জন্য, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য' উহাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে সচেষ্ট হও। 'ওঠ, জাগো, লক্ষ্যলাভের আগে থামিও না'—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

"সব শক্তি তোমাদের ভিতর রহিয়াছে, তোমরা সব করিতে পার।"

"একটা মানুষ যদি তৈরী হয় তো লাখ বক্তৃতার কাজ হবে।"

"জগতের সমুদয় ধনরাশির চেয়ে মানুষ হচ্ছে বেশী মূল্যবান।"

"চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

মহাপ্রভুর ভাবধারা ও বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামী

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত

এই ভাবের অলৌকিকত্বকে বৃন্দাবনের গোস্বামিগণও যে নতমস্তকে স্বীকৃতি দিয়েছেন তার পরিচয়ও তাঁদের রচনায় চিহ্নিত হ'য়ে আছে। কিন্তু প্রসঙ্গতঃ এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, বৃন্দাবনের চৈতন্যভক্তগণ কেবল রাধা-ভাবে ভাবাবিষ্ট চৈতন্যদেবকে দেখতেই অভ্যস্ত ছিলেন, এবং এইখানেই তাঁদের তত্ত্বদৃষ্টিরও উন্মেষ ঘটেছে। সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামী তিনজনই তাঁদের রচনায় শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণরূপী ভগবান ব'লে অভিহিত করেছেন। তাঁদের ভক্তির অঞ্জলি চৈতন্যপাদপদ্মে অপরিসীম আনন্দানুভূতির সঙ্গেই অর্পণ করেছেন। তবে উপাস্য করেছেন তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে। তাঁদের বন্দনার কয়েকটি শ্লোক আলোচনা করলেই তাঁদের সাধনা ও মানসানুভূতির স্বরূপটিকে আমরা দেখতে পাবো।

সনাতন গোস্বামী 'বৃহদ্ভাগবতামৃতে'র মঙ্গলা-চরণে শ্রীচৈতন্যের বন্দনা করেছেন এইভাবে—

নমঃ শ্রীগুরুকৃষ্ণায় নিরুপাধিকৃপাকৃতে।
যঃ শ্রীচৈতন্যরূপোঽভূৎ তন্বন্
প্রেমরসং কলৌ॥

—কলিতে প্রেমরস দান করার জন্য দেহরূপে যিনি শ্রীচৈতন্য হ'য়ে দেখা দিয়েছেন, সেই অহেতুক করুণাময় শ্রীকৃষ্ণরূপ গুরুকে নমস্কার।

ঐ গ্রন্থেরই তৃতীয় শ্লোকে সনাতন আবার বলেছেন,—

স্বদয়িতনিজভাবং যো বিভাব্য স্বভাবাৎ
সুমধুরমবতীর্ণো ভক্তরূপেণ লোভাৎ।
জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা
হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ॥

যিনি নিজভাব থেকে স্বীয় ভক্তগণের নিজের প্রতি ভাব আলোচনা ক'রে সেই ভাবের প্রতি লোভহেতু অপরূপ ভক্তরূপে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই স্বর্ণকান্তি সন্ন্যাসিবেশী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক শ্রীহরি শচীনন্দনের জয়।

রূপ গোস্বামী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে চৈতন্য-দেবের মহিমা প্রচার করেছেন। তাঁর 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু'র প্রথমেই যথার্থ ভক্তিময় নিষ্ঠার সঙ্গে রচিত চৈতন্য-বন্দনার যে শ্লোকটি দেখা যায়, তাতে চৈতন্যদেব স্বয়ং হরিরূপেই তাঁর কাছে দেখা দিয়েছেন :

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্তিতোঽহং
বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য॥

—আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র হ'য়েও যাঁর প্রেরণা হৃদয়ে গ্রহণ ক'রে এই গ্রন্থের রচনাকর্মে প্রবর্তিত হয়েছি সেই চৈতন্যদেব শ্রীহরির পাদপদ্ম বন্দনা করি।

'বিদগ্ধমাধবে'র নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে রূপ গোস্বামী চৈতন্যদেবের প্রশস্তি রচনা করতে গিয়ে যেমন অপরূপ কবিত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তেমনি তাঁকে হরিরূপেও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন :

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

—বহুকাল যাবৎ যা দেওয়া হয়নি, সেই উন্নত উজ্জ্বল রসে-ভরা নিজের সেই ভক্তিসম্পদ দান

করবার জন্য যিনি অশেষ কৃপায় কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন, সুবর্ণ অপেক্ষাও অপূর্ব দ্যুতি-সম্পন্ন সেই শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়-কন্দরে পরিস্ফুট হোন।

আর জীব গোস্বামীর বন্দনায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চিন্তামণি ও পূর্ণ-শুদ্ধ রসবিগ্রহস্বরূপ :

নাম চিন্তামণি: কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহ:।
পূর্ণশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনো: ॥

তিনি আরও বলেছেন, কলির মালিন্যযুক্ত সর্ব-ভাবহীন জীবকে উদ্ধার করবার জন্যই করুণা-ধাম রসপুরুষ শ্রীহরি গৌরাঙ্গদেব পরিজন দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে নবদ্বীপধামে আবির্ভূত হয়েছেন।[৪]

তিনি 'সর্বসংবাদিনী'তেও চৈতন্যনামধারী শ্রীভগবানকে কলিযুগে বৈষ্ণবগণের একমাত্র উপাস্য ব'লে নির্ণয় করেছেন।

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বন্দনায়ও সেই একই ভাব ও সুরের প্রতিধ্বনি শোনা যায় :

হরি: দৃষ্ট্বা গোষ্ঠে মুকুরগতমাত্মানমতুলং
স্বমাধুর্যং রাধাপ্রিয়তরসখীবাপ্তমভিত:।
অহো গৌড়ে জাত: প্রভুরপরগৌরৈক-
তনুভাব
শচীসূনু: কিং মে নয়নশরণীং
যাস্যতি পুন: ॥

—যিনি গোষ্ঠে দর্পণে নিজের অনুপম দেহমাধুর্য দেখে রাধাভাবে তা আস্বাদন করবার জন্য শ্রীরাধার শুভ্রকান্তি গ্রহণ ক'রে গৌড়দেশে জন্মগ্রহণ করলেন, সেই শচীনন্দন শ্রীহরি কি আমার নয়নপথের পথিক হবেন?

৪ বন্দে শ্রীগৌরচন্দ্রং রসময়পুরুষং ধাম কারুণ্যরাশে-
র্ভাবং গৃহ্নন্ রসস্থিতুমিহ শ্রীহরিং রাধিকায়া:।
উদ্ধর্তুং জীবসঙ্ঘান্ কলিমলমলিনান্
সর্বভাবেন হীনান্
জাতো যো বৈ সুধাপ: পরিজননিকরৈ:
শ্রীনবদ্বীপমধ্যে।

শ্রীচৈতন্য তাঁর জীবনের আচরণ দিয়ে যে-অধ্যাত্মচিন্তার দ্বার সকলের সম্মুখে উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন, তাতে প্রেমের দিকটিই একান্ত হ'য়ে দেখা দিয়েছিল; তাই বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ ভাগবত এবং রাধাকৃষ্ণকে উপজীব্য ক'রেই শাস্ত্রগ্রন্থরচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। ভাষাও নিলেন তাঁরা সংস্কৃত; নবদ্বীপ ও তার আশেপাশের চৈতন্যপরিকরদের মতো বাংলা ভাষাকে তাঁদের মধ্যে কেউ গ্রহণ করলেন না। তা ছাড়া, ধর্মীয় সাধনার বেদীভূমিতে শ্রীচৈতন্যের অন্তত: তিন চার শ' বৎসর পূর্ব থেকেই রাধাকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সেই-জন্যও রাধাকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে তাঁরা কেবলমাত্র চৈতন্যদেবকে উপাসনার উপেয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারলেন না। গোস্বামিগণ শ্রীগৌরাঙ্গের নীলাচললীলাকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই প্রত্যক্ষদৃষ্ট লীলার কথাই তাঁরা স্তবরচনার সময় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের ভিত্তিটি যখন তাঁরা গ'ড়ে তোলেন, তখন বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা এবং কৃষ্ণলাভের উপায়কেই প্রগাঢ় ভক্তির সঙ্গে বিধিবদ্ধ করতে চেয়েছেন। সনাতনের 'বৃহৎ ভাগবতামৃতে', রূপগোস্বামীর অলংকারের পটভূমিকায় কৃষ্ণলীলার রসচর্যামূলক গ্রন্থ-গুলিতে, এবং জীবগোস্বামীর 'ষট্‌সন্দর্ভ' ও বিভিন্ন টীকায় এই দিকটারই একান্ত সমর্থন পাওয়া যায়। গোপাল ভট্টের নামে প্রচারিত 'হরিভক্তিবিলাসে'ও কৃষ্ণপ্রাপ্তিরই উপায় নির্ধারিত হয়েছে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে সনাতন নিজেই ঐ গ্রন্থটি সংকলন ক'রে আত্মপ্রচারবিমুখ গোপাল ভট্টের নামে প্রচার করেছিলেন[৫] গৌড়ীয় বৈষ্ণব অধ্যাত্ম-

৫ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস—(পূর্বার্ধ) ৪র্থ সংস্করণ : ডঃ সুকুমার সেন। পৃঃ ৩০৮

চিন্তাকে একটি ব্যাপকতর দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করার সব চেয়ে বেশী কৃতিত্ব জীবগোস্বামীর। কৃষ্ণলাভের উপায়স্বরূপ মানব-মনের ভক্তি ও প্রীতিকে কিভাবে পঞ্চম পুরুষার্থের স্তরে উন্নীত করা যায়, তারই দিক নির্দেশ করেছেন তিনি তাঁর ছয়টি সন্দর্ভে। রঘুনাথ ভট্ট কোনো গ্রন্থ লিখেছিলেন কি না জানা যায় না; তবে তিনি ভাগবতপাঠের একটি নূতন ধারা প্রবর্তন করেছিলেন। সনাতনের ভাগবতের টীকা 'বৈষ্ণবতোষণী'র আনুগত্যে এই রঘুনাথ তাঁর সুমধুর কণ্ঠে ভাগবত ব্যাখ্যা করতেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁর 'দানকেলি চিন্তামণি' গ্রন্থটি প্রেম-সাধনার বিবৃত রূপ হিসেবেই রচনা করেছিলেন মনে হয়। অপর দিকে, আমরা পূর্বেই বলেছি, নবদ্বীপের পরিকরগণ একমাত্র গৌরাঙ্গপারম্যবাদ গ্রহণ ক'রে কেউ কেউ নাগরীভাবের সাধনায় আত্মমগ্ন হয়েছিলেন। এ কথা ঠিক যে, তাঁরা বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মতো সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গকে কেউ গ্রহণ করতে চাননি। মনে হয়, চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস তাঁদের প্রত্যেকের পক্ষেই একটি অসহনীয় দুঃখের ব্যাপার হয়েছিল। এইখানেই বৃন্দাবনের গোস্বামী ও নবদ্বীপ-পরিকরগণের মধ্যে আদি পার্থক্য ব'লে মনে করি। তা'ছাড়া গৌড়-ভক্তগণ এক এক জনকে পূর্বজন্মের দৈবত সূত্রে বেঁধে দিয়ে শ্রীচৈতন্যলীলার প্রাধান্যকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে এই দুই মতবাদের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য-বিধান করতে চেয়েছিলেন, এবং বেশ কিছুটা সফলকামও হয়েছিলেন। তবে এ আমাদের মানতে হ'বে যে, নবদ্বীপের ভক্তগণ কৃষ্ণজ্ঞানেই চৈতন্যদেবকে পূজা করতেন। এদিক দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যেন চিরকালের একটি নির্ঝরস্বরূপ (eternal spring)। বৃন্দাবন এবং নবদ্বীপ,—ভারতের এই দু'টি অংশের ভক্তহৃদয়গুলিকেই শ্রীকৃষ্ণের স্বমহিমার মাধুর্য-ধারায় যেন সিঞ্চিত ক'রে রেখেছিলেন। কিন্তু এ-কথাও আমাদের ভাবতে হ'বে যে, নবদ্বীপে সহজিয়া সাধনার ধারা চৈতন্যদেবের জীবৎকালেই প্রবর্তিত হ'য়েছিল এবং এই সূত্র ধরেই মনে হয় স্বকীয়া ও পরকীয়া-সাধনার দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। জীব গোস্বামী পরে স্বকীয়া-তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করতেও দ্বিধা করেননি। বৈষ্ণব পদাবলী তো পরকীয়া-তত্ত্বেরই ছন্দ-মধুর রসরূপ ছাড়া আর কিছু নয়। স্বকীয়া ও পরকীয়ার দ্বন্দ্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্তও বিস্তৃত হয়েছিল দেখতে পাই। মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে বাঙালী কবি বৈষ্ণব-ভক্ত সুপণ্ডিত রাধামোহন ঠাকুর পরকীয়া-তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং তাতে সফলকামও হয়েছিলেন।

সব চেয়ে বড় দ্রষ্টব্য এই যে, বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ দার্শনিক ভিত্তিতে একটি ধর্মমতকে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে বলেই আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করতেন; কারণ তাঁরা জানতেন, শ্রীকৃষ্ণ এবং ভাষা সংস্কৃত না হ'লে তাঁদের ধর্মমত সর্বভারতীয় গুরুত্ব লাভ করতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, —'চৈতন্যকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাঁহারা কৃষ্ণলীলা-স্মরণেও কৃষ্ণ-উপাসনার ব্যবস্থা দিলেন, এবং চৈতন্যলীলা-বর্ণনায় ও চৈতন্যপূজার দিক দিয়া গেলেন

না। এই কারণে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের শাস্ত্র ও অনুশাসন—

আসিন্ধু নদীতীর আর হিমালয়
বৃন্দাবন মথুরাদি যত দেশ হয়

সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।'[৬]

বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের প্রচেষ্টায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের এই ভারতব্যাপী বিস্তৃতি সত্ত্বেও গৌড়দেশীয় বৈষ্ণবগণ কোনরূপ দার্শনিক চিন্তার দিক দিয়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি, কেবল অন্তরের নির্মল ভক্তিরসধারায় অভিষিক্ত করতে চেয়েছেন তাঁকে।

ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ তাঁর 'চৈতন্য-চরিতামৃতের ভূমিকা'র অন্তর্গত 'ভজনাদর্শ—গৌড়ে ও বৃন্দাবনে' নামক প্রবন্ধে উভয় স্থানের ভক্তগণই যে চৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণের ভজনাদর্শে আস্থাবান ছিলেন, তাই সপ্রমাণ করতে চেয়েছেন। এতে দ্বিমত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু তত্ত্বাদর্শ-প্রতিষ্ঠায় বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ যে-পথে পদচারণা করেছেন, তাতে এ-কথা আমাদের বলতেই হ'বে যে, কৃষ্ণকেন্দ্রিক উপাসনাকেই তাঁরা জীবনে ও মননে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন। জীবগোস্বামী 'হরিনামামৃতব্যাকরণ' রচনা করেছিলেন, কিন্তু চৈতন্যনামামৃতব্যাকরণ রচনা করেননি। তবে প্রসঙ্গতঃ এইটুকু বলা যায় যে, উভয় দলের অন্তরের গভীরে চৈতন্যদেব সমান শ্রদ্ধার সঙ্গেই বিরাজ করতেন; এবং এইজন্য একদলের সঙ্গে অন্যদলের কোনোরূপ মতবিরোধের সূত্রপাত হয়নি।

কিন্তু এ আমাদের মনে রাখতে হ'বে যে, বৃন্দাবনের গোস্বামীদের এই রাধাকৃষ্ণকেন্দ্রিক উপাসনার ধারাটিই খুব একটা সুদূরপ্রসারী রূপ লাভ করেছিল।

---

৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (পূর্বার্ধ) ৪র্থ সংস্করণ: ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ-৩১৬

গুরু নানকের জন্মদিনে

শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

হে ঋষি, হে মহাপ্রাণ
জনমের শুভ ক্ষণে
স্মৃতি সম তব জ্ঞান ও কর্ম
উড়াক জয়নিশান।
সত্য পথের পরিচয় দিলে
সাম্যের জয়গানে
হাত মিলাইতে শিখায়েছ তুমি
হিন্দু-মুসলমানে
আমাদের মাঝে তোমার আশিস
আজো গাহে জয়গান
হে ঋষি, হে মহাপ্রাণ।

যা দিয়েছো তুমি
তুলনা নাহি যে তার;
কি দিব তোমার
পায়ে পূজা উপচার—
শুধু মিনতি জানাই তোমার চরণে
মিলনের সুর বাজে যেন মনে
সবাকার প্রাণ পরশে যে সুর—
যুগে যুগে অম্লান,
হে ঋষি, হে মহাপ্রাণ!

রাজগৃহ

স্বামী সুত্রানন্দ

রাজগৃহের অধুনাতন নাম রাজগীর। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাম গিরিব্রজ, বসুমতী, বাগমতী, বার্হদ্রথপুর ও বিম্বিসার-পুরী—বৌদ্ধসাহিত্যে রাজগৃহ এবং জৈন-সাহিত্যে কুশাগ্রপুর ও বৃষরপুর। রাজগৃহ নামের উপর তিনটি মত প্রচলিত। রাজার গৃহ—তাই নাম হয়েছে রাজগৃহ। অন্যমতে পর পর বহুবংশীয় রাজগণ এখানে বহুকাল বাস করে রাজ্য শাসন করেন, এজন্য ইহাকে বলে রাজগৃহ। পুরাণে আছে, মগধরাজ জরাসন্ধ এখানে ১০৮ জন বিজিত রাজাকে একটি ঘরে বন্দী করে রাখেন, এজন্যই নাম হয়েছে রাজগৃহ। গিরিব্রজ অর্থাৎ পাহাড়ে তৈরী দুর্গ। ইহা এমন একটি সুবিস্তৃত সমতলভূমি, যার চারদিক ৬টি উচ্চ পাহাড়ে পরিবেষ্টিত। বসুমতী, বাগমতী, বার্হদ্রথপুর ও বিম্বিসারপুরী বিভিন্ন রাজার নামানুকরণে বিখ্যাত। হিউয়েঙচঙ্ বলেছেন—এইস্থানে সুগন্ধিজাতীয় একপ্রকার কুশ (খশ খশ) প্রচুর উৎপন্ন হ'ত, তাই নাম হয়েছে কুশাগ্রপুর।

আজকাল যোগাযোগ-ব্যবস্থার কল্যাণে রাজগীর যাতায়াত অতি সহজ। কলকাতা-পাটনা রেললাইনের বখ্তিয়ারপুর জংশন থেকে শাখা লাইনে মাত্র ৩৩ মাইল দক্ষিণে রাজগীর স্টেশন অবস্থিত। তাছাড়া বিহারের যে-কোন বড় শহর থেকে বাসে কিংবা ট্যাক্সিতেও যাওয়া যায়। টুরিস্ট বাসও আছে—পাটনা থেকে খাওয়া-দাওয়া সহ প্রতি টিকিট ১৮·০০ এবং খাওয়া ছাড়া মাত্র ১৩·০০। পৌঁছে থাকারও অসুবিধা নেই—ডর্মিটরী, ডাকবাংলো, টুরিস্ট লজ, ধর্মশালা, যুবক-ছাত্রাবাস, বিভিন্ন আশ্রম, পাণ্ডাদের বাড়ী ও হোটেল সবই আছে।

রাজগীর নালান্দা তথা মগধের ইতিকথা বলেছেন পুরাতত্ত্ববিদ স্যার জন মার্শাল, হিউয়েঙ্চঙ্, ফাহিয়েন, ডঃ রমেশ মজুমদার, বেণীমাধব বড়ুয়া, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তারানাথ প্রভৃতি। আজ বলা যায়, প্রাচীন আর্য সভ্যতার চেয়ে আর্যেতর সভ্যতা বেশী হীন ছিল না। রাজা রাবণ, মগধের জরাসন্ধ, প্রাগ্জ্যোতিষপুরের ভগদত্ত এবং গয়াসুর প্রভৃতি কেহই আর্যবংশসম্ভূত নন। এঁদের সভ্যতা সংস্কৃতির জ্ঞান ছিল উচ্চস্তরের। রাজধানী লঙ্কার সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। মগধরাজ জরাসন্ধ অত্যন্ত সাহসী ও পরাক্রমশালী ছিলেন। ৮৬টি দেশ তাঁর অধীনে ছিল। সে সময় সকল রাজা তাঁকে সম্ভ্রম ও ভয় করে চলতেন। জরাসন্ধ সমস্ত রাজ্য প্রভু শিবের নামে উৎসর্গ করে নিজে তাঁর সেবায়ত হিসাবে রাজকার্য পরিচালনা করতেন।

ধার্মিক রাজা বিম্বিসার সকল ধর্ম-সম্প্রদায়-কেই যোগ্য সম্মান প্রদান করতেন; তাঁর রাজত্বে বিশাল রাজগৃহে রাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিধিব্যবস্থাও ছিল গৌরবের উচ্চ শিখরে—সুখসমৃদ্ধিতে প্রজাপুঞ্জ ছিল পরিপূর্ণ। অজাতশত্রুর রাজত্বে রাজ্যের লোকসংখ্যা ছিল ১৮ কোটি। তিনি বৌদ্ধধর্মকে রাজধর্মে স্বীকৃতি দান করেন। বর্তমান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্য জগৎ মেলাকে

প্রচারের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছেন। খৃঃ পূঃ ৫০০ বৎসর পূর্বেই রাজা বিম্বিসার ও অজাতশত্রু তার প্রচলন করেন। সেই মেলাকে 'সমাজ' বলা হ'ত। তাতে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কলা, নৃত্য-গীত কিছুরই অভাব ছিল না। নিকটস্থ পুরান কীর্তির দ্রষ্টব্যস্থল গিরিয়াক গ্রামে এখনও প্রতি বৎসর কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে সেই অনুযায়ী বড় মেলা হয়। বৌদ্ধধর্ম মহাসম্মেলনীর প্রথানুযায়ী আজও বিখ্যাত বেণুবনে প্রতি ৩ বৎসর অন্তর মলমাসে বৃহৎ মেলার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ইহা একমাসব্যাপী স্থায়ী হয়। লক্ষ লক্ষ লোক সেই মেলায় যোগদান করে থাকেন। শোনপুরের হরিহরছত্রের মেলার পর এই মেলাই বিখ্যাত।

আর্যেতর ধর্মনীতি, রাজনীতি, বিদ্যাচর্চা, বাণিজ্য ও শিল্পকলার নিদর্শন মহেঞ্জদরো, হরপ্পা, তক্ষশীলা ও রাজগৃহ। প্রাচীনতম প্রত্নতত্ত্বের প্রথম তিনটি বর্তমানে বিদেশ—যাতায়াত কঠিন। একমাত্র রাজগৃহ ভারতে। এই রাজগৃহ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। ভারতীয় সংস্কৃতিতে এর দান অফুরন্ত, প্রাগৈতিহাসিক—প্রাগার্য* যুগেও ইহা সমৃদ্ধ ছিল, কিন্তু ষোলকলায় পূর্ণ হয় রাজা বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর রাজত্বে। গুপ্তযুগ ও পালযুগ পর্যন্ত তা অক্ষয় থাকে। রাজগীর যে শুধু প্রাগার্য যুগের ও বৌদ্ধজগতের গৌরব-পতাকা বক্ষে ধারণ করে দণ্ডায়মান তা নয় - জৈনধর্ম এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের উজ্জ্বল মহিমাও তার ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। জৈন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়—চব্বিশজন তীর্থঙ্করের প্রত্যেকেই এই রাজগৃহের বিভিন্ন পাহাড়ে বিভিন্ন সময়ে তপস্যাদি করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। ২০তম তীর্থঙ্কর মুনি সুব্রতের জন্মস্থানও এখানে। মহাবীরও এখানকার বিপুলগিরিতে ধর্মপ্রচার করেন এবং তাঁর ৩২ বৎসর সন্ন্যাস-জীবনের মধ্যে এই পবিত্র রাজগৃহেই উদ্‌যাপন করেন দীর্ঘ ১৪টি চাতুর্মাস্য ব্রত। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে প্রধান ১১ জনের মরদেহ এখানে পরিত্যক্ত হয়। আলো-আঁধার, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য পাশাপাশিই থাকে। একটি না থাকলে অন্যটির মর্যাদা বুঝা দায়। জটিলা-কুটিলা, জগাই-মাধাই না থাকলে লীলা-পোষ্টাই হয় না। রাজগৃহের গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত রূপের পাশেই একটি কলঙ্কিত চিত্রও বিদ্যমান। বৌদ্ধধর্মের বিভেদ ঘটে এই রাজ-গৃহেই। বুদ্ধদেবের বিশিষ্ট শিষ্য এবং পূর্বাশ্রমের জ্ঞাতিভ্রাতা দেবদত্ত মতবিরোধ হওয়ায় অন্য সংঘ গঠন করেন। আর দেবদত্ত শুধু এখানেই ক্ষান্ত হননি, বুদ্ধদেবকে নিহত করা্ইবার চেষ্টাও করেন। সেই কুখ্যাত স্থানটির নাম মদকুক্ষি

অনেক সাধনা-সংস্কৃতি ও বৈভবের কাহিনী রাজগীরে সময়ের অপেক্ষায় আবদ্ধ ছিল। আজ তারা মুক্ত। ৮।১০ মাইল দূর থেকেই দেখছি আকাশে হেলান-দেয়া কালো পাহাড়-শ্রেণীর শিখরে বসে সাদা মন্দিরগুলি হাতছানি দিচ্ছে—পথিক এসো, কত যুগ-যুগান্তর ধরে কত পুরাণ, কত ইতিহাস বক্ষে ধারণ করে বসে আছি; এসো, দেখো—তৃপ্ত হও। এখন স্টেশনে নেমেই মনে হল, আহা! কত মহা-পুরুষ—সাধুসন্ত এখানে চিরশান্তি লাভ করেছেন!

* আর্যগণ বাহির হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন অথবা ভারত হইতেই বাহিরে গিয়াছিলেন, তাহার সঠিক কোন প্রমাণ এখনো পাওয়া যায় নাই। ঐতিহাসিকগণ অনুমান-সহায়ে এ বিষয়ে এখনো দ্বিমত। —সঃ

রাজগীর একদিনে দেখে শেষ করা যায় না। অন্ততঃ পক্ষে সাতটি দিনের প্রয়োজন। রেলস্টেশন এবং বাসস্টেশনের পূর্বদিকে রাজগীর বাজার ও গ্রাম। রাস্তার ডানদিকে দিগম্বর জৈন ও বাঁদিকে শ্বেতাম্বর জৈন মন্দির। এদিক সেদিক বাড়ীঘর, আশ্রমাদি, থানা ও হাসপাতাল। বাজার থেকে পুরান রাজপথ এবং স্টেশন থেকে আর একটি পথ সোজা দক্ষিণে দেড় মাইল গিয়ে একত্র হয়ে পাহাড়ে পাদদেশে পৌঁছেছে। এই দেড় মাইলের মধ্যে এক মাইল পর্যন্ত ছিল নূতন রাজগৃহ; বাকী আধ মাইল বেণুবন। বৌদ্ধশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ টীকাকার বুদ্ধ-ঘোষ বলেছেন, রাজগৃহ রাজা মান্ধাতা কর্তৃক স্থাপিত। হিউয়েঙ্‌চাঙ্‌ বলেছেন—নূতন রাজগৃহ তৈরি করেছিলেন রাজা বিম্বিসার; কিন্তু ফাহিয়েন বলেছেন, রাজা অজাতশত্রু। হিউয়েঙ আরো বলেছেন—কুশাগ্রপুরে প্রায়ই আগুন লাগত। অনেক বাড়ীঘর পুড়ে গিয়ে নগর অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত। বিম্বিসার আইন জারি করলেন যে, যার বাড়ীতে আগুন লাগবে, তাকে নগরের বাইরে গিয়ে বাস করতে হবে—ভেতরে স্থান হবে না। দৈবক্রমে একবার রাজপ্রাসাদেই অগ্নিকাণ্ড হয়ে গেল। তাই রাজা আইন-শৃঙ্খলা ও ন্যায়-নীতি রক্ষার্থে স্বয়ং নগরের বাইরে চলে গেলেন ও নূতন রাজগৃহের পত্তন করলেন। হিউয়েঙচাঙ-এর সময়ও নূতন রাজগৃহে বড় বড় অট্টালিকা ছিল। এখন শুধু উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ—আছে মাত্র চারদিকে প্রাচীরের পরিচয়। এক পাশে গুপ্তি মহা-রাণীর ছোট্ট একটি মন্দির আছে—আর আছে একটি শিবলিঙ্গ; পূজা হয়। প্রাচীর দেখলে সত্যি মনে হয় এ কাজ দৈত্য-দানব ছাড়া মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর স্তরে স্তরে সাজিয়ে চুন-সুরকি ছাড়াই ইহা নির্মিত। দেয়ালটির দৈর্ঘ্য ৩ মাইল এবং প্রশস্ত ১০।১২ ফুট। প্রায় দেড়শ' ফুট দূরে দূরে এক একটি স্তম্ভ। দেয়ালের এক একটি পাথর ৫ ফুট-৭ ফুট।

প্রাচীরের ও রাস্তার পূর্বদিকে আধুনিক সাজসজ্জায় সজ্জিত বার্মীজ বৌদ্ধ মন্দির। তার দক্ষিণে রাস্তার পাশেই ভগবান বুদ্ধের স্তূপ। এই পূতাস্থির স্তূপ রাজা অজাতশত্রু কর্তৃক নির্মিত। কুশলে চিতাভস্ম চুরি হয়ে গেলে রাজা এখানে এই ভাবে সুদৃঢ় স্তূপ নির্মাণ করেন। পূর্বদিকে জাপানীদের মন্দির। ইহা বর্তমান কালে তৈরী। দ্বিতল বাড়ী, সম্মুখে ফুলের বাগিচা। উজ্জ্বল ধাতু-মূর্তিটি অতি অপূর্ব। এই মন্দিরের পিছনে পর্বতগাত্রে দেখা যায় মখদুম কুণ্ড, মখদুম গুহা, মসজিদ, কয়েকটি সরাইখানা ও বাড়ীঘর। গৌতম বুদ্ধ এই গুহায় প্রথমবার এসে বাস করেন। দেবদত্তও এখানে তপস্যাদি করেন এবং দেহ-রক্ষা করেন। অনেক কাল পরে বিহার-শরিফের একজন ফকির মখদুম শাহ এখানে এসে তপস্যাদি করেন। তারপর থেকেই স্থানটি মুসলমান অধিকারে আসে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই কুণ্ডের নাম ছিল ঋষ্যশৃঙ্গ কুণ্ড। স্থানটি অতি মনোরম। পাহাড়ের নীচে সবুজ বনরাজিতে চারিদিক আবরিত। কুণ্ডের জল গরম—তিনটি ধারায় বহির্গত। মুসলমান যাত্রিগণ এখানে স্নান-দান করেন। বখতীয়ার খিলজী ও পুত্র মহম্মদ যখন রাজগৃহ তথা মগধ অধিকার করেন ও ধ্বংস করেন, তখনই রাজ-গৃহের ধর্ম, সংস্কৃতি, শিল্পকলার অবনতি ঘটে। বুদ্ধস্তূপ, বেণুবন, জাপানী মন্দির, জরাসন্ধকী বৈঠক প্রভৃতির এধার ওধার যেসব কবরখানা দেখা যায় সেগুলিতে এবং মসজিদে সে ধ্বংসের স্বাক্ষর আজও রয়েছে।

রাজপথের উপর প্রকাণ্ড বটগাছ—নাম ধুনিবট। গাছ সুন্দর। সমানভাবে চারদিকে বিস্তারিত। গোড়াটি প্রশস্ত করে বাঁধানো। নিদাঘের খরতাপে হাজার হাজার লোক এর শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। কোন পর্ব-উপলক্ষে বা মেলায় বহু লোক খাওয়া থাকা এবং রাত্রি যাপন করেন। প্রবাদ আছে, কোন সাধুর ধুনির কাঠগুলি থেকেই নাকি বটগাছটি উদ্ভূত হয়ে তীর্থযাত্রীদিগকে ছায়া দান করতে থাকে। সেজন্য নাম 'ধুনিবট'।

পশ্চিমে দেখতে পাবেন চমৎকার বাঁধানো একটি পুকুরকে কেন্দ্র করে উপবন তৈরী হয়েছে—সরকারী বাগান। চারপাশের অঞ্চল নিয়ে ছিল রাজা বিম্বিসারের সখের বেণুবন। পুকুরের পশ্চিম তীরে কালো পাথরের সুন্দর ও বড় বুদ্ধমূর্তি এবং উত্তর ধারে একটি আরো বড় শুভ্র মর্মরমূর্তি- শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত চন্দ্রাতপের নীচে। পুকুরটির চারধারে সুন্দর লাল মাটির রাস্তা ও ফুলের বাগিচা—মাঝে মাঝে দর্শনার্থীদের বিশ্রামস্থল। সে সময় রাজা বাগানের সীমানা বাঁশঝাড় দিয়ে সাজিয়েছিলেন - এজন্য একে বেণুবন বলে। পুষ্করিণীর নাম ছিল 'কলন্দ-নিবাত'। বিম্বিসার গুরু বুদ্ধদেবকে এ বাগান সমর্পণ করেন। বেণুবন বুদ্ধদেবের অতি প্রিয় ছিল। এখানে অনেক বিহার ও স্তূপ ছিল। বুদ্ধদেব এই সঙ্ঘারামে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার অনেকগুলি ত্রিপিটকে স্থান লাভ করেছে। সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের দেহরক্ষার পর তাঁদের ভস্মাবশেষের উপর স্তূপনির্মাণ হয় এখানেই। ভিক্ষু আনন্দের স্তূপও কাছেই ছিল। বেণুবনের পশ্চিমে ছিল শীতবন। আজকাল ফাঁকা মাঠ ও বাড়ীঘর। শীত-বনের পশ্চিমধারে একটি শ্মশান। একটি বৌদ্ধ স্তূপ আছে—খৃঃ পূঃ ২৭২ অব্দে তৈরী। ইহা সম্রাট অশোক কর্তৃক নির্মিত।

এবার আমরা সেই রাজপথে ফিরে আসি —পাহাড়ের পাদদেশে, যেখানে পুরান রাজ-গৃহের উত্তর দিকের প্রবেশপথ। ভেতরে বিশাল সমতলভূমি—জঙ্গলাকীর্ণ; কোথাও বা সরকারী বনানী। চারদিকে গিরিপ্রাকার। অর্থাৎ সত্যিই প্রকৃতিদেবী অতি পরিপাটিরূপে এই নগরীরক্ষার ভার গ্রহণ করেছিলেন। এইরূপ আরো তিনটি প্রবেশপথ আছে, তার বিবরণ আমরা পরে পাব। পর পর পাহাড়। নীচ থেকে আঁকা-বাঁকা পথ সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেছে সানুদেশে—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর জৈনদিগের শ্বেত মন্দিরের পাদমূল পর্যন্ত। দূর থেকে দেখতে বেশ সুন্দর। প্রবেশপথের ডাইনে ও বামে পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে দেউলের পর দেউল দণ্ডায়মান।

অনেকের ধারণা, রাজগীর ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও পুরাতত্ত্বের জন্য বিখ্যাত; এ কারণেই লক্ষ লক্ষ লোকের সেখানে যাতায়াত। কিন্তু আসলে তা অর্ধ-সত্য। বৌদ্ধ- ও জৈনধর্মাবলম্বীদের তো কথাই নেই, সমগ্র বিহারের জনসাধারণও সেখানে যায় কেবল তীর্থদর্শনমানসে—ঋষিনামাঙ্কিত কয়েকটি কুণ্ড আর বিভিন্ন দেবমন্দিরের আকর্ষণে। অবশ্য নালন্দায় যারা যায়, তারা মাত্র পুরাকীর্তি ও ঐতিহাসিক নিদর্শনের আকর্ষণেই যায়। রাস্তার এপাশ-ওপাশে দোকানপাট, পর্যটককেন্দ্র, হোটেল ও ছোট ছোট ঘর-বাড়ী। ডানদিকে (পশ্চিমে) বৈভারগিরি। গিরির পদপ্রান্তে সরস্বতী নদী প্রবাহিত। এখানে নদীর দু'কূল বাঁধানো। সুন্দর দু'টি সেতু নদীর উপর শোভাবর্ধন

করছে। ওপারে ৮।১০টি কুণ্ডে অনেকগুলি জলধারা। নাম শতধারা বা সাতধারা। তার মধ্যে ব্রহ্মকুণ্ড সমধিক বিখ্যাত। এটি উষ্ণ-প্রস্রবণ। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশ বসু দু'বার রাজগীর গিয়েছেন। কুণ্ডের জল পরীক্ষা করে তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং বিস্তৃত বিবরণও দিয়েছেন। সংক্ষেপে জলের গুণ এই যে—তাতে রেডিয়াম আছে। আরো আছে লোহা, তামা, গন্ধক। অনেক দুরারোগ্য রোগ এ জলে আরোগ্য হয়, বিশেষতঃ বাত বেদনা ও হজমের অসুখে অব্যর্থ। হাল আমলে এ জলের অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ১৯৫৪ সালে সরকার ও দানশীল ব্যক্তিগণ সেগুলো বাঁধিয়ে, চৌবাচ্চা তৈরি করে অতি সুন্দরভাবে ব্যবস্থাদি করেছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে ঐ ব্রহ্মকুণ্ডের উৎসমুখই খোলা আছে; অন্য দু'টি ঠাণ্ডা জলের ধারাও আছে—অতি ক্ষীণ। বাদবাকী সব একেবারেই বন্ধ। বহুশত লোক প্রতিদিন ব্রহ্মকুণ্ডের জলে স্নান ক'রে তৃপ্তি লাভ করেন। পূজা-অর্চনাও করে থাকেন। কুণ্ডের অগ্নিকোণে হংসতীর্থে ভগবান বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও গণেশ আছেন এবং দক্ষিণে বিষ্ণুর আর একটি মূর্তি। আর এক স্তর উপরে যজ্ঞকুণ্ড, শিব ও লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির। শ্বেত পাথরের লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তি অতি মনোমুগ্ধকর। এখানে উল্লেখ-যোগ্য, রাজগীরের সব মূর্তিই অপূর্ব কারুকার্য-খচিত—সৌন্দর্যময়! অবশ্য এসব দেবদেবীর মূর্তি অনেক পরের। কুণ্ড ও মন্দিরাদির উত্তরে-দক্ষিণে দু'টি অশ্বত্থবৃক্ষ—যাত্রীদের শীতল ছায়াদানে রত। তার উপরের স্তরে ধর্মশালা। স্থানটির সামগ্রিক রূপ অতি অপূর্ব! আরো একটু উপরে জরাসন্ধকী বৈঠক। পাথরে বাঁধানো চত্বর। রাজা জরাসন্ধের রাজত্বে ইহা নগররক্ষীদের ব্যারাক ছিল। পাশে বৈভার-গিরি চড়াইয়ের রাস্তা। সেখানে প্রাচীন ও আধুনিক ৬টি জৈন মন্দির। মন্দিরে রক্ষিত প্রাচীন মূর্তি অতি মনোহর—সুন্দর স্বর্গীয় চিত্রে চিত্রিত। এর মধ্যে অনেকগুলি খৃঃ পূঃ ৮ম ও ৫ম শতাব্দীর। খৃঃ পূঃ ৮ম শতাব্দীর নির্মিত একটি শিবমন্দিরও বিদ্যমান—ভগ্নাবস্থায়। গর্ভমন্দিরে শিবঠাকুর এখনও আছেন। অনেকের ধারণা এই প্রাচীন শিব আচার্য শঙ্করের কিংবা ৫ হাজার বৎসর পূর্বের জরাসন্ধের প্রতিষ্ঠিত। সুমুখে আছে প্রকাণ্ড নাটমন্দির—গ্রেনাইট পাথরের। চারদিকে সুরক্ষিত প্রাচীর। আরো আছে সন্ধ্যাদেবীর মন্দির, কেদারতীর্থ, গরম জলের নির্ঝর ও রাজকীয় উদ্যান। পর্বতচূড়ার দক্ষিণ পাশে হল—পিপ্পলি গুহা, সপ্তপর্ণী স্তূপ, সপ্তপর্ণী গুহা (১,১৪৭ ফুট)। পিপ্পলি গুহাতে বুদ্ধদেব, সারিপুত্র ও ভিক্ষু মহাকাশ্যপ বাস করতেন। গুহাটির মাপ ৮৫ ফুট থেকে ৮১ ফুট, উচ্চতা ২২ থেকে ২৮ ফুট। বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। তাতে কয়েকটি কুটির আছে। এখানে মুসলমানদের ৫টি কবরও আছে। আরো উপরে সপ্তপর্ণী গুহার সম্মুখে প্রথম বৌদ্ধধর্ম-সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এই মহা-সম্মেলনী অনুষ্ঠিত হয় বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের ছয় মাস পরে। সভাপতি ছিলেন মহাকাশ্যপ। গুহা ও মণ্ডপটি তৈরি করেন রাজা অজাতশত্রু। সুমুখে যে ঘর প্রস্তুত করা হয়, তাতে ৫০০ ভিক্ষুর স্থানসঙ্কুলান হ'ত। এই গুহাতে ৯টি কুটির। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ ত্রিপিটক প্রথম এখানেই রচিত হয় অনুমান খৃঃ ৫ম কিংবা ৬ষ্ঠ শতকে। গুহাটি পাহাড়ের অভ্যন্তরে কতদূর পর্যন্ত লম্বমান তা বলা শক্ত; বর্তমানে

আর কেহ প্রবেশ করতে পারে না। বুদ্ধদেব এখানে অনেকদিন বাস করেন এবং শিষ্যদের মধ্যে উপদেশ বিতরণ করেন। গুহার দ্বার-দেশ থেকে উত্তরে সুবিস্তৃত মাঠ, নদী-নালা ও সমতলভুমির মনোরম দৃশ্য দেখে তিনি প্রসন্ন হয়েছিলেন।

ডানদিকের বর্ণনা হ'ল, এখন প্রবেশপথের বাঁ-দিকের কথা। এই বিপুলগিরির পদতলেও সেইরূপ পাঁচটি কুণ্ডে গরম ও ঠাণ্ডা জলের ছয়টি ধারা বর্তমান। একটির নাম সূর্যকুণ্ড। এগুলির জলও খুব ভাল—রোগনিবারক। তা ছাড়া আছে ৮টি দেবদেবীর মন্দির, একটি স্তূপ ও একটি গুহা। মধ্যবর্তী অশ্বত্থবৃক্ষটি হ'ল ক্লান্ত ও শ্রান্ত যাত্রীদের বিশ্রামস্থল। জরাসন্ধকী বৈঠকের ন্যায় এপাশেও একটি প্রহরীদের ব্যারাকের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। গিরিতে (১,০৩৬ ফুট) উঠবার রাস্তাটি ইদানীং কালের তৈরী। আগাগোড়া সুন্দর সোপানা-বলীতে শোভিত। জৈনগণ প্রত্যেক পাহাড়ে এইভাবে রাস্তা ও মন্দির তৈরি করেছেন। সব পাহাড়ের উপর থেকেই চারদিকের সমতলের দৃশ্যাবলী অতি সুন্দর। গিরির উপরে একটি গণেশের ও একটি নবগ্রহের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। সানুদেশে আছে একটি বড় গুহা ও ৬টি আধুনিক জৈন মন্দির—বিভিন্ন তীর্থঙ্করদের।

এবার আমরা প্রাচীন নগরীর ভেতরে প্রবেশ করব। সুমুখেই শিখগুরুদ্বারা। ভোর ৪টা থেকে রাত্র ১১টা পর্যন্ত গ্রন্থসাহেব পাঠ করা হয়—উচ্চশক্তিসম্পন্ন মাইক্রোফোন সহযোগে। সেই পাঠের শব্দ বহুদূর পর্যন্ত শোনা যায়, একটি পবিত্র প্রভাব সৃষ্টি করে। রাজগীরকে সর্বধর্মসমন্বয়ের স্থান বলা যেতে পারে। ইতঃপূর্বে আমরা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও শিখ ধর্মের পরিচয় পেয়েছি। এছাড়া বৈষ্ণবপন্থী, কবীরপন্থী, উদাসী-সম্প্রদায় ও আজীবক সম্প্রদায় এখানে আছেন। আজীবক সম্প্রদায়ের গুরু গোশালের আগমন এখানে অনেকবার হয়েছে। অবশ্য আজ পর্যন্ত রাজগীরে খৃষ্টান ধর্মপ্রতিষ্ঠান যায়নি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রকৃতিদেবী ৬টি পাহাড়ের দ্বারা রাজগীরে দুর্গ নির্মাণ করেছেন। ঐ সব পাহাড়ের ওপর দিয়ে আবার মনুষ্য-নির্মিত বৃহৎ প্রাচীরও হয়েছিল। এখনও তার ধ্বংসাবশেষ আছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের দ্বারা তৈরী এই প্রাচীর। চুন-সুরকি ব্যতীত স্তরে স্তরে সাজিয়ে সুদৃঢ়-ভাবে ইহা গঠিত। দৈর্ঘ্য ৩০ মাইল, প্রস্থ ১৮ ফুট ও উচ্চতা ১২ ফুট। এই প্রাকার অতিক্রম করে পাহাড়ের নীচে পাওয়া যায় পরিখা বা খাদ। ইহাই পূর্বে সরস্বতী নদী ছিল। নগরের জলনিকাশের পথও ছিল এই নদী। তীরে এবং রাস্তার দুপাশে শ্মশান। বৈভারগিরির ধারে পাওয়া যায় ছোট ছোট কয়েকটি মন্দির। একটি হ'ল জরা রাক্ষসীর। বর্তমানে সেখানে মহিষমর্দিনীর মূর্তি দেখা যায়। অন্য একটি ধ্বংসাবশেষকে বলা হয় বলরামের মন্দির—মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। আরো এগিয়ে পাওয়া যায় সোনাভাণ্ডার। এই গুহাগুলির ভেতরের পাথর ভাল না হলেও সামনের গুলি এতই কঠিন ও মসৃণ যে, গোলা-বারুদেও নাকি তার কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে না। প্রবাদ, রাজা বিম্বিসারের ইহা স্বর্ণভাণ্ডার—গুপ্তধন আছে, নিকটস্থ দুর্বোধ্য শিলালেখ যে পাঠোদ্ধার করতে পারবে সেই অধিকার করবে এই লুক্কায়িত ধন। কিন্তু সে-লেখার নাকি উদ্ধার হয়েছে। অন্যান্য গুহার মত এখানেও

বহু মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে পুরাকালের বিষ্ণু, বুদ্ধ এবং ৪র্থ খৃষ্টাব্দে নির্মিত জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তি আছে। পুরাতত্ত্ব বিভাগ প্রমাণ করেছেন যে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায় একই গুহামন্দিরের সংস্কার সাধন করেছেন। প্রাচীন নগরীর বাঁ-দিকে প্রথমই বিপুলগিরি, পরে (মধ্যে) রত্নগিরি, তারপরে (দক্ষিণপ্রান্তে) গৃধ্রকূট বা শৈলগিরি। রত্নগিরিতে আছে ৪টি মন্দির—দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের। একটি প্রাচীন শিবমন্দিরও বর্তমান; এই পাহাড়ের নীচে অর্থাৎ পুরান রাজগৃহের মাঝখানে 'মনিয়ার মঠ'—পাটনা-গয়া রাস্তার উপর। এদিক-সেদিকে শ্রীফলের বন। ইউকেলিপ্টাসের বাগানও আছে। মঠটি প্রায় দুর্গের মত—অতি সুরক্ষিত ছিল। প্রাচীরবেষ্টিত। ইহা খৃঃ পূঃ ৬০০ শতাব্দীর। খননে এখানে ৫টি স্তর পাওয়া গেছে—ভিন্ন ভিন্ন যুগের তৈরী। উপরের স্তরগুলিতে যথাক্রমে জৈন, বৌদ্ধ, শৈব দেবালয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। নীচে দেখা যায় নাগ-নাগিনী-পূজার ধ্বংসাবশেষ। খৃঃ পূঃ ২০০ শতাব্দীর মণিনাগ আবিষ্কৃত হয়েছে। আর ১৯ ফিট নীচে পাওয়া যায় প্রাচীন যুগের আরো ৩টি মূর্তি। তাছাড়া বাইরের দেয়ালে ছিল বহু মূর্তি—নাগ-নাগিনী, শিব, গণেশ প্রভৃতি। যক্ষ-যক্ষিণীর প্রতীক পাওয়া গেছে। প্রত্যেকটি মূর্তি ও চিত্র অতি সুন্দর কারুকার্যখচিত। খননকালে অনেক মাটির বাসন-পত্র, ঘড়া-কলসীও পাওয়া গেছে। বাসন প্রভৃতি জীব-জন্তু, নাগ-নাগিনীর চিত্রে চিত্রিত। পশ্চিমে পাওয়া গেছে স্ত্রী-পুরুষের বিশিষ্ট চিত্র ও মণিনাগের চিত্রাঙ্কিত বিবিধ সামগ্রী। এতে প্রমাণিত হয়, আর্য, বৌদ্ধ, জৈন সম্প্রদায় বিভিন্ন যুগে ইচ্ছানুসারে একই অতি প্রাচীন দেবালয়ের সংস্কার করে, পূজা-অর্চনা ও সাধন-ভজন করে এসেছেন। এই সব আবিষ্কৃত বাসন-পত্র, চিত্রাবলী ও মূর্তি খৃঃ পূঃ যুগের সভ্যতা-সংস্কৃতি-স্থাপত্যকলার এক একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এখানে অনেক কঙ্কালও আবিষ্কার করেছেন। শিবপূজায় হয়তো পশুবলি হ'ত। রাজা জরাসন্ধের শিবভক্তি প্রসিদ্ধ। রাবণ রাজাও শিব-উপাসক ছিলেন। অনার্যগণ আর্য বা ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংস্পর্শে আসবার পূর্বে পূজা-অর্চা করতেন একমাত্র শিবের। আশুতোষ শিবের পূজা—সহজ ধর্ম। তিনি ভোলানাথ—সহজেই ভুলে যান মানুষের ভুল-ত্রুটি, অন্যায়-অত্যাচার। পৌরাণিক যুগ বাদ দিয়ে বর্তমান যুগে দেখা যায়, কাশ্মীর থেকে আরম্ভ করে নেপাল ভুটান হয়ে নাগাল্যাণ্ড পর্যন্ত পাহাড়ী জাতি এবং আদিবাসীদের মধ্যে শিবপূজার প্রচলন সর্বত্র—অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা থাক আর না-ই থাক। এমন অনেক জাতি আছে হিন্দুদের আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাদের এতটুকু সামঞ্জস্য নেই, কিন্তু শিবপূজায় তারা অনুরক্ত।

আরো দক্ষিণে প্রাসাদনগরী। ইহা আর একটি প্রাকারের দ্বারা বেষ্টিত—মাটির প্রাচীর। লম্বায় ৩ মাইল, উচ্চতায় ৩০ ফুট। দ্বার ছিল ৪টি। অতি সুরক্ষিত। সন্ধ্যার পর নগরে প্রবেশ করা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। একবার রাজা বিম্বিসার কোন কারণবশতঃ সময়ে ফিরতে পারেননি, এজন্য তাঁকেও নাকি প্রাসাদে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি—বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করে পরদিন সকালে প্রাসাদ-নগরীতে প্রবেশ করেন। এই স্থানের ধ্বংসাবশেষে অনেক স্তূপ, কূপ, পগার, প্রাচীন লিপি ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। দক্ষিণে

একটি ঘর ছিল ২০০ বর্গফুটের—বন্দিশালা। পূর্তবিভাগ এখানে একটি শিকল (হাতকড়া) উদ্ধার করেছেন। অনুমান অজাতশত্রু পিতা বিম্বিসারকেও এখানেই আবদ্ধ রাখেন। বিম্বিসার এখান থেকে গৃধ্রকূট পর্বতে ভ্রমণরত বুদ্ধদেবকে দর্শন করতেন।

রাজগৃহের উত্তরের ফটকে আমরা এসেছি। এসে পৌঁছেছি এখন নগরীর দক্ষিণ প্রান্তে, প্রাসাদে। প্রাসাদনগরীর তিনদিকে বাকী তিনটি প্রবেশপথ—পশ্চিমে, দক্ষিণে ও পূর্বে। পশ্চিমে হ'ল বৈভারগিরি ও সোনাগিরির মধ্যস্থল। ইহার সম্মুখে বিরাট মাঠ—রণভূমি বা মল্লভূমি। প্রাসাদ থেকে দূরত্ব দেড় মাইল। এখানেই নাকি ভীম ও জরাসন্ধের মল্লযুদ্ধ হয়েছিল দীর্ঘ ১৮ দিন। অবশেষে রাজা নিহত হন। রণভূমির মাটি অতি কোমল ও উজ্জ্বল শুভ্র। প্রবাদ আছে, যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় রাজা জরাসন্ধ প্রচুর পরিমাণে ঘি ও দুধ দিয়ে মাটিকে এরূপ নরম ও সাদা করেছিলেন। আজও বিহারের কুস্তিগিরগণ এই রণভূমির মাটি শ্রদ্ধা সহকারে নিয়ে যান এবং গাত্রে লেপন করেন। অদূরে একটি ঠাণ্ডা ও স্বাদু জলের নির্ঝর আছে। আরো আছে পর্বতোপরি একটি স্থান - চোপপাত। ইহা অমর ঝরনার নিকটবর্তী। এখানে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হ'ত - পাহাড়ের উপর থেকে নীচে ফেলে দিয়ে। চোপপাত—অর্থাৎ চোরপ্রপাত। রণভূমির ৬ মাইল দূরবর্তী একটি স্থান আছে, ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষের জন্য বিখ্যাত। নাম জেঠিয়ান। প্রবেশপথের দক্ষিণের পাহাড়টি সোনাগিরি। সোনাগিরির সানুদেশে ৩টি জৈন মন্দির ও ১টি তপোবন অবস্থিত। তপোবনে গরম জলের একটি ঝরনা ও ঋষভদেবের প্রাচীন মন্দির বর্তমান। পাণ্ডাগণ বলেন এই বিগ্রহ থেকে শিলাজতু নির্গত হয়ে থাকে। পাহাড়টিকে পুরাণে ঋষিগিরি এবং রত্নাচল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অতীত কালে নাকি মূল্যবান রত্নাদি পাওয়া যেত। রাজগৃহের অন্যান্য পাহাড়েও এই প্রবাদ প্রচলিত।

দক্ষিণের প্রবেশদ্বার সোনাগিরি ও উদয়গিরির মধ্যস্থল। এদিকে বাণগঙ্গা নামে একটি নদী প্রবাহিত। মহাভারতে আছে, রাজা জরাসন্ধকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করে শ্রীকৃষ্ণ ভীম ও অর্জুনকে সাথে নিয়ে এদিকে প্রবেশ করেন। তখন তাঁর রথের অশ্ব অত্যন্ত পিপাসার্ত হয়ে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে বাণের দ্বারা পাতাল থেকে গঙ্গা উত্তোলন করেন। তৃষ্ণার্ত ঘোড়া গঙ্গাজল পান করে সুস্থ হয়। এই সেই বাণগঙ্গা—যেখানে পুণ্যার্থিগণ স্নান-দান করে থাকেন। একটি বিশ্রামাগার আছে। স্থানটি অতি মনোরম! পথের দক্ষিণ প্রান্তে উদয়গিরি—পাটনা-গয়া রাস্তার উপর। প্রথম বিশ্রামাগার। পাশেই পাহাড়ে উঠবার রাস্তা। উদয়গিরির উপর দুটি জৈন মন্দির। একটি শ্বেতাম্বর ও অন্যটি দিগম্বর সম্প্রদায়ের। শিখর থেকে দূরদূরান্তবিস্তৃত মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী দেখে স্তম্ভিত হতে হয়! অতি চমৎকার সে-প্রকৃতির রূপাবলী! সর্বাধিক সৌন্দর্যময় হল সূর্যোদয়—তাই জৈনদের দেওয়া নাম উদয়গিরি। তাছাড়া এই পাহাড়টি বৃষভগিরি, পাণ্ডবগিরি ও গিরিব্রজ নামে খ্যাত।

পূর্বদিকে প্রবেশপথের দক্ষিণে উদয়গিরি ও উত্তরে গৃধ্রকূট পর্বত। রাজা অজাতশত্রু ও শ্রীগুপ্ত দেবদত্তের পরামর্শে বুদ্ধদেবকে যেখানে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিলেন, সেই স্থানটি অতিক্রম করে পূর্বদিকে এগিয়ে গেলে পাওয়া

যায় জীবকাম্রবন। আম্রবন রাজবৈদ্য জীবকের। তিনি অতি উচ্চশ্রেণীর চিকিৎসক ছিলেন; অস্ত্র-চিকিৎসাও ভাল জানতেন। পুরাতত্ত্ব বিভাগ আম্রবনে অনেক ঔষধ-পত্র আবিষ্কার করেছেন। ঔষধের বিভিন্ন গাছ-গাছড়ার বাগানও সেখানে ছিল। অদ্যাপি নাকি বাগানে জড়ি-বুটির গাছ পাওয়া যায়। আম্রবনটি জীবক গুরু বুদ্ধদেবকে অর্পণ করেন। বনে অনেক বিহার ও স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। বুদ্ধদেব এখানে ১,২৫০ জন ভিক্ষুসহ বসবাস করেছেন। আম্রবনের ১ মাইল অন্তর গৃধ্রকূট পর্বতে চড়াইয়ের রাস্তা। এই রাস্তা তৈরি করেন রাজা বিম্বিসার। গৃধ্রকূট বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীদের মহাতীর্থ। গৌতমের জন্মস্থান হিমালয়ের কোলে কপিলবস্তু নগর (খৃঃ পূঃ ৫৬৩ অব্দ), বাসস্থান শ্রাবস্তীর জেতবন ও নির্বাণস্থান মল্লরাজ্যের কুশীনগর (খৃঃ পূঃ ৪৮৩ অব্দ) অবজ্ঞাত। কিন্তু অবতার বুদ্ধদেবের বহুস্মৃতি-বিজড়িত গিরিব্রজের গৃধ্রকূট ও বেণুবন আজও সগৌরবে সমভাবে সমাদৃত। সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করে গোরক্ষপুরের অনুপ্রিয় গ্রামে সন্ন্যাস, নেপালের বৈশালীতে 'আড়ার-কালামের' এবং রাজগৃহে উদ্রেকের নিকট শাস্ত্রাদি শিক্ষালাভ করেন।* তারপর উরু-বিল্বে গিয়ে সত্যলাভ করেন এবং ঋষিপত্তনের মৃগোদ্যানে ধর্ম প্রচার করেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষাদানের প্রধান কেন্দ্র ছিল রাজগৃহ বা গিরিব্রজ। পুনরায় বুদ্ধদেব রাজগৃহে ফিরে এসে জীবনের অধিকাংশ কাল গৃধ্রকূট ও বেণুবনে যাপন করেন। রাজা বিম্বিসারও তাঁকে রাজসম্মানে অভ্যর্থনা করেন। তাঁর জগদ্বিখ্যাত বহু শিষ্য এই গিরিব্রজের; এখানেই তাঁরা পবিত্র বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হ'ন। প্রথম ধর্মমহাসম্মেলনের সভাপতি মহাকাশ্যপ, প্রধান বক্তা কুমার কাশ্যপ এই রাজগৃহের ব্রাহ্মণ-সন্তান। সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়নও এখানকারই শিষ্য—নালন্দার বিখ্যাত ব্রাহ্মণ-বংশসম্ভূত। এই দু'জন মহান শিষ্যই ছিলেন বুদ্ধদেবের দুটি হস্তস্বরূপ। কাজেই রাজগীর যে সাধনা-সংস্কৃতি-বৈভবের কেন্দ্রস্থল, একথা বলাই বাহুল্য। পুরাতত্ত্ব বিভাগ এখানে অনেক চন্দনকাষ্ঠের বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কার করেছেন; এক মাইল উপরে দুইটি স্তূপ আছে। আরো কিছু উপরে পাওয়া যায় দুটি গুহা; ১মটি ভিক্ষু আনন্দ, সারিপুত্র প্রভৃতির এবং ২য়টি স্বয়ং বুদ্ধদেবের। এখানে তিনি বহুদিন ধর্মশিক্ষা দান করেন। সেই উপদেশই 'প্রজ্ঞাপারমিতা' নামে বিখ্যাত হয়েছে। রাজা বিম্বিসার এখানেই তাঁর উপদেশবাণী শ্রবণ করতেন। উপদেশের স্থল—সমতল পাথর দিয়ে বাঁধানো। গৃধ্রকূট পর্বতের সানুদেশে অশোক-স্তম্ভ আছে। স্থানটির নাম ছঠাগিরি—১,১৪৭ ফুট উচ্চ। বর্তমানে এই পাহাড়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা হচ্ছে। ভারত ও জাপান সরকার সমবেত ভাবে এই উন্নয়নকার্যে যোগদান করেছেন। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে শীর্ষ পর্যন্ত 'রোপ-ওয়ে' এবং মন্দির প্রভৃতি তৈরী হচ্ছে। ভ্রমণ-রত বুদ্ধদেবকে হত্যার উদ্দেশ্যে শিষ্য দেবদত্ত উপর থেকে পাথর গড়িয়ে দিয়েছিলেন এই গৃধ্রকূটেই। সৌভাগ্যক্রমে হত না হলেও তিনি বেশ আহত হয়েছিলেন। পাহাড়ের দক্ষিণ তরাই-অঞ্চলে একটি মৃগোদ্যান ছিল—নাম মদ্দকুচ্ছি। পাশে পুষ্করিণী এবং পুষ্করিণীর পরপারে মোরনিবাপ ময়ূরস্থান।

* এই উভয় পণ্ডিতই ছিলেন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।

স্বামীজীর স্মৃতি*

বিরজা দেবী

[অনুবাদক : স্বামী চেতনানন্দ]

১৯০০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথমদিকে স্যানফ্রান্সিসকো শহরের রিজেমন হলে স্বামী বিবেকানন্দ 'ভারতের আদর্শ' এই পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে তিনটি বক্তৃতা দেন। ইহার প্রথম বক্তৃতার দিনে তাঁর বক্তৃতা শুনবার মহান সুযোগ আমার হয়েছিল। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁকে জোর করে বক্তৃতা-মঞ্চে যেতে হত। স্বামীজীর আগমন প্রতীক্ষা করে আমি হলে বসেছিলাম এবং মনের ভিতর একটু সংশয় জাগছিল যে আমি তাঁর বক্তৃতা শুনতে এসেছি ত ? কিন্তু আমার সকল সংশয়ের নিরসন ঘটল যখন স্বামীজীর সেই রাজোচিত মূর্তিখানি হলে প্রবেশ করল। তিনি প্রায় দীর্ঘ দুঘণ্টা যাবৎ ভারতের আদর্শ সম্বন্ধে বলে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও টেনে নিয়ে গেলেন তাঁর সঙ্গে, তাঁর নিজেরই দেশে—যাতে আমরা তাঁকে একটু ভাল-ভাবে বুঝতে পারি এবং তিনি যে মহান সত্য শিক্ষা দিলেন উহার কণিকাও যেন আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। বক্তৃতার পরে স্বামীজীর সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল; স্বামীজীর সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে আমার ভাবতরঙ্গ উপছে পড়ছিল। আমি একটি কথাও বলতে পারলাম না, কেবল দূরে বসে তাঁকে লক্ষ্য করছিলাম এবং বক্তৃতার হিসাবনিকাশরত সঙ্গীদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। দ্বিতীয় দিন বক্তৃতার পরেও আমি সেইরূপ অপেক্ষা করছিলাম এবং দূর থেকে স্বামীজীকে লক্ষ্য করছিলাম; কিন্তু তিনি আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁর কাছে যেতে ইঙ্গিত করলেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে বসলাম এবং তিনিও একটা চেয়ারে বসলেন। তিনি বললেন, "মহাশয়া, আপনি যদি একাকী আমার সঙ্গে দেখা করতে চান তবে আপনি টার্ক স্ট্রীটে আমার ফ্লাটে যাবেন—সেখানে টাকাপয়সার এইসব ঝামেলা নাই।"

আমি তাঁকে বললাম যে আমি তাঁর একান্ত দর্শনাভিলাষী। তিনি অনুমোদন করে বললেন, "কাল সকালে আসুন", এবং আমি তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে চলে এলাম। প্রায় সমস্ত রাত্রিটাই আমার মনের মধ্যে প্রশ্নাবলীর তোলপাড় হয়েছিল; কতকগুলি জটিল প্রশ্ন মাসের পর মাস আমার জীবনটাকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল, তবুও আমি কারও কাছে উহার জন্য সাহায্য চাইনি। পরদিন সকালে ফ্লাটে এসে শুনলাম যে, স্বামীজী এখুনি বাইরে বেরুবেন, সুতরাং কারও সাথে দেখা হবে না। আমি বললাম যে, তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন, কারণ তিনিই আমাকে আসতে বলেছেন; সুতরাং আমাকে উপরে যেতে দেওয়া হল এবং আমি সামনের একটা বৈঠকখানা ঘরে বসলাম। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বামীজী একটা লম্বা কোট ও একটা ছোট কাল টুপী পরে মৃদুস্বরে স্তব আবৃত্তি করতে করতে সেখানে ঢুকলেন। ঘরের বিপরীত দিকে একটা চেয়ারে এসে তিনি বসলেন এবং তাঁর সেই

* Vedanta Kesari পত্রিকার ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে অনুদিত।

তুলনাহীন সুরে স্তোত্রপাঠ করতে লাগলেন। পরে আমায় আপ্যায়ন করলেন। আমি একটা কথাও বলতে বা জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না, কেবল কাঁদতে লাগলাম এবং ক্রমাগত অশ্রুকণা গড়াতে লাগল। স্বামীজী আরও কিছু সময় ধরে স্তোত্রপাঠ করলেন এবং তারপর বললেন, "আগামী কাল ঠিক এই সময়েই আসবেন।"

এইভাবে সেই পুণ্যশ্লোক স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল এবং সেই মহান ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে বিনা জিজ্ঞাসায় আমার জীবনের জটিল সমস্যাগুলির সমাধান ঘটেছিল এবং প্রশ্নাবলীও মীমাংসিত হয়েছিল। স্বামীজীর সহিত আমার সেই প্রথম সাক্ষাৎ থেকে আজ দীর্ঘ চব্বিশ বছর হতে চলল, কিন্তু তবুও উহা আমার স্মৃতিপটে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ-স্বরূপ হয়ে রয়েছে। প্রায় একমাস ধরে প্রতিদিন স্বামীজীকে দেখবার এক মহান সুযোগ আমার ঘটেছিল—তাঁরই পরিচালিত টার্ক স্ট্রীটের সেই মধুময় ধ্যানের ক্লাসগুলিতে।

ক্লাসের পরেও আমি তাঁর কাছে থাকতাম এবং তাঁর খাবার তৈরির কাজে সহায়তা করতাম এবং এমন কি তিনি আমাকে রান্নাঘরে ঢুকবার অনুমতি দিতেন ও অন্যান্য খুঁটিনাটি কাজগুলি করিয়ে নিতেন। রান্না করবার সময় তিনি বেদান্ত আলোচনা করতেন আর সঙ্গে সঙ্গে স্তোত্রাদিও আবৃত্তি করতেন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬১তম শ্লোকটি তিনি অতি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করতেন—'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥' অর্থাৎ 'হে অর্জুন, অন্তর্যামী নারায়ণ সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে সর্বভূতকে মায়াদ্বারা যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় চালিত করছেন।' তিনি এইগুলি সংস্কৃতে অনর্গল আবৃত্তি করতেন এবং উহা আলোচনা করবার জন্য মাঝে মাঝে থেমে যেতেন। তিনি ছিলেন মহান্ এবং তাঁর চরিত্র ছিল এমনই বিভিন্নমুখী যে, কখনও দেখা যেত যেন ঠিক শিশুদের মত, আবার কখনও গর্জনকারী বেদান্তসিংহ; কিন্তু আমার কাছে তিনি ছিলেন সহৃদয় প্রেমময় পিতা। তাঁকে স্বামীজী বলে ডাকতে আমাকে নিষেধ করতেন এবং বলতেন ভারতীয় শিশুদের মত 'বাবাজী' বলে ডাকতে। একদিন এক বক্তৃতার শেষে তাঁর সহিত পথে চলতে চলতে আমি অবাক্ হয়ে গেলাম—আমার মনে হল তিনি এক অতিকায় পুরুষ এবং সাধারণ মানুষের চাইতে তাঁর আয়তন ছাড়িয়ে গেছে আর পথের লোকগুলিকে দেখাচ্ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র অর্থাৎ বামনের মত। তাঁর ছিল এমনই রাজকীয় চেহারা যে পথের লোকেরা তাঁর জন্য পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াত। এক সন্ধ্যায় বক্তৃতার পরে [স্বামী]জী আমাদের দশ-বার জনকে নিয়ে আইসক্রীম খাওয়ার জন্য একটা রেস্তোরাঁতে ঢুকলেন। স্বামীজী আইসক্রীম সোডার চেয়ে আইসক্রীম খেতে ভালবাসতেন। পরিচারিকা আদেশ ভুল শোনায় স্বামীজীর জন্য আইসক্রীম সোডা নিয়ে হাজির হল; কিন্তু পরে ভুল বুঝতে পেরে সে স্বামীজীর জন্য উহা পাল্টে দিতে চাইল। দোকানের মালিক ইহার জন্য পরিচারিকাকে একটু ভর্ৎসনা করলেন, কিন্তু স্বামীজী উহা শুনতে পেয়ে দোকানের মালিককে ডেকে বললেন, "আপনি ঐ নিরীহ বালিকাটিকে গাল দেবেন না; যদি আপনি ঐ বালিকাটিকে আর গালি দেন তবে আমি আপনার সব আইসক্রীম

সোডা খেয়ে ফেলব।"

টার্ক স্ট্রীটের বাড়ীতে একমাস থেকে স্বামীজী আলামেডাতে চলে যান এবং হোম অব্ ট্রুথ (Home of Truth)-এ কিছুদিন থাকেন। সুন্দর বাগান-পরিবেষ্টিত ঐ বিরাট বাড়ীটাতে স্বামীজী আনন্দ সহকারে ধূমপান করতে করতে বাগানে বেড়িয়ে বেড়াতেন। ঐ বাড়ীটার প্রবেশপথেই ছিল একটা বড় বারান্দা, সেখানে স্বামীজী কখনও কখনও বসতেন এবং আমাদের সেই ক্ষুদ্র দলটির সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। ইস্টার সানডের রাত্রিটা ছিল পূর্ণিমা, নিস্টিরিয়া ফুল পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছিল এবং উহা বস্ত্রের ন্যায় বারান্দাটিকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। স্বামীজী সেখানে এসে বসলেন এবং ধূমপান করতে করতে মজার গল্প বলতে শুরু করলেন; তারপর তিনি বললেন, কি করে চিকাগোতে জুতা পরবার সময় তাঁর পায়ের আঙ্গুলে চোট লাগে এবং উহার জন্য একজন মহিলা ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কাহিনী খুব মজা করে বললেন, "হায়, আমার পায়ের আঙ্গুল, বড় সাধের আঙ্গুল! যখনি আমি ঐ মহিলা ডাক্তারের কথা মনে করি তখনই আমার পায়ের আঙ্গুলে ব্যথা শুরু হয়।" তারপর আমাদের মধ্যে একজন তাঁকে 'ত্যাগ' সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ করলেন। "ত্যাগ?" স্বামীজী বলে উঠলেন, "তোমরা শিশু, তোমরা ত্যাগের মাহাত্ম্য কি বুঝবে?" আমাদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, "আমরা কি এতই শিশু যে, আমরা উহা শুনবার অধিকারী নই?" স্বামীজী কিছু সময় মৌন হয়ে রইলেন; তারপর একটি অগ্নিগর্ভ উদ্দীপনাময় ভাষণ দিলেন। তিনি প্রকৃত শিষ্যদের গুণাবলী এবং কি করে তারা ঠিক ঠিক গুরুর শরণাগত হয়—সে সম্বন্ধে আলোচনা করলেন, আর উহা ছিল পাশ্চাত্য জগতে এক নূতন শিক্ষা। আলামেডাতে প্রতি রবিবার বিকালে স্বামীজী নিজের জন্য ভারতীয় প্রণালীতে হিন্দুদের আহার্য বস্তু তৈরি করতেন, সুতরাং পুনরায় উহাতে যোগ দিবার এবং তাঁর ভোজনাংশ গ্রহণ করবার সুযোগ আমার জুটে গেল। যদিও স্যানফ্রান্সিস্‌কো এবং আলামেডাতে স্বামীজীর সকল সাধারণ বক্তৃতাগুলিতে আমি উপস্থিত থাকতুম, কিন্তু তবুও স্বামীজীর সহিত সেই ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শটাই আমার কাছে বড় ভাল লাগত। একদিন কিছু সময় মৌন থাকার পর স্বামীজী বলে উঠলেন, "ভদ্রে, উদারচেতা হও; সব সময় দুটো পথ দেখতে চেষ্টা কর। যখন আমি খুব উচ্চে (অর্থাৎ পারমার্থিক সত্তাতে) উঠি তখন বলি, 'সোঽহং'; কিন্তু যখন আমার পেটে যন্ত্রণা শুরু হয় (অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্তাতে নেমে আসি) তখন বলি, 'মা, তুমি আমাকে কৃপা কর।' তাই বলি—সব সময় দুটো পথ দেখতে চেষ্টা কর।" আর একদিন তিনি বলেছিলেন, "সাক্ষিস্বরূপ হতে শিক্ষা কর। যদি দুটো কুকুর পথে মারামারি করে এবং আমি যদি সেখানে যাই তবে আমিও উহাতে লিপ্ত হয়ে যাব; কিন্তু আমি যদি শান্তভাবে ঘরে বসে থাকি তবে সাক্ষিস্বরূপ হয়ে ঐ বিভীষিকাময় সংগ্রাম জানালা দিয়ে দেখতে পাব। তাই বলি—এই জগতে নির্লিপ্ত হয়ে সাক্ষিস্বরূপ হতে শিক্ষা কর

আলামেডাতে তুকের হলে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। একদিন তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'মানুষের চরম লক্ষ্য'। এই অদ্ভুত হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শেষ করবার কালে তিনি তাঁর হাতখানা বুকের উপর রেখে জোরে বললেন,

"আমি-ই ঈশ্বর।" শ্রোতাদের উপর তখন একটা ত্রস্ত নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল এবং কেউ কেউ ভাবছিল এরূপ মারাত্মক কথা বলা স্বামীজীর পক্ষে ধর্মদ্রোহিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

একদিন স্বামীজী রীতিবহির্ভূতভাবে একটা জিনিস করে ফেলেছিলেন এবং উহা আমাকে কিছুটা আঘাত দিয়েছিল। তিনি উহা দেখে বললেন, "ভদ্রে, তোমরা বাইরের এই ছোট বিষয়গুলিকে সুন্দরভাবে দুরস্ত করতে চাও; কিন্তু জেনে রেখ, বাইরের ঐ নিখুঁত আদব-কায়দায় কিছু যায়-আসে না—ভিতরের বস্তুই আসল।"

ওঃ! কত অল্প-পরিমাণেই না আমরা স্বামীজীকে বুঝেছি! তিনি প্রকৃত যে কি ছিলেন সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নাই। সময় সময় তিনি আমাকে কত কি বলতেন, আর আমি অজ্ঞানতাবশতঃ বলে উঠতাম—স্বামীজী, আমি ওভাবে চিন্তাই করিনি। আর তিনি বেশ মজা করে হেসে বলতেন, "আচ্ছা, তাই না কি!" তাঁর ভালবাসা ও সহিষ্ণুতা ছিল অতুলনীয়। তখন স্বামীজীর শরীর বিশেষ ভাল ছিল না এবং বক্তৃতার পর বক্তৃতা তাঁর শরীরকে জবাব দিচ্ছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন যে, এইরূপ মঞ্চোপরি বক্তৃতা তাঁর আর ভাল লাগে না এবং আবেগভরে বলতেন, "এইরূপ সাধারণ বক্তৃতা আমাকে শেষ করে ফেলেছে। ঠিক হল, আটটার সময় আমাকে 'প্রেম' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হবে, অথচ সে সময় আমার 'প্রেম' সম্বন্ধে কোন ভাবই উঠল না।" আলামেডাতে বক্তৃতা শেষ করে স্বামীজী ক্যাম্প টেইলরে যান এবং আরও কয়েকদিন পরে পূর্বদিকে (অর্থাৎ নিউইয়র্কের দিকে) যান এবং আমরা আর কোনদিন তাঁকে ক্যালিফোর্নিয়াতে দেখি নাই। আমরা যে কয়জন তাঁর সেই পবিত্র সংস্পর্শে এসেছিলাম—কোনদিনই ভুলতে বা অনুভব করতে পারব না যে, তিনি চিরকালের জন্য আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। তিনি আমাদের স্মৃতিতে জীবন্ত হয়ে রয়েছেন আর তাঁর সেই বাণীও আমাদের কাছে অমর হয়ে রয়েছে। যাওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে বলেছিলেন, যদি আমি কোনদিন পূর্বের ন্যায় মানসিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ি তবে তাঁকে ডাকতে এবং স্মরণ করতে; তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, এমন কি শত শত মাইল দূর হলেও তিনি আমার কথা শুনবেন। আর সত্যি বলতে কি, তিনি এখনও উহা শোনেন।

"সেই দেশটি ধন্য যেখানে তিনি জন্মেছিলেন, তাঁরাও ভাগ্যবান যাঁরা এই পৃথিবীতে তাঁর সময় জীবিত ছিলেন এবং আশীর্বাদপুষ্ট, শতধারায় আশীর্বাদপুষ্ট অল্প কয়েকজন যাঁরা তাঁর পাদমূলে বসেছিলেন।"

ভগিনী ক্রিষ্টিন

রোমের মনস্বী সম্রাট্ মার্কাস অরেলিয়াস

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

"ধ্বংসের চিরন্তন গতিপথ আমাদের সকলেরই লক্ষ্য করিতে অভ্যস্ত হওয়া উচিত, এবং বুঝা উচিত কোনপ্রকার ক্ষতি বিশ্বজগৎ সমর্থন করে না। বিশ্বপ্রকৃতি জগতের উপাদানগুলিকে মোমের মত ব্যবহার করে। কোন উদ্দেশ্যে এখন একটি ঘোড়া তৈয়ারী হইল, কিছুক্ষণ পরে উহাকে গলাইয়া একটি বৃক্ষমূর্তি তৈয়ারী করিতে দেখা গেল, তৎপরে মানুষ, তাহার পর আবার অন্য কোন জিনিস। মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য উপাদানগুলি এক এক শ্রেণীর জীব বা বস্তুতে পরিণত হয়। এইরূপ মূর্তি-পরিবর্তনে উপাদানগুলির কোনরূপ বিকার উপস্থিত হয় না।" (৭ম ভাগ, ২৩ সূত্র)। "জন্মমৃত্যু প্রকৃতির এক রহস্য এবং উহাদের মধ্যে বেশ একরূপ সাদৃশ্যও আছে, কারণ সৃষ্টিতে যে উপাদানগুলি একত্রীভূত হইয়াছিল, মৃত্যুতে সেইগুলিই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে" (৪র্থ ভাগ, ৫ম সূত্র)। "এই সকল পরিবর্তনের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রই একমাত্র সৎ বস্তু যাহা আমাদের জীবন-নীতিকে পার্থিব প্রভাব হইতে শুদ্ধ ও মুক্ত রাখিতে পারে।" তোমার ইচ্ছামত যে-কোন আবহাওয়া বা অবস্থার মধ্যে আমাকে ফেল না কেন, যদি আমার দৈবসত্তা ঠিক থাকে, এবং নিজ প্রকৃতির অনুসরণ করে, তাহা হইলে আমার শাশ্বত সত্তার কোন ক্ষতি হইবে না, আমিও ধীর স্থির থাকিতে পারিব। (অষ্টম ভাগ, ৪৫ সূত্র)

স্টোয়িক মতবাদ স্বীকার করে—সকল প্রকার অনুভূতি আত্মার স্থূল সংস্কার সৃষ্টি করে, বিচারশক্তিই স্থির করে সেই সকল অনুভূতি সত্য বা মিথ্যা, শুভ বা অশুভ। মতামত-গঠনের যে শক্তি মানুষকে শুদ্ধ বা পবিত্র রাখে, যুক্তিবাদী জীবের শাশ্বত সত্তার বিপক্ষে বা তাহার প্রকৃতির বিরুদ্ধে কোন মত করিতে উহাই বাধা দেয়। (৩য় ভাগ, ৯ম সূত্র)

"আহত হইয়াছ এরূপ অনুমান করিও না, তাহা হইলেই তোমার অভিযোগ দূর হইবে; অভিযোগ করা থেকে বিরত থাক, তাহা হইলে তোমাকে আঘাত পাইতে হইবে না (৪র্থ ভাগ, ৭ম সূত্র)।" দার্শনিক সম্রাট্ মার্কাস অরেলিয়াস এইরূপ কথাগুলি বলিয়া দুর্বোধ্য শাস্ত্রীয় উপদেশ কার্যকরী নীতিতে পরিণত করিয়াছিলেন। মার্কাস অরেলিয়াস তাঁহার 'মেডিটেশনে' যে-সকল কার্যকরী উপদেশ দিয়াছেন, অবশেষে তিনি সেই-সকল উপদেশের অনেক ঊর্ধ্বেই উঠিয়াছিলেন। রাজার অধিকার বিষয়ে অ্যানিটসথেনেসের মন্তব্য তিনি কত আনন্দের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন—"সৎকাজের জন্য নিন্দিত হওয়া রাজকীয় ব্যাপার (৭ম ভাগ, ৩৬ সূত্র)।" কৃতজ্ঞতার আকাঙ্ক্ষাকে তিনি কিরূপ নিপুণভাবে ব্যর্থ করিয়াছেন। একজন ফরাসী লেখক কৃতজ্ঞতার সংজ্ঞা দিয়াছেন—কৃতজ্ঞতা সৎকর্মের সুদ আদায়। মার্কাস অরেলিয়াস বলিয়াছেন—"এমন কতকগুলি লোক আছে যাহারা তোমার কোন উপকার করিলে তৎক্ষণাৎ তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা দাবি করিবে। আর একশ্রেণীর লোক আছে, তাহারা ইহাদের অপেক্ষা কি ভদ্র! তাহারা তোমার কোন উপকার করিলে

তাহাদের ব্যবহার ও চোখের দৃষ্টিতে বুঝা যাইবে যে তাহারা তোমাকে অধমর্ণ বলিয়াই মনে করে। আর এক প্রকারের লোক আছে তাহারা বুঝিতেই পারে না যে, তাহারা কাহারও কোন উপকার করিতেছে। ইহারা দ্রাক্ষালতার মত ফল ধারণ করিয়াই সন্তুষ্ট, এক গুচ্ছ আঙ্গুরের জন্য কেহ যে তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিবে তাহারা কোন দিন সে আশাও করে না। দ্রুতগামী অশ্ব বা কোন শিকারী কুকুর যখন তাহার কোন কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে, তখন সে কোনরূপ শব্দ করে না, নীরবেই কাজ করিয়া থাকে; কিংবা কোন মৌমাছি যখন কিছু মধু প্রস্তুত করে, তখন সেও কোন শব্দ করে না। সুতরাং প্রকৃত যে মানুষ সে কোন দয়ার কার্য করিয়া তাহা বলিয়া বেড়ায় না, অধিকন্তু সুযোগ পাইলেই ঐরূপ কর্মই করিয়া থাকে, যেমন দ্রাক্ষালতা পরবর্তী ঋতুতে আবার আঙ্গুর উৎপন্ন করে। আমরা সেইসকল বিজ্ঞ লোকেরই অনুসরণ করিব, যাঁহারা উপকার করিয়া মনে রাখেন না।" (৫ম ভাগ, ৬ষ্ঠ সূত্র)

মার্কাস অরেলিয়াস সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—"যে-লোক চীৎকার করিয়া বলে আমি তোমার সহিত সরলভাবেই ব্যবহার করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহাকে কিরূপ শূন্যগর্ভ ও ঘৃণার্হ দেখিতে হয়! শোন বন্ধু, এরূপ বৃথা দম্ভের প্রয়োজন কি? তোমার কার্য দ্বারাই তোমার মনের পরিচয় দাও, তোমার মুখমণ্ডলই তোমার বাক্যের সাক্ষ্য হওয়া উচিত। আমি চাই—সাধুতা ও সরলতা দেহ ও মনের সহিত এরূপ মিলিত হইবে যে, ইহা সকল ইন্দ্রিয় দ্বারাই প্রকাশিত হইবে।" (একাদশ ভাগ, ১৫শ সূত্র)

মার্কাসের চিন্তাসূত্রে গ্রথিত আর একটি উজ্জ্বল রত্ন—"প্রতিশোধের প্রকৃষ্ট পন্থা—আঘাতের অনুকরণ না করা।" (৬ষ্ঠ ভাগ, ৬ষ্ঠ সূত্র)

প্রার্থনার ফললাভের কি উদার কল্পনা!—"এই লোকটি···কোন বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য দেবতাদিগের স্তবস্তুতি করে; তোমার প্রার্থনা হওয়া উচিত যাহাতে তোমার মনে ঈদৃশ ইচ্ছার উদয় না হয়। আর একজন তাহার পুত্রের মৃত্যুনিবারণকল্পে ভক্তিমান হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু আমি প্রার্থনা করিতে চাই, ঐরূপ মৃত্যুর আশঙ্কাই যেন আমার হৃদয়ে না জাগে। ভক্তি-প্রকাশের এইরূপ পদ্ধতিই হওয়া উচিত।" (নবম ভাগ, ৬০ সূত্র)

দর্শনশাস্ত্র প্রধান প্রধান যে প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছে, মার্কাস সেইসব প্রশ্নের কিরূপ সমাধান করিয়াছেন এইবার তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। অমঙ্গলের উৎস কোথায়, ইহা লইয়া দার্শনিকদিগের মধ্যে অনেক বাকবিতণ্ডা আছে। সর্বমঙ্গলময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব-প্রমাণের বিরুদ্ধে অমঙ্গলের বর্তমানতা একটি অমোঘ যুক্তি। স্টোয়িকেরা সাহসভরে এই অমঙ্গলের অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—এই জগৎ দোষস্পর্শশূন্য, নিখুঁত। যাহা অমঙ্গল বলিয়া মনে হয়, তাহা সর্বজনীন মঙ্গলের জন্যই প্রয়োজন। এই বিষয়ে মার্কাসও প্রাচীন-পন্থী। কিন্তু অত্যধিক তত্ত্বজিজ্ঞাসার তিনি নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"তোমার শশা কি তিক্ত লাগিতেছে? উহা এক পার্শ্বে রাখিয়া দাও। তোমার পথ কি কণ্টকাকীর্ণ? তাহা হইলে কণ্টকগুলি এড়াইয়া চল। এই পর্যন্তই ভাল। কিন্তু ইহার পর আজ জিজ্ঞাসা করিও না—ঐগুলি লইয়া

জগতের লোক কি করিবে? প্রকৃতি-বিজ্ঞানী (Natural Philosopher) ঐরূপ প্রশ্ন শুনিলে তোমাকে উপহাস করিবে। ছুতারকে তাহার কারখানায় করাতের গুঁড়ার জন্য দোষারোপ করা কিংবা দর্জিকে তাহার দোকানে ছাঁট কাপড়ের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যেরূপ বুদ্ধিমানের কাজ নয়, জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্বের জন্য অনুযোগ করাও সেইরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়।" এপিক্‌টেটাস বলিয়াছেন—"লক্ষ্যচ্যুত হইবার জন্যই যেমন লক্ষ্যবস্তু স্থাপিত হয় না, সেইরূপ জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব নিছক অমঙ্গল করিবার জন্য নহে।"

অর্থাৎ পৃথিবীতে বিশুদ্ধ অমঙ্গল কোথাও নাই, সকল প্রকার অশুভই কোন না কোন শুভকার্যের সূচনা করে। (৮ম ভাগ, ৫৫ সূত্র)

মার্কাস অরেলিয়াস মাঝে মাঝে বলিতেন —"সর্বজনীন নীতিই (Universal Laws) এ জগৎ চালিত করিতেছে।" আবার কখনও কখনও বলিতেন—"দেবতারাই সকল জিনিস সুপরিচালিত করেন।" কোন মতেরই উপর তিনি বিশেষ জোর দিতেন না। জগৎসৃষ্টি ও পরিচালনার মুখ্য কারণ দেবতাগণ বা অণু-পরমাণুর সংযোগ ও বিয়োগ, ঈশ্বর বা কোন অনিশ্চিত ও অবর্ণনীয় ঘটনা, তাহা তিনি জোর করিয়া বলিতেন না। যদিও মার্কাস অরেলিয়াস দেবতাদিগকেই সৃষ্টির কারণ বলিয়া মাঝে মাঝে প্রচার করিতেন, তাহা হইলেও তিনি বলিতেন—"যদি কোন দৈবঘটনাতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতেও মানুষের কিছু আসে যায় না।" ভবিষ্যৎ জীবন বা জন্মান্তর সম্বন্ধেও তিনি কোন কিছুই নিশ্চিত করিয়া বলেন নাই। মানুষের আত্মা দেবতারই অংশবিশেষ, সুতরাং উহা অবিনশ্বর। কিন্তু মৃত্যুর পর মানুষ আবার নূতন দেহ ধারণ করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে কি না এবং সে বিষয়ে তাহার কোন জ্ঞান থাকে কি না, এ প্রশ্নের উত্তর মার্কাস অরেলিয়াস কোথাও দেন নাই। তবে তিনি বলিতেন—"ইহজীবনের সহিতই আমাদের সংস্রব। ভাগ্যক্রমে যদি তোমরা তিন সহস্র বৎসর বাঁচিয়া থাক বা তোমাদের ইচ্ছামত ত্রিশ হাজার বৎসর বাঁচ, তাহা হইলেও মনে রাখিও যে-জীবন তোমরা এখন যাপন করিতেছ, সেই জীবনই তোমাদের নষ্ট হইবে, অন্য কোন জীবন হইতে তোমরা বঞ্চিত হইবে না; যে-জীবন তোমরা হারাইবে, সে-জীবন ব্যতীত অন্য কোন জীবন তোমাদের ছিল না।" (২য় ভাগ, ১৪ সূত্র)

এরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেও জীবনের নশ্বরতা দেখিয়া তিনি মহতী এক নীতি আবিষ্কার করেন। চার্বাকদের মত তিনি বলেন নাই—"যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।" অথবা "Eat, drink and be merry, for to-morrow we may die." কিংবা "এ জীবন মজা লোটার জন্য।"

বলিতেন—"এই জীবনের সদ্ব্যবহার কর, কারণ আর একটিও জীবন আমাদের হাতে নাই।" তিনি আরও বলিতেন—"আমাদের কর্তব্যকর্মগুলি নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতে পারিয়াছি—এই জ্ঞানই মৃত্যুকালে আমাদের সান্ত্বনা। যদি পবিত্রভাবে আমাদের জীবন যাপন করিয়া থাকি তাহা হইলে সন্তুষ্ট চিত্তেই আমরা মরিতে পারিব; আমরা দীর্ঘায়ু হই বা অল্পায়ু হই, তাহাতে কিছুই আসে যায়

না। উহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।"

এপিকিওরিয়াস তাঁহার শিষ্যবর্গকে বলিতেন—"ভোজে তৃপ্ত হইয়া অভ্যাগতরা নিমন্ত্রণবাড়ী হইতে যেভাবে বিদায় গ্রহণ করে, তোমরাও সেইরূপ ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে।" স্টোয়িকেরাও বলেন—"কোন অভিনেতা তাঁহার অভিনয়কাল শেষ হইলে মঞ্চ হইতে যেভাবে প্রস্থান করেন, তুমিও ইহলোক হইতে সেইভাবে প্রস্থান করিবে।"

মার্কাস অরেলিয়াসও তাঁহার 'মেডিটেশনের' দ্বাদশ ভাগের ৩৬ সূত্রে অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন—"শোন বন্ধু, তুমি এই বৃহৎ শহরের একজন অধিবাসী মাত্র। তুমি এই শহরে পাঁচ বৎসরই বাস কর বা তিন বৎসরই বাস কর, তাহাতে তোমার কি আসে যায়? তুমি যদি এই শহরের আইনকানুন মানিয়া থাক, তোমার এখানে অল্পকাল বা দীর্ঘকাল বাস করিবার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যে প্রকৃতিদেবী তোমাকে এই পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনিই যদি তোমাকে এই স্থান হইতে অপসারণের আদেশ দেন, তাহাতে এমন কি কষ্ট হইবে তোমার? তুমি বলিতে পার না—কোন স্বেচ্ছাচারী রাজা বা কোন বিচারবুদ্ধিহীন বিচারক তোমাকে এই স্থান হইতে বিতাড়িত করিতেছে। না, একথা তুমি বলিতেই পার না। মঞ্চাধ্যক্ষের ইঙ্গিতে যেমন কোন অভিনেতা উৎফুল্ল হৃদয়ে মঞ্চ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তোমাকেও সেইরূপ এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। তুমি হয়তো জিজ্ঞাসা করিবে—তিনটি অঙ্কে মাত্র আমি অভিনয় করিতে পারিয়াছি, পঞ্চম অঙ্কের পূর্বেই আমাকে চলিয়া যাইতে বলা হইল কেন? ভাল কথা, তিন অঙ্কেই যে তোমার জীবনের অভিনয় শেষ হইয়াছে। প্রথম অঙ্কে যাঁহার আদেশে তুমি রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিলে, তিনিই এখন তোমার প্রস্থানের ইঙ্গিত করিয়াছেন। তোমার আগমনের জন্য যেমন কেহই তোমাকে দায়ী করে নাই, তোমার প্রস্থানের জন্যও কেহই তোমাকে দায়ী করিবে না। সুতরাং সন্তুষ্টচিত্তেই প্রস্থান কর, কারণ যিনি তোমার প্রস্থানের ব্যবস্থা করিলেন, তিনি তোমার কার্যে সন্তুষ্ট হইয়াই এ কাজ করিয়াছেন।"

এইরূপ অনেক কথাই আমরা মার্কাস অরেলিয়াসের চিন্তাসূত্রগুলিতে (Meditations) দেখিতে পাই। এগুলিকে অনেকে প্রশংসা করিয়াছেন আবার কেহ কেহ অল্পাধিক নিন্দাও করিয়াছেন। সমগ্র 'মেডিটেশন' পাঠ করিলে কিন্তু বিস্ময়ে আপ্লুত হইতে হয়। তখন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে—

"সহজ হবি, সহজ হবি,
ওরে মন সহজ হবি,
কাছের জিনিস যে দূরে রাখে
তার থেকে তুই দূরে রবি।
সহজে তুই দিবি যখন
সহজে তুই সকল পাবি॥"*

* The Meditations of Marcus Aurelius. Translated from the Greek by Jeremy Collier. Revised with introduction and notes by Alice Zimmerrn. এই পুস্তকখানি হইতে প্রবন্ধটির উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে।

সর্বজনের জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবী

স্বামী জীবানন্দ

"যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রসিদ্ধ এই মন্ত্র—আদ্যাশক্তি পরমা জননীর উদ্দেশে প্রণতি-নিবেদন।

দেবীসূক্তে আছে, অম্ভৃণ মহর্ষির কন্যা বাক্ নিজেকে এই আদ্যাশক্তির সঙ্গে অভিন্ন বোধ করেছিলেন, তাই তো বলতে পেরেছিলেন :

"ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহ-
মাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।" ইত্যাদি।

তাঁর উপলব্ধিতে তিনি সকলের জননী, তিনিই সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্রী—এই ভাব পরিস্ফুট।

সর্বভূতে মাতৃরূপে বিরাজিতা চিন্ময়ী প্রকৃতিই অসীমস্নেহময়ী জননী সারদাদেবী-রূপে এসেছিলেন।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবনে দেখা যায়, তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা নিচ্ছেন। মানবীয় দৃষ্টিতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী। যিনি সুদীর্ঘকাল সর্বধর্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে সাধনার ফল এবং জপের মালাটি পর্যন্ত সারদাদেবীর পাদপদ্মে নিবেদন ক'রে জগতে মাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনি দেবমানব—নরদেহধারী শ্রীভগবান।

কোন্ শক্তিবলে সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা নিয়েছেন? চিন্ময়ী পরমা প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন বোধ না করলে কোন মানবীর পক্ষে, তিনি যেরূপ মহীয়সীই হোন কেন, একি সম্ভব?

তিনি স্বয়ং মহাশক্তি ব'লেই জন্মদিনে সেবক-সন্তানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সকলের হয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে—যারা এসেছে, যারা আসতে পারেনি, যারা ভবিষ্যতে আসবে—সকলের পূজা গ্রহণ করবেন। শ্রীশ্রীমা বললেন, "আজ বিশেষ দিন। আমার জানা অজানা সকলের হয়ে ফুল দাও।" সেবক পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার পর মা বললেন, "ঠাকুর, সকলের ইহকাল পরকাল দেখো। আমি সকলের মা, আমি আর কি ব'লব।"

একটি সন্তানের জননী না হয়েও সকলের যিনি জননী, সবাই যাঁর সন্তান, তিনি স্বয়ং আদ্যাশক্তি, নরলীলায় শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা-সঙ্গিনী।

পৃথিবীর সব দেশের মানুষকে—সমস্ত নর-নারীকে, এমনকি পশু-পাখি-পিপীলিকাটিকে পর্যন্ত তিনি তাঁর অনুপম মাতৃভাব দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন।

সন্তানের প্রতি কী অসীম স্নেহ শ্রীশ্রীমায়ের! তিনি সন্তানের শত অপরাধ ক্ষমা করেন, ক্ষমা ক'রেই নিশ্চিন্ত থাকেন না, শরণাগত সন্তানের সমস্ত দোষকে গুণে পরিণত করেন। তাই-তো স্বামী অভেদানন্দজী মাতৃস্তোত্রে লিখেছেন, 'দোষানশেষান্ সগুণীকরোষি।' মায়ের এমনি মহিমা, এমনি কৃপা, পতিতপাবনী গঙ্গার মতো তিনি সকলকে পবিত্র করছেন! ভালো মন্দ সকল সন্তানের প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের যে স্নেহ, তার দৃষ্টান্ত অন্যত্র সুদুর্লভ। "জগতে সবাই আমার সন্তান"—তাঁর এই কথা থেকেই বোঝা যায় তাঁর স্নেহের প্রসার কতখানি। আচার্য শঙ্করের

"নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্যরত্নাকরী
নির্ধূতাখিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী।"

ইত্যাদি স্তোত্রে জগজ্জননী অন্নপূর্ণার নিত্যা-

নন্দকারিণী বরাভয়দায়িনী পবিত্রতাদায়িনী যে মূর্তি ফুটে উঠেছে, শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে তারই ছবি দেদীপ্যমান !

শ্রীশ্রীমা সঙ্ঘশক্তি—সঙ্ঘের পালয়িত্রী, রক্ষয়িত্রী। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মহাশক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমা যেন একই মুদ্রার এ পিঠ, ও পিঠ। আবার বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমা অভিন্ন। অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি এবং সূর্য ও সূর্যের দীপ্তি যেমন পৃথকভাবে চিন্তা করাই যায় না, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমাকে আলাদা ক'রে ভাবা যায় না, তাঁরা একই সময়ে সমভাবে চিত্তে সমুদ্ভাসিত হন, তাই স্বামী সারদানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের প্রণামমন্ত্রে বলেছেন,

"যথাগ্নের্দাহিকাশক্তিঃ রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা।
সর্ববিদ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম্॥"

দুর্গা দুর্গতিনাশিনী। শ্রীশ্রীদুর্গাদেবী মৃন্ময়ী প্রতিমায় চিন্ময়ীভাবে অর্চিতা হন। সমস্ত দেবতার সমষ্টিশক্তিস্বরূপা জগজ্জননী দুর্গার ঘনীভূত চিন্ময় বিগ্রহ কি সচ্চিদানন্দময়ী সর্বদেবদেবীস্বরূপিণী শ্রীশ্রীমা সারদা ? তাই কি স্বামীজী তাঁকে বলেছেন 'জ্যান্ত দুর্গা' ? শ্রীশ্রীমা দুর্গতিনাশিনী। তিনি সর্ববিধ দুর্গতি, শোক তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা দূর ক'রে পরমানন্দ দান করেন। যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের নয়নে তাই তিনি দুর্গা—'অগ্নিবর্ণা তপসা জ্বলন্তী', আবার 'বহুশোভমানা উমা হৈমবতী' ! .

কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী—একই আদ্যাশক্তি বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন সাধকের চিত্তে উদ্ভাসিত হন। মহাশক্তি কখনও মুক্তিদায়িনী, কখনও দুর্গতিনাশিনী, কখনও ধনদায়িনী, কখনও জ্ঞানদায়িনী। শ্রীশ্রীমা-ও ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষগণের ধ্যাননেত্রে ও ভক্তদের মানসপটে নানারূপে নানাভাবে সুপ্রকট। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে 'জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী' বলেছেন।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী বলেছেন, "মায়ের নাম জপ করি, মা আনন্দময়ী ব'লে! তাঁর নামে ভক্তি, শ্রদ্ধা, বুদ্ধি, ধনদৌলত সবই লাভ হয়। ৺চণ্ডীতেও আছে, তিনি ঋদ্ধি সিদ্ধি সবই দিতে পারেন।" আরও বলেছেন, "ঠাকুর ও মাকে অভেদ দৃষ্টিতে দেখবি। মনে রাখবি, ঠাকুরের কৃপা না হ'লে মাকে পাওয়া যায় না, আবার তেমনি মায়ের কৃপা না হ'লেও ঠাকুরকে পাওয়া যায় না। ঠাকুর যেন নারায়ণ, মা যেন লক্ষ্মী। মায়ের কাছে শক্তি চাইতে হয় শক্তি না হ'লে কোন কাজ হয় না।"

স্বামীজী শেষদিকে একদিন শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম ক'রে বলেছিলেন, "মা, এইটুকু জানি, তোমার আশীর্বাদে আমার মতো তোমার অনেক নরেনের উদ্ভব হবে, শত শত বিবেকানন্দ উদ্ভূত হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও জানি, তোমার মতো মা জগতে ঐ একটিই, আর দ্বিতীয় নেই।"

পরমকরুণাময়ী শ্রীশ্রীমা সন্তানের কল্যাণের জন্য অসুস্থ অবস্থাতেও কত উদ্বিগ্ন থাকতেন, তারই একখানি অপূর্ব চিত্র নিম্নলিখিত ঘটনাটিতে রয়েছে :

মা রাত্রে জেগে আছেন মনে ক'রে সেবক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মা, আপনি কি ঘুমাননি, ঘুম কি হচ্ছে না ?" উত্তরে মা বললেন, "কি আর করি, বাবা ? ছেলেরা সব ব্যাকুল হয়ে ধরে এবং আগ্রহ ক'রে তখন দীক্ষাটি নিয়ে যায়, কিন্তু কেউ নিয়মিত জপ করে না, নিয়মিত কেন কেউ বা কিছুই করে না। তা বাবা, যখন তাদের ভার নিয়েছি, তখন আমাকেই তো তাদের দেখতে

হবে। তাই জপ করি আর ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি—'ঠাকুর, ওদের চৈতন্য দাও, মুক্তি দাও, ওদের ইহকাল পরকাল সব তুমিই দেখো, এ সংসারে বড় দুঃখকষ্ট।'"

এই সব কথা বলতে বলতে শ্রীশ্রীমা অতি ধীরে ধীরে উঠে বসতেন, আবার বলতেন, "এত আগ্রহ ক'রে মন্ত্রটি তো নিয়ে গেল, কিন্তু কিছু করে না কেন? এমন আর কি শক্ত! একটু অভ্যাস ক'রে করতে থাকলেই তো কেমন আনন্দ আসে! আহা, যোগেন (যোগেন-মা) ও আমি বৃন্দাবনে যখন ছিলুম, কি আনন্দেই কত জপ করতুম! চোখে মুখে মাছি বসে ঘা ক'রে দিত। কোন হুঁশ হ'ত না। সে-সব কী দিনই গেছে!"

মা বলতেন, "বাবা, যার আছে সে মাপো, যার নেই সে জপো" - অর্থাৎ সৎ কাজে অর্থাদি দান করো, আর অর্থ না থাকে জপ করো। আরও বলতেন, "এত জপ করলামই বলো আর তপ করলামই বলো, তাঁর কাছে এসব কিছুই নয়। মহামায়া দয়া ক'রে পথ ছেড়ে না দিলে জীবের কার কি সাধ্য? হে জীব, কেবল শরণাগত হও, তবেই তিনি দয়া ক'রে পথ ছেড়ে দেবেন।" শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এই কথাই রয়েছে—"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।" তিনি শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণ-পরায়ণা।

ওড়িশায় দুর্ভিক্ষের সময় (১৯১৮) শ্রীশ্রীমায়ের হৃদয় দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট জনগণের জন্য কেমন কেঁদেছিল, এই কথাগুলিতে বোঝা যায়:

শ্রীশ্রীমা চিঠিতে দুর্ভিক্ষের সংবাদ শুনে চোখের জল ফেলছেন ও বলছেন, "ঠাকুর, লোকের দুঃখকষ্ট আর দেখতে শুনতে পারিনে। তাদের দুঃখজ্বালার অবসান কর।" স্বামী সারদানন্দজীর দুর্ভিক্ষের সেবাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বলছেন, "শরতের দিল দেখলে? যেন বাসুকি—যেখানে জল পড়ে, শরৎ আমার সেখানেই ছাতা ধরে! শরতের মতো অমন দিলদরিয়া লোক, জীবের দুঃখে এত প্রাণ কাঁদা—সকলকে পালন করছে, অন্নদান করছে, যেন পালনকর্তা! ঠাকুর, রাশ ঠেলে দাও, সকলকে দেবার জন্যে তার দু'হাত ভ'রে দাও।"

অনেকে বলেন, শ্রীশ্রীমায়ের নিকট যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় উপবেশন ক'রে যাঁদের তাঁর কৃপালাভের সৌভাগ্য হয়েছিল, তাঁরা প্রত্যেকেই মনে করতেন, মা তাঁকেই যেন সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। আসল কথা এই—প্রত্যেকের সুখদুঃখাদির সহিত শ্রীশ্রীমায়ের প্রগাঢ় সমবেদনা ছিল। প্রত্যেকের মনের ভাব ধরবার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল। বৃদ্ধা মজুরনীর রোজগারী পুত্রের চিরবিরহে শোকে অভিভূত হয়ে মা হাউ হাউ ক'রে কেঁদেছিলেন। সংসার অনিত্য, শোক ক'রে কী হবে—ইত্যাদি না ব'লে তার শোক যেন নিজের শোক, এইভাবে অনুভব করেছিলেন, তার রুক্ষমাথায় তেল ও এক কোঁচর মুড়ি দিয়েছিলেন এবং আবার আসতে বলেছিলেন। সান্ত্বনা-দানের এমনি অজস্র ঘটনা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে আছে। আর্তের আর্তি তাঁর নিজেরই যেন!

সংসারে নানা ঝামেলার মধ্যে অবস্থান ক'রে কিভাবে ভগবান লাভ করতে হয়, শ্রীশ্রীমা তাঁর জীবনে তা দেখিয়ে গেছেন। সম্পূর্ণ নির্লিপ্ততার দৃষ্টান্ত তাঁর মহিমান্বিত জীবন। পদ্মপত্রে জলের মতো অসংসক্ত-অনাসক্ত এ মহাজীবন!

প্রাচীনঐতিহ্যমণ্ডিত সুপবিত্র ব্রাহ্মণকুলোদ্ভবা হয়েও তিনি কুলমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে সর্বসংস্কার-

বিমুক্ত ছিলেন, তাঁর মধ্যে কোনপ্রকার গোঁড়ামির ভাব ছিল না ; তাই দেখা যায় বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন ধর্মের নরনারী তাঁর কাছে সমভাবে সমাদৃত হচ্ছেন। বর্তমানে যখন ভারতীয় মহান্ আদর্শের দ্বারে নানা সংঘাত এসে করাঘাত করছে, তখন নারীজাতির সম্মুখে শ্রীশ্রীমায়ের সর্বভাবে ভাস্বর জীবনটি অতুলনীয় দিগ্‌বর্তিকাস্বরূপ।

অচিন্তনীয় বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারিণী তিনি—যুগকল্যাণে নরদেহে অবতীর্ণা মহাশক্তি জগজ্জননী। তিনি পূর্বে সীতারূপে এসেছিলেন, তা-ও তাঁর কথাতেই পাওয়া যায়। সকল অবস্থাতেই তাঁর অন্তরে 'আনন্দের পূর্ণঘট' বসানো থাকত এবং সর্বদা তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণভাবে বিভোর দেখা যেত।

"রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং তন্নামশ্রবণপ্রিয়াম্।
তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥"

জননী মোর এলে !

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

আমার আঁধার জীবন মাঝে জ্যোতির আলো জেলে,
বিশ্বময়ী মূর্তি ল'য়ে জননি মোর এলে !
সকল রূপে স্বরূপ ধ'রি,
উঠলে জেগে বিশ্ব ভ'রি,
স্নেহ-সরস হৃদয়খানি ধরায় দিলে মেলে !

স্থূলে তুমি, সূক্ষ্মে তুমি—ব্যষ্টি-সমষ্টিতে,
নেমে এলে কৃপার বশে আজ যে আচম্বিতে !
আছ তুমি যে দিকে চাই,
তুমি ছাড়া আর কিছু নাই,
সর্বব্যাপী প্রকাশ তোমার হেরি সর্বভিতে !

বিহঙ্গ আজ গান ধরেছে মিলন-মধুর-সুরে,
জীবনভরা বিষাদ-ব্যথা গেল যে কোন্ দূরে !
তোমার আগমনীর গানে,
মন ছুটেছে তোমার পানে,
তোমার আবির্ভাবের সাড়া জাগলো জগৎ জুড়ে !

চিরদিনের মা তুমি গো—আর ত' কেহ নহ,
এমনি ক'রেই হৃদয়ে মোর চিরদিনই রহ !
এমনি ক'রেই আঁধার টুটে,
আলোক তোমার উঠুক ফুটে,
তোমার রাতুল-চরণ-তলে প্রণাম আমার লহ !

আবার চাঁদের দেশে ঃ

(অ্যাপোলো-১২)

শিবদাস

এই মাস চারেক আগে অ্যাপোলো-১১ যানে চড়ে নীল আর্মস্ট্রং ও এডুইন অ্যালড্রিন চাঁদে নেমে ফিরে এলেন, মানুষের সাধনার বিপুল জয়গানে মানুষের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সূচিত ক'রে। সম্প্রতি আবার অ্যাপোলো-১২ মহাকাশযানে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের দ্বিতীয় অভিযান সফল করে নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছেন রিচার্ড গর্ডন (মূল যানের চালক), চার্লস কনরাড (অভিযানের নেতা) ও অ্যালেন বীন (চন্দ্রযানের চালক)। চাঁদে নেমেছিলেন কনরাড ও বীন। গত ১৪ই নভেম্বর যাত্রা করে ২৪৪ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটে যাওয়া-আসা নিয়ে পাঁচ লক্ষ মাইল মতো পথ চলা শেষ করে তাঁরা পৃথিবীতে ফিরেছেন গত ২৫শে নভেম্বর।

এই দ্বিতীয় অভিযানে যাত্রা-ও প্রত্যাবর্তন-পথের প্রায় সব বিবরণই আগের অ্যাপোলো-১১ অভিযানের মতো, যার বিস্তারিত পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে এ-অভিযানের কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব আছে, বিশেষ করে সেগুলিই আলোচনা করা যাবে এখানে।

গত ১৪ই নভেম্বর, রাত্রি ৯-৫৩ মিনিটে[১] অ্যাপোলো-১২ আমেরিকার কেপ কেনেডি উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়। অ্যাপোলো-১১র মতই বিশালকায় বিপুলশক্তি স্যাটার্ন-৫ রকেট তাকে ১১ মিনিটের মধ্যেই ১৮০ মাইল ওপরে তুলে পৃথিবীর কক্ষে স্থাপন করে এবং যানটি দ্বিতীয়বার পৃথিবী পরিক্রমা করার মুখেই তাকে চন্দ্রাভিমুখী ক'রে ঘণ্টায় প্রায় ২৫ হাজার মাইল বেগে মহাশূন্যে ছুঁড়ে দেয়।

চাঁদের কাছে পৌঁছানোর জন্য আপোলো-১১ মহাশূন্যে এমন একটি পথ বেছে নিয়েছিল (free return trajectory), যে পথে চলার সময় যানের ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেলে চাঁদে নামা হত না বটে কিন্তু চাঁদের বুকে আছড়ে পড়ার কোন ভয় ছিল না, চাঁদকে ছাড়িয়ে সূর্যের দিকে চলে যাবারও না ;—চাঁদের ওপাশে গেলে সেখানে চাঁদ ও পৃথিবীর একমুখী টান তাকে পৃথিবীতেই নির্বিঘ্নে ফিরিয়ে আনতো। অ্যাপোলো-১২ কিন্তু সে পথ ধরল না ; কারণ এবারে অভিযাত্রীরা চন্দ্রযানকে চন্দ্রপৃষ্ঠে ঠিক একটি নির্দিষ্ট স্থানে নামাতে চায় একটুও এদিক-ওদিক না করে,— আগের পথে গেলে যা সম্ভব হবে না। তাই তারা বিপদের ঝুঁকি নিয়েই নতুন পথ ধরল (hybrid trajectory)। অবশ্য এমন ব্যবস্থা ছিল, মাঝপথে যদি দেখা যায় যন্ত্রযানের (Service Module) ইঞ্জিন অচল হয়েছে, তাহলে অভিযাত্রীরা চন্দ্রযানের ইঞ্জিন চালিয়ে পথ বদল করে নিরাপদ পথ ধরতে পারবেন।

যাত্রার প্রারম্ভেই এক অনর্থপাত। যানটি যখন উৎক্ষিপ্ত হল, তখন কেপ-কেনেডি অঞ্চলে খুব দুর্যোগ, ঝঞ্ঝাবাত চলছিল। তা উপেক্ষা করেই যান উঠল—এতে তার কি করবে?

১ প্রবন্ধে উল্লিখিত সব সময়ই ভারতীয় সময়

তাছাড়া যাত্রার 'মাহেন্দ্রক্ষণ' (Window)[২] এসে গিয়েছিল, যার মধ্যে যাত্রা না করতে পারলে সে ক্ষণের জন্য আরো দুদিন অপেক্ষা করতে হবে, সেবারেও না পারলে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। ওঠার পরই উৎক্ষেপণ-পরিচালন-কেন্দ্র থেকে পরিচালক দেখলেন, সর্বনাশ, যান থেকে তথ্য আসাই বন্ধ হয়ে গেছে! বলে উঠলেন, "একি হল, আমি যে হতবুদ্ধি হয়ে গেছি! যানের ওপর বাজ পড়ে এরকম হল নাকি?" সত্যিই বাজ পড়ে যানের ভিতরকার যন্ত্রগুলিতে বিদ্যুৎ-চলাচল অল্প কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যানের ভেতর যাত্রীরাও বিপদের সঙ্কেত পেয়েছিলেন—বিপদসূচক অনেকগুলি লাল আলো জ্বলে উঠতে দেখে; কিন্তু অবিচলিত থেকেই উত্তর দিলেন তাঁরা, "আমাদের হতবুদ্ধি হবার সময় নেই এখন, আমরা এগিয়ে চলেছি।" অল্পক্ষণের মধ্যেই অবশ্য সব আবার আপনা আপনি ঠিক হয়ে যায়। বাজ পড়েছিল এটা তখন অনুমান করে নেওয়া হল; কিন্তু তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েছিলেন কনরাড ২০শে নভেম্বর; চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে উঠে চন্দ্রযান যখন মূলযানের (Command Module) সঙ্গে সংযুক্ত হতে চলেছে, দুটি যানের ব্যবধান খুব কমে এসেছে, তখন কনরাড বলে উঠলেন, "ঐ যে দেখা যাচ্ছে, মূলযানের মাথার দিকে খানিকটা জায়গার রং জ্বলে গেছে! ওখানটাতেই বাজ পড়েছিল তাহলে।"

চাঁদের পথ ধরার কিছু পরেই ১৫ই নভেম্বর রাত্রি ১-১২ মিনিটের সময়ে অভিযাত্রীরা চন্দ্রযানকে মূলযানের পিছন থেকে সামনে নিয়ে এলেন, অ্যাপোলো-১১ যেভাবে করেছিল সেভাবে। এবারের চন্দ্রযানটির নাম দেওয়া হয়েছে 'Intrepid,' অর্থাৎ 'নির্ভীক'। পৃথিবী ও চাঁদের বিপরীতমুখী আকর্ষণ সেখানে যানটির উপর সমপরিমাণ, সেই 'গোধূলি'-ক্ষেত্রে (Twilight) যানটি পৌঁছল ১৭ই নভেম্বর রাত্রি ৭-৮ মিনিটে (পৃথিবী তখন ২,১১,৩২২ মাইল দূরে, চাঁদ ৩৮,৯৩৩ মাইল), এবং চাঁদের পাশ দিয়ে চাঁদের ওপারে গিয়ে চন্দ্রপরিক্রমা শুরু করল ১৮ই নভেম্বর সকালে। চাঁদের ৭০ মাইল ওপর দিয়ে সারা দিনরাত চাঁদকে বার বার পরিক্রমা করার পর পরদিন (১৯শে) সকালে কনরাড ও বীন মূলযান থেকে চন্দ্রযানে প্রবেশ করলেন; কিছু পরে মূলযান থেকে চন্দ্রযানকে বিচ্ছিন্ন করা হল।

এবারের এই বিচ্ছিন্ন করার পদ্ধতি আগের বারের থেকে আলাদা। অ্যাপোলো-১১ অভিযানে দুটি যান আলগা করার পর মূলযান চন্দ্রযানকে সামনের দিকে একটু জোর দিয়ে ঠেলে দিয়েছিল। এই একটু ঠেলে দেওয়ায় চন্দ্রযান 'ঈগলের' সামান্য গতিবৃদ্ধির ফলে যেখানে তার

২ চাঁদ নিজের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, পৃথিবীও নিজের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে চাঁদকে সঙ্গে নিয়ে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। এই বহুবিধ বহুমুখী গতির হিজিবিজির মধ্যে হিসেব করে পৃথিবী থেকে গিয়ে চাঁদের ওপর কোন বিশেষ স্থানে নামার পক্ষে চাঁদ ও পৃথিবীর কয়েকটি বিশেষ অবস্থান খুবই উপযোগী হয়। এই সব উপযোগী অবস্থানগুলির মধ্যেও আবার বাছাবাছি আছে, বিশেষ তিথিতে তা পড়া চাই; কারণ চাঁদের যেখানটায় নামা হবে সেখানে তখন চাঁদের প্রভাতকাল হওয়া চাই, অর্থাৎ সেখানকার দিক্‌চক্রবাল থেকে ৫° ডিগ্রী হতে ২০°-র মধ্যে সূর্য থাকা চাই, যাতে আলোও থাকে এবং যাত্রীদের সেখানে উঁচু-নীচু সহজে বোঝার জন্য চন্দ্রপৃষ্ঠে বস্তুর ছায়াও খুব লম্বা হয়ে পড়ে। সব দিক থেকে যাত্রার বিশেষ উপযোগী সময়গুলিকে মহাকাশবিজ্ঞানের অভিধানে 'Window' বলে।

অবশ্য তত্ত্বের দিক থেকে যে-কোন সময় যাত্রা করে চাঁদের যে-কোন স্থানে নামা সম্ভব, কিন্তু তাতে এত বেশী জ্বালানি চাঁদ পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে হবে, যা বর্তমানে সম্ভব নয়।

নামার কথা ঠিক সেখানে নামতে পারেনি। এবারে তাই দুটি যান আলগা করার পর মূলযান গতি কমিয়ে নিজেই একটু পিছিয়ে এসে চন্দ্রযান থেকে বিচ্ছিন্ন হল; এতে চন্দ্রযান 'নির্ভীকে'র গতিতে কোন তারতম্য ঘটাতে হল না।

মূলযান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর চন্দ্রযান 'নির্ভীক' আপন গতিবেগে কিছুক্ষণ চন্দ্র পরিক্রমা করার পর ১২-১৬ মিনিটের সময় নিজের ইঞ্জিন চালু করে চাঁদে নামতে লাগল, চন্দ্রপৃষ্ঠ স্পর্শ করল দুপুর ১২-২৪ মিনিটে (১৯শে)। নামল চাঁদের ঝঞ্ঝাসাগরে ঠিক পূর্বপরিকল্পিত স্থানেই[৩]—আড়াই বছর আগে আমেরিকার যাত্রিহীন যান 'সার্ভেয়ার-৩' যেখানে নেমেছিল এবং এখনো যেখানে আছে, তা থেকে মাত্র ৬০০' ফুট দূরে। এবারকার অভিযানের বিশেষ লক্ষ্যই ছিল সার্ভেয়ার-তিনের খুব কাছে নামা—যাতে চন্দ্রযান থেকে নেমে সেটির কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যায় ও তার কিছু অংশ খুলে সঙ্গেও নিয়ে আসা যায়। 'নির্ভীকের' অবতরণ খুবই সাফল্যমণ্ডিত হল, সে লক্ষ্যলাভ হল।

সার্ভেয়ার-৩ নেমেছিল একটি বড় গর্তের মধ্যে; চন্দ্রযান সে গর্তটির ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে নামল ওপাশের কিনার থেকে মাত্র ২০' ফুট দূরে। কনরাড বলেছেন, "যদি ২০' পিছিয়ে নামতাম, তাহলে গর্তের মধ্যেই নামতে হত।"

চন্দ্রযান 'নির্ভীক' চন্দ্রপৃষ্ঠ স্পর্শ করার প্রায় ৫ ঘণ্টা পরে, বিকাল ৫টা ১৪ মিনিটের সময় (১৯শে) প্রথমে কনরাড চন্দ্রপৃষ্ঠে নামলেন, বীন নামলেন ৫-৪৪ মিনিটে। নামার পর অ্যাপোলো-১১ অভিযাত্রীদের মতো আগেই কিছু চাঁদের পাথর কুড়িয়ে যানে রাখলেন, যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা বসালেন চাঁদের ওপর। তারপর যান থেকে একটা যন্ত্রের প্যাকেট বের করলেন, যার ওজন পৃথিবীতে ১২৬ কিলো; চাঁদের অভিকর্ষ পৃথিবীর অভিকর্ষের ছয়-ভাগের একভাগ ব'লে চাঁদে তার ওজন মাত্র ২১ কিলো। এর ভেতর অনেকগুলো যন্ত্র ছিল যা অভিযাত্রীরা চাঁদে বসিয়ে এলেন—একটা ছোট-খাট পরীক্ষাগারই স্থাপন করলেন সেখানে যা একবছর ধরে সব সময় চালু থাকবে। যন্ত্র-গুলিকে শক্তি যোগাবে একটি পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র। এবারের অভিযানের এও একটি বৈশিষ্ট্য; আগের অভিযানে যে-যন্ত্র চাঁদে রেখে আসা হয়েছে, তার শক্তির উৎস সূর্য-কিরণ, তাই চাঁদের দিনের বেলা তা সক্রিয় থাকে, রাতে নিষ্ক্রিয় (চাঁদে দিন ৩৪০ ঘণ্টায়,

৩ চন্দ্রপৃষ্ঠে ২°৯৩° দক্ষিণে, ২৩°৪৫° পশ্চিমে (উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৭৬ সংখ্যার ৫২৬ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চাঁদের মানচিত্রে '৮' চিহ্নিত স্থান)। খালি চোখে দেখে অ্যাপোলো-১২-র এই অবতরণ স্থানটি সম্বন্ধে মোটামুটি খানিকটা ধারণা করতে পারি আমরা। পূর্ণিমার দিন চাঁদের যে দিকটা আমরা গোল থালার মতো দেখতে পাই (শুধু একটি দিকই দেখতে পাই আমরা) তার ঠিক মাঝখান দিয়ে ওপর নীচে লাইন টেনে চাঁদকে যদি দুভাগ করি, তাহলে তার বাঁদিকে যে অনেকটা কালো দাগ দেখা যায়, তার একেবারে বাঁদিক ঘেঁষা অধিকাংশই হল ঝঞ্ঝাসাগরের এলাকা। ডাইনে-বাঁয়ে আর একটা রেখা টেনে (এটিকে চাঁদের বিষুবরেখা বলা হয়) চাঁদকে যদি আমরা ওপরে-নীচে সমান দুভাগ করি, তাহলে এই দুটি রেখা যেখানে পরস্পরকে ছেদ করছে সেখান থেকে, চাঁদের এই কেন্দ্রবিন্দু থেকে, এই বিষুবরেখা ধরে বাঁ-দিকে এগিয়ে গেলে চাঁদের কেন্দ্রবিন্দু থেকে বাঁ-কিনারার মাঝামাঝি পৌঁছুবার খানিকটা আগেই 'নির্ভীক'-এর অবতরণ-স্থলের কাছাকাছি পৌঁছুব। আসলে অবতরণ-স্থানটি কেন্দ্রবিন্দু থেকে যতখানি খানি বাঁয়ে, অবতরণ-স্থানটি থেকে বাঁ-কিনারার দূরত্ব তার আড়াইগুণেরও বেশী, চাঁদকে ফুটবলের মতো বর্তুলাকার না দেখে থালার মতো গোলাকার দেখি বলেই এরকম মনে হবে। অ্যাপোলো-১১ অভিযানে ঈগল' নেমে-ছিল কেন্দ্রবিন্দু থেকে প্রায় এতখানিই দূরে, ডাইনে (০°৭° উত্তরে, ২৩°৬° পূর্বে); আগে যে ২৪টি যাত্রিহীন যান চন্দ্রপৃষ্ঠ স্পর্শ করেছে, তারও অধিকাংশই নেমেছে এই বিষুব রেখার কাছাকাছি—৪টি ছাড়া আর সবই বিষুবরেখার ১০° ডিগ্রী উত্তর বা দক্ষিণের এলাকাতেই। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে অ্যাপোলো-৮, ১০, ১১ ও ১২ সব যাত্রিবাহী যানগুলি যাত্রাও করেছিল পৃথিবীর বিষুবরেখার ওপর থেকেই।

রাতও তাই)। চাঁদে এই প্রথম পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার হল।

যন্ত্রের প্যাকেটটিকে বের করে কনরাড ও বীন যান থেকে ১,০০০´ দূরে বয়ে নিয়ে গেলেন। সেখানে প্যাকেট খুলে যন্ত্রগুলি বের করে বসাতে লাগলেন। এতটা দূরে বসাবার কারণ, তাঁরা যখন চন্দ্রযানের ওপরের অংশ চালু করে ফিরে যাবেন, তখন তার ইঞ্জিন যে-বেগে গ্যাস ও আগুন ছড়াবে, তার কোন প্রতিক্রিয়া যেন যন্ত্রগুলিকে নষ্ট করতে না পারে। প্রথমে তাঁরা বসালেন (১) বেতার-গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্র, যা অন্য যন্ত্রগুলি দ্বারা আহৃত তথ্য গ্রহণ করবে এবং বেতারযোগে পৃথিবীতে পাঠাবে। একই সঙ্গে তিনটি যন্ত্রের সঙ্কেত পাঠাবার মতো ব্যবস্থা এতে করা আছে; প্রয়োজন হলে পৃথিবী থেকে নির্দেশ পেয়ে কোন একটি বিশেষ যন্ত্র থেকে তথ্য আহরণ করে পাঠাবার ব্যবস্থাও আছে। এরই কাছে একটু দূরে বসালেন (২) পারমাণবিক শক্তি-উৎপাদক যন্ত্র; 'প্লুটো-নিয়াম ২৩৮' এতে শক্তি সঞ্চার করবে। এই শক্তি-উৎপাদক যন্ত্রটির চারিদিকে এটিকে কেন্দ্র করে ১০০´ দূরে দূরে তাঁরা পাঁচটি যন্ত্র বসালেন; বেতারযন্ত্র এবং এই পাঁচটি যন্ত্রকে শক্তি-উৎপাদক যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করলেন তার দিয়ে। যন্ত্রগুলি হল: চাঁদের কম্পন মাপার জন্য (৩) ভূমিকম্প মাপার যন্ত্র (Seismometre); (৪) চাঁদের চৌম্বকক্ষেত্র মাপার যন্ত্র (Magnetometre); (৫) সূর্য থেকে চাঁদে যে-সব পরমাণু আসছে তা নির্ণয়ের যন্ত্র (Solar wind Spectrometre); (৬) চাঁদের আবহমণ্ডল নেই; তবু, খুব পাতলা ভাবে খুব অল্প পরিমাণ কোন গ্যাস চন্দ্রপৃষ্ঠের পাথর থেকে বা চাঁদের অভ্যন্তর থেকে বেরুতে পারে, সূর্য থেকেও চাঁদে আসতে পারে; যদি তা হয়, তাহলে সেগুলি কোন্ কোন্ গ্যাস তা জানার এবং সেগুলিকে বিশ্লেষণ করার যন্ত্র (Cold Cathode Gauge); এবং (৭) আয়ন-কণা পরিমাপক যন্ত্র (Suprathermal Ion Detector)।

যন্ত্রগুলি বসাবার পর কনরাড ও বীন চন্দ্র-পৃষ্ঠ থেকে পাথর ও চাঁদের মাটি সংগ্রহের কাজে লেগে গেলেন। আগের অভিযানেও চাঁদের মাটি আনা হয়েছিল, তবে তা এলোমেলোভাবে কুড়িয়ে; এবারে প্রত্যেকটি স্থান থেকে মাটি বা পাথর নেবার জন্য খোড়ার আগে ও নেবার পরে সেখানকার ফটো তুলে নেওয়া হল। এবারে পাথর আনাও হয়েছে বেশী, প্রায় ৪০ কিলো।

এই সব কাজ সেরে কনরাড ও বীন যানে ফিরে গেলেন। প্রায় চার ঘণ্টার মত সময় লাগলো তাঁদের। তারপর খাওয়া দাওয়া করে প্রায় ৯ ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে দ্বিতীয় বার চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের জন্য তৈরী হলেন। আগের পোষাকে আঁটা অক্সিজেন প্রভৃতি ৪ ঘণ্টার কিছু বেশীক্ষণ চলার মতো হিসেব করে দেওয়া ছিল। অবশ্য প্রথম বারে দেখা গেছে চাঁদে অভিকর্ষ কম বলে অক্সিজেন কম লাগে, হিসাবের চেয়ে বেশী সময় চলতে পারে দেওয়া অক্সিজেনে। এবারে আবার নতুন করে অক্সিজেন সঙ্গে নেওয়া হল। যানের ভেতরে পোষাক পরা থেকে শুরু ক'রে ফিরে এসে পোষাক খোলা পর্যন্ত এই অক্সিজেনই তাঁদের শ্বাস নেবার একমাত্র অবলম্বন। যানের ভেতরের জন্য অবশ্য ৪০ ঘণ্টা শ্বাস নেবার মত অক্সিজেনের ব্যবস্থা ছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করার জন্য কনরাড চন্দ্রপৃষ্ঠে নামলেন ২০শে নভেম্বর সকাল ৯-৩১ মিনিটে, বীন ৯-৪০ মিনিটে। তারপর

সোজা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন সার্ভেয়ার-৩ যে গর্তটার ভেতর রয়েছে, তার কিনারায়। দেখলেন গর্তটির কিনারা ধাপে ধাপে নেমে গেছে। নামার পথ ঠিক করে নিয়ে তাঁরা নামতে লাগলেন। তাঁদের বলে দেওয়া হয়েছিল, এই গর্তে নামার সময় খুব সাবধান, প্রতি পদক্ষেপ দেখে দেখে যেন নামেন তাঁরা; কারণ চাঁদের ওপরে যে-পরিমাণ ধূলো জমে আছে, এখানে তার চেয়ে বেশী থাকারই সম্ভাবনা, তাছাড়া পিছলিয়ে পড়ে যাবার ভয়ও আছে। কিন্তু ওঁরা চলার সময় দেখলেন তা নয়, বরং এখানকার জমি ওপরের চেয়ে বেশী শক্ত। দেখলেন, গর্তটির ভেতরকার জমি লাঙ্গল-চষা ক্ষেতের মত দেখাচ্ছে।

সার্ভেয়ার ৩-এর কাছে যেতেই পৃথিবী থেকে প্রশ্ন হল "যানটির রং কেমন দেখছ?" কনরাড বললেন, "হালকা তামাটে (light tan)।" যানটির রং ছিল সাদা ও ফিকে নীল; চাঁদে আড়াই বছর প্রচণ্ড গরম ও ঠাণ্ডায় থেকে তা তামাটে হয়ে গেছে। চাঁদে দিনে তাপমাত্রা ওঠে প্রায় ২৪০° ফারেণহিটে, রাত্রে নামে শূন্যের নীচে ২৭৯° ডিগ্রীতে; ৫০০° ডিগ্রীরও বেশী তফাত দিনে ও রাতে। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল সার্ভেয়ার-৩ চাঁদে নামার সময় বার দুই লাফিয়ে ওঠে, পায়াগুলো একটু হড়কে যায়, চাঁদের বুকে তার দাগ সার্ভেয়ারের পাঠানো ছবিতেই ছিল; এখনো সে দাগগুলি চাঁদে আছে কি না, থাকলে কি অবস্থায় আছে, তা জানার জন্য বিজ্ঞানীরা উদ্‌গ্রীব। কনরাড দেখলেন, দাগ এখনো আছে—ছবি তুললেন। আশপাশের জমির ছবি, সার্ভেয়ার-৩-এর ছবি, সবই তুললেন। আড়াই বছর চাঁদে থাকার পর পৃথিবীর বস্তুর ওপর কি প্রতিক্রিয়া হল, তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য সার্ভেয়ার-৩-এর কিছু অংশ তাঁরা খুলে নিলেন—এ্যালুমিনিয়াম টিউব খানিকটা, টেলিভিসন কামেরাটি, বিদ্যুৎ-সরবরাহের তার কিছুটা এবং একখণ্ড কাঁচ। দেখলেন, সার্ভেয়ারের কাঁচ একখানিও ভাঙ্গেনি।

সার্ভেয়ার-৩ চাঁদে নামার সময় এবং নামার পরও কিছুদিন কেবল যে ছবি তুলে পাঠিয়েছিল তাই নয়, একটা হাতল দিয়ে চাঁদের মাটি খুঁড়ে তুলে এনে যানের ভিতরকার স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষাগারে তা পরীক্ষা করে পরীক্ষার ফলাফল পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল। যাত্রিহীন যান হলেও সার্ভেয়ার-৩-এর নিরাপদে চাঁদে নেমে এইসব তথ্যসংগ্রহ ক'রে পৃথিবীতে পাঠানোর গুরুত্ব ছিল তখন খুবই বেশী—তা প্রভূত সহায়তা করেছে চাঁদে মানুষ নামার কাজে।

এসব কাজ সেরে, সেখান থেকেও কিছু পাথর সংগ্রহ করে কনরাড আর বীন ফিরে এলেন চন্দ্রযানে, চার ঘণ্টার মধ্যেই।

চন্দ্রপৃষ্ঠে দ্বিতীয় বার নামা ও কাজ করার সময় অভিযাত্রীরা তৃষ্ণার্ত বোধ করেছিলেন। মাঝে একবার বিশ্রামও করতে হয়েছিল তাঁদের। কনরাড একবার পড়েও গিয়েছিলেন। এবারে চাঁদে নেমে তাঁরা বলেছিলেন, চাঁদের এ অঞ্চলে ধূলো খুব বেশী; কাঁচের টুকরোও তাঁদের চোখে পড়েছিল। দুবারে মিলে তাঁরা চাঁদে হেঁটে বেড়িয়েছেন আট ঘণ্টারও বেশী। যান থেকে ১২০০′ দূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন; অবশ্য ৩০০০′ ফুট পর্যন্ত গিয়ে নির্বিঘ্নে ফিরে আসার মতো ব্যবস্থা ছিল।

চন্দ্রযানে ফিরে আসার পর কনরাড ও বীন—বিশ্রাম করলেন কয়েক ঘণ্টা। তারপর ২০শে নভেম্বর সন্ধ্যা ৭-৫৫ মিনিটের সময় চন্দ্রপৃষ্ঠে যান নামার ৩১½ ঘণ্টা পরে চন্দ্রযানের

ইঞ্জিন চালু করে চন্দ্রপৃষ্ঠ ত্যাগ করলেন। ওপরে উঠে মূল যানের (Command Module) সঙ্গে তাঁদের যান সংযুক্ত হল সাড়ে তিনঘণ্টা পরে, রাত্রি ১১-৩১ মিনিটের সময়। কম্যাণ্ড মডিউলে এসে রিচার্ড গর্ডনের সঙ্গে মিলিত হলেন তাঁরা; গর্ডন এতক্ষণ একা একাই চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭০ মাইল ওপরে থেকে দুঘণ্টায় একবার করে চন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করেই চলেছিলেন

মূল যানে ফিরে আসার পর আর একটি কাজ করা হল। চাঁদ থেকে আনা পাথর ও অন্যান্য জিনিসপত্র চন্দ্রযান থেকে সরিয়ে আনার পর যানটিকে বিচ্ছিন্ন করে, যেখানে কনরাড ও বীন যন্ত্রপাতি বসিয়ে এসেছিলেন, সেখান থেকে কয়েক মাইল দূরের একটি লক্ষ্যের দিকে তাগ করে চালিত করা হল (বেতার-নিয়ন্ত্রণে)—যাতে সেটা সেখানে চাঁদের বুকে আছড়ে পড়ে। এর ফলে যে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগবে (১৬০০ পাউণ্ড টি-এন-টি বিস্ফোরণের সমান জোরের ধাক্কা), তাতে চাঁদের জমি কেঁপে উঠবে। সে-কম্পনের বেগ চাঁদে বসানো যন্ত্র ধরেছিল এবং পৃথিবীতে পাঠিয়েও ছিল; চাঁদের মাটি কেঁপে-ছিল প্রায় আধঘণ্টা পর্যন্ত। এই তথ্যটুকুরও গুরুত্ব অনেক। কারণ যন্ত্রটি পরে যা সব কম্পনের তথ্য পাঠাবে, সে-কম্পনের উৎস যন্ত্র থেকে কতদূরে এবং উৎস-মুখে তার জোর কতখানি, তা এখনো সঠিক জানার উপায় নেই, তা অনুমান-সাপেক্ষ; চন্দ্রযান আছড়ে ফেলে যে-কম্পন সৃষ্টি করা হল, তাতে কিন্তু বিজ্ঞানীরা দুই-ই জানতে পারলেন, যার ফলে, তাঁরা মনে করেন, চাঁদের আভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধে খুব মূল্যবান ইঙ্গিতও পেয়েছেন; তবে তা যে কি, তা এখনো ভেঙ্গে বলেননি।

এরপর চাঁদের চারপাশে আরো একদিন ধরে ঘুরলেন তিনজন মিলে, চাঁদের অনেক ফটো তুললেন সেখান থেকেই। তারপর পৃথিবীর দিকে ফেরা শুরু করলেন ২২শে নভেম্বর রাত্রি ২-১৮ মিনিটে।

পৃথিবী থেকে যাত্রার সময় চাঁদের দিকে ঠেলে দিয়েই বিরাটকায় সাটার্ন-৫-এর সব অংশই অ্যাপোলো-১২ যান থেকে খসে গিয়েছিল; ছিল শুধু চন্দ্রযান (দুই অংশ সংযুক্ত হয়ে), মূল যান ও যন্ত্রযান। চন্দ্রযানের নীচের অংশ তো চাঁদেই রেখে আসা হয়েছিল, অপর অংশটিকে চাঁদে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল, ফেরার সময় অবশিষ্ট ছিল শুধু মূল যান ও যন্ত্র-যান। গত ২৫শে নভেম্বর পৃথিবীর আবহ-মণ্ডলের কাছাকাছি এসে রাত্রি ২টার সময় চন্দ্রযানকেও বিচ্ছিন্ন করে কেবল মূল যান যাত্রী তিন জনকে নিয়ে আবহমণ্ডলে (পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪০,০০০′ ফুট ওপরে) প্রবেশ করল রাত্রি ২-১৪ মিনিটে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করল রাত্রি ২টা ২৮ মিনিটে

যাত্রীদের এবারেও আগের মত ২১ দিন আলাদা রেখে দেওয়া হবে, চাঁদ থেকে পৃথিবীর জীবের পক্ষে মারাত্মক কোন জীবাণু তাঁরা সঙ্গে এনেছেন কি না দেখার জন্য—যদিও, আগের বারে যা দেখা গেছে, তার সম্ভাবনা নেই। এবারেও যদি দেখা যায় চাঁদে সেরূপ কোন জীবাণু নেই, এর পরবর্তী কোন চন্দ্রাভিযানের যাত্রীদের এভাবে আর নির্জনবাস করতে হবে না।

অন্তঃসূর্য

শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদা

[অনুপ্রত্নাস আয়বঃ, পদং নবীয়ো অক্রমুঃ-
রুচে জনন্ত সূর্যম্ ॥ সাম পূর্বার্চিক—৬. ২. ৬;
ঋগ্বেদ—৬. ২৩. ২।]

দিব্যশক্তির অধিকারী, হে মানব!
অনুগামী নয়,
তুমি অগ্রণী হও!
অনুভবের বল নিয়ে
স্বয়ং নূতন সৃজন-আধার প্রস্তুত করো!
তুমিই তোমার সূর্য হও!

আপন পথের নির্মাতা হও তুমি
স্বয়ং বিধাতা হও নিয়ম ও চেতনার
'অনন্ত ক্ষমতা আছে সবারি মাঝে'
এই আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত করো অন্তরে!
তুমিই তোমার সূর্য হও!

তোমার যাত্রাপথের পদচিহ্ন
যেন মুছে না যায় কোনো দিন, কোনো কাল,
বন্ধ করো না গতি বাধা-বিঘ্ন এলে,
নিত্য নূতন আলোক-রশ্মিতে
তোমার প্রতিভাকে স্বয়ং জ্যোতি-স্নাত করো!
তুমিই তোমার সূর্য হও!

শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের একটি দিক

স্বামী তথাগতানন্দ

শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন একজন অসাধারণ বীরপুরুষ, কিন্তু বীরত্বের মহিমার সঙ্গে মনুষ্যত্বের মিলনেই আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি হতে পারে, তাঁর জীবনে আমরা দেখি এই মিলন। এই কঠিন-বীর্য নির্ভীক যোদ্ধার জীবনে আমরা দেখি তাঁর শত্রুদের প্রতি ক্ষমাশীল উদার ব্যবহার। সত্যিই তিনি ছিলেন আর্তত্রাণ-পরায়ণ নারায়ণ, চিত্তবৃত্তির এই উদারতা তাঁর জীবনকে মহিমান্বিত করেছে। তাঁর অপরাজেয় পৌরুষের সঙ্গে ছিল হতভাগ্যদের প্রতি অশ্রুতপূর্ব ক্ষমা, তাঁর যৌবন শুধু শৌর্যেই বৃহৎ নয়, ঔদার্যেও ছিল মহৎ। মহৎ চরিত্রের এটি একটি ধর্ম। বাহুবলের সঙ্গে হৃদয়বত্তার সংযোগেই মহৎ চরিত্রের সৃষ্টি। ঋষি নারদের উক্তিতে তাঁর চরিত্র-মাহাত্ম্য সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে। বাল্মীকিকে তিনি বলেছিলেন রামসম্পর্কে—'কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ।' রবীন্দ্রনাথ রামচন্দ্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন :

"কহ মোরে, বীর্য কার
ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের
অঙ্গদের মত।
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে
কে হয়নি নত।
সম্পদে কে থাকে ভয়ে বিপদে কে
একান্ত নির্ভীক
কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম।"

আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অত্যন্ত সংক্ষেপে তাঁর শত্রুর প্রতি উদার ব্যবহার সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব

রামচন্দ্রকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করার বাসনা রাজা দশরথ সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেছেন। অযোধ্যার সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত। বশিষ্ঠ প্রভৃতি জ্ঞানবৃদ্ধ পুরোহিত-গণ আনুষ্ঠানিক কাজে ব্যস্ত। রাম ও সীতা পূর্বরাত্রে বশিষ্ঠের উপদেশে উপবাস করেছেন। কৌশল্যা আনন্দের সহিত মাঙ্গলিক কাজে ব্যস্ত। এমন সময় রামের প্রতি কৈকেয়ী সেই কঠিন আদেশ দিলেন। আশ্চর্যের বিষয় রামচন্দ্র কৈকেয়ীর প্রতি বিন্দুমাত্র অসৌজন্য প্রকাশ করেননি। বিচলিত হ'লেও দুঃখকে ভাবে বা ভঙ্গীতে প্রকাশ করেননি। 'ধারয়ন্ মনসা দুঃখম্' (২. ১৯. ৩৫)—কবি এইভাবে তাঁর মনোভাবকে প্রকাশ করেছেন।

যথারীতি কৈকেয়ীকে প্রণাম করে বন-গমনের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। অবশ্য রামচন্দ্রও মানসিক দুর্বলতার ঊর্ধ্বে নন। স্বভাবতই স্থানে স্থানে কৈকেয়ীর প্রতি তাঁর বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। কৈকেয়ীর হাতে তাঁর মাতার লাঞ্ছিত হবার আশঙ্কা করেছেন। বনবাসযাত্রার কালে লক্ষ্মণকে এইজন্য তিনি অযোধ্যায় থাকার জন্য বলেছিলেন। ৩১ সর্গের ১১, ১২, ১৩ ও ১৭ শ্লোকে এবং ৫৩ সর্গের ৬-১৫ শ্লোকে শ্রীরাম দশরথ ও কৈকেয়ীর সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করেছেন, এমনকি কৈকেয়ীর কৌশল্যা ও সুমিত্রাদেবীর

প্রতি অতি হীন কার্যের সম্ভাবনার কথাও ভেবেছেন।

"ক্ষুদ্রকর্মা হি কৈকেয়ী দ্বেষাদন্যায়মাচরেৎ।
পরিদদ্যাদ্ধি ধর্মজ্ঞ গরং তে মম মাতরম্॥"
(২।৫৩।১৮)

অবশ্য এসব ভাবান্তরের মধ্যে শ্রীরামকে আমরা রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে ধরতে পারি। তবুও এ কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, এসব তাঁর স্বগতোক্তি। লক্ষ্মণ ও ভরত যখনই কৈকেয়ীর বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন, তখনই তিনি প্রতিবাদ করেছেন। দশরথ ও কৈকেয়ীর সম্বন্ধে সকলেই কঠোর সমালোচনা করেছেন। প্রাজ্ঞ বশিষ্ঠ পর্যন্ত কৈকেয়ীকে তিরস্কার করেছেন। চিত্রকূট পর্বতে ভরত তাঁর মার সম্পর্কে রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করেছেন। এমনকি হত্যা করার কথাও বলেছেন, কিন্তু ধর্ম ও শ্রীরামের ভয়ে নিজেকে শান্ত রেখেছেন। শ্রীরামচন্দ্রের উদার মনোভাব ও মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে দশরথ ও কৈকেয়ীকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলাতে।

"যুক্তমুক্তং চ কৈকেয্যা পিত্রা মে সুকৃতং কৃতম্ ২।১১১।২৯॥" শুধু তাই নয়। তাঁরা ধর্মশীল। কত উচ্চ অন্তঃকরণ হ'লে ধর্মশীল বলা যায় কৈকেয়ীকে। ভাবাবেগে বা ক্ষণিক দুর্বল মুহূর্তে এসব কথা বলা হয়নি। শেষকালে ভরতের অযোধ্যাযাত্রার পূর্বে আবার শ্রীরাম ভরতকে বলেছেন কৈকেয়ীর প্রতি ভাল ব্যবহার করার জন্য। শুধু মৌখিক স্তোকবাক্য নয়, সীতাদেবীও নিজের নামে এই দুরূহ কর্তব্যের ভার ভরতকে দিয়েছেন।

"কামাদ্বা তাত লোভাদ্বা মাত্রা তুভ্যমিদং কৃতম্।
ন তন্মনসি কর্তব্যং বর্তিতব্যং চ মাতৃবৎ॥"
(২।১১২।১৯)

"মাতরং রক্ষ কৈকেয়ীং মা রোষং কুরু তাং প্রতি॥" (২।১১২।২৭)
"ময়া চ সীতয়া চৈব শপ্তোঽসি রঘুনন্দন॥"
(২।১১২।২৮)

বালিবধ নিয়ে সাধারণ মানুষের অনন্তকাল ধরে নানা আলোচনা চলেছে। আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করতে চাই না এখানে। শুধু শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি মৃত্যুপথযাত্রী বালীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের কথাটি বলতে চাই। আমরা শুধু বালীর জন্য শোক করে থাকি, কিন্তু ভুলে যাই শ্রীরাম প্রাণাপেক্ষা সীতাকেও অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে তাঁর চারিত্রিক বিশুদ্ধতার প্রমাণ দিতে বলেছিলেন, আবার প্রজাদিগকে শান্ত করার জন্য অপাপবিদ্ধা সীতাকেও বনবাসে পাঠিয়েছিলেন। প্রাণসমপ্রিয় লক্ষ্মণকেও বর্জন করেছিলেন। আমরা এঁদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে থাকি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সীতা বা লক্ষ্মণ কোনদিন একটি দুর্বল মুহূর্তের জন্যও শ্রীরামের বিরুদ্ধে কিছুমাত্র দোষারোপ করেননি। শ্রীরামের একটিমাত্র তীরের আঘাতে বালী মাটিতে পড়ে যান। বালী তখন শ্রীরামকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেন অধর্মাচরণের জন্য। কিন্তু অসহায় মুমূর্ষু বালীর ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিয়েছেন শ্রীরামচন্দ্র। বালী সন্তুষ্টচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

"ন দোষং রাঘবে দধ্যৌ ধর্মেঽধিগতনিশ্চয়ঃ॥
(৪।.৮।৪৪)
প্রত্যুবাচ ততো রামং প্রাঞ্জলির্বানরেশ্বরঃ।"
(৪।.৮।৪৪)
"যদযুক্তং ময়া পূর্বং প্রমাদাদুক্তমপ্রিয়ম্।
তত্রাপি খলু মাং দোষং কর্তুং নার্হসি রাঘব॥"
(ঐ, ৪৬)

এবং আরও আশ্চর্যের বিষয় বালীর প্রিয়তমা স্ত্রী তারা শ্রীরামের বিরুদ্ধে একটা কথাও

বলেননি, যদিও তিনি স্বামীর মৃতদেহের উপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন, তবুও সেই ঘোর দুর্দিনে শ্রীরামের চরিত্র-মাহাত্ম্যকে ভোলেননি। শ্রীরাম শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। বালী শ্রীরামকে সুগ্রীব ও পুত্র অঙ্গদের ভার দিয়েছেন। "তারেয়ো রাম ভবতা রক্ষণীয়ো মহাবলঃ ॥···ত্বং হি গোপ্তা চ শাস্তা চ কার্যাকার্যবিধৌ স্থিতঃ (৪।১৮।৫২, ৫৩) ॥ তারাও শ্রীরামকে 'নিবাসবক্ষঃ সাধূনাং আপন্নানাং পরা গতিঃ (৪।১৫।১৯-২০)" বলেছেন, সমুদ্রলঙ্ঘনের পূর্বে বিভীষণ যখন রাবণকে পরিত্যাগ করে শ্রীরামের কাছে আসেন তখন লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি অনেকেই তাঁকে পরিত্যাগ করার জন্য শ্রীরামকে অনুরোধ জানিয়েছেন, কিন্তু আশ্রিতবৎসল শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে শুধু গ্রহণ করেননি, তিনি এমনকি রাবণকেও স্থান দিতে চান।

"সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥
(৬।১৮।৩৩)

আনয়ৈনং হরিশ্রেষ্ঠ দত্তমস্যা ভয়ং ময়া।
বিভীষণো বা সুগ্রীব যদি বা রাবণঃ স্বয়ম্ ॥"
(ঐ, ৩৪)

যুদ্ধে রাবণ প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত। শ্রীরাম ইচ্ছা করলেই সেদিন রাবণকে হত্যা করতে পারতেন। সেদিন রাম তাঁর শত্রুর প্রতি অহৈতুকী অনুকম্পা দেখিয়ে রাবণকে বিশ্রামের সুযোগ দিয়েছেন। মহৎ চরিত্রেই এমন ঔদার্য দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে কর্ণবধের কথা স্মরণীয়। সেখানে কর্ণের কাতর অনুরোধেও বিরুদ্ধপক্ষ ক্ষমা করেননি, রথচক্রকে মেদিনী-গ্রাস থেকে তোলার সুযোগ দেওয়া হয়নি। 'ত্বং মুহূর্তং ক্ষম পাণ্ডব' (১০।১১৬, মহাভারত) বলে কর্ণ আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু শ্রীরামের প্রবল পরাক্রমে পর্যুদস্ত মৃত্যুপথ-যাত্রী রাবণ কর্ণের মতন কোন আবেদন জানাননি। রাবণ দম্ভের প্রতীক। তাঁর নিজের বক্তব্য থেকেই সেকথা স্পষ্ট বোঝা যায়।

"দ্বিধা ভজ্যেয়মপ্যেবং ন নমেয়ং তু কস্যচিৎ।
এষ মে সহজো দোষঃ স্বভাবো দুরতিক্রমঃ ॥"
(৬।৩৬।১১)

তথাপি শ্রীরাম রাত্রিতে বিশ্রামের সুযোগ দিয়েছেন রাবণকে।

"কৃতং ত্বয়া কর্ম মহৎ সুভীমং হতপ্রবীরশ্চ কৃতস্ত্বয়াহম্।
তস্মাৎ পরিশ্রান্ত ইতি ব্যবস্য ন ত্বাং শরৈর্মৃত্যুবশং নয়ামি ॥
প্রযাহি জানামি রণার্দিতস্ত্বং প্রবিশ্য রাত্রিঞ্চ ররাজ লঙ্কাম্।
আশ্বস্য নির্যাহি রথী চ ধন্বী তদা বলং প্রেক্ষ্যসি মে রথস্থঃ ॥" (৬।৫৯।১৪২-৪৩)

রাবণবধের পর বিভীষণের মনে একটা প্রতিক্রিয়া আসে। ভাইয়ের শেষকৃত্য করার জন্য শ্রীরামের কাছে অনুমতি চান। এখানেও শ্রীরামের অপরিসীম মনুষ্যত্ববোধ। তিনি বিভীষণকে বলছেন, "মৃত্যুতে সকল শত্রুতার অবসান হয়। এরপর আর ঘৃণা করাও উচিত নয়।" আমি সফলতা লাভ করেছি, কেন আমি তাঁর উপর আর বিদ্বেষভাব রাখব? মৈত্রীবন্ধনজনিত আমরা উভয়ে এখন এক হয়েছি। সেজন্য তিনি তোমার বড়ভাই হ'লেও আমারও। তোমার তাঁর প্রতি শেষ কর্তব্য নিশ্চয় করা উচিত। তুমি না করলে আমি নিশ্চিত করব। জগতের ইতিহাসে এ দৃশ্যের তুলনা নেই।

গোবিন্দরাজ টীকায় বলছেন :

"তব যথা ভ্রাতা তথা মমাপি ভ্রাতা,
মদ্‌ভ্রাতৃভূতস্য তব ভ্রাতৃত্বাৎ
ত্বমস্য দোষং দৃষ্ট্বাবেদহমেব করিষ্যামি।"

সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে দশরথকে আমরা দেখি—দশরথ রামকে উপদেশ দিয়েছেন, সীতাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। সে সময় দেখি শ্রীরাম দশরথের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছেন কৈকেয়ী ও ভরতের মঙ্গলের জন্য।

ক্ষমা দেবদুর্লভ গুণ। অসহায় শত্রুকে ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারে প্রকৃত বীর। দুর্বলের ক্ষমা করার সাধ্য নাই। মহাত্মা গান্ধীও তাই বলেছেন। অগ্নি-প্রবেশের প্রাক্কালে সীতার প্রশ্ন ছিল শ্রীরাম কেন এমন যুদ্ধ করলেন যদি তাঁর মনে সীতা সম্পর্কে সন্দেহই ছিল। তার উত্তরে শ্রীরাম বলেছেন যে, যুদ্ধ জয় করে তাঁর কুলগৌরব রক্ষা করেছেন এবং পৌরুষবলে তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন।

"যৎ কর্তব্যং মনুষ্যেণ ধর্ষণাং প্রতিমার্জতা।
তৎ কৃতং রাবণং হত্বা ময়েদং মানকাঙ্ক্ষিণা॥
নির্জিতা জীবলোকস্য তপসা ভাবিতাত্মনা।
অগস্ত্যেন দুরাধর্ষা মুনিনা দক্ষিণেব দিক্॥
বিদিতশ্চাস্ত ভদ্রং তে যোঽয়ং রণপরিশ্রমঃ।
সুতীর্ণঃ সুহৃদাং বীর্যান্ন ত্বদর্থং ময়া কৃতঃ॥
রক্ষতা তু ময়া বৃত্তমপবাদং চ সর্বতঃ।
প্রখ্যাতস্যাত্মবংশস্য ন্যঙ্গং চ পরিমার্জতা॥"
(৬।১১৫।১৩-১৬)

ভগবান ব্যাসদেবকৃত শ্রীরামচন্দ্রাষ্টক থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে এই প্রসঙ্গ শেষ করছি।

"ভবাব্ধিপোতরূপকং হ্যশেষদেহকল্পিতং।
গুণাকরং কৃপাকরং ভজে হ রামমদ্বয়ম্॥"

'তদ্দূরে তদন্তিকে চ'

আশুতোষ দাস

তুমি হৃদয়ে ভাসিয়া হাসিয়া লুকাও, ছুটিয়া পলাও ধরিলে!
ফুটিয়া, অমনি পলকে মুদিয়া পড় গো পরশ করিলে॥
তুমি বাড়াইয়া দাও দেখিবার আশা চকিত চপল প্রকাশে,
হারাইয়া যাও মেলিলে নয়ন অসীম অতল আকাশে!
তুমি ক্ষণিক সুরভি রাখিয়া, ক্ষণ-রূপরেখা আঁকিয়া
গোপনে থাকিয়া স্বপনে ডাকিয়া দাও নীরবতা ঢাকিয়া—
তুমি শুধু দিয়ে দেখা, ফেলে যাও একা ফিরে নাহি চাও স্মরিলে॥

কি যে অভিনব প্রিয়-উৎসব, শেষ হয় তা কি স্মরণে?
কিবা অনুপম পিয়াসা পরম থেকে যায় স্মৃতি-ক্ষরণে।
তুমি বিস্মৃতিভরা স্মৃতি গো, চপলতা তবু স্থিতি গো,
বিয়োগেরও গীতি মিলনেরও সুর, বিরাগ মেশানো প্রীতি গো!
তুমি হাত ছেড়ে দাও তবু কাছে রও, কোলে তুলে নাও পড়িলে॥

সাগর মেলায়

শ্রীমহাদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় প্রতি বছর বাৎসরিক পরীক্ষার শেষে কলকাতায় পূজ্যপাদ পিতৃদেবের কাছে ছুটি কাটাতে যেতাম। দেখতাম ভাগীরথীর কূলে কূলে নৌকাগুলি গঙ্গাসাগর-যাত্রি-প্রতীক্ষায় নিশান উড়িয়ে জলে ভাসছে। পত্ পত্ শব্দে পতাকা উড়ত—আমার মনটিও গঙ্গাসাগরের উদ্দেশ্যে পাখা মেলে দিতে চাইঃ

করুণারূপিণী গঙ্গা আমার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলেন এতদিন পরে। যেন এতদিনে মহামুনি কপিলের কৃপা হ'ল! কলকাতার 'আউটরাম' ঘাট থেকে 'রিভার গঙ্গা' স্টীমারে গঙ্গাসাগর অভিমুখে যাত্রা করলাম। স্টীমারে তিলধারণের ঠাঁই নেই। বহু কষ্টে পেলাম একটু বসবার আসন। স্টীমার ছাড়ার সাথে সাথে যাত্রীরা 'গঙ্গা মাঈকী জয়! মহামুনি কপিলকী জয়!' ইত্যাদি ধ্বনিতে আমাদের যাত্রার সেই শুভ মুহূর্তটি কলমুখরিত করে তুলল।

জনপদ থেকে বহুদূরে সাগরকূলের পাতালে মহামুনি কপিল কঠোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন। এইখানেই মহাতেজা মুনিবর সগররাজার ষাট হাজার পুত্রকে ভস্মীভূত করেছিলেন। দুষ্টের দমনে ও শিষ্টের পালনে ইক্ষাকুবংশের বাহুর পুত্র সগর ছিলেন আদর্শ নরপতি। অপুত্রক থাকায় তাঁর মনে শান্তি ছিল না। সুদীর্ঘকাল শিবের তপস্যা-শেষে শিবের বরে শৈব্যার গর্ভে একটি এবং বৈদর্ভীর গর্ভে ষষ্টিসহস্র পুত্র লাভ করলেন। শুভক্ষণে সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন। তাঁর ষাট হাজার পুত্র সসৈন্যে সর্বসুলক্ষণ অশ্বের রক্ষক হিসাবে ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। এই অশ্বমেধ যজ্ঞ পণ্ড করার উদ্দেশ্যে দেবরাজ ইন্দ্র অলক্ষিতে যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করে পাতালে কপিল মুনির আশ্রমে লুকিয়ে রাখলেন। সেখানে অশ্বকে দেখতে পেয়ে মদগর্বী রাজকুমারেরা মহাতেজা মুনিবরকে কটুবাক্যে ভর্ৎসনা করায় মুনির

"বাহিরায় দুই চক্ষু হইতে অনল।
ভস্মরাশি করিলেক কুমারসকল॥"

দেবর্ষি নারদের মুখে এ সংবাদ পেয়ে সগররাজা শোকে মুহ্যমান। অবশিষ্ট বংশধর অংশুমানের বহু স্তবস্তুতিতে কপিল তুষ্ট হয়ে যজ্ঞাশ্ব ফিরিয়ে দিলেন, অসমাপ্ত যজ্ঞ সমাপ্ত হল, কিন্তু ভস্মীভূত ষাট হাজার পুত্রের উদ্ধার তখনি সম্ভব হল না :

"মম ক্রোধে দগ্ধ যত সগরকুমার।
তব পৌত্র করিবেক সবার উদ্ধার॥
শিবে তুষ্ট করিয়ে আনিবে সুরধুনী।
যজ্ঞ সাঙ্গ কর অশ্ব লইয়া এখনি॥"

দিলীপের পুত্র ভগীরথের কঠোর তপস্যায় তুষ্টা হয়ে পতিতপাবনী গঙ্গা মর্ত্যে অবতরণ করে সাগরসঙ্গমে কপিল মুনির আশ্রমে এসে মুক্ত করলেন সগররাজার ষাট হাজার পুত্রকে।

তাই আজও কপিল মুনির আশ্রম পবিত্র ও পুণ্য। গঙ্গা ও কপিল মুনির মাহাত্ম্যে সাগরদ্বীপ মহীয়ান। মকর সংক্রান্তিতে চব্বিশ পরগণার অন্তর্বর্তী সাগরদ্বীপে গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে ও মহামুনি কপিলের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ তপস্যাভূমি দর্শনার্থে লক্ষ লক্ষ

তীর্থযাত্রীর সমাবেশ হয়। এ যাত্রাপথ সঙ্কটময় তবু কোন বছরই পুণ্যার্থীদের স্নান ও দর্শনের উৎসাহে কিছুমাত্র ভাটা পড়ে না। আসমুদ্র হিমাচল থেকে আগত গৃহী ও ত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হয়ে থাকে।

যাত্রাপথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরম উপভোগ্য। প্রকৃতিদেবী যেন তাঁর সমস্ত সৌন্দর্য উজাড় করে দিয়েছেন ভাগীরথীর দুই তীরে।

তর্ তর্ কল্ কল্ পত্ পত্ শব্দে স্টীমার টল্‌তে টল্‌তে সমুদ্রানুসন্ধানে তীব্রবেগে অগ্রসর হচ্ছে; জল ফুলে ফুলে উঠছে, তরঙ্গ আবর্ত রচনা করে কূলে উচ্ছল আঘাতে ভেঙে পড়ছে। মৃদু শব্দ করে বাতাস বইছে। শ্বেতবর্ণের অসংখ্য সমুদ্রপক্ষী মাছের আশায় স্টীমারের পিছু নিয়েছে। কেউ কেউ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সামুদ্রিক মাছ শিকার করছে। নির্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়েছে। সব মিলিয়ে সে মাঝদরিয়ায় নিজেকে যেন হারিয়ে ফেললাম!

রাত একটায় মাঝসমুদ্রে সাগরদ্বীপে স্টীমার ভিড়ল। দ্বীপটি বিজলীর আলোকমালায় সজ্জিত। রাত্রে স্টীমারের ডেকে আশ্রয় নিলাম। প্রত্যূষে নৌকাযোগে কপিল মুনির মন্দিরের কাছে পৌঁছুলাম।

সাগর মেলাটি স্বল্পপরিসর, বালুস্তূপের উপর বিশাল জনসমুদ্রের গগনভেদী শব্দে বেশ জম-জমাট হয়ে উঠেছে। প্রাতঃস্নান সেরে পূজা-ও দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সকলেই ব্যস্ত। বহু-কষ্টে মুনিজীর দর্শন ও পূজা করলাম। ছোট মন্দিরে পাথরের তিনটি ধ্যানস্থ মূর্তি বিরাজিত —সর্বাঙ্গ সিন্দূরে চর্চিত। নিকটেই নিশ্চল সগর রাজার অশ্বের প্রস্তরমূর্তি। তদানীন্তন মহামুনির তপোবন সমুদ্র গ্রাস করে নিয়েছে—অবশিষ্টটুকুও ক্রমশঃ গিলছে। মেলায় হোগলাপাতার অসংখ্য অস্থায়ী যাত্রিনিবাস—শীত, বৃষ্টি ও ঝড়ের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার ক্ষমতা অবশ্য তাদের নেই। তবু ক্ষণভঙ্গুর ছাউনিতে যাত্রীর ভিড়। সুদূর মেদিনীপুর ও চব্বিশপরগনা অঞ্চলের অসংখ্য দোকান-পসারীও যোগ দিয়েছে—যাত্রীদের সব রকমের চাহিদা মেটাতে। আর বসেছে রেসটুরেন্ট, ভোজনালয় ও নামকরা মিষ্টির দোকান। বিশুদ্ধ পানীয় জল ও দাতব্য চিকিৎসালয়েরও সুব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেকে অন্নসত্র খুলেছে, কম্বলও বিতরণ করছে।

সাগর থানা পুণ্যার্থীদের সকল অসুবিধা দূরীকরণে সদা ব্যস্ত। তবে বৃহৎ ব্যবস্থায় কিছু না কিছু ত্রুটি থাকবেই, তা নিয়ে ঢাক ঢোল বাজাবার কিছু নেই। কালের পরিবর্তনে মেলার রূপটিরও পরিবর্তন হয়েছে।

পূর্ণিমার স্নান সেরে মুনিজীকে শেষ প্রণাম জানিয়ে স্টীমারে ফিরে এলাম। আমাদের 'রিভার গঙ্গা' ছাড়ল। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম মন্দিরটির দিকে। ক্রমে মন্দিরচূড়া অদৃশ্য হল, কিন্তু স্মৃতিতে তা স্পষ্ট হয়েই রইল।

অলিম্পিক ক্রীড়া

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

যখন গ্রীসদেশে আর্যজাতির এক শাখার সভ্যতা বিস্তৃত, তখন খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দ হইতে প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী যাবৎ গ্রীক দেবতা জুপিটারের পবিত্র নামে এই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতি চারি বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত হইত। স্বাধীন সচ্চরিত্র গ্রীক নাগরিক এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার অনুমতি লাভ করিত। বর্তমান ফরাসী দেশ হইতে সাহারা এবং বসফরাস সাগরের বহু পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত জনপদের এবং সমগ্র গ্রীক জাতির প্রতিনিধিগণ এই ক্রীড়ায় যোগদান করিতেন। এমনকি গ্রীস যখন রোমের পদানত তখনও এই ক্রীড়া অব্যাহত ছিল। কিন্তু ৩৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বৈজন্তিয়ামের ধর্মান্ধ খ্রীষ্টান সম্রাট্ প্রথম থিওডেসিয়াস খ্রীষ্টধর্মের স্বার্থে এই ক্রীড়া বন্ধ করিয়া দেন। বর্তমানকাল পর্যন্ত ২৯৩টি ক্রীড়ার সঠিক বিবরণী রক্ষিত আছে এবং পাওয়া গিয়াছে।

পর পর কয়েকবার ভূমিকম্প সত্ত্বেও এই ক্রীড়াক্ষেত্রের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা খ্রীষ্টানদের হাতে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। প্রায় ১০০০ বৎসর অলিম্পিয়া নিশ্চিহ্ন ছিল। তারপর সর্ববিদ্যা-বিশারদ জার্মানীর প্রত্নতাত্ত্বিক আর্নেস্ট কার্টিজ ও ফ্রাইডরিস্ অ্যালডারের প্রযত্নে এলুসীর এই বিশ্ববিশ্রুত ক্রীড়াক্ষেত্রটি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারন পিয়ারী ডি কৌবা-রটিন নামক এক অত্যুৎসাহী ক্রীড়ামোদীর অক্লান্ত প্রযত্নে এই প্রাচীন বিশ্বজনীন ক্রীড়া পুনঃপ্রচলিত হয়। ১৮৯৬ খ্রী: হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি চার বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত হইয়া ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চদশ ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি স্বাধীন রাজ্যই এই ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। পূর্বে গ্রীসদেশের এলুসী ক্ষেত্রে এই ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হইত কিন্তু বর্তমানে ইহা বিভিন্ন রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়; অবশ্য অলিম্পিয়া হইতে অনির্বাণ আলোক-বর্তিকা ক্রীড়াক্ষেত্রে আনা হয়। গ্রীসদেশে এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার উদ্ভব বলিয়া তাহাকে এখনো এই মর্যাদা দেওয়া হইতেছে। পূর্বে স্ত্রীলোকের এই ক্রীড়াক্ষেত্রে যাইবার অধিকার ছিল না, বর্তমানে সকলেই অংশ গ্রহণ করিতেছেন। পূর্বে পুরস্কার ছিল মাত্র পবিত্র জুপিটার-মন্দিরের অলিভপাতার বিজয়-মাল্য; বর্তমানে স্বর্ণ-রৌপ্যাদি-নির্মিত পদক পুরস্কার দেওয়া হয়। এই ক্রীড়া এক বিশ্বমহামেলার সৃষ্টি করে; সেখানে রাজনীতি বা জাতীয় স্বার্থচিন্তা ত্যাগ করিয়া সকল দেশের লোকের মেলামেশা ও ভাববিনিময়ের, বিশ্বমৈত্রীর পথ প্রশস্ত করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়।

মাত্র ৭২ বৎসর এই ক্রীড়া পুনরনুষ্ঠিত হইতেছে, তবুও ইতিমধ্যেই তিনবার, ১৯১৬, ১৯৪০ ও ১৯৪৪ সালে পৃথিবীজোড়া হিংসা দ্বেষ ও হত্যালীলা চলিতে থাকায় এই ক্রীড়া বন্ধ ছিল।

আজ আমরা সুসভ্য বলিয়া গর্ব করিতেছি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রভৃতি স্থাপন করিয়া

নানাভাবে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ রাখিবার ও শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা করিয়া চলিয়াছি। সভ্যতার পথে পূর্বাপেক্ষা বহুদূর অগ্রসর বলিয়া আমাদের গর্ব সত্ত্বেও আধুনিক কালেই এই নির্দোষ ক্রীড়া তিনবার বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭৬ সালেও গ্রীকজাতি যে উচ্চ নৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছে তাহাতে সত্যই বিস্ময় জাগে। তখন গ্রীসদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবদমান রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং তাহাদের মধ্যে ও চারি পার্শ্বের রাজ্যের সঙ্গে সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত। তথাপি পিসা ও এলিস রাজ্যের দুই যুদ্ধলিপ্ত রাজা ৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে যে পবিত্র অলিম্পিয়ার সন্ধি স্বাক্ষর করেন তাহা বরাবরই অতি যত্নে উভয় পক্ষ কর্তৃক অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে সকল রাজ্যই এই ক্রীড়ার সময় বিবাদ-বিসংবাদে বা যুদ্ধে বিরত থাকিত। এমনকি যে-কোন অলিম্পিয়া-যাত্রীকে সকল জনপদের মধ্য দিয়াই নিরাপদে যাইতে দেওয়া হইত। ইহার ব্যতিক্রম হইলে জরিমানা করা হইত এবং তাহা অনাদায়ও থাকিত না। এমনকি ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ, যদিও খুব প্রতাপশালী ছিলেন, তথাপি তাঁহার সৈন্যগণ একবার এথেন্সবাসী অলিম্পিয়া-যাত্রীর যথা-সর্বস্ব অপহরণ করায় জরিমানা দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত: করেন নাই।

অলিম্পিক ক্রীড়া নির্বিঘ্নে পরিচালিত হইবার জন্য সকলের মধ্যে যে চুক্তি হইত তাহা অতি বিশ্বস্ততার সহিত রক্ষিত হইত; আর কোনও প্রতিজ্ঞা বা চুক্তি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে এইভাবে রক্ষিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহা গ্রীকজাতির উন্নত নৈতিক মানেরই সাক্ষ্য দেয়। এমনকি গ্রীস যখন রোমের অধীন তখনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বৈজন্তিয়ামের সম্রাট কনস্টেন্‌টাইনের খ্রীষ্টধর্মগ্রহণের ১০০ বৎসর পর পর্যন্তও অবাধে এই ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

তীর্থগামী

শ্রীগোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

প্রাণের মাঝে রয়েছ জানি
মানে না তবু মন,
খুঁজি, যেখানে তুমি আপন রূপে
ভোলাও ত্রিভুবন,
ওগো নয়ন-বিমোহন॥

চলেছি তাই তীর্থগামী
গাহিয়া গান দিবসযামী;
ধেয়ানে যারে পাইনে তারে
করি গানেতে আবাহন॥

অগম গিরি অভ্র ঘিরে,
তুষার নদী উৎস নীরে,
ঢেউ-এর শিরে, বনগভীরে
শুনি মুরলী-মুরছন॥

শ্রান্ত পায়ে পৌঁছে দ্বারে
পরাণ কাঁপে আবেগ-ভারে,
নয়ন ঝরে পুলক-ধারে
পেয়ে নয়ন-বিমোহন
পুণ্য দরশন॥

সমালোচনা

ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ)—অজাতশত্রু। প্রকাশক রামকৃষ্ণ কৃষ্টি পরিষদ, ৫১ নং জয়পুর রোড, দমদম, কলিকাতা ৩০। পৃষ্ঠা ১৭২; মূল্য পাঁচ টাকা।

ভক্তবৎসল শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তসঙ্গে লীলা-কাহিনী পুস্তকখানিতে সহজ সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকটির আবেদন পাঠকচিত্ত স্পর্শ করিয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণ ইহাই প্রমাণ করে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পুঁথি, কথামৃত, ভক্তমালিকা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে পুস্তকের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগৃহীত, তবে চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য কিছু কিছু কল্পনার আশ্রয়ও গ্রহণ করা হইয়াছে।

বিদ্যামন্দির পত্রিকা (১৩৭৬)—প্রকাশক: সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ। পৃষ্ঠা—৯০+২৮।

এবারের বিদ্যামন্দির পত্রিকায় সুলিখিত রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'সেবা-মূর্তি ভগিনী নিবেদিতার জীবন-চিত্র', 'অচিন রশ্মির স্বরূপ', 'রবীন্দ্রনাথ—প্রকৃতিরই কবি', 'The Changing Indian Family', 'শ্রীশ্রীবিবেকা-নন্দ-বন্দনম্'।

'আমাদের কথা'য় মহাবিদ্যালয়ের সারা বৎসরের কর্মধারা বিজ্ঞাপিত।

সন্দীপন (নবম সংখ্যা, ১৩৭৬) প্রকাশক: সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণমন্দির, বেলুড় মঠ। পৃষ্ঠা—১০২+৩৮।

রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণমন্দিরের মুখপত্র সন্দীপন তাহার পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত।

সন্দীপনের প্রত্যেকটি রচনাই সুচিন্তিত ও সুখপাঠ্য হইলেও নিম্নলিখিত লেখাগুলি বিশেষ-ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে: 'ভারতের আত্মার প্রতিভূ', 'জাতীয় সংহতি: সমাজবিজ্ঞানের 'ভারত ও বিশ্বের বিবেকানন্দ', 'I am the Eternal Witness', 'Some Views on Education', 'আধ্যাত্ম-চিন্তনম্'।

বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন পত্রিকা (দ্বিচত্বারিংশ বর্ষ, চৈত্র, ১৩৭৫)—বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন, ৭৫ ও ৭৭ স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওড়া-৪ হইতে প্রকাশিত; পৃষ্ঠা ৫০।

পত্রিকাটিতে যে-সমস্ত প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প প্রকাশিত হইয়াছে, সবই পঞ্চম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণীর ছাত্রগণের। প্রত্যেক রচনাই সুসম্পাদিত এবং পড়িবার মতো। কয়েকটি লেখা পড়িয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি: মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ স্মৃতিতীর্থে, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর, দেখে এলাম অমৃতসর, প্রার্থনা (কবিতা)। 'আমাদের কথা' প্রবন্ধে বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রচেষ্টা পরি-লক্ষিত হয়।

মহাজীবন (মাসিক পত্র, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৭৬)—৮, ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৯৬। মূল্য প্রতি সংখ্যা সত্তর পয়সা।

মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁহার জীবন ও বাণী অনুধ্যানের উদ্দেশ্যে পত্রিকাটির আবির্ভাব ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। উপযুক্ত রচনাসম্ভারে পত্রিকার মান উন্নত করিবার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান সংখ্যায় কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের লেখা আছে।

রূপালোক (শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৬)—সম্পাদক: সুবল রায়, মহেশ্বরপুর (সখের বাজার), পো: বাওয়ালী, জেলা ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ১৬, মূল্য ৩০ প.।

বর্তমানে পল্লীগ্রামে দরিদ্র রিক্ত অবহেলিত মানুষের নানা সমস্যা পত্রিকাটির সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এবং অন্যান্য গল্প ও কবিতার মাধ্যমে ফুটাইয়া তুলিবার প্রচেষ্টা আছে। মহা-পুরুষগণের বাণী-সংকলনও পত্রিকার আদর্শ অনুযায়ী।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবা : গত অক্টোবর মাসে (ক) **মালদহে** ১৮,৯৮৯ কেজি চাল, ৬১ কেজি চিড়া, ২৮ কেজি গুড়, ২১ কেজি লবণ, ১০৫ কেজি আটা এবং ১০০ খানি কম্বল মিশন কর্তৃক ৩৩টি গ্রামের ৪,৯৮৪ জন বন্যার্তের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। (খ) **মুর্শিদাবাদে** ৭টি গ্রামের ৩,৭৮৭ জন বন্যা-পীড়িতের মধ্যে ৩৫,৭৮৮ কেজি চাল ও ৫০ পাউণ্ড চা বিতরিত হইয়াছে। (গ) **জলপাইগুড়িতে** ১২টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ১টি মহাবিদ্যালয়ে ১,৮৫০টি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দেওয়া হইয়াছে ; শহরের উপকণ্ঠে কতকগুলি নূতন গৃহের নির্মাণকার্য আরম্ভ হইয়াছে।

কাছারে বন্যার্তসেবা : শিলচরে অক্টোবর মাসে মিশন কর্তৃক ৬০৬ কেজি চাল, ৭০ খানি কম্বল এবং ১৩৪ খানি বস্ত্রাদি ১২টি গ্রামের ৯১টি পরিবারের ৬০০ ব্যক্তিকে দেওয়া হইয়াছে।

অন্ধ্রে ঘূর্ণিবাত্যা-বিপর্যস্তদের সেবা : গুণ্টুর জেলার চিরালায় দুর্গতদের পুনর্বাসনের জন্য এ পর্যন্ত ২২টি গৃহের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং একটি কূপ খনন করা হইয়াছে।

সাম্প্রতিক সাইক্লোনের অব্যবহিত পূর্বে চিরালায় একটি তন্তুবায় কলোনী অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ দগ্ধ হইয়া যায়। উক্ত কলোনীর ১৮০ জনকে ৩০০ কেজি চাল দিয়া সাহায্য করা হইয়াছে।

গুজরাটে বন্যার্তসেবা : সুরাটে যে-সব নূতন কলোনী নির্মিত হইয়াছে, সেগুলিতে রাস্তা, সমাজমন্দির, জলসরবরাহ এবং বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য কার্য ভালভাবে অগ্রসর হইতেছে।

গত ২৯শে নভেম্বর, ১৯৬৯ গুজরাটের গভর্ণর শ্রীমন্নারায়ণ ফুলপাড়া ও নভগাম কলোনীর উদ্বোধন করিয়াছেন। ভারাচ্ছা ও কামরেজ ক্যাম্পও তিনি পরিদর্শন করেন।

বিবেকানন্দ সৎসঙ্গ ভবন

রায়পুর আশ্রমে গত ১৩ই নভেম্বর, ১৯৬৯ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী বিবেকানন্দ সৎসঙ্গ ভবনের উদ্বোধন করিয়াছেন। তিনি আশ্রমের প্রার্থনা-গৃহেরও ভিত্তিস্থাপন করেন।

কার্যবিবরণী

বেলঘরিয়া : রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দের কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাচীন গুরুকুল-প্রথায় সুপরিচালিত এই বিদ্যার্থী আশ্রমে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রেরা সম্পূর্ণ বিনাব্যয়ে, ও কিছু ছাত্র আংশিক অথবা পূর্ণ ব্যয় বহন করিয়া অবস্থান করে এবং বিভিন্ন কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষালাভের সুযোগ পায়। বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রগণ এখানে শরীর-মনের সুষম বিকাশসাধনের সুযোগ লাভ করে। পড়াশুনার সঙ্গে স্বাস্থ্যচর্চা প্রার্থনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রোগীর পরিচর্যা, এবং নৈশবিদ্যালয়-পরিচালনা প্রভৃতি কাজ তাহারা নিষ্ঠার সহিত করিতে অভ্যস্ত হয়।

আলোচ্য বর্ষের শেষে মোট ৯১ জন

আশ্রমিকের মধ্যে ৫৯ জন সম্পূর্ণ বিনা-ব্যয়ে থাকিবার সুযোগ লাভ করে ; ১০ জন আংশিক এবং ২২ জন পূর্ণ ব্যয় বহন করিয়াছিল। বিদ্যার্থী আশ্রমের সকল শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক।

গ্রন্থাগারের সুনির্বাচিত গ্রন্থসংখ্যা ৩,৫৯০। ৩টি দৈনিক সংবাদপত্র রাখা হয়। লাইব্রেরীর টেক্সটবুক সেকসন-এ ২,৬৫৮ খানি পাঠ্যপুস্তক আছে, ১,৭১৯টি বই লইয়া বিদ্যার্থীরা পড়াশুনা করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমে প্রতিমায় শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা ও শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি ও অন্যান্য পুণ্য দিনগুলি বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্মৃতি-উৎসব পূর্ব বৎসরের মতো পালিত হইয়াছে। স্বাধীনতা-দিবস, প্রজাতন্ত্র-দিবস প্রভৃতি যথোপযুক্ত মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করা হয়।

বিদ্যার্থী আশ্রমের আর একটি কর্মবিভাগ 'রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ' ; সরকার-অনুমোদিত এই পলিটেকনিকের আলোচ্য বর্ষের ছাত্র-সংখ্যা ৫৬০। ছাত্রগণের মধ্যে ১৬৫ জন সিভিল, ৩০২ জন মেকানিক্যাল ও ৯৩ জন ইলেকৃট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা করে।

শিল্পপীঠের গ্রন্থাগারে ৪,৫০০ খানি পুস্তক আছে ; ৫টি দৈনিক সংবাদপত্র ও ৬টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, শিল্পপীঠের দুই জন ছাত্র ইলেকৃট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ফাইন্যাল ডিপ্লোমা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

শিল্পপীঠের ছাত্রগণ উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া জলপাইগুড়ির বন্যার্ত অঞ্চলগুলির পলিটেকৃনিক ছাত্রদের সেবাকার্যে দান করিয়াছিল।

রঁাচি : রামকৃষ্ণ মিশন যক্ষ্মা-হাসপাতালের বার্ষিক কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৮—মার্চ, ১৯৬৯) প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই স্যানাটোরিয়াম রঁাচি রেলওয়ে স্টেশন হইতে ৯ মাইল দূরে ২৭৯ একর স্বাস্থ্যকর ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত। বর্তমানে ২৫০টি শয্যার মধ্যে ২২৮টি সাধারণ ওয়ার্ডে, ১৩টি কেবিনে ও ৯টি কুটিরে।

এই সেবাকেন্দ্রটি একটি পূর্ণাঙ্গ টি. বি. স্যানাটোরিয়ামে পরিণত হইয়াছে ; এখানে সর্বপ্রকার যক্ষ্মারোগের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রোগনির্ণয়, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের সুব্যবস্থা আছে।

আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৬০৩, তন্মধ্যে ৩৫৮ জনকে এ বছর ভরতি করা হয় এবং বৎসরের প্রথমে ছিল ২৪৫ জন। ৩৪৭ জন রোগী হাসপাতাল হইতে ছাড়া পায় এবং বর্ষশেষে ২৫৬ জন রোগী চিকিৎসাধীন থাকে। ১২২ জন রোগীর অস্ত্রোপচার, এক্স-রে বিভাগে ৪,৯২২টি এক্স-রে এবং ল্যাবরেটরিতে ১৬,৩০২টি পরীক্ষা করা হয়। বহির্বিভাগে ৬২১ জন যক্ষ্মারোগী এবং অন্যান্য রোগাক্রান্ত ১,৩৩৫ ব্যক্তি চিকিৎসা লাভ করিয়াছে।

৮০ জন দরিদ্র রোগীকে সম্পূর্ণ বিনা-খরচে, ১৪ জনকে আংশিক খরচে চিকিৎসা করা হইয়াছে। ৩৬ জন রোগী আরোগ্য-লাভের পর আরোগ্যোত্তর উপনিবেশে স্থান পাইয়াছে ; স্যানাটোরিয়ামে ইহাদিগকে নানাপ্রকার বৃত্তিমূলক কর্ম শিক্ষা দেওয়ার পর

বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত করিয়া জীবিকা-নির্বাহের সুযোগ দেওয়া হইতেছে।

স্থানীয় দরিদ্র জনসাধারণের জন্য স্থাপিত অবৈতনিক হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারীতে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা : নূতন ৬,০০৭, পুরাতন ৭,৯১৮।

দরিদ্র রোগীদের জন্য আরও ফ্রি-বেডের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে, এ বিষয়ে আমরা বদান্য ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

উৎসব-সংবাদ

ফরিদপুর—রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৯শে নভেম্বর স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে প্রতিমায় শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা সুসম্পন্ন হইয়াছে। সারাদিন পূজাদিতে অতিবাহিত হইবার পর সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে শ্রীকরুণাময় অধিকারী, শ্রীমতী উমা দেবী ও অন্যান্য শিল্পিগণ মাতৃসঙ্গীত পরিবেশন করেন। ২০শে নভেম্বর অপরাহ্নে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী অতি মর্মস্পর্শী ভাষায় শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করিয়া সকলকে তৃপ্তিদান করেন। সর্বশ্রেণীর নরনারীই এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

স্বামী প্রণবাত্মানন্দের প্রচারকার্য

গত ১৬ই আগস্ট (১৯৬৮) হইতে ১৯৬৯-এর সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত স্বামী প্রণবাত্মানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস-হোম—বেলঘরিয়া, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান—কলিকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—শিলং, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—গৌহাটী, লাবান হরিসভা—শিলং, দিনহাটা, হেলাপাকড়ী, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—জলপাইগুড়ি, রামকৃষ্ণ আশ্রম—তিনসুকিয়া, রামকৃষ্ণ আশ্রম—কুচবিহার, রামকৃষ্ণ আশ্রম—আলীপুর দুয়ার জং, মণ্ডলঘাট, প্রধানপাড়া, রামকৃষ্ণ আশ্রম—মাথাভাঙ্গা, জল্পেশ্বর, রামকৃষ্ণ আশ্রম—ধুবড়ী, ময়নাগুড়ি রোড, বিবেকানন্দ পল্লী—বার্ণেশ, বালাপাড়া ইত্যাদি স্থানে হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ, ভারতীয় নারী ও মাতা সারদা দেবী, ভারতে শক্তিপূজা, জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচার্য বিবেকানন্দ, ভারতীয় সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে মোট ৪০টি বক্তৃতা দিয়াছেন। তন্মধ্যে ২৯টি ছায়াচিত্রের মাধ্যমে প্রদত্ত হইয়াছে।

স্বামী চৈতন্যানন্দের দেহত্যাগ

আমরা দুঃখিতচিত্তে জানাইতেছি, গত ৯ই নভেম্বর রাত্রি ১টা ৪৫ মিনিটের সময় স্বামী চৈতন্যানন্দ (পরমেশ মহারাজ) ৭২ বৎসর বয়সে বারাণসী সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত দুই মাস যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন। দেহত্যাগের পূর্বে তিনি সেরিব্রাল থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি সারা জীবনই বারাণসী সেবাশ্রমের কর্মী ছিলেন, পরে সেবাশ্রমের শিবালা শাখা-কেন্দ্রটি পরিচালনা করিতেন। তিনি অকপট, কষ্টসহিষ্ণু এবং মধুরস্বভাব সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার আত্মা শ্রীভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

স্বামী ঘনানন্দের দেহত্যাগ

দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ১৬ই নভেম্বর বেলা ১১টা ৫৭ মিনিটে (লণ্ডন সময়) স্বামী ঘনানন্দ ৭১ বৎসর বয়সে লণ্ডনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। করোনারী থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হইয়া তিনি গত ১১ই

অক্টোবর হাসপাতালে ভরতি হন; ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিতেছিলেন, কিন্তু নূতন উপসর্গ দেখা দেওয়ার ফলে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নিকট হইতেই সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ মঠে যোগদান করেন; সেখানে কিছুকাল 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। পরে সিংহলে শিক্ষাকার্যে কিছুকাল ব্রতী হন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে মরিশাসে নূতন কেন্দ্র খুলিবার জন্য তিনি সেখানে প্রেরিত হন। কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণ-মানসে মরিশাস হইতে তিনি ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে চলিয়া আসেন। ইংলণ্ডে পৌঁছিবার পর কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সেখানেই থাকিয়া যান এবং লণ্ডনে রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেণ্টার গড়িয়া তোলেন। জীবনের অবশিষ্টাংশ তিনি লণ্ডনেই অতিবাহিত করিয়াছেন; মধ্যে তিন বার ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজীতে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

তাঁহার আত্মা অভয় পদে মিলিত হইয়া শাশ্বত শান্তিলাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

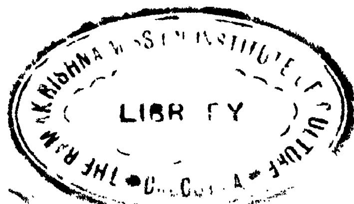
খিদিরপুর 'সুরবিতান' শ্রীববীন বসুর পরিচালনায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভগিনী নিবেদিতার জন্মোৎসব পালন করিয়াছে।

পরলোকে খগেন্দ্রকৃষ্ণ রায়

বেলুড়নিবাসী খগেন্দ্রকৃষ্ণ রায় গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ (২০ ১১ ৬৯) সকাল সওয়া নয়টার সময় ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বেলুড় মঠের সন্নিকটে তাঁহার বাসস্থান ছিল, প্রায় ২৪ বৎসর দুইবেলা বেলুড় মঠে যাওয়া তাঁহার প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ হইয়া গিয়াছিল।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৬ই পৌষ, ৩১শে ডিসেম্বর, বুধবার পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীর ১১৭তম জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে ও অন্যত্র বিশেষ পূজানুষ্ঠান হইবে।



স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

সন্ন্যাসীর গীতি—১৪শ সংস্করণ। স্বামীজী রচিত 'Song of the Sannyasin'-নামক ইংরেজী কবিতা ও উহার পদ্যে বঙ্গানুবাদ। মূল্য ০'২০।

ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—৫ম সংস্করণ, ভগবান ঈশার জীবনালোচনা—মূল্য ০'৪০, উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ০'৩৫।

সরল রাজযোগ—৫ম সংস্করণ। স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারা সি. বুলের বাড়িতে কয়েকজন অন্তরঙ্গকে 'যোগ' সম্বন্ধে যে বিশেষ উপদেশ দান করেন, বর্তমান পুস্তক তাহারই ভাষান্তর। মূল্য ০'৫০।

পত্রাবলী—১ম ও ২য় ভাগ। অভিনব পরিবর্ধিত সংস্করণ। প্রায় ১০৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বামীজীর বহু অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। তারিখ অনুযায়ী পত্রগুলি সাজানো হইয়াছে। পরিচয়- এবং নির্ঘণ্ট-সংযুক্ত। মনোরম বাঁধাই। স্বামীজীর সুন্দর ছবি-সংবলিত। প্রতি ভাগ মূল্য ৫'৫০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ৫৲।

ভারতে বিবেকানন্দ—১৪শ সংস্করণ। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজীর ভারতীয় বক্তৃতাবলীর উৎকৃষ্ট অনুবাদ। ৫৯৯ পৃষ্ঠা; মূল্য ৫৲। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ৪'৫০।

দেববাণী—৯ম সংস্করণ। আমেরিকার 'সহস্র-দ্বীপোদ্যান'-নামক স্থানে কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে স্বামীজী যে-সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন, ঐগুলির একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ২১৪ পৃষ্ঠা; মূল্য—২৲ উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১'৮০।

শিক্ষাপ্রসঙ্গ—৪র্থ সংস্করণ। শিক্ষা-সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণীসকল সংকলিত ও ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেশিত। ১৮৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ১'৭৫।

বাণীসঞ্চয়ন—১ম সংস্করণ। যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র রচনাবলী হইতে বিভিন্ন বিষয়ে সুনির্বাচিত উপদেশাবলী। স্বামীজীর বাস্ট-সংবলিত সুন্দর প্রচ্ছদপট। পৃষ্ঠা ৩১২; মূল্য ৩'২৫।

কথোপকথন—৭ম সংস্করণ। স্বামীজীর ছবিযুক্ত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৪২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১'২৫। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১'১৫।

মদীয় আচার্যদেব—স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত; ১১শ সংস্করণ, ৬৪ পৃষ্ঠা। স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদের নিকট স্বামীজীর বিবৃতি। মূল্য ০'৭৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ০'৬৫।

ভারতীয় নারী—১২শ সংস্করণ। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি হইতে নারী-সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির একত্র সমাবেশ। ভারতীয় নারীর শিক্ষা, মহান্ আদর্শ, পাশ্চাত্য নারীদের সহিত পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা। স্বামীজীর মনোরম ছবি-সংবলিত, ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি ১২০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১'৫০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১'৩৫।

স্বামি-শিষ্য সংবাদ—(পূর্বকাণ্ড — ১৩শ সংস্করণ; উত্তরকাণ্ড— ১শ সংস্করণ)। শ্রীশরৎ-চন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। স্বামী বিবেকানন্দজীর মতামত অল্প কথায় জানিবার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। স্বামীজীর জীবিতকালে তাঁহার সহিত প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-দেশীয় আচার-নীতি, দর্শন-বিজ্ঞানাদি এবং ধর্ম ও সমাজগত সমস্যামূলক নানা বিষয়ের বিশদ আলোচনা। সরস ও হৃদয়গ্রাহী এই সব বর্ণনা সত্যিই আনন্দদায়ক। বর্তমান যুগের বহু সমস্যার আদর্শানুগ সমাধানও ইহাতে পাওয়া যাইবে। জীবনতত্ত্ব বিষয়ে এই পুস্তকদ্বয় অমূল্য রত্নের সন্ধান দিবে। ২২০ ও ২১০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য প্রতি কাণ্ড ২'২৫।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ—১৫শ সংস্করণ। ১৫৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, জড়-ভরতের উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, জগতের মহত্তম আচার্যগণ, ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট ও ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালক-দিগের চরিত্রগঠনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবান্ করিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে; মূল্য ১'৫০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১'৩৫।

প্রাপ্তিস্থান :—উদ্বোধন কার্যালয়' বাগবাজার, কলিকাতা ৩

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে অপূর্ব পুস্তক। স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত। দুইভাগে রেক্সিন-বাঁধাই। মূল্য—১ম ভাগ ১০৲ ২য় ভাগ ৮৲
উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে " ৯৲ " ৭·২০
সাধারণ বাঁধাই পাঁচ ভাগে:

মূল্য—১ম ভাগ	২·০০	উঃ গ্রাঃ পক্ষে	১·৮০
২য় "	৩·৭৫	"	৩·৪০
৩য় "	৩·০০	"	৭·৭০
৪র্থ "	৩·০০	"	২·৭০
৫ম "	৩·৫০	"	৩·১৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি— ৭ম সংস্করণ। অক্ষয় সেন-প্রণীত। সুললিত কবিতায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিস্তারিত জীবনী ও অলৌকিক শিক্ষা-সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ আর নাই। ৬৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—বোর্ড-বাঁধাই ১১৲ উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১০৲।

পরমহংসদেব—ষষ্ঠ সংস্করণ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-প্রণীত। সুললিত ভাষায় অল্প কথায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য জীবনবেদ। ১৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—১·৭৫।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—১২শ সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। বালক-বালিকাদিগের জন্য সরল ভাষায় লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী। মূল্য—০·৬০।

শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত — ২য় সংস্করণ। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী-প্রণীত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর অপূর্ব সমাবেশ। বোর্ড-বাঁধাই ডিমাই সাইজ। মূল্য—৪·০০।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ— ১৮শ সংস্করণ। সুরেশচন্দ্র দত্ত-সংগৃহীত। ২৬৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—৩৲।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত। ২২শ সংস্করণ। মূল্য—০·৬০ পয়সা। কাপড়ে বাঁধাই ৮০ পয়সা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা—শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত-মহাকাব্য শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির অমর লেখক অক্ষয়কুমার সেনের লেখনী-প্রসূত গ্রন্থ। মূল্য—২·০০।

রামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—১৪শ সংস্করণ। স্বামী প্রেমঘনানন্দ-প্রণীত। এই সুচিত্রিত সুদৃশ্য সুলভ পুস্তকখানি ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনগঠনের সহায়তা করিবে। মূল্য—১·৭৫।

শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত। ৪র্থ সংস্করণ। এরূপ বিস্তারিত জীবনী-গ্রন্থ পূর্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। পৃষ্ঠা ৭১০; মূল্য—৮৲।

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ-প্রণীত। পৃষ্ঠা ১১০। মূল্য—২·০০।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানদের 'ডাইরী' হইতে সংগৃহীত সারগর্ভ উপদেশ। সংসারতাপে সান্ত্বনাদায়ক ও অধ্যাত্মরাজ্যে পথপ্রদর্শক। মূল্য—১ম ভাগ—৫·৫০, ২য় ভাগ—৪·০০।

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত। স্বামীজীর অধুনাতন মূল্যবান প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ড ৭৲। একত্র লইলে ২০৲। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৮৲।

স্বামী বিবেকানন্দ—৩য় সংস্করণ, শ্রীপ্রমথনাথ বসু-রচিত। দুই খণ্ডে প্রকাশিত স্বামীজীর জীবনী। ৯৬৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—প্রতি-খণ্ড ৪৲। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৩·৬০। দুই খণ্ড একত্র বাঁধান ৮·৫০।

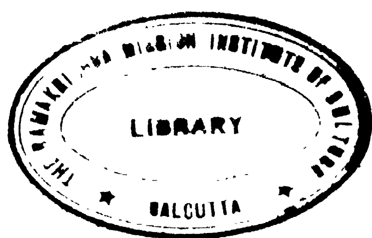
স্বামী বিবেকানন্দ—১১শ সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। স্বামীজীর জীবনের প্রধান প্রধান সকল কথাই বলা হইয়াছে। মূল্য—০·৭০।

বিবেকানন্দ-চরিত—৯ম সংস্করণ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-প্রণীত। মূল্য—৭৲

স্বামীজীর কথা—৫ম সংস্করণ। স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় শিষ্য ও ভক্তগণ তাঁহাকে যেভাবে দেখিয়াছেন তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য ২৲; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১·৮০;

প্রাপ্তিস্থান :—উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৩




LIBRARY
CALCUTTA


205/UDB/B
70026